উপন্যাস সমগ্র

নবারুণ ভট্টাচার্য

উপন্যাস সমগ্র

নবারুণ ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

UPANYAS SAMAGRA
A collection of Bengali Novels by NABARUN BHATTACHARYAY
Published by Sudhangshu Shekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241 2330, 2219 7920 Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail com
Rs 350 00

ISBN 978-81-295-1057-0

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭২

প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত

৩৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

রাজীব চৌধুরীকে

লেখকের অন্যান্য বই

গদ্য সংকলন

অ্যাকোয়ারিয়াম

কবিতা সংকলন

এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
পুলিশ করে মানুষ শিকার
মুখে মেঘের রুমাল বাঁধা
রাতের সার্কাস

গল্প সংকলন

হালাল ঝাণ্ডা ও অন্যান্য গল্প
অন্ধবেড়াল ও অন্যান্য গল্প
নবারুণ ভট্টাচার্যর ছোটগল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প
ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য
ফ্যাতাড়ুর কুম্ভীপাক
প্রেম ও পাগল
মহাযানের আয়না

উপন্যাস সমগ্রের ভূমিকা

আমার আটটা ছোট-বড় উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন। কেউ চাইলে এবার একটি সসীম মুদ্রিত পরিসরে আমার আখ্যান, তার ব্যর্থতা ও সফলতা, একাধিক ধাঁচের বাচনের মধ্যে আমার অস্থির সন্ধান, কোনো মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক যোগসূত্র আছে না নেই, জটিল ও ধ্বস নামার সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা আমি করতে পেরেছি কি না, আমার বিশ্ববীক্ষা, প্রাণমণ্ডলের সঙ্গে একটা সক্রিয় অঙ্গীকার— সবটাই যাচাই করে নিতে পারবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, যে তাগিদ থেকে আমি লিখি তার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক রদবদলের যে বিচিত্র ও ট্রাজিক সময়ের আমি সাক্ষী তার অনুরণন আমার আখ্যানে রয়েছে— কখনও আমি অংশীদার এবং সব সময়েই ভিক্টিম। তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক হিসেবে সেটাই আমার উপলব্ধি। বিচ্ছিন্নতার কষ্টকর একাকীত্ব থেকে কোনো একটা অন্বয়ে আমার যাওয়ার চেষ্টা আশা করি পাঠকের চোখ এড়াবে না। অমানবিকতা ও তৎসংশ্লিষ্ট আবশ্যিক যে বুজরুকির সার্কাসের মধ্যে আমরা রয়েছি তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ অসম্ভব। এটাই আমার ও আমার আটটি আখ্যান—এই ন'জনের সম্মিলিত ঘোষণা।

নবারুণ ভট্টাচার্য

সূচি

হারবার্ট

এক

''চবণে বন্ধন নাই, পবাণে স্পন্দন নাই,
নির্বাণে জাগিযা থাকি স্থিব চেতনায।''
—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

—ভালো করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হযে যাবে।

২৫মে। ১৯৯২। 'মৃতেব সহিত কথোপকথন'-এব অফিস বা হাববার্টেব ঘর থেকে অনেক বাত্তিবে বমি বমি ধুনকিতে গলিব বাড়ি, বাস্তাব বাড়ি, কোথায় বাড়িতে ফেবার সময কথাটা বলেছিল বড়কা। সেই বাত্তিরেব মালেব আসরেব পব বাড়ি ফেবাটা কোটন, সোমনাথ, কোকা, ডাক্তাব, বড়কা এদেব যেমন মনে আছে এখনও, সেটা এলোমেলো। চাঁদেব গাযে স্যাঁত্‌লা। বাস্তাব আলোগুলোব পাশে ফেনা ফেনা আলোব গুঁড়ো। গবমে সব হড়কে যাচ্ছে। পেটের অন্তেবা থেকে চপ, চানা আব হুইস্কি, বাম, ববফ জল সব গ্যাঁজগেঁজিযে উগরে আসছে। নর্দমার ঝাঁঝবি দিযে ভুবভুর কবে আবশোলা বেবিযে বাস্তার আলো তাক করে উড়ে যাচ্ছিল। কোকা দত্তদের বাড়ির গেটেব গাযে বমি কবেছিল। গবম, টক, হড়হড়ে সেই বমির ঝাঁঝটা কোকা আজও ভোলেনি। ডাক্তাব আব কোটন তখন পেচ্ছাপে পেচ্ছাপে কাটাকুটি খেলছিল। বস্তার মতো একটা তেলচিটে মেঘ আকাশেব চাঁদে ঠুলি পরিয়ে দিল। গযলাবস্তির মুখে সবকাবি কল। সেখানে কানিপবা পাগলীবুড়ি পা ছেতবে বসে জল ছেটাচ্ছিল। প্যাঁচার করক্ক কক্কর্‌ ডাক শুনে গা-পচা কুকুবগুলো ঘুমের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিল। হারবার্ট সবকারেব চিলছাদেব ওপরে স্টার টি-ভি ধবাব বাটি অ্যান্টেনা খসা-তাবা ধরবে বলে হাঁ কবে তাকিয়েছিল। ডাক্তার কাটাকুটি খেলা শেষ করে গেট ধবে দাঁড়িযে থাকা কোকাকে বলেছিল, খেলেও উল্‌টি। না খেলেও উল্‌টি। এই জন্যে তোদেব সঙ্গে মাইরি মাল খেতে ভালো লাগে না। ঝিম বিলা! নেশা বিলা। খালি বাওয়াল করবে!

কোটন চিৎকার করল, হারবার্টদা বিলা! হারবার্টদা ভোগে!

কোকা ভাবার চেষ্টা করছিল যে সে জন্মে আব কখনও মাল খাবে না। কিন্তু সেও বমির সুতো সুতো লালা ঝুলিয়ে দৌড় দিল কারণ পাড়া জাগিযে সোমনাথ চেঁচাচ্ছিল, খোড়োববি আসচে। তোদেব মাছ খাওয়াবে বলে খোঁড়োরঁবিঁ আসচে।

জলে ডুবে কবে মরে গেলেও খোড়োরবি আসতেই পাবে। হারবার্টদা ডাকলে তো আসবেই।

সেই রাত্তিরে এইরকমই ছিল বন্দোবস্ত। একে বলে সাঙঘাতিক বা খতরনাক্‌ গুগলি। সচরাচব নেশায় নেশায় এইসব রাতগুলো কেটে যায়। তৎসহ মবা বাতাসও থাকে।

দোতলার বারান্দায় বড় ঘড়িতে রাত একটার ঘন্টা বাজল। শালপাতার প্লেটের ওপরে ভাঙা চপের টুকরো, ভাঁড়ের তলায় গুজবাটি দোকানেব চানার ঝোল—সব গোটা আটেক আরশোলা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। তাদেব কাউকে ধরবে বলে রাস্তার দিকের দেওয়ালের

মোটা টিকটিকি দেওয়াল থেকে নেমে, খাটেব পাযা বেয়ে উঠে একবার চুপ কবে বুঝে নিল হারবার্ট ঘুমোচ্ছে কি না। সে দেখল হাববার্ট নিথর। তখন টিকটিকিটা হারবার্টেব বুকেব ওপব দিযে গিযে তাব বাঁ হাত ববাবব নেমে গিযে দেখল যে হাতটা বক্তেব গন্ধওলা ঠাণ্ডা জলে ডুবে বযেছে। সবুজ চোখে সে অন্ধকাবেব মধ্যে হাত থেকে বালতিব কানা মাপ কবে নিযে লাফ মেবে বালতিব কানায় উঠেছিল। সেখান থেকে বালতিব গা বেযে তবতবিযে নেমে কোন্ আবশোলাটাকে ধববে এটা ঠিক কবাব সময় নীল একটা আশ্চর্য আলোয সকলেব চোখ ধাঁধিযে যায। টিকটিকি ও আবশোলারা দেখেছিল সেই আশ্চর্য দৃশ্য। বাইরের দেওযালে, গলিব দিকে যে বন্ধ কাচেব জানালা তাব ধুলোমযলায মুখ ঘষে, ডানা ঝাপটে, একটা পবী ঘবে ঢুকে হাববার্টেব কাছে আসার চেষ্টা কবছে। তাব নীলচে মুখেব ভাপ কাচেব ওপব পড়ছে, তার চোখের জলে ধুলো ধুয়ে যাচ্ছে। হারবার্টেব চোখ দুটো তখন আধখোলা। যদিও পবে বুজিয়ে দেওয়া হযেছিল। সেই রাতে এরকমই ছিল বন্দোবস্ত। এবপর ভোববাতে পিঁপড়েবা আসতে শুরু কবে। পিঁপড়েরা ঝগড়াবিবাদ না কবে ভাগাভাগি কবে নিতে জানে। কালো পিঁপড়েবা খাবাবেব টুকবো, দাঁতেব ফাঁকে আটকে যাওযা ও খুঁচিযে ফেলা ডালেব দানা বা গুঁড়ো খাবাব, শুকনো খাবারের দিকে যায। লাল ও ডেঁও পিঁপড়েবা সবাসবি মৃতের নাসাবন্ধ্র, শ্লেষ্মা, চোখ, থুথু মাবফৎ ঠোঁটের কোনা, জিভেব গোড়া, দুর্বল মাড়ি ইত্যাদি পছন্দ করে। এতসব আমিষবিলাসী পোকা ও কীটেব ভিড়ে সবব মুষ্টিমেয ঝিঁঝিঁপোকা অবশ্যই অকিঞ্চিৎকব। কাবণ সুদিনে, দুর্দিনে তাবা যুগ যুগ ধবে না সভ্যতাব, না অসভ্যতাব জযগান গেযে আসছে। কেউ শুনুক আব না-শুনুক।

দেওযালে পোঁতা মবচে-ধবা লোহাব গজাল। তাব ভেতব দিকে ঝুলছে হাববার্টেব বাঁটওলা ছাতা। ছাতাটা দেখা যায না কাবণ তাব ওপর দিযে ড্রাকুলাব জোব্বাব মতো ঝুলছে হাববার্টেব অলেস্টার। হারবার্টেব মাথার কাছে খোঁদল করা তাকে বয়েছে হাববার্টের দুটি অতীব প্রযোজনীয় বই—

১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষর্ণ প্রণীত 'পবলোকেব কথা'—সংশোধিত ও পবিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্কবণ। মূল্য দুই টাকা মাত্র। বইটি বযেছে ১৭১ পাতা থেকে। তাই শুরুতেই দেখা যায মহাবাজ বাহাদুব সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে. সি. এস আই-এব ফটো। ছবিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায যে ১৯০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি ৭৭ বছব বযসে পবলোকগমন কবেন—বইটি এইভাবে শুরু—"লিখিলেন,—'মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমিও অনেক যন্ত্রণা ভোগ কবিযা এখন বেশ শান্তিতে আছি।' এইরূপ আবও অনেক কথা লেখার পর শিবচন্দ্রেব স্ত্রীব আবেশ ভাঙিয়া গেল। তিনি কন্যাব জন্য কাঁদিতে লাগিলেন . " ইত্যাদি।

২) কালীবব বেদান্তবাগীশ প্রণীত 'পবলোক-রহস্য'।

এই দুটি বই হারবার্ট তার দাদু বিহাবীলাল সরকারেব সংগ্রহ থেকে পেয়েছিল। 'পবলোক-রহস্য' বাদে কোনো বই-ই আস্ত সে দেখেনি। অবশ্য আব একটি আস্ত বই ছিল—শ্রীগুরুপদ হালদাব রচিত 'ব্যাকবণ দর্শনের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড। এই বইটি স্বাভাবিক কাবণেই হাববার্ট কখনও খোলেনি। তবে জবাজীর্ণ, বাঁধানো নাট্যমন্দিব পত্রিকা থেকে সে 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' পড়েছিল। এর থেকে সে আউট-নলেজ সংগ্রহ করেছিল যে দুই সহোদবা অভিনেত্রী সুচিন্তা ও সুকুমারীর ডাকনাম ছিল শুচি ও ভুঁদি, শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী 'প্রফেসর বোসেব গ্র্যাণ্ড সার্কাস'-এ প্লে করিতেন এবং আবও দুই অভিনেত্রী হিরণ্ময়ী ও মৃন্ময়ী ওরফে ভূতি ও ভোমা বিডন

স্ট্রিটে থাকতেন। একভাবে দেখলে এঁদেব প্রতি হারবার্টের একটি টান ছিল, ছিল এঁদের সঙ্গে একজাতীয সখ্য যা ঠিক প্রত্যক্ষ আলাপ বা সমসাময়িকতাব অপেক্ষা রাখে না। "বমণীগণেব ভীতিজনক চিৎকার ও পুরুষগণেব হৈচৈ শব্দে সেই ঘোরা দ্বিপ্রহর বজনীযোগে পিথাপুরেব বাজবাড়ী যথার্থই কম্পান্বিত হইতে লাগিল। আবাব বুঝি কি এক অভিনব ভৌতিক কাণ্ড হইল ভাবিযা, প্রাণভয়ে গোপাল ডুবিযা ও সহিসগণ বহির্ভাগেব আস্তাবল বাটী হইতে দৌড়িযা আসিল।"– হাববার্টেব-এ ঘটনা প্রায দেখা ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

জানালাব কাচে অনেকক্ষণ ধরে ডানা ঘষে কিছু হল না দেখে আকাশ ফিকে হবাব ভয়ে পবী এক সময শেষরাতের মধ্যে দোকানে ফিবে গেল। টিকটিকি ও আবশোলারা পরীব দিকে আব মন দেযনি। হাববার্টেব ঘবে আটকে পড়া একটা মাছি রাত ১২টা নাগাদ হারবার্টেব বাঁ হাতেব শিবা কাটাব সমযে সমুদ্রেব মধ্যে অন্ধ হাঙরেব মতো বক্তেব গন্ধ পেযেছিল। কিন্তু কানা বলে সে সেখানে পৌঁছতে পাবেনি। ঘবে যখন একটু একটু কবে আলো ঢুকছে তখন সে উড়ে গিযে মেঝেতে পড়ে থাকা একটি ব্লেডেব ওপরে গিযে বসেছিল যায গাযে বক্ত আব চটচটে নয, কালচে হযে শুকিয়ে গিযেছিল। হাববার্টের বাঁ হাতটা শিবা কাটা অবস্থায় লোহাব বালতিতে ববফজলে ডোবানো ছিল। চোখ দুটো অল্প খোলা। মুখটা অবশ্য অন্য সমযেব মতো ফবসা আব চোখা চোখা ছিল না। কালি পড়ে গিযেছিল। মুখটা একটু ফাঁক করা। ডান হাতটা বুকেব ওপবে ভাঁজ কবে রাখা। অত মদ আনিয়েছিল ছটফটানিটা কম হয যাতে তাব জন্যে।

যারা চিঠি দিযেছিল তাবা, তাবপব–খববের কাগজের ফটো-বিপোর্টাব, কলেজের ছেলেমেযে–ওবা চলে যাবাব পরে কোটন, বডকা, কোকা, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সোমনাথ, অভয, খোড়োরবিব ভাই ঝাপি, গোবিন্দ–সব ছেলেবা ঢুকে দেখল হারবার্ট থবথর করে কাঁপছে। হাঁসফাঁস করছে, ঘামছে। জামা খুলে ফেলেছে। টেবিলফ্যানটা এমাথা ওমাথা করছিল আর হারবার্ট তার সঙ্গে সবে সবে হাওয়ার সামনে থাকাব চেষ্টা করছিল। ওরা ফ্যানটাকে একমুখো কবল। হাববার্টেব খাটে তাকে বসিযে জল খাওযাল। চা আনল স্পেশাল। আস্তে আস্তে ধাতস্থ হল হারবার্ট। চোখ থেকে ভয় যাযনি। বারবার বলছিল, সব গুগলি হয়ে গেল। সব গুগলি হযে গেল। ওফ্ .. ধুকপুক কবচে, ধুকপুক ধুকপুক করচে। এ কী বন্দোবস্ত রে বাবা!

–ওস্তাদ। তুমি একটু চুপ করে বসো তো। থিতিযে বসো। আর একটু চা খাবে?

–না। সব খাওয়াব শেষ খাওয়া হযে গেচে আজ। কেবল মাবচে! কেবল মারচে! হামা দিচ্চে, তবু মারচে। পাটবন শুযে পড়েচে, তবু মারচে! কিল, চড়, লাথি, ঝ্যাঁটা ....

হাববার্ট ককিযে কেঁদে ওঠে, চুল টানতে থাকে। লাথি মেরে বালিশ ফেলে দেয়। উঠে খোঁদলে রাখা ছোট আয়নায নিজেকে দেখে, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মুখে হাসি, বলে, বাপমা মরা, খানকিব ছেলে, ভূতের পাইন মেরে টাকা কামাবে না? জীবন্তে কুলোলো না, মড়া মারাতে গিয়ে হল তো! কেমন লাগচে এখন কাবলে ঠাপ খেতে? টাকরায় ঠেকচে, কেমন লাগচে, হারবার্ট, হার বার্ট, হা .ব.. বার্ট।

নিজের গালে এলোপাথাড়ি চড় মারতে থাকে আব লাফায়। ওরা হারবার্টকে টানাহ্যাঁচড়া করে বসায়। ধুতি খুলে যায়। শুধু আণ্ডারওয়্যার পরা। বসে দুলতে থাকে সামনে পেছনে। চোখ বন্ধ।

–আর তো কতা বলব না, আর কতা বলচি না। ভুড়ভুড়িটুকুও দেখতে পাবে না। যতই পাড়ে বসে থাকো আঁশবটি নিয়ে, টেরটি দেব না। পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা!

—একটু সামালাও গুরু নিজেকে। শুয়ে থাকো না একটু।

ওরা জোর করে শোয়াতে যায় হারবার্টকে।

—না ছাড়, পেটটা কেমন গুলোচ্চে। অসোযাস্তি।

—পায়খানা করবে?

—হবে বোধয়। ঘুরে আসি।

হারবার্টকে পায়খানায় বা কলে যেতে হলে রাস্তা দিয়ে ঘুরে পেছনদিকে মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়—কাজের লোকদের ওখানেই ব্যবস্থা। আণ্ডারওয়্যার পরা হারবার্টকে যেতে দেখে কয়েকটা বাচ্চা "বাঁটপাখি! বাঁটপাখি!" বলে চেঁচায়। কোটন বেরিয়ে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে বলে—এক লাথ্ মারব পেটে, ইয়ার্কি মারা বেরিয়ে যাবে। বাচ্চাগুলো দৌড়ে পালায়।

ওরা ঘরে হারবার্টের জন্যে অপেক্ষা করে। কথা বলে—পায়খানাটা হলে দেখবি গুরু আবার ফিট হয়ে যাবে।

ডাক্তার যার নাম তার ওষুধের দোকান আছে। ক্লাস সেভেন অব্দি পড়লেও ডাক্তার অনেক জানে।

—আমি ভাবচি অন্য কথা। অনেক সময় হার্ট চোক হওয়ার আগে হাগা, বমি এইসব পায়।

—আমি দেখেচি গলায় দড়ি দিলে হেগে ফ্যালে।

—থাম্‌তো। হচ্চে শালা হার্টচোকের কথা তার মধ্যে কোত্থেকে গলায় দড়ি নিয়ে এল।

—ওই জন্যেই তো ওর বাবা জ্ঞানবান নাম রেখেছিল।

—বাপ তুলবি না কোকা! পিন মেরে দেব।

এইভাবে কথা চলছিল ওদের। বাইরে তখন রোদ্দুরে বিকেলের মায়া জড়াতে শুরু করেছে। কমজোরী সোনালী আলো। ওরা হঠাৎ দেখতে পেল সেই আলো মাথায় মেখে রূপবান হারবার্ট দাঁড়িয়ে। তার মাথা, গা ভিজে, বুকের লোম ভিজে, চুল ভিজে লেপটে আছে। আণ্ডারওয়্যারটা জল সপসপে। টপটপ করে জল ঝরছে এবং হারবার্ট হাসছে। দরজা থেকে নাচের ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে হারবার্ট দড়ি থেকে গামছা নিয়ে গা মুছতে মুছতে বলল—

দেখলাম চৌবাচ্চা উজলে জল পড়ে যাচ্চে, চানের লোভ হল।

—এখন কেমন লাগচে গুরু?

—হেভি আমেজ আসচে। মনে হচ্ছে বেড়াতে যাই।

—গুরু, আজ মাল খাবে না?

—খাবো না মানে? আজকে তো গ্যালাখ্যালা হবে। মালটা যা জমবে না আজকে! ফুরফুর করবে। নসলিয়া!

—যাক, তোমার মুডটা ঠিক হয়েচে তাহলে।

হারবার্ট কাচা ধুতি পরে। পরতে পরতে কথা বলে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কথা বলে। হাতে কাচা একটা ফুলসার্ট পরে। তারপর তোরঙ্গটা খোলে। টাকা গোনে। অনেক টাকা। থুথু লাগিয়ে লাগিয়ে গোনে।

—আমাদের আবার মুড। খানকির ছেলেদের জানবি মুডফুড নিয়ে কোনো চুদুরবুদুর নেই। খালি আচে মজা। বাবলাগাছে কাতলামাছে কী খেলা যে জমেচে কী বলব। টুনুক টুনুক ঘন্টা বাজছে। লাল নীল আলো মারচে—ডান্স পার্টিতে যেমন থাকে। ওদিকে আবার ডালে ডালে রুই মিরগেলের চকচকি, পাতায় পাতায় মৌরলা মাছের বাহার। চিকমিক চিকমিক! চিকমিক চিকমিক। বাওয়াল কেউ থামাতে পারবে না বাবা। সায়েবরা তো রাতদিন ধরে মারল। পারল?

সায়েববা হেদিয়ে গেল তো এবা এল—আরে বাবা ইংবিজি ঝাড়লে যদি বাওযাল ঠেকানো যেত তাহলে আব দেখতে হত না

টাকাব গোছটা নিযে ববাব ব্যাণ্ড দিযে জডায়। তাবপব গোছটা ছুঁড়ে দেয গোবিন্দব কোলে।

—তিন হাজাব আচে। পোর্টেবল হযে যাবে।

—ক্লাবেব টিভি গুরু?

—আবার কি? সবাই যখন জালি ব্যবসা, জালি ব্যবসা বলচে তকন আব ওব টাকা শালা ঘবেই বাখব না। আব কোকা, এই নে চাবশো। মাল কিনবি।

—চাবশো টাকায তো কুডিটা বোতল হবে গুরু।

—কুড়িটা বোতল! আবে ফোটা! ও বাংলাফাংলা নয। ইংলিশ, ইংলিশ—ফবেন লিকাব শপ।

—কী আনব হাববার্টদা! আজ তো তবে বাঘেব খেলা।

—একটা হুইস্কি নিবি বড। একটা বাম নিবি বড়। তিন কিলো ববফ নিবি নতুন বাজাব থেকে। যাবা মাল খায না তাদেব জন্যে চপ, ঝাল ঝাল চানা তারপব চিংড়ির কাটলেট, ঐ যে ন্যাজ বেরিযে থাকে। তাবপব সল্টেড বাদাম নিবি, সিগারেট নিবি—দূব, অত কি বলা যায নাকি? ওডাতেও শিকলি না! আজ হল একেবাবে যাকে বলে মেমফুর্তি।

হারবার্ট ওদেব বলেছিল সাডে আটটা নাগাদ চলে আসতে। তাবপব হারবার্ট ঘুমিয়েছিল কিছুক্ষণ। ঘুম থেকে উঠেছিল সাতটায। দবজাব বাইবে, চেযাব নিয়ে গিয়ে সাইনবোর্ডটা নামিযে এনেছিল। তাতে লেখা ছিল 'মৃতেব সহিত কথোপকথন'—'প্রোঃ হাববার্ট সরকার।' সাইনবোর্ডটা দেওযালেব দিকে মুখ ঘুবিযে বেখেছিল। খোঁদলেব তাকেব বই দুটোব তলায একটা নতুন ব্লেড ছিল। সেটা আছে কিনা দেখেছিল। তাবপব দবজা টেনে ভেজিয়ে দিযে দোতলায় জ্যাঠাইমাব সঙ্গে দেখা করতে গিযেছিল। জ্যাঠাইমা মন দিযে টিভি দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চলে এসেছিল হাববার্ট। খাতাব একটা পাতার আধখানায ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কী লিখে বুকপকেটে বেখেছিল। মালেব পার্টি খুব জমেছিল। বালতির মধ্যে অনেকটা ববফ গলে জল জমছিল। হাববার্ট ওদেব বলল পাখাব হাওয়ায ঠাণ্ডাটা ছডিযে ঘর শেতল হবে। হাববার্ট বলেছিল, যা ঘাবড়ে দিযেছিল। ঐ যে ঘোষ, যে চিঠি দিয়েছিল—শালা তাকিযে আছে গোঁযাডগেলেব মতো। আর খালি ইংবিজি বলচে, খালি ইংবিজি বলচে। যত বলচে তত সব আমার গোলপুঁটুলি হযে যাচ্চে।

—আব খবরের কাগজেব মেয়েটা কি আজব মাল গুরু! পুকপুক করে সিগারেট খাচ্চে, আবাব এই দেখি ফ্ল্যাশ মেরে মেবে ফটো তুলছে।

—আচ্ছা হাববার্টদা, তোমাব এই মরাব সঙ্গে কথাটথা—সবটাই কি ঢপের কেত্তন ছিল।

—তোব কি মনে হয়?

—ঢপ হলে অত লোক আসত তোমাব কাছে? অত লোক, অত কথা—সব ফ্যাল্না?

—তবে এ ব্যবসা আর করব না। বদনাম যখন রটবেই তখন আর এসব লাইনে হারবার্ট সবকার নেই।

—তাহলে কী করবে গুরু?

—ভাবচি। ভাবতে ভাবতে লাইন একটা ঠিকই বেবোবে। ও, দেখেচিস, সাইনবোর্ডটা খুলে ঘরে নিয়ে এসেচি! কোকা, একবার ঐটে দেখিয়ে দে তো বাবা।

কোকা দুটো জিনিস দারুণ দেখায়। একটা হচ্ছে কোন্ একটা ইসবগুলের বিজ্ঞাপন যার নাম 'চেয়ার পায়খানায় বসে হনুমান হাগচে'—এটা ও টিভি থেকে তুলেছিল। অন্যটা হচ্ছে—

কৃশানু আর বিকাশ মোহনবাগানে সই করার সময় গজু বোসের মুখ।

কোন্‌টা গুরু? চেয়ার পায়খানা?

—না, না, গজু বোস।

কোকা দেখাল। খুব রগড় হল। ধুম নেশা হয়েছিল। বালতি ভরতি বরফগলা জল। বোতলে একটু রাম থেকে গেল। ঘর থেকে ওরা যখন বেরোয় তখন হারবার্ট জানালা বন্ধ করছে। অনেক রাত্তিরে বমির ধুনকিতে গলির বাড়ি, রাস্তার বাড়ি, কোথায় বাড়িতে ফেরার সময় কথাটা বলেছিল বড়কা।

—ভালো করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।

দুই

"বিদেশে, প্রাণেশ, তুমি করিয়া ভ্রমণ,
দেখিবে নূতন দৃশ্য প্রত্যেক দিবস।"
—বলদেব পালিত

হারবার্ট জ্যাঠাইমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে যাবার সময় যে খাতাটি কিনেছিল তার থেকে জানা যায়,
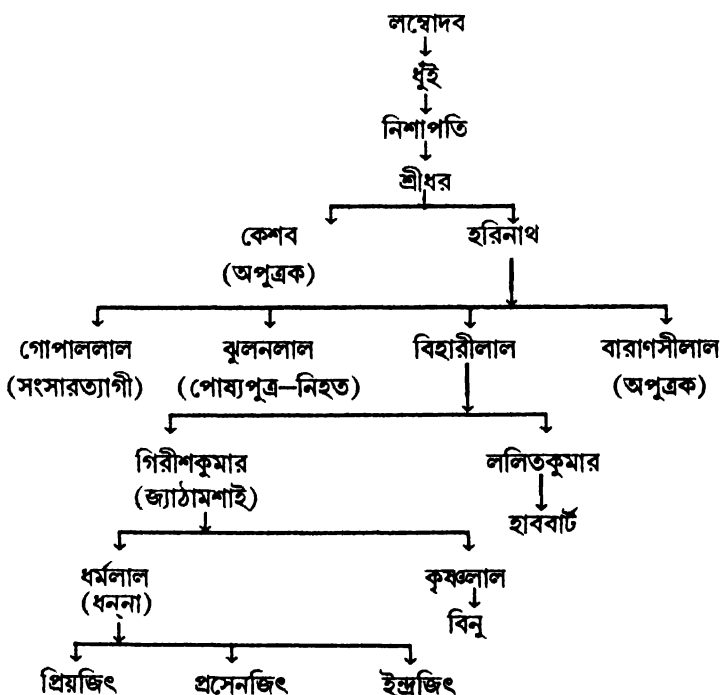
যা হারবার্টের খাতা থেকে জানা যায়নি তা মোটামুটি,

হারবার্ট সবকাব। পিতা ললিতকুমাব। মাতা শোভারাণী। হারবার্টের আবির্ভাব ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। ললিতকুমাব যুদ্ধেব বাজারে কামানো টাকা ফিল্মে লড়িয়ে বুববক বনে যান। ১৯৫০-এ হারবার্টের এক বছবেব জন্মদিনেব পবে পবেই চলচ্চিত্রে ব্যর্থ নাযিকা মিস রুবীর সঙ্গে দার্জিলিং-কার্শিয়াং রুটে জিপ দুর্ঘটনায আবও দুই আবোহী ও ড্রাইভাব সমেত খতম। মা শোভারাণী শিশু হাববার্টকে বিডন স্ট্রিটে মাতুলালযে নিয়ে যান। সেখানে মাস আটেক পবে ছাদে ধাতব তাবে ভিজে কাপড় মেলাব সময শোভাবাণী বিদ্যুৎস্পৃষ্টা হন। শিশু হারবার্ট 'মা যাব, মা যাব' বলে যেতে গিয়ে হোঁচট খেযে পড়ে কাঁদতে থাকে এবং চিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটি মুখপোড়া ও একটি পেটকাট্টিব মাবাত্মক ঢিলি প্যাঁচ দেখে বিভোব হয়ে থাকে এবং এই ভাবেই তাব প্রাণরক্ষা পায। শিশু হাববার্ট পুনবায পিতৃগৃহে ফিবে আসে এবং যেনতেন প্রকাবেণ বড হতে থাকে—জ্যাঠাইমাই যা কিছুটা আদব দিত।

জ্যাঠামশাই গিবীশকুমাব বেশ্যাসক্ত ছিলেন। ফলে তাঁব অবশ্যম্ভাবী ব্যাধি হয যাব পবিণতি জেনাবেল প্যাবালিসিস অফ দা ইনসেন। ইনি, ছোটবেলা থেকেই হাববার্ট দেখে আসছে, দোতলায থাকেন, ঘরবাবান্দা কবেন এবং ঘণ্টাখানেক পবে পবে মোবগ যেমন ডাকে তেমনই নিযমিতভাবে 'পিউ কাঁহা। পিউ কাঁহা।' বলে চেঁচান। আগে আগে রান্নাঘবে বা একতলাব উঠোনেব পাশে সদর কলঘবে জ্যাঠাইমা থাকলে 'এখেনে, আসচি গো।' বলে সাড়া দিতেন। গিবীশকুমাবেব দুই পুত্র—ধর্মনাথ, হাববার্টেব ধন্‌নাদাদা ও কৃষ্ণলাল। কৃষ্ণলাল ইংবিজিব অধ্যাপক, প্রগতিশীল ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিব অতীব নিকট ছিলেন এবং এখনও তাই বিশ্বাস কবেন—বহবমপুব কে এন কলেজে পডাতেন। ওখানেই ছোটখাটো বাড়ি কবেছেন। পৈতৃক বাড়ির অংশ ছেলে বিনুর মৃত্যুব পবে ধন্‌নাদাদাকে লিখে দেন। ধন্‌না শিশুকাল থেকেই খচ্চরেব আঁদি ও লোভী। মিন্টে অর্থাৎ টাঁকশালে চাকবি জুটিযেছিল। আগে তো এত কড়াকড়ি ছিল না, হয়তো ঘুষও কিছু দিত—বোজ ধন্‌না টিফিনবাক্স ভবে সিকি, আধুলি ঝেড়ে আনত। ধরা যখন পড়ল তখন ক'বছর ধরে ঝেড়েছে বোঝার উপায নেই। চাকবি গেল, জেলে গেল—যদিও সাজা কিছুটা মকুব হয়। বেবিযে ধন্‌না নাদুবাবুব বাজাবে তালাচাবিব মস্ত দোকান দিল, বিযে করল। তিন ছেলের বাপ হল। তিনটির মধ্যে বড়টি গৌহাটিতে থাকে। ভ্যাবলা গোবলা, বৌ-এব ন্যাওটা। ঐটে তাও ভালো। বাকি দুটো লাফাঙ্গা—কেঁদো কেঁদো, হাডবদমাইশ। মেজটি বাড়িব চিল ছাদে কেব্‌ল টিভি-ব অ্যান্টেনা বসিযেছে—স্টার টিভি, এম টিভি, বিবিসি এইসব লোকে তো আজকাল হামলে দেখছে। ছোটটি এক ব্ল্যাক বেল্টকে কাবু কবে তাব সঙ্গে শেযাবে কারাটে—কুংফু-ব ইস্কুল খুলেছে যদিও নিজে ধুড়েব ধুড়—এসবেব কিছু জানে না। ধন্‌নাদাদাব বৌ কাজেব লোক, ইংরিজি ইস্কুলে পড়া। বাড়িতে রান্না শেখায়—তিন মাসের কোর্স স্ন্যাকস্‌-এব যাব মধ্যে পার্টি লোফ্‌ থেকে রিবন স্যাণ্ডউইচ এইসব আছে আব আছে মোগলাই, সেটাও তিন মাসেব কোর্স—রেইনবো পোলাও, মুর্গ্‌ ইরানী ও আরও কত কি। আগে অর্ডাব দিলে বার্থডে কেকও পাওযা যায়। ধন্‌নাদাদাব বৌ-এর ক্লাসে অনেক বৌ আসে। হাববার্ট গলিব ওপরে, বলতে গেলে বাড়ির বাইরে, যে ঘরটায় থাকে সেখান থেকে এই বৌদেব আসা যাওয়া দেখা যায় না। হাববার্টের খাতায় এই গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে দুটি লাইন বয়েছে,

ধন্‌নাদাদার হলঘরে
কেন্নীরা খল্‌বল্‌ করে।

হারবার্ট সবকার। নন্দকুমার ইনস্টিটিউশনে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি এবং ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে ওঠার পর যাযনি। বাড়িতেই যা টুকটাক পড়ত। হারবার্ট যে স্কুলে যাচ্ছে না সেটা প্রথম

কয়েকমাস কারো চোখেও পড়েনি। যখন জ্যাঠাইমার চোখে পড়ল তখন বেশ কিছুদিন ধরে নিজেই তাঁর হারবার্টকে মুদির দোকানে ও বাজারে পাঠানো হয়ে গেছে। অবশ্য ইস্কুলে তাকে ধন্নাদাদার টিফিন, পরীক্ষার সময় চোতা, বই এইসব নিয়ে যেতে হত। ধন্না যেহেতু সব সাবজেক্টে টুকত তাই তার বই লাগত বেশি। বাইরে থেকে অঙ্ক করে পাতা সাপ্লাই দেওয়াটা এ পাড়ার রেওয়াজ। সবাই ঘরের ছেলে বলে মাস্টারবাবুও এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। গত একত্রিশ বছরে নন্দকুমার ইনস্টিটিউশন থেকে মাত্র তিনজন সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে।

হারবার্টের বয়স যখন আঠারো তখন জ্যাঠাইমা তাকে নিয়ে পনেরো দিনের জন্য পুরী গিয়েছিলেন। হারবার্ট সঙ্গে একটি খাতা ও কলম নিয়েছিল। ওরা উঠেছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে। সেখানে হারবার্টের কবি-প্রতিভা জাগ্রত হয় ধাপে ধাপে। যে হারবার্ট পুরীতে নেমেই লিখেছিল,

বাংলার পরে আছে উড়েদের দেশ
রোজ রাতে যায় তথা পুরী এক্সপ্রেস

সেই হারবার্টই চারদিন পরে লেখে,

ঐ এল ঢেউ
ঐ গেল ফিরে
অবিরাম আসা যাওয়া
সাগরের তীরে

এবং তারই তিনদিন বাদে, জটিলতর,

স্থলবায়ু বহে বেগে
জলবায়ু ভালো নয়
অক্টোপাসের ভয়
কি হয়, কি হয়

হারবার্ট পাড়ার দর্জির দোকানে গিয়ে নিয়মিত বাংলা কাগজ পড়ত। সেলুনে 'শুকতারা' ও 'নব কল্লোল' পড়ত। হারবার্ট-এর ছন্দজ্ঞান ও উপলব্ধি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিল যদিও শেষ অবধি কিছুই ঘটেনি। পুরী থেকে ফিরে হারবার্ট লিখেছিল,

টুপিধারী নুলিয়ার রগুড়ে জীবন
কোনোই খরচ নাই প্যান্ট ও জামায়
সারাদিন জলে নেমে করে হুটোপুটি
লুটোপুটি করে আর পয়সা কামায়

কাব্যবোধ ও কাব্যদক্ষতা যে কিভাবে হ্রাস পেতে পারে তারও এক মৃত উদাহরণ হারবার্ট। যার কলম দিয়ে এইসব বেরিয়েছে তারই লেখা এগুলি পড়লে কে না মর্মাহত হবে—

ফুটপাথে ফুটফাট
ভুট-ভাট-ভুট
ধন্না অপিসে যায়
পায়ে গামবুট

বা,

কী গরম পড়েছে যে উঃ
আরশোলা কানে করে কুঃ

এই হাস্যকর স্টুপিডিটির পর, ভালগারধর্মী হলেও, ঝি-দের দলবদ্ধ বৃষ্টি ভেজা দেখে লেখা

এই গানের মধ্যেও যেন ভরসা পাওয়া যায়, হয়তো বা কিছুটাই,

—তোমরা ভিজচ কেন গা

ভিজে গা

তোরা ভিজবি কেন লো

গা এলো

কিন্তু শেষটায় যা হতাশাই শুধু নয়, করুণারও উদ্রেক করে, তা হল, আর কিছু না পেরে, অমুক সিং অরোবার গানের লাইন টুকে দেওয়া (এটিই হারবার্টের খাতায় তার শেষ হাতের লেখা)—

আমায় তোমার

কাজললতার কালি করো।

ধন্নাদাদাদের বাড়িটা খুব বড়ও নয়, ছোটও নয়। দোতলার ওপরে ছাদ। সেখানে ঠাকুরঘরের ওপরে চিলছাদ। তার ওপরে গঙ্গাজল আসার ট্যাঙ্ক ছিল। এখন যেখানে স্টার টিভির অ্যান্টেনা। বাড়ির সদর গেটের দিকে নয়, গলির মধ্যে একটা ছোট ঘর আছে। এই ঘরটি একাধারে পুরনো বইপত্র, সেভেন্টি এইট রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ এবং ইলেকট্রিক মিটারের ঘর। এই ঘরটিতে যখন কলকাতায় বিনু পড়তে আসে, ১৯৬৯ সালে, তখন একটি ছোট তক্তপোষ ও টেবিলফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। বিনুর মৃত্যুর পরে ঘরটি কয়েকবছর বন্ধ ছিল। পরে এটি হারবার্টের অফিস এবং শেষ রাত অবধি তারই ঘর ছিল।

এর আগে হারবার্ট দোতলার ভেতরের বারান্দায় শুত। ওখানে বৃষ্টির ছাট আসত না। হারবার্টের জামা-কাপড় থাকত ছাতে ওঠার সিঁড়ির পাশে দড়িতে ঝোলানো। চিলছাদে ওঠার জন্য আগে একতলা থেকে সটান একটা ধচাপচা কাঠের সিঁড়ি ছিল। কিন্তু সেটা দিয়ে উঠলে পাশের বাড়ির ভাড়াটেদের শোবার ঘর দেখা যেত। ওরা চেঁচামেচি করাতে সিঁড়িটির ব্যবহার প্রায় বাতিল হয়ে যায়। বিনুর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে একদিন খুব ঝড়জল হয়। সেই বৃষ্টির রাতেই সিঁড়িটার নীচের দিকটা ভেঙে পড়ে। ওপর দিকটা তখনও চিলছাদে আটকে ঝুলছিল। ওপর থেকে খুঁচিয়ে তখন বাকিটা ফেলে দেওয়া হয়।

ধন্নাদাদাদের বাড়ির সামনের মোড়ে পাড়ার কালীপুজো হয়। দুর্গাপুজোটা হয় একটু এগিয়ে, বারোয়ারি মোড়ে। ওখানে ব্যাচাদার মিষ্টির দোকান আছে। সারাবছর একই খাবার কিন্তু দোলের সময়ে ওখানে দোলবড়া বানানো হয়।

ললিতকুমারের একটি ফটো এলবাম উত্তরাধিকার সূত্রে হারবার্টের পাওয়ার কথা ছিল। এতে ছিল প্রথম দিকে, রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো, লন চ্যানি (নানা ধরনের চরিত্রে), ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো, লিলিয়ান গিশ, মেরি পিকফোর্ড, এরল ফ্লিন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের ক্লার্ক গেবল, রবার্ট টেলর, ভ্যান হেফলিন, হামফ্রে বোগার্ট, বেটি ডেভিস, ভিভিয়ান লেই, ক্যাথরিন হেপবার্ন প্রমুখের রঙীন ফটো। একটি ফটোতে দেখা যায় ললিতকুমার ও শোভারাণী একটি সানবিম ট্যালবট মোটরযানের সামনে। মধু বোস ও সাধনা বোসের মধ্যে ললিতকুমার। ব্যর্থ নায়িকা মিস রুবী ও ললিতকুমার। শিশু হারবার্ট কোলে শোভারাণী। শিশু হারবার্ট।

এলবামটি হারবার্ট কোনোদিন চোখেও দেখেনি। কারণ ধন্না এলবামটি মেরে দেয় এবং তার আলমারির তলায় পুরনো জামাকাপড়ে জড়িয়ে রেখে দেয়। ললিতকুমারের আর একটি সংগ্রহ ছিল—নানা ধরনের সিগারেট হোল্ডার। সেটি অবশ্য ধন্না নয়, অন্য কেউ লোপাট

করেছিল। বহু সন্ধান করেও ধন্না সেই চুরুটের বাক্সটি খুঁজে পায়নি যার মধ্যে ললিতকুমার তাঁর সিগারেট হোল্ডারগুলি রাখতেন। ললিতকুমারের সাহেবিয়ানার দৌলতে ধন্নাও মাঝে মধ্যে বিলিতি সিগাবেট ও স্কচ হুইস্কি ঝেড়ে মেরে দিত। টাকাও সরাত। হিসেব কবে কিছু কবার লোক ললিতকুমার ছিলেন না। অতএব ওসব ছুটকো-ছাটকা ব্যাপার কোনোদিন তাঁব চোখেও পড়েনি। ললিতকুমার যুদ্ধের বাজাবে ছাঁট লোহা ও তামাব কাববাব কবে যে বিপুল অর্থ কামিয়ে ছিলেন তা সিনেমার মাধ্যমে ভোগে না গেলে হারবার্টের জীবনকাহিনী যে অন্যবিধ হত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পাবে না।

হাববার্ট সবকার। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা! ফরসা। চোখা, সাহেবি গড়ন। রোগা। ললিতকুমার নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন ছেলের চেহাবাব সঙ্গে কোথাও একটা লেসলি হাওযার্ড মার্কা হলিউডী চেহারার মিল আছে। সাহেবি নাম হয়ে গেল—হারবার্ট। হাববার্টের মা উত্তব কলকাতাব ছায়া ছায়া বাড়িব প্রায় শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী। ললিতকুমারও কম সুপুরুষ ও কেতাদুরস্ত ছিলেন না। যেভাবেই হোক হারবার্টেব চলাফেবা ও তাকানোর মধ্যে সুন্দর একটা হিবো হিবো ভাব বরাবরই ছিল। তাকে আরও সাহেবি লাগত কারণ বেশির ভাগ সময়েই তার ভয় করত। ভয়ের ফ্যাকাশেটা ফরসা ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিত। বাবা মার কাবণে মোটরগাড়ি ও বিদ্যুতেব ভয় তো ছিলই। পবে এর সঙ্গে ধন্নার মারের ভয় ছিল। জ্যাঠামশাই-এব যখন তখন 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা' চিৎকারেব ভয ছিল। বিনু আবাব নতুন এক ধবনের ভয নিয়ে এসেছিল।

এর মধ্যে অবশ্য বছব চোদ্দ বয়সে হাববার্টেব এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয। পুবনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার তলাব, ঐ শেষ ঘবেই, একদিন দুপুবে সে একটি টিনেব তোবঙ্গ পায। সেই তোরঙ্গের মধ্যে একটি মড়ার মাথা ও কয়েকটা লম্বা হাড় পেয়েছিল হাববার্ট। এ বাড়িব ঝাড়েগুষ্টিতে কেউ কখনও ডাক্তারি পড়েনি। ম্যাজিকও দেখায়নি। আচমকা তোবঙ্গ খুলে ঐ খুলি, চোখের কন্দর ও দাঁত দেখে প্রথমটায় ভয় তো পেয়েইছিল হারবার্ট। পরে বারবাব, যেন নেশার ভবে, এসে তোরঙ্গটা খুলে খুলি আব হাড়গুলো দেখত হারবার্ট। ভাবতে চেষ্টা করত এটা যার খুলি সেই লোকটা কে হতে পারত। যেই হোক, তার জন্যে অসম্ভব কষ্ট পেত হারবার্ট। বছর দুয়েক পরে একদিন হাড়গুলো আর ঐ কঙ্কালের মুণ্ডুটা হাববার্ট একটা থলিতে ভরে ভোরবেলা কেওড়াতলায় আদিগঙ্গাতে ফেলে দিয়ে এসেছিল। ঐ তোরঙ্গটিতে সে তার জিনিসপত্র রাখত। পবে টাকাপয়সাও রাখত।

গঙ্গায় সেই হতভাগ্য অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটির অবশেষ বিসর্জন দেওয়ার পরে হারবার্টের মধ্যে চরম দুর্মদ মৃত্যুচেতনা জেগে ওঠে। তাব মনে হত সে ঐ ফাঁকা দুটি চোখের কোটরের মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছে আর তার চারপাশে নাগবদোলাব মতো তারা বা জোনাকির আলো ঘুরছে।

... এবং এরই পরে সে পূর্বকথিত "অতীব প্রয়োজনীয়" দুটি বই আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়া শুরু করে।

এরপর হারবার্টের কমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে সুইসাইড করে খোড়োরবি। তখন হারবার্টেব বয়স উনিশ। খড়কাটার কল বাড়িতে ছিল বলে নাম ছিল খোড়োরবি। খোড়োরবি ছেলেটা ছিল ভালো। পেছনের পাড়ার জয়া বলে একটা বেঁটে মেয়েকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল খোড়োরবি। জয়ারা রোজ বিকেলে দল বেঁধে পাক মারতে বেরোত, এসে এপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্প করত। জয়াকে দেখলেই খোড়োরবি যে কেমন একটা করত সেটা সবাই জানত। অবশ্য খোড়োরবির সাহস ছিল না। দঙ্গল ছেড়েও বেরোত না। কিন্তু পুজোর অষ্টমীব দিন
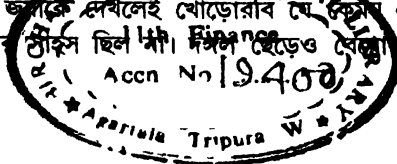
মাথায় যে কী খেয়াল চাপল খোড়োরবিব তা সেই একা জানত। পুজোর বেমক্কা ভিড়ে, ওদেব পাড়াব প্যাণ্ডেলে গিয়ে খোড়োববি, তখন পুঁচকে পুঁচকে ফাউন্টেন পেন বাজারে এসেছিল, সেই একটা কলম আব একটা কাগজ জযাকে ধরিয়ে দিল। কাগজে এঁকাবেঁকা কাগেব ঠ্যাং বগের ঠ্যাং হাতের লেখায়—"জয়া, দেবীব পদতলে ভক্তেব এ ক্ষুদ্র পূজা উপহাব—ইতি ববি।" ওপাড়াব ছেলেরা হাতেনাতে ধরল ববিকে। জযা হুড়মুড় কবে বাড়িতে পালাল। ববি ওদেব হাত ছাড়িয়ে পালাল। জাপটাজাপটিতে ববিব পুজোব জামা ছিঁড়ল। বাতে খোড়োরবিব বাড়িতে জযার কাকা এল। দুই পাড়াতে টেনশন হল। নবমী, দশমী খোড়োরবি বেপাত্তা। ভাসানেব জেব কাটেনি, একাদশীব দিন শেষদুপুবে হৈহৈ কাণ্ড। কবপোবেশনেব ঘেবা পুকুবে আত্মঘাতী খোড়োববিব মড়া ভাসছে।

খোড়োরবিব মৃতদেহ পশ্চিমপাড়ের কাছে, দু-মানুষ জলে ভাসছে আব দুলছে। পাড়ে পাড়ার সব ছেলেবা, হাববার্ট। বোদ্দুব কিছুটা স্বচ্ছ কবেছে, তলায দামেব ঝাঁক দেখা যায়, তারপরে গাঢ় শ্যাওলাব সবুজ হয়ে অন্ধকাব। পাড়েব কাছে একটা সাইকেল দাঁড় করানো। লম্বা বাঁশ বাড়াচ্ছে কেউ। সুইমিং ক্লাবেব দুজন ছেলে সাঁতরে এগোয়। ডাইভিং বোর্ডেব কাছ থেকে বাঁশেব খোঁচা খেয়ে উল্টোনো খোড়োববি ঘোলা জলে আসে। রোদ্দুর দ্রুত পালাচ্ছে। পুলিশ এসে গেছে। সার্জেন্ট এগোতে এগোতে বলে—"লাশ উঠেছে?" কেউ জবাব দেয না। দুই সাঁতারু খোড়োববিব কাছে এসে ছুঁতেই সে যেন ছোট ছোট ঢেউতে ভব কবে সবে যেতে চায়। ওবা দুপাশ থেকে কাঁধেব কাছে জামা খামচে ধরে ফেলে। খোড়োববি আটকা পড়ে যায। ওরা পা দিয়ে জল কেটে কেটে পাড়েব দিকে এগোয আব খোড়োরবিব একমাথা চুল জলে টান টান হয়ে যায। খোড়োববিকে হাববার্টেব শেষ বোদে মনে হয এক ঝাঁক বাধ্য মাছ হয়ে ফিবে আসছে। এই দৃশ্যটি একটি ফটো হতে পাবত। হলেও কবে হলদেটে কোনা খাওযা হয়ে শেষে তুলোটে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ শত শত বছব ধবে চাঁদেব আলোয বা শীতেব ভোবে কুযাশায তার প্রেম নিয়ে খোড়োববি ঐ মবণজলে ভেসে থাকবে। তাকে ঘিবে মৎস্যকন্যারা ওলটপালট কববে যাবা কাঁদলেও তাদেব চোখেব জল কেউ দেখতে পাবে না।

"আমাব নাম হাববার্ট। আমি বাঁট। বাঁট দেখেছো। এবাব লাট দেখবে।"

"মখমোলাযেম ঘাসফুলেল মাঠে হুবিপবীদেব খেলা।"

"ঘুড়ি, এবোপ্লেন, বেলুন, ঝুলঝাড়ু, মানুষ, প্যারাসুট, পাখি—সবই
একসময় নেমে আসে। অথচ তাব আগে ওঠে। ওটাও ওঠে। নেমে আসে।"

"মানুষ যদি ১ হয় তাহলে ০ হল মবা মানুষ। মানুষ + মরা মানুষ = ১+০=
১=খোড়োববি।"

"ফাঁকফোঁকবে জলের হেঁযালি
ঢাকনাপেড়ে শাড়িব খেযালী।"

—হারবার্ট

তিন

"মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।"

—মানকুমারী বসু

বাব্বা। বাব্বা! রোদ পেটে মেখে যে ঘুড়িটা উঠছে তো উঠছেই তার গোঁত্তা খাওয়ার সময় চোখ সরিয়ে নিলে ঐ, ও ..ই তেবোতলা বাড়ির ওপারে সেদিন অব্দি হাওড়া ব্রিজ দেখা যেত. ভিক্টোরিয়ার চূড়া ঐ সাহেবপাড়া সিনেমাপাড়া . নতুনবাজার টেলিফোন অপিস আরও কাছে শীলদের ছাদ, তারপর হাঁড়িফাটা পালদের কেষ্টান বাড়ির পাঞ্জাবি ভাড়াটেদের জামাকাপড় শুকোচ্চে তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস মাখা হালদারদের ছাদ যেখানে বুকি, সুন্দর, বং ময়লা, নরম, ঈষৎ উদ্ধতবুক বুকি আর কখনও বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এমাথা ওমাথা হেঁটে হেঁটে পড়বে না, হাতে খোলা বই, জোরে হাওয়া দিলে ওদের ছাদের টবের গাছগুলো নুয়ে পড়ছে, বুকির চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, বই-এর পাতা উড়ে যাচ্ছে

চিলছাদটাই ছিল হারবার্টের জায়গা। ঐ চিলছাদেই হারবার্ট সবকিছু উপলব্ধি করেছিল। যে আশ্চর্য স্বপ্ন তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি দিয়েছিল অথচ প্রকারান্তরে যা ছিল তার সমূহ বিনাশের কারণ সেই স্বপ্নও হারবার্ট দেখেছিল এই চিলছাদেই। চিলছাদে ছিল গঙ্গাজলের ট্যাংক। আগে হারবার্ট এই ট্যাংকের ভেতরে নেমে মিহি কাদা সাঁতলে সাঁতলে জ্যান্ত সাদা কুচো চিংড়ি ধরত—তিরতির করে ঠ্যাংগুলো ছুঁড়ছে। ট্যাংকের ভেতরের গায় গোল গোল গেঁড়ি লেগে থাকত। পরে জল আসা বন্ধ হয়ে গেল। তলার কাদা শুকিয়ে গেল। পাইপটা ভেঙে গেল। পরে বৃষ্টির জল জমত। তখন ভেতরে একটু হয়তো শ্যাওলার মতো হত বা জলে ফেনা জমে দু-একটা ডিগবাজি খাওয়া জলপোকা বা মশার বাচ্চা জন্মাতো কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গঙ্গাজল আসা বন্ধ হয়ে গেল বলে ট্যাংকটাও মরে গেল। তখন কিন্তু হারবার্টের কাছে মরা ট্যাংকটা অন্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। হারবার্ট তখন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ট্যাংকের তলায় ঢুকে ঠাণ্ডা ছায়ায় গরমকালে ঘুমোত। আচার বা লজেন্স পেলে নিয়ে যেত। লজেন্সটা কয়েকবার চুষে একটা কাগজের ওপর রেখে 'পরলোকের কথা' পড়ত। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখত গোটা তিন বা চার (তার চেয়ে বেশি পিঁপড়ে চিলছাদে উঠত না) পিঁপড়ে লজেন্সটা খাচ্ছে তাহলে টোকা দিয়ে দিয়ে তাদের তাড়াত। আর একরকম ছোট ছোট অনেক পা-ওলা নিরীহ পোকা চিলছাদের ফাটলে থাকত—এদের মতো নির্বিরোধী ও অহিংস পোকা ভূভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। কলকাতায় যেবার আকাশপথে লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল আসে তখন ট্যাংকের গায়ে তাদের ক্রমাগত ঠোক্কর খাওয়ার শব্দ হারবার্টকে বিস্মিত করেছিল। বৃষ্টির শব্দের থেকে একদম আলাদা। শীতকালে কৃষ্ণদাদার দেওয়া সোয়েটার আর জ্যাঠাইমার দেওয়া র‍্যাপার নিয়ে রোদ্দুরম চিলছাদে উঠে যেত হারবার্ট। বিশ্বকর্মার আগে থেকে চলতে থাকে ঘুড়ির মরশুম। সে সময়ে একদিন বিকেলে হারবার্ট ফাঁকা ছাদে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ পেটে সুড়সুড়ি। জেগে দেখে পেটের ওপর দিয়ে কাটা ঘুড়ির হাপতা সুতো চলেছে। শিশুকালে মৃতা মার অনতিদূরে শুয়ে ঢিলি প্যাঁচ দেখেছিল হারবার্ট। সে কথা তার মনে না থাকলেও ঢিলি প্যাঁচের প্রতি তার অদম্য এক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ঢিলি প্যাঁচ খেললে লাটাইতে অনেক সুতো রাখতে হয় কারণ দেদারে সুতো ছাড়তে হয়—ছাড়তে ছাড়তে সাদা সুতো এসে গেলে বিপদ। টেনে প্যাঁচ খেলাতে ভায়োলেন্স বেশি। ঘুড়িও তখন বেহাওয়া না থাকলে ওড়নদারের মনের কথা

কিড়মিড করে বলে। হাববার্টেব হতভম্ব লাগত অসভ্য টানামানি দেখতে—আকাশ পথে ঘুড়ি ছিনতাই-এব ধান্দা, এব মধ্যে যে কবে সে সম্ভবত বলাৎকাবেব আনন্দ পায়। হাববার্টেব সবচেয়ে ভালো লাগত হাই অলটিচুড দিয়ে আপনমনে কোনো কাটা ঘুড়িকে চলে যেতে দেখতে। ঘুড়িটা যদি একটু বেশি নাচানাচি কবে, ওলট-পালট কবে তাহলে বুঝতে হবে প্রায় কলেব তলা দিয়ে কাটা পড়ায় সুতো খুবই কম। আব যদি মন্দ্র গম্ভীব ঢঙে পযসাব মতো ভাবি হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে বিস্তব সুতো তলায় বয়েছে—ঐ ঘুড়ি যে ধববে তাব লাটাই-এরও সুদিন। ধন্না-ব তিন ছেলে বড় ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়াত। ওদেব চিলছাদে ওঠা ছিল বাবণ। চিলছাদে ঘুড়ি পড়লে হাববার্ট জমিয়ে বেখে ওদেব দিয়ে দিত।

ঘযলা, মোমবাতি, পঙ্খীবাজ, চৌবঙ্গি, পেটকাটি, চাপবাস, সতবঞ্চি, মুখপোড়া, পান ও অন্যান্য বেনামা ঘুড়িব নক্সাদাব জেল্লা যতই হোক না কেন গাঢ বঙেব বুলুম হল ঘুড়িব রাজা। মেঘলা আকাশে অনেক ওপব দিয়ে কেটে যাওযা একটা কালো বুলুম দেখে হাববার্টেব প্রায় ভয করেছিল। এত গম্ভীব শেষযাত্রা হাববার্ট আগে বা পবে কখনও দেখেনি। এমনকি তাব নিজেব শেষ যাত্রাযও এতটা গাম্ভীর্য ছিল না।

এই চিলছাদেই হাববার্ট তাব কিশোব জীবনে একদিন নিজেব শবীবেব মধ্যে থেকেই আশ্চর্য আনন্দ ও ইন্দ্রিযসুখেব সন্ধান পেয়েছিল। তখন তাব চোখে কালো রোদ্দুর, চাবপাশে দেড় হাত উঁচু পাঁচিলেব গায উজ্জ্বল সবুজ শ্যাওলাব ঢল। এখান থেকে কত কত বছব ধবে হাববার্ট দেখেছিল বিকেল হলে ওপব দিয়ে বকেবা লাইন দিয়ে ফিবে যায ঘবে। সন্ধ্যাব মুখে চামচিকে ও সন্ধ্যার পবে বাদুড ওড়ে। এবোপ্লেনেব আলো জ্বলে নেভে। চোখেব পলক পড়াব আগে অগণিত তাবাব মধ্যে একটি খসে পড়ে। ফানুস ভেসে যায। হাববার্ট ঘুড়িলণ্ঠনও দেখেছিল—ঠোঙাব মধ্যে কাঠিব ফ্রেম কবে মোমবাতি বসিয়ে ঘুড়িতে বেঁধে ওড়ানো। একবাব ফানুসে টান আসা অব্দি ধবেছিল সে।

ছোটবেলা বাস্তায কমিউনিস্ট পার্টিব অনুষ্ঠানে কৃষ্ণদাদাব সঙ্গে গিয়ে হাববার্ট 'ফল অব বার্লিন', আবও কি সব যুদ্ধেব ডকুমেন্টাবি দেখেছিল। একবাব দেখেছিল ববফেব চাঙড় উল্টে যোদ্ধাদেব অতল জলে তলিয়ে যেতে। হাববার্টকে কেউ বলেনি যে ওটা আইজেনস্টাইনের 'আলেকজান্দাব নেভস্কি'। আব অনেক আগে একবার ইন্দিবা হলে দেখেছিল একটা বাংলা বই যাতে শ্বশুববাড়িব উঠোনে সাবিত্রী চ্যাটার্জি মাথায চটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আব পাড়াব পুজোয অন্যান্য সিনেমাব মধ্যে দেখেছিল 'ফির সুবাহ হোগী'। পবে পযসা কামাবাব পবে ক্যাওড়া পাব্লিকেব অনুরোধে ভাড়া কবা ভিডিও-তে অবশ্য অনেক ছবি দেখেছিল হাববার্ট। কিন্তু তার যা কিছু শেখাব তাব অর্ধেকটা যদি পূর্বকথিত দুটি বই থেকে হয তাহলে বাকিটা ঐ চিলছাদে। চিলছাদ থেকেই হাববার্ট ও বুকি পরস্পব আকৃষ্ট হয়। বোজ বুকি বিকেলে ছাদে আসত। হারবার্ট তো চিলছাদে থাকবেই। এই সময়ে দুজনে দুজনকে নিবিড়ভাবে পেত যদিও মধ্যে দুটো বাড়িব ফাবাক থাকত। বুকি যতক্ষণ না আসত ততক্ষণ বোদে মেলা বুকিব ফ্রকগুলো হারবার্টকে সঙ্গ দিত। বুকি ইস্কুলে যেত-আসত বিক্সায। বুকিবা হালদাব বাড়িতে ভাড়া এসেছিল। বছর দুয়েক ছিল। তাবপর চলে যায। হাববার্টের তখন যোলো—বুকিব বছর এগাবো হবে। চলে যাবাব আগের সরস্বতী পুজোয পাড়াব লাইব্রেরি ঘবেব পাশে ওদের প্রথম কথা হয়। ব্যানার্জিদের গেটেব থামের পাশে প্রায় লুকিয়ে ফিঁসফিস কবে হারবার্ট বলেছিল,—আমি চিঠি দিলে নেবে?

বুকি মাথা নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

—তুমি কোন ক্লাসে পড়?

—সিক্স। তুমি?

—আমি পড়ি, তবে ইস্কুলে পড়ি না

—বাড়িতে মাস্টাব আসে?

হারবার্ট মাথা নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ। যদিও এটা বলতে তাব ভালো লাগেনি। বুকিবা চলে যাবার পবে হারবার্ট কযেক মাস চিলছাদে ওঠেনি। পবে গিয়েছিল ঠিকই। হাববার্ট দেখতে পেত বিকেল ফুরিযে গেলে যখন ছায়া ছাযা হতে থাকে, একটা দুটো করে আলো জ্বলে, উনুনের ধোঁয়া নদীর মতো ভেসে যায, তারও একটু পরে ঐ ছাদটাকে আব ফাঁকা বলে মনে হয় না। হযতো ঐ অস্পষ্ট অবুঝেব মধ্যে বুকি দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে, হাত নাডছে। চোখ কচলে দেখলে ঠিক যেন মনে হয় তাই। চোখটাও তো তখন একটু ঝাপসা থাকে। পবে তো ঐ ছাদটুকুও চলে গেল যখন হালদারবা দোতলা ওঠাল। চিলছাদের পাঁচিলেব গায হাববার্ট ইট দিযে ঘষে 'ব' লিখে রেখেছিল। গভীব কবে। লেখাটাব ওপরে শ্যাওলা হয়ে গেলেও হারবার্ট বুঝতে পারত যে ওব তলায় সেই অক্ষবটা তাকে মাথা নেড়ে নেডে বলছে, হ্যাঁ।

চিলছাদ কোনোদিনও হাববার্টেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবেনি। কিন্তু দুটো ঘটনা ঘটেছিল যার থেকে বিপদ হতে পারত। একবার সন্ধেবেলা তুমুল বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিল হাববার্ট। সে জলের কী তোড়। তার ওপবে ট্যাংকেব ওপবে শিল পড়ার শব্দ। ট্যাংকেব তলায ঢুকে গিয়েছিল হারবার্ট। কযেকটা শিল ধাক্কা খেযে ছিটকে তাব কাছে আসছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মেঘেব গর্জন। বাজ পড়েছিল কযেকটা। হারবার্ট ভেবেছিল সে আব নামতে পাববে না। নামতে পাবছিলও না। এত বৃষ্টি। দিক ভুল হযে যদি বাস্তাব দিকে বা গলিব দিকেব ফাঁকাতে পা বাখে। আব একবাব কালীপুজোর আগে দিনেববেলায কেউ উডন তুবডি টেস্ট কবছিল। তাব তেতে ওঠা খোলটা ফেটেছিল চিলছাদে। হারবার্টের গলায, চিবুকেব সটান তলায, কণ্ঠাব ওপবে একটা সাদা দাগ ছিল।

ধন্‌নাদাদা, ধন্‌নাবৌদি, তাদেব তিনটে বাড়ন্ত ছেলে—এদেব সঙ্গে হাববার্টেব মানসিক দূবত্ব বাড়তেই থাকল। সাহেবপাড়ায় অর্থাৎ আধাঘন্টা হেঁটে ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার থেকে গভীর অভিনিবেশময় ভ্রমণ ও তৎসহ সাহেবি হাবভাব পবের ব্যাপাব। এই ভ্রমণ আশি দশকের মধ্যভাগে শীত থেকে শুরু হয় যখন হাববার্টকে জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইয়ের অলেস্টাবটি দিয়েছিলেন। যদিও এতে কযেকটি জায়গা পোকা খাওয়া ও রোঁয়াওঠা ছিল এবং কোমবেব বেল্ট ছিল না তবু ধন্‌নাদাদা তাব মা অর্থাৎ জ্যাঠাইমাকে শুনিয়ে বলল—বাড়িব সব পুবনো, ভালো ভালো জিনিশ, সব ঐ বসে খাওযাটার পেটে পুরচে। বাপের একটা জিনিশ! বড় ছেলেকে একটিবার জিজ্ঞেস অব্দি কবলে নাকো।

জ্যাঠাইমাও দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। —দ্যাখ ধন্‌না, আধবুড়ো হলি তবু হিঁসকুটেপনা গেল না। হেয্যাহেয্যির জ্ঞান তো খুব দেখছি, কী হয়েছে ওকে একটা গরম কাপড় দিলে? ঐ কি তুই পরতিস।

—দ্যাকো মা, যা বোজো না তাই নিয়ে কাঁই কাঁই মোট্টে করবে না। আমি কি স্বার্থ থেকে বলচি। আমি বলচি অব্যেসের কথা। খেতে পরতে পাচ্চে। তার ওপর এটা ওটা তো আচেই। তার ওপর যদি ওপরঝোঁকা হযে আজ টিয়া, কাল কাকাতুয়া এনে দাও পরে সামলাবে কে? এরপর বাড়ির ভাগ চাইবে, ঘরদালান চাইবে।

—সে ওতো ভালো বলে কখনও বলে না। চাইলে কী দোষেরটা শুনি? ওর বাপের ভাগ কি নেই?

—এই দ্যাকো, মাতাগবম কবে দিলে তো। বাপের ভাগ মারাচ্চে। বলি বিষয়সম্পত্তি সাইজ করাব মতো বুদ্ধি আছে ঐ ঘটে? ভাগ চাইবে। ভাগ চাচ্চে।

—চাইলে কী বলবিটা কী শুনি।

—পেঁদিয়ে তাড়াব, বলব কী? এত বছবেব ভাতকাপড়—হিসেবটা হোক না! খাল খিঁচে দেব না বাঞ্চতেব।

"ইন্দ্রিয়াবাম দেহাত্মবাদীদিগেব মন পবলোক বুঝিতে অক্ষম। পরলোক কেন,—ইহলোকেরও অনেক সূক্ষ্ম বিষয বুঝিতে অক্ষম। ইহাদেব মনে—শবীব, ইন্দ্রিয ও ভোগ্য বিষয় লইযাই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ও ব্যাসক্ত অবস্থায অবস্থান করে; সেই কারণে ইহাদের মনে পবলোক বিষযক প্রমাদজনিত নির্মল সত্যজ্ঞান জন্মে না। মন যে বিষয়ে একাগ্র হয, সে বিষয় তাহাদেব নিকট স্ফূর্তি পায এবং যে বিষয়ে একাগ্র না হয, সে বিষয স্ফূর্তি পায না। মনেব এই স্বভাবশক্তি বা স্বধর্ম, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেবই নিকট পবিচিত বহিয়াছে।"

অলেস্টার পর্বেব পব হাববার্টেব দুই ভাইপো প্রসেনজিৎ (ফুচকা) ও ইন্দ্রজিৎ (বুলান) একতলায খাওযাব জাযগায অতর্কিতে হাববার্টকে আক্রমণ কবে। অজুহাত ছিল হাববার্ট নাকি তাদেব পড়ার সময পুবনো ডাবের খোলা কেটে জ্বালানী বানাবাব অছিলায শব্দ করে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। জ্যাঠাইমা তখন পুজোয বসেছেন। ওপবে আওযাজ যাযনি। ধন্না দোকানে। বৌদিও বাড়িতে ছিল না। বড ছেলে অর্থাৎ প্রিযজিৎ তখন স্নানেব ঘবে। হাববার্টেব আর্তচিৎকার শুনে সে গামছা পবে বেবিযে আসে এবং চেঁচিয়ে ভাইদেব থামতে বলে। হাববার্টের তখন ঠোঁট ফেটে গেছে। বক্ত পড়ছে। চোখেব তলায় ফুলে গেছে। দাঁত ব্যথা কবছে। এই ঘটনাব আব এক সাক্ষী ছিল ধন্নাদাদাব ঝি নির্মলা। হাববার্ট, মাব খাওযাব পবে যখন উঠোনে নেমে মুখ থেকে বক্ত ধুচ্ছে, প্রিয়জিৎ ঘটি থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে, মাথা ঘুবছে হাববার্টেব তখন মনে আছে ওপর থেকে জ্যাঠামশাই-এব গর্জন শোনা যাচ্ছে—"পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা"।

এই ঘটনার ফলে মর্মাহত হাববার্ট কিন্তু স্বর্গেব চাবি পেযে গেল। দর্জির দোকানে দুলাল, বাখালবাবু ওদেব তো বলেছিল উঠোনে পা পিছলে পড়ে এই কাণ্ড। কিন্তু নির্মলা মারফত সাবা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। নির্মলা টিউবওযেল, মুদির দোকান, মিষ্টিব দোকান—সর্বত্রই বলেছিল—কী নিদয়া গো ছেলেগুলো! ভালোমানুষ কাকাটাকে অমন করে মারতে পাবল। ধন্নাকে অব্দি গাঙ্গুলী বাড়িব বড় ভাই, বড়িলাল একদিন অনেকেব সামনেই বলে বসল, —ধনা। বাড়িতে এসব কী হচ্ছে শুনচি! এপাড়ায তো বাবা এমন ঘটনা শুনিনি। ভাইপোরা শেষে কাকাকে ধবে পেটাচ্ছে!

পাড়ার যুবক ও হাববার্টেব জুনিযাব যে গ্যাংটি একদিন তাকে দেখলেই "বাঁটপাখি! বাঁটপাখি"! বলে ক্ষেপাত তাবাও আর না ক্ষেপিয়ে ও কাছে ঘেঁষে এসে তাদেব সমবেদনা জানাল। এবং এরা হারবার্টের কাছে এসেছিল বলে দুই ভাইপো বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

এভাবে হারবার্ট যেমন অনেকের কাছে আপন হয়ে উঠল তা ছাড়াও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণ অবশ্যই বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। সামনে পেছনে ঘুষি খেয়ে হারবার্টের অপরিণত ব্রেন বোধ হয নড়ে গিয়ে থাকবে কারণ তা না হলে পনেরো বছর আগের ঘটনা আশ্চর্য এক স্বপ্নের মধ্যে দিযে ফিরে আসবে কী করে? লৌকিকের এই হস্তক্ষেপের ফলে হাববার্টের জীবনচরিত নতুন একদিকে মোড় নিল এবং কাকতালীয হলেও যা অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় যে ১৯৭১-এ পুলিশের গুলিতে নিহত নকশালপন্থী ভাইপো বিনুর বাবা, হাববার্টের কৃষ্ণদাদা তখনই কলকাতায় কাজে এসেছিলেন এবং ঐ বাড়িতেই ছিলেন।

"আমি বললাম—দেখ দীননাথ, কল্যকার ব্যাপারটাই মনে মনে আলোচনা করেছ কিনা—তাই বোধহয় স্বপ্নজ্ঞানে এরকম বিভীষিকা দেখেছ। এখন সকলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাবার চেষ্টা কর।

"গর্জন করিয়া দীননাথ বলিয়া উঠিল—কী বলছেন মশাই? আমার কথা আপনি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন? আমি মিথ্যা বলিনি, আমি স্বপ্ন দেখিনি—চোখের ওপর যা যা দেখেছি, তাই আপনাকে বললুম: আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওঁদের সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, সকলে তো আর এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখিনি।"

এই অংশটি 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' ও আগেরটি 'পরলোক রহস্য' থেকে। হায়, সেই বুকি আজ কোথায়? সেই চিলছাদে শোভা পাচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা। হারবার্ট নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। হিপোড্রোম সার্কাস নেই। সিমলা স্ট্রিটে প্রসিদ্ধ গোঁসাই বাড়ির পাশে দীনুর হোটেল নেই। "শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর চক্ষুদ্বয় প্রায় সর্বক্ষণ মুদিত থাকিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে আঁজুবাবু বলিত।" তিনিওনেই।

বাব্বা! বাব্বা!

চার

"ঐই শুন! ঐই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ"
—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনু কলকাতায়, আশুতোষ কলেজে জিওলজি অনার্স নিয়ে পড়তে এসেছিল। বিনু আরও, অনেক আগে ছোটবেলায় একটা ছড়া শিখিয়েছিল হারবার্টকে—পুলিশের লাঠি, ঝাঁটার কাঠি/ভয় করে না, কমিনিস্ট পার্টি। বিনু এসে রাস্তার ধারের ঘরটায় উঠল। কৃষ্ণলাল নিজে এসেছিলেন। বিনুর জন্যে ছোট একটা তক্তপোষ এল। তোষক এল। জ্যাঠাইমা দোতলার বারান্দার ছাদ থেকে ঝোলা বিছানার বাণ্ডিল খুলে বিনুকে বালিশ দিলেন। দেওয়ালে খোঁদল করা বাঁধানো তাকে উইনচেল-হোমস ইত্যাদি সাহেবদের বই শোভা পেতে লাগল। বিনু সিরিয়াস। দোহারা গড়ন। মিষ্টি করে কথা বলে। বিনু একদিন সকাল নটা নাগাদ খাটে উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে মন দিয়ে কী লিখছিল। দরজাটা একটু ফাঁক করে হারবার্ট ভেতরে তাকিয়েছিল। একগাল হেসে বিনু বলেছিল, ও কী হারবার্টকাকা। ভেতরে এসো। কী দেখছ দাঁড়িয়ে?

হারবার্টের সঙ্গে বিনুর বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। বিনুর বন্ধুদেরও বেশ লাগত হারবার্টের। হারবার্টকে ওরা সিগারেট খাওয়াত। গল্প করত। আবার এক এক সময় ঐ বিনুই বলত, হারবার্টকাকা, এবার তোমাকে একটু . হারবার্ট বুঝত যে বিনু ওকে এখনকার মতো চলে যেতে বলছে। কিন্তু সেটা খারাপভাবে নয়। বিনু তাকে একটা ফুলপ্যান্ট কিনে দিয়েছিল। সঙ্গে একটা বেল্ট।

—ওফ্, হারবার্টকাকা, তোমায় না ঠিক অ্যামেরিকান ফিল্মস্টারদের মতো লাগচে।

ধন্না হারবার্টের প্যান্ট দেখে চমকে গিয়েছিল। পরে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল শুনে যে টিউশনির টাকা থেকে বিনু এটা হারবার্টকে কিনে দিয়েছে।

জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, দেখেচিস তো। দেখে শেখ্। আকুটেপনা করে তো জীবন কাটালি।
ধন্না বলেছিল, ফ্যাচ্ফ্যাচ করোনা তো। ওপরপড়া আদিখ্যেতা থেকে শিখবটা কী শুনি?
তবে হ্যাঁ, আমারগুলো যদি বিনুটাকে দেখে বোজে—না কবল লেখাপড়া, না হল ভব্যসভ্য।

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, পিউ কাঁহা। পিউ কাঁহা।

বিনু পরলোকে আগ্রহী হারবার্টকে মৃত্যুর একটা অন্য মানে বুঝিয়েছিল।
—ও কি সব আগডুম বাগডুম পড় বলো তো। ওসব ধাপ্পা। রিডিকিউলাস। এ মরল, ভূত হয়ে এল, ও মরল ভূত হয়ে গেল—এই যে পাতায় পাতায় ভূত কিলবিল করছে, বলো, নিজে কখনও দেখেছ? লোক তো আর মরেনি এমন নয়? এ বাড়িতেই ক'জন মরেছে কে জানে?
—আমি দেকিনি বলেই সবটা মিথ্যে হয়ে যাবে?
—শুধু তুমি দেখনি না, কেউ দেখেনি।
—তাহলে প্ল্যানচেটে যেটা হয়?
—কী হয়? বহরমপুরে নিজে আমি দেখেছি।
—দেখেচিস? এল?
—আসবে না কেন? নিজেরাই তো হয় অক্ষরের কাছে গেলাশ টেনে আনছে নয় তো পেন্সিল কাঁপাচ্ছে। অবশ্য তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যতদিন হাতে গোনা কয়েকটা লোক লাখ লাখ মানুষকে বোকা বানিয়ে খাটিয়ে মারবে, তাদের ঠকাবে, ততদিন ভূত, তারপর তোমার গিয়ে ঠাকুর-দেবতা ধর্ম—এই সবই চলবে। শোনো, একটা লেখা শোনো, (বিনু একটা ছোট বই খোলে, পাতা ওল্টায়)
—আমাদের সামনে হাজার হাজার শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের কথা মনে পড়লেই আমাদের প্রতিটি জীবিত লোকের হৃদয় বেদনায় ভরে ওঠে, এমন কী স্বার্থ আছে যা আমরা ত্যাগ করতে পারব না অথবা এমন কী ভুল আছে যা আমরা শুধরে নিতে পারব না?—কথাটা কার লেখা বলতে পারবে?
হারবার্ট মাথা নাড়ে। এসবের কিছুই সে জানে না।
—মাও-সে-তুং।
১৯৭০-এর ১৯ নভেম্বর বারাসতের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটে। যতীন দাস, কানাই ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সমীর মিত্র, স্বপন পাল, সমীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তরুণ দাস ও গণেশ ঘটককে গভীর রাতে পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) -র সাধারণ সম্পাদক চারু মজুমদার তাঁর ২২ নভেম্বর, ১৯৭০-এর ইস্তেহারে আহ্বান জানালেন,
—আজ প্রত্যেকটি ভারতবাসীর পবিত্রতম কর্তব্য এইসব কাপুরুষ বিদেশীদের আজ্ঞাবহ খুনেদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা। এটা আজ দেশবাসীর দাবী, দেশপ্রেমিকের দাবী। প্রত্যেক বিপ্লবী কর্মীকে এই বীর শহীদদের হত্যার বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এই জল্লাদরা ভারতবাসীর শত্রু, প্রগতির শত্রু এবং বিদেশীর অনুচর। এদের শেষ না করলে ভারতবর্ষের মুক্তি নেই।
বিনু এই ডাকে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো কোনো রাতে ফিরত না। ধন্নাদাদার পাড়াটা কিন্তু পাঁড় কংগ্রেসী। বামপন্থার ছিটেফোঁটা থাকলেও বোঝা যেত না। বড়িলাল ছিল ইনফর্মার। হারবার্টকে একদিন বেশ কিছু টাকা আর মাও-সে-তুং-লিন পিয়াও-এর ছবি ছাপা

রসিদ বই দিয়ে বিনু পাঠাল লেক মার্কেট এলাকায় কোনো এক বিজয়-কে পৌঁছে দেবার জন্যে। বিজয় তাকে নিয়ে গেল কালীঘাটের গ্রীক চার্চের পেছনে। সেখানে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গাল ভাঙা চশমা পরা একজন লোক আবছা অন্ধকারে হাববার্টকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—"অভিনন্দন কমবেড। বিনয় আপনাব কথা অনেক বলেছে। আপনাব মতো বিশ্বস্ত বন্ধুব আমাদেব দবকার। চা খান।"

ফেরাব বাস্তায় মনোহবপুকুর মোড়টা ওকে পার কবে দিয়েছিল দুটি ছেলে। কোথাও বোমা পড়েছিল। হারবার্ট আব খবব পায়নি যে ঐ বিজয় পবে ববানগবে আত্মগোপনে থাকাকালীন ১৯৭১ সালের ৯ মে সকালে বাজাবেব খাবাবেব দোকানেব সামনে পুলিশেব গুলিতে মাবা যায়।

বিনু একটানা অনেকদিন বাড়িতে ছিল না। ধন্নাদাদা কৃষ্ণলালকে চিঠি দিল। কৃষ্ণলাল জবাবে লিখলেন।

—বিনু এখন যুবক। সে বোঝে কী কবছে। আব, এটা তো আব সে নিজে বোঝে নি, অনেকের সঙ্গেই সে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব, আমাব তবফ থেকে তাকে নিবৃত্ত করাব কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উপবন্তু বিনুব মাও এ বিষয়ে আমাব সঙ্গে সহমত পোষণ কবেন। তবে, তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে জানলাম। অন্য ব্যবস্থা কবছি। কিন্তু তাব জন্য তোমাকে আমাব কলকাতা যাওয়া অবধি অপেক্ষা কবতে হবে। বাবা ও মা আশা কবি ভাল আছেন। হাববার্ট ও তোমার পুত্রদের আমাব

অবশ্য কৃষ্ণলালেব কলকাতায় এসে অন্য ব্যবস্থা কবাব দবকাব হযনি। বাত্তিবে, এলগিন বোডের জাহাজবাড়ির কাছে একটা দেওয়ালে স্টেনসিল থেকে মাও-সে-তুং-এব মুখ আঁকছিল তিনটি ছেলে। উল্টোদিকেব ফুটে মুখ ঢেকে যাবা শুযেছিল তাদেব মধ্যে একজন চাদব সবিয়ে গুলি চালায়। একটি ছেলে দুজনেব কাঁধেব ওপব পা বেখে স্টেনসিলেব ওপবে কালি বোলাচ্ছিল। সে পড়ে যায়। অন্যরা তাকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা কবে। তখন অনেক পাযেব শব্দ ছুটে আসছে। হুইসল বাজছে। আহত ছেলেটিব কথাতেই তাকে বেখে তখন দুজনে পালায। আহত ছেলেটি উল্টে বুকেব উপর ভর করে কনুই দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে হাত পাঁচ বা ছযেক যেতে পেরেছিল। ফুটপাথে রক্তের ঘষটানো দাগ হয়েছিল। তাবপর সে জ্ঞান হারায়।

এস. আই. সন্তোষ দেখল প্রাইজক্যাচ। বিনযকে পাযের ওপব দাঁড করালে অনেক কিছু জানা যাবে। পিজির কেবিন। ডাক্তার।

—লাংফিল্ড পাঙচাব হয়ে গেছে। কিছু করার নেই। এনি টাইম। জানলে বাড়িতে খবর দিন। বাড়িতে খবর এসেছিল। ধন্না কৃষ্ণলালকে তার কবে। হাববার্ট দুবেলা হাসপাতালে পড়ে থাকত। শরীরের বেশির ভাগ বক্ত রাস্তায় ও ভ্যানের মেঝেতে ঢেলে দেওয়ার পরেও অদম্য এক প্রাণশক্তি বিনুকে দুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। কৃষ্ণলাল এসেছিলেন। ওদিকে বাড়িতে, বিশেষত বিনুব ঘরে সব ওলটপালট কবে, তোষকের তলায় বা কোথাও পুলিশ কিছু পায়নি। এর অনেক আগেই বিনুর কথামতো চিলছাদে হারবার্ট অনেক কিছু পুড়িয়েছে। দেশব্রতী, দক্ষিণ দেশ, চট্টগ্রামে ছাপানো একটি গেবিলা যুদ্ধের বাংলা ম্যানুয়াল, কিউবার ট্রাইকন্টিনেন্টাল পত্রিকা থেকে সংগৃহীত মলোটভ ককটেলের নকশা, রেডবুক, কিছু চিঠি। একটু একটু করে পুড়িয়েছে যাতে ধোঁয়া কম হয়। কেউ বুঝতেও পারেনি।

কৃষ্ণলালকে তার বন্ধু অধ্যাপক প্রফুল্লকান্তি বাইরে চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হারবার্টকে বন্দুকধারী দুই গার্ড দয়াপরবশ হয়ে বলেছিল— ভেতরে যান, ভুল বকচে। বাপটা

আবাব কোথায় গেল?

হাববার্ট বিনুব কাছে গিয়েছিল। বুক অবধি কম্বলে ঢাকা। উল্টোনো বোতলের থেকে ববাবেব নল হাতে। একটা জিনিস হাববার্ট দেখতে পাযনি। পায়েব দিক থেকে কম্বলেব তলা দিয়ে একটা শেকল বেবিয়েছে। সেটা লোহাব খাটেব সঙ্গে দুপাক জড়িয়ে তালা আটকানো। গলায় ট্র্যাকশন লাগানো একটা ছেলে পালাবার পবে এই ফুলপ্রুফ ব্যবস্থা কবা হয়।

বিনুব চোখদুটো বন্ধ কিন্তু ঠোঁটদুটো নড়ছিল আব যেটাকে দুজন পুলিশ প্রলাপ বলে ভুল কবেছিল সেটা ছিল বাবাসাতেব শহীদ সমীব মিত্র-ব লেখা কবিতা, অনেক চেষ্টা করে, মনে কবে শব্দগুলো বলা, ঠিক কবিতা বলাব মতো নয়,

—আমি দেখতে পাচ্ছি,
আমাব চোখেব সামনে, আমাব এতকালের দেখা
পুবনো দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে,

(বিনু পবপব কয়েকবাব 'পাল্টে যাচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে' বলে চলে, পরেব কথাগুলো মনে আসে পবে, কাশির মতো হয, ঠোঁটেব কোনা দিযে বক্ত মেশা ফেনা ফেনা থুথু চলে আসে, হাববার্ট মাথাব কাছে বাখা বক্ত মাখানো তোয়ালেতে মুছিয়ে দিতে যাবে, নার্স এসে যায়। নার্স মুছিযে দেয, দিয়ে দৌড়ে বেবিযে যায।)

ভেঙেচুবে, তছনছ হয়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো
হয়ে ঝবে পড়ছে
পুবনো দিনগুলো।
ঝড় আসছে একটা

(কযেকবাব 'আসছে, আসছে' বলে। চোখদুটো বড় করে তাকায। মুখেব ওপবে হারবার্ট ঝুঁকে। তার চোখে জল। বিনুব চোখ এদিক ওদিক তাকায়। সে আসলে কাউকে খোঁজেনি। দেখছিল পুলিশরা তাব শেষ কথা শোনার চেষ্টা কবছে কি না।)

—কিছু বলবি, বিনু?

—হাববার্টকাকা, পুজোর ঘরে, ডায়বি...হারবার্ট...কাকা....ডায়রি. কালীর ফটোর পেছনে. .ডায়বি... বিনু তাকিয়ে থাকে। একটু ওপব দিকে। এভাবে মানুষ সবসময় তাকায় না। কিছু দেখাব জন্যে না হলেও তাকিয়ে থাকা।

ডাক্তার এসে ঢোকে। হারবার্টকে বলে সরে যেতে। পুলিশরা ঢোকে। নার্স। এক্সপায়ারড্।

এরপর পুলিশ-ফৈজৎ কাঁটাপুকুর ঘুবে ক্যাওড়াতলা। বিনুর দেহ বিদ্যুৎ-চুল্লিতে ঢুকে যায়। শ্মশান ঘিবে অত বাতেও পুলিশেব কড়া পাহারা। কৃষ্ণদাদা কি বিড়বিড় করছিলেন এক দৃষ্টিতে চুল্লির দিকে তাকিয়ে। চুল্লির দবজাব ওপবে লেখা 'পুলিশের কুত্তা দেবী রায় হুঁশিয়ার—সি.পি. আই. (এম. এল.)'। জনৈক বুদ্ধিজীবী পুলিশ অফিসার অধস্তন একটিকে বলেন—'ঐ দেখুন, নকশালের বাবা, ছেলে পুড়ছে বলে মন্তর পড়ছে।' কথাটা শুনে হাববার্ট কৃষ্ণদাদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কৃষ্ণদাদা আবৃত্তি করছেন,

ওরা বীর ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে,
গুলি, বন্দুক, বোমাব আগুনে
আজও বোমাঞ্চকর।

বিনু পুড়ছিল তখন।

এই ঘটনার পরে পচা, বদ্ধ, অকিঞ্চিৎকব যে কালপর্ব চলেছে তা এতই ক্লান্তিকর যে এব তুলনা অন্তত ইতিহাসে মেলা ভাব। এবং হাববার্ট কলকাতা শহরেব যে খণ্ডেব বাসিন্দা সেখানে যুগযুগান্তেও কিছু পাল্টায কিনা সন্দেহ। বনেদী বাড়িগুলোব মধ্যে চিলচিৎকাবেব মধ্যে দিয়ে যে ভাগাভাগি হযেছে তার ফলে অভাবনীয সব জাযগাতে দেওযাল ও দবজা এসেছে। অবশ্য কিছুটা মুখ পাল্টানোর স্বাদ এনেছে পুরনো বাড়িব জাযগায় তৈরি প্রোমোটারদের মাল্টিস্টোরিড। ভিডিও-ব দোকান হয়েছে। জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান দুই ভাই প্রথম বিপ্লবী পদক্ষেপ নিযে দোকানটি খোলে। মোড়ে বোলের দোকানও হযেছে। বড় বাস্তায আগে বড বড় গাছের ছায়া ছিল। তাব তলা দিয়ে ছায়াস্নিগ্ধ দোতলা বাস যেত। এখন গাছ নেই। উন্মত্ত যানবাহন। পাড়ায ঠেলাওলাদের আড্ডাটা উঠে গেছে। হারবার্টেব মনে পড়ে একবাব মাঝরাত্তিবে ভূমিকম্প হযেছিল। দোতলার বাবান্দাব ঝোলানো বিছানার বান্ডিল পেন্ডুলামের মতো দুলছিল। বাস্তায় ভীত এক বৃদ্ধ ঠেলাওলা তাব ঘুমন্ত স্বদেশীদের—"ভুঁইডোলারে ভুঁইডোলা!" বলে সতর্ক কবছিল। অথচ, পরদিন সকালে ডেকাডেন্ট রাস্তায সেই গত বাতের মাতাল ও গতকালেব বেসুড়েদেব ফোলা ফোলা চোখ নিযে বাজাব কবতে যাওয়া, সেলুনের মেঝেতে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল, বিক্সাব শব্দ—সব দেখলে শুনলে কাব বাপেব সাধ্যি বলে যে এই শহরে গতরাতে একটা ছোট মাপেব হলেও ভূমিকম্প হয়ে গেছে। অবশ্য কযেকবাব ভোট হয়েছিল। হাববার্টের তাতে কিছু যায় আসে না। সে কখনও ভোট দেয়নি। প্রত্যেকবাব ভোটের দিন ও যখন কোথাও না যেযে চিলছাদে বসে থেকেছে। সেটা ওব কাছে বিনুব প্রতি ট্রিবিউট বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বিনুব বেশি কথা তার মনে পড়ত না।

অলেস্টারেব ঘটনায় ভাইপোদের হাতে কদর্যভাবে মার খাওয়াব পরে একদিন দুপুববেলা চিলছাদে আরাম করে ঘুমোচ্ছিল হারবার্ট। কৃষ্ণদাদা এসেছিলেন সে সময়। বিনুর মৃত্যুব পব ধন্নাকে তাঁব নিজের অংশ লিখে দেওয়ার পরে সেই যে ফিবে গিয়েছিলেন তিনি, তাবপব এই প্রথম আসা। বিনুর মৃত্যুর বছর পাঁচেক পরে বিনুর মা মারা যান। প্রায তেরো চোদ্দ বছর পরে আসা। আগের মতো এবারেও হারবার্টকে নিয়ে হকার্স কর্নার থেকে দুটো ধুতি আর দুটো ফুলশার্ট কিনে দিয়েছিলেন।

নতুন ধুতি আর শার্ট পরে ঘুমোচ্ছিল হারবার্ট। আকাশে সাদা পালক মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের ছটা বেরিয়েছিল। আধভিজে নিশ্বাসের মতো হাওয়া দিচ্ছিল। হারবার্ট স্বপ্নটা দেখেছিল।

"কেন গো নরের বেশে এ খেলা তোমার?
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার!"
—নগেন্দ্রবালা মুস্তোফি

বিরাট, কতদূর ছড়ানো একটা কাচের পর্দা। তার এপারে একটা এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তা যেটা কাচের পর্দার পাশ দিয়ে সমান্তবাল ভাবে চলেছে। ওপারে একটা সোনালী পাহাড়ের তলার দিকে বিরাট গুহা দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সরু পাথর ওপর থেকে ঝুলছে, বরফেব ঝালরের মতো, আবার নিচের থেকেও ওরকম উঠে গেছে—বিনুর আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পায় হারবার্ট—

ওপর থেকে যেগুলো ঝুলছে সেগুলো স্ট্যালাকটাইট, তলা থেকে যেগুলো উঠেছে সেটা স্ট্যালাগমাইট—ঠিকই তো, বই থেকে বিনু তো দেখিয়েছিল। তারপর পাহাড় ফুরিয়ে গেল। আবার চলছে, আবার চলছে। কখনো কাচের ওপারে জল। কখনো আকাশ। আলো কমছে। ফিরতে হবে অতটা পথ। কোথায় ফিরতে হবে। এই ভয়টা আসার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কাকের একটা মেঘ ওপারে কাচের কাছে ছুটে আসে। কাচে ঠোকরায়। ডানা ঝাপটায়। অথচ কোনো শব্দ নেই। কাকের রক্ত, কাকের গু ছেবড়ে ছেবড়ে কাচটাকে নোংরা করে দিচ্ছে। সেই অসংখ্য কাকের ফাঁকে বিনুকে দেখতে পায় হারবার্ট। ৮০ দশকের মধ্যভাগ। বিনুর মৃত্যুর পর এই প্রথম বিনু। বিনু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বিনু কিছু বলছে। কাকের ঢেউ এসে বার বার বিনুকে আড়াল করে। কাচের তলায়, ওপারে, মরা কাক জমছে। বিনু একটু এগিয়ে আসে। বিনু হাসছে। হারবার্টও হাসে। হাত নাড়ে। কথাগুলো, বিনুর কথাগুলো কাচের এপারে ইকো হচ্ছে অনেক দূরের ভেসে আসা মাইকের গানের সঙ্গে—

—হারবার্টকাকা, পুজোর ঘরে, ডায়রি   হারবার্ট   কাকা ডায়রি কালীর ফটোর পেছনে . ডায়রি

কাচের কাছে এসেছে বিনু। বিনু তাকিয়ে আছে। একটু ওপর দিকে। এভাবে মানুষ সবসময় তাকায় না। কিছু দেখার জন্যে না হলেও তাকিয়ে থাকা।

হারবার্ট ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। মুখের গড়ানো লালা শার্টের আস্তিনে মুছেছিল। ঘুমচোখে দেখেছিল আকাশে রামধনু। রামধনুর ওপরে কারা যেন হাঁটছে। বুকের মধ্যে রেলগাড়ি চলার মতো শব্দ। শহরের অপ্রয়োজনীয় শব্দ। হারবার্ট নেমে এসেছিল। ঠাকুরঘরে ঢোকেনি। সোজা দোতলার বারান্দায়। জ্যাঠাইমা মাদুরে বসে। কৃষ্ণদাদা, ধন্নাদাদা, ধন্নাবৌদি চা খাচ্ছিল। ধন্না কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হারবার্ট চিৎকার করে উঠল—

—জ্যাঠাইমা। স্বপ্ন পেয়েচি। স্বপ্নে বিনু এসেছিল। বলল .

(আবার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে, আবছা আবছা, ধন্দ)

কৃষ্ণদাদা স্মিত হাসেন,—বিনুকে স্বপ্ন দেখলি?

এবার পর পর মনে পড়ে।

—দেখব কী। এত কাক যে দেখাই দুষ্কর। বিনু, বিনু, বলল—চলো—দেখবে চলো জ্যাঠাইমা

..দাদা বলে,—যা বলল মাথা ঠাণ্ডা করে বল। গুলিয়ে না যায়। স্বপ্ন তো'

—বলল, জ্যাঠাইমার—ঠাকুর ঘরে, কালী ঠাকুরের যে ফটোটা আছে (হারবার্ট মাথায় হাত ঠেকায়) তার পেছনে বিনুর ডায়রি অছে।

জ্যাঠাইমা উঠতে চেষ্টা করেন—ধর, আমায় ধরে ওঠা। মা, মাগো'

হারবার্টের স্পষ্ট মনে ছিল আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জ্যাঠাইমা, তার পরে হারবার্ট, ধন্নাদাদা-বৌদি, শেষে কৃষ্ণলাল প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। শেকল খুলে ঠাকুরঘর খোলা হল। ঠাকুরঘরের টিমটিমে আলো জ্বালানো হল। মা কালীর ফটোটি দেওয়ালের মাঝামাঝি ঝোলানো। জ্যাঠাইমা ঠাকুর প্রণাম করে ফটোর তলার দিকটা সামনে টানতে একটা টিকটিকি দৌড়ে দেওয়ালের ওপর দিকে গেল। ভাবি ফটো। জ্যাঠাইমা বললেন—ধন্না, টান ত। অত ভাবি ঠাকুর, আমি কি পারি?

ফ্রেম বাঁধানো বড় ছবি কালীর। তলাটা সামনে টানতে কিছু হল না।

—কিছু থাকলে তো বেরোত।

জ্যাঠাইমা বললেন—ধরাধরি করে ঠাকুরটা নামা না, নামিয়ে উল্টো দিকে দ্যাখ্।

ফ্রেমটা উল্টে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাবার সময়েই সকলে দেখতে পেয়েছিল। ফ্রেমের কাঠের ওপরে রেখে কাঁটাপেরেক ঘুরিয়ে আটকানো মাকড়সার জাল ও ধুলো মাখা ছোট একটা ডায়রি। নীচ থেকে ফোকলা চিৎকার শোনা গেল,—"পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!"

—ওঃ সে কত কাগরে বাবা। কাচের এমুড়ো ওমুড়ো ঠুকরোচ্চে আর ডানা ঝটকাচ্চে। তার মধ্যে আবার গান হচ্চে। বিনু ঠায় হাসছে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্চি না। তারপর কানে এল, ফাঁকায় কতা বলার মতো। পষ্ট শুনলাম ... বলেই সেবারের মতো মবে গেল ..

হারবার্ট হদিশ পাচ্ছে। এবার তাকে দাপাতে হবে। বিনুর সময় এসছিল। এবার তার সময়। সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে হবে। নকড়াছকড়া করে ফাঁৎরাফাঁই করে বিশ্ব সংসারে একটা তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে হবে।

"পুরাকালে এ দেশে অনেক ভূতবিদ্যাবিৎ ঋষি ছিলেন। শুনিতে পাই, বিদ্যমানকালেও, অন্য ভূখণ্ডেও অনেক ভূতবিদ্যাবিশারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত ঋষিদিগের মতবৈষম্য দেখা যায়। ঋষিদিগের মতে যাবৎ প্রেত-অবস্থা, তাবৎ তাহাদিগকে আহ্বান বা আকর্ষণ করা যায় এবং দেব গন্ধর্বাদি দেবযোনি-প্রাপ্তদিগকেও আকর্ষণ বা আহ্বান করা যায়। ...শুনিতে পাই, বর্তমান কালের ভূতবিদ্যাবিশারদেরা মৃতমাত্রকেই আহ্বান করিতে পাবেন বা করেন; এমন কি, বুদ্ধদেবের আত্মাকেও নাকি কোনো পণ্ডিত আহ্বান কবিয়াছিলেন।"

(পবলোক রহস্য)

"কম্পিত হৃদয়ে স্পন্দিত বক্ষে গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম, সবে মাত্র শয্যাত্যাগ করিযাছি—এমন সময় কক্ষতলে আমার দৃষ্টি পতিত হইল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—পাঁচ সাতটা সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড কক্ষতলে গড়াইয়া বেড়াইতেছে! সে মুণ্ডের বিকট দশন পাটি—ভীষণ ভ্রূকুটি-ভ্রূভঙ্গ—লক্ লক্ রসনা আমার হৃদয়ে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিল—আমি পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম—পদমাত্র অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না। পরক্ষণে আবার গগনভেদী চিৎকার।"

(সার্কাসে ভূতের উপদ্রব)

পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

কৃষ্ণলাল ফিরে যাওয়ার পরে হারবার্ট জ্যাঠাইমাকে জানিয়ে দিল যে, নীচের ঘরে সে ব্যবসা শুরু করবে।

পাঁচ

"তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ধন্না মারফতই অলৌকিকভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে বিনুর ডায়রি পাওয়ার ঘটনাটি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। করপোরেশন পার্কেব ধারে রবিবার সন্ধেবেলার আড্ডায় ধন্না কথাটা বলতে বড়িলাল, ক্ষেত্র, গোবী, উঞ্ঝে, হরতাল ইত্যাদি পাড়ার সিনিয়াররা তাজ্জব হয়ে গেল।

গোবী পাঁড়মাতাল। সে লাল চোখে জলের দিকে তাকিয়ে ভাবুকভাবে বলল,—আসলে কী

জানিস। সবই মায়ের খেলা। কাকে যে কখন কোথায় মাথায় একটু টুক্ করে ছুঁয়ে দেবে তা কে বলতে পারে! হারবার্ট এ করতে পারে কেউ ভেবেছিল কখনও?

—অনেকে বলে তাবাপীঠে এক কী যেন বাবাব সমাধি আছে। সেখানে এক বোতল মাল ঢাললে নাকি দেব্যদিষ্টি পাওয়া যায়।

—অতদূরের কী দবকাব। যা না, ঐ ঘুটিযাবি শনিফ ঘুবে আয়না। দেখবি কত বকমেব কাণ্ড।

বড়িলাল বলেছিল—হারবার্টের কাছে যাব তো একবাব। নিজের কানে শুনতে হবে গোটাটা।

আসলে বড়িলাল অন্য কারণে যাবে ভেবেছিল। তাব ভাই গামা গত বছব লিভাব পচে মবেছে চোলাই খেযে খেযে। মরেছে, মরেছে, তাবপব থেকে বাড়িতে আজ এব জ্বব, কাল ওব পেটখাবাপ, পবীক্ষায় ফেল লেগেই আছে। হাববার্ট কি কোনো হদিশ দিতে পাববে?

হাববার্টেব ঘরে তখন পাড়াব অন্য ছেলেবাও ছিল। হাববার্ট মনে অন্য জোব পেযে গেছে তখন। একদৃষ্টে সে কিছুক্ষণ বড়িলালেব চোখের দিকে তাকিযে থাকল। তারপব বলল—একবছব হল, না?

—ঠিক ঠিক ধবলে এগাবো মাস। শ্রাদ্ধশান্তি তো সবই কবেচি। বাৎসরিকও হবে।

—সে সব তো কবলে বুঝলাম, কিন্তু জল না পেয়ে যে মবাপানা হয়ে যাচ্চে গো

—কে?

—কে আবার? চাঁপাগাছ গো, চাঁপাগাছ।

বড়িলাল বেজায় ঘাবড়ে যায়। ছাদের বাগান ছিল গামাব একমাত্র শখ। সেখানে কাঠেব বাক্সে চাঁপাগাছ লাগিয়েছিল গামা। সত্যিই তো।

হাববার্টও ছাদ থেকে দেখত গামা সাবা বিকেল গাছেব যত্ন কবছে, মাটি খুঁচোচ্ছে, জল দিচ্ছে।

এটাও হাববার্ট দেখেছিল যে ডাগরডোগর চাঁপাগাছটা হাড়কাঁটা হযে যাচ্ছে। বড়িলাল তড়িঘড়ি উঠে বওনা দেয়। এবাবে মোক্ষম খেলাটা খেলে দেয় হারবার্ট।

—যদি দেখ গাছটা মবে গেছে তাহলে ওটাকে তুলে ফেলে ভালো একটা ডাল সামনের বর্ষায় পুঁতে দিও। আব বেঁচে থাকলে কতাই নেই। দিনকযেক গোড়া ভিজোলেই জানান দেবে।

বড়িলালের পা কাঁপছে। হাববার্ট থামে না, থামলে এখন চলবে না, থামা যায় না।

—আসলে কী জানো? টান! টান! মবে গেলাম। পুড়িয়ে দিল। কিন্তু যেখানে টাক সেখানে তো মন সারাক্ষণ পড়ে থাকবে। যাবে কোথায়। সবই অন্তরালের খেলা। অন্তবালের লীলা! কতরকমের যে বন্দোবস্ত। পরে একদিন বলবোখন বড়িদা। এখন যা বললাম কবো দিকিনি।

বড়িলালের সেবায় শুকনো ডালে কযেকদিন পরে পাতা বেরোল। নতুন ডাল ছাড়ল ফেকড়ি দিয়ে। ধন্না আর ক'জনকে বলেছিল। বড়িলালের অক্লান্ত প্রচার নানাদিকে ছড়াতে শুরু কবল। থানার বড়বাবু অবধি শুনে বিস্ময় প্রকাশ কবলেন

—বলো কী? এ যে দেখছি প্রায় নস্ত্রাদামুস। মালটাকে তো দেখতে হচ্ছে একবার।

কোটন আর সোমনাথ একদিন সকালে বিক্সা করে বাটম-বাঁধানো টিনে হলদের ওপরে লাল দিয়ে লেখা ঝক্‌মকে একটা সাইনবোর্ড নিযে এল—'মৃতের সহিত কথোপকথন'—প্রোঃ হারবার্ট সরকার।

কৃষ্ণদাদা বিনুর ডায়রি নিয়ে ফিরে যাবার সময়ে হারবার্টকে একশো টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই দিয়েই হারবার্ট ব্যবসা শুরু করে। কৃষ্ণদাদাও হারবার্টের স্বপ্নের ব্যাপারটা অনিচ্ছা ও ঘোর

আপত্তি থাকলেও বিশ্বাস করতে, বলতে গেলে, বাধ্য হয়েছিলেন। সত্যি বলতে বিনু যে হাসপাতালে তাকে ঐ কথাগুলো বলেছিল সেটা হারবার্টের মনে ছিল না। বিনুকে দাহ করার সময় অত পুলিশ, ভ্যান, বন্দুক দেখে তার ভয়েতে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল।

'শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত "পবলোকের কথা" পাঠ করিলে পবলোক-তত্ত্ব ও আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে, এবং পরলোকগত প্রিয়জনের সহিত কথাবার্তা বলিবার এবং তাঁহাদের দর্শনলাভের উপায় জানা যাইবে।'

মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য হারবার্টের অনুসৃত পদ্ধতিটি স্পিরিচুয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে একটি জগাখিচুড়ি বলে মনে হতে পারে। টক্ টক্ শব্দ দ্বারা আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের যে পদ্ধতি আমেরিকার ফক্স ভগিনীরা অবলম্বন করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন অর্থাৎ 'ব্যাপিংস্' নামে যে পদ্ধতি পরিচিত তার কোনো প্রভাব হারবার্টের মৃতের সহিত কথোপকথনে পড়েনি। শ্লেট বা কাগজে অদৃশ্য হস্তে লেখা যে পদ্ধতি এগলিন্টন সাহেব ১৮৮১ সালে কলকাতায় দেখিয়েছিলেন বলে শোনা যায় তাও হারবার্ট কখনো করেনি বা সোজা বাংলায় করতে পারেনি। একদিক দিয়ে হাববার্টকে আমরা একধরনের মিডিয়াম বলতে পারি। এ বিষয়ে 'পরলোকের কথা' থেকে হারবার্ট জেনেছিল, "এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল উপায়ে মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত কথাবার্তা বা ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, তাহাতে একজন মধ্যবর্তী লোকেব আবশ্যক। এই মধ্যবর্তী লোককে ইংরাজীতে মিডিয়াম বলে। মিডিয়াম হইবাব শক্তি সকলের আছে কিনা ঠিক বলা যায না। তবে সকলের যে সমান শক্তি নাই, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ দেখা গিয়াছে, বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও কেহ কেহ শৈশববধি, সম্ভবত জন্মাবধি, এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আবার কেহবা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাহাবও কাহারও মতে, যাঁহারা তুলারাশির ও শান্ত প্রকৃতির লোক, যাঁহাদিগের মন-সংযম করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাই ভালো মিডিয়াম হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে মৃতব্যক্তির আত্মা স্ববশে সহজে আনিতে সমর্থ হন। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই মিডিয়ামের সংখ্যা অধিক দেখা যায।" সহসা, এক স্বপ্নে, হারবার্টের মতো পরলোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা অর্জনের উদাহবণ স্পিরিচুয়াল বিশ্বে বিরল। হারবার্ট কখনো প্ল্যানচেটে লেখার চেষ্টা করেনি। বরং বলা যায় যে কিয়দংশে সে স্বৈরলিপি বা অটোমেটিক রাইটিং পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিল। অবশ্য হারবার্টের কখনো কখনো খাপছাড়াভাবে ব্যবহৃত অটোমেটিক রাইটিং-এর উদাহরণ যদি কেউ স্টেড সাহেবের 'বর্ডারল্যাণ্ড' পত্রিকার রচনাবলী (বিশেষত মিস জুলিয়াসের আত্মার লেখাপত্র) বা ডবলিউ স্টেনটন মোজেজ সাহেবের কর্মকৃতির সঙ্গে তুলনা করতে যান তাহলে অবশ্যই হাস্যরসের উদ্রেক ঘটবে। হারবার্ট কখনো কখনো অবশ্য ট্রান্স মিডিয়াম বা মোহাবিষ্ট মিডিয়ামের ভাব দেখিয়েছিল। দিব্যদৃষ্টি বা ক্লেয়ারভয়্যান্স তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। আরোগ্যকারী মিডিয়াম বা হিলিং মিডিয়াম সে কখনো হতে পারেনি। মেসমেরাইজ করার ক্ষমতা তার ছিল না। আত্মার জড়ীয় মূর্তিধারণ বা মেটেরিয়ালাইজেশন ছিল তার সাধ্যের অতীত। রিচেট, ক্রুকস, কোনান ডয়েল, মায়ার্স—এই মহান ঐতিহ্যের মধ্যে হারবার্টকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করা যায় না। সে একটি 'ফ্রিক্'। কলকাতায় যাঁরা গভীরভাবে প্রেতযোনি ও মৃতাত্মা নিয়ে চর্চা করেন, যাঁদের মধ্যে সংস্কৃতি জগতের এক প্রবাদ-পুরুষও ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও হারবার্টের কোনো যোগাযোগ ছিল না। সর্বোপরি, ব্যবসা জমে ওঠার পরে তার সাধারণ জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। টাকার লোভে যা খুশি তাই সে করত। কখনো মৃতের ব্যবহৃত কোনো জিনিস বা হস্তাক্ষর

কিছু নিয়ে ভাব দেখাত যে সাইকোমেট্রির সহাযতা নিয়ে হদিশ চালাচ্ছে। এ ছাড়াও অনেকেই জানেন যে প্রকৃত স্পিবিচুযালিস্টরা ঠিক দুপুবে বা গভীর বাতে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডায বা গ্রীষ্মে কিংবা ঝড়, বৃষ্টি, বাজ পড়ার সময অপরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা পছন্দ করেন না কারণ এবকম সময ভূত-প্রেতই বেশি আসে। মুক্ত আত্মারা প্রায আসে না বললেই চলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাছাড়া হারবার্টেব তখন থামাব সময ছিল না।

একেবারে প্রথম দিকেই এসেছিলেন বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, সঙ্গে তাঁব স্ত্রী অতসী। বিনয়েন্দ্রবাবুর একমাত্র ছেলে ছিল পাইলট। এযারবাস দুর্ঘটনায় হাযদবাবাদে মারা যায়। বছবখানেক হয়েছে। ছেলে বাহুলের বিযেব কথা হচ্ছিল। সেই থেকে অতসী প্রায় উন্মাদ। বিনযেন্দ্রবাবু একেব পব এক সিগাবেট খাচ্ছিলেন। অতসী অপলকভাবে হাববার্টেব দিকে তাকিযে ছিলেন এবং হাববার্ট শিরদাঁড়া সোজা কবে বসে অপলকভাবে বাহুলেব ফটোটি অনেকক্ষণ দেখাব পব চোখ বন্ধ কবেছিল। দবজাব বাইবে কোটনবা দাঁড়িয়েছিল। একবার চোখ খুলে হাববার্ট সামনে বাখা কাগজে ডটপেন দিয়ে লিখল—ম, ৪—তারপর স্মিত হেসে ফটোটা বিনয়েন্দ্রবাবুব দিকে এগিয়ে দিল। হাববার্ট বলতে থাকে,

—অকালমৃত্যু, আযু ছিল. কর্মশক্তি ছিল—কিন্তু কী কবে কী হল, উপচ্ছেদ হযে গেল। শোক। দুকখু। হুতাস। শুধু তাই নয। সমষ্টি মৃত্যু। উঃ কী কবে যে এ সহ্যশক্তি পেলেন আপনাবা। গড় কবি। অমন সহ্য শক্তিতে গড কবি।

অতসী সরবে কেঁদে ওঠেন। হারবার্টও নিজেব চোখের জল মোছে। স্মিত হাসি ফুটে ওঠে তাব মুখে।

—তবে আব তো দুঃখেব কিছু নেই। দুঃখেব কী আছে। কালরাজ্য, মৃত্যুবাজ্য—এ তো থাকবেই। ছেলেটির মন বড় ধার্মিক ছিল দেখছি।

বিনযেন্দ্র ও অতসী চমকে উঠেছিলেন কাবণ দোতলা থেকে গর্জন শোনা গিযেছিল—'পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!'

বিনয়েন্দ্রই বললেন—আমি তো যতদূব জানি ধর্ম-টর্ম নিযে খোকা একেবারেই মাথা ঘামাত না।

—ঘামাত না?

—বরং তর্কই কবত। উনি তো আবাব সাঁই বাবাব

হাববার্ট চেঁচিয়ে ওঠে,—থাক, আব বলতে হবে না। আমি শুনব না, শুনব না, শুনব না . (কানে হাত চাপা দেয)

দুজনেই অপ্রস্তুত। কী কববেন ভেবে উঠতে পারেন না। কান থেকে হাত সবিয়ে হেসে ফেলে হারবার্ট।

—মাপ করবেন। মুখ্যু মানুষ তো, রেখে ঢেকে কতা আসে না। আচ্চা, ধরুন আপনাব কতাই ঠিক। তা যদি হবে তাহলে এমনটি কী কবে হল বলুন তো?

—কী হল?

হারবার্ট কাগজের দিকে দেখায় যেখানে ম, ৪ লেখা।

—এর মানে?

—মানে? মানে শুনলেই তো আমার খেলা শেষ, ওফ্ ঐ ঐ শিবদুর্গা আসছে, কতবড় বন্দোবস্ত। আমি বলি এই হালফ্যাশানের যুগে কজন মধ্যমধার্মিক হয়? কজন চতুর্থ স্তরে থাকতে পারে? আমি মরলে পারব? স্থূলপাপী হব, নরকের কীট কেন্নো চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। আপনাদের

ছেলের তো আনন্দ এখন,—নন্দনকাননাদি স্থান, যক্ষকিন্নরাদি শরীর ও তদুপযুক্ত সুখ-দুক্‌খ ভোগ।

অতসী যেন ভাবের ঘোরে শুনে যান।

—বলেচে কি জানেন, বলেচে—জপ-তপ সবই বৃথা মরতে জানলে হয়। মরণকালে ভালো চিন্তা ছিল, তারই সুফল ভোগ করচে। কী আনন্দ, কী আনন্দ মা, মাগো, কেন লুকিয়ে রেখেছিলি মা ... কেন?

মৃত বৈমানিক পুত্র মধ্যমধার্মিক অবস্থায় চতুর্থ স্তরে প্রভূত সুখে বিরাজ করছে জেনে শান্ত, নিথর অতসীকে নিয়ে বিনয়েন্দ্রবাবু গম্ভীরমুখে অ্যাম্বাসাডরের পেছনে বসে বাড়ি গেলেন এবং ওয়ালেটে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট কম ছিল।

—আপনার ..

—কী আপনাব?

—মানে কী দেব।

—দেবেন? দেবেন। দেবেন না? দেবেন না। ভিক্ষে যার সম্বল, লাতি-ঝ্যাঁটা যার মাথায় নিত্যি ঝরচে সে কি দরদাম করবে। তাও যদি দুটো ডিগ্রি থাকত, বলতে পারতুম।

বিনয়েন্দ্রবাবু নোট দুটো বালিশের তলায় গুঁজে বেখে চলে গিয়েছিলেন। সেই দিনই রাতে কুড়ি টাকার বিনিময়ে এক বোতল বাংলা আসে এবং আশি টাকা তোরঙ্গে সঞ্চিত হয়।

এর কিছুদিন পরে হাববার্ট দোতলায় গিযে জ্যাঠাইমাব কাছে একশো টাকা ও ধন্‌নাবৌদিকে এক বাক্স মিষ্টি দিযে এল—বলল, 'ফুচকা-বুলানকে দিও। কাকা হযে কখনও কি খাওয়াতে পেরেচি?' ঘুষির জবাবে বড় বড় সন্দেশ। পরে ধন্‌নাকেও জুতোতে ছাড়েনি। 'দাদা, মিষ্টি খেয়েছিলে?' ধন্‌না বলল—হুঁ। কিছুদিন পরে ধন্‌নাবৌদি বলল,—ঠাকুরপো, বাইবের কাজের লোক আসে। তুমি বরং ভেতরের কল-বাথরুমটাই ইউজ করো না। কেউ কি বলেছে কিছু কোনোদিনও তোমাকে?

—না, বৌদি। অব্যেস হযে গেচে তো। আর আমাব তো সময়েব ঠিক নেই। আমার তো কোনো অসুবিদে হচ্ছে না।

—মানে, তোমার দাদাই বলছিল বলে কথাটা বল্লুম।

সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন জ্যাঠাইমা। হারবার্টের মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—প্রাণটা যেন জুড়িয়ে দিলি যে হারু। অত অত্যেচার, অত অনাচার, ভাবিসনি আমার কিছু নজর এড়ায়। মুখ বুজে থাকলে কী হবে, আমি সব জানি। পুণ্যকাজ করচ বাবা, সবই মায়ের আশীব্বাদ।

—জ্যাঠাইমা!

—উঃ।

—সেই গপ্পোটা বলো না?

—কোন্‌টা?

—তোমার বিয়ের সেই ...

—কদমা। হিহিহিহি। সে তো বাসররাতের আগে। নতুন জামাই তো কুঁতে কুঁতে খেল—এই লুচিটা ধরে তো ঐ আলুটা পড়ে যায়। ঢলো ঢলো ভাব।

—কেন গো?

—ওমা, সঙ্গে যে বন্দুগুলো গিয়েছিল ওগুলো তো লুকিয়ে মদ নিয়ে গিয়েছিল। নিত্যি খেত তো। পলকাটা কত রকমের বোতল। তারপর বুজলি,

—ও জ্যাঠাইমা, ঢুলচ কেন?

—হ্যাঁ, তারপর হল কী এয়োবা খিলখিল কবচে। কেন? জামাইকে একটা কদমা দিয়েচে খেতে সে একেবাবে হাতিব মাতার মতো।

—তাবপব?

—তোর জ্যাঠা তো তকন রসে টইটম্বুর। তবে হ্যাঁ, আডাখানা ছিল বলরামেব মতো। যেই না কামড় দেওয়া, অমনি, ছিছি কী কাণ্ড, হিহিহিহি।

—কেন গো জ্যাঠাইমা?

—কদমার ভেতরে জুতো। একপাটি জুতো গো। জুতো পাতে। চোখ গোল্লা গোল্লা করে এদিক ওদিক তাকাচ্চে। আব মেয়েবা চেঁচাচ্চে—'জামাই, জুতো কামড়াচ্চে গো। এ কেমন জামাই গো।' সে যে কী বটকেবা হয়েচিল।

নিজেব বাসববাতেব স্মৃতি কি মনে পড়ে যায় গিরীশকুমারের? তাই কি তারস্ববে স্বগতোক্তি করে ওঠেন তিনি—'পিউ কাঁহা। পিউ কাঁহা।'

জ্যাঠাইমা বলেন,—ঐ এক হযেচে বাবা পিউ কাঁহা। ধন্‌না, কেষ্ট—ছোটবেলা অশৈলপনা কবলে বলতেন শূযাব কাঁহাকাব। ওবা নীচু গলায় জবাব দিত 'কলকাতাকাব'। সব বিস্মবণ। ঐ দাপট, ঐ ঝাপট। সব গিযে ঐ পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা! একটা গান মনে এল বে হারু, গাইব?

—গাও না। তুমি তো ভালো গাইতে আগে।

—শোন্‌। সুব ধবতে পাবব?

—পাববে। ঠিক পাববে।

চাঁদের আলোয় জ্যাঠাইমা গান ধবেন,

সখি!

কেমনে যমুনাজলে যাই।
জল আনিবাব পথে, যে রূপ দেখিনু লো,
তুলনা তাহার কোথা নাই॥
জিনি নব জলধব, কান্তি মনোহর লো,
শুন শুন পবাণেব সই।
মনে মন নাহি মোব, হরে নিল মনচোব,
সবমেব কথা কাবে কই॥
অবলা রমণী আমি, সে, রূপ হেরিয়ে লো
হই যেন আপনারে হাবা।
জল নিতে ভুলে যাই, শুধু তারি পানে চাই,
বল সই এ কেমন ধারা॥
ঘরে মন নাহি সরে বাঁশীরব শুনে লো,
ঘটিল যে এ বড় বালাই।
শাশুড়ী ননদী সবে, গঞ্জনার কথা কবে,
কেমনে যমুনা জলে যাই॥

গান শেষ হয় না। জ্যাঠাইমা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকেন। তেরচা চাঁদের আলো ঢুকে আলমারির এক পাল্লায় পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাব সঙ্গে ধন্‌নার ঘরের টিভির আলো বারান্দায় মিলেমিশে নীলচে একটা দপদপে আলেয়া তৈবি করেছে। সেই আলোয় জ্যাঠাইমাকে রেখে

চলে আসতে গিয়ে হারবার্ট দেখেছিল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গভীর মমতাব সঙ্গে গান যেখান থেকে আসছিল সেদিকে চেয়ে আছেন জ্যাঠামশাই। কাঁদতে কাঁদতে নেমে এসেছিল হারবার্ট।

মন কেমন করে। চিলছাদ, ছায়া, রাত, সকাল, কাকের ডাক সব কিছুর জন্যে মন কেমন কবে। বাবার জন্যে মন কেমন করে। মাব জন্যে মন কেমন করে। জ্যাঠামশাই-এর জন্যে মন কেমন কবে। জ্যাঠাইমার জন্যে মন কেমন করে। সব কিছুতে মায়া, টান থেকে যায়। সব কিছুর জন্যে মন কেমন করে।

নিজের ঘরে খাটের ওপরে উপুড় হযে বালিশ ভিজিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদে হারবার্ট। বিনুর জন্যে কাঁদে। নিজের জন্যে কাঁদে হারবার্ট। বুকির জন্যে কাঁদে। মিথ্যে কথা বলার জন্যে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিযে পড়ে। ঘুমের মধ্যে ফোঁপায়। চিৎ হয়ে শোয। ঘুমেব মধ্যে হাসতে থাকে। আবার ফোঁপায়। হাসে।

পিতা ললিতকুমার ও মাতা শোভাবাণী শিশুপুত্রের এই বিচিত্রভাব দেখিতেছিলেন। বিস্মিত ললিতকুমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শোভারাণীর দিকে তাকাইতে শোভারাণী ঈষৎ মায়াময় হাসি হাসিযা বলিলেন—'দ্যায়লা করচে!'

হারবার্টের ব্যবসা চলতে শুরু করল। একজন ডাক্তার এসেছিলেন তাঁব ভাই-এর বৌকে নিয়ে। ভাই আমেবিকায ক্যানসাবে মাবা গেছে। একজন এযাব হোস্টেস এসেছিল। সে তাব বাবাব সঙ্গে যোগাযোগ কবতে চায। দোহাবা চেহাবার একটি ছেলে এসেছিল একদিন। তাব মা-র জন্যে। সদ্য বোধহয কলেজে ঢুকেছে। যাবাব সময বলে গেল—যা কিছু আপনি বলছেন সবই ভেগ। একটা কংক্রিট কথাও বলতে পাবেননি। আসলে আমাব আসাটাই উচিত হযনি।

ছেলেটি চলে যাবার পরে হাববার্ট কিছুক্ষণ চুপ কবেছিল। তারপব বলেছিল,—আসাটাই উচিত হয়নি! বাপের বানচোৎ ছেলে। আমি আসতে বলেছিলুম?

ছয়

"আপনারে গেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে
ধর সখি দুইটি চুম্বন"!

—সবাজকুমাবী দেবী

১৯৯১-এর শীতে, কোনো এক বিকেলে, কালো অলেস্টাব ও বিনুর দেওয়া প্যান্ট পরে, গত তিন-চার বছবের শীতকালে যেমন হয়েছিল আয়নায় নিজেকে দেখে মোহিত হয় হারবার্ট ও বলে—ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ!

কী করবে এখন হারবার্ট? সেই অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধেও একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল তার। এদিক থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটলে সায়েব পাড়ার এলাকা—বাস্তার নামগুলো শুনলেই কেমন লাগে—লাউডন, রডন, ববিনসন, শর্ট, উট্রাম, উড, পার্ক ....

উপর্যুপরি কয়েকদিন এভাবে অদ্ভুত চেহারার এই মানুষটিকে দেখে দারোয়ান বা কোনো আয়ার হয়তো মনে হয়ে থাকবে লোকটা পাগল এবং চেহারাটা ভালো করে দেখলে মনে হয় ওর গাযে হয়তো সত্যি সায়েবের রক্ত আছে। তা না হলে ওরকম রং, ওরকম তাকানো, একটু নীলচে চোখে ..

হারবার্ট হাঁটছে। হঠাৎ 'প্যাকার্স এণ্ড মুভার্স'-এব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু বলবে? কী যেন বলার ছিল। থাক, এখন না বললেও চলে। হারবার্ট বিড়বিড় করে—ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ!

কেকেব দোকান থেকে গন্ধ বেবোচ্ছে। কালো কাচ দিয়ে দোকানটা সাজানো। ঢুকবে? উবে বাবা, কতটা জায়গা নিয়ে বাড়িটা। বিরাট গেট। ভেতবে একটা মারুতি ব্যাক করছে পেছনে সাদা আলো জেলে। যারা গাড়িতে তাদেব থেকেও কিন্তু বাড়িটাকে ভালো চেনে হাববার্ট। ভেতবে একটা কাঠেব সিঁড়ি থাকতেই হবে। সিঁড়িটা উঠে দুভাগে ভাগ হয়ে ডানদিকে বাঁদিকে উঠে গেছে। যেখানে ভাগ হয়েছে সেখানে একটা আয়না কালো কাঠেব ফ্রেমে আটকানো, ফ্রেমটা আটকানো একটা স্ট্যাণ্ডে যাব পা-গুলো বাঘের থাবাব মতো ডুমোডুমো। দুপাশে দুটো পেতলের বড ফুলবাখাব পাত্র। ডানদিকেব সিঁড়িটা দিয়েই হারবার্টেব ওপরে ওঠার অভ্যেস। কিন্তু ওপরের ঘবগুলো কী বকম, কটা ঘব আছে, সেই ঘবে কী হয়েছিল, কে থাকত? মাথাটা ব্যথা করে হাববার্টেব। একটা সিগারেট ধরায়। ফুটপাথে একটা পুরনো দিনের ঘোড়ার জল খাবার লোহার চৌবাচ্চা। তাব কিনারে বসে। মুখে যদিও বলে—ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ।

কিন্তু আবছা কবে যেন সাদা পোশাকেব, ফিনফিনে, সাদা গা দেখা যাচ্ছে, সোনালী চুল চোখ বন্ধ কবে ভাবতে থাকে হাববার্ট মোমবাতি জ্বলছে আর সেটা নিভিয়ে দেবাব জন্যে ফুঁ দিতে, এগিযে আসছে কেউ নিচু হয়ে, কাচেব গেলাসের শব্দ হাববার্ট চোখ খোলে। অন্ধকাব ছড়িযেছে। বাস্তায় আলোগুলো জ্বলেনি। গাড়িব আলো। হারবার্টের একই সঙ্গে মনে হয় কিছু একটা যেন বলাব ছিল আব এই বাড়িতে ঐ চিলছাদটা নেই।

বিখ্যাত জুয়েলাবেব ছেলে তার কর্মচারিদেব নিয়ে এসেছিল এবং হারবার্টেব কথায় সে বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে যায। মুখ লাল হয়ে ওঠে।

—কী এসব বলছেন। আমার বাবা দেবতুল্য লোক ছিলেন। এঁদের-ই বলুন না, দীর্ঘদিন বাবাব কাছে কাজ করেছেন এঁবা—বলুন না, দাসবাবু

—কী বলেচি যে আমায় ওদেব কাছে জানতে হবে। কী বলেচি যে গিলতে পাচ্চেন না। বিষম ঠেকচে। গালাগালমন্দ কিচু কবেচি?

—ঐ যে বললেন বাবা পাপী।

হারবার্ট হা হা কবে হেসে ওঠে—বলেচি যে সামান্য পাপী, তৃতীয় স্তবে বিবাজমান। মানে কিছু বোজেন যে প্যাঁক প্যাঁক কবচেন?

ছেলেটি এবাব চুপ করে থাকে। শুনে যায—ব্যবসায়ী লোক। বিস্তর বড় জাল ফেলচে, জাল গুটোচ্চে, মাছ খামচাচ্চে, আবার এ পুকুরের এঁড়ে মাছ ও পুকুরে ছেড়ে দিচ্চে—কী বুঝলেন?

—আজ্ঞে, ওঁর তো মাছ-ফাছের ব্যবসা কখনও ছিল না, আমাদের তো জুয়েলারি ...

—আরে বাবা, এগুলো হল হেঁয়ালি। বুঝতে হবে। বলচি যে ব্যবসায়ী মানে বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত তো, মরণমূর্ছা কাটতে একটু সময় লাগে। তবে খুব বেশি টানলে ঐ দেড় বছর ... তারপর ছাড়া পেয়ে যাবে। দিব্যি উড়ে বেড়াবে। ওঃ কী যে লীলা।

—আমাদের কী করণীয় তাহলে?

—আপনাদের? কিচ্ছু না।। মন দিয়ে ব্যবসা করুন। তবে হ্যাঁ, জমির ব্যাপারটা নিয়ে অতিপ্তি একটা আচে?

—জমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জমি। বলচে বড় দুশ্চিন্তা, বড় অতিপ্তি। কী লটঘট আচে নাকি কোথাও?

—আজ্ঞে, ঐ বারাসাতের একটা জমি নিয়ে যে মামলাটা চলছিল ..

—থাক্ থাক্ ও আমার শুনে কাজ নেই। পাবলে মিটিয়ে নিন। আমাব কী।

—আমরা তাহলে আসি। আপনার দক্ষিণাটা ...

—রাখুন না, এখানেই রেখে দিন। আপনাদেব আর কী, পাপ জমচে তো আমার। আসুন ভাই। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

আর একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় চুল। চশমা। বেশ স্মার্ট। ঘিয়ে ঘিযে রঙেব ব-সিল্ক-এর বুশ শার্ট আর চকোলেট রঙের ফুলপ্যান্ট—লোকটা জুয়েলাববা চলে যাবাব পব ভেতবে এল—কবে আপনাকে একটু ফাঁকায় পাওযা যাবে বলুন তো।

—বলুন না। এখন তো ফাঁকাই আচি।

—না, এখন আবার আমার সময় নেই। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। বিকেলে আপনি কেস দেখেন?

—আজ্ঞে না, বিকেলে একটু বেড়াই।

—বেড়ান? একদিন না হয নাই বেড়ালেন। ব্যাপাবটা ইমপবট্যান্ট।

হাববার্ট ঘাবড়ে যায়, ঝামেলা-টামেলা কিছু নয তো?

—ঝামেলা। একভাবে দেখলে ঝামেলা বৈকি। হেভি ঝামেলা। ঠিক আছে, আমি একসময ঠিক এসে যাব। সন্ধেবেলা কী কবেন।

—চলে আসি সাড়ে সাতটার মধ্যে।

—তাবপর পাড়ার ঐ লুম্পেনগুলোব সঙ্গে ড্রিংক করেন। দেখুন, আমি সব জানি। ঠিক আছে, দেখা হবে। চলি।

—খোলসা কবে কিছু বললেন না। খটকা লাগচে কেমন।

—লাগুক। আমি আসব। এসে খটকাটা ভাঙব। চলি।

রবিনসন স্ট্রিটেব নার্সিং হোম থেকে একটা গাড়ি বেরোচ্ছিল। ড্রাইভাবেব মাথায সাদা টুপি। সেই গাড়িটাতে সুন্দরী ববচুল এক লেডি ডাক্তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল হাববার্ট। গাড়িটা বিদেশি। টয়োটা বা ডাটসুন কিছু হবে। এইসব গাড়িতে সাসপেনশন এত ভালো যে ঝাঁকানি প্রায় হয় না, ঢেউএর মতো গাড়িটা চলে যায়। এরকমই একটা ঢেউ-তে লেডি ডাক্তার যখন মাথাটা একটু ঝাঁকি দিয়ে চুল ঠিক করছিল তখনই হারবার্ট তাকে দেখে হাঁ-মুখ স্ট্যাচু হয়ে যায। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা ঐ মুখ। চেনা তো বটেই। কিছু অসম্ভব দরকাবি কথা বলার ছিল। লেডি ডাক্তার শুনল না। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল। চলে গেল লেডি ডাক্তাব। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কে নেমেছিল?

ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে হারবার্ট নামছিল আর বাঁদিকেব সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছিল, যার পিঠ, ববচুল, কাঁধ, কোমর, সাদা পোশাক পরা, জামার সঙ্গে ঝালর, গাড়ির মধ্যে লেডি ডাক্তারকে পাশ থেকে দেখা ১৯৯১-এর শীতে হারবার্টের এক আশ্চর্য আবিষ্কার, লেডি ডাক্তার, দাঁড়াও, ওভাবে চলে যেও না। হাঁপিযে হাঁপিয়ে ছুটলেও আমি তোমার গাড়ির নাগাল পাব না—দাঁড়াও শোনো—কথাটা শুনলে কী এমন দোষ হবে, যদি একবার আয়নাটার সামনে গেলে একটাও কথা মনে পড়ে যায়—উঃ

মাথাটা দপ্‌দপ্ করছে। অলেস্টারের মধ্যে গরম লাগছে। বড় বড় বোতাম। হ্যাঁচকা মেরে খুলতে গিয়ে একটা বড় কালো মেডেলের মতো বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে পড়ে গেল। হাতড়ে কুড়িয়ে নেয় হারবার্ট। বোতামটা পকেটে রাখে। লেডি ডাক্তারকে কী বলবে হারবার্ট? হারবার্ট হাঁটতে থাকে। ফিসফিস করে বলে যায়—ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ ....

বেড়ানোব সময় বাব বার, বিকেলের পর বিকেল ঐ নার্সিং হোমের সামনে এসে অনেকবাব দাঁড়ালেও হাববার্ট আব ঐ লেডি ডাক্তাবকে দেখতে পায়নি। খুব রাগ হয়েছিল। অভিমান হয়েছিল। শুনছে কে? লেডি ডাক্তার তো চলে গেল। শুনলই না। হারবার্ট হাঁটতে থাকে। মুখ দিয়ে মেশিনগানের শব্দ করে। মেশিনগান দেখেছিল হারবার্ট। সিনেমায। বাট্‌টাট্‌টাট্‌টাট্‌!

একটা আধপাগলা লোক এসে হাজিব। তাব বোন পালিয়ে যায়। কয়েকমাস পবে হাওড়া স্টেশনে ট্রাংকের মধ্যে বোনেব টুকরোগুলোকে সনাক্ত করার পর তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এসেছিল হারবার্টের কাছে।

—আমি ট্রাংক, সুটকেস, কোনো বন্ধ বাক্স দেখতে পাবি না। আমাব শুধু মনে হয় বন্ধ ডালাব ফাঁক দিয়ে চুল বেবিয়ে ঝুলছে। ডালাটা খুললেই দেখতে পাব.

লোকটা মযলা শার্ট আর প্যান্ট পবা। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আব 'না' বলার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে— পাবছি না। কিছুতেই স্ট্যাণ্ড কবতে পাবছি না, একটু হেলপ্ করুন, আই শ্যাল ডাই, দোহাই আপনাব, একটু হেলপ করুন, আপনি তো পাবেন ডেডদেব সঙ্গে কমিউনিকেট কবতে, আমাব বোনটা ...

এবাব প্রায চিৎকাব কবে কাঁদতে থাকে লোকটা। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। পকেট থেকে নোংবা রুমাল বেব কবে মুখ মোছে, চশমা মোছে।

—আপনাব বোনেব নাম কী ছিল?

—শান্তা।

—হাববার্ট কাগজে লেখে—সানতা। তাবপব নামটাব তলায একটা লাইন দেয।

—ফটো-টটো কিছু আছে আপনাব বোনেব?

—ফটো তো আনিনি। তবে চলে যাবাব পবে একটা চিঠি এসছিল ওব। তাব জেবক্সটা আছে। দেব?

—জেরক্স কেন?

—ওবিজিনালটা লালবাজাবে।

—বাবা! পুলিশ, ফৈজত, আচ্ছা দিন। আমাব পড়ার দরকার নেই। একটু ছুঁযে থাকতে হবে। বসতে হবে কিন্তু আপনাকে। একটু ঘুবে আসুন না বরং। একা থাকলে কাজটা আব কী ভালো হয।

—হ্যাঁ, ঘুবে আসছি। আপনি দযা কবে আমাকে হেলপ করুন। বিশ্বাস করুন আমি পাগল হয়ে যাব।

একে কি বলবে হারবার্ট ভেবে পাযনি। ঘবের দরজা বন্ধ কবে জানালা দিয়ে আসা আলোয় হাঁচড়-পাঁচড় করে 'পরলোকেব কথা' খুলেছিল। ভেবেছিল 'ভ্রাতৃস্নেহে মৃতা ভগিনীর আবির্ভাব' থেকে কিছু একটা দাঁড় কবাতে পারবে—'সে ১৮৭২ সালের কথা। যশোহরের চাঁচড়ারাজ সরকারের প্রধান কর্মচারি "নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় তখন সপরিবাবে কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীটের ৩নং বাড়িতে বাস করিতে ছিলেন ...তবে কি সে পেত্নী হইয়াছে?'' এর থেকে কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। 'মৃতাপত্নীর প্রতিহিংসা' বা 'সতীনের উপর আবির্ভাব' থেকেও কোনো রাস্তা বেরোল না। 'আমার হারানো মেয়ে জ্যোৎস্না' থেকে বরং পাওয়া গেল উচ্চস্তরের আত্মা উজ্জ্বল হয়। তাতেই বা কী? হাববার্টের ভয় ভয় করেছিল। গোটাটাই। এ কী এলরে বাবা। হঠাৎ দরজায় টক্ টক্ শব্দ। দুরু দুরু বুকে দরজা খুলে দেখে চায়েব দোকানের ছেলে পাঁচু গেলাস নিতে এসেছে। পাঁচু বলল যে চায়ের দোকানে কেউ তো বসে নেই। তখন চটি গলিয়ে বেরিয়ে হারবার্ট সিগারেটের দোকান,

বাস স্টপ সব দেখল। কোথাও নেই। লোকটা আর আসেনি। হারবার্টের কাছে অন্যান্য ঠিকানা লেখা কাগজের সঙ্গে শান্তার চিঠির জেরক্স কপিটা থেকে গিয়েছিল।

লোকটিকে যা বলা যেতে পাবত সেইগুলো ববং কাজে লেগে গেল। এক ছোকরা ডাক্তাব, বাচ্চাদের স্পেশালিস্ট, সঙ্গে কবে নিযে এসেছিল বেলজিয়ামের সুন্দবী অভিনেত্রী টিনাকে। টিনা ইন্ডিয়া দেখতে এসেছে। টিভি ও স্টেজে অভিনয় কবে। ওকে দেখাব জন্য হাববার্টের ঘবের সামনে ভিড জমে গিয়েছিল। ডাক্তারটি হাববার্টেব কথা ইংবিজি করে বলে দিচ্ছিল। টিনাব মা-ও অভিনেত্রী ছিলেন। কিন্তু গাড়ির একসিডেন্টে পঙ্গু হয়ে যান। টিনার বাবা আবাব বিয়ে করেছে। সেই মা মারা গেছেন। বড় দুঃখ টিনার। সস্নেহ মাতাব আত্মার অনেক কার্যকলাপ হাববার্টেব জানা—বিদেশী বলে একটু বেসিক থিওবিও প্রযোগ কবেছিল অব্যর্থ—মৃত্যুব পবে ছ'রকম প্রেত হয়—সেগুলো কী কী—কে কোন স্তরে থাকে—মাব স্নেহ কীভাবে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা কবে। টিনা বলেছিল সে একজন তিব্বতী লামাব কাছে গিয়েছিল, লণ্ডনে। সেও বলেছিল—প্রেত ছয় রকমেব কিন্তু তার মা কোথায় থাকতে পাবে, কীভাবে আছে কিছুই বলতে পারেনি। মেমসাহেব একশ টাকা দিযে গিযেছিল হারবার্টকে। পাড়ায হাববার্টেব ইজ্জৎ আরও দশগুণ বেড়ে গেল। ডাক্তাব একটা বসিদেও সই কবিয়েছিল হাববার্টকে।

—গুরু! তুমি তো ক্যান্টাব কবে দিচ্চ। মেমটা আবার কবে আসবে গো?

—দরকাব পডলেই আসবে। যা ডোজ দিয়েছি।

—বস্, তুমি নাকি মেমটাকে নিয়ে দবজা বন্ধ করে ভূত দেখিযেচ।

—এই এক ক্যাওড়ামি তোদেব গেল না। ওসব ফুটি মাবাব ধান্দা জানবি হারবার্ট কবে না। মেম দেখাচ্চে! কত মেম বলে দেখলাম।

লেডি ডাক্তারের দেখা না পেলেও হারবার্ট পার্ক স্ট্রিটের এক বন্ধ অ্যান্টিকের দোকানে কাচেব মধ্যে পরীকে দেখেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছিল যে ঐ পবীই লেডি ডাক্তাব বা সিঁড়ি দিয়ে যে উঠে গিয়েছিল তার ছোটবেলা। পরীব থেকে একটু বড়ই ছিল বুকি। কিন্তু চিলছাদ থেকে দেখা বুকি অন্যবকম। মেলানো যায না। কিন্তু পরীকে দিয়েই শুরু। সোনালী চুল, হলদেটে পাথর দিয়ে তৈরি। গাযে পাথবেব কাপড় জড়ানো। বাঁ হাতটা ভাঁজ কবে মাথাব পেছনে রাখা। ডান হাতটা উঁচু কবে একটা আলো ধরে আছে। আলোটা জ্বালানো যায়, কারণ একটা কালো ইলেকট্রিকের তাব নেমে গেছে। ইলেকট্রিকের তাবটা দেখতে অস্বস্তি হয হারবার্টের। পরীর আশপাশে কত কী! পাথরেব ফুলদানি, পাথরের চেয়াব, পেছন ফিবে থাকা কাঠেব হাতি, পাথরের টেবিলেব ওপবে বাখা মস্ত একটা পুবনো জাহাজেব আলো।

—ক্যাট, ব্যাট, ওযাটার, ডগ, ফিশ!

ঐ পরীর দিকে তাকিয়ে হারবার্ট কানে মৃতা পশ্চিমী নারীদের গান শুনতে পেয়েছিল। সেই গান দল বেঁধে বিলাপ করতে করতে এসে ধোঁযাধুলো মাখা দোকানেব কাচে ধাক্কা মারে। হায় নগ্ন পরী! জার্মান মেশিনগানেব সামনে সেই রুশী যুবতী যেন—নগ্ন, দুহাত দিযে বুক ঢেকে দৌড়চ্ছে কালো মাটির ওপর। শুনতে সে কোনো কথাই চাইছে না। ব্যস্ত পথচাবীরা দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকলে শুনতে পেত যে হারবার্ট গুমরে গুমরে মুগ্ধ হয়ে কাঁদছে এবং সেই পরী ক্রমশ ওপরে উঠছে—তার গাল ঘষে দিচ্ছে দড়ি মইতে বাঁধা বিরাট বেলুন। শীতের পার্ক স্ট্রিটে এক ঝলক রেফ্রিজারেটরের হাওয়া এসে হারবার্টকে জড়িয়ে ধরে। হারবার্ট অলেস্টারেব কলারটা তুলে দেয় এবং তাকে হলিউড ছাড়া এখন অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব। এখনও বিকেল আছে। তখনও বিকেল ছিল। এরপর অন্ধকাব ছেয়ে এলে পরীও লুকোতে শুরু করবে। গাড়িব আলো

কখনো কখনো তাকে চমকে দেবে। মনে হবে তাব ঠোঁট নড়ছে। অন্ধ দুটো চোখে হলুদ আলো জ্বলছে। হারবার্ট ফিসফিস করে বলেছিল,—জেপটে জুপটে থাকো এখন। ফেব আসবখন।

ফেরাব রাস্তায গাছ, পবিচিত কুষ্ঠরোগী, বাবান্দাব থাম, সাইনবোর্ড, চায়ের দোকান, ডিউটি সেরে বাড়িতে ফেরা আয়া, নার্স, বেশ্যা, পার্কেব বেলিং, জলাধারের গায়ে আঁকা সিংহ ও মিকিমাউসের ছবি, শহবেব পাতাল থেকে উঠে আসা জল—প্রত্যেককে আলাদা করে কিছু না কিছু বলাব ছিল। বিজ্ঞাপনেব বিবাট হোর্ডিং-এব ওপবে গাড়ির আলোর চলাফেরা দেখে হাববার্টের মনে হয সে সিনেমাব পর্দাব দিকে তাকিযে আছে। রাস্তার ভিড়ে, কৃষ্ণদাদার পাশে দাঁড়িযে হারবার্ট 'ফল অব্ বার্লিন' দেখেছিল। তাব সঙ্গে দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব আবও ডকুমেন্টাবি ছিল। নগ্ন একটি রুশী যুবতী দুহাতে বুক ঢেকে কালো মাটিব ওপব দিযে দৌড়চ্ছে আর কয়েকজন জার্মান সেনা মেশিনগান তুলে ধবছে। সেই যুবতী ছুটছে তো ছুটছেই। শুনতে সে কোনো কথাই চাইছে না। বাট্ টাট্ টাট্ টাট্ .

বছবেব চাকা ঘুরল। ১৯৯২ এল দেদাব কেচ্ছা-ফেচ্ছা, চুবিচামারি আর হারামিপনাব ফিবিস্তি নিযে। বছবেব শুরুটা হাববার্টেব খাবাপ হযনি। কয়েকটা বাংলা কাগজে দু-একটা লেখাও বেবিযেছে। জানুযাবিতে বিশেষ কিছু হল না, ফেব্রুযাবিতেও না—টুকটাক কেস অবশ্য আসছিল। মার্চেও বিশেষ কিছু না। পযসা যা আসছিল তাতে হাববার্ট খুশিই ছিল। তবে মাল, সিগাবেটেব খবচাটা বড বেডে গিযেছিল। হাববার্ট ঠিক কবল দোল যখন ১৮ তারিখে পড়েছে তখন বংবাহাবী খবচ খবচা যা হবাব হযে যাক। এবপব সব ছেড়েছুড়ে, সাত্ত্বিক টাইপেব হয়ে যাবে। সাহসটাও কেমন যেন কমে যাচ্ছিল হারবার্টেব। আসলে গণ্ডগোল হযেছিল মেশিনে—সাউণ্ড আছে, পিকচাব নেই। পিকচাব আছে, সাউণ্ড নেই। মানুষও তো টিভি। হারবার্টের শরীরটা এখানে ওখানে ক্যাঁ কোঁ করছিল কিছুদিন ধ'বে। জ্যাঠাইমা বলেছিল,—হ্যাঁবে পযসাকড়ি আসচে, শরীবটা অমন মাছেব কাঁটাব মতো হচ্চে কেন রে? বেশি নেশাভাং করচিস তাহলে।

—যাঃ কী যে বলো জ্যাঠাইমা। আসলে হয়েচে কী জানো, ধকল যাচ্চে তো খুব, একেবাবে হাড়কালি করা ধকল, তাই সব বসা শুকিযে যাচ্চে, মাসে জমচে না।

—বসা টানা তো সাধুপুরুষের লক্ষণ রে। আমার হাবুর সাধু হযে কাজ নেই। তোকে আমি বিযে দেব। সংসাবে বাঁধতে হবে।

—কে আমাকে বিযে কববে জ্যাঠাইমা।

—শোন কতা। বোজগেরে ছেলে। এমন দেবকান্তি দেকতে। কত ছুঁড়ি বলে পুঁতি খুঁজতে খুঁজতে বরেব ঘবে ছুটবে—

পুঁতি গড়িয়ে যায়। সেই পুঁতি খুঁজতে খুঁজতে কেউ তো হারবার্টের কাছে আসেনি। না বুকি। না লেডি ডাক্তাব। আর পবী? না, পবীকে কিছুতেই হাববার্ট বৌ বলে ভাবতে পারে না। দোলের দিন খুব রং খেলা হল। মাথার চুলের মধ্যে কী একটা দিযেছিল কেউ যত জল ঢালে ততই রং বেবোয়। ততই বং বেরোয়। গলগল কবে।

দোলের পরের দিন। খোঁয়াবি কাটেনি। ভবদুপুর বেলায় ভেজানো দবজা খুলে সেই বানচোৎ এসে হাজিব যে ঘিয়ে বঙের র-সিল্কেব বুশ শার্ট পরে এসে বলে গিয়েছিল যে সময়মতো এসে খটকা ভেঙে দেবে। হারবার্ট তখন স্বপ্ন দেখছিল সে হাসপাতালের দরদালানে বড় বড় কাচের বয়ামে রাখা মানুষেব নানা রকম শবীরের টুকরো, গ্যাঁদা বাচ্চা, মুখ চোখ হযনি, এই সবের মধ্যে দিয়ে সে একটা ন্যাংটো মেয়েকে নিয়ে পালাচ্চে। ল্যাংটো মেয়েকে নিয়ে বেরোবে কী করে? উপায় ছিল। হাসপাতালের চত্বরে ছায়া ছায়া জাযগায় খানকিরা মবা মেয়েদের কাপড়

বিক্রি করছিল। সস্তায় একটা নাইলনের কাপড় হারবার্ট সেই ন্যাংটো মেয়েকে কিনে দিল। কাপড়টা পরে হারবার্ট আর মেয়েটা হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়ে দেখল ট্রাম-ডিপো। কিন্তু ট্রামে না চড়ে তারা একটা রিকসাতে উঠল। রিকসাটা চলছে। হারবার্ট নিচে তাকিয়ে দেখে তো অবাক—আরে, মেয়েটার পায়ে একটা হাইহিল জুতো সে তো খেয়াল করেনি। মেয়েটার বগল এই তো পাশে। নাইলন ঢাকা দেওয়া বুক গুরু। সেই সময় চোখ খুলল হারবার্ট। ঝুঁকে ব-সিল্ক ঘিয়ে ঘিয়ে বুশ শার্ট তাকিয়ে।

—ঘুম হচ্ছে? ঘুমিয়ে থাকলে খটকা ভাংবে?

হারবার্ট ধড়মড় করে উঠে বসে।

—বলেছিলাম না, সময়মতো আসব। ওঠো, জাগো, হারবার্ট সরকার, তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার।

লোকটা ব্রিফকেস খুলে একটা চ্যাপটা মদের বোতল বের করেছিল। বের করেছিল দুটো ফিনফিনে গেলাশ। এক প্যাকেট ক্লাসিক সিগারেট। লাইটার। হারবার্টকে বলেছিল,—যাও পাঁচু, গিয়ে মুতে এসো, এসে, গ্যাঁট হয়ে বসো। অবাধ্য গর্দভের মতো চেয়ে থেকো না। যা বলছি তাই করো। এতে তোমারও মোঙ্গল, আমারও চেংগিশ খান।

হারবার্ট ঘেবড়ে যেয়ে দুদ্দাড় করে হিসুফিসু সেরে ফিরে দেখল লোকটা দুটো গেলাস ভরতি করে সাজিয়ে বসে আছে। দুজনে গেলাস ধরল, সিগারেট ধরাল, লোকটি বলল,—চিয়ার্স নয়, স্কল নয়, আমরা বাঙালি, বাংলাদেশে এখন সবাই বলছে—উল্লাস! হারবার্টও বলল,—উল্লাস।

লোকটির নাম সুরপতি মারিক। বাড়ি, জমি, ভেডি, কয়লা, মোপেড—নানা বিষয়ে মধ্যস্থতা করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কমপিউটারাইজড় হরোস্কোপ এদেশে যাঁরা প্রথম চালু করেন তাঁদের মধ্যে নাকি শ্রীমারিকও ছিলেন। বড় মাপের প্রফেশনাল ফুটবল কলকাতায় চালু করার জন্যে হন্যে হয়ে যাচ্ছে সুরপতি। রুসি মোদি, রতন টাটা, ছাবারিয়া, আমবানি—এদের সকলের সঙ্গেই বিগত তিন বছরে ফুটবলের ব্যাপার নিয়ে সুরপতির কথা হয়েছে। কিন্তু এখন তার নজর হারবার্টের দিকে পড়েছে। নেক নজরে তাকিয়ে থেকে সুরপতি বলে যায়—দ্যাখো ভাই, তোমার ঐ ভূতফুৎ আমি মানি না। ওদের সঙ্গে তোমার কেমন দহরম মহরম তাতে আমার বিশ্বাসও নেই, অবিশ্বাসও নেই। আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝি—তেলাপিয়া যদি চৌবাচ্চায় থাকে তার সাইজ বাড়ে না।

—মানে ভাই, তুমি বলতে চাইচ আমি চৌবাচ্চার তেলাপিয়া?

—তা নয়তো কী? ঝিলের গজাল না সাগরের তিমি। স্পেডকে স্পেড আমি বলবই।

—তা তোমার মোদ্দা কতাটা কী সেটা ঝেড়ে কাশলেই তো হয়। এরপর নেশা চেপে ধরবে, মাথা গুলোবে।

সুরপতি মারিক চোখ বন্ধ করে। বলে চলে—গুড গুড, ওসব গ্যাঁজাগোঁজি আমিও ডু নট লাইক! মোদ্দা কথাটা হল তোমাকে আমি টপ লেভেলে নিয়ে যাব। তাতে আমারও স্বার্থ থাকবে। মিনিমাগনা এই হুইস্কিটা তাহলে কিনতুম না। আর যাই করো, আমাকে চোদু ভেব না। তোমার মতো কাঁড়ি কাঁড়ি হারবার্ট আমি ফেলেছি। আবার ছেঁকে তুলেছি।

সুরপতি মারিক চোখ খোলে। বলে চলে,—একটা কাচফাচ লাগানো, এ.সি. লাগানো ঘ্যাম অফিস। দেওয়ালে নানা রকম ছবি। একটা মেয়ে কম্পিউটার চালাচ্ছে। তাকে ঝকঝক করছে এ লাইনের দামী দামী বই। বাজনা বাজছে আস্তে আস্তে। ডিমে আলো। কার্পেট। পাঁচশো টাকা ভিজিট। মিনিমাম। স্পেশাল কেস হলে আরো বেশি। এরপর বম্বে, দিল্লি। মরা পলিটিশিয়ান

কী মেসেজ পাঠাচ্ছে সেটা জ্যান্ত পলিটিশিয়ানের কানে একবারটি তুলে দেওয়া। এই ভাবে ফাটকার কিং পিন, বিগ বুলদের কয়েকটাকে বশ করে ফেলা। তার সঙ্গে নির্লিপ্তি, শ্মশানবৈরাগ্য। তারপব দুবাই। বাহরিন। মবা শেখ, জ্যান্ত শেখ। এযার ইন্ডিয়া। টাটা সিয়েরা। বলহরি হরিবোল। বাম নাম সত্য হ্যায়। আব বলতে পাবছি না। দাঁড়াও, আব এক পাত্তব ঢালি। মালটা কিন্তু স্মুদ্। কী বলো? হারবার্ট জমতে থাকা নেশার থেকে ভবসা জোটায় ঠিকই কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও যেন হবে না হবে না ভাব,—কিন্তু এসব কবতে গেলে তো ইংবিজি না জানলে চলবে না। ওখানেই তো আমাকে মেরে রেখেচে কিনা।

—বাল হবে ইংরিজি দিয়ে। শালা, ইন্টারপ্রেটাব থাকবে তোমাব, যা বলবে স্যাটাসাট বলে দেবে। পার্টি বেগড়বাঁই করলে দাঁত চিপে শুনিযে দেবে —ফাক্ ইউ' টিট' কান্ট' প্রিক'

—তাহলে হবে বলচ, পারব? আমার ভয় একটা কেচ্ছা না কবে ফেলি।

—দূর! তোমার মনে খালি ভয। আমার আবাব অভয়, ববাভয়। ব্যবস্থা তো আমার। ফিফটি-ফিফটি। মারিক সরকার এন্টারপ্রাইজ।

পেটেতে পুবিযা পাঁট
রাজী তবে হাববার্ট ..
কি ঠিকতো?

—তুমি আবাব কবে আসচ ভাই।

—ঐ তো। কবে, কখন আসব সেটা আমার ব্যাপাব। মারিক এলোন উইল ডিসাইড। এখন আমাব কাজ তোমাকে একটু তুলে ধবা। একটু সুগন্ধ নাকে নাকে পৌছে দেওয়া। ওয়াশিং পাউডার নিবমা!

—মানে?

—এ শালা তো দেখছি স্প্যাসটিক। তোমাকে যে বাচ্চারা 'বাঁটপাখি! বাঁটপাখি!' বলে, আই সাপোর্ট দেম! এখন আমার একনম্বব কাজ হবে তোমার জন্যে পাবলিসিটির ব্যবস্থা। সাঁড়াশি স্ট্রাটেজি। একদিকে চলবে হুইস্পার ক্যাম্পেন. গুজগুজ ফুশফুশ। অন্যদিকে ইংবিজি কাগজে দু-একটা মাল ভিড়িযে দেওযা। যাই হোক, আমাদের কারবার শুরু হয়ে গেল। আমি চললুম। আর হ্যাঁ, সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দাও। আর ঐ পাড়াব বংকা-লেটো-মদনাদের সঙ্গে বাংলা খেয়ে খেয়ে লিভারটার বারোটা বাজিও না। এর পরে এ.সি. ঘরে বসে ডিম আলো জ্বেলে তুমি আর আমি ব্ল্যাক ডগ খাব!

সুরপতি মারিক যাবাব আগে হাববার্টের গাল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে যায়—গুলু গুলু গুলু গুলু!

সন্ধ্যা ঘনায়। অন্ধকারে ক্লাসিক সিগারেট ধরায় হারবার্ট। বুকি, লেডি ডাক্তার, পরী ... দীর্ঘশ্বাস আসেই কিন্তু এদিকে স্বর্গের দরজা যে একটু একটু করে খুলছে। সুর করে করে হারবার্ট বলে চলে,

ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ ..
ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ ...
ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার ডগ, ফিশ ...

অন্ধকারের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া নানারকমের নকসা তৈরি করে যদিও তা দেখা যায় না। গোল আগুনটা শুধু বাড়ে, কমে।

সাত

"ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি
বিলাপের স্থান।"

—হিরণ্ময়ী দেবী

নিষ্ঠুরতম এপ্রিলে কলকাতায় পুঞ্জ পুঞ্জ হিংস্র ভাইরাস দাপিয়ে দাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একেবারে রাস্তায় বা ঝোপড়িতে যারা থাকে তারা এইসব ভাইরাসের সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে, নিগূঢ় দক্ষতায় প্রতিষেধক অ্যান্টি-বডি তৈরি করতে পেরেছে বলে বিশ্বাস কারণ তা না হলে এদের স্টোনম্যানের হাতে পাঁচ-সাতটি করে মরতে হত না, ভাইরাসের কামড়েই তারা বাল-বাচ্চা সমেত ঝাড়েগুষ্টিতে ফৌত হয়ে যেত। এই অজানা, বিকট, পিশাচসিদ্ধ ভাইরাসেরা অক্লেশেই ফতে করে মধ্যম বর্গকে, যাদের ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরে ভিটামিন-সি কমে যায়। যে যুবতীরা বসন্ত সমাগমে পুংকেশরের বোঁযার সুখময় স্পর্শের কথা ভেবে দেহবল্লরীতে টক আগুন জ্বালিয়েছিল তারাও অশ্লীল স্বপ্নের মধ্যে ফুলে ফুলে এই ভাইরাসকে "নাথ, নাথ।" বলে ডাকে এবং সেই ভাতঘুম থেকে প্রভূত শ্লেষ্মা-বিজড়িত অবস্থায় জেগে ওঠে। যুবকেরা জাগরণেই ভাইরাল কুস্তির বগ্‌লী প্যাঁচে অজান্তে কোতল হয়। এই ভাইরাসপুঞ্জই নির্ভাবনায় বসে থাকা হাঁসের মতো হারবার্টকে পেয়ে গেল। সবাই জানে যে দারোগারাই ডিম খায় হাঁসের অক্লান্ত ফাকিং-এর পরিশ্রম থেকে। এক্ষেত্রে কিন্তু ডিম খায় ডাক্তাররা। কারণ এই ভাইরাস মারার অস্ত্র তাদেরই কুক্ষিগত।

শুরু হয়েছিল পিঠ কোমর ঘাড়ে ব্যথা আর নাক দিয়ে জল ঝরা দিয়ে। ভেবেছিল ঝাল চর্বির বড়া আর বাংলা ("খালি বোতল আস্ত অবস্থায় ফেরৎ দিলে বোতলের দাম ২০৫ পয়সা ফেরত দেওয়া হইবে") কড়া করে মেরে দিলে ম্যাজম্যাজানি পালাতে পথ পাবে না কিন্তু রেজাল্ট হল একেবার উল্টো। অঘোর জ্বর এল। সঙ্গে বমি। দুদিনের পর অচৈতন্য হারবার্টকে দেখে জ্যাঠাইমা ধন্‌নাকে বলল। ধন্‌না গজ্‌গজ্ করতে করতে সেলুনের পাশে হোমিওপ্যাথ শেতল ডাক্তারকে ডাকল। ফল কী হল বোঝা গেল না। জ্বর আরও বেড়ে গেল। শুরু হল ভুল বকা।

—"আধলা ঝাড়ব! আধলা ঝাড়ব!" চেঁচিয়ে উঠে হারবার্ট আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখছিল একটা জায়গায় সে আটকে গেছে। গলির মধ্যে। ওখানে ভীষণ নোংরা আর পেছল। কিন্তু ফিরতে পারছে না। কারণ ময়লার মধ্যে এক চোখ কানা একটা ঘেয়োবেড়াল বসে আছে। গেলেই কামড়াবে। তাকে মারবে বলে হারবার্ট একটা আধলা ইট তুলে চেঁচায়,—ঘেয়োবেড়াল কামড়ালে আধলা মারব। আধলা ঝাড়ব।

ডাক্তার, সোমনাথ ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কোকা জলপট্টি দেয়। কী আরাম। দোতলায়, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওপরের কোথায় ঘরে, মোমবাতি নিভিয়ে দেবার জন্যে যে নিচু হয়েছিল সে ঝুঁকে দেখছে কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না...আবার ঘেয়োবেড়ালটা তেড়ে আসে ...

—আধলা ঝাড়ব! আধলা! ঝাড

একবাব জ্ঞান ফেবে হাববার্টেব। যেন জলেব তলা থেকে ঘবটাকে দেখছে। জ্যাঠাইমা, সোমনাথ, বুলান, কোকা জানলা

—জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা!

—বল্ বাবা। আমি শুনচি।

—বড দুব্বল লাগচে।

—জ্বর হযেচে তো। সেবে যাবে বাবা।

—বাব বাব ঘেযোবেড়াল কামডাতে আসচে।

—আব আসবে না। আমি তাডিযে দেব এলেই।

—আসবে না?

—না, আসবে না।

ঘেযোবেড়াল আব আসেনি। কিন্তু সেই বাতেই হাববার্টেব চোখে শুধু তলাব দিকের আধখানা আছে এরকম কযেকটা মানুয চিৎকার কবে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। কোমবেব ওপর থেকে কিছু নেই। ঘবে চেয়াবে বসে ঢুলছিল সোমনাথ। হাববার্টেব গোঙানি শুনে সে আলো জ্বেলেছিল। হাববার্টেব চোখগুলো এদিক ওদিক কবছিল। পবে একটু ঘাম হল। হাববার্ট আবাব ঘুমিযে পডল। সোমনাথও ঘুমিযে পড়ল। বাকি বাতটুকু শোভাবাণী ছেলেব কপালে হাত বুলিযে দিযেছিলেন। বিলিতি ইউডিকোলনেব কী সুগন্ধ!

পবেব দিন সুধীব ডাক্তাবকে খবব দেওযা হল। বাডিতে এলে কুড়ি টাকা ভিজিট। অনেকক্ষণ ধবে দেখলেন। শেযে বললেন,—বিশ্রী একজাতেব ডেঙ্গু খুব হচ্ছে আজকাল। অবস্কিওব ভাইবাল অবিজিন। ধবে যাবে, টাইম নেবে। একটা অ্যান্টিবাযোটিক ক্যাপসুল দিলাম। দিনে তিনবাব কবে অন্তত দশ দিন চলবে। সঙ্গে একটা ভিটামিনও দিলাম। তা না হলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। হাল্কা খাবার চলবে। ম্যাক্সিমাম বেস্ট।

ধন্না জিজ্ঞেস কবল, ভাত খাবে কবে ডাক্তাববাবু?

—এখনই খাক না। একটু পেস্ট কবে খাইযে দিন না। লাইট খাবাব, সুপ .

দিন সাতেক পবে হাববার্ট একটু সুস্থ বোধ কবতে শুরু কবল। অসম্ভব ঘুমোত। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি হযে গিয়েছিল। ওষুধ, তারপব মাগুবমাছ, মুসাম্বি—এসবেব খবচ জ্যাঠাইমাই দিয়েছিল। হাববার্টেব তোরঙ্গ খুলতে হযনি। হারবার্ট যখন অচেতন তখন একদিন সুরপতি মাবিক এসেছিল। তাব কাজ কিছুটা এগিযেছে সেটা জানাতে। হারবার্টেব শবীরের খোঁজখবর ছেলেদের কাছ থেকে নিয়ে গিযেছিল। ভালো ডাক্তার দেখেছেন শুনে আশ্বস্তও হয়েছিল। ছেলেদেব বলেছিল—যাই হোক, একটু সুস্থ হলে বলবেন একেবাবে চিন্তা না কবতে। একদম প্ল্যানমাফিক কাজ এগোচ্ছে। ওঁর বিষযে দুটো ইংরিজি লেখা বেরোবার কথা আছে। কিছুদিনের জন্যে আমি একটু সাউথে যাচ্ছি। সেই সময় যদি লেখাগুলো বেব হয় তাহলে ফিরে এসে, সেগুলোর কাটিং নিয়ে আমি আসব বলবেন। চলি ভাই। খুব কবছেন আপনারা যা হোক। এরকম আজকাল তো দেখাই যায় না। পাড়াব ব্যাপাবটাই তো লোপাট হয়ে যাচ্ছে কলকাতা থেকে। বড় ভালো লাগল ভাই। বলবেন কিন্তু মনে করে। গুড নাইট! গুড নাইট!

ওদের সকলকে ক্লাসিক সিগাবেট খাইয়েছিল মাবিক। এবং কথাগুলোও সে ফালতু বলেনি। এপ্রিলের শেষ রবিবার আর তার আগেব সপ্তাহের শনিবার দুটো ইংরিজি কাগজে দু-দুটো লেখাই বেরোল—'ডেড স্পিকস্ ইন দা ডিভাইন সুপারমার্কেট' এবং 'মেসেজেস ফ্রম দা আদার

সাইড'। ঠিক লোকদের নজরে লেখাগুলো ঠিকই পড়েছিল। এ ছাড়াও হারবার্ট সম্বন্ধে আরও বিশদ খবরাখবর চেয়ে ঐ দুটি কাগজের দপ্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফেট', 'জেটেটিক স্কলাব' ও ইংল্যাণ্ডের 'ফর্টিয়ান টাইমস' এবং 'আনএক্সপ্লেইনড্' পত্রিকা থেকে চিঠি এসেছিল।

সারাদিন প্রায় অকাতরে ঘুমোত হারবার্ট। জেগে থাকলে যদি পড়তে ভালো লাগে তাই ডাক্তার ওকে কান্তি পি. দত্তের লেখা 'ভূতের জলসায় গোপাল ভাঁড়' দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা লাইনের বেশি ও পড়তে পারত না। ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম ভাঙতে দেখত বিকেলের আধমরা আলো বন্ধ জানালার শার্সিতে লেপটে আছে। ঘরের মধ্যে তারপর আলো আরও কমত। কোনো বাড়ি থেকে রেডিওর গান হয়তো আসছে না আসছে না। শালিখ পাখিগুলো গলির কার্নিসের ফাঁকফোঁকরে ফিরে আসছে। ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত কেউ। আবার ঘুম। ঘুম ভাঙতে দেখল ঘরে দু-চারজন পাড়ার ছেলে। চুপ করে বসে আছে।

—রোজগারপাতি তো বন্ধ হয়ে গেল রে! এ শালা কী জ্বরবে বাবা। হাড়মজ্জা সব যেন ক্যাঁকলাসে শুষে খেয়েচে!

—কদিনের মধ্যেই তাগড়া হয়ে যাবে হারবার্টদা। আর আমরা তো আচি।

—হারবার্টদা, একটা কতা, সাহস করে বলব গুরু? আগে বলো রাগ করবে না।

হারবার্ট জানত ওরা কী বলবে। বলত, তোরঙ্গ খুলে নে না। তবে হ্যাঁ, উকিলের ছেলেকে চাইলেও কোনো পয়সা দিবিনি।

—না, গুরু। আমরা শুধু নিজেদের জন্যে কুড়ি নেব।

—নে না। কুড়ি, পঁচিশ যা দরকার নে। ওঃ শীত করচে রে।

—চাদরটা টেনে দিচ্চি।

—কেউ ঘরে থাকবি তো?

—সে কি গুরু! একজন শুদু যাবে আর আসবে।

—যাবে আর আসবে। সে বরং ভালো। যাবে আর আসবে। .. যাবে .. আর...

হারবার্ট আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

"যাঁহারা সামুদ্রবিদ্যায় বিশারদ, তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক মানুষই আপন আপন কর্তব্যকর্মের ও কর্মফলভোগের তালিকা বা বিবরণসহ জন্মগ্রহণ করে। সে তালিকা তাহাদের পূর্বকর্মানুসারে বিধাতা কর্তৃক অথবা নিয়তি কর্তৃক প্রস্তুত হয়। সে তালিকা কী?"

ঘুমন্ত হারবার্টকে দেখতে অপূর্ব লাগে। সে যদি জলেও নিমজ্জিত থাকে সেই জলাকাশেও চাঁদ ও সূর্য ওঠে। তারকারা বিস্ফারিত চোখে আলোকবর্ষ দূরে আলো পাঠায়। সেই আলো চোখের পাতায় লাগলে জন্মান্ধও চমকিত ও শিহরিত হয়।

"যেমন মনুষ্য এক জাতি, ইহার অবান্তরজাতি অনেক, তেমনি, ভূত এক জাতি, ইহার অবান্তরজাতি অনেক। অপিচ, ভূত জাতীয় জীব সমস্তই যে তুল্যধর্মা বা তুল্য স্বভাবসম্পন্ন, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যেও বিশেষ ভাব বা তারতম্য ভাব প্রচুর পরিমাণে আছে। উহাদের মধ্যে জ্ঞানী ভূত ও মূর্খ ভূত, শান্ত ভূত ও অশান্ত ভূত, সমস্ত ভেদই আছে, ইহা ভূতবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।"

(পঃ রঃ)

জাহাজের আলো জ্বলে ওঠে। পেছন ফিরে থাকা কাঠের হাতি এপাশে মুখ ঘুরিয়ে শুঁড় দোলায়। ঘেয়োবেড়াল আসতে চেষ্টা করেছিল, হাতি পা ঠোকাতে পালিয়ে যায়। মামদো ভূতের সঙ্গে গোপালের মোলাকাৎ হয়। হারবার্ট কাচের মিছরি চেটে চেটে গলিয়ে দেয়। 'গোপাল

কাঁপতে কাঁপতে জিগ্যেস করল : আপনি কে? আমি মামদো ভূত।' পাথরের চেয়াবটেবিল হাওয়ায় ওড়াউড়ি করে। পরী প্রজাপতি বা মথেব মতো কাচের ঘরে উড়ে বেড়ায়। ঘুমের মধ্যে চমকে, চমকে জেগে উঠেছিল হাববার্ট। ১৯৯২ সালের মে দিবস। রাশিয়াতে বরিস ইয়েলৎসিন জব্বর ভূতের জলসা বসিয়েছেন। লাখ লাখ কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিজমেব ভূত দেখছে। সলঝেনিৎসিনেব ছদ্মবেশে বাসপুটিন ফিবে আসছে। যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে পড়ছে। ক্রোশিয়ান টেনিস খেলোয়াড় গোরান ইভানিসেভিচ ভাবছে প্রচণ্ড গতিতে সার্ভ করে জিম কুরিয়াব বা আন্দ্রেই আগাসিকে পুঁতে ফেলবে। শেষবার এক দেশের দল হিসেবে সুইডেনে খেলতে যাবে বলে তৈবি হচ্ছিল কমনওয়েলথ্ অফ ইণ্ডিপেনডেন্ট স্টেটস বা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন। একীভূত জার্মানি ভেবে পাচ্ছে না কাদেব দিয়ে দল গড়বে—পূর্ব না পশ্চিম? বম্বেতে বসে হবশদ মেহতা বলে একটা লোক দিল্লি থেকে ছক অনুমোদনেব টেলিফোন পাবে বলে অপেক্ষা করছিল। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভেকিয়া, বুলগেবিয়া, রুমানিয়া, আলবেনিয়া জুড়ে মহা হট্টগোল। কমিউনিজম কেলিয়ে পড়েছে। এবকম সময়েই হাববার্ট, কলকাতায়, ১৯৯২ সালেব মে দিবসেব বণধ্বনি শুনে ভেবেছিল যে রাযট লেগেছে না দেশ স্বাধীন হল না তেরো জন অশ্বাবোহী অবলীলাক্রমে .

১৬ মে হারবার্ট অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ কবে ছাদে উঠেছিল এবং সন্ধ্যায় ছাদে সে অবসন্ন ও আধা-অজ্ঞান হযে পড়ে। সে সময় আকাশে সপ্তর্ষি, মৃগশিরা, কোয়াসাব, পালসাব, ব্ল্যাক হোল, হোযাইট ডোযার্ফ, বেড জায়েন্ট—সব শালাই ছিল। ঈষৎ চৈতন্য ফিরতে হারবার্ট দেখেছিল যে দশটি নখ সহ দুটি বিশাল পা-এব সামনে নতজানু হয়ে আছে যাঁব হাঁটু তিন তলা, তাবও ওপবে তাঁব বিশাল লিঙ্গ, দোদুল্যমান অণ্ডকোষ, জাম্বো যৌনকেশ ও তারও ওপরে, এতই গগনচুম্বী যে প্রায় ধোঁযা ধোঁযা। সে গগনবিদাবী স্ববে বলেছিল, হাঃ হাঃ হারবার্ট, ললিতকুমাবের ঔরসে ও শোভাবাণীর গর্ভে নির্মিত, স্কাউন্ড্রেল, হতভাগ্য বানচোৎ হাববার্ট গড় কব্, গড় কব্

.

—আপনি কে?

—শূওবেব বাচ্চা! আমি কে? আমি ধুঁই।

—আপনি ধুঁই? আপনিই!

—চোপ্। একটা কথা বললে মুখে পা ভবে দেব। ঐ দেখ আমার বাপ লম্বোদর। মেঘ নয় রে, ঐটাই। ঐ দ্যাখ, নিশাপতি। তাব পেছনে ঐ যে চিল্লোচ্চে, ঐটে শ্রীধর।

—আজ্ঞে, চিল্লোচ্চে কেন?

—কর্মদোষে ভগন্দর। চিল্লোবে না তো কী গান করবে? যা হোক, অ্যাণ্ডায় গণ্ডা মেরে তো ভালোই চালাচ্চিস! শালা খচ্চর।

ধুঁই হুহুংকার করে। হারবার্ট গড় করে কিন্তু পরপর অন্য কত ফটো মানুষ ত্রিমাত্রিক হয়ে তাকে নিয়ে লোফালুফি করে যেন সে বল। অপুত্রক কেশব ও হরিনাথ অবিরাম রক্তবমন প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। ধুঁই বলেন, এ বলে চাঁপার গন্ধওলা মদ এক হাঁড়ি খাব তো ও বলে কলার সেন্ট ওলা মদ দু হাঁড়ি খাব! ওদের মদ আসত চন্দননগর থেকে। লিবার্টি, ইকুয়্যালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি!

—তারপর?

—চোপ্। মালের কম্পিটিশন একবার শুরু হলে কখনও থামবে না। কল্পান্ত অবদি চলবে। কপাৎ।

—দোহাই আপনাব, কপাৎ বলে মুখ বন্ধ করবেন না।

—তোর তো দেখছি খুব জানার ইচ্ছে। তবে দ্যাখ—ঐ যে সাধুকে দেখছিস, লিঙ্গে লোহার কড়া পরে লাফাচ্ছেন, ওঁকে চিনিস?

—আজ্ঞে না তো!

—তা চিনবে কেন? চিনবে তো যত নষ্টা বেবুশ্যে লেডি ডাক্তার। ও হল সংসাবত্যাগী গোপাললাল। প্রশ্ন থাকলে কর!

—উনি সংসারত্যাগ কবলেন কেন?

—কেন? কেন? শুনবি?

—শুনব।

—গৃহে আশ্রিত পাচকেব মেয়ের পেট হয়েছিল বলে।

মুণ্ডহীন কেউ হা হা রবে রোদন করতে করতে এসে সরবে পর্দন ও বিষ্ঠাত্যাগ কবে।

—উনি কে?

—উনি নয়। ঐ বানচোৎ কে বল্। ঐ হল পুষ্যিপুত্তুর ঝুলনলাল। ওরই গলা কেটে তো বিহারীলাল পিউ কাঁহা আর তোর বাপেব জন্ম দিয়েছিল। আর ঐ যে দেখছিস দূরে বসে রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একমনে লুডো খেলছে ওর ঠ্যাঙের নখগুলো একবাব মাথায় ঠেকা। এ হল বারাণসীলাল। ব্যবসায় মেতেছিল ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে। কামুক সাহেবদের নেটিভ মাগী সাপ্লাই দিত।

—তারপর?

—তারপর? তারপর সব বোকাচোদা। তবে হ্যাঁ আমাদের গিন্নিগুলো ভালো ছিল। শঙ্খিনী বা পদ্মিনী কম, দু-একটা, হস্তিনীই বেশি। ওদের আর একদিন দেখাব।

লম্বোদর হঠাৎ লাফিয়ে নামে। সে উদরই শুধু। হারবার্ট গড় করে।

—মুক্তি চাস? হাববার্ট! হারা! আত্মহারা! শ্যামা বা দক্ষিণা কালিকার ধ্যান কব। ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং ...

শ্রীধর বলে, ওসব ভাট বুক্‌নি ছাড়। আদ্যকালী বাদে কেউ নেই রে। হাক, হারাধন .

হ্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা!

হারবার্ট টাল খায়। ক্রীং ক্রীং, গুহ্যকালিকে ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্মশানকালিকে ওঁ কালী করালবদনা নিমগ্নরক্তনয়না চামমাংসচর্ব্বণ তৎপরম। পোষ্যপুত্র, নিহত ঝুলনলাল হেগো পোঁদে মুণ্ডহীন নাচ নেচে চলে। কোথা হতে আবার সুট পরা ললিতকুমার এসে 'লাইট! লাইট!' বলে চেঁচায় এবং দোতলায় জ্যান্ত জ্যাঠামশাই যথারীতি 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা' বলে যেতে থাকেন এবং এই পর্ব যখন শেষ হয় তখন গগনচুম্বী ধুঁই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে মারাত্মক পরমাণুতে পরিণত হচ্ছেন অথচ তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই কানের সহ্য করার ডেসিবেল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

—হারবার্ট, তুই কাঠের চিতায় পুড়বি... হারবার্ট, তুই কাঠের চিতায় পুড়বি ... হারবার্ট, তুই কাঠের চিতায় পুড়বি ...

১৭ মে, ১৯৯২, হারবার্ট একটি চিঠি পেয়েছিল। চিঠিটি সাদা কাগজে টাইপ করা। তার বয়ান ছিল এইরকম :

মহাশয়,

সংবাদপত্র ও লোকমুখে আপনার 'অলৌকিক' ক্ষমতার সম্বন্ধে জানতে পেরে এই চিঠি

আপনাকে দেওয়া হল। আমরা, যুক্তিবাদী সঙ্ঘের কর্মীরা, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বহু জ্যোতিষ ও বাবাজী ব লোক ঠকানো ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছি। এ বিষয়ে আপনি কতদূর জানেন আমরা খবর রাখি না। তবে আপনার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন নিছকই ভণ্ডামি, মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আপনি যেটা করছেন সেটা জালিয়াতির ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামী ২৫মে, আমি ও আমাদের সঙ্ঘের কর্মীরা বেলা ২টো নাগাদ আপনার দপ্তরে যাব। যে সংবাদপত্রে আপনার সম্বন্ধে বচনাদি প্রকাশিত হয়েছে সেই সংবাদপত্রের সাংবাদিক প্রতিনিধিরাও থাকবেন। এই চিঠি পাওয়ার পরে, তিন দিনের মধ্যে আপনি যদি আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করে অবিলম্বে এই জাল ব্যবসা বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতি না দেন এবং আপনার 'অলৌকিক' কার্যকলাপ যে নিছক ভণ্ডামি তা লিখিতভাবে স্বীকার না করেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আমাদের চ্যালেঞ্জ আপনি গ্রহণ করছেন।

ইতি

প্রণব ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সঙ্ঘ

হারবার্ট চিঠিটা ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিয়েছিল।

—ইল্লি! বইতে সব বড় বড় লোক, কত উকিল মোক্তার মেনে নিল আর কোত্থেকে উড়ে এসে বলচে কিনা এসব ঢপবাজি। আবার কোতাকার কে ঝাঁটের লোম, তার কাচে গিয়ে কিনা বলতে হবে। মামাবাড়ির আবদার-রে আমার! ওরে কেরে? দুটো আমড়া ভাতে দেবে! হরিনাম খাবলা খাবলা। আয় না গুখেকোরা, এমন রেত্তান্ত শুনিয়ে দেব যে ধুড়ধুড়ি নড়ে যাবে। কোনো ঝামেলায় নেই, ঘর থেকে বেরোচ্চি না, কাউকে ফুঁসলোচ্চি না, স্বপ্ন পেয়ে কারবার খুলেচি আর শালাদের জ্বালা ধরেচে খুব। এই করে বাঙালিরা মরল। মরগে যা।

হারবার্ট সোৎসাহে 'ভূতের জলসায় গোপাল ভাঁড়' পড়তে থাকে।

আট

"দুরন্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তার চাপি অকস্মাৎ,
মুহূর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ।"

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

সোমবার, ২৫মে, ১৯৯২। হারবার্ট চায়ের দোকানে বলে রেখেছিল যে চা লাগবে কয়েকটা। সকালে একটা লোকও এসেছিল। বর্ধমান থেকে। তাকে বলেছিল যে আজকে হবে না। পরের সপ্তাহে আসতে। তাকগুলো ঝেড়েঝুড়ে বইগুলো সাজিয়ে রেখেছিল। নির্মলাকে বলতে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিয়েছিল। মারিক অবশ্য বলে গেছে যে মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসবে। কাজটা তবে এগোচ্ছে। মারিক লোকটা বেশ দিলদরিয়া। কিছু না হতেই কেমন মদ-সিগারেট খরচা করে গেল। দিল্ না থাকলে হয়? হারবার্ট ভাবতেও পারেনি যে দুপুরবেলা কতজন আসবে। তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নেবে। কিন্তু ঘুম এল না। ওদের পাঠানো চিঠিটা নিয়ে আবার পড়েছিল। পড়তে পড়তে মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটেছিল। একটা মাছি ঢুকেছিল ঘরে। শার্সির গায়ে ভন্‌ভন্ করছে। কয়েক পা হাঁটছে। আবার উড়ে দুপাক খেয়ে ফিরে আসছে।

মাছিরা মরলে কী হতে পারে ভাবছিল হারবার্ট। এমন সময় চায়ের দোকানের পাঁচু ওদেব নিয়ে এল।

—এইতো ঘরটা। কাকাবাবু, আপনাকে খুঁজচে। নাম বলতে নিয়ে এলাম।

এত লোক! পাঁচ-সাতটা ছেলে। কয়েকজনের চশমা। দাড়ি। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো। দুটো মেয়ে। বলা কওয়ার তোয়াক্কা না করেই ওরা ঢুকতে থাকে। হারবার্ট দেখল বাইরে ভাবি চশমা পরা লম্বা একটা লোক সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়েকে আঙুল দিয়ে তার সাইনবোর্ডটা দেখাচ্ছে। মেয়েটা কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা তুলে সামনের নলের মতো কালো কাচটা ঘোবাল, ছবি তুলল। একটি ছেলে বলে—আপনিই হারবার্ট সরকার। প্রণবদা ভেতরে আসুন।

ঘরে একটাই চেয়ার। তাতে বসে প্রণব ঘোষ। এই লোকটাই তাহলে চিঠি দিয়েছিল। সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটা ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ফ্ল্যাশ জ্বেলে কয়েকটা ছবি তুলল হারবার্টেব, ঘরের। হারবার্ট খাটের কোণের দিকে সবে যায়। বালিশ সরায়। ওদের খাটের ওপবেই বসতে বলে। দু-একজন বসে। কেউ দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ায়। জিনস্ প্যান্ট আর শার্ট পরা যে একটু পরে ঢুকেছিল তাকে প্রথমে ছেলে ভেবেছিল হারবার্ট। সে একটা ক্যাসেট টেপ বেকর্ডার রেকর্ডিং-এর নব টিপে খাটের ওপর বেখেছিল। প্রণব ঘোষ চশমাটা খোলে। হাই পাওয়াব চশমা খুললে চোখটা কেমন ভাবলেশহীন হয়ে থাকে। গলার আওয়াজটা ভারি—

—আপনি যখন এলেন না তখন বোঝাই গেল যে আমাদের চ্যালেঞ্জ আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন।

চ্যালেঞ্জ শব্দটা চিঠিতে ছিল। কিন্তু শব্দটা প্রণব ঘোষেব মুখ থেকে এত ধারালোভাবে বেরিয়ে আসে যে হারবার্টের বুকটা কেমন করে ওঠে।

—না মানে, চিঠিফিঠি তো লিকি না অত। আর কোথায যে আপনাদের দপ্তর। ভাবলুম সে কী আর হবে গিয়ে। আর তাছাড়া কী অন্যাযটা করেচি যে যেতে হবে। শরীবটাও ভালো নেই। ডেঙ্গু হয়েছিল। সবে উঠেচি।

—সে না হয় হল। কিন্তু এই যে বললেন অন্যায় করেননি সেটা কিন্তু ডাহা মিথ্যে কথা। সাঙ্ঘাতিক অন্যায় করেছেন আপনি। করে চলেওছেন।

—কী অন্যায়টা করেচি, যদি করেই থাকি তো বলুন না। দাঁড়ান, দাঁড়ান, জানলাটা খুলে দি। গরম হচ্চে ঘরে।

—অন্যায় মানে? প্ল্যান করে লোক ঠকিয়ে চলেছেন, কতগুলো আজগুবি ননসেন্স শুনিয়ে টাকা নিচ্ছেন লোকের কাছ থেকে আর বলছেন কিছু করেননি।

—কাকে ঠকিয়েচি? কোনো শালা এসে বুক ঠুকে বলুক না, কাকে ঠকিয়েচি?

হারবার্ট রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। একটা ছেলে ঠাণ্ডা গলায় বলে—এই, একদম গলা তুলবেন না। স্ল্যাং ইউজ করবেন না। বলেই ছেলেটা ক্যামেরা কাঁধে মেয়েটাকে বলে—এদের এক্সপোজ করলেই দেখবেন গলাবাজি শুরু করে দেয়। ভাবে এইসব মেলোড্রামা করলে পার পাওয়া যাবে।

মেয়েটা বলে—বাট হি সিম্‌স টু বি এ ডাড। মিকি, প্রোফাইলটা কিন্তু অনেকটা মন্টি ক্লিফ্‌টের মতো না।

মিকি নামক মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—ও, হি ইজ এ সুইট, কিউট স্মল টাইম ক্রুক।

প্রণব ঘোষও হেসে ফেলে—এক্স্যাক্টলি।

হারবার্ট রেগে যায় আবো।

—ও ইংরিজি করে বলে ভেবেচেন ভেবড়ে দেবেন সেটি হবে না। ইংরিজি মারাচ্চে।

প্রণব ঘোষ একটু গলা তোলে—প্রমাণ দেব? কীভাবে আপনি লোক ঠকিয়েচেন?

—দিন না, ক্ষ্যামতা থাকে তো দিন না।

—আপনার কাছে টিনা বলে একটি বিদেশী মেয়ে এসেছিল না?

সুন্দবী যুবতী বেলজিয়ান অভিনেত্রী টিনা। কী সুন্দর দেখতে। কটা কটা চোখ। খালি খিল খিল করে হাসে। শুধু মা-ব কথা বলাব সময় মুখটা কেমন ভার হয়ে গিয়েছিল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল—বড় মায়া হযেছিল হাববার্টের।

—হ্যাঁ, এসেছিল তো। সঙ্গে একটা ডাক্তাব ছিল, কী যেন নাম।

—টিনাকে আপনি কী বলেছিলেন। আমার কাছে ক্যাসেট আছে, শুনবেন?

হাববার্ট এসবেব কোনো থই পায না। কী যে সব হচ্ছে! কেন হচ্ছে! প্রণব ঘোষ যে ক্যাসেটটা ভরা ছিল সেটা বাব করে। অন্য একটা ক্যাসেট বসায়। প্লে করে তার ওপরেই ফাস্ট ফরোয়ার্ড কবে ফলে কিঁচকিঁচ প্যাঁক প্যাঁক নানারকমের উদ্ভট শব্দ হয়। স্টপ কবে চালায়। টিনার হাসি। হাববার্টের গলা—ভেরি গুড' ভেবি গুড! ডাক্তাবেব হাসি, রাস্তাব শব্দ। স্টপ। ফাস্ট ফরোযার্ড। ঘ্যাব ঘ্যাব করে ক্যাসেট ছোটে। স্টপ। প্লে। হাববার্ট নিজের গলাব আওয়াজ শোনে—হ্যাঁ, এরকমই সব আজব বন্দোবস্ত। ওব মা তো ভালো আচে দেখচি। পঞ্চম স্তরে, মধ্যমধার্মিকরা যেখানে থাকে। ও ডাক্তাবমশাই, ওকে বলো, একেবারে যেন মন খারাপ না কবে। ক'জন যেতে পারে ঐ পাঁচতলায়। বেশির ভাগই তো এক বা দোতলার বাসিন্দা—ওব মা তো দেখচি মেরে দিয়েচে গো ডাক্তাব। আর একটা তলা উঠলে তো মহা আনন্দ—ওঃ সে তো মুক্ত হযে যাবে গো!

ডাক্তাবেব গলা।

—যা বললেন ওকে একটু বলে দিই।

হারবার্ট—হ্যাঁ ভাই, বলে দাও। শুনে মন প্রফুল্ল হোক।

ডাক্তার—হি ইজ সেযিং দ্যাট ইওর মাদাব ইজ নাউ ইন দ্য ফিফ্থ প্লেন হুইচ ইজ দা রেল্ম্ অফ বিংস উইথ 'মধ্যম ধার্মিক'—বিংস উইথ মডাবেট ভাবচুস

টিনা—হোয়াট, ও ইযেস, হাউ এক্সাইটিং, টেল হিম দ্যাট হি ইজ মার্ভেলাস, আ মাস্টার

ডাক্তাব—টিনা বলছে যে আপনি খুব অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।..

স্টপ। প্রণব ঘোষ ক্যাসেটটা বার করে। যে ক্যাসেটটা চলছিল সেটা ফের বসায়। চশমাটা রুমালে মুছে পরে। তাবপবে, বেকর্ডিং-এর নব্ টেপে—আপনি জানেন টিনা কে ছিল। ও হচ্ছে জেনিভা বেসড ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের মেম্বার। লন্ডনের ঐ টিবেটান লামাটা, যেটার কাছে পলিটিশিয়ানগুলো কেনা ছিল, সে এখন ঐ টিনার ফাঁদে পড়ে জেল খাটছে জানেন? মেক্সিকো, ব্রেজিল, ফিলিপাইন যত সব মির‍্যাকল হিলার কতজনকে ও ফ্রড বলে প্রমাণ করেছে জানেন? আমবাই টিনাকে পাঠিয়েছিলাম—এখানকার একটা টিপিক্যাল স্যাম্পল দেখতে।

—সে কী করে হবে? সঙ্গে যে একজন ডাক্তার ছিল, আমার কতার তজ্জমা করচিল।

—ডাক্তাব? হ্যাঁ, অলোক ডাক্তার ঠিকই। ও আমাদের সংগঠনের একজন ফাউণ্ডার মেম্বার।

—তাতে করে হলটা কীরে বাবা!

—কী হল? ধরা পড়ে গেল যে আপনি ঠক। বুজরুক। টিনার মা বহাল তবিয়তে জীবিত।

আর আপনি একেবারে ফিফথ প্লেনে পাঠিয়ে দিলেন? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি তো অশিক্ষিত—এগুলো এফিসিয়েন্টলি করতে হলে যে সফিস্টিকেশন লাগে সেটা আপনার নেই। থাকলে 'স' দিয়ে শান্তার নাম লিখতেন না। বিমলেন্দু নাম করা একটা থিয়েটার গ্রুপ-এ আছে। যে এসেছিল আব কী আপনাব কাছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ ট্রাংকের মধ্যে বোনেব বডি ইন সো মেনি পিসেস। ও তো ক্লিয়ারলি মার্ক করেছিল যে অ্যাট দা মেনশন অফ লালবাজাব আপনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বলুন। নিজেকে কী বলবেন আপনি। মৃতের সহিত কথোপকথন।

দাড়িওলা একটি ছেলে বলে ওঠে—ঢপ কম্পানির মেজর জেনাবেল!

সবাই হো হো কবে হেসে ওঠে। হাববার্ট ঘামছে। লাল হয়ে গেছে। তাক থেকে টেনে 'পবলোকের কথা' ও 'পরলোক রহস্য' বের করে।

—এগুলোব নাম জম্মে শুনেচেন? ভাবচেন সব জালিয়াতি? পড়ুন, তবে তো বুজবেন কীবকম কাণ্ড, কীবকম বন্দোবস্ত।

—আমাদের ওগুলো পড়ার দরকার নেই।

ক্যামেরাসহ যুবতীটি 'পরলোকের কথা' উল্টে দেখে বলেছিল—সেই প্ল্যানচেট আর স্পিবিট। বুলশিট।

হারবার্ট চেঁচায়—বুজবেন না, জানবেন না, বাড়ি বয়ে ঝগডা কবতে বেরোন দুপুববেলা, লজ্জা করে না।

—লজ্জাটা কাব করে সেটা বুঝবেন যখন পুলিশ এসে কোমবে দডি দিযে নিযে যাবে।

—কেন পুলিশে নিয়ে যাবে কেন? নিলেই হল?

—হ্যাঁ, নিলেই হল। কাবণ আপনি টিনাকে যেমন বলেছেন সেইসব আগডুম বাগডুম অন্য লোকেদের কাছে বলে পযসা কামিয়েচেন। এটাও এক ধবনের চিটিং। চুরি। আমাদের রিপোর্টটা গেলে কী হয় দেখবেন?

—কী হবে?

—পুলিশ আসবে। আপনাকে অ্যারেস্ট করবে।

—না! পুলিশ আসবে না! আমি স্বপ্ন পেয়েছিলুম। বিনুকে পুলিশ মেবেছিল! গুলি কবে।

হারবার্ট প্রচণ্ড চেঁচাতে আর কাঁদতে থাকে—পুলিশ আসবে না। আমি মিথ্যে বলিনি। ভূত আচে। ভূত থাকবে।

প্রণব ঘোষ মেয়েটিকে ইঙ্গিত করতে সে এই অবস্থায় একের পর এক ফটো তোলে। মেয়েটা সিগারেট ধরায়। দবজার বাইরে পাড়ার ছেলেদের ভিড়। ওরাও সামনে থাকছে না। পুলিশের কথা শুনে সরে গিয়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে যে ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল সে বলে—এইসব মালের ওষুধ হল স্ট্যালিন। পড়ত স্ট্যালিনের হাতে। স্ট্রেট ফায়ারিং স্কোয়াড।

হারবার্ট ভয় তো পেয়েইছে, তবু চেঁচায়—ও লেলিন-স্ট্যালিন আমরাও নাম করতে পারি। পুলিশ আসবে না। নিদ্দোষকে পুলিশ কিছু কবে না। পুলিশ তোদের ধরবে। তোদের গায়ের কাচে যমদূত ঘুরে বেড়াচ্চে।

—ঠিক আছে, আমরা চললাম। টিনার রিপোর্টটা পেলেই আমরা মুভ করব।

—চোপরাও। ইংরিজি মারাচ্চে। আমিও দেখে নেব। খালি ইংরিজি বলচে। দোবেড়ের চ্যাং দেকেচো? দোবেড়ের চ্যাং দেকবি?

—ওসব করছেন করুন। তবে আমরা জানবেন, শুধু আপনাকে কেন, আপনার মতো একটা

জোচ্চোবকেও ছাড়ব না। সব তান্ত্রিক বাবাজীর বাবোটা বাজাব আমরা। ছাড়ব না।

—ঠিক আচে, ঠিক আচে। আমরাও দেখে নেব।

আমবা বলতে কাদেব বুঝিয়েছিল হাববার্ট সেটা স্পষ্ট নয়। ওরা যখন বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হাববার্ট নেচে নেচে বলছিল—হায, হায়, আমি কী দিনু। ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটাব, ডগ, ফিশ! ক্যাট, ব্যাট, ওযাটাব ডগ, ফিশ।

নাচতে নাচতে মাথা ঘুবে যায় হাববার্টের। খাটেব গাযে ধাক্কা খায়। মেঝেতে পড়ে যায হাববার্ট। আবাব ওঠে। যত ভয কবে তত দাপাতে থাকে। ঘামছে দরদর কবে। হঠাৎ থেমে গিযে বিনুব খাট, তোযক, বালিশ দেখে। বিনুকে গুলি কবে মেবেছিল পুলিশ। পুলিশ কি তাকেও মাববে। আব টিনা। এইবকম ধর্মঘাতক মেযে হয কে জানত? কী পাপিষ্ঠ নারী' এই, এই ছিল তোব মনে।

—ক্যাট, ব্যাট, ওযাটার, ডগ, ফিশ, ক্যাট, ব্যাট, ওযাটার, ডগ, ফিশ, ক্যাট, ব্যাট ..

বাস্তায় বেবিযে প্রণব ঘোষকে মাঝখানে বেখে ওরা হাঁটছিল। মিকি বলল— লোকটা কিন্তু ভীষণ ক্রুড প্রণবদা।

—তাতে কী? এ দেশে যতই ক্রুড হোক না কেন ক্লায়েন্টের অভাব নেই।

একটি ছেলে বলল—বারুইপুবেব লেভিটেশন-এর সেই কেসটা! কি যেন নাম ছিল লোকটাব?

—মোসলেউদ্দিন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোসলেউদ্দিন। ও লোকটা কিন্তু ট্রিমেণ্ডাস চালাক ছিল।

—তা যদি বলো তাহলে বিয্যালি ক্লেভাব প্যাক ছিল ঐগুলো।

—কোনটা প্রণবদা! সেই তাবাপীঠ?

—না না, ঐ যে, সাতটা অ্যাস্ট্রোলজাব, টিভিতে হল না!

—তবে প্রণবদা, ওবা হচ্ছে টোটালি আরবান। চালু তো হবেই।

—কেন, হারবার্ট আববান নয়?

ওবা চুপ কবে থাকে। প্রণব ঘোষও কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকে। তারপব বলে—এক একসময আই ওয়াণ্ডার যে কেন এগুলো লোকে করে। তোমবা যদি মনে কর প্রত্যেকেই ছক করে এগোয, লাইক ক্যাসানোভা, ভুল কববে।

মিকি অবাক হয।

—কোন্ ক্যাসানোভা প্রণবদা?

—যে ক্যাসানোভাকে তুমি চেন, দা গ্রেট লেডি কিলাব। সে না হয়, খুব চালাক ছিল। মেযেদেব ইমপ্রেস করার জন্যে অকাল্টিস্ট বলে নিজেকে চালাত। কিন্তু ক্যাগলিওস্ত্রো কেন করত? রাসপুটিনকে এক্সপ্লেন কবা তো সোজা। লোকটা গেটে-কেও ইমপ্রেস করেছিল। গ্রেট রাসক্যাল। অথবা দা কাউন্ট অফ সাঁ-জরমেঁ। ফ্যাসিনেটিং। ইন কমপ্যারিজন এই এক্ষুনি যাকে দেখলে তাকে কী বলা যায় বল তো? গোপাল ভাঁড়!

যারা চিঠি দিয়েছিল তারা, তারপর খবরের কাগজের লোক, কলেজের ছেলেমেয়ে—ওরা চলে যাবার পরে কোটন, বড়কা, কোকা, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সোমনাথ, অভয়, খোড়োরবির ভাই ঝাপি, গোবিন্দ—সব ছেলেরা ঢুকে দেখল হারবার্ট থরথর করে কাঁপছে। হাঁসফাঁস করছে, ঘামছে।

জামা খুলে ফেলেছে। টেবিলফ্যানটা এমাথা ওমাথা করছিল আর হারবার্ট তার সঙ্গে সরে সরে হাওয়ার সামনে থাকার চেষ্টা করছিল। ওরা ফ্যানটাকে একমুখো করল। হারবার্টের খাটে তাকে বসিয়ে জল খাওয়াল। চা আনল স্পেশাল। আস্তে আস্তে ধাতস্ত হল হারবার্ট। চোখ

থেকে ভয় যায়নি। বাববার বলছিল—সব গুগলি হয়ে গেল। সব গুগলি হয়ে গেল! ওফ্ . ধুকপুক করচে, ধুকপুক ধুকপুক করচে। এ কী বন্দোবস্ত রে বাবা!

নয়

"দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্রদৃষ্টি নর;
ওই বহ্নি, ওই ধূম! কিবা তাবপব?"
—অক্ষয়কুমাব বড়াল

সকাল ন'টা। সাড়ে ন'টা। দশটা। সাইনবোর্ড-বিহীন ঘব খুলছে না দেখে ধাক্কাধাক্কি। কোকা, বড়কা, সোমনাথও খবব পেয়ে ঘুমনেশা চোখে ছুটে এসেছে মুখে গন্ধ নিয়ে।

—হারবার্টদা! হারবার্টদা!

ডাকাডাকি আর দরজা ধাক্কানোর শব্দ দোতলাব থেকেও পাওযা গিয়েছিল। ধন্না তখন ফুচকাকে বলল—নীচে গিয়ে দেখ্না একবার।

ফুচকা আধখানা গালে সাবান নিয়ে নেমে এল। ব্যবসা করে। আঁচ করল কিছু গড়বড় হবে। ফুচকাই ওদের বলে দরজা ভাঙতে। দরজা ভাঙা হল। ঘরে জমে থাকা মবার গন্ধটা হুশ কবে বেরিয়ে আসে। ফুচকা দৌড়ে ওপবে চলে যায়। ধন্নাকে বলে। হতভম্ব ধন্না দিশেহাবা হযে চিৎকাব করতে থাকে, আত্মঘাতী হয়েছে! ভাই আমার আত্মঘাতী হযেছে।

ধন্নাব বৌ আর নির্মলা নেমে এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে তারা ওপরে উঠে যায়। জ্যাঠাইমা বুঝতে পারেনি প্রথমে। তারপর মূর্ছা গেল। বাড়িব তলায় ভিড় জমছে দেখে কী সুখকর স্মৃতি গিরীশকুমারের মনে জাগ্রত হয়েছিল বোঝাব উপায় নেই। তিনি নিজের উপস্থিতি জানান দিযে বললেন—'পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!'

গোবি, হরতাল ইত্যাদি ধন্নার বন্ধুরা এসে গেল।

—এই, কেউ মড়া ধরবি না। ঘরের কিছু ছুঁবি না।

—জানলাটা খুলে দেব হবতালদা?

—বললাম না কুটোটা অব্দি ছুঁবি না। সুইসাইড কেস। যে ঘাঁটাঘাঁটি কবতে যাবে পুলিশ তাব হালুয়া টাইট করে দেবে।

ধন্না কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসে। সাইকেল নিয়ে পাড়ার ছেলেদের একটা দঙ্গল ছুটল থানায়। থানাব অন-ডিউটি অফিসার শুনল। শুনে বলল, যাঃ শালা। দিনটা ভোগে গেল।

হাববার্ট নির্বিকার। নির্লিপ্ত। ইহলোকের এসব ঝুটঝামেলা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথাই আর ছিল না। লোকের ভিড় আরও বাড়তে লাগল। কোকা, সোমনাথ, গোবিন্দ—সব হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

—কালকেই ক্লাবের টিভি কেনার টাকা দিল। কত খরচ করল। একটুও যদি বুঝতে পারতাম।

মেন্টালি কিছুটা আনস্টেবল দেখাচ্ছিল খোড়োরবির ভাই ঝাপিকে। নিজের দাদার কেসের পর থেকেই ও যেন কেমন কেমন। ও ফুটপাথে উবু হয়ে বসে থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিল, হয়ে গেল! হয়ে গেল!

একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এল। অফিসার আর জনা তিনেক কনস্টেবল। ভিড় সরে

জায়গা করে দিল।

সব দেখেটেখে অফিসাব বলল, সুইসাইড নোট ফোট কিছু রেখে গেছে? কেউ কিছু বলতে পারে না। অফিসারটিই তখন কাছে গিয়ে একহাতে নাক টিপে অন্য হাতে চিত হয়ে শুয়ে থাকা হাববার্টেব বুকপকেট থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বেব করল।

সেই কাগজে লেখা ছিল,

চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগবে চলল।
দোবেড়েব চ্যাং দেকবি? দোবেড়েব চ্যাং
দেকাব? ক্যাট ব্যাট ওযাটার ডগ ফিশ

হারবার্ট সরকার—

পুলিশ অফিসার নোটটি পড়ে বলল, বাপেব জন্মে এমন সুইসাইড নোট কেউ দেখেনি। লোকটা কি পাগলটাগল ছিল নাকি।

হবতাল বলেছিল, ঠিক পাগল নয়। একটু ছিটিযাল বলতে পারেন।

পাড়ার সুধীব ডাক্তার কিছুতেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে রাজী হল না। বলল, হ্যাঁ, আমার পেশেন্ট ঠিকই। কিন্তু সে তো ডেঙ্গুতে মবেনি। আমাব ট্রিটমেন্টেও মবেনি। মবেছে সুইসাইড কবে অ্যাণ্ড দ্যাট টু ইন এ ঘাস্টলি ম্যানার। পুলিশ এসেছে। কাইণ্ডলি, আমাকে ভাই আর রিকোয়েস্ট করো না। পাডাব লোক। দুলাইন লিখে দিলে যদি ল্যাঠা চুকে যেত আমি কি কবতাম না।

পাডার ছেলেবা এবপর থেকে সুধীব ডাক্তারকে হারামী ডাক্তাব বলে অভিহিত করতে শুরু কবে। সব শুনে পুলিশ অফিসাব বলল, ঠিক আছে। আমি থানায় গিযে লাশের গাড়িব ব্যবস্থা করছি। কেউ একজন সঙ্গে চলুন। কনস্টেবলরা থাকবে।

—আপনি কি সাব আব আসবেন না।

—আসব না মানে? দেখি শম্ভুনাথে যদি লিখিযে দিতে পারি তাহলে ওখান থেকে কাঁটাপুকুর ...

—সাব, আমরা বডি পাব কখন?

—লাশ, এখন কটা বাজে, পৌনে বারোটা। এই ধরুন .. সাতটা নাগাদ কাঁটাপুকুরে চলে আসুন না . তবে মর্গের ব্যাপার তো, যদি টাইম লাগে আরও?

—ও আপনি আমাদেব ওপর ছেড়ে দিন। কাঁটাপুকুবে আমাদের লাইন করতে অসুবিদে হবে না।

—তাহলে তো কথাই নেই!

পুলিশের কালো মুর্দাভ্যানে চড়ে হাববার্ট বাড়ি থেকে চলে গেল। দোতলার বারান্দায় জ্যাঠাইমাকে দুপাশ থেকে ধবে দাঁড়িয়েছিল নির্মলা আর ধন্নার বৌ। কড়া রোদ ছিল তখন। এমন কড়া রোদ যে কাকের গলা দিয়ে শুকনো ডাক বেরোয়।

ছাদে, প্রখর রৌদ্রে দণ্ডায়মানা শোভাবাণীকে ললিতমোহন বলিলেন, শোভা! ভাবচি ছবিটা লেগে যাবে না ফ্লপ করবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তাই আমি মেনে নেব।

উত্তরে শোভারাণী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কুটিপাটি।

নীচে মেথর এসে বালতির বরফগলা রক্তগোলা জল নিয়ে গিয়ে নর্দমাতে ঢালল। বোতল, কাটলেটের হাড়, মরা আরশোলা, ব্লেড, সিগারেটের টুকরো, ছাই—সব ফেলল। বাকি রামটুকু চুক করে মেরে দিল। ঘর ধোয়া হল। জানালা খুলে দেওয়া হল। জানালাটা খোলার পরে ভেতরে কাল থেকে যে মাছিটা আটকে ছিল সেটা উড়ে এসে প্রথমে জানালার শিকের গায়ে বসেছিল। তারপর বাইরে ঘুরপাক খেয়ে উড়ে গিয়েছিল।

পাড়াব ছেলেরা মিটিং করে ঠিক করল যে হারবার্টের খাট তোষকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। শ্মশানে সাহাদা-স্বপন কেসের পরে মড়ার বিছানা-বালিশ পোড়ানো হচ্ছে। হাববার্টদাব বিছানাও তার সঙ্গে চলে যাক। কিন্তু এ ব্যাপারে ধন্‌নাদাদাব অনুমতি নেওযা একান্তই প্রযোজন।

ধন্‌না গম্ভীব মুখে শুনল।

—আমিও অমনটিই ভাবছিলুম। ওর মায়া জড়ানো তো, ওব সঙ্গেই চলে যাওয়া ভালো।

ধন্‌না স্মৃতিচারণ কবে।

—ঐ খাট, তোষক—সব এসেছিল বিনুর জন্যে— বিনুও চলে গেল অপঘাতে। হারুও চলে গেল। কী হবে। সব নিয়ে যা। তবে তক্তপোষটা কিন্তু শক্তপোক্ত ছিল। ওটা নিবি?

—ও কত তক্তপোষ আসবে যাবে ধন্‌নাদা। ওটাকেও যেতে দাওনা। সারাক্ষণটি থাকত ওব ওপরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধন্‌না বলেছিল, নিয়ে যা। আমবাও তো শ্মশানে যাব। তা তোবা কিছু টাকাকড়ি নে, খরচ-খরচা তো হবেই।

—ও তুমি কিছু ভাববে না ধন্‌নাদা। হাববার্টদা আমাদেবও তো ভাই ছিল বলো। ও আমবা গাড়িটাডি সব করব। দোহাই তোমার, ব্যাগড়া দিও না।

ধন্‌না পুনরায় কাঁদতে থাকে। ওরা ব্যবস্থাপনার কাজে মেতে ওঠে।

পাড়ার লালার লরিব ব্যবসা। লরি, ড্রাইভাব তুড়ি মাবতে হযে যায। ফুল, ধূপ, সেন্ট, কাপড় সব এসে যায়। লরিব ওপব তক্তপোষ ওঠানো হয। তোষকটি বড়ই ভাবি ছিল। হিমসিম খেয়ে যায ওরা।

—পুবনো দিনের মাল তো। ভালো ছোবড়া দিত। ওয়েট দেখেছিস।

তক্তপোষের চাবকোণে রজনীগন্ধা বাঁধা হয়। তোষকেব ওপবে বালিশ দিযে তার ওপরে নতুন চাদর দেওয়া হয়। শেষে এত ছেলে হয়ে যায় যে আর একটা টেম্পো নিতে হয়। পাড়া থেকে আব যারা যাবে তারা সোজা শ্মশানে যাবে। এরা চলল কাঁটাপুকুব। পাড়ায় বিশাল জনতা লরি ও টেম্পোর শোভাযাত্রাকে বিদায় জানায়। চালাও পানসি—বিমাউন্ট রোড, কাঁটাপুকুর। এর মধ্যেই চুক চুক করে বাংলা খাওয়া শুরু হয়ে যায়। ফাট কবে র' মাল একটু গলায় ঢেলে বোতলটা কোমবে পেটের কাছে গুঁজে রাখা। গামছাটা ওপর দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

"..পরন্তু প্রেতেবা আপনদিগেব দুঃখনিবাবণে সম্পূর্ণ পরবশ বা অস্বাধীন। এই কারণে কোন কোন প্রেত অসহ্য যাতনা সহ্য কবিতে না পারিযা সুহৃদ স্বজনদিগকে পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ায উত্তেজিত করিবার জন্য দেখা দেয় এবং কেহ বা আত্মগোপন করতঃ অর্থাৎ অদৃশ্য থাকিয়া নানা আকারের সংকেত প্রদর্শন করে. ভূতের ঐ শক্তি ভূতচালকদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। ভূতচালক ইংরাজ ও ভূতচালক বাঙ্গালী, সকলেই ভূতদিগের ঐ শক্তি থাকার কথা বলেন, জল্পনা করেন ও নানাপ্রকার পুস্তক লিখিয়া প্রচারিত করিতেও উদাসীন নহেন।" (পঃরঃ)

কাঁটাপুকুবে ফাঁড়াই, রক্ত শূন্যতা প্রদর্শন ও সেলাইয়ের পরে কাপড় মুড়ি দিয়ে হারবার্ট যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছিল, অধিকাংশ আত্মঘাতীদের মতো আচাভুযা নয়। পশ্চিমে এর আগে, সূর্য লাট খাওয়ার মনোমুগ্ধকর রক্তিমাভা মেঘে মেঘে মমতা বিস্তার করেছিল। পাশেই যে জলাভূমি তার পেছনে রেললাইন এবং মাঠ দিয়ে ওয়াগনব্রেকাররা ছিল হরিণের মতো ধাবমান। পাড়ার গোবিন্দ বড় ঘরের ছেলে। সে হারবার্টের মড়ার ওপরে এক শিশি সেন্ট ছড়ায় ও চিল্লাতে থাকে, 'পাতি মড়া যাবে অগুরু মেখে। গুরুর জন্যে ইন্টিমেট।'

লরি চলতে থাকে। এবং সহসা স্লোগান শুরু হয়,

হারবার্টদা, যুগ যুগ জীও
যুগ যুগ জীও, যুগ যুগ জীও
হারবার্টদা, তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না
—ভুলছি না ভুলব না।

ট্রাফিকে লরি দাঁড়াতে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, কোন্ পার্টির লিডার ভাই?

জবাব দেয় কেউ, ব্যাঙ পার্টির!

হঠাৎ তালে তালে হাততালি দেওয়া শুরু হয়। সঙ্গে সিটি ও নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ। এইভাবে শোক অন্তিম রিচুয়ালের মাধ্যমে ব্যাপকতর আনন্দময় কোলাহলে পরিণত হতে থাকে। কেউই খেয়াল করেনি। করবার কথাও নয়। কেওড়াতলার বড় গেটের সামনে লরি যখন এসে থেমেছিল তখন রাতের আলো জ্বলেছে। গেটের পাশেই ক্রন্দনশীলা শোভারাণীর পাশে বিমূঢ় ললিতকুমার দাঁড়িয়েছিলেন। আনন্দধ্বনি শুনে তিনি বলে উঠলেন, শোভা, তুমি কাঁদছ? এ তো দেখছি কার্নিভাল।

ধন্না, ফুচকা-বুলান, পাড়ার বড়রা—সব আগে থেকেই এসে গিয়েছিল। কাগজ লেখাতে গেল কেউ। শ্মশানে লাশের সঙ্গে যারা আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যান্য লাশের পেছনে কী মৃত্যুর কারণ রয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চায়। এমনই একজন কোকাকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং কিঞ্চিৎ নেশার ঘোরে কোকা জবাব দিয়েছিল এইভাবে, কী হয়েছিল দাদা?

—কিসের কী হয়েছিল?

—বলচি, কি হয়েছিল, আপনাদের দাদার?

—মার্ডার।

কোকা যে কোনো মৃত্যুরই ইংরিজি 'মার্ডার' বলে জানত। মানুষ বাংলায় মরে, ইংরিজিতে 'মার্ডার' হয়। এই বার্তা রটে যাবার ফলে, মার্ডার কেসের ভিকটিমকে দেখার জন্য ভিড় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। যাদের অন্যান্য লাশ ছুঁয়ে থাকতে হচ্ছিল তারাও কখন দেখতে যাবে তার জন্যে উশখুশ করছিল। ধন্না, বিধ্বস্ত ও শোকস্তব্ধ ধন্না বলল তার দ্বারা এ কাজ হবে না। তখন ভাইপো বুলানই কাকার মুখাগ্নি করে। শ্মশানে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা। কিছু টুকরো সংলাপ, সজোরে শ্লোগান, কান্নার শব্দ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তোষক বালিশ সুদ্ধুই যাবে।

—হারবার্টদা, যুগ যুগ জীও .

—গুরু, তুমি চলে যাচ্চো।

—যবতক সূরজ, চাঁদ রহেগা, হারবার্ট তেরা নাম রহেগা!

—সরে যান, সরে যান, লাশ ঢুকবে!

ঘ্যাড় ঘ্যাড় ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে চুল্লির দরজা উঠে গেল। শেষ শয্যায় হারবার্ট কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষমাণ। শ্লোগান তুঙ্গে উঠেছে। গমগম করছে কেওড়াতলা। চুল্লির অভ্যন্তরে অগ্নিশয্যা দেখে বিমোহিত ললিতকুমার বলিয়াছিলেন, ফ্যাসিনেটিং!

সঙ্গে সঙ্গে কড়া ধমক, চোপ্ শালা!

যুগপৎ চমকিত ও শিহরিত ললিতকুমার মাথা ঘুরাইয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ধুঁই এবং অনতিদূরে লম্বোদর, শ্রীধর, নিশাপতি, কেশব, মুণ্ডহীন ঝুলনলাল—সকলেই দণ্ডায়মান।

সশব্দে হারবার্ট চুল্লিতে প্রবেশ করল। প্রবেশ করা মাত্র তার দেহের আচ্ছাদন, চুল ও চাদর দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। ঘ্যাড় ঘ্যাড় ঘ্যাড় ঘ্যাড় শব্দে চুল্লির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে

ভেতরে একটানা গোঁ কবে একটা শব্দ।

ভিড়ের একটু পেছনে উদাস মুখে দাঁড়িয়েছিল সুরপতি মারিক। তার পকেটে ইংবিজি কাগজের কাটিং। সিগারেট ধরিয়ে সে মনে মনে বলেছিল 'বিদায, বন্ধু, বিদায়।' ওপব থেকে লোক নামতে থাকে। নেমে আসে। গোঁ-ও-ও-ও .

এমন সময়ে সকলকে সচকিত করে প্রথমে একটি ছোট বিস্ফোরণ শোনা যায়। বালতি চাপা দিয়ে চকোলেট বোমা ফাটালে যেমন হয় তেমন—ডুম!

এর রেশ কাটতে না কাটতে আরও বড় একটি। তারপর ক্রমাগত। আরও জোরে আরও জোরে। চুল্লির দরজা ধড়মড় করছে, লোক ছোটাছুটি করতে শুরু কবে। অন ডিউটি পুলিশরা দৌড়ে আসে। ..টি....গুম..

চুল্লির ওপর থেকে দেওয়ালের কিছুটা উড়ে গিযে ইট, বালি, চাঙড় ছিটকে বেরোয় ও সেখান দিয়ে বিস্ফোরকের গন্ধকগন্ধ মাখা নানা বর্ণের ধূম নির্গত হয়। লোকাল এক বংবাজ গর্জায়, মাল চার্জ করচে! মাল চার্জ করচে!

একজন পুলিশ যথোপযুক্ত উপস্থিত বুদ্ধির পবিচয় দিযে শেষ অবধি ঠিকই চেঁচিয়েছিল, চুল্লি অফ করে দে! ভেতরে ফাটচে!

কিন্তু তারপরেই গগনবিদারী এক বিস্ফোরণ ঘটে চুল্লিব পাশের ও পেছনেব দেওযাল ধ্বসে পড়ে। গরম কয়েলের টুকরো হবিষ্যি বান্নাব জলে পড়ে ভস্ কবে ধোঁযা ওঠে। পুরো শ্মশানে পাওয়ার অফ হয়ে যায়। ভাঙা চুল্লিব ধকধকে লাল আভা। বিকট কাণ্ড। অন্ধকাবে লোক ছোটাছুটি করে। শ্মশানের উল্টোদিকেব কোনো বাড়ি থেকে হয়তো ফোন গিযেছিল। পুলিশ আসে। আরও পুলিশ। পুবো শ্মশান কর্ডন কবে ফেলা হয় সেই বাতে। অনেক পবে এমারজেন্সি লাইনে সি ই. এস. সি কোনোমতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করলে দেখা যায় চুল্লিটি কেউ যেন ভেতর থেকে ফাটিয়ে চুরমার কবে দিয়েছে। শেষে কড়া পুলিশ প্রহরাতেই হাববার্টেব মাথা, নাড়িভুঁড়ি, পা,হাত, পেট-বুক, টুকরো—এইসব নিযে গিয়ে, অধিক রাত্রে, পাশে ম্যানুযেল পদ্ধতিতে কাঠে পোড়ানো হয়।

হারবার্টের দেহাংশ একত্র করে পুড়িয়ে দেওয়ায় প্রথমদিকে ইনভেস্টিগেশনে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক। কারণ ১৯৯১-এর ২১মে যে ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে এমনভাবে যথেষ্ট ভাবার কারণ আছে যে এল টি. টি. ই-র লাইভ হিউম্যান বম্ব্ ধানুর সঙ্গে তুলনীয় হারবার্ট ছিল একটি ডেড হিউম্যান বম্ব্। অবশ্য মোটিভটা স্পষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণও নেই। কারণ শ্মশানে ঐ সময় গণ্যমান্য কারও আসার কথা ছিল না। থাকলেও এই হাইপথে- সিসটি দুঁদে তদন্তকারীরা বাতিল করে দেন। আসলে, কোনো একটি ঘটনা এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে তার পরবর্তী প্রত্যেকটি ঘটনাই অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা কবার চেষ্টা কবা হয়। এটা মানুষের ধর্ম।

হারবার্টের সুইসাইড নোট,

> চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল।
> দোবেড়ের চ্যাং দেকবি? দোবেড়ের চ্যাং
> দেকাব? ক্যাট ব্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ
>
> হারবার্ট সরকার

থেকেও মনে হয় না এর মধ্যে কোনো কোড নিহিত যদিও "চ্যাং দেকবি?" ও "চ্যাং দেকাব?"-র মধ্যে একটা শাসানি দেওয়ার মনোভাব সুস্পষ্ট। প্রকাশ থাক যে হাওড়ার কোনো এলাকায়

অতীব খচ্চর ও হাবামী লোকেদেব 'দোবেড়ের চ্যাং' বলা হয়। কিন্তু 'ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার ডগ, ফিশ!' সম্ভবত নিছকই উন্মত্ততা। লোকটা তখন এক্সপোজড্। সিভিয়ার শকের পরে অবশ্যম্ভাবী ডিপ্রেশান। আব ববাববই অ্যাবনর্মাল।

যাই হোক, কোনো বারুদগন্ধী বহস্যই শেষ অবধি অসমাধিত ও অসম্যক থাকতে পাবে না। দেশ-কাল-জাতির স্বার্থে তা অভিপ্রেত নয় পরন্তু একান্তই অনভিপ্রেত।

শ্মশান-বিধ্বংসী এই হামলাব জন্য দায়ী হল বিনু। হ্যাঁ, মৃত নকশালপন্থী বিনু। সে-ই, রাতের পর বাত, তার কমবেডদেব সঙ্গে তোষকের পবতে পবতে গোমিযার আই সি আই. কারখানা থেকে চোরাপথে সংগৃহীত পাথর ফাটানোর নানা মাপ ও ক্ষমতাব প্রভূত ডিনামাইট স্টিক ঢুকিযে বেখেছিল। উন্নতমানেব এই ডিনামাইট স্টিকগুলি যথেষ্ট মাত্রায় শক গ্রহণ করতে পারে। পাতি পেটো নয যে চাপ পড়ল কী ফাটল। দেশেব অগ্রগতিতে ডিনামাইটেব সদর্থক ভূমিকাব কথা কে না জানে?

হয়তো বিনুদেব প্ল্যান ছিল বিকট প্রলযঙ্কর কিছু ঘটাবাব। হয়তো, হয়তো কোনো মহতী প্রাণনাশের। হয়তো আবও অভাবনীয কোনো অঘটনেব। তা হতে পাবেনি। হতে পারেনি ঠিকই কিন্তু গত দুই দশক ধবে এই বিস্ফোবক সমাহার তোষকেব মধ্যে শীতঘুম ঘুমোচ্ছিল যা চুল্লিব উত্তাপে জেগে ওঠে। এবং কী আশ্চর্য হতে হয ভাবলে যে ১৮মে, ১৯৯২ থেকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শবেব সঙ্গে শয্যা পোড়ানো শুরু না হলে এ ঘটনা ঘটতেই পাবত না। কী বিচিত্র এ ডিটোনেশন!

হাববার্টের বক্তহীন মৃতদেহ দাহ কবাব সময যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিতভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে বাষ্ট্রযন্ত্রেব এখনও বাকি আছে।

দশ

"বৃথা আসি, বৃথা যাই
কিছুই উদ্দেশ্য নাই"

—অক্ষয়কুমার বড়াল

হারবার্টের ঘর থেকে তক্তপোষ বিছানা বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ঘরটি বড়ই ফাঁকা ও বড় লেগেছিল। কেউ যদিও সেটা দেখেনি কারণ তারপর ঐ ঘরে তালা দিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেকদিন অবধি কেউ ঢোকেনি। এরপরে, একদিন রাতে, লোডশেডিং-এর অন্ধকারে প্রচণ্ড ঝড় হয়। যে জানালা খোলার জন্যে মাছিটা বেবোতে পেরেছিল সেই জানালাটা খোলাই ছিল। উন্মত্ত, দুর্বার ঝোড়ো বাতাস ঢুকে ১৭১ থেকে শুরু করে 'পরলোকের কথা'-র পাতাগুলো উড়িয়ে উড়িয়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিযেছিল। খোঁদলের তাকে রাখা হারবার্টের আয়নায় বিদ্যুৎ চমকানোর আলো ঝলসে উঠেছিল। হাওয়ার দাপটে দুলে দুলে উঠেছিল অলেস্টার। 'পরলোক রহস্য', 'ভূতের জলসায় গোপাল ভাঁড়', হারবার্টের কবিতার খাতা, শাস্তার ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সঙ্ঘের চিঠি তাকে থাকলেও এলোমেলো হযে গিয়েছিল। দড়িতে ঝোলানো গামছা, শার্ট, ধুতি উড়ে মেঝেতে পড়েছিল। তার কিছুদিন পবে, ধন্নাদাদা, কোনো এক রবিবার, এই ঘর খুলে সব বই, বই-এর পাতা, খাতা, টিনের বোর্ড সব বিক্রিওলাকে বেচে দেয়। টেবিলফ্যান,

নিশীথে, সমুদ্রতীরে এই কাহিনির অবতারণা। ঝোড়ো বাতাস ও সমুদ্র গর্জনের দুই ভীষণ শব্দ মিলে ভীতিপ্রদ এক ধ্বংসের আবহ তৈরি করেছে। তবে অনুমান হয় যে, এই শব্দ আরও ঝোড়ো, আরও ক্ষ্যাপা হয়ে উঠবে। অল্পস্থায়ী বিদ্যুতের ঝলকে, অন্ধকাবে, চকিতে দৃশ্যমান হয় বালিয়াড়ি যা ঢাল দিয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। অতএব শব্দময় অন্ধকারে এলোমেলো উড়তে থাকা বালুকণা ও বৃষ্টির ছাঁটের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয় আরও কয়েক লহমা যতক্ষণে যুযুধান মেয়েদের মধ্যে আরও বেশি সময় ধরে ঝল্‌সে দেওযাব খেলা না জমে ওঠে।

সেই ঝলক অনেকটা ওয়েল্ডিং কবার আলোর মতো। তাতে দেখা গেল ঢেউ-এর আঘাতে পাশ ফিরছে বা গড়াচ্ছে একটি কাটা মুণ্ডু। মুণ্ডুটির চোখদুটি আধখোলা, ঠোঁট একটু ফাঁক, অনেক চুল ও দাড়ি জলে ভিজে লেপটে রয়েছে। ভারি কাতানের কোপে মুণ্ডুটি যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন হয়তো নেশার বশে বধকর্তার চোখ বা হাতের আন্দাজ একটু বেসামাল হয়ে থাকবে। ফলে কোপটি একটু তেরচাভাবে পড়েছিল। দিবালোক হলে হয়তো নোনাজলে রক্ত ধুয়ে যাওয়ার পবে স্বরনালী বা অন্ননালী বিশদ দেখা যেত। কিন্তু এই অন্ধকারে সে আশা করা যায় না।

বালিয়াড়ির ওপরে, কিছুটা ভেতবে গেলে অন্য দৃশ্য। দেখা যায় প্রৌঢ় এক পেশীবহুল মানুষ মানুষপ্রমাণ এক গর্ত ভিজে বালি পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভবাট করছে। বোঝাই যায় যে, সে মুণ্ডুবিহীন ধড়টিকে বালি চাপা দিচ্ছে। এক এক সময় এত বেশি সময় ধবে অন্ধকাব বিদ্যুদ্দীপ্ত থাকে যে, তা অপ্রাকৃতিক বলে মনে হয়। যাই হোক, যা বিস্মিত কবে তা হল প্রৌঢ় এই গা-খালি বলিষ্ঠ মানুষটি এই ভয়াবহ ঘটনার অংশীদার হয়েও বড় বেশি নির্লিপ্ত। কে জানে, হয়তো নেশার ঝোঁক এই নির্লিপ্তির কারণ। গর্তে অনেকটা বালি ভরে গেছে। এবারে সে নিচু হয়ে আঁজলা বালি নিয়ে ঝুপ ঝুপ শব্দ করে ফেলে। তারপর পা দিয়ে দাবিয়ে দাবিয়ে ভিজে বালির উঁচুনিচু সমান করে। বৃষ্টি জোরে শুরু হয়।

কাটা মুণ্ডু কথা না বলুক, মৃত্যুর নিয়মে তার নিশ্চল জড়মণ্ডের মতো পড়ে থাকার কথা। বিশেষত মাথা কাটার এতক্ষণ পরে। কিন্তু উপ্‌চে উপ্‌চে এগিয়ে আসা কালো ঢেউ-এর থাবা তাকে নিয়ে খেলা করছিল। সাদা ফেনার নখ তাকে আঁচড়াচ্ছিল। বড় ঢেউ এসে ভাঙলে মুণ্ডুটি ওলটপালট করে পাড়ের দিকে এগোয়। কিছুক্ষণ হয়তো বালিতে নাক গুঁজে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু ফেরত যাওয়া জলের ধাক্কায় আবার সোজা হয়ে যায়। তখন আবার সেই আধখোলা চোখ, ফাঁক মুখ, তার মধ্যে দাঁতের অস্পষ্ট আভা দেখা যায়। কখনও জলের তোড়ে মুণ্ডুটি ঘুরে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমুদ্রের দিকে গড়াতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। ঘোর বর্ষণ মুণ্ডুর মুখ, চোখ অস্পষ্ট করে দেয়। ঢেউ-এর সঙ্গে ঢেউ-এর ধাক্কায় বিস্ফোরণের শব্দ হয়। আকাশে জল লাফিয়ে ওঠে। মহাপ্রলয় কালে লুপ্ত কোনও গ্রহের মতোই মুণ্ডুটি অজানা হয়ে যায়। বাজ পড়ে সমুদ্রের মধ্যে। বীভৎস এই তাণ্ডবের মধ্যে রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও ঘোর, আরও প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

... .

নিজের ঘরে মিথিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে, সে অ্যামেরিকায় গেছে। চেয়ারের ওপরে কাদামাখা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া জিনস্, জ্যাকেট, নোংবা পাঞ্জাবি, ব্যাগের মধ্যে দলাপাকানো

আধভেজা গামছা, ড্যাম্প ধরে যাওয়া চার্মিনারের প্যাকেট, দেশলাই। কালই সে বারদোনের হাখণ্ড উৎসব থেকে ফিরেছে যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল—এই উৎসবে একজন ভান করে যে মরে গেছে। সেই সাজানো মড়া নিয়ে ধর্মের থানে এলে মন্ত্র পড়া হয়—মরা তখন গাজন নাচের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে ওঠে। তখন ঝাঁপ হচ্ছিল।

মিথিলের স্বপ্নটা ছিল এইরকম। মিথিল অ্যামেরিকায় গেছে। সেখানে দারুণ ফূর্তি মনে। যে শহরে গেছে সেটা খুব বড় নয়। স্টিফেন কিং-এর লেখায় যে ধরনের ছোটখাট শহরে ভ্যাম্পায়ার বেরোয় অনেকটা সেরকম ছিমছাম শহর। সেখানে যে বাড়িতে মিথিল উঠেছে তারা বাঙালি অথচ মিথিলের চেনা নয়। বাড়িতে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা, একটি কমবয়সি মেয়ে এবং বেশ কয়েকটা বাচ্চা রয়েছে। শোবার ব্যবস্থা একটা টানা ঘরে। মিথিলের প্রথম চিন্তা হয় যে, ঐ মেয়েটা কি তার কাছে শোবে না বাচ্চাগুলো? মিথিল এরপর বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। মদ কিনবে। মিথিল কিন্তু জানে যে, তার স্টকে একটা ভদকার পাঁইট আছে। মদের দোকানের সামনে মাঝারি গোছের লাইন। লোকগুলোকে দেখতে ঠিক অ্যামেরিকানদের মতো দশাসই নয়। বরং অনেকটা ইস্ট-ইউরোপের মতো। এর মধ্যে কিন্তু একটা নিগ্রো ছেলেকে দেখা গেল। এই কিউ-এর সামনে, দোকানের মুখোমুখি একটা টেবিলে সাদা চাদরের ওপর জলের গেলাশ রাখা। সেখানেও দু-চারজন চিৎকার করে কি বলছে। মিথিল বুঝতে পারল যে, এখানে একটা এলকোহল-বিরোধী অভিযান চলছে যার মোদ্দা কথাটা হল মদ খেও না, বরং গেলাশ গেলাশ জল খাও। কিউ-এর লোকেদের সঙ্গে ওদের, ঐ মদ বিরোধীদের ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি হয়। মিথিল কিন্তু তার ফলে চিন্তিত হয় না। তার দুশ্চিন্তা তখন অন্য। তার কাছে ডলার নেই। আসার সময় ভিসা, পাশপোর্ট এই সব নিয়ে এত ঝক্কি গেছে যে, টাকার কথাটা তার মনে হয় নি। একদিন, দুদিন না হয় যে বাড়িতে আছে তাদের কাছ থেকে ধারধোর করে চালাবে। কিন্তু সেটাই বা কদিন। আর চাইবার মধ্যে তো একটা লজ্জা আছে। দুশ্চিন্তার ভাবটা বেড়ে গেল। রাস্তা একটাই। এক্ষুনি ফোন করে মাসিমণিকে বলতে হবে যে, মিথিল স্ট্র্যান্ডেড—স্টেটস্-এ। ফ্যাক্সে কি ডলার পাঠানো যায়? যাই হোক, ফোন করে মিথিল। ডায়ালটা একটা ফাটা ফাটা মেটে রঙের চাকতি যাতে কোনও সংখ্যা নেই। চাকতিটার যে যে জায়গায় নম্বরগুলো হতে পারে আন্দাজ করে ডায়াল করে মিথিল। এবং দুটো সংখ্যার পরে যখন '৩' আসে তখন মিথিল বুঝতে পারে যে, ঘড়ির ডায়ালে যেখানে '৯' থাকে সেখানে সে '৩'-এর জন্যে ডায়াল ঘুরিয়েছে। সব ভুল হচ্ছে। এর পরের চারটে ডিজিটও প্রায় উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। '১' টা ঠিক ছিল কিন্তু '৮' আর '৭'? ফোন বাজে। রিসিভার ওঠে। মাসিমণির গলা। আমি মিথিল, আমি অ্যামেরিকা থেকে বলছি, আমি চলে এসেছি কিন্তু—

—হ্যাঁ, এসে দেখি তোর জন্যে রাখা ডলার তুই সব ফেলে গেছিস।

—শোনো, দেরি করবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো পাঠিয়ে দাও। মাসিমণি!

—বল্ মিথিল।

অথচ ঘরের মধ্যে সেই লোকটা এসে গেছে। তার গলা শুনতে পাচ্ছে মিথিল। লোকটা তো বলল, একদিন পরে আসবে। আর লোকটাকে মাসিমণি চেনে না। ডলার কী করে কলকাতা থেকে অ্যামেরিকা আসে? প্রসেসটা কী? টাকা পাল্টে ডলার হয়ে আসে, না প্রথম থেকেই ডলার থাকে। মিথিলের ঘুম ভেঙে গেল। মিথিল মনে করে কী ঘটেছিল গতরাতে। স্বপ্নটা একেবারেই ফালতু। গতকাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে সে বাড়ি আসে নি। দিব্যর বাড়ি গিয়েছিল। দিব্য তখন চিৎকার করে অনন্য রায়ের 'আলোর অপেরা' পড়ছিল। রোজ সন্ধেবেলা দিব্য একঘণ্টা কবিতা জোরে জোরে পড়ে। বলে এটা ওর ইভনিং প্রেয়ার। পাঠ-এর পর ওর কাছে হাফের হাফ রাম ছিল। সেটা খাওয়া

হল। তখন মিথিল বলল তার এক্সাইটিং ডিসকভারির কথা। কথাটা শুনে দিব্য বলল এরকম ঘটনা প্রিমিটিভ সোসাইটিতে হতে পারত। মিথিল তাকে বলল লোকটা কলকাতায় আসছে।

বেতের ছড়ি নিয়ে নাচ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকের আওয়াজের তালে তালে সন্ন্যাসীদের পাণ্ডা বুকের ওপব থেকে বেতেব ছড়ি সরিয়ে দিয়েছিল। তাবপব শুরু হল সিঁদুর, ফুল দিয়ে বঁটি পুজো। এবপব বস্তার ওপরে সার দিয়ে বঁটিগুলো যখন রাখা হল মনে হল নৌকোর দল চলেছে। তারপব শুরু হল বাঁশের ভারার থেকে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ। খুব জোব বাজনা বাজছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তখনই অভিমান্য পণ্ডিত এসে মিথিলের কানে কানে বলেছিল—'আজ আপনাকে আশ্চর্য এক নোক দেকাব। একনই রওনা হতি হবে। তিন কোবোশ পথ।'

মিথিল অভিমান্যর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল ফাঁকায়।

—খুব ভাগ্য আপনার। অনেক পুণ্য কবলি পবে ভোগী দেকা যায়।

—ভোগী! কী কবে ভোগী?

—কী কবেন না তাই ঠিক নেই। কদিনই বা থাকেন।

—মানে সাধু টাইপের? কদিন থেকে চলে যায়?

—এ বাবু তোমাব আঁদাড়ের সাধু নয। এ হল ভোগী। ভোগী যে সে হয না। আবাব যে কেউ হতি পাবে। কে হবে সে এক গূঢ় রহস্য।

অভিমান্যব সঙ্গে চলতে থাকে মিথিল। অভিমান্য সিংহেশ্ববে থাকে। ওব কাছ থেকে মিথিল খাতায লেখা 'বনবিবির পালা' নিযে পড়েছিল। সে দুবছব আগেব কথা। অভিমান্য ওকে অনেক মেলায় ঘুরিয়েছে। এখন যেটা চলছে, মিথিল যেটাকে বলে এথ্‌নিক ফেজ, তাতে অভিমান্য ওর প্রধান গাইডদেব অন্যতম।

—বেশ ঝাঁপটা দেখছিলাম।

—রাকো তো তোমাব ঝাঁপ। ঝাঁপ দেকাচ্চে। কত ঝাঁপ বলে দেখলাম। এসব হল গে চ্যাংফচকেদের খেলা। বলচি বলি ভোগীব কাছে যাচ্ছি। ভোগী কে জান তো? সে করে কি তোমাব কয়েকদিন মাত্তর থাকে। এর মধ্যে ভোগ কবে। তারপব বলি হয়ে মবে যায়।

—মরে যায়? কেন?

—কেন আবার কি। চারদিকে এত অনাচার, অত্যাচাব, ধম্মোলোপ, খুন-খাবাপি, চোপরদিন চুরিচামারি—এই অনাছিষ্টি দূব কবাব জন্যেই ভোগী আসে, তাবপব যা বললাম—আত্মঘাতী হয।

—আত্মঘাতী মানে? সুইসাইড করে?

—অতশত বাপু জানি নে। তবে যতদূর শুনেছি ভোগীকে মুক্ত করে একজনা, তার নাম কখনও শুনি নি। হতি পারে ভগবান, হতি পারে বনবিবি। তবে ভোগীব মুক্তি যে সে বেপার নয়। সে এক মহাকাণ্ড।

সেই গ্রামে ঢোকার আগে, সাইকেলের টায়ার-টিউব সারাবার দোকান থেকে এক বোতল বাংলা মদ মিথিলকে দিয়ে কিনিয়েছিল অভিমান্য। ভোগীকে দেওয়ার জন্য। একটা বুড়োর সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলেছিল অভিমান্য। সে কিছুটা এগিয়ে এসে গাঁয়ের মধ্যেই একটেরে বাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির বাইবে, বেড়া ঘেঁষে বিরাট একটা নিমগাছ। তার ডালে পাতায় সূর্যডুবের আলা মাখা। উঠোনেই বেশ কিছু লোক। বাচ্চা কোলে মা, কয়েকটা বুড়ি। দুটো সাইকেলও দাঁড়িয়ে।

মিমিকে মিথিল বলতে মিমি ঠোঁট উল্টে বলেছিল রিডিকিউলাস। এবং বলেছিল এসব কিছু 'বিজার' ও 'এক্সোটিক' ভাট বকে মিথিল ওকে ইমপ্রেস করছে অথচ মিমির এতে কিছু যায় আসে না। মিমি যে খুব সুন্দর দেখতে তা নয়। সিবিয়াসও যে তাও বলা যায় না। এমনকি মিথিলকে তার

যে খুব একটা পছন্দ এমনও মনে হয় না। হলে অত্যন্ত নিকট হয়ে তিনদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসাব পর মিথিল 'জুরাসিক পার্ক' নামে যে কবিতাটা মিমিকে উপহার দিয়েছিল সেটা জেরক্স করিয়ে মিমি মাসিমণিসহ প্রত্যেককে এক কপি করে দিয়ে বেড়াত না। ড্রাগ ছাড়ার পরে মিথিলেব এটিই এক এবং অদ্বিতীয় রচনা। প্রেরণা মিমির সঙ্গে তিনদিন তিনরাত ও রকিদের ঘরে ভিডিও-তে দেখা স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক'।

মিমির সনেট

মনে পড়ে মিমি মেমারিতে নেমে
        খুঁজেছিলে তুমি সালামি এবং,
বার্বি পুতলী পোষাকবিহীন
        ঘডিতে নাইটি একটাব ঢং।
মথবেণু মেখে করেছিলে গান,
আমার জবাব—কি লেসবিয়ান।

ঝিঁঝি পোকা আব উচ্চিংড়েরা
        জানতো কপালে লেখা নেই ফেরা,
কোথায় তখন বাশিযা বা চীন
        নগ্ন বার্বি কুযাশায় ঘেরা।
মনে আছে মিমি করেছিলে গান,
আমাব জবাব—ছি লেসবিয়ান।

সঙ্গমরত টিরানোসোরাস,
কন্ডোম দিয়ে করে প্রাতরাশ।।

বাইরে আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। একটা কুপির আলো। মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকে মিথিল। এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে ভোগীর চোখাচোখি। ভোগী আসনে বসে। চুল দাড়িতে ঝাঁকড়া মুখ, মাথা, বয়স হবে বোধহয়, মিথিলের মনে হল চল্লিশ মতো হবে। ভোগীর চোখে পলক পড়ে না। সামনে রাখা সরা, তার ওপবে কালচে হয়ে যাওয়া কাটা ফলের মধ্যে জ্বলন্ত রোগা ধূপকাঠি গোঁজা। বোঝাই যায় সে এসব ফলপাকুড় কিছুই খায় নি। পলক না পড়া চোখদুটো বেশ জ্বলজ্বলে। আর তার মুণ্ডুটা কুপির আলোয় দেয়ালে বড় নড়বড়ে ছায়া ফেলেছে। অভিমান্য নমস্কার করে বোতলটা রাখে। সরে আসে। বদ্ধ গরম। মিথিল ঘামছে। ধূপ, ফল, ঘাম এইসবের গন্ধের সঙ্গে পোড়া গাঁজা ও বিড়ির গন্ধ মিশে এক বিকট সমাহার। ভোগী প্রথমে অভিমান্যকে বলে,

—এই ড্যাকরা, বাবুটাকে আনলি, আনলি, ঐ ফকফকে মালটা সঙ্গে নে এলি কেন? বেরাণ্ডি আনতি পারলি নি?

—আজ্ঞে, খবর পেয়ে তো খরো খরো দৌড়ে বারদোন থেকে আসতিচি, ও মাল এ তল্লাটে পাবো কোথায়?

—ও! আমি ভাবলাম বুঝি কলাকাতা থে এলি। তারপর বাবু, ঝাঁপ তো দেখলেন, কেমন নাগল?

—ভাল।

—ভাল! ঐ তেড়ং বেড়ং ভাল। ধুস্। আপনারে এক্কবার দেকিচি এর আগে।

—আমাকে? কোথায়?

—হয় স্বপনের ঘাটে নয় মাইবিবিব হাটে। দেকিচি। দেকিচি। তারপব ঐ বিষের নেশা ছেড়ে ভাল কবেচেন।

এই, আঁচিব বন্ধন পাঁচিব বন্ধন বন্ধন বাঘের পা

আর শালার বাঘ চলতে পাববে না।

নেশাভাঙেব ভয় নেই। আর মায়েব বাড়া মাসি ঠিক আগলে বাখবে। এই শালা, খোল দিনি বোতল। ভোগী যকন তকন মাল ভোগ কবি!

বোতলটা কষেব দাঁত দিয়ে চেপে খোলে অভিমান্য। খুলতে গিয়ে ঠোঁট কাটে। গামছায় বোতলেব মুখটা মুছে এগিযে দেয। ভোগী গলায ঢক ঢক কবে ঢালে।

—নাবে, মালটা ভাল। তারপর বাবু! ও আমার কলকাতার বাবু বে! তবে বাবু তোমার কপালে চাকরি নেই। আবার অভাবও নেই। মাসি আচে, মাসি পুষবে। ভোগীর কথা বাবু, মিলিয়ে নেবেন।

সবোজদা সিগারটা বিবাট ঢাউস অনিক্স পাথবের অ্যাশট্রেতে বাখলেন। এত ছোট একটা চুমুক দিলেন যে, গেলাশেব হুইস্কি কমলো কিনা বোঝা গেল না।

—শেষ করেছো? দ্যাটস্ গুড।

উঠে গিয়ে মিথিলেব গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন। মিনি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করলেন। মেশালেন না। কাচেব ওপবে বাখলেন।

—মদ্য সম্বন্ধে আমাব সুসমাচাবটি কি তোমাকে বলেছি?

—ঠিক মনে কবতে পাবছি না।

—বলি নি বোধহয। ইয়ুথে, একটা বয়স অবধি আমাব মতে মদ ব্রেনেব বাগানে সারের কাজ কবে, বুঝলে? তাবপব গাছ যখন ইন ফুল ব্লুম কমাও, কমাও। এই এজে খাবে। খাবে আর ঢালবে।

—কিন্তু লোকটার সম্বন্ধে কিছু বলুন। ফ্রাঙ্কলি বলছি সরোজদা আমি কিন্তু একটা, সর্ট অফ ট্রান্সের মধ্যে আছি।

—কে নেই? খবর নিয়ে দ্যাখো ও তোমার গববাচভ থেকে শুরু করে সবাই একটা ট্রান্সের মধ্যে বয়েছে। গববাচভ। গববাচভ। পলিটিক্স ইজ দা আর্ট অফ দা পসিবল ..যাঃ যাঃ কি একখানা দিলাম... আর ঐ রাফিয়ানটা কি নাম যেন..

—কে সরোজদা, লেগচেভ?

—লেগচেভ নয়, লিগাচেভ। ও নয়। স্কাউন্ড্রেলটার নাম মনে আসছে না—ঐ ব্যাটাই তো পলিটিকাল অ্যালকেমি, তারপর লেনিন কখন গ্লাসনস্ত কথাটাকে কোথায়, কখন এইসব বলে একটা থিওরেটিকাল গ্যাঁজ তৈরি কবেছিল। নামটা মনে আসছে না। এই একটা নাম যখন মনে আসে না ওনলি দেন আমার ঐ প্যান সেক্সুয়ালিস্ট ফ্রয়েডেব কথা মনে পড়ে।

মিথিলের এই বিষয়ে আগ্রহ এতই কম যে, মুখে আগ্রহ দেখালেও না শোনার চেষ্টা করে।

—এইট্টি ফাইভের এন্ডে যখন মস্কো গেলুম, বুঝলে মিথিল, আই সেন্সড সামথিং। কোথায় একটা কী যেন নেই—ঐ যে, মোটা একটা ফেক স্টুপিড মাঝে মাঝে আসতো না, কোমারভ নামে, ওটাকে আমি বলেওছিলাম। কিন্তু ভিজে ফুটবলের মতো মাথা। বলে কী হবে?

—সরোজদা, আমার প্রব্লেমটা....

—ও বয়, আমি তোমার প্রব্লেমটাই ভাবছি। কিন্তু ভাবার চেষ্টা করছি একটা ব্রডার পারস্পেকটিভে, লাইক আ টপিকাল, আনরিপেন্টান্ট মার্কসিস্ট ...দ্যাখো মিথিল, সেই কবে, কোন্ কালে ব্রিফল্ট, ফ্রেজার পড়েছি, একটু না উল্টোলে ..তবে....'রক্তোৎসব...রক্তোৎসব...' সরোজদা

চোখ বন্ধ করেন। বন্ধ চোখেই হাত বাড়িয়ে নিজের গেলাশটা তোলেন, চোখ খোলেন, গেলাশটি ফাঁকা করেন, রাখেন, সিগারটি নিয়ে ধরান এবং বলেন,

—এখনই, অফ হ্যান্ড, মনে পড়ছে থার্টিনথ্ ও ফোর্টিনথ্ সেঞ্চুরির ফ্ল্যাজেলান্টদের যারা নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করত। বলত বিশ্বের পাপ তারা নিজেব রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেবে। ইলেভেনথ্ সেঞ্চুরিতে বেনেডিকটাইন মনাস্টারিগুলোতে রিফর্ম, হিলডে-ব্রান্ড আর দামিয়ানির মুভমেন্ট...এক সময় ইতালিতে যত প্লেগ ততই ঐ ফ্ল্যাজেলান্ট—এদের দলে স্রেফ পাণ্ডারা নয়, পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চারাও থাকত...

সরোজদা চুপ করে থাকেন। ঘরের মধ্যে সিগারের ধোঁয়ার মাতোয়ারা গন্ধ। মিথিল চুপ। সরোজদা এবাব ঘুমের মধ্যে কথা বলেন,

—ব্যাবিলনের একটা ফেস্টিভাল ছিল, সাচিয়া, এতে একটা চোর বা ক্রিমিনালকে বাজাব পোষাক পরিয়ে তিনদিন রাজার মতো রাখা হতো, তারপর মেরে ফেলা হাতো। বারাব্বাস হয়তো তাই ছিল। তুমি, একবার, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কনিবিয়েব-এর 'দা হিস্টোরিকাল ক্রাইস্ট'-টাব খোঁজ নিও তো।

মিথিল অনেক রাতে বাড়ি ফিবে স্নান সেরে, খেয়ে, সবে শুয়েছে এমন সময় দরজায় টোকা মাসিমণিব।

—তোর ফোন।

মিথিল ফোনটা যখন তুলেছে তখন সে ঘুমোচ্ছে। সবোজদাব গলা।

—মিথিল। ঐ স্কাউন্ড্রেলটার নাম মনে পড়ে গেল। আলেকজান্দার ইয়াকোভলেভ। কী, ঘুম থেকে তুললাম নাকি!

—না, না, এখনও খাই নি।

—আচ্ছা, দেন গুড নাইট। হ্যাভ এ গুড স্লিপ।

মিথিল রিসিভার নামিয়ে রেখে টলতে টলতে ঘরের দিকে যায়। মাসিমণি বলেন,—কে রে? এত রাতে তোকে ডাকছিল? মিথিল জড়ানো গলায় বলে,

—একটা ছাগল। স্টুপিড একটা। আর টাইম পেল না।

—ছি মিথিল, আমি শুনলাম বয়স্ক মানুষের গলা। তাঁকে ছাগল স্টুপিড তুমি কক্ষনো বলতে পারো না।

—পারি না আবার কি! বলা তো হয়েই গেছে।

—আঃ মিথিল।

—সরি মাসিমণি।

লোকজন হালকা হয়ে যাওয়ার পরে অভিমান্য আর এক বোতল মাল এনেছিল। সঙ্গে খোলসে মাছের ঝাল। ফুরফুরে হাওয়ায় উঠোনে বসে ভোগী মিথিলকে বলেছিল,

—আপনারা শিক্ষাত লোক। কত খবর জানেন। দেশ মানুষ সব রসাতলে গেঁল। এ চললি দেখে নেবেন ঐ বাবুও থাকবে না আর এ গরিব গুরবোও থাকবে না। সব বেবাক লোপাট হয়ে যাবে। আরে বাপের জম্মে শুনেচেন—লোক ভাল হবার জন্যে ডাকাতি ছেড়ে দেচে—তারে তেরাত্তির যেতে না যেতে শালা পুলিসদারোগা এসে খোঁচা মারতেচে—কিরে শালা! ধম্মপুত্তুর হলি নাকি! ওঠ, ওঠ ব্যাটা, কাজে বেরো। শুনেচেন কখনো? এই হলো ঘোর কলি। ঘরে ঘরে দেখ পোয়াতি মেয়ে ফলিডল খেয়ে মরতেচে, ধস্‌সন হচ্ছেন, আর ঐ শুয়োর ব্যাটা মদ্দগুলো মদ-গ্যাঁজা ছেড়ে এখন সব টেবলেট খাচ্ছে! এ কতদিন চলবে। অপঘাতে মরতেচে বলে অশরীরীর সংখ্যা কত বেড়ে

গেছে হদিশ কবা যায় না—ও আমরা বুঝতি পাবি—হল্লাভূত, যক, কন্ধকাটা, জলাবুড়ি, একনিড়ে, গুমো, পেঁচো, গলায় দড়ে—ওঃ সে যে কী কাণ্ড কী বলব আপনারে—আর এই যে নিমগাছটা দেখচেন—নজব করে দেখুন—জোব হাওযা দিল তো অদ্ধেক গাচে পাতাডাল নড়ে, বাকি অদ্ধেক থির হিমাঙ্গ ..'

—কেন?

—জিন বসে আচেন যে। জিন থাকলি অমনতবো হয়। আব ঐ শবীল তো শুধু নিমগাছে নয়, জাম, জামরুল, প্যায়রা ছেড়ে একন বাড়ি, ঘব, সহব, বেল, দেশ সব হাতড়ে বেড়াচ্ছে। বাবু বলবো না, নোক—এই নোক যে কি ধম্মঘাতক হযেচে সে তো বাবু আপনি জানেন—ভাবতেচে সগ্‌গ মত্ত সব কাঁইপে দিচ্চি, ওদিকে নিজিব পোঙায় ভগন্দর—তুই শালা কবে কম্মে ফেঁদে বসলি সুপুবিব কাববাব ওদিকে তোব বৌ-বালবাচ্চা পাচাব হযে গেল ডায়মন্ডহাববার—শেষমেশ তোব হলোটা কী? কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না—সব ঠিক কবে দেব, একবাব মুক্তি পাই। সব সেবে দেব। আপনাব সঙ্গে বাবু একটা কতা ছিল। বিরেতে। ফাঁকায। কাকপক্ষীও যেন না শোনে। একটা কতা ছিল।

অভিমান্য উঠে দাঁড়ায। তাব বেশ নেশা হযেছে। ভোগী তাকে বলে, 'আবাব তুমি উঠলে কেন। তুমি বসো। বসে বসে খাও। আমি সেই ফাঁকে বাবুব সঙ্গে গুপ্তকতাটা সেবে আসি।'

নেশাব ঝোঁকে আকাশ তারায তাবায সবগবম। মিথিলেব অ্যাডিডাসেব 'স্ট্যান স্মিথ' মডেলের টেনিসজুতো হোঁচট খায। মিথিল সামলে নেয। হাওযা দিচ্ছে। হাওযা হাওয়া-পাতায় বাতাসেব শব্দ মহানিম। তাব তলায দুজনে দাঁড়ায।

—বাবু, কথাটা এই যে, একবাব শিশুকালে বাপ মা-ব হাত ধবে কলকাতা গিযেছিলাম। সেবাবে বাবু আমাদেব সব জমি সমুদ্দুবেব বানে নোনাফ্যানা হয়ে গিযেছিল। কদিন ভিক্ষে কবে হেই বাবু, দেই বাবু কবে গেরামে ফিবে এলাম। কিছু স্মবণে নেই। তা আমার বাবু বড় শখ মিত্যু হওয়াব আগে একবাব কলকাতা দেখব। দেকাবেন বাবু। দেখে নিযে আমি চলে যাব।

—কোথায যাবে?

—সমুদ্দুবেব পাড়ে। যেখানে আমাব মুক্তি হবে।

ভট্‌ভটিতে মিথিল। উড়ছে তাব আর্জেন্টিনাব ফুটবলারদেব মতো চুল। সিগাবেটের ফুল্‌কি উড়ে জিন্‌সেব জ্যাকেটে লেগে নিভে যায। ভট্‌ভটিব খোলে কয়েকটা শুকনো শামুকেব খোলা। দূরে ডাঙা। টুথব্রাসের বোঁয়াব মতো গাছখানা। ফেনামুখে ঘোলাজল দাগ টানে জলে। ভট্‌ভটির একটু দূরেই জলে ছোট ছোট ঢেউ। কুমির কামটেব আড্ডা। ভোগী বলেছে শেয়ালদায় নেমে ঠিক চলে যাবে। মিথিল সিগাবেট প্যাকেটের ভেতরের কাগজে ব্লক লেটাবে ঠিকানা দিয়েছে। ট্যাক্সিভাড়াও।

বম্বের বেশ কযেকটা কোম্পানিতে রাজের শেয়ার অ্যাপ্লিকেশনের অনেকগুলো টাকা আটকে ছিল। চিঠিচাপাটি চালিয়ে রিফান্ড মেলে না। তখন রাজ টাকা আনতে বম্বে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল মিথিলকে। ওরা ছিল ভাণ্ডুপে। বাজ-এর এক বন্ধুর বাড়িতে। মিথিল রাজকে বোঝে কিন্তু ওর অবাক হওয়াটা যায় না। চব্বিশ ঘন্টায় ওর মাথায় টাকা ঘুরছে। এই তো সেবার, ইউনিট ট্রাস্টেব মাস্টারগেইন নিয়ে খুব হৈ চৈ যখন, রাজ এসে মাসিমণিকে বলে কয়ে, প্রায় জোর করে, কুড়ি কুড়ি চল্লিশ হাজারের মাস্টারগেইন করালো। মিথিলকে বলবে—কিরে মাস্টাবগেইন সাড়ে আটের ওপরে উঠছে না বলে ঘাবড়াচ্চিস? সাত বছরের মামলা দেখবি তুই গোল্ডমাইন মেরে দিবি। মিথিল কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে, ঐ চল্লিশ হাজাব মায়ের ভোগে গেলেও মিথিলের কিছু যায় আসে

—কে ভদ্রলোক?

—গৌতম দা। বস্ হচ্ছে গ্লোরিয়াসের পি. আর ও। ওঁর স্ত্রী হচ্ছেন রুবেনা রায়। ফিল্মমেকার।

রুবেনার নাম মিথিল কেন, সকলেই জানে। রাজ বলে, 'গ্লোরিয়াস, অসম্ভব ফাস্ট গ্রো করছে। এখন তো স্রেফ ফিনান্স নয়, রিয়্যাল এস্টেট, হোটেল, প্ল্যান্টেশন, তারপর ঐ সার্ভিস সেকটর, সর্ট অফ আ মিনি-মাল্টি-ন্যাশনাল।'

ওরা দেখল গৌতমদা লোকটাকে চড় মারল এবং সে কিছু বলল না। কী বলল লোকটাকে শোনা গেল না। ফিরে এল।

—মারতাম না। মারিও নি। একটু হিউমিলিয়েট করলাম। ব্যাটা এক নম্বরের জোচ্চোর। একটা টাইমে ডোনেশনের জন্যে কি জ্বালাতনই না করত। আসলে ওর একটা ডুবিয়াস ভোলান্টারি অর্গানাইজেশন আছে। আজকাল তো ওটাই ভাল ব্যবসা—নরসেবার নাম করে নরবলি চালিয়ে যাও আর ফরেন এড তো আছেই। যাইহোক, বালকেরা সবি। রাজু, একটু মোটা হয়েছিস মনে হচ্ছে।

—প্যান্ট ঢিলে হয়ে যাচ্ছে গৌতমদা আর তুমি মোটা দেখছ?

—ও তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মিঃ বসাক। জিরো জিরো সেভেন ডিটেকটিভ এজেন্সির সিকিউরিটি অফিসার এবং এই পদার্থটি হচ্ছে ওদেরই প্রোভাইডেড বডিগার্ড কাম ড্রাইভার বসন্ত। আমার রক্ষণাবেক্ষণ, এই প্রেসাশ অ্যানিমালটিকে জ্যান্ত রাখার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। যাইহোক এবার তাহলে আমরা চলব।

বুলকু বলে, কোথায়?

—ওহ, ডু নট আস্ক, 'হোয়াট ইজ ইট?' লেট আস গো অ্যান্ড মেক আওয়ার ভিজিট। শোনো, বীরগণ, বাইরে একটি স্টেশন ওয়াগন দণ্ডায়মান যা নিয়ে বীরাঙ্গনা রুবেনা শুটিং-এ যান সেটি-চড়ে আমরা নির্জন কোনও জায়গায় গিয়ে একটু কাব্যচর্চা বা গান করতে পারি এবং তৎসহ টিনবন্দি হাইনেকেন ভাল্লুক সেবন। এই প্রস্তাব।

> থেকে, থেকে, নির্জন হাওয়ায়
> শোনা যায় রণধ্বনি
> হাম সব চোর হ্যায়।

রাজ গেল না। জয়পুর থেকে মার্বেল টাইল-এর এক সাপ্লায়ার এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করবে।

—ঐ কর। টাকা, টাকা করেই গেলি।

—বাঃ গৌতমদা, গুনে গুনে অতগুলো টাকা এক্ষুনি যে পকেটে রাখলে!

—রাখলাম ঠিকই কিন্তু ভারত সরকারের জন্যে। রুবেনার দুষ্টু বাবা গুণবতী মেয়েকে একটি হাতি উপহার দিয়েছিলেন ইন দা শেপ অফ আ স্ট্যান্ডার্ড টু থাউজেন্ড। সেটাকে ঝেড়ে দিলাম। নাউ, নাউ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট—এই টাকাটা দেখালে রুবেনা এন. এফ. ডি. সি-র লোন পাবে। বুঝেছো চাঁদু?

—রুবেনাদি তো এন. এফ. ডি. সি-র থেকে পুরো ফিনান্সই পেতে পারে। আফটার অল শি ইজ এ সেলিব্রেটি!

—দ্যাখ ভায়া, ওখানেও বিস্তর কলকাঠি, কোটারি, ক্লিক—যে কারণে এখন অবদি ও যা কাজ করেছে একটাও সরকারি টাকায় না। তবে থিংস মাইট চেঞ্জ....

বুলকু ওর মারুতি-জিপসি নিয়ে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে চলল। মিথিল উঠেছিল গৌতমের গাড়িতে। ক্যাসেটে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজে। গীতা ঘটকের—এখনও গেলনা আঁধার...গৌতম বলে,

হোপলেস সিচুয়েশন। এই নিয়ে জানিস মিথিল রুবেনাব সঙ্গে আমার ঝগড়া—আজকে এই অল পারভেডিং ঐ অ্যামেরিকান শুওয়ের বাচ্চাগুলোব পপ কালচাবের মধ্যে কোনও ভাল কাজ কি সম্ভব? টোটাল রিকল, বোবোকপ, ডাই হার্ড, ম্যাডোনা, ঐ জঘন্য হেভি মেটাল ব্যান্ডগুলো—সব, সব ভায়োলেন্স, সেক্স—বদমাইসির চূড়ান্ত। আব থার্ড ওয়ার্ল্ড তাই গিলছে...রুবেনা বলবে এটা পাসিং ফেজ। আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। কর্পোরেটের চাকর হতে পারি বাট বাট আমার একটা সোল অ্যান্ড মাইন্ড আছে লিখব, বুঝলি মিথিল—এই মিডিয়া কালচার নিয়ে লিখব..

মিথিলের গৌতমদাকে বেশ ভাল লেগে যায়। দারুণ ডায়নামিক। আলফাল কথা বলছেন না একটাও।

—আসলে কি জানিস! আব এক বাউন্ড গ্লোবাল লড়াই হবে। ক্যাপিটালের সঙ্গে হিউমানিটিব লড়াই। মার্কসবাদ নামক শর্ট-লিভড্ রিলিজিয়নটি যা পারল না। ডু ইউ নো একসময়,—যখন এস অফ কবতাম তখন ওঃ কত স্বপ্ন ছিল। ফাক্স্। হাম সব চোর হ্যায়। দুনিযাটা কে চালাচ্ছে বল্তো? ক্লিন্টন, কোল, মেজব, নাকি ঐ জাপানি লিডাবগুলো—ইমপসিবল নেম্স? ওরা? ঘেঁচু। দুনিয়াটা চালাচ্ছে—জি এম, আই বি এম, পেপসিকো, জেনারেল ইলেকট্রিক, কাইজাব, শেল, ফোক্সভাগেন, এক্সস্কন—এবকম কযেকশো মাল্টিন্যাশনালস। ভাবতে পাবিস ফার্স্টন্যাশনাল সিটি কর্পোরেশনেব প্রেসিডেন্ট বলছে, 'কনসিউমার ডেমক্রেসি ইজ মোব ইমপরট্যান্ট দ্যান পলিটিকাল ডেমক্রেসি', আই বি এম-এব এক শালা ফতোযা ঝাডছে দুনিযাব সব পলিটিকাল স্ট্রাকচাব পচে গেছে, এগুলো ব্যবসাব বাস্তায বাধা। দুনিযাব মানুষ মেনে নেবে? ছিঃ ভাবা যায না।

—কী কববে বলো।

—লড়বে। না পাবলে মবে যাবে। ইন প্রোটেস্ট মবে যাওযাও ইজ্জতেব। বসন্ত, ফাঁকা জায়গায় সাইড কবে লাগাও।

ইন প্রোটেস্ট মবে যাওয়াও ইজ্জতেব। কথাটা বড মনে ধবে মিথিলেব।

ইস্টার্ন মেট্রপলিটান বাইপাসেব ধারে দুটি গাড়ি। আকাশে কলকাতাব চাঁদ। হাওয়ায হাওয়ায় মাঝে মাঝে চামডাব কারখানার গন্ধ আসে আবাব হাওযায হাওয়ায় চলে যায। ভেড়ির জলে ছোট ঢেউ। বসাক-বসন্ত অনতিদূরে ঘাসে থেবড়ে বসে বাম খাচ্ছে ভিজে ছোলা দিয়ে। একথা সেকথা বেশি না হবার আগেই মিথিল বলে, 'আপনি এক্ষুনি বললেন না যে, ইন প্রোটেস্ট মরে যাওয়াও ইজ্জতের। তাহলে একটা সত্যি ঘটনা আপনাকে একটু বলি গৌতমদা। পুরো ঘটনাটা এখনও ঘটে নি। তবে কয়েকদিনেব মধ্যেই ঘটবে.'

ভোগীব কথা বলে মিথিল। ভোগী আসবে। কলকাতা দেখবে। তারপর. অভিমান্য যে একজন বধকর্তার কথা বলেছিল.. মুক্তি.

ক্যানেব পরে ক্যান বিয়াব শেষ হয় এবং সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলা হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আংটা ধবে টেনে ছিঁড়ে নতুন টিন খোলা হয়। মার্লবোরো সিগাবেটের প্যাকেট গৌতমদা খুলে সামনে রেখে দিয়েছে। বসাক এসে দুটো নিয়ে যায়।

—এই হারামী দুটোকে প্রোভাইড কবেছে গ্লোরিয়াস। বুঝলি মিথিল। একটা রিটায়ার্ড পুলিশের মাল, অন্যটা খালাস পাওয়া লাইফাব। মার্ডার কবেছিল। গ্লোরিয়াস যখন রিযাল এস্টেটে ঢুকলো, এখানে সেখানে মাশরুম প্রোমোটারদের সঙ্গে খটাখটি—তখন ব্যাটাবা অনেক ব্রেনস্টর্মিং করে বের করল যে, আমাদের জন্যে সিকিউরিটিব দবকাব—জ্যোতি বোসদেব মতো 'জেড' ক্যাটিগরি নয়, আমার মতো হরিদাসদের জন্যে ছোটহাতের 'এ'। অতএব বলরাম ও সুভদ্রা—মধ্যে আমি নুলো জাগারনট। ভালগার। অতলান্তিক ভালগাবিটি। এব মধ্যে ইম্যাজিন—ভোগী..

বুলকু তখন অবিরাম বিয়ার পানের ফলে অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক তাড়নায় দূরে গেছে যদিও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে. .আকাশে কলকাতার জাল চাঁদ মেঘ ঢাকা দিল বলে...গৌতমদা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—ভোগী...তুই কী শোনালি মিথিল...ভোগী ..ইন প্রোটেস্ট .ইন প্রোটেস্ট.

মিথিল ইতস্তত বোধ করে। সে কি বলে ফেলে ভুল করেছে?

হ্যাঁচকা টানে আব একটা বিয়ারের ক্যান খোলেন গৌতমদা। ছিটকে, ভুসভুসিয়ে ফেনা বেরোয। মার্লবোরো জ্বালেন।

—মিথিল! মিথিল! সেই বৃদ্ধ ইহুদি বুদ্ধিজীবীব নাম আমার মনে নেই যিনি জার্মান গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, লিখে রাখো। লিখে রাখো। মিথিল, হতে পারে অশিক্ষিত, ইন আওয়ার সেন্স, হতে পারে উন্মাদ—কিন্তু এটা আমাদেব ডিউটি যে ওকে ইমমবটালাইজ করতে হবে....তুই, আমি জানলে হবে না মিথিল .কনসিউমাবরা জানুক, কর্পোবেট জানুক, মিথিল . তোর মনে হয় নি মিথিল...ঘটনাটা কেউ জানবে না এ তো ভাবা যায় না...আই মিন উইদাউট হার্টিং হিজ ভ্যালুজ...

—কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব গৌতমদা?

বুলকু কিছু না বুঝেই এসে বলে, 'কী সম্ভব নয়? শালা পাতি গাড়ি চাব থাবডায ফর্মূলা কাব হয়ে যাচ্ছে...'

—চুপ কর্ বুলকু! নাউ লিসেন মিথিল...সবটাই চমৎকাব ভাবে করা যায। স্রেফ একটু বুকেব পাটা দরকার।

গৌতমদা কোটের ভেতরের পকেট থেকে নোটেব তাড়াটা বেব কবে বলেন, 'এত বড একটা স্যাক্রিফাইস হবে আর আমি, শালা কর্পোবেটের গিনিপিগ গৌতম রায় ল্যাবার মতো বসে থাকব? এই টাকাটা একটা বেটাব কাজে লাগুক। দবকাব নেই রুবেনার ফিল্মের। কী হবে, আল্‌টিমেটলি, ঐ ছাতার মাথার ফিল্ম দিয়ে। কিছু এসে যাবে?'

—কী করবেন গৌতমদা?

—কী করব? এই টাকাটা রুবেনাকে দিয়ে বলব ইউনিক এই ইভেন্টের একটা ভিডিও ডকুমেন্ট তোলো, তুলে রেখে দাও ফর পস্টারিটি। পাপস্খালন করো। টাকা, ফিল্ম সব ভুলে নিজের বিবেকটাকে বাঁচাও। লোকটার, মানে ঐ লিভিং সেইন্টের ইন্টারভিউ নাও, ওর কথা শোনো. .ওর সঙ্গে সঙ্গে যাও রাইট টু দা ব্লাডি অ্যান্ড গ্লোরিয়াস এন্ড...মিথিল...মিথিল...এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে...মনে পড়ছে ভিয়েতনামের মঙ্কদের সেলফ্ ইমোলেশন ..নব্বই দশকে ওয়েস্টের মুখে এই ডকুমেন্ট হবে একটা দুর্ধর্ষ নক আউট ব্লো...এ তোমার তাও অফ ফিজিক্স নয়...এই হল ইস্ট...এই স্যাক্রিফাইস দেখে শেখো. .

গৌতমদা আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। ফুঁপোতে ফুঁপোতেই জিজ্ঞেস কবেন, 'ভোগী, কবে আসবে রে মিথিল?'

—আমার হিসেব মতো পরশু। তবে অন্যরকমও করতে পারে। বলেছিল যে, শহর দেখার বড় শখ।

—সে সব হয়ে যাবে। গোটা শহব আগাপাছতলা দেখিয়ে দেব। আসলে আমাদের রেডি থাকতে হবে। আর কীই বা আমাদের করার আছে বল্ নিখিল।

কলকাতার চাঁদটা তখন বাইপাসের আকাশে চাকতির সাইডগুলো ঘষে ঘষে ধারালো করে তুলছিল। হাওয়ায় নোংরাপচা গন্ধ। বসাক আর বসন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় শ্রী থ্রি এক্স।'

এদিক থেকে গৌতমদাও চেঁচিয়ে উঠল,

—হাম সব চোব হ্যায়।

—জয় শ্রী থ্রি এক্স।

—হাম সব চোব হ্যায়।

গৌতমদা ও মিথিল ফোন নম্বব বিনিময় কবে। গৌতমদাব সেভেন ভিজিট। মিথিলদেব এখনও হয় নি। ঘেমো হাতে দুজনে হাত মেলায়।

ভোগী ডাল খেলো না। আডট্যাংবাব ঝাল দিয়ে অনেকটা ভাত সাপটেসুপটে খেলো। ঢক্ ঢক্ কবে জল খেলো। কালো কালো সুন্দবপানা যে-বৌটি খাবাব বেডে দিচ্ছিল তাবই ঢেলে দেওযা জলে মুখ ধুলো। কুলকুচিব জলটা বেডাব কোণে একটা জাযগায ফেলল। তাবপব পবনেব মযলা কাপডে হাত মুখ মুছে বলল, এবাবে ও পুকুবে, উত্তবেব পুকুবে নাইতে যাবে। উত্তবেব পুকুব যাব তাদেব সঙ্গে এ বাডিব দা কুমডো সম্পর্ক। সেটা যদিও ভোগীব জানাব কথা নয তবু সে বলে, 'ঝোগডা তো কি আচে? ভোগীব সঙ্গে কাবো ঝোগডা নি। চলো বলতিচি আবাব তখন কথা কি।'

তিন-চাবজন লণ্ঠন নিযে ভোগীব সঙ্গে সঙ্গে যায। বড বড গাছেব মধ্যে দিযে এঁকাবেঁকা পথ লণ্ঠনেব দুলে ওঠা আলোয উঁচু-নিচু লাগে। ভোগী হোঁচট খায। একজন ধবতে যায। ভোগী খ্যাঁক্ কবে ওঠে, 'এই শালা, ধববিনি তো। ভোগী ধবতেছে। হেলে ধবতি পাবে না, কেলে ধবতি যায। কেন হোঁচট খেলাম বল দিনি।'

ওবা চুপ কবে থাকে।

—এইখানে এক শালী মেছোমাগী আব আঁতুডেব মবা বাচ্চা শালাবা বড্ড অশৈল কবতেছে যত আঁদাডেব ভূত যাও, যাও দিনি অশৈল কবতি নেই যাও চলো। সবে গেচে।

উত্তবেব পুকুব পাডে যেতে না যেতে বে বে কবে মাছ-পাহাবাবা ছুটে আসে। 'কে? হেই খববদাব। কে?' ভোগী তখন কাপড ছেডে ন্যাংটো হচ্ছিল। 'তোব বাবাবে শালা।'

সঙ্গেব লোকেবা মাছপাহাবাদেব ফিসফিস কবে বলে। ওবা থতমত খেয়ে চুপ কবে যায। ভোগী জলে নামে। সাঁতবে চাঁদেব ছাযা ভেঙে ভেঙে দূবে চলে যায। কোথাও একটা মাছ লাফালো। ভোগী এত দূবে চলে যায যে, দেখাই যায না।

—বাপ বে।

হঠাৎ ডুব সাঁতাবে এসে অন্ধকাব জল থেকে মাথা বেব কবে। ডাইনে বাঁযে মাথা ঝাঁকায। উঠে আসে।

—মিবগেলেব বাচ্চাগুলো খালি কুট কুট কবে কামডাচ্ছে। কাব সাধ্যি একটু থিব হয়ে চান কবে।

কাপড পবে। তাবপব ওদেব বলে ফিবে যেতে কাবণ ভোগী এবাব চলে যাবে। যাবাব সময সেই কালো-কোলো সুন্দবী মেযেব ববটিকে বলে যায যেন দশ বছব বযস অবদি বাব বাব ছেলেব মাথাব চুল ফেলে দেয। ঘাড মোটা হবে। বাতবিবেতে ভোগী বিদায নেয়।

মিথিলকে স্টেশন ওয়াগন যখন বড বাস্তায ছেডে দিযে গেল তখন সওযা দশটা। এ বকম সময মিথিল অনেক বাব মিমিব সঙ্গে দেখা কবেছে। বাত এগাবোটা অবধি থেকেছে। কখনও বাডিব সামনে হেঁটে হেঁটে গল্পও কবেছে। মিথিল এগোয। মধ্যে দাঁডিযে সিগাবেট কেনে।

সেই বাতেই রুবেনাব সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হয গৌতমেব। রুবেনা তখন ওব স্টাডিতে বসে নতুন ফিল্ম-এব স্ক্রিপ্ট কবছিল। ওদেব একমাত্র ছেলে বুবিন ত্রিবেণী একাডেমিতে পডে। গৌতমই রুবেনাকে স্টাডি থেকে টেনে বাব কবল। রুবেনা খুব কাজেব মেযে। সেই বাত্তিবেই প্রথমে সে ভিভা ভিডিওব মালিক রূপেশকে ফোন কবল—বিটাক্যান ভিডিও ক্যামেবা, সনি ভিডিও

রেকর্ডার, বিটাক্যাম ক্যাসেট, মাইক্রোফোন, হেডফোন, মনিটর, পোর্টেবল জেনারেটর, মাল্টিটুয়েন্টি লাইট—এই সব কিছুর দুটো সেট যদি নেয় কী পড়বে জেনে নিল। কী রকম বুকিং আছে জেনে নিল। নিজে একটা ছোট্ট নিল আর একটা বড় হুইস্কি গৌতমকে দিল। এক ফাঁকে গৌতমের পিঠেও একবার কামড়ে দিল। তারপর এস. টি. ডি. করল বোম্বেতে—অনেকক্ষণ প্রমীলা মেহবার সঙ্গে কথা বলল। প্রমীলার সঙ্গে বি. বি. সি. চ্যানেল ফোরের খুব ভাল যোগাযোগ। তারপর আবার ফোন করল কলকাতায় সেই ছেলেটিকে যে বার্তোলুচ্চির সঙ্গে তাঁর শেষ ছবিতে কাজ করেছে। এরপব সি. ডি. প্লেয়ারে নরম ল্যাটিন বাজনা বাজিয়ে স্লিপিংসুট পরা গৌতম ও রুবেনা নাচতে থাকে। ঘরে তখন আলোও কম ছিল। টিমে তালে এই অবশ আনন্দময় নিরুদ্বিগ্ন নাচ বোধহয় তাদের খুব ভাল লেগে থাকবে। তা না হলে এঞ্জেল, সোর্ড টেল, গাপ্পি, গোল্ড ফিস—এরা সব একোয়ারিয়ামের একদিকের কাচের দেওয়ালে ভিড় কবেছিল কেন?

মিথিলের কাছে সবটা শুনে মিমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। জল খেলো। মিথিলকে জিজ্ঞেস করল খাবে কিনা? মিথিল বলল, না, গৌতম রায়ের ইমপোর্টেড বিয়াবে সে টইটম্বুব। বরং একবার বাথরুমে যাবে। সেখান থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মিথিলকে অবাক করে দিয়ে মিমি ফেটে পড়ল।

—তুমি যে একটা কাওয়ার্ড, মাসিব আহ্লাদে গোল্লায যাওয়া ক্যানারি বার্ড সেটা আমি কেন, সকলেই জানে। কিন্তু আমি জানতাম না যে তুমি, তুমি একটা, কি বলব, একটা পিম্প্।

—কী বলছ কী মিমি, কেন বলছ? হোয়াট হ্যাভ আই ডান?

—তুমি ভোগীকে বিক্রি কবেছো....সেটা জানো না ভোগীকে তুমি ফোর্থ রেট ফিল্মমেকার রুবেনা রাযের কাছে বেচে পয়সা নিয়ে....লজ্জা করে না তোমার...নিনকমপুপ!

—কোথায় পয়সা নিয়েছি দেখাও? কে পয়সা নিয়েছে?

—নাওনি, নেবে। সে তো একটা গ্রামের লোক—সে হয়তো মিসগাইডেড— যাই হোক না কেন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে? কী রাইট আছে তোমার? ভোগী কি তোমার প্রোডাক্ট যে, তুমি তাকে ইচ্ছেমতো বেচবে, বাঁদর নাচ নাচাবে!

—তুমি বুঝতে পারছ না মিমি—গৌতমদা ব্যাপারটা ফিল করেছে, এর মধ্যে কোনও বিজনেস বা মানি অ্যাঙ্গেল নেই।

—কচি খোকা! মাসি নাক টিপে দেয় আর দুধ বেরোয়। ন্যাকা। বদমাইশ! বিজনেস অ্যাঙ্গেল নেই। কোনও ইন্টারেস্ট ছাড়াই গৌতম রায় অফ গ্লোরিয়াস ফিনান্স অ্যান্ড ক্রেডিট ধেই ধেই করে নেচে উঠল?

—সত্যি মিমি, আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

—দ্যাখো মিথিল, ইতররা যখন স্টুপিড সাজে তখন আরও অসহ্য লাগে।

—ননস্টপ আমাকে ইনসাল্ট করে ভাবছো খুব ভাল কাজ করলে? তুমি ভাবতে পারলে আমি ভোগীকে বেচে দিয়েছি?

—হ্যাঁ, খুব ভাবতে পারলাম। নাউ প্লিজ ক্লিয়ার আউট! আর কক্ষনো আসবে না, ফোনও করবে না!

মিমি কেঁদে ওঠে। মিমির বাবা, মা, কুকুর। স্তম্ভিত। মিমির মা বলেন,

—কী হলে তোর মিমি? কী হয়েছে বাবা?

—কী আবার হবে। আপনার মেয়ে বলতে চায় যে আমি, হ্যাঁ আমি হচ্ছি জুডাস ইসকারিয়ট। ফর থার্টি পিসেস অফ সিলভার...আমি চললাম। গুড নাইট মিমি।

মিমি চেঁচায়, 'হ্যাঁ, চলে যাও। আব কক্ষনো আসবে না।'

মিথিল গট গট করে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় গিয়ে সে দেখেছিল যে সিগারেটের প্যাকেটটা সে মিমিদেব বাড়ি ফেলে এসেছে। গুলি মাবো! আব এক প্যাকেট সিগাবেট কেনে। একটা বেব কবে জ্বালায়। টাকাব ধান্দা কবলে মিথিল উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে কযেকটা টিউশনি নিয়ে চুপ করে থাকতো না। কর্পোবেটে ধান্দা কবলে মিথিল অনেক আগেই ভিড়ে যেতে পারত। হয়তো ড্রাগ আমাব বোঝাব ক্ষমতাটা কমিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবলে মিথিলেব ভয় হয়। হাম সব চোর হ্যায়। আমি চোব নই। মিমি যাই বলুক। মিথিল বিড বিড কবে বলেছিল, ভোগীব সঙ্গে আমিও শালা চলে যাবো। যা হয হোক। ট্যাক্সি।

সেই রাতে পৌনে একটা আব একটায দুবাব ফোন বেজেছিল। বেজে বেজে থেমে গিয়েছিল। মিথিল শুনেও যায নি। মাসিমণি ঘুমেব ওষুধ খেয়েছিলেন সে বাতে, তাই শুনতে পান নি। প্রথম ফোনটা গৌতমদাব। পবেবটা মিমির।

সকালবেলা দরজায় ধাক্কা দিযে ভোগী উপস্থিত। বাড়ির কাজের লোক অনন্ত সবিশেষ বিবক্ত হয় দবজায বেল না দিযে ধাক্কা দেওযাব জন্যে। সে গিযে মাসিমণিকে ডেকে আনে। একমুখ দাড়ি, একমাথা চুল, নোংবা কাপড-জামা, সঙ্গে একটা পঁটুলি অথচ হাসি হাসি মুখ, 'আপনি তো মাসি। ঠিক চিনেচি। এই যে বাবুব নিজির হাতে লেখা নাম ঠিকানা!'

সত্যিই তো মিথিলেবই হাতেব লেখা। মাসিমণি ভোগীকে বাইবের ঘরে নিয়ে যান। বসতে বলেন। ভোগী সোফাব ওপবে বসতে যায়, তাবপব কি মনে করে নীচে জড়োমতো হয়ে বসে। গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পকেট থেকে দেশলাই বাক্স বের করে, তার মধ্যেই বিড়ি ছিল। এর মধ্যে কয়েকবাব সে অনন্তর দিকে তাকিয়ে হেসেছে। অনন্তও একটু মজেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ায় টেবিল থেকে অ্যাসট্রে এনে ভোগীর সামনে রাখে।

—এতে ছাই ফেলো। কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—এলটা আবার কে? যাওয়া হচ্চে। বুঝতি পেরেছেন? যাওয়া হচ্চে।

মিথিলকে মাসি ধাক্কা দিযে তোলেন, 'তোর কাছে একটা অদ্ভুত দেখতে লোক এসেছে। কাকে ঠিকানা দিয়েছিলিস?'

মিথিল লাফ দিয়ে ওঠে। 'এসেছে?'

তড়িঘড়ি ঘডিটা পবে। দুদ্দাড় কবে সিঁড়ি টপকে টপকে নামে। ঘবে ঢুকতেই ভোগী দাঁড়িয়ে ওঠে, একগাল হাসি। 'বাবু!'

মিথিল ভোগীকে জড়িয়ে ধরে।

—আর বাবুটাবু নয়। এবার নাম বলতে হবে। মিথিল।

—তা কী করে হয় বাবু!

—ঠিক আছে, মিথিল, মিথিলবাবু।

—মিতিলবাবু। ভাল হল। নামও করা হল। বাবুও বলা হল। তাহলে আপনি আমারে কী বলবেন?

—সেই তো। তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।

—আমার নাম ভোগী। ঠিক নাম নয়। যেমন ধরুন বাঘ, মানুষ কুমীর—এইরকম বড় জাতের নামধারণ—ভোগী।

মিথিল মাসিমণিকে বলে, 'মাসিমণি। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন একজন, কী বলব, সাধুসন্তের মতোই মানুষ, নাম হল ভোগী। এখন আমাদের কাছে কয়েকদিন থাকবেন।' মাসি নমস্কাব করে। ভোগী প্রণাম করে।

—খুব ভাল মাসি বাবুর। মানে মিতিলবাবুর।

মিথিল বলে, 'জানো, আমাকে দেখেই উনি তোমার কথা বলেছিলেন। আর এই হল অনন্ত।'

—ওনার সঙ্গেতে আগেই পরিচয় হয়েচে।

মিথিল ভোগীকে নিয়ে ওপরে নিজের ঘরে যায়। ভোগীকে বসায়। বসিয়ে বলে, 'একটু, মানে তেমন কিছু নয়, ঝামেলা হয়ে গেছে, বুঝলে।'

—ঝামেলা মানে হুজ্জুৎ?

—হ্যাঁ, তোমার কথাটা বলে ফেলে. .

—ছি, ছি, কী ভাবলেন তেনারা

—কী আবার ভাববে, তাদের মাথা ঘুরে গেছে!

—না গো মিতিলবাবু। ও মাথা ঘোরার মন্তব নয়। ও হল গে ঘুরঘুবি পোকার বাসা। ঘুরঘুবিব গপ্পো জানো তো? মাটি খুঁড়তেছে, মাটি খুঁড়তেছে—কি না কেঁচো ধববে। হঠাৎ শালা ঘুবঘুরিব পাল বেইরে পড়ল .

ভোগী হা হা কবে হাসে। মিথিলের ঘব দেখে।

—ভাল, কিন্তু আগোছালো। সংসার করলি ঠিক হয়ে যাবে।

—দূর, ওসব ঝুটঝামেলায় কে যাবে?

—তা বললি হয় নাকি। সংসাব করা না করার সিদ্ধান্ত কি মিতিলবাবু ঠিক করবে?

ভোগীকে মিথিল স্নানে পাঠাল। শাওয়ার দেখাল। বালতিতেও জল ভরে দিল। তাবপব নিজের একটা কাচা পাজামা, পাঞ্জাবি দিয়ে বলল স্নানের পরে পবতে। ভোগী কিছুতেই পরবে না।

—আরে বাবা, তোমার কাপড়চোপড় আমি সব রেখে দিচ্ছি। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। এখন তো এটা পবো। আর দরকারও আছে। বললাম না একটু ঝামেলা হয়ে গেছে।

ভোগী বিড়িদেশলাই নিয়ে স্নানে ঢুকে যেতে মিথিল একটা সিগাবেট ধবালো। ধবিয়ে, মাসিমণির ঘরে গিয়ে গৌতমদাকে ফোন করল। সিক্স ডিজিট থেকে সেভেন ডিজিটে নম্বর পেতে অনেক সময় বিস্তর ঝামেলা হয়। শেষ অবধি লাইন পায় মিথিল। বেজেই যায়। বেজেই যায়। ফোন তোলার শব্দ। গৌতমদার বাড়ির জানলায় কাক ডাকছে। শুনতে পায় মিথিল। ঘুম জড়ানো গলা। ইনিই কি রুবেনা?

—হ্যালো!

—এক্সকিউজ মি, একটু বেশি সকালেই ফোন করলাম। আমি একটু গৌতম রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—ও তো এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। আপনার নম্বরটা দিলে আমি ওকে রিং ব্যাক করতে বলব।

—শুনুন, ব্যাপারটার একটু আর্জেন্সি আছে। আমার নাম মিথিল, মিথিল চৌধুরি।

—ও! হ্যাঁ। আমি রুবেনা রায় বলছি। এক্ষুনি ডাকছি ওকে। কেমন?

—হ্যাঁ, প্লিজ!

আবার কাকের ডাক। গাড়ির হর্ন। সময় যায়। রিসিভার তোলার খচমচে শব্দ।

—হ্যালো, গৌতমদা। আমি মিথিল বলছি।

—হ্যাঁ, বল্। এসেছে?

—সেইটাই গৌতমদা। আই অ্যাম রিয়্যালি সরি। আসলে ওরকম কিছু নেই। একটা কক্ অ্যান্ড বুল স্টোরি।

—হোয়াট! ইউ আর লাইং! মিথিল... একটানা চিৎকার করে গৌতম রায় এদিকে যে দু সেট ভিডিও ইউনিটের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছে...তোর এই কথাগুলো একটাও আমি বিশ্বাস করি না. .নিশ্চয় তুই অন্য কারো সঙ্গে ডিল করেছিস .আমি শালা লোক চরিয়ে খাই...কোনও ডুবিয়াস ডিল করে লাভ হবে না বসাক বসন্তকে দেখেছো, এবার চিনবে ভোগী যদি আসে ওকে তুলে নিয়ে আসবো ..গ্লোবিয়াসের লং—লং হ্যান্ড সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই...যেমন কুকুর তেমন মুগুর .গ্লোবিয়াসের ক্লাউট কাকে বলে এবার ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ইউ বাস্টার্ড.

—গৌতমদা, আপনি বিশ্বাস করুন, ভোগী ফোগী সব আমার ব্রেন ওয়েভ . জাস্ট আ ফিগমেন্ট অফ ইম্যাজিনেশন।

সত্যি, মিথ্যে না বুঝলে গৌতম রায় হতো না। পেছনে শোনা যায় রুবেনার গলা—তুমি আমাকে একবার ফোনটা দেবে? ওকে, মিথিল. .তুমি কারও সঙ্গে ডিল করে, আমার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট ব্রেক করে পার পাবে না. .নাউ, নাউ বসাক ও বসন্ত. একজন রিটায়ার্ড অথরাইজড কিলার—একজন কনভিকটেড মার্ডারার ওদের কাজ হবে তোমাকে ট্যাক্‌ল করা—আরও আছে—মিথিল, লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন ফর ইউ

ক্রমাগত শাসানিতে মিথিল ঘাবড়ায় আবার রেগেও যায়।

—আপনি ফাল্‌তু বকবক করছেন গৌতমদা। ডোন্ট ট্রাই টু স্কেয়ার মি—সহজ ব্যাপারটা এই যে, ভোগী বলে কেউ নেই, কিছু নেই. .

স্নান করে, মিথিলের পোশাক পরে, ভিজে চুলদাড়ি বেয়ে জল পড়ছে, ভোগী এসে এক ফাঁকে মিথিলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে হঠাৎ মিথিলকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,

'বদর গাজি বাপ
কেউটে কুমির ভাল্লুক
যেন করতে পারি সাফ. কে বলচে—ভোগী আসে নি?'

গৌতমদা চেঁচায়. .কে কথা বলল? কে? হতচকিত মিথিল ফোন নামিয়ে রাখে। ক্যাবলার মতো বলে, 'এখন কী হবে ভোগী?'

—কী আবার হবে? হুজ্জুৎ, এবারে জমবে মোচ্ছব। ঘাবড়াবার কী আচে?

—নেই?

—ধুস্।

মিথিল চটপট তৈরি হয়ে নেয়। মাসিমণি খাবার দেওয়ার সময় দেখে মিথিল মুখ দিয়ে অদ্ভুত জন্তুর আওয়াজ করে হাত মুঠো করে, পা আকাশে ছুঁড়ে ক্যারাটের টেকনিক দেখাচ্ছে আর ভোগী খুব হাসছে। মিথিল অনন্তকে দাঁড় করিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আবার সরে আসছে এবং বলাই বাহুল্য যে, সে এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছে না।

—ই...ই...আঃ বুঝলি, গাঙ্গুলিদা বলেছিল যে, মিথিলকে কিওকুশিন ব্ল্যাক বেল্ট কেউ আটকাতে পারবে না।

মাসিমণি বলেন, 'কী হচ্ছে কী মিথিল। বলা তো যায় না, যদি লেগে যায়!'

—লাগবে না। লাগবে না। অনন্ত, ধর তোর নাম বসাক বা বসন্ত...তখন কী হবে বল তো...এই দ্যাখ লিভারটা ফেটে গেল...

—আঃ মিথিল।

মিথিল ভোগীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়াব আগে মাসিমণির কাছে থেকে বেশ কিছু টাকা নেয়।

—এই কদিন ক্যাশ ফ্লো-টা একটু জেনেরাস রাখতে হবে, বুঝেছো তো।

—তাহলে তো অনন্তকে ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে।

—পাঠাও।

—দুপুরে খাবি তো?

—এখন বলা সম্ভব নয়। খেতেও পারি, নাও খেতে পারি।

ওরা ট্যাক্সি নেয়। ভোগী এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। বাস বা মিনিবাস গায়ের ওপর এসে পড়লে সিটের ভেতরে ঢুকে আসে।

—উবে শালা। যখন এলুম তখন সক্‌কোলে ঘুমোচ্ছিলেন। এইবাবে সব দুদ্দাড় করে বেইরে পড়েচে। জোর মোচ্ছব, জোর মোচ্ছব!

স্টেট ট্রান্সপোর্টের ত্রিতলিকার পেছনে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। মিথিলদেব ট্যাক্সিও।

—হাতি দেঁইড়ে গেল তো পোঁদে পেঁদে সব দেঁইড়ে গেল! তাজ্জব বেপার!

ট্যাক্সি ড্রাইভার হেসে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু নয়া হ্যায় কেয়া?'

মিথিল বলে, হাঁ। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজের মনেই বলে, কলকাত্তা ঘুমনে আয়া। তারপরই খিস্তি করে—কারণ একটা অটো বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করছিল। অটোর ড্রাইভারও উল্টে গালিগালাজ করে। ভোগী আনন্দ পায়, 'মোচ্ছব! মোচ্ছব!'

বড় বাস্তা থেকে ট্যাক্সি ছোট রাস্তায় ঢোকে। ঠিক বাড়ির সামনে নয়, একটু ছেড়ে দাঁড় কবাতে বলে। ট্যাক্সি ছাড়ে না। গাড়িতে ভোগীকে বসতে বলে কিছুক্ষণ। বলে ভয়ের কিছু নেই। ড্রাইভারও হেসে বলে, 'ডরনেকা কুছ নেহি হ্যায় বাবুজী'।

—ভোগীর আবার ভয়। তুমি আমারে একটা সিগ্রেট দিয়ে যাও দিনি।

মিথিল কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে। করে বেল টেপে। দরজা খুলে দেয় মিমি, মুখে একগাল হাসি, 'আমি কাল রাত্তিরে ফোন করেছিলাম।'

—ভাল করেছিলে। এখন ভেতরে চলো। দরকারি কথা আছে।

মিথিল ঢুকতেই কুকুর দৌড়ে এসে লাফাতে থাকে। মিথিল তাকে কোলে তুলে নেয। সাদা স্পিৎজ্। নাম পুঁটি।

—শোনো, বাইরে ট্যাক্সি ওয়েট করছে। তাতে ভোগী বসে আছে।

—আছে। এসেছে।

—চুপ করো। না লাফিয়ে এখন শোনো। সকালে আমি গৌতম রায়কে ফোন করেছিলাম। বললাম ঐ ভোগী ফোগী সব ঢপ, আমার ম্যানুফাকচার। কিছুতেই শুনবে না। খালি থ্রেট করছে। বলছে ওর দুটো বডিগার্ড আছে—বসাক আর বসন্ত—একটা কিলার।

—কী করবে তোমায়? মারবে?

—সেটার ভয় করছি না। ফোনের শেষটায় ভোগী হঠাৎ চেঁচিয়ে মেচিয়ে ভাণ্ডাফোঁড় করে দিল। দেখ, ঝামেলা ওরা করলে আই ক্যান ভেরি ওয়েল ফেস দ্যাট। কিন্তু ভোগীকে জড়িয়ে কিছু হোক আমি চাই না। সেকেন্ডলি গৌতম রায়ের ক্লাউট, তার ডাবল ও সেভেন সিকিউরিটি—এরপর ইনেভিটেবলি পুলিশটুলিশ জড়িয়ে একটা কেলো। ভোগীকে এর বাইরে রাখতেই হয়। একটা অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা...

—এখন থাকছে কোথায়?

—কোথায় আবাব, আমাব কাছে। আচ্ছা মিমি, তোমাব সেই লিজেন্ডারি মামা কিছু করতে পারেন না?

—কী করবেন মামা?

—আরে বাবা, ওরা ইচ্ছে কবলে সব পাবে।

—অবশ্য আমি বললে দাঁড়াও একটা ফোন কবি। থাকলে হয় আবার! নাম্বারটা নিয়ে আসি।

দৌড় মিমি তার ডায়রি নিযে আসে।

—ফোর ফোরটা কী হয়েছে জানো?

—টু ফোব ফোব সম্ভবত।

—দাঁড়াও, দেখি।

মিমি ডায়াল কবে।

—এনগেজড়্। আমাব মাফিয়া মামার লাইন এনগেজড়্। মিথিল, আই লাভ ইউ।

—ননসেন্স। আবার কবো।

মিমি আবার ডায়াল কবে।

—ইমপসিবল।

—এবারও অনগেজড়্?

—না, এবাব বলছে প্লিজ চেক দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডাযালড়্।

—চেক কবো তাহলে।

পুঁটি এবার মিমির কোলে গিযে উঠেছে। মিমি তাকে চটকে আদব কবে। ডাযাল করে।

—রিং করছে! রিং কবছে। হ্যালো, হ্যালো, কি ঘিটিবঘিটিব আওযাজরে বাবা, হ্যালো, হ্যাঁ জোরেই বলিছ, মন্টু মামা আছে? দুর ছাই, বলুন না আমি মিমি. .হ্যাঁ হ্যাঁ, মিমি বললেই হবে.. (হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে) গাধা কতগুলো ফোন ধবে .

মিথিল সিগারেট ধবায়। সিগাবেটের ধোঁয়া নাকে লাগায পুঁটি ফ্যাঁচ করে হাঁচে। মিথিল বলে, সরি!

—মামা...শোনো, আমি মিমি বলছি। হ্যাঁ, মিমি। তোমার সঙ্গে ভীষণ দবকাব। আমি এক্ষুনি আসছি। খুব দরকার মামা। হ্যাঁ, মা, বাবা সবাই ভাল। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব। আর এই শোনো, এটা একেবারে পার্সোনাল.. না না বাবা, বিয়েটিয়ে করি নি.. ওসব না...আসছি...বাখছি।

—শোনো, চটপট, তুমি রেডি হয়ে বেরিয়ে এস। ট্যাক্সিটা একটু আগে দাঁড় করিয়েছি, আগে মানে বাড়ি ছেড়ে...

মিথিল ট্যাক্সিতে এসে দেখে ভোগী সিটের ওপরে বাবু হয়ে বসে ড্রাইভারের সঙ্গে জব্বর গল্প জুড়ে দিয়েছে।

—ভ্যানরিকশা যেমন ভাড়ায় চলে, এও তেমনি ভাড়া?

—হ্যাঁ, ঐ যে মিটার! ওতে ভাড়া উঠছে।

—দেকিচি। ভোগীর সব দেখা হয়ে গেছে।

মিমি এসে যায়। এসেই জানলা দিয়ে মাথা নিচু করে ভোগীকে দেখে। ভোগী, মিথিল, মিমি বসে। সকলেই হাসছে। যদিও আলাপ হয়নি। মিথিল বলে, 'চলিয়ে ড্রাইভার সাহাব। ট্যাংরা!'

ট্যাক্সি স্টার্ট দেয়।

—ভোগী, এ হচ্ছে মিমি, আমার বন্ধু।

—কী নাম বললে, মেমি?

—মেমি নয়, মিমি।

—থামো দিনি। মেম থেকে নাম তো। তাই মেমি। আমি ঠিকই বলেছি। তাই হল, মেমি।

ভোগী বেশ জোরেই বলে ওঠে, ও ড্রাইভার সাহেব, চলো, চলো, খরো খরো চলো, মেমির মামাবাড়ি দেখব মন করতেছে...'

মিমি অবাক হয়ে যায়। মিথিলকে বলে, 'ওঁকে বলেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

—ভোগীকে কিছু বলতি হয় না মেমিদিদি। ভোগী সব আগেভাগে বুঝতে পারে।

এ রাস্তা, সে রাস্তা পেরিয়ে চৌরাস্তায় মোড়। ট্রাফিক সিগন্যাল। পুলিশ কীভাবে রাস্তা সামলাচ্ছে ভোগীকে মিথিল বুঝিয়ে দেয়।

—গেরামে পুলিশ তো চোর ধরে। একানে ধরে না।

মিমি বলে, 'চোরডাকাত ধবার পুলিশ আলাদা।'

মাদার ডেয়ারির বিশাল দুধের ট্যাঙ্কার দেখে অবাক হয়ে যায় ভোগী। তার থেকেও অবাক কাচের মড়ার গাড়ি দেখে। মড়ার গাড়িটাকে ওভারটেক করে ড্রাইভার।

—ভাল হল। বুঝলে মেমিদিদি, ভাল হল।

—কেন?

—বাঁদিকি মড়া গেলি শুভ হয়। বেশ মজা। কাচেব ঘরে পুতুলেব মতো পড়ে আচেন। দ্যাকো, দ্যাকো, আমাকে দ্যাকো। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেকব না। সব দ্যাকা হয়ে গেচে। দিব্যি শুয়ে আচেন।

মিথিল মিমিকে বলে, 'কী গো মেমিদিদি, কিছু মাথায ঢুকলো?'

—একটু, একটু।

—ভাবছি তোমার মন্টুমামা আবার পাল্টি না খেয়ে যায়।

—কেন?

—খেলেই হল। হাজার হলেও রাঘববোয়ালদের ব্যাপার তো। ওদের মধ্যে কখন যে কী আন্ডারস্ট্যাডিং হয়ে যায়।

মন্টু মিত্তিরের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দেয় মিথিলরা। এলাকাটা মোটের ওপর ঘিঞ্জি হলেও কিছু জায়গাওয়ালা বাড়িও রয়েছে। গেটে দারোয়ান মিমিকে দেখে সেলাম করে। মিমির সঙ্গে দুজনও সহজেই ছাড়া পায়। তা না হলে এ বাড়িতে ঢোকা এত সহজ নয়। বিশেষত মাস চারেক আগে বোমচার্জের সেই ঘটনার পরে। হাই পাওয়ার এক্সপ্লোসিভ ছিল বোমায়। বাইরের ঘরটার প্রায় কিছুই ছিল না। ঘরে তখন মন্টু মিত্তির ছিলেন না। কিন্তু পুলিশের খাতায় দুই দাগি আসামি, কানা সুধীর আর মুন্না মারা যায়।

মন্টু মিত্তির মোটা, ফরসা, কুচকুচে কলপ করা চুল। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা। ঘরে বেশ কিছু লোক। মিমিকে দেখে উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে আসেন। বুকে টেনে পিঠ চাপড়ে আদর করেন। মিথিল লক্ষ করে আনসারিং মেশিনটেশিন লাগানো বিরাট এক অন্য রকম টেলিফোন। দু তিন প্যাকেট ইন্ডিয়া কিং। চায়ের কাপ। মিমি বলে, 'মামা, আমরা পাশের ঘরে গেলে ভাল হয়।'

—আমরা কী করতে যাবো। ওরা বরং বাইরে যাক। এই তোরা বেরো তো। আরে বসো ভাই। বসো।

মিমি বলে, 'এই হল মামা মিথিল আর ইনি আমাদের বন্ধু। মিথিল এবার তুমি মামাকে গুছিয়ে বলে দাও সবটা।'

মিথিল বলতে থাকে। ভোগীর সম্বন্ধে সবটা যদিও বলতে পারে না। মোট কথা গৌতম রায়ের

ব্যাপারটা কী করে সামলানো যায়, 'মানে, দেখুন, আমিও মামাই বলছি, আমরা চাই যে, গৌতম রায় যেন বাগের বশে ঐ বসাক আর বসন্ত, ওদেব দিয়ে কিছু করে না বসে। মানে কোনওভাবেই আমাদের এই বন্ধুর প্রোগ্রাম যেন আপসেট না করা হয়।'

—সে বুঝলুম। কিন্তু খট্‌কা একটা লাগছে। মিমি, কেসটা ক্লিয়ার নয়।

—সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে মামা। আগে ঐ গৌতম বায়।

—দাঁড়া, দাঁড়া, আমাব যদি বুঝতে ভুল না হয় তাহলে তোদের এই বন্ধুর ওপরে ওদের নজব আছে, একটা ভিডিও মিডিও কী করতে চায়—কিন্তু কেন? ইনি কে? আমি অবশ্য এখনকার স্টারফার সব চিনি না।

—সে ব্যাপাব নয়। ইনি দেখুন, ইনি হচ্ছেন

ভোগী বলে ওঠে, 'আজ্ঞে মামা, আমি হলাম গে ভোগী'

—ভোগী? যোগী টোগি হয় জানি, এই যেমন ঐ যে তোমাব গিয়ে বাবা লোকনাথ, তারপর ঐ যে মড়া নিয়ে কী কেচ্ছাবে বাবা ..ভোগী তো কখনও শুনি নি। সেটা আবাব কী?

মিথিল বেশ ফাঁপড়ে পড়েছে। তবু যতটা পাবে ম্যানেজ কবাব চেষ্টা কবে।

—ভোগী মানে, ইনিও এক ধরনের সাধু বুঝলেন!

—ও আই সি।

—মানে ওঁবও বেশ কিছু ক্ষমতাটমতা আছে, এলাব কিছু সিক্রেট পাওয়ার মানে বিভূতি বলতে পাবেন, এসব আছে এবং সেটার ভিডিও তুলে, সোজা কথা ওরা ব্যবসা করতে চায় এখন তাতে আমি না বলেছি বলে

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। এক এক কবে, সিবিযালি, বুঝতে দাও। তুমি না বলার আগে হ্যাঁ বলছিলে?

—আজ্ঞে, প্রায় তাই।

—পরে না বললে কেন?

—আজ্ঞে আমার ভুল হযেছিল।

ভুলটা ধরিয়ে দিল কে?

ভোগী বলে ওঠে, 'কে আবার? মেমিদিদি।'

—কিবে মিমি। এটা ঠিক?

অবাক মিমি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—তা গৌতম বায়কে এখন ফোটতে হবে, এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হল না। আগেই হ্যাঁ ব'লো না। কথার খেলাপটা আমাদের দিকে। তার তো কোনও দোষ নেই?

—না।

—অতএব আমাদের যেটা করতে হবে সেটা বাজনীতির পরিভাবায় যাকে পজিশন অফ স্টেংগ্‌থ্ বলে, তার থেকে কথা বলতে হবে। বাংলা কথায় রং নিতে হবে, রোয়াব দেখাতে হবে, চমকাতে হবে। লোকটার নাম হচ্ছে গৌতম রায়, গ্লোবিযাসের পি. আর. ও, বৌ-এর নাম রুবেনা, জিরো জিরো সেভেনের বসাক, এক্স-পোলিসম্যান এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লাইফার বসন্ত—তা বাবাজীবন মিথিল, মালের টেলিফোন নম্বরটা দাও তো...

মিথিল দেয়। ডিজিটাল ডায়ালিং। একবাবেই লাইন পেয়ে যান মন্টু মিত্তির...

—নমস্কার। গৌতম রায় আছেন নাকি? বাঃ বাঃ কী সৌভাগ্য আমাব। আজ্ঞে, আমি ট্যাংরার

থেকে বলছি।...হ্যাঁ...আজ্ঞে অধমের নাম মন্টু মিত্তির...ও বুঝতে পেরেছেন। কী সৌভাগ্য আমার...তা বড় দরকারে পড়ে ফোন করলাম যদিও জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ...না, না, তা বলছেন কেন, আমার মতো হরিদাস পাল কত আছে, কত থাকবে, তবে হ্যাঁ, আমি আপনার স্ত্রীর ফিলিমের একজন অ্যাডমায়বার, 'অসতী'-র ভিডিও ক্যাসেট আছে, কী ছবি, কী সাহস...হ্যাঁ, তা যে দবকাবে আপনাকে বিরক্ত করলাম সেটা হল, মিথিল নামে ঐ যে ছোঁড়াটা, হেঁ হেঁ...খুব রেগে আছেন দেখছি...আর বলবেন না, স্কাউন্ড্রেল বলে স্কাউন্ড্রেল, দুবেলা উদোম করে জুতোতে হয়, হাড়বজ্জাত...তা ঘটনাচক্রে মিথিল হল বলতে গেলে আমার বিশেষ স্নেহধন্য বুঝলেন, জানি অন্যায় করে, আপনাদের মতো লোককে খচাতে সাহস পায় কিন্তু আমার ব্যাপারটাও বুঝুন, বলতে গেলে প্রায ঘরের ছেলেই, তাই আর কি আগলে আগলে রাখি, কী করব বলুন. .হ্যাঁ, হ্যাঁ স্নেহ অতি বিষম বস্তু, সে কী আর করা যাবে, তবে আপনাব কোম্পানি কাজটা বড় ভাল করেছে, খুব দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে...কোন্ কাজটার কথা বলছি বুঝতে পারলেন না, বলছি, বলছি. .আপনাদের টি ডিভিশনের দুজন এক্সিকিউটিভকে কিডন্যাপ করাব পর আপনাদের জন্যে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করে...চিনি বই কি, কাউকে কাউকে চিনতে তো হয়ই যেমন ধরুন ঐ যে জিরো জিরো সেভেনের বসাক বলে একটা ভুঁড়ো খচ্চর আছে...অ্যাঁ, বলেন কি, ওটাকে আপনার সঙ্গে দিয়েছে...আরে ও ব্যাটা যখন পেঁড়োতে দারোগা ছিল তখন পেঁড়ো-আঁটপুর রুটে প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া খাটাত, খুব লাথিয়েছিলাম একবার...হ্যাঁ, হ্যাঁ লাথিয়েছিলাম, সে কি হাউ হাউ করে কান্না, খালি পা জড়িয়ে ধরে, খালি পা জডিয়ে ধবে, জিজ্ঞেস করবেন। ভোলার কথা তো নয়—আব ঐ কে বসন্তফসন্ত ওসব আমি চিনি না. .এইবার তাহলে রাখি...হ্যাঁ, আর মিথিলকে আমি টিট কবে দেব, দেখুন না কী করি. .আচ্ছা এবার রাখি তাহলে...নমস্কার, ম্যাডামকেও বলবেন, বড় আলাপ করতে ইচ্ছে তবে ঐ ফুরসত নেই. আচ্ছ, আচ্ছা, না, না, মিথিলকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তাই আমি আর করব না, আপনিই তো অভয় দিলেন স্বয়ং...আচ্ছা ভাই রাখি তাহলে...আচ্ছা, আচ্ছা...

মন্টুমামা হাসিমুখে রিসিভার রাখেন। বেল বাজান। যারা বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা ঢুকতে থাকে।

মিথিলকে বলেন, 'যতটা পারি মোলায়েমের ওপর দিয়ে সারতে হল। কী করা যাবে বল? গুবলেট কেস তো, যে কেসের যেরকম সওয়াল।'

মিথিল কানে কানে মিমিকে জিজ্ঞেস করে, 'মামা বিয়ে করেন নি?'

—করেছিল। ডিভোর্স হয়ে গেছে।

মিমি এবার ইনিশিয়েটিভ নেয়।

—মামা, আর একটা কথা ছিল।

—দাঁড়া, হাঁ রাখ্, ওদের সামনে রাখ।

কোল্ড ড্রিংকস আর মিষ্টি। স্ট্র দিয়ে কীভাবে খেতে হয় ভোগীকে বোঝাতে হয় না। মিথিল বলে, 'কেমন খেতে।'

—ভাল। তবে ঝাঁজ দিচ্ছে।

মামা এবার বলে, 'এদের সঙ্গে দুমিনিট সেরে নি বরং তারপর শোনা যাবে। অত সহজে ছাড়ছি না।'

এসেছিল আসলে দুটো দল। তিন-চারজন ভেড়ির মালিকদের দলটা কয়েকদিন ধরেই আসছে। ভেড়িতে ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। পুলিশ কিছু করবে না, ওদিকে নতুন বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েও বেগড়বাঁই করছে। মামা বললেন যতটা চেষ্টা তদ্বির করার তিনি করেছেন। ও. সি-র সঙ্গে কথাও হয়েছে। তবে সময় লাগবে। দ্বিতীয় দলের একজনকে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার সময় বাইরের

ছেলেরা ক্ষুর মেরে দিয়ে গেছে।

—তা তোরা এতজন কি ঘাস কাটছিলিস? যা হোক সেই ছোঁড়াটা কোথায়?

—কোন ছোঁড়াটা সার?

—ঐ যেটাকে ক্ষুব মেরেছে।

—আজ্ঞে সাব, এন. আর এস-এ।

—কোথাকার ছেলেরা এসেছিল।

—এন্টালির সার।

—এন্টালি তো আব এইটুকু জায়গা নয়। ক্লাবেব নামটাম নিয়ে এলে দেখা যেতে পারে। তবে বেশি কিছু তো কবার নেই। সিনেমাব টিকিট ব্ল্যাক কবাটাও খারাপ কাজ, ক্ষুর মাবাটাও ভাল কাজ নয়।

মামা ছেলেটাব বাড়ির জন্যে দু'শ টাকা দিযে দিতে বললেন। দুটো দলই চলে গেল।

—শুনলেও গা জ্বলে যায আবার না দেখলেও চলে না। আমাব হয়েছে ভাল জ্বালা। তারপব .. ভোগীব দিকে তাকান। তাকিযে থাকেন।

—কদিন থাকা হবে কলকাতায়?

—আজ্ঞে দুদিন।

—কেন? দুদিন কেন? দুদিনে কি কলকাতা দেখা যায?

—তা কী করব বলুন। তাব বেশি থাকাব আব উপায নেই।

মিমি বলে, 'আচ্ছা মামা, দু-তিন দিনেব জন্যে আমাদেব একটা গাড়ি দিতে পারবে?'

—গাড়ি না হয একটা ভাঙাচোবা যোগাড কবা গেল। তেল, ড্রাইভাব—এসব খরচ কে দেবে?

—কেন, তুমি দেবে।

মামা মিথিলকে বলেন, 'শুনেছো কথাটা! অবশ্য মিমি এটা চাইতেই পাবে। গতবারের মিমির জন্মদিনটা তো হলই না।'

মিথিল বলে, 'শুনেছি। মিমির কাছে।'

—হৈ, হট্টগোল, দু দুটো ডেথ, মধ্যে থেকে মিমিব জন্মদিনটা ক্যানসেলড্ হয়ে গেল..

—তবে বাবু একটা কতা বলব, যদি কিছু মনে না কবেন?

—না, না, মনে কবার কী আছে। বলুন না!

—ভোগীর দশটা কতাব মধ্যে একটা ফসকে গেল তো খুব জোর, নটা কতা ঠিক ফলে যাবে।

ভোগী উঠে গিয়ে একটা জায়গা দেখায়। সেখানে একটা সোফা রাখা ছিল। ভোগী সোফাটা ধরে টানে। সোফাটা সরে যেতে দেখা যায়—মোজেকেব তিন চারটে টাইল ভাঙা, অনেকটা নেই। মামা উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওরাও। গর্ত হযে গিয়েছিল। হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা। ভোগী সেখানে থেবড়ে বসে, জায়গাটায় হাত রেখে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকে সামনে পেছনে। যেটা কেউ দেখতে পায় নি সেটা হল মামার মাথার পেছনে যে-বিরাট কোয়ার্টজ দেওয়াল ঘড়িটা রয়েছে তার সেকেন্ডের কাঁটাটা পাঁচ সেকেন্ড বন্ধ ছিল। ভোগী মেঝের থেকে হাত তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটা আবার চলতে শুরু করে। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। জায়গাটা জ্বলন্ত চোখে দেখে বীরদর্পে এসে একটা দেশলাই তুলে নেয়। একটা কাঠি জ্বালিয়ে ঐ জায়গাটায় রেখে দেয়। কাঠিটা জ্বলে শেষ হয়ে যায়। ভোগী সোফাটা টেনে আবার জায়গায় করে দেয়। ঘেমে গেছে। এসে বসে।

—আজ কী বার?

—বুধবার।

—তাহলি এই বুধবাবে আমি আগুন জ্বালালাম—মামা, আপনি তো যুক্তিধর নোক, ভোগীর একটা কতা মেনে চলবেন?

—চলব। নিশ্চয়ই চলব।

—আপনার ফাঁড়া কিন্তু আচে। চাব মাস গেচে তো। আগাম চার মাসে আপনি বৈকেলেব পব কোতাও যাবেন না, মোট্রে ফাঁকায় যাওয়া নেই। চাবমাস পরে অবাদ গতি। ত্যাকন আর কোনও ভয়ডব কবতি হবে নি।

—তাহলে একটা কথা দিতে হবে ভাই। চাবমাস পরে এই বাড়িতে দয়া করে আর একবাব পায়ের ধুলো দিতেই হবে। কোনও না শুনব না।

—সে যদি বা হয় ত্যাকন আমার পায়ের ধুলো আপনি চিনতি পারবেন? ধুলো তো উডে উড়ে আসেন। কোন্‌টা কার পায়েব সে বোঝা এক দুষ্কর বেপাব।

—বুঝলাম না ভাই।

—সব ভোগীর কতায় এই আপত্তি। কী করব বলুন, আব কতা যে জানা নি। তা মামা মেমি-দিদির আবদার আবার আমাবও আবদার—গাড়ি চড়ব।

—ওমা, ছি ছি। গাড়ি। এ আর কি একটা কথা হল?

মামা বেল বাজান। একজন দৌড়ে ঢোকে।

—কোন্ গাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে রতন অ্যাম্বাসাডর নিয়ে...

—আঃ অ্যাম্বাসাডরের কথা কে জানতে চায়?

—মারুতি ভ্যান আব ট্রেকার আচে বাবু।

—না, না, ট্রেকার নয়। লরির মতো। ওটা একটা গাডি হল? বাহাদুব কোথায়?

—আচে বাবু।

—বাহাদুবকে ডাকো।

—হ্যাঁ বাবু।

লোকটি দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

—বাহাদুরই ভাল। সবরকম পারে। সঙ্গে চেম্বাব রাখে। বড ভাল ছেলে। গাড়িটা চালায়ও তুখোড। তবে ওর ঐ একটা দোষ—ক্যাসেট না বাজলে ওর অ্যালার্টনেসটা কেমন যেন কমে যায।

বাহাদুর ঢোকে। বয়স বেশি নয়।

—বাহাদুর, তুমি মারুতি ভ্যানে এঁদের নিয়ে তিনদিন ঘোরাবে। যেখানে যাবে, যাবে। তেল কিনবে। যা বলে শুনবে। আর শোনো, এঁবা আমার—সব আপনা আদমি—এই মেমসাহেবকে চেন তো—আমার ভাগ্নী—এ হল, মেমসাহেব...

—ঠিক হ্যায় বাবু।

—আর ইনি সাধুবাবা। বহোৎ বড়িয়া সাধু। বাহাদুর ধুপ করে ভোগীকে প্রণাম করে।

—টাকা, ম্যানেজারের কাছে নিয়ে নাও। যা দরকার। আর শোনো, রাতে থাকতে বললে থাকবে। ছেড়ে দিলে আসবে। আমার লোকজন সব। কোনও অসুবিস্তা হবে না।

—ঠিক হ্যায় বাবু।

বাহাদুর বেরিয়ে যেতে ভোগী বলে, 'মামা, এর কিন্তু অপঘাতে মরণ।'

—সে কি!

—কিছু করা যায় না? ছেলেটা বড় ভাল।

—দেকি।

হঠাৎ ফোন বাজে। মন্টুমামা ফোন তোলেন।

—ও হ্যাঁ বলুন ভাই। হ্যাঁ, আছে। দেব? নিন, কথা বলুন।

জটিল টেলিফোনে একটি বোতাম টিপে হেসে মিথিলকে বলেন,

—গৌতম বায়। প্যানিকে প্রচুর মাল খেযে ফেলেছে। কথা বলো।

মিথিল বিসিভার তোলে। সেই বোতামটি উঠে যায়।

—মিথিল? মি .থি লা।

—কথা বলছি।

—আমি গৌতমদা।

—বুঝেছি। বলো।

—বলব?

—বলো।

—মিঃ ব্যালফ্ হজসন! শুনছেন!

—বলো।

—আমি এখন মাল খেয়ে আছি। সুভাষ মুখুয্যেব কবিতাব 'টুপভুজঙ্গ'।

—কিছু বলবে? আমাকে বেরোতে হবে।

—দাঁড়াও ভায়া। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। শোন্ মিথিল,

উইথ হিজ মিউজিকাল সাউন্ড
অ্যান্ড হিজ বাস্কাবভিল হাউন্ড
হুইচ, জাস্ট আ ওয়ার্ড ফ্রম হিজ মাস্টার
উইল ফলো ইউ ফ্যাস্টার অ্যান্ড ফ্যাস্টার
অ্যান্ড টিয়ার ইউ লিম্ব ফ্রম লিম্ব

(রুবেনাব গর্জন—'তুমি এই সকালে কী শুরু করলে।')

ওয়েট, ওয়েট...মিথিল ..যোগী অ্যান্ড দা কমিসার ..ভোগী অ্যান্ড দা মাফিয়া...

মিথিল রিসিভার রেখে দেয়। মামা হেসে বলেন,

—এরকম হয়। তবে মিথিল, দোষ তোমাব।

—মানছি।

—বললে হবে না মিথিল। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কীভাবে বলুন?

—বলব। পরে বরং বলব। আগে বিলেশনটা পাকাপাকি হোক। তখন দেখবে মামা কী বস্তু।

মারুতি ভ্যান বেরিয়ে যায়। মামা ঘরে ঢোকেন। সোফা ঠেলে সরাতে যাবেন এমন সময় আবার ফোন। মন্টুমামা ফোন তোলেন।

—আচ্ছা মন্টুমামা আছেন?

—কথা বলছেন। বল্, আমি বলছি।

—এই দাদা, তোর কাছে মিমি গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। চিন্তা করার কিছু নেই।

—সঙ্গে মিথিল নামে একটা ছেলে ছিল?

ফোনটা কেড়ে নেয়। রাশভারি পুরুষকণ্ঠ।

—মিথিল, মিমি একসঙ্গে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে এসেছিল। সুনীতদা, ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, চুরিডাকাতি, মানে পলিটিক্স করি না, মাল্টিস্টোরিড বানাই না, খাবাপ থাকার তো কোনও কারণ নেই।

—ওঃ সুনীতদা! যাইহোক বিকেলে হবে না, সকালে একদিন যাবো।

—হ্যাঁ। সকালই ভাল। বিকেলে তুমি তো আবাব বৈকল্যপ্রাপ্ত হও। সকালই ভাল।

—রাখলাম।

—হ্যাঁ রাখো। তবে শোনো, মিমিকে একটু কম স্পয়েল কবলে ভাল হয়।

—চেষ্টা করছি। রাখলাম।

—সাবধানে থেকো।

—আছি।

বিসিভারটা নামিয়ে রাখেন মামা। রেখে এগিয়ে গিয়ে ঠেলে সোফাটা সবান। ভোগী যেখানে জ্বলন্ত দেশলাই ফেলে গিয়েছিল সেখানে বেশ কিছুটা ছাই যা একটা দেশলাই কাঠি পুড়ে হতে পাবে না। কোথা থেকে এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে ছাইটা ঘরময় উডিযে দেয়। মামা দেখেন দরজা জানলা সব বন্ধ।

এসপ্ল্যানেডে মারুতিভ্যানে বাহাদুর বসে থাকে অনেকক্ষণ। ওবা ততক্ষণে পাতাল বেলে টালিগঞ্জ গিয়ে ফিরে আসে। টালিগঞ্জ যাবার গাডিতে ভিড ছিল না। কিন্তু আসার গাডিতে কিছুটা দেরি হলেও অপিসের ভিড়ের একটা আন্দাজ পেয়ে যায় ভোগী। মিমি একবার দেখেছিল যে, ফিরে আসার সময় একটার পর একটা স্টেশন এলে ভোগী খুব একটা কিছু দেখছে না। বরং চোখ বন্ধ করে মিটিমিটি হাসছে। পরে বেরিয়ে এসে ভোগী প্রথমেই জিজ্ঞেস কবে,

—কালীমন্দিবের তলা দিয়ে যখন রেল যায় তখন কি মন্দির কাঁপে?

—না মন্দির থেকে বেশ কিছু দূর দিয়ে লাইনটা গেছে। আর ঐ যে সুড়ঙ্গ দেখলে না, ও এমন শক্ত সিমেন্ট আর লোহা দিয়ে তৈরি যে, ওপরে শব্দও যায় না, কাঁপেও না।

—আমি ভাবি আব এক কতা। তলায় কেমন যেন রাত রাত ভাব। তার ওপরে দিন। আচ্ছা, কালীঘাটে তো মা গঙ্গা আছে। তার জল ঐ সুড়ঙ্গের মদ্যে যদি নেমে আসে।

—কী করে আসবে? সব রাস্তা বন্ধ।

—তা বললি হয়? পাতালে রেল আর কতদিন। জল সে তো কবে থেকে পাতালমুখী হযে আচেন। তবে হ্যাঁ, দ্যাকবার মতো জিনিস একখানা...হয়েছিল বলে শুনিচি। এবার দ্যাকা তো হল।

—ভাল লাগল?

—ভাল। খুব ভাল।

অ্যামেরিকান কনসুলেটের বাড়ি, টাটা সেন্টার, জীবনদীপ—সব পেরিয়ে থিয়েটার রোডের মোড়ে ডানদিকে যায়—গাড়ি। ভিক্টোরিয়া দেখে, দূব থেকে, ভোগী ভেবেছিল, হয়তো কোনও মন্দির। তারামন্ডলে কী হয় ওকে বুঝিয়ে দেয় মিথিল। এর থেকে ভোগী একটা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে আসে।

—বাবুরা দেকতিচি সবকিছু ডবল করে বানিযেছে। ভগবান রাত বানিয়েচেন। আমিও শালা মাটির তলায় রাত বানাবো! ভগবান আকাশ তারা সব সিষ্টি করেচেন। আমিও শালা কম যাই কিসে। ঐ যে বললে না, তারামণ্ডলী—আমিও বানাবো। মিমির মজা লাগে কথাটায়।

—এখানে একটা জঙ্গলও বানানো আছে জানো তো। সেখানে বাঘ, সিংহ সব রয়েছে।

—জানি মেমিদিদি। তাকে বলে চিড়িয়াখানা। দেকে গেচে এমন নোকের মুখি শুনিচি।

—তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে।

—কী হবে ঐ বাঘ বাঁদর দেকে? ও আমি অনেক দেকিচি। চিডিয়াখানা দেকে আমার আর কাজ নি।

এসপ্ল্যানেডে বেরোতেই গণ্ডগোল। বাহাদুর যেখানে গাড়ি পার্ক করেছিল তার কাছেই মাড়োয়াবি মহিলাব হ্যান্ডব্যাগ ছেনতাই হযেছে। জটলা, মহিলার কান্না, পুলিশ। মিথিলরা গাড়িতে ওঠে।

—কি বাহাদুব, ছেনতাই হযে গেল?

—হাঁ বাবু। ইধাব তো হোতাই হায়।

—বুঝলে ভোগী, এখানে রাজ্যের লোকের ভিড তো। অনেকে দোকান বাজাবে এসেছে। তাই পকেটমার, ছেনতাইবাজ সব গিজগিজ কবছে। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে, লোকটা ধরা পড়ে নি।

—কেন?

—সবাই মিলে মেবেধরে রক্তাবক্তি করত। অনেক সময় তো পিটিয়ে মেবেই ফেলে।

—গেবামের দিকে ডাকাত যদি ধবা পডে তো ঐরকম হয। একবাব, বুঝলে মেমিদিদি, একতাবাব কাছে সাত সাতটা ডাকাত ধবা পডেছিল। তা ছটাবে তো পিটিয়ে শেষ করে দেচে। তা সদ্দাবটাকে যত মাবে কিছুতেই মবে না। শেষে বলে, দ্যাখ্ আমার এই কাঁধের কাছে ওষুদ ঢোকানো আচে, মন্তর পডা ওষুদ। ঐ ওষুদ যতক্ষণ থাকবে কেউ আমাব জান নিতে পারবে না। তকন ওবা ঐ কাঁধের চামডা কেটে ওষুদ বেব করল। এই এট্টা ড্যালার মতো। তারপর কয়েক ঘা দিতিই কারবার হয়ে গেল।

নিউ মার্কেটের সামনে গাডি বাখা হয়।

—বুঝলে মেমিদিদি, ঐ ওষুধ যে দিয়েছিল সেই গুণিন আবাব আমাব চেনা।

—তুমি পার ঐ ওষুধ দিতে?

—না গো। ওদেব ভেন্ন ঘব। ভেন্ন মন্তব। ধবো তোমাব ওপব যদি কুদিষ্টি পড়ে ও যদি 'ফাকাশে ফণা আনকা গেতায়াকা ফাকছাক্কাল ইয়াত্তমা হাদিদ' নিখে তাবিজ দেয়, ফুঁ দেয় অমনি সব ঠিক। আমি করতি গেলে অষ্টরম্ভা।

ওরা নিউ মার্কেটে ঢোকবাব মুখে ভোগী হঠাৎ চেঁচিযে ওঠে,

ডাইনে আল্লার তলওয়াব
বামেতে মহম্মদের ঢাল
পিছনেতে আদম শফি উল্লাহ্
সম্মুকেতে মরতজ্জা আলি
ইয়া আলি, ইয়া আলি, ইয়া আলি
জুল ফাক্কাব, জুল ফাক্কাব, জুল ফাক্কাব।

লোকজন চমকে ওঠে। বাবমুডা প্যান্ট পরা বিদেশিদেব একটা দল থমকে যায।

—সেই গুণিনের শরীল বন্দ মন্তর! বড় ভাল নোক।

দোকানে দোকানে ছয়লাপ। বেশিই জামাকাপড়। যত দোকান, তত কাচ আয়না, সেই আয়নায় ভোগী নিজেকে দেখে হাসে, তত লোক।

—গেরামের দিক হলে ভেন্ন দেশ তো। তাই সেখানে নোক সব ন্যাংটোপোঁদে ঘুরতেছে। আর

একানে দেখ—একেবারে মেলা করে রেকেচে।

—এসব সায়েবদের আমলে তৈরি। ইংরেজরা যখন এই দেশের রাজা ছিল তারা ঐসব বানিয়েছিল। মেমসায়েবরা জামাকাপড় কিনত। ঢোকার পর দেখলে না সায়েবদের কামান।

—ঐ কামানে যুদ্ধ হতো?

—এক সময়ে তো হতোই। এখন আরও বড় বড কামান ছোঁড়া হয়।

মিমি বলে, 'বফর্স!'

—আচ্চা মিতিলবাবু, এই যে জামাকাপডেব বাজার কেনিং-এর মাচের বাজার সে রকম কামানের বাজার হয়? কলকাতায নেই?

—কামানের বাজার আছে বলে তো শুনি নি। বন্দুকের দোকান আছে কয়েকটা।

—আমাদের ওদিকে কত ঘরে বন্দুক বানায়। ডাকাত গুণ্ডা সব কেনে। তারপব বোমা বানায়। হাট বসলে দেকবে মেমিদিদি দা বল্লম সব বিকোচ্চে। কেনো আর মাবো, কেনো আব মাবো!

মিমি একটা লং স্কার্ট আর ব্লাউজ পরেছিল। একটা দোকানেব সামনে হ্যাঙাব থেকে স্কার্ট ঝুলছিল।

ভোগী বলে, 'মেমিদিদি, এই দ্যাখো, তোমার পবণেব পোশাক ঝুলতেছে। তুমি এই হাট থেকে কেন?'

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিনি।

—আগে কিনত মেমসায়েব। একন কেনে মেমিদিদি। ভাল, ভাল।

—কী ভাল?

—কেনাকাটা। আমি শুধু ভাবি মানুষ কত সাজে সাজতি চায়। এই দেকলাম মশানপীব মা কালী তো ঐ দ্যাকো টঙ্গর বাশুলী মহাকাল, গোলকনাথ, রতি পতি, কামদেব, পঞ্চ বেতাল, ভুজঙ্গ জননী, পতরচণ্ডী, চামুণ্ডা, ভূতভবেশ্বরী, সব ঘোবাফেরা করতিচেন উঃ ডাইনে ধবলদেবী তো বাঁযে আসে কালভৈরবী, ওলাবিবি, মড়িবিবি,.ঝেঁটুনেবিবি, আজগৈবিবি, বাহড়বিবি, আসাবিবি, তারপব তোমার গে মানিকপীর, ষাঁতাল, মাকাল, বিবিমা, খুকিমা সব দরশন হয়ে গেল—এইবাব ঘবে চলো মিতিলবাবু!

— শরীর খারাপ লাগছে?

—ভোগীর জানবে সব সময় অস্থির অস্থির ভাব। এই ভাব থাকবে, ভাবান্তর হলি পরে সেরে যাবে?

বাড়ি ফেরার রাস্তায় ওরা মিমিকে নামিয়ে দেয়। মিমির ওবেলা নিজের রিসার্চ গাইডের কাছে যেতে হবে। দরজার কাছে মিমি মিথিলকে বলে, 'ভোগীর শেষে যা হবে বলেছিলে সেটা কি সত্যি?'

—দ্যাখো অন্য লোকেও বলেছে, ও নিজেও তাই বলেছে।

—তুমি বিশ্বাস করো? একেবারে ভেতর থেকে?

—সত্যি কথা বলতে করি। মোরওভার এটাকে তো সুইসাইড বা ম্যানস্লটার—ঐ জাতীয় কিছু বলে মনে করা যায় না।

—আমার কিন্তু ভাবলেই কেমন লাগছে।

—আমারও লাগছে না ভেবেছো? কিন্তু কিছু করার নেই। ও কোনও সাধারণ লোক নয়।

—সেটা বুঝতে পেরেছি।

—তাই সাধারণ হিসেবটাও ওর বেলায় খাটবে না। ও একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা একটা স্টেশন। একটা টেম্পরারি ব্রেক। এ ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে

কোনও ইনটারভেনশন ঠিক হবে না। তোমাব সাবজেক্টেব ভাষায় ওর সভরেইনটি নষ্ট হবে।

—ওবেলা ফোন কোরো।

—করব।

বাড়িতে পৌঁছে মিথিল বাহাদুবকে ছেড়ে দেয়। বলে সন্ধেবেলায় সাতটা নাগাদ আসতে। বাড়ি ফিরতে মাসিমণি বলল যে, মন্টু মিত্র ফোন কবেছিলেন। মিথিল যেন একবার ফোন করে। আবার নতুন কোনও ঝামেলা কিনা ভেবে মিথিল ফোন করে দেখল সেসব কিছুই না। মন্টুমামা জানতে চেয়েছিলেন কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

দুপুরের খাওয়াব পব ভোগী এক লম্বা ঘুম লাগাল। মিথিলও ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটু ছাড়া ছাড়া ঘুম। উল্টোপাল্টা স্বপ্ন। যে স্বপ্নে একটাও চেনা লোক, চেনা জায়গা কিছু থাকে না। ঘুম থেকে উঠে দেখে মাসিমণিব সঙ্গে ভোগীব খুব গল্প জমেচে। কাল ওরা দুজনে সকালে উঠে কালীঘাটে যাবে।

—ভালই হল। গাড়ি করে যাবে আসবে।

—এসে থেকে কতরকম গাড়ি, টেসকি, পাতাল রেল চডা হল। যেদিকে তাকাও না কেন নোক আব নোক—ঘরবাড়ি ছেড়ে সব যেন বেইরে পড়েচে।

মাসিমণি বলেন, 'লোক কি বলচ বাবা। আমাব তো বাস্তায় পা দিতে ভয় করে। মাড়িয়ে দিয়ে না চলে যায়।'

—এখনই এরকম বলছ। ক্লাব অফ বোম-এব একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম জানলে—তাতে বলেচে কলকাতায, কোন্ একটা সালে, পাশ ফিবতে গেলেও ধাক্কা লাগবে।

—আমাব যে আব দেখাব ইচ্ছে নেই।

—তা বললি কি হয় মাসি, যার যা দ্যাকার তাকে তা দেখতেই হবে। এই যেমন আমি কলকাতা দেখতিচি।

চা খাওযাব পরে মিথিল ভোগীকে নিয়ে ছাদে উঠল। ওকে ছাদ থেকে দেখাল ভোগীর চেনা ভিক্টোরিয়ার চুড়ো, গল্ফ্ গ্রীনের টিভি টাওয়ার। এত উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে চারিদিকে যে, বার বাব চোখ ধাক্কা খায়। সূর্য ডোবাব মুখে মেঘে মেঘে লালচে সোনালি রং ধরেচে। ভোগী ওঠবার সময়ে তাব পুঁটলিটা নিয়ে উঠেছিল।

উবু হয়ে বসে, তার মধ্যে ছেঁড়া গামছাব খুঁট খুলে একটা শক্ত , ভারি কালো মতো গোল জিনিস বের করে। সেটা ফুটো করে একটা সুতো পরানো আছে। সুতোটা ধবে ঝোলায। জিনিসটা কিছুক্ষণ থেমে থাকে। গোল হয়ে ঘুরে চক্কর কাটে। তারপর একদিকে জোরে জেরে দুলতে থাকে।

—কী দেখছ ওটা দিয়ে...

—দিক দেখচি, দিক...

—কীসের দিক?

—সমুদ্দুরের দিকে যেতি হবে যে আমাকে। তা সব দিকেই তো সমুদ্দুর। আমাকে যেতি হবে দকখিন পশ্চিমে। সেকানে আমার জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে আচে যে...

—কে?

ভোগী হেসে ওঠে।

—কে আবার? মামা। ভাগনের পথ চেয়ে বসে আচে।

—কীভাবে যাবে তুমি।

—ও আমি দিক চিনে ঠিক চলে যাব। সকাল সকাল বেবতি হবে।

—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—তোমার কি মাতার ব্যারাম নাকি। ভোগীব সঙ্গে যাচ্চে। কেউ বলে?

—আমরা যদি তোমাকে একটু এগিয়ে দিই তাহলেও কি অসুবিধা হবে?

—না, সে হয় না। সেখানে একলা যেতি হয়। তিনিও তো একলাই থাকবেন। তাবপর কী মনে করে ভোগী মিথিলের মুখের দিকে তাকায়,

--আমি যকন, যেকান থেকে ফিরে আসতে বলব আসবে?

—আসব।

—তা না হলি কিন্তু ঘোর অনাচার হয়ে যাবে। আদেশ অমান্য করলি আর রক্ষে নি।

ভোগী কিছুক্ষণ চুপ করে সূর্য ডুবে যাবাব পর যে অল্প আলো সেদিকের আকাশে তাকিয়ে থাকে। হাওয়া আসে। ভোগীর চুল একটু একটু ওড়ে।

—মিতিলবাবু, এট্টা কতা বলি। মাছফুলফুল খেলা, ঘর সংসার, তরমুজ, লঙ্কা, পানিফল, তেকাটার রস—যত ভাববে তত মন কেমন করবে। বুক ফেটে বলতি ইচ্ছে কববে বন পোড়ে তো সবাই দ্যাকে, মন পোড়ে তো কেউ দ্যাকে না। ঐ পোড়ার মনকে বাদ দে দাও। দেকবে আর কেমন করা নেই।

বাহাদুর কাব স্টিরিওতে গান বাজিয়েছে,

কুছ লেনা হ্যায় লেনা হ্যায়
কুছ দেনা হ্যায় দেনা হ্যায়..

নতুন হাওড়া ব্রিজের মাঝখানে গাড়ি দাঁড করিয়ে দেয় বাহাদুব। ভোগী, মিথিল নামে।

—কি বাগাতক কাণ্ড রে বাবা! উঃ সে কোতায় কোতায় আলোর ডুম দেচে।

—রাত বলে এতটা সুন্দর লাগছে।

—ওঃ মা গঙ্গারে বেড় দে ফেলেচে একেবারে। বাবুদির গড় করতি হয়।

মোটর বাইকে এক সার্জেন্ট এসে থামায়।

—আপনারা কাইন্ডলি এখানে গাড়ি দাঁড় করাবেন না।

মিথিল বলে, 'না, না, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আমি জানি যে দাঁড়ানো বারণ।'

সার্জেন্টটি অসম্ভব ভদ্র।

—আই অ্যাম সরি...বাট...

—না, না, চলো—আমরা উঠে পড়ি গাড়িতে। বাহাদুর চালাও ভাই।

কুছ লেনা হ্যায় লেনা হ্যায়
কুছ দেনা হ্যায় দেনা হ্যায়...

ওখান থেকে মিথিলের মাথায় এল কোথায় যাওয়া যায়। সুশান্তদের নাইট স্কুলে একবার যাবে। তার আগে রজতদার বাড়ি একটা কুইক ভিজিট।

রজতদার ড্রইংরুম সরগরম। মিথিল ও ভোগীকে বসান রজতদা। মিথিলকে কানে কানে বলেন, 'এর কথাই বলেছিলে?'

মিথিল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

—বসুন ভাই, বসুন।

রজতদার সঙ্গে তখন আই. এস. আই-এর অর্থনীতির অধ্যাপক পুরুষোত্তম চ্যাটার্জির জোর তর্ক চলেছে। পুরুষোত্তম করেছেন কি রবিন ব্ল্যাকবার্ন সম্পাদিত 'আফটার দা ফল—দা ফেলিওর অফ কমিউনিজম অ্যান্ড দা ফিউচার অফ সোশালিজম' বইটি পড়েছেন এবং সবিশেষ প্রভাবিত

হয়েছেন। বিশেষত এরিক হবসবম, ফ্রেডবিক জেমসন এবং ব্যালফ্ মিলিব্যান্ডের লেখাগুলো তাঁকে ভাবাচ্ছে। এর কোনও কিছুই বজতদাকে ইমপ্রেস কবে নি।

—দ্যাখো পুরুষোত্তম, আমাব সহজ কথাটা হল এই নিউ লেফট বিভিউ মার্কা অ্যানালিসসগুলো আমি মেনে নিতে পাবি না—বলতে পারো যে, সেটা আমাব লিমিটেশন—যাই হোক, আমার কথা হল তুমি যেটাকে বলছ ফেলিওর আমি সেটাকেই বলছি বিট্রে॰াল। ভুলচুক কটা হয়েছে? হ্যাঁ, এক এক সময় মনে হয়েছে গাইড টু অ্যাকশনেব বদলে ডগমাব দিকে পাল্লা ভারি। সো হোয়াট' কমরেড স্তালিন বা কমবেড মাও তো আব আর্মচেযাব থিওবেটিশিযান ছিলেন না, তাঁদের এত বড বড় কাজ করতে হয়েছিল—তাতে একটু আধটু গলদ থাকতেই পারে—

—কিন্তু সেটা ঠিক থাকলে এরকম হাম্পটি ডাম্পটি শো হতো না রজত দা।

—তাহলে চায়নাতে হল না কেন? ভিযেতনাম, কোরিযা, কিউবা কী করে লড়ে গেল। দ্যাখো, ফান্ডামেন্টাল টেনেট্স্ বলতে আমবা যা বুঝি—ওয়ার্কিং ক্লাসের ফিলসফিকাল আউটলুক, ডায়ালেকটিকাল অ্যান্ড হিসটরিকাল মেটেরিযলিজম, মার্কসিস্টলেনিনিস্ট পলিটিকাল ইকনমি, ক্লাস স্ট্রাগল, যেটা মোটিভ ফোর্স, তাবপব শ্রমজীবী মানুষেব স্টেট, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গড়ার প্রযোজনীযতা—ক্যাপিটালিজম থেকে সোসালিজম হয়ে কমিউনিজম—এর একটাও ইনভ্যালিড নয়—

—তাব মানে সেই মডেল, সেইভাবে?

—হ্যাঁ, সেই মডেল, সেইভাবে। তিনচার বছবের সেটব্যাক দেখে সব নড়েচড়ে গেল অত দুর্বল কমিটমেন্ট আমাব নয় পুরুষোত্তম...

মিথিল বলে, 'সবি রজতদা, আমরা তাহলে উঠি।'

—সেকি এই এলে, ওঁকে নিযে এলে, কথা হল না।

—আব একদিন হবে রজতদা। আবও কযেকটা জায়গায় যেতে হবে আমাদের।

—দাঁড়াও, দাঁডাও, তোমাদেব অন্তত এগিযে দেবাব ভদ্রতাটুকু করি। পুরুষোত্তম, আমি এক্ষুনি আসছি।

রজতদাকে মিথিল বলে, 'রজতদা, উনি পরশু চলে যাচ্ছেন।'

—ও তাই? আপনাব কথা মিথিলের কাছে শুনে কী বলব ভাই, খুব অবাক লেগেছিল।

—আপনাবা কত জ্ঞানীমানী লোক, আমারই সৌভাগ্য যে দেখা পেলুম।

—না, না, তা কেন? জেনে কী হল এটাই তো বোঝা যাচ্ছে না ভাই।

একটু বাগান বাগান। রাত পেয়ে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে।

—আর আমরা যে বাবু কিছুই জানলাম না। সেটাতেই বা কী হল? জেনেও হল না। না জেনেও হল না। মধ্যে যত ধিপ্পি নাচন। যাই বাবু।

রজতদা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। গাডি চলে যায়। ড্রইংরুমে ফিরে আসেন। পুরুষোত্তম হেসে বলেন, 'নিশ্চয়ই কোনও অ্যাবস্কনডিং এক্সট্রিমিস্ট।' রজতদা চুপ করে থাকেন। উত্তর দেন না। পুরুষোত্তম বলেন, 'চেহারাটা অনেকটা সেই কিউবাব রেডলিউশনারিদের মতো—ফিদেল, চে, ক্যামিলো, রাউল...।

গাড়িতে তখন বাহাদুরের ক্যাসেট বাজছে।

—তু তু তু তুতু তারা...দিল হামারা।

—ঘরে কত বই। আচ্ছা মিতিলবাবু সব যে অত বই ওতে সব কতা নেকা আচে, তাই না?

—সব কথা মানে কী বলো?

—এই আমি কেন ভোগী হলাম। কাঁকড়া কেন কাঁকড়া হল? তোমার সঙ্গে কেন দ্যাকা হল? এত যে দ্যাকা-সাক্ষাৎ, এত মেলামেলি—সব নেকা আচে মিতিলবাবু?

—কিছু লেখা নেই ভোগী। কেউ কিছু জানে না।

—তবে কীসের জোরে সব কিচু হচ্চে?

—কে জানে?

—আমি জানি মিতিলবাবু।

—কীসের জোবে?

—আলোর জোরে। আলো থাকলি ভিজি মাটিতি, গাঙের ধারে দেকবেন গেঁড়ি-গুগলি-শামুক সবাই আসতেচেন...কোনও ওজর নি, কোনও আপত্তি নি, হেঁচড়ে হেঁচড়ে আসতিচেন .তাবপব সমুদ্দুরের কাঁকড়ারা আসবেন, মাচ আসবেন।

—তারপব কী হবে ভোগী?

—পরশু আমি জানবো।

ও লাল দোপাট্টেওয়ালী তোরা নাম তো বাতা, তেবা নাম তো বাতা, তেরা নাম তো বাতা...

বাহাদুর ছোট হয়ে আসা বিড়ি ঠোঁট উল্টে মুখের ভেতরে নিয়ে গলি গলি বস্তির রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

মিথিল গাড়ি থামাতে বলে। কয়েকটা পুলিশ। জটলা। থমথমে ভাব। ভোগীকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করে। মিথিলের বন্ধুদের একটা দল এখানে একটা নাইট স্কুল চালায়। কুচকুচে কালো, লম্বা চেহারায় সাদা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পবা একটা ছেলে এগিয়ে আসে।

—কাকে চাই দাদা! ও আপনি সুশান্তদার ফ্রেন্ড না?

—হ্যাঁ ওদের স্কুল আজ বসে নি।

—না। কাল লোকাল ছেলেদের সঙ্গে হেরোইন পার্টির জোর কওযালি হয়েচে...বোমচার্জ করেচে...তাই ইস্কুল বন্ধ।

—এখানে যারা ড্রাগের কারবার করত সেগুলো কোথায়?

—দুতিন ঘর ছিল। আমরা মেরে তুলে দিয়েছি। হারামিগুলোকে আর ঢুকতে দেব না।

—ভাল। ঠিক আছে ভাই। চলি।

—আসুন। সুশান্তদা এলে কিছু বলতে হবে?

—বললেই হবে যে, মিথিল এসেছিল।

—মিথিল?

—হ্যাঁ।

বাহাদুর প্রায় একটা বন্ধ দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি ঘোরায়। হেডলাইটের চড়া আলো চোখে পড়ায় পুলিশরা চোখ ঢাকে। তাদের হাতে বন্দুক।

বাড়ি ফিরে গাড়ি ছেড়ে দেয় মিথিল। খাওয়াদাওয়ার পর মিথিলের ঘরে ভোগী বিড়ি খেতে খেতে রেডিও শোনে। মিথিল মিমিকে ফোন করে।

—শোনো, কাল সকালে ও মাসিমণির সঙ্গে কালীঘাট যাবে। বিকেলে আমরা মিট করতে পারি।

—কাল আমি ফ্রি। কোনও প্রবলেম নেই। এমনিতে ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, অ্যাপারেন্টলি কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে মাঝে মধ্যে ফ্যাসিনেটিং সব কথা বলছে। আর জানো, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। ওর সঙ্গে কিছুটা যাব।

—আমিও যাব।

—সে তুমি বোলো বরং। তবে কন্ডিশনটা ও বলে দিয়েছে।

—কী?

—যখন যেখান থেকে বলবে ফিবে আসতে হবে। ঠিক আছে মিমি। ঘুম পেয়ে গেছে। বাখছি। কাল দেখা হবে।

—এক্ষুনি চলে এসো মিথিল। ভীষণ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে কবছে।

—ঘুমোও। আমারও ঘুম আসছে।

—মি...থি .ল...

মিথিল আস্তে কবে ফোন নামিয়ে রাখে। ঘবে ফিবে দ্যাখে ভোগী অকাতবে ঘুমোচ্ছে। বেডিও বাজছে। মিথিল রেডিওটা বন্ধ করে দেয।

পরের দিন সকালে দেবি হয মিথিলেব ঘুম ভাঙতে। উঠে দেখে ভোগী মাসিমণিব সঙ্গে কালীঘাট চলে গেছে। অনন্ত বলল যে গাড়ি এসেছিল। চা খেযে কাগজটা নিযে বসেছে। ফোন এল। ফোন করেছে সুমিতেশ। ওরা গড়িয়াহাটেব কাছে হাযাব সেকেন্ডারি থেকে গ্রাজুয়েশন লেভেল অবধি একটা কোচিং খুলেছে। ভাল ছেলে ছাড়া পড়াবে না। ওরা চায যে মিথিল ইংরিজিটা পড়াক। সপ্তাহে দুদিন। মিথিল বলল কবতে তাব আপত্তি নেই তবুও ফাইনালি দুদিন পরে জানাবে। অনন্তকে বলল নীচেব মেজনাইন ফ্লোবেব ঘরটা যেন পবিষ্কাব কবে বাখে। ওখানে স্বচ্ছন্দে আগের মতো কযেকজনকে পড়ানো যায়। ওদেব ফিরতে দেবি হচ্ছে। নিজেব ঘবটা গুছোতে থাকে মিথিল। খাটেব তলা থেকে একগাদা ধুলো পড়া ম্যাগাজিন, সিগারেটেব প্যাকেট, মাকড়সা, বিয়ারের বোতল, বুল ওযার্কাব, ভাঙা গিটাবের টুকবো (ড্রাগের ঝোঁকে আছড়ে ভাঙা), ড্রাগ বিযযক লিফলেট, খবরেব কাগজ, আবও কত কি বেবোয। মিথিল অনন্তকে বকে। যদিও এতে অনন্তর কোনও দোষ নেই কারণ এতদিন মিথিলেবই হুকুম ছিল যে ওর ঘবে হাত দেওযা যাবে না। ধুলো মেখে, ঘেমে মিথিল অস্থির তখন এল মিমিব ফোন। প্রব্লেম। মিমিব মা, বাবা দুদিনের জন্য ব্যারাকপুব গেছেন সকালে। ওদের বাড়িব কাজেব লোক নতুন। তাই পুঁটিকে দেখার জন্যে মিমিকে থাকতে হবে। মিমি ওদেব বলল বিকেলে আসতে। কি ঝামেলা। ওদিকে ওরাও আসছে না।

ভোগীরা ফিবল বেশ বেলায। কালীঘাটে আজ অসম্ভব ভিড় ছিল।

—দম আটকে যায প্রায। তাব মধ্যে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। আমার আবার দুশ্চিন্তা। ভিড়ের মধ্যে ও হারিযে গেলে আবাব আব এক কাণ্ড।

—বাচ্চা ছেলে নাকি যে হারিয়ে যাবে? কী, মা কালী দর্শন হল?

—ভাল মতো দরশন হযে গেল। তাবপব তোমাব গে নকুলেশ্বর ভৈববের পুজোও দিলাম।

—সেটা আবার কোথায়?

—শোনো মাসিব কতা। মায়ের মন্দির জানে, ভৈরব জানে না।

—গেছে নাকি কোনওদিন যে জানবে?

—কে বলেছে যাই নি?

—মা থাকলি জানবে ভৈরববে থাকতি হবেই। ইনি আচেন, উনি নেই এমনটি জানবে হতিই পারে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে ভোগী আবাব ঘুমিয়ে পড়ল। খুব ভাল করে খেয়েছিল ভোগী। খাওয়ার পরে দই, মিষ্টি—সব। খুব তৃপ্তি কবে খেয়েছিল। মিথিল সিগাবেট খায় চেয়ারে বসে। ভোগীর মুখটা দেখে। শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধেবেলায় মিমির বাড়িতে স্যান্ডউইচ, চা, মিষ্টি খাওয়া হল। মিমির এক বন্ধু ওকে 'ড্রাগন

: ব্রুস লি স্টোরি'-র ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিল। সেটা দেখা হল। জেসন স্কট লি যখন জন চেং-কে বেধড়ক প্যাঁদাচ্ছে তখন ভোগীর আনন্দ দেখতে হয়। সে একেবারে বীতিমতো উল্লাস।

—করো, আরও অধম্ম করো, তারপর একন কেমন পেটন দিচ্চে. .উঃ বে উঃ বে আবে শালার হয়ে গেচে. আবার মুখ দে কেমন গজ্জন করতেচে. ওরে বাবা পেছনের থে আর এট্টা আসতেচে, (লি আচমকা ঘুরে লোকটার বুকে প্রচণ্ড এক লাথি মাবে) দেচে দেচে হাঃ হাঃ হাঃ এক পদাঘাতে শালা খতম.. মার্ . মার্. . ভোঁদাটা পালাচ্চে. হ্যাঁ, একন কেমন ম্যাং ম্যাং করতেচে দ্যাকো .. কেনরে শালা .. তখন মনে ছিল নি . এইরে, গলাব ওপরে পা তুলে দিয়েচে গো চোক ঠিকরে বেরোচ্ছে...মার...এট্টাকেও ছাড়বি নি.. হা হা... মোচ্ছব ..মোচ্ছব .

মিমির বাড়ি থেকে ফেবাব আগে মিমি বলল, 'আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। তুমি না বলতে পারবে না। কাল আমিও যাব।'

ভোগী চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'না গেলিই নয় মেমিদিদি!'

—না গেলেই নয়।

—তা ইনি যকন যাচ্চেন তকন উনিও চলুন। ভোগী হাসতে হাসতে গাড়িতে ওঠে।

—কুকুরির নাম পুঁটিমাছ! হে হে...পুঁটিমাছরা জানতি পারলে কী ভাববে কে জানে। আচ্চা মিতিলবাবু, আমার যে একন বেরান্ডি খাবাব বাসনা হল তার কী হবে?

মিথিল একসেকেন্ড ভাবে। বৃহস্পতিবার। ড্রাই ডে।

—ঠিক আছে। বাহাদুব, ল্যান্সডাউন বোড চলো।

—মোটর ভেহিকেলস কি পাস। মালুম হ্যায় বাবুজী।

—ঐ মোটরের কাছে বুঝি মদের দোকান।

—না, না, দোকান নয়। আজকে তোমার বৃহস্পতিবার তো। মদের দোকান বন্ধ থাকে। ওখানে একটা জায়গায় একটু বেশি দামে পাওয়া যায়।

রাস্তার আলোগুলো কোনও কারণে জ্বলছে না। যদিও লোডশেডিং নয়। ডাঁই করা ময়লাব গাদাটা পেরিয়ে গাড়িটা দাঁড়ায়। মিথিল জানলার কাছে মুখ নিযে এদিক ওদিক তাকায। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে আধবুড়ো লোকটা বেরিয়ে আসে।

—কি মাল নেবেন বাবু?

—কি আচে।

—সব আচে। রাম আছে, হুইস্কি আছে, ব্রান্ডি আচে।

—কি ব্রান্ডি?

—হানিবি হবে বাবু।

—একটা হাফ।

মিথিল একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরে। লোকটা টাকাটা নিয়ে চলে যায়। ভোগীকে বলে, 'এ জায়গাটা ভাল। কয়েকটা আরও ঠেক আছে। সেখানে জালি মাল পাওয়া যায়।'

মিথিল সিগারেট ধরায়। আধবুড়ো লোকটা একটু লেংচে হাঁটে। বোতলটা দেয়। তারপর টাকা ফেরত দেয়। গাড়ি চলতে থাকে। ভোগী গাড়ি দাঁড় করায়। বোতলটা নেয়। প্যাঁচ কেটে মুখটা খোলে। মিথিলকে ইশারা করে খেতে বলে। মারুতিভ্যানের মধ্যে ধক করে গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে।

—আমি ব্রান্ডি খাই না ভোগী। আমার ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না তো এক ফোঁটা খাও।

মিথিল প্রায় ঠোঁটে ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দেয়। তাও সামান্য পড়েছে মুখে। ভোগী বোতলটা তুলে

ঢক ঢক কবে ঢালে। নামায়।

—তোমাব ঐ এট্টা সিগ্রেট দাও দিনি।

সিগারেট টানতে থাকে।

খাব না, খাব না ইচ্ছে
এক পালি চাল, একটা উচ্ছে

আবাব ঢক ঢক কবে খায়। মাথা ঝাঁকায। আবার খেযে বোতলটা শেষ কবে। বাইবে ফেলে দেয। চোখ বন্ধ করে সিগাবেট টানে ভোগী। চোখ বন্ধ কবেই বলে,

—এইবার ঘবে চলুন মিতিলবাবু। কাল সেই কাকভোবে বেবতি হবে।

—ভোগী, একটা ভুল হযে গেল যে।

—কী ভুল?

—মিমি যে যাবে বলল। ঠিক আছে ফোনে বলে দেব। ছটাব আগে বেবোবার দবকার হবে?

—না, দেবি হয়ে যাবে। অন্ধকাব থাকতি থাকতি শুরু কবতে হবে।

—অন্ধকাব থাকতে থাকতে হলে তো সাড়ে চারটে নাগাদ যাওযাই ভাল।

বাডিতে ফিরে বাহাদুরকে সেইমতো বলে দিল মিথিল। মিমিকেও ফোনে বলল বেডি থাকতে।

ভোগী বাডিতে ঢুকেই বলল ও বাতে কিছু খাবে না।

—আমাব একন খাওয়া বাবণ। মিতিলবাবু তুমি খেযে নাও। মাসি, আপনারা আহাব করুন। আমি ঘবে গে বসি।

মিথিল ওপবে উঠে দেখল ভোগী ঘবেব সঙ্গে লাগোযা বাবান্দায বসে আছে।। আরও দেখল যে ভোগী মিথিলের জামা কাপড ছেড়ে নিজেব পোষাক পবেছে। পুঁটলিটা বেঁধে ঘবেব কোণে বাখা। বাথরুমে মিথিলের জামাকাপড। ভোগী যেগুলো পবেছিল। ভোগী একের পব এক বিড়ি খায। একসময় উঠে এসে মিথিলকে বলে,

—তুমি ঘুইমে পড। আমি ঠিক ডেকে দেব তোমাকে।

—তুমি শোবে না?

—সে ঘুম পেলে শোবোখন।

আলো নিবিযে শুয়ে থাকে মিথিল কিন্তু ঘুম আসে না। মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ চমকাল। সেই কয়েক ঝলকে ভোগীকে দেখতে পায় মিথিল। শিবদাঁডা সোজা কবে বসে আছে। কিছু একটা বিড়বিড করছে কি? কোন্ সময় যে ঘুমিয়ে পড়ে মিথিল। বৃষ্টি শুরু হয। ঝিবঝিব করে।

ভোররাতে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। মিথিলকে ধাক্কা দিযে ডাকে ভোগী।

—উঠে পড়ো মিতিলবাবু। গাড়ি এসে গেচে।

মিথিল ধড়মড় করে উঠে বাথরুমে গিযে চোখমুখ ধুযে আসে। জিন্স পবে। সার্টের ওপরে একটা উইন্ডচিটার গলায়। পায়ে অ্যাডিডাসের 'স্ট্যান স্মিথ' টেনিস শু। মিথিলকে দুর্দান্ত দেখায়। চটপট চুলটা আঁচড়ে নেয়।

—তুমি একটুও ঘুমোও নি।

—ঘুম এল নি।

মাসিমণি উঠে পড়েছিলেন! সিঁড়িব পাশে দাঁড়িয়ে। অনন্ত ঘুমোচ্ছে। উনিই দরজা বন্ধ করবেন।

—আমি তাহলে এলাম মাসি।

—আবার এসো।

—মাসি, তুমি মিতিলবাবুকে কুলেখাড়া শাকের রস খেতে দিও। ওকে নিয়ে ভেব নি। পবিত্তিব

পর নিবিত্তি। নিবিত্তিব পর নির্বিকার। আমি খেয়াল বাকবখন।

শহবে শেষরাত আর নীলভোর। বাহাদুব ফাঁকা বাস্তায় হেডলাইট জ্বেলে বেশ জোরে চালায়। মিমিদের বাইবের ঘবে আলো জ্বলছিল। মিমি বেবিয়ে আসে। আলোটা জ্বলতে থাকে। কুকুবেব ডাক শোনা যায়।

গাড়ি উড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে একটু অন্যরকমের। এরকম বৃষ্টিতে ওয়াইপার চালানো যায় না। বেশ কিছুক্ষণ ধবে ফোঁটা ফোঁটা জল কাচের ওপর জমলে একবার চালালেই কাজ চলে যায়। ভিজে ওযেদাব দেখে মিমি একটা সিন্থেটিক শাড়ি পরেছে যেটা সচরাচর ও পরে না। ঠাণ্ডা বাতাস আসে বলে আঁচলটা জড়িয়ে নেয়। মারুতি ভ্যান হাওড়া পেরিয়ে বম্বে রোড ধরে। বৃষ্টিটা জোরে হয।

কোনও বহস্যময় কাবণে বাহাদুর ক্যাসেট বাজায় নি। একবার একটা জোর ঝাঁকুনি খেতে হয কারণ বৃষ্টির আবছায় বাহাদুর স্পিডব্রেকার দেখতে পায় নি। মিথিল ঢুলছে। যদিও চোখ বন্ধ কবে আছে। জানলা দিয়ে হু হু বাতাস ঢুকছে। ভোগী একদৃষ্টে তাকিয়ে রযেছে বাইরে। মিথিল আর মিমি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালটিকুরি, আন্দুল, উলুবেড়িয়া—দুপাশে একদম ফাঁকা। ভোগী ফাঁকার মধ্যে তাকিয়ে থাকে। উড়ন্ত জলের কণা এসে ওর চুলদাড়িতে বসে। রূপনারায়ণ পেবিযে কোলাঘাটে গাড়ি ঢুকতে চা-র দোকান যেখানে পব পর সেখানে ভোগী গাড়ি দাঁড় কবাতে বলে। বাহাদুর তার চেনা দোকানের দিকে গাড়ি নেয়। বৃষ্টি পড়ছে। উইক ডে। ভিড নেই। কিন্তু স্থানীয় লোক। ওরা উল্টোদিকেব বাস ধরবে। বাহাদুরের এই রাস্তা খুব চেনা। মণ্টুমামাকে নিযে অনেকবাব আসতে হয়েছে। মিথিলের চটকা ভেঙে যায়।

—ও, কোলাঘাট এসে গেলাম।

মিথিল মিমিকে ধাক্কা দিয়ে তোলে। ওরা নামে। মিথিল মিমিকে বলে, 'কাল রাতে কিছু খাযনি। ঘুমোয়ও নি। মনে হয় ক্ষিদে পেয়েছে।'

ভোগী বলে, 'তোমরা চা টিফিন খেয়ে নাও। আমি এট্টু ফাঁকায় যাই।'

—তুমি খাবে না?

—না, আমার খাওয়া বারণ।

ভোগী একটু দূরে যেয়ে সুতোর সঙ্গে বাঁধা সেই জিনিসটা বের করে। দুলছে। বাঁদিকে দুলছে, এর আগে গোল হয়ে ঘুরছিল। ভোগী একবার আকাশের দিকে তাকায়। মেঘলা। ছাই ছাই।

—মিথিল, এখন মনে হচ্ছে আমার না এলেই ভাল হতো।

—কেন?

—কিরকম আনক্যানি লাগছে মিথিল।

—আমারও লাগছে। কিছু কিন্তু করার নেই।

—মিথিল, সত্যি ও মরে যাবে?

—ওঃ মিমি। আমি জানি না।

বাঁদিকে হলদিয়ার রাস্তা। বাহাদুর পর পর তিনটে অয়েল ট্যাঙ্কারকে ওভারটেক করে। অস্বাভাবিক লম্বা একটা ট্রাক পেছনে পডে থাকে যার শেষে একটা লাল আলো জ্বলছে। ভোগী একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে। প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পরে একটা বিরাট গোল চক্কর। ভোগী গাড়ি থামাতে বলে। গাড়ির মধ্যে বসেই সুতোটা ধরে ঝোলায়। কালো জিনিসটা প্রথমে নিশ্চল ছিল। তারপর একদিকে যেতে আসতে শুরু করে। ভোগী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কাঁথির রাস্তা। পুঁটলিটা কোলে নিয়ে ভোগী দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে বসে আছে। তার চোখের পলক পড়ছে না। মিমি মিথিলের কাছে সরে আসে। মিমির চোখে জল। মিথিল মিমিকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখে।

মাথায় চুমু খায। বৃষ্টি আরও জোবে হয়। মেঘ ডাকে। ভোগী অপলক তাকিযে আছে। ভোগী সুর কবে কী একটা বিড়বিড করছে। মিথিল একটু ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা কবে। বুঝতে পারে না। অভিমান্য পণ্ডিতেব মুখটা যেন দেখতে পায মিথিল। তাব কথাগুলো শুনতে পায় কি ভোগীর ঐ বিড়বিড করাব সুব ধবে, 'চারদিকে এত অনাচাব, অত্যাচাব, ধম্মোলোপ, খুন-খারাপি, চোপরদিন চুবিচামারি—এই অনাছিষ্টি দূব কবাব জন্যেই ভোগী আসে। তাবপব যা বললাম .' প্যাচপেচে কাদা, নোংবা কাঁথিব বাস্তায়। লোকজনও আছে। বাসনেব দোকানেব সামনে একটা সাইকেল বিকসাব চাকা ড্রেনে পড়েছে। ছোটখাটো একটা জটলা। বাহাদুর হর্ন দিতে একটা ছেলে, মাতব্বর গোছেব, ভিড ঠেলে গাডি যাওযাব রাস্তা কবে দেয। বড বড মাছ নিয়ে দুটো লোক। গরু। কুকুর। আওযাজ। সিনেমার পোস্টাব। বেডিওর দোকান। ক্যাসেট। ভোগীব চোখে পলক পডে না। সে কী দেখছে সেই জানে। মিমি মিথিলকে কানে কানে ফিসফিস কবে বলে, 'কী হবে মিথিল?'

ভোগী হঠাৎ খিলখিল কবে হেসে ওঠে, বাহাদুবও চমকে যায। তারপব আবাব চুপ। মিথিল সিগাবেট ধবায। বাহাদুবকে বলে, 'এ রাস্তা তো দীঘার।'

—হ্যাঁ, বাবু।

ভোগী শুনতে পায় বলে মনে হয না। হাওয়াব চবিত্র পাল্টাচ্ছে। কখনও মনে হতে পারে সমুদ্র এত কাছে যে, একটু গেলেই দেখা যাবে। কিন্তু তা হয না। মাঠেব পরে গাছের সারি শেষ হতে না হতে আবার মাঠ শুরু হযে যায। মিথিল বাস্তাব ধাবে চোখ বেখে দেখে—দীঘা—সাত কিলোমিটার। কাঁটা ষাট থেকে সত্তব কিলোমিটারের মধ্যে উঠছে নামছে। ভোগী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আস্তে, এবাবে এট্টু ধবে ধবে চলো। এট্টা নিমগাছ পড়বে।'

—বাহাদুব, আভি কুছ স্লো চালাও।

গাড়ির গতি নেমে ১৫ থেকে ২০তে চলে আসে। বাহাদুব সেকেন্ড গিযাবে চালায়। বৃষ্টিটা ধবেছে। ভোগী গাডি থামাতে বলে। নামে। কালো জিনিসটা দুলচে না। স্থির। আবার গাডিতে ওঠে। এবাবে স্পিড আবও কম। মাত্র দশ বা বাবো। বাঁদিকেব গাছগুলো লক্ষ করছে ভোগী। এবারে ও বাহাদুরের কাঁধে খিমচে ধবে। মুখে কিছু বলে না। বাহাদুব একটা মোডে গাডি সাইড করে লাগায়। ওরা যেখানে নামল সেখানে বাঁদিকে ক্যানালেব ধাব দিযে একটা বাস্তা চলে গেছে। মোড়েই ডালপালা ছড়িয়ে নিমগাছ। ভোগী গাছটাব দিকে তাকায। কয়েকটা ভেজা কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়।

—এসে পডেচি। ঐ তো নিমগাছ। নিমবিক্ষ।

কাকেরা সাড়া দিল।

সুতোটা বের করে। কালো গোলটা দুলতে দুলতে সিধে রাস্তা আব বাঁদিকের রাস্তার মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে দুলতে থাকে। বাহাদুরও নেমে এসেছে।

ভোগী হঠাৎ মুখের কাছে হাত জোড় কবে সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচায়, 'আমি এসে পড়িচি, ভো...গী...জানান পে . য়ে . চো. . ?'

তার উত্তরে দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা ছুটে আসে। মিমি ফুঁপোতে শুরু কবে। তার ঠোঁট কাঁপছে। ভোগী পুঁটলিব মধ্যে থেকে হাতড়ে হাতডে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়ক বের করে। সেটা বাহাদুরকে দেয়।

—অপঘাতে মরণ ছিল তোমাব। এইটে মাঁদুলি করে পরবে। বেঁচে যাবে কিন্তু অঙ্গহানি আমি ঠেকাতে পারব নি।

বাহাদুর প্রণাম করতে যায়। ভোগী করতে দেয় না। এবার ওদের দিকে যায়,

—ওরে আমার মেমিদিদিরে...কেঁদেকেটে এক্কেবারে একসা করেচে...দ্যাকো দিনি...এ মেয়ের তো দেখতিচি বড্ড নরম সোভাব. .তুমি মা কক্‌খোনো কারো ছেরাদ্দ খেও নি মা.. পোয়াতি থাকলি বাপ মরলিউ নয়...

ও মেমি
ও আমাব বাবু
আমার বড় জ্বর হয়েচে, তোমরা দুদে সাবু
আমাব আবাব জন্ম জন্ম বাই
এবার আমি যাই?
মিতিলবাবুবে তোমাদেব মনোমিল খুব পাকা
এবাব তোমবা বে কবে ফেল
আমি ঠিক দেখতি পাব
আমি দেকব

মিথিল এগিয়ে গিয়ে ভোগীর হাত চেপে ধবে। ভোগী ছাড়িয়ে নেয।

—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি থাকল, বন্ধু ভাব হলি পরে হবে বাদায না লাটে? হয মাইবিবিব হাটে নয় স্বপনের ঘাটে।

ভোগী ঘুরে হাঁটতে থাকে। সামনে একটু উঁচু। তার ওপর উঠতে থাকে। মিমি জোবে কাঁদছে। মিথিল তাকে জড়িযে রাখে। বাহাদুবও চোখ মুছছে। ভোগী আব একবারও ফিবে তাকায় না। উঁচুব ওপরে ওঠে। নেমে যায়। তাকে আর দেখা যায় না। ওব চলে যাওয়াব দিক থেকে হা হা কবে হাওয়া এসে আছড়ে পডে। ওদিকে আকাশে আবার কালো মেঘ সাজছে। সবাইকে জড়িযে রেখেছে হাওয়ার শব্দ, ঝড় .. ওবা অনেকক্ষণ ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

... ...

ভোগী হাঁটতে থাকে। জোরে জোরে। কখনও কখনও পাথর বেরিয়ে আছে মাটি থেকে। নোনা বাতাসে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর। মাটিই বেশি। কোনও মানুষের শব্দ নেই। মেঘলা আকাশ। কিছুটা দমবন্ধ করা গুমোট থাকছে আবার তারপরেই সাঁই সাঁই করে ভেজা বাতাস ঘাস আর কাঁটাঝোপের মাথা নুইয়ে দিয়ে ছুটে আসছে। একটা ছোট নালা। অগভীর। তাতে ঘোলা জল ছুটছে। ভোগী পেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পুঁটলিটা নালাব জলে ফেলে দেয়। কিছুটা ঘোলা জল হাতে নিয়ে মাথায় দেয়। কাদা কম, মাটিতে বালির ভাগ বাড়ছে। আবার—একটু উঁচুনিচু। অনেকটা। অনেকটা জায়গা ধরে। উঁচুটার ওপরে যেয়ে বসে। হাঁপায়। ঝিমুনি আসছিল হয়তো কিন্তু বাতাসের একটা দল চারদিক তোলপাড় করে চলে গেল আর সেই বাতাসে ভর করে এসেছিল সমুদ্রের আওয়াজ। সমুদ্র কত দূরে। ভোগী উঠে হাঁটতে থাকে। আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ। ভোগী আড়চোখে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘের ওপর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে উড়োজাহাজ যাচ্ছে। দেখা না গেলেও আওয়াজ শোনা যায়।

বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে জল। পাশে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা, সেই ডালে নোংরা ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা। জলে ভেজা মাটিতে তিন আঙুলে পাখির পায়ের ছাপ। ছাপের গর্তে জল ভরে রয়েছে যেন আকাশে তাকানো চোখ। ভাঙা শামুক খোল। ভোগী বিড়বিড় করছে সুর করে। এত আস্তে যে, শোনা যায় না।

আবার শুকনো। দূরে গাছপালা দেখা যায়। জোর দমকা বাতাস আসে। ভোগীর মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ ভারি চিৎকার করে একটা দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে সামনে বসে। ভোগী থমকে দাঁড়িয়ে

যায়। দাঁড়কাক কালো চোখে ভোগীকে দেখে। ডাকে না কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করে। ভোগী বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ থুথু ছেটায়। কাকটা উড়ে যায়। ভোগী চলতে থাকে। ভোগীর মাথার ওপর দিয়ে কাকটা পাক দিয়ে ওড়ে। চড়া রোদ থাকলে দেখা যেত কালো ছায়া। ভোগী দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল বোধহয় তা নাহলে হোঁচট খেয়ে সবাসবি আছড়ে পড়ত না। কপালটা ছড়ে গেছে। দাড়িতে বালিমাটি লেগে। কিছুক্ষণ পড়ে থাকে নিশ্চল হয়ে। দাঁড়কাকটা আড়ে আড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে আসে। ঠোঁটটা ফাঁক। বেশ বড় ঠোঁট। পায়ের নখগুলো বেঁকানো। ভোগী একটা চিৎকার করে। কাকটা লাফ দিয়ে পেছিয়ে যায়। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। কাকটা লাফ দিয়ে দিয়ে ওকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। একদলা কাঁকরমাটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভোগী। সেটা ছুঁড়ে মারতে চোখে, ঠোঁটে, ডানায়, পালকে লাগে কাকটার। ঝটপট করে উঠে ওপরেই একটু তালগোল পাকিয়ে ওড়ে তাঁর মাটি থেকে কয়েক হাত মাত্র ওপর দিয়ে সোজা উড়ে দূরে যেতে থাকে। ভোগী মুখে অল্প হাসি নিয়ে ওকে পালাতে দেখে।

কয়েকটা ঝোপড়া ঝোপড়া ঘর। ভোগী প্রথমে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর গা থেকে জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেয়। এগোতে থাকে। জামাটা ঝোপড়ার সামনে ফেলে দেয়। দিয়ে চলতে থাকে। ভোগী কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পরে ওরা বেরিয়ে আসে। আঙুল নেই। নাক নেই। চোখ গলে গেছে। সমুদ্রের হাওয়ায়, সূর্যের আলোয় ওদের এখানে থাকার নিয়ম। তিনচার-জন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে, ভোগী চলে যাচ্ছে। একজন আস্তে আস্তে গিয়ে জামাটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অন্যদের দেয়।

রোগা হাড়জিরজিরে একটা কুকুর ভোগীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর সামনে সামনে চলতে থাকে। কুকুরটা চারপায়ে বেশ জোরে চলে বলে সেই সম্মোহনে ভোগীও জোরে জোরে পা চালায়। বেশ কিছুটা জায়গা ধরে—অনেক ঝিনুকের খোল। আঁষটে গন্ধ। ভোগী দাঁড়িয়ে যায়। সামনে, দূরে বা কাছে, কোথাও কুকুরটা দাঁড়িয়ে শোঁকে। চলতে শুরু করে। ভোগীও চলতে শুরু করে। ভোগী বিড় বিড় করে। দাঁড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি শুরু হয়। ওপর দিয়ে একটা মেঘ চলে যাচ্ছিল। সে-ই বৃষ্টি দিয়ে গেল। ভোগী দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে, বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। কুকুরটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে। লোম ভিজে যাওয়ায় তার পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখদুটি বড়ই করুণ। ভোগীর পিঠ বেয়ে বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। ভোগী হাঁটতে শুরু করে। আবার পড়ে যায়। কুকুরটা কুঁই কুঁই শব্দ করে। ভোগীর মুখের কাছে মুখ আনে। থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়ে খেলার ভঙ্গি করে, ডাকে। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে শুরু করে।

মাটিতে নুনের ফেনা। শাদা গ্যাঁজলা। ধারালো কাঁটা ঝোপ। এলোপাথাড়ি বাতাসে সমুদ্রের আওয়াজ। বেশ কাছে। কিছুটা দূরেই বালিয়াড়ি। কুকুরটা থমকে দাঁড়ায়। আর নড়ে না। ভোগী এগিয়ে যায়। কুকুরটা বসে আকাশে মুখ তুলে কাঁদে। ভোগী ফিরে তাকায় না। এগোয় সমুদ্রের আওয়াজ, আর তার সঙ্গে বাতাসের শব্দ, চোখ বন্ধ করে শুনলে এক এক সময় মনে হবে চিৎকার করে কাঁদছে কেউ, কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে, মাঝে মধ্যে ঢেউ-এর দীর্ঘশ্বাস। বালিয়াড়ির ওপরে উঠতে থাকে ভোগী। ঠোঁট কাঁপছে। সাগরের হাওয়ায় সারা শরীরে ঠাণ্ডা কাঁপন। বালিয়াড়ির ওপরে উঠে সামনে তাকায়। কালচে মেঘে ঢাকা আকাশের তলায় দিগন্ত অবধি অবাধ সমুদ্র, রং গাঢ়, শাদা ফেনা থেকে থেকে।

বালিয়াড়ি ডাইনে বাঁয় দুদিকে চলে গেছে। ভোগী বাঁদিকে উঁচু নিচু দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোয়। শুকনো কাঁটাগুলি এড়িয়ে যায়। সামনে একটা উঁচু জায়গা। সেটা পেরোতেই দেখতে পায় লোকটাকে। এক মনে কি করছে।

লোকটা আধবুড়ো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বলিষ্ঠ। একটা বড় পাথব। তার ওপরে ভিজে বালি ছড়িয়ে ঘষে ঘষে একটা ভাবি কাতানে শান দিচ্ছিল। ভোগীর দিকে তাকায। হাসে। কাতানটা জল দিযে ধোয। আঙুল বুলিযে ধাবটা দেখে পাশে রাখে।

—এলে?

—হ্যাঁ।

—ঐ হাঁড়িতে জল আছে। খাও।

ভোগী মাটিব হাঁড়ি থেকে উপুড় কবে জল খায। খেযে হাঁড়িটা নামিযে বাখে। হাসে।

—এক্কেরে হাঁপ ধরে গেছে।

—হ্যাঁ, অনেকটা পথ তো।

—অনেকটা পথ।

লোকটা আবাব পাথবের ওপব বালি দিযে, জল ছড়িয়ে কাতান ধাব দিতে থাকে।

—এর আগের ভোগী কবে এসেছিলেন?

—সে অনেকদিন হযে গেল। শীতকালে। তা তুমি জানলে কী কবে যে, তুমি ভোগী?

—বুঝতি পাবলাম! ও ঠিক বোঝা যায। এট্টু শুযে নিই।

—নাও। এখন অনেক বাকি।

ভোগী শুযে পড়ে। ঘোর আসে একটা। একদিকে সাগবেব শব্দ। সেই সঙ্গে পাথবেব ওপবে লোহা ঘষার আওযাজ। কাত ফিবে হাতেব ওপব মাথা দিযে শোয। ঠিক ঐ লোকটাকে না, নিজেই ভুল বকার মতো বলে চলে,

—তো অন্দকার তকন বেশ হয়েচে। ভাবলাম যে যাই। জলে গেবণ দেখে আসি। গেবণ দেখতিচি, গেরণ দেখতিচি, তা ওমা, চেঙ মাচগুলো দেকি কাদার থে বেইবে এসে কি মাতন করতেচে... কোতায় রাতমণির জলছর্বি দেখব...তা সব ঘেঁটে দেচ্চে তকন পষ্ট শুনতি পেলাম কানে...তুই ভোগী হ .শুনতিচিস...তুই ভোগী হ.. কে যে বলল ঠাওর করতি পারলাম না...তারপর জ্বব হল. .আটেকাটে দড় তো ঘোডার পিঠে চড়...ভোগী হয়েচি. তারপর সেই ভোগী

লোকটা বালিতে গলা অবধি পোঁতা একটা বোতল বের করে মদ খায়।

ভোগী অনেকক্ষণ ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে চিৎ হয়। হাসে। কথা বলে। লোকটা কাতান ধার দিয়ে চলে। বৃষ্টির ফোঁটা মুখে পড়তে ভোগীর ঘুম ভাঙল। দিন গড়িয়ে আকাশ আরও অন্ধকার হয়েছে। ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে। ভোগী আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়।

—সময় হয়েচে?

—তা প্রায় হয়ে এল।

—তাহলি তো সাজতি হয়।

—হ্যাঁ।

ভোগী বালিয়াড়ি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যায়। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙা জল পায়ে লাগে। একটু জল নিয়ে মাথায় ছিটোয়। কাপড়টা খুলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। পরণে কিছুই নেই। হাঁটুজল ভেঙে ভেঙে এগোয়। তারপর মাঝারি ঢেউ পেরিয়ে গিয়ে ডুব দেয়। তিনবার। উঠে দাঁড়ায়। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। উঠে আসে। চুলদাড়ি লেপটে রয়েছে। জোর হাওয়া। ভোগী ফিরে আসে।

—সরায় ভাত আছে।

—দাও।

ভোগী জল দেওয়া ভাত খায়। তৃপ্তি কবে খায়। নুন নেই। শুধু মিঠে ভাত। খেতে খেতে দ্যাখে

যে, লোকটাব কাতান ধার দেওয়া হযে গেছে। সে জল দিযে পাথরেব ওপব থেকে বালি ধুযে দেয়। বৃষ্টি আসে জোবে। ভোগী মাটিব হাঁডি থেকে জল খায। আঁচায। মাটিব হাঁডিটা বাখে। তাতে বৃষ্টিব ফোঁটা পডে। ভোগী হাসছে। হাসতে হাসতে পাথবটাব দিকে এগোয়। লোকটা বোতলটা উপুড কবে খায। খেযে বোতলটা ছুঁডে দূবে ফেলে কাতানটা তুলে নেয। ঝড় আসে। অন্ধকাব আবও ঘোব হয। ভোগী বলে,

—আসি।

হাতদুটো পিছমোডা কবে পিঠে নিয়ে যায়। হাঁটুব ওপরে বসে। তাবপর পাথবটাব ওপবে বুক দেয়। হিঁচডে হিঁচড়ে এগোয। মাথাটা উল্টো হয়ে পাথবেব থেকে বেবিযে আসে। আব একটু এগোয। গলাটাও বেবিযে আসে। গলাব ওপবে নীচে ফাঁকা।

লোকটা কাতান সোজা কবে ভোগীব গলাব পেছনে আলতো কবে ছোঁযায। পুবো ভাবটা দেয না। তাবপব সজোবেব কাতানটা হ্যাঁচকা দিযে নিজেব মাথাব ওপবে তোলে। বিদ্যুৎ চমকায়। কাতান নেমে আসে।

কা ট্

নিশীথে সমুদ্রতীবে যে-কাহিনিব অবতাবণা তা ভোগী উপাখ্যানেই শেষ হল না কেন? রাতের সমুদ্রেব ঢেউ বার বাব এসে সেই প্রশ্নটাই মুখে ফেনা তুলে জিজ্ঞেস করছে।

এবমধ্যে ভোগী গিযে সমুদ্রতীব থেকে ভোগীব মুণ্ডুটি নিযে এসেছে। এটা তার ট্রফি। সে বলেই দিযেছে যদিও বাজাবে জোব গুজব যে, সে অস্কাব নমিনেশন পাবে, শ্রেষ্ঠ বিদেশি অভিনেতা হিসেবে, কিন্তু তাব কাছে সিন্থেটিক পদার্থে নির্মিত অবিকল মুণ্ডুটি সেই পুবস্কাবেরই সমতুল্য যা ববার্ট ডে নেবো বা অ্যালপ্যাচিনো পেযে থাকেন। মুণ্ডুটি তৈবি হয়েছিল মাদ্রাজেব সুন্দবম স্টুডিওতে। এব আগেও ওবা কমল হাসান, জ্যাকি স্রফ ও এঁরা বাদে অনেকে, যাঁবা ভিলেন কবে খ্যাত যেমন অমবীশ পুরী ইত্যাদিব মুণ্ডু বানিয়েছেন।

পবিচালকেব ইন্টাবভিউ-এব কিছুটা অংশ এবাবে প্রয়োজনীয় সংযোজন।

—শেষটায ডে ফব নাইট শুটিং কবেছি। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক। ফিল্ম কোড্যাক, ক্যামেবা অ্যারিফ্লেক্স-থার্টি ফাইভ, একটি বিশ ফুট ক্রেন ছিল, আর্টিফিশিয়াল লাইটের জন্যে জেনারেটর ছিল. .এই স্টুপিড ডিটেলগুলো আপনাদেব দিচ্ছি তাব কাবণ আপনাবা স্টুপিড প্রশ্ন করছেন—আরও ডিটেল-এ যেয়ে আপনাদের বলতে পাবি, ঐ যে শিরশ্ছেদের দৃশ্যটিতে লো অ্যাঙ্গল মিডিয়াম ক্লোজ শট নিয়েছি ফর্টি এম এম. লেন্সে, ক্যামেবা জুম কবেছে আব লংগিশ মিড শটগুলো নিযেছি ফিফটি এম. এম. লেন্সে—নাউ, কোয়াযেট, কোযাযেট—এই যা বললাম এব মধ্যেই একটা টুপি রয়েছে। সেটা কেউ পয়েন্ট আউট করবেন? আপনাদের ব্রেনগুলো এত ভাল জানলে অন্তত আজকে আমি বিয়ার অফাব করতাম না।

—টুপিটা কোথায়?

—মাথায়। সমুদ্রেব ধারে, একটা লোকেশনে, একটা বিশ ফুট ক্রেন নিযে যাওযার খরচটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ কবে যে, নো কমপ্রোমাইজ। আমি এন. এফ. ডি. সি-র টাকা মারি নি।

—তার মানে আপনি বলতে চান অন্য যাঁরা করছেন তাঁরা টাকা মারছেন?

—নো কমেন্টস্।

—ছবির মধ্যেই তো আপনি এন এফ ডি সি. সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছেন।

—নো কমেন্টস্। আ ফিল্ম ইজ আ ফিল্ম।

—থিমটা আপনি পেলেন কোথায়? এরকম কি হয়?

—এখানে হয় কিনা জানি না। তবে আমার এক বন্ধু, তিনিও ফিল্মমেকার, আপনারা অনেকেই নাম জানেন, তিনি বলেছিলেন আসামে নাকি এরকম হয়।

—সেখানেও কি ভোগী বলে?

—হ্যাঁ।

—ভোগীর মির‍্যাকলগুলো কী করে আপনি জাস্টিফাই করেন?

—দেখুন, ওগুলো ফেস ভ্যালুতে নিলে আমার হাসি পাবে। ওগুলোকে কবিতার চিত্রকল্প হিসেবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? ভোগী কিন্তু তারকোভস্কির—'স্যাক্রিফাইস'-এর অটো নয়। আমার ছবিটার মূল থিম হল অল আউট কোরাপশন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সোসাইটির চেষ্টা। ভোগী একজন কমন ম্যান। কমন ম্যানই প্রোটেস্ট করবে। করছে। তার জন্যে মরতে হবে।

--কিন্তু সেটা কি এসটাব্লিশড্ হয়েছে?

—যদি না হয় সেটা আমার ফেলিওর। আসলে এর পরে আমি ভেবেছিলাম একটা ডকুমেন্টারি ন্যারেটিভে যাব। সেই মহেঞ্জোদড়োতে বাচ্চার খুলিতে চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আঘাতের চিহ্ন থেকে আজ অবধি ..বসনিয়া বলুন, লেবানন বলুন, ইরাক বলুন—এর বিরুদ্ধে ভোগী একটা পোয়েটিক ইমেজ অফ আ প্রোটেস্ট। তারপর ভাবলাম—এই দেশটাই যথেষ্ট—গলাপচা, চোর-জোচ্চোরের দেশ—এইটুকুই থাক। যে যা বোঝার বুঝবে। স্টোরি লাইনটাই এনাফ।

—আচ্ছা, ঐ ফিল্ম ডিরেকটর রুবেনো রায়—ওটা কি আপনার কন্টেমপোরারি কেউ?

—হাস্যকর প্রশ্ন করবেন না।

—আপনি কি মনে করেন যে, 'ভোগী' একটা কমিটেড ছবি?

—হ্যাঁ, মনে করি। না করলে ছবিটা আমি করতাম না। আর কোনও প্রশ্ন কেউ করবেন?

'ভোগী' ভারতীয় প্যানোরামায় নির্বাচিত হয়েছে। আশা করা যায়, ভেনিস বা কান্ চলচ্চিত্র উৎসবেও 'ভোগী' সমাদর লাভ করবে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি

১

রাতেব আকাশ ঝলসাচ্ছিল যুদ্ধের আলোয়। সেই সঙ্গে ক্রমাগত শব্দ বিস্ফোরণের। এভাবেই ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। প্রাণ দেওয়ার ও নেওয়ার যুদ্ধ। যে জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে রণজয় সেই যুদ্ধের আলো-আওয়াজেব দিকে তাকিয়েছিল তার শিকগুলো অনেক দিনের পুরনো। তলায়, কাঠেব মধ্যে গেঁথে যাওয়ার জায়গায় মরচে ধরে ধরে সরু হয়ে গেছে। কাঠটাও রোদে জলে কখনো শুকিয়ে কখনো ফেঁপে ফেটে গেছে। শিকগুলো নড়ে। শিকের বাইরে জাল। চৌখুপি চৌখুপি। জালটাও নিচের দিকে ছেঁড়া। লাল ঘাঁটির বাইরে ২-১১-৯৪-এর সন্ধ্যায় যে যুদ্ধ চলছিল তার আলো কখনো কখনো রণজয়ের মুখটা ভাসিয়ে দৃশ্যমান করে তোলে। রণজয় বেশ লম্বা। পাঁচ এগাবো। ছোট ছোট করে কাটা চুল। হলদেটে, কাঁচাপাকা, খাড়া খাড়া। গালে চাব পাঁচ দিনের শাদাটে দাড়ি। রণজয় দেখল ফ্লেয়ার-এর আলোয় আকন্দর ঝোপ আর কাল কাসুন্দার বন ছাড়ালে যে জলা আছে সেটা চকচক করে ওঠে। এই আলোয় রাতকে দিন করে প্রতিপক্ষেকে চিনে নেয় সৈন্যরা। বাইরে যে সামান্য কয়েকজন অসমসাহসী কমরেড সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিযে লড়ে যাচ্ছে। তাদের কেউ হয়তো ওই আলোয় ধরা পড়ে গেল। মেশিনগানের নিশানাব মধ্যে ছুটে পালাতে গিয়ে জলের মধ্যে, কাদার মধ্যে লাফ দিয়ে নেমে যায়। মেশিনগানের বুলেটে শরীরটা বুক বরাবর সেলাই হয়ে যায়। হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে যায়। কিন্তু চিৎকার করে এগিয়ে গিয়ে কেউ গ্রেনেড চার্জ করায় মেশিনগানটা চুপ করে যায়। রণজয় বিড়বিড় করে বলে যায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে করতেও চেষ্টা করে। 'ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চাই একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং চাই রাজনীতি সচেতন জনতা। এই দুটি শর্ত পালিত হলেই টেবেনের প্রশ্ন আসে। টেরেনের প্রশ্নের দুটি দিক আছে। একটা প্রাকৃতিক এবং অন্যটা নিজেদের হাতে তৈরি করা। সমতলভূমিতে ঘাঁটি এলাকা হতে পারে। তার প্রমাণ জাপ-বিবোধী যুদ্ধের সময় পিকিং শহরের উপকণ্ঠে সাতটি এরকম ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল।' নীলচে বা হলুদ আগুন ঝলক দেওয়ার পর এবার শব্দগুলো আসছে। হয়তো মর্টার যার গোলাটা নলের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরেই কানে হাত চাপা দিতে হয়। রকেটের মতো কি আকাশ বেড় দিয়ে উড়ে গিয়ে ফাটল। মধ্যে, কবে যেন কেউ বলেছিল কি? স্নাইপাররা রাতেও দেখতে পায়। টেলিস্কোপিক নাইট ভিশন না কি যেন? কখনো বলেছিল কেউ? ঘাঁটি এলাকার এই বাড়িটা লাল ইটের আর কাঁটাতার লাগানো। বাইরের দেওয়ালটাও লাল ইটের কেন? বাড়িটা বিপ্লবীরা তৈরি করেনি। রণজয়রা দখল করেছিল। কবে? রণজয় মনে করতে পারে না। একটু আগেই তো ঘুমোচ্ছিলে না রণজয়? সেই বিকেলের আগে থেকে। খেতে যাওয়ার আগে ওষুধটা খেয়েছিলে বলে ঘুম এসেছিল? দূর বোকা। তুমি তো শুয়ে শুয়ে কোবা কখন ইস্কুল থেকে ফিরবে, ফিরে বলবে সোমবার ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে, না, তারপর বালতির ঢাকার স্টিয়ারিং নিয়ে বাস-বাস খেলবে, কোবার ফিরে আসার ইস্কুলভ্যানের ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করছিলে না রণজয়? মেখলা গেটের কাছে গিয়ে কোবা ফেরার জন্যে অপেক্ষা

করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে, কাছে কোথাও রাইফেল থেকে ফায়ার করছে। আবার আকাশে ফ্লেয়ার উঠল। আস্তে আস্তে, দুলতে দুলতে আলোটা নামছে। ঘুম আসে কিন্তু ঠিক ঘুমের মতো নয়। তাই না রণজয়? প্রথমে দফায় দফায় চৌকো নীল, গাঢ় নীল রঙ বড় থেকে ছোট হয়ে যায়। সবাই ওই আলো ধরতে চায়। তারপর সেইসব মুখ আসে। কী ঠিক না? তেরচা চোখ। অসম্ভব চোয়াল। কারো কারো আবার এমন থ্যাৎলানো যে চেনা-অচেনার বাইরে। এরপরে, এরকম চলতে চলতে কখন যেন ভারি, ভিজে কেমন একটা কেউ-নেই কোথাও-নেই হয়ে যায়। স্টেনগানের শব্দ তোৎলাচ্ছে। তবে, রণজয়, তুমি শুনতে পেয়েছিলে না যে জুতো মোজা খুলে রেখে কোবা মেঝের ওপরে খালি পায়ে হাঁটছে? দরজা জানলাগুলো নীচে বোমা ফাটার শব্দে ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে। কোবা হাত, পা ধুযেছে। ভিজে মেঝের ওপরে ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ ফেলে হাঁটছে। মেখলা সব সময় নজর রাখে কোবার ওপর। কোবা যদি জানলা বেয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়? যদি হেড ইনজিউবি হয়? যদি কিছু মনে না পড়ে তার? তখন তুমি কী করবে রণজয়? বাই দা বাই, তোমাকে ওই নাইট ভিশন ডিভাইসেব কথাটা কে বলেছিল? ওই নতুন ডাক্তারদের কেউ? ইন্টারোগেশনেব সময় ঘুরেফিবে বারবার মূল প্রশ্নটা এলে যদি তুমি জবাব না দাও তাহলে কী হয় রণজয় তোমার তো জানা না থাকার কথা নয়।

অত মনে বাখতে পারে না রণজয়। সত্তর দশকেব সফল ও ব্যর্থ লড়াই-এব মধ্যে দিয়ে যে সামান্য কযেকটা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল এবং পবেও যা থেকে যায় তার একটির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রণজয় সেই সন্ধ্যায় নিজেকে ধিক্কার দিল। নাইট ভিশন? অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার, তথ্য, ইতিহাস মনে রাখলে অবশ্যম্ভাবী পিছুটান ও বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। ঘাঁটি এলাকা, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, রাজনীতি সচেতন জনতা এবং দুই দিক সহ টেরেনের প্রশ্ন এখন একমাত্র চিন্তার বিষয়। ভুল হয়ে গেছে রণজযের। ঘাঁটিব দুর্ভেদ্যতার ওপরে অহেতুক আস্থা রেখে মনগড়া একটা স্বস্তিতে রাতদিন কেটে যেতে দেওয়ার ভুল। এরকম মারাত্মক, পার্টি বিরোধী, দেশদ্রোহিতার ভুল তুমি কী করে করতে পারলে রণজয়? তার মুখেব ওপরে বিস্ফোরণের আলো চমকায়। কবে থেকে যেন চোখে কম দেখে বলে আলোগুলো কত বড় দেখায়। বাল্বের আলো, বৃষ্টির আলো, বিস্ফোরণের আলো, তারার আলো, মুরগির ঘরের ছাদের ঢেউ খেলানো টিনের ওপরে প্রতিফলিত সূর্যের আলো—প্রত্যেকটা আলোর ধার থেকে অবছা আলো দূরে যেতে চায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সব আলো যেখানে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা সেখানেও চৌকো নীল, গাঢ় নীল আলো। সে আলো পেরোলে হাঁ মুখ, না মুখ। তা পেরিয়ে গেলেও অন্ধকার নেই। ফাঁকা সময়। তারও একটা অস্ফুট আলো আছে। বিপ্লবীরা যেহেতু বা নির্দিষ্টভাবে বস্তু-জগতের ব্যাখ্যা করার থেকে বিরত হয়ে তাকে পাল্টানোর কাজে লিপ্ত তাই তাদের ভুলচুক কখনোসখনো হতেই পারে। কিন্তু এ ধরনের ভুল কি অমার্জনীয় নয়? রণজয়, কৃপা করেই তোমার নামের আগে এখনো যদি কমরেড শব্দটা জোড়া যায় তাহলে জেনে রাখো যে তুমিও ট্রটস্কি, বুখারিন, লি শাও-চির দলে নাম লেখাতে চলেছ! তোমাকেও নেকড়ে ও কুত্তার দো-আঁশলা বলা হবে, বলা হবে কুকুরের গু বা ছারখার করিয়ে উইপোকা। একটা ঘাঁটির পতন ঘটার অর্থ হল শ্রেণী শত্রুদের আত্মবিশ্বাস শতগুণে বেড়ে যাওয়া। লাল ফৌজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কববে রণজয়? তুমি? নাইট ভিশন। ইন্টারোগেশন। তিমির দৃষ্টি! জেরা! হ্যাঁ, কী মনে করবেন তিনি? কমরেড স্তালিন? কমরেড স্তালিনের ছদ্মনাম এবং পরে পার্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যে নাম চালু ছিল তুমি না সেই নামে নিজের ছেলের নাম রেখেছিলে 'কোবা'। বাঃ 'বিশ্ববিপ্লবের নেতা চেয়ারম্যান মাও আজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাই জয় আমাদের

হবেই। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে বেঁচে থাকুন চেয়ারম্যান মাও।' কী ভাববেন তিনি? এরপরেও কি তিনি বণজযের ওপরে এতটুকু ভবসা রাখতে পারবেন? পাববেন কমবেড চুতে, কমরেড লিন পিয়াও, কমরেড ও শ্রদ্ধেয় নেতা চাক মজুমদার? কোবা যখন বড হয়ে শুনবে যে তার বাবা 'শক্রর অস্ত্রাগাব আমাদের অস্ত্রাগাব' জেনেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তখন সেই-বা কী বলবে? দূবে হলেও অস্ত্র একটা জায়গায় আছে। গর্তটা আছে। গর্তের মধ্যে পলিথিনেব চাদর ও চট দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অস্ত্রগুলো, রাইফেল দুটো ছিলই, তলায় ইট বিছিয়ে নামনো হযেছিল। ওপরে কাঠের তক্তা। মনে আছে কয়েকটা তক্তা থেকে এঁকাবেঁকা পেরেক বেরিয়ে। তক্তার ওপরে ইট। তার ওপরে মাটি। বাঁধাছাঁদা কবাব পব আস্ত্রের বান্ডিলটা মনে হয় চাদরে জড়ানো মরা মানুষ যাকে কবর দেওযা হবে। ওই তো মাথার দিকটা সরু, হাঁটুটা ভাঙা। অস্ত্র নিয়ে এই অবরুদ্ধ ঘাঁটি এলাকায় ফিবে আসা সম্ভব কী? অবশ্যই সম্ভব। "আমাদেব মনে রাখতে হবে কমবেড মাও সে-তুং-এর শিক্ষা, 'দমননীতিব বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জনসাধাবণেব সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধবায এবং আত্মসমর্পনের পথে যায়'।" নাইট ভিশনে কোনো স্নাইপার বাইরের অজানা কোনো অবস্থান থেকে রণজযকে দেখে থাকবে। তার ছোঁড়া বুলেটটা ছেঁড়া জাল পেবিয়ে শিক গলে ঘরের মধ্যে ঢুকে উড়তে শুরু কবে। রণজয় অন্ধকারেই ডোরা ডোবা দাগ কাটা, বড কলাবওয়ালা, রক্তেব ছিটে লাগা শার্টটা খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয। পাযজামাও খুলে ফেলে। ন্যাংটো হয়ে হাতড়ে হাতড়ে চকলেট বঙের টেরিকটনেব প্যান্টটা পরে ফেলে। হাডজিরজিরে বুক পিঠের ওপবে হাত কাটা গেঞ্জি গলায সিন্থেটিক ইয়ার্ন মেশানো ব্যাগি স্পোর্টস শার্টটা পবে নেয। সাহেবদেব দেশে এগুলো সামাবে পরে জগিং করে। বোমা ফাটে তলায়। তলায গানও বাজাচ্ছে কেউ। হল্লাহাসি ভেসে আসে। সেবার ঘুলঘুলিব গর্তের মধ্যে লুকিয়ে বাখা তিনফলা নিডানিটা বের কবেছিল বণজয। এবাবে ওয়াড় খুলে ফেলে ফাটা জায়গাটা দিযে হাত ঢুকিযে টাকাগুলো বাব করে। প্যান্টের পকেটে নেয়। ঘরের মধ্যে বুলেট উড়ে বেডাচ্ছে। সকালেব হলদে হয়ে যাওয়া, ভাঁজে ভাঁজে ছেঁড়া খবরেব কাগজটাকে আরো ছোট ভাঁজে বশ করে পকেটে ঢোকায়। সযত্নে রক্ষিত ডটপেনের বিলিফটা নেয়। জানলা দিযে বুলেটটা ঢুকেছিল রণজযকে মারার জন্যে। বুলেট তখন ক্লান্ত হয়ে কালো সোনালী ডানা দুটো ছড়িয়ে বসে। জীবন্ত কিন্তু নিস্পন্দ। রণজয় পা টিপে টিপে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁডায়। বিস্ফোরণ ঘটছে, মেশিনগানও চলছে। তবে দূবে মেখলা আর কোবা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তলায় নেমে বণজয় দেখল দুটো কোলাপসিবল গেটই আধখোলা। রিসেপশনের কালো কাঠের টেবিলের ওপরে দুটো চাবিভরা তালা আর একটা বড় টর্চ রাখা। কাছেই জোরে গান বাজছে। মদের গন্ধ হালকা শীতের হাওয়াহীনতায় থমকে থমকে ঘুরছে। ওপরে কেউ রোজকার মতোই চেঁচাল। রণজয় সুড়কির রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে বাগানে, মরশুমি ফুলের গাছের মধ্যে চলে যায। ঘাপটি মেরে থাকে। রণজয় পালঙের বেড়ের ওপর দিয়ে দৌড়োয়। ঝুপ ঝুপ শব্দ হয়। উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে মুরগির ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে। ইটের ফোকর করা। তাতে পা দিয়ে সাবধানে ওপরের টিনটা ধরে ঝুলে হাত দুয়েক ডানদিকে গিয়ে চওড়া দেওয়ালটা জাপটায় রণজয়। তারপর তিনসারি কাঁটাতাবের তলা দিয়ে হিঁচড়ে বেরিয়ে আসে। পিঠের দিকে কাঁটাতার ঘষে কেটে যায়। হাতও কাটে রণজয়েব কারণ পাঁচিলের ওপরে ভুমো ভুমো কাচও বসানো ছিল। বাইরে, তলায় অগভীর খাদ। জলও নেই। রণজয় হাত আগলা করে কিন্তু নামতে পাবে না। শার্টের কিছুটা কাঁটতাব খিমচে ধরে রয়েছে। ছিঁড়ে, পড়তে কয়েক লহমা সময় লাগে। পরিখার তলায় পড়ে রণজয় মাথা ঘুবিয়ে ওপরে আকাশ দেখে। বাঁ পা-টা মচকে গেছে।

পা-টা দুহাতে চেপে ধরে রণজয়। কাত হয়ে শোয়। অসহ্য যন্ত্রণা। এমন যন্ত্রণা যে আর কখনো যেন হাঁটতেই পারবে না। খাদের তলায় ছায়া আর কখনো কখনো বাগানের জল আসে বলে ঠিক ঘাস নয়, বড় বড় পাতার কি একটা গাছ ভরে থাকে। এতে ছোট ছোট হলদে ফুলও হয়। তার ওপরে শুয়ে আকাশেব দিকে তাকায় রণজয়। নানা পাওয়াবের কত বাল্ব জ্বলছে। কয়েকটা বাল্ব ঝুলময়লায় এতই ম্লান যে দেখাই যায় না। চোখে কম দেখে বলে আলোগুলো ধেবড়ে যাওয়া। তারাদের অনেক নাম আছে কিন্তু একটাও বণজয়েব মনে পড়ে না। অতটা ওপর থেকে পড়লেও চমশমাটা ঠিক ছিল। নাকি একটু বেঁকে গেছে আব নাকেব ওপরে কেমন জ্বালা জ্বালা। রণজয় উঠতে থাকে। কনুই দিয়ে, হাঁটু দিয়ে ঠেলা মেরে মেরে নালির ওপরে উঠে আসে। উঠেই যুদ্ধের নিয়মে উল্টে গাড়িয়ে যায় রণজয়। কেউ গুলি কবলে যাতে ফসকে যায়। একটা ফ্রন্ট। তুলকালাম যুদ্ধের ফ্রন্ট। ফ্রন্টে অসাবধানতার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। রণজয় উপুড় হয়ে চারদিকটা দেখে নেয়। ঘাঁটির ভেতরে গান বাজছে জোরে। হুল্লোড়ের শব্দও আসছে। কোলাপসিবল গেটগুলো বন্ধ করছে কেউ। লোহার সঙ্গে লোহা ধাক্কা খাওয়ার শব্দ। যুদ্ধের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও লুকিয়ে স্নাইপার থাকলেও থাকতে পারে। থাকলেও কিছু করার নেই। কোবা আর মেখলা ঘুম থেকে উঠে তোমাকে না দেখে চিন্তা করবে না রণজয়? ওরা কিছু জানাবোঝার আগেই তুমি সেই জায়গাটায় গিয়ে লুকোনো অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে পারবে? গেট খুলে কেউ বাইরে এসে টর্চের আলো ফেলল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখল। চড়া আলোটা রাস্তায়, নালিতে, বাস্তার ওপারে আকন্দ গাছের ওপরে পড়ল। গেট বন্ধ হল। তালা লাগল। রণজয় উঠে বসে। এই বাস্তাটা ডাইনে বাঁয়ে, কোনদিকে স্টেশনের কাছে গেছে? শেষবার ট্রেনে আসেনি রণজয়। গাড়িতে এসেছিল। স্টেশন থেকে কলকাতা। তার মধ্যে আবার যাদবপুর রেল স্টেশন। সে আব একটা স্টেশন। তার ওপারে, লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কোথায় সেই জায়গাটা যেখানে চট-পলিথিনে জড়ানো মরা মানুষেব মতো দেখতে অস্ত্রগুলো রাখা হয়েছিল? রণজয় কিছুটা বাস্তা হাত আর হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে এগোয়। রাস্তার ধারে খোয়া আর শুকনো চাপ বাঁধা ঘাস। এইভাবে চললে কতক্ষণ লাগবে কলকাতা পৌঁছতে? যতক্ষণই লাগুক, বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়। সূচিশিল্প বা প্রবন্ধ রচনা নয়। নেভস্কি প্রসপেক্টের মতো সিধা সড়ক নয়। এবং বিপ্লবের পথে শ্রেণী শত্রুরা ছাড়াও, মেকি বিপ্লবী ও দাদাল গুপ্তচরদের বাধা থাকবেই—সেই কাউটস্কি, বার্নস্টাইন থেকে শুরু করে মেনশেভিক, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, ট্রটস্কি, লি শাও চি-দের কথা ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না ডাঙ্গেচক্র, নয়া সংশোধনবাদী ও 'খোকনচক্রে'র কথা। এই যে পায়ের ব্যথা নিয়ে রণজয় ভাবছে তারও মধ্যে রয়েছে নিজের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অহেতুক বড় করে ভাবা। এরই নাম অহমিকা। 'চেয়ার‍্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি কমিউনিস্টকে সর্বদা অহমিকা ও দম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ, অহমিকা ও দম্ভ সমস্ত কমিউনিস্ট গুণাবলিকে শেষ করে দেয়।' রণজয় দাঁড়িয়ে ওঠে, দু-পা এগোতে না এগোতে দুমড়ে পড়ে যায়, চুপ করে থাকে, পায়ের যন্ত্রণার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে ঘৃণার স্রোতে ধুয়ে দেয়, ওঠে, হাঁটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। চীনের লাল ফৌজ ছ-হাজার মাইল অতিক্রম করছে—আছে অসংখ্য পাহাড়, নদী, কখনো মরুর উন্মত্ত গরম, কখনো মেরুর উন্মাদ শীত। আছে দিনের পর দিন নিরন্তর বিমানহানা। বোমা, স্টেফিং, মৃত্যু। আর রণজয় কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে কলকাতার সেই জায়গাটায় গিয়ে অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে পারবে না?

'লং মার্চের অগ্নিপরীক্ষা লাল ফৌজ ভয় করে না
তোযাক্কা কবে না হাজারো পাহাড় ও নদীর।'

রণজয় এগোতে থাকে। বাঁদিকে ইটভাটাগুলো শেষ হবার পব রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকটা একটু আলো আলো। বণজয় সেদিকেই এগোয়। কিছুটা ধুলোর বাস্তা, তারপর অন্ধকার। রাস্তাব ধারে পিচের ড্রাম আব খোযাব পাহাড়। অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেলেও দেখতে বেশ অসুবিধে হয়। বেশ বড় বড কয়েকটা গাছ বাঁদিকে। সেগুলো পেবিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পড়তেই আকাশে কোথাও আলো হয়ে উঠেছিল। সেই আলোতে, সামনে, একটু হেলে দাঁড়িয়ে থাকা চকচকে মোটব সাইকেলটা দেখে রণজয সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। একবারে নিরস্ত্র অবস্থায বণজয়। দুটো হাত মুহূর্তে মুঠি পাকিয়ে যায। লোকটা সহসা চামডা সেলাই-এব মতো শব্দ কবে বিভলভারটা বাব কবাতে রণজয়ও পায়েব ব্যথা ভুলে টান টান হয়ে যায়। এত ক্লোজ রেঞ্জে কোনো এনকাউন্টাবে গুলি না লাগাটাই অস্বাভাবিক।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যার আছে সে জানে যে শত্রু কিভাবে, কখন আক্রমণ শুরু করতে পারে সেটা আগেভাগে আঁচ কবতে গেলে কি পবিমানে সতর্ক থাকতে হয়। সকালে, তরকাবির বাগানে, সার সাব পালং আব কপিব বেডের পাশ দিযে ঝারি দিয়ে জল দেওযার সময়েই বিস্ফোরণের কয়েকটা শব্দ কানে এসেছিল। লাল বাডিটাব পেছন দিকটাতে মেয়েরা থাকে। বাডিটা প্রায চিবে দুভাগ করে বাখা। পেছন দিকটা দেখা যায না। সেখান থেকে রোজ সকালে যে কান্নার শব্দটা আসে সেটা শুনছিল বণজয়। তখনো একটা দুটো শব্দ পেযেছিল রণজয়। দুপুবে সবাই যখন লম্বা কাঠের টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে সাব দিয়ে খেতে বসে তখনও। মহীতোষ আসাব পরে সচরাচর খাওযা শুরু হয। মহীতোষ সবসময ধুতি, শার্ট পবে থাকেন কিন্তু খেতে আসেন ন্যাংটো হয়ে। স্নানের পরে পা' কবে চুল আঁচড়ানো। মহীতোষের সিটটা বাঁধা। সেখানে কেউ কখনো বসে না। মহীতোষ কখনো অন্য রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন না। স্মিত হাসেন। বণজয়, কোবা ও মেখলা ছাড়া কাবও সঙ্গেই কথা বলে না। কী বলবে? দু-একবার এদের ক্লাস নেওয়াব চেষ্টা করেছে রণজয। কার সাধ্য এদেব ক্লাস নেবে? মুবগিব ঘরেব ব্রয়লারগুলো যেমন অসভ্য এবাও তেমন। এবা রয়েছে একটা ঘাঁটি এলাকায়। কিন্তু সেটার গুরুত্ব কি এরা বোঝে? এক বমেশ একটু একটু বোঝে কিন্তু ওই যতক্ষণ শুনছে ততক্ষণই। তারপবেই আবার যে কে সেই। তবে হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে কোবা। চাব বছরেব কোবা কতকিছু যে শিখছে। খেলা করছে। ছড়া বলছে। রণজয়ের রোজকার খববের কাগজ, সযত্নে রক্ষিত ডটপেনের রিলিফ—সব কখনো লুকিযে রাখছে। ছোট্ট ঘরে তিনজন থাকলে এরকম তো হবেই। তবে কোবাটা বড় ভীতু। শাদা ব্রয়লার মুরগিগুলোকে নিয়ে কোবার কী ভয়। ওদের খাবার বালতিতে করে নিয়ে এসে দবজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঝটপট করে বেবিয়ে এসে পালঙের বেডের ওপরে লাফিয়ে পড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে শুরু করে দেয়। আবার তাড়া দিলেই ঘরের মধ্যে। ওরা কামড়াতে জানে না। কিন্তু কোবা, ছোট্ট কোবা তবু ভয় পাবে। যদিও রণজয় ওকে বারবার হাতেনাতে দেখিয়েছে যে একটু কাছে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকলেই ওরা কেমন পালায়। এই হোয়াইট গার্ডদের মধ্যে যে দুটো সবচেয়ে কেঁদো তাদেব নাম দেনিকিন আর কোলচাক। ওই দুটো সবার আগে পালায়। ওদের পেছনে বাকিরা। কোবা বড় হলে 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' পড়বে। চাপায়েভের গল্প পড়বে। 'ধীরে বহে ডন' ও 'সাগরে মিলায় ডন' পড়বে। পড়বে ডাইসন কার্টার-এর 'সোভিয়েট বিজ্ঞান', লিও কিয়াচেলি-র 'নতুন দিনের আলো', ডিয়ানা লেভিন-এর 'সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা', দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ছোটদের

সোভিয়েট', তিন খণ্ডে অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহেব অনুবাদে ১৯৪২ সালের স্তালিন পুবস্কার পাওয়া 'পারীর পতন', লু সুন, লাও চাঅ, তিং লিঙ ও অন্যানয পাঁচজনের লেখা এগারোটি গল্প, নীহার দাশগুপ্তের অনুবাদে গোর্কির 'নবজাতক', ঘুমপাড়ানী নয় ঘুমতাড়ানী ছড়া—লিখেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মঙ্গলাচারণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, পড়বে হতাশ আর ভগ্নোদ্যম সেই সব মানুষ পুতুলের যান্ত্রিক জীবনের অপরূপ কাহিনী 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। কোবাকে যেভাবে তৈবি করা নিয়ে ভেবেছে রণজয় তাতে সন্দেহ থাকে না যে কিছু একটা হবেই। যাইহোক মহীতোষ আসার পরে সবাই ভাত আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাঁদিকে একজন টেবিলের কানায় জলভরা গেলাশ রেখেছিল। নীচে বোমা বা গ্রেনেড এসে পড়ায় জানলা ঝনঝন করল। গেলাশটা কারো ছোঁয়া বিনাই শব্দেব ধাক্কায় নীচে পড়ে গেল। নগ্ন মহীতোষ উঠে দাঁড়ালেন। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপাব যে রমেশ, যাকে নিয়ে রণজয়ের কিছুটা আশাভরসা ছিল সে আচমকা 'ভাত, ভাত, ভাত, ভা...ত', চিৎকার শুরু করল। ভাত এল, ডালও এল। পাশের লোকটার নাম জানে না রণজয় তবে মুখ চেনা। তার থালায় ভাত, ডাল পড়তেই সে যেই খাবলে খেতে যাবে অমনি থালাটা ঘুবতে শুরু কবল। রণজয়, প্যাস্টোরাল তোমার ভালো লাগেনি কিন্তু ফিফথ্ সিমফনির শুরুটা শুনে তুমি চোখ বন্ধ করেছিলে, মনে পড়ছে? লং প্লেইং রেকর্ড ঘুরছে। তার পর তো পালং শাকও দিল। নীচেব বেড থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে আনছে। থালাটায় টাল ছিল বলে ও যেই হড়হড়ে বিউলিব ডাল, পাথরকুচি মেশানো ভাত আর পালং বা ওপারে যে রোজ সকালে কটিন কবে ককিয়ে কাঁদে তার চুল ভাজা দিয়ে সবটা মাখতে যাবে তখন থালাটা ঘুরতেই থাকে। ও কবল কি বকবাব আঙুলটা থালার কোণায় রেখে উদ্ভট গলায় গান গেয়ে উঠল, 'পথের ক্লান্তি ভুলে, স্নেহভবা কোলে তব, মা গো বলো কবে শীতল হব? কত দূর, আর কত দূব বলো মা', সকলে হেসে ওঠে। মহীতোষ ও রণজয় বাদে। ও হাতের তেলো দিয়ে থালাটা জোরে জোরে ঘোরায়। এবারও সকলে হাসে। টেবিলের উল্টোদিকে একজন বেঞ্চির ওপরে হ্যান্ডস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করে ও সেই সঙ্গে ক্রমাগত 'ঢোল ডগর, ঢোল ডগর' বলে যেতে থাকে। থালাটা ঘুরতেই থাকে। ও আরও জোরে জোরে ঘোরায়। একবার থালাটা ঘুরতে ঘুরতে ওর জলের গেলাশে ধাক্কা খেয়ে সরে আসে। ওর দেখাদেখি ন্যাড়া ও অন্যরাও তাদের থালা ঘোরাতে চেষ্টা করে। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এর থালা ওর কাছে চলে যায়। চিচিঙ্গে বিরাট টেবিলটার একধার দিয়ে হামা দিয়ে উঠে আসে। মেঝের ওপরে থালা গেলাশ পড়ার শব্দ ঝনঝনিয়ে ওঠে। হুইসল বাজে। ডাল শাক মেখে উপুড় হয়ে পড়তে চিচিঙ্গের মাথায় কেউ হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিল জগ থেকে। ন্যাড়া ওর পিঠের ওপরে লেবুর টুকরো আর কাঁচালঙ্কা পরপর সাজায়। উলঙ্গ ও নিবার্ক মহীতোষ দাঁড়িয়েই আছেন। রাগে থরথর করে কাঁপছেন। রমেশ দৌড়ে গিয়ে বেসিনের তলায় যেখানে পাইপ ঢুকে যাওয়া ঝাঁঝরিটা আছে সেখানে শুয়ে পড়ে কিঁচ কিঁচ শব্দ করে ছুঁচোদের ডাকে। দারোয়ানরা চিচিঙ্গেকে টেনে নামাল। ডাল-ভাত শাকের এক দলা মুখে দিতে যাবে রণজয়, ধাক্কায় সব ছিটকে যায়। গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে চিচিঙ্গে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফায়। টেবিলের তলায় তিন-চারজন। লাফাতে লাফাতে হাত তোলে, হাত ফ্যানের ব্লেডে লাগে। রক্ত ছেটকায়। রণজয়ের ডোরা ডোরা শার্টে লাগে। ফ্যানের ব্লেড বেঁকে যায়। রণজয় নিজের ঘরে ফিরে গেল। বোমা ফাটার শব্দ। খেতে যাওয়ার আগে ওষুধটা খেয়েছিল বলে ঘুম পেয়েছিল। ঠিক ঘুমের মতো নয়। শুয়ে শুয়ে রণজয় কোবার রিকশাভ্যানের ঘন্টার জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

মোটাসোটা কালোকোলো যুবকটি জিনস্‌ ও লেদাব জ্যাকেট পবা, থুতনিতে ফিতে আটকানো ক্র্যাশ হেলমেট মাথায়। এবং সে রিভলভাব বেব করেনি। বাস্তাব ধারে পেচ্ছাপ কবাব পব জিনস্‌-এর জিপ ফাসনার টানতে টানতে মোটব সাইকেলেব দিকে এগোচ্ছিল। তখনই সে রণজয়কে দেখতে পায়। আকাশে কোথাও আলো ফাটল। কালো-কোলো মুখে বোকা বোকা হাসি। কথাটা সে-ই বলল,

—'পায়ে চোট আছে, না?'

রণজয় জবাব দিল না। হাত দুটো শক্ত মুঠো। তখন সতর্ক হওযাব সময়। খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঝাঁপিযে অ্যাটাক করতে পারে। গডনটা বেশ ভাবিব দিকেই।

—'আমি মাইবি হেব্বি ভয় খেয়ে গিয়েছিলুম। আনকা জাযগা, পেচ্ছাপ কবচি আর দেখচি কে লেংড়ে লেংড়ে আসচে। একে তো মালঝাল খেয়ে আছি। ভাবলুম ছেনতাইপার্টি নাকি শালা কালীপুজোয় ভূতফুত বেরোল। ওফ্‌, যা ঘাবড়ে দিয়েছিলেন!'

লোকটা এখনো এমন কিছু কবেনি যে অ্যাকশন কবাব দবকাব। কিছু না থাকলে খালি হাতেই। পায়ের ব্যথাটা কিন্তু একেবারে নেই।

—'এদিকে একলাটি হাঁটচেন। যাবেন কোথায়?'

বণজয প্রথম কথা বলল।

—'স্টেশন।'

--'তাহলে উঠে আসুন। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি তো স্টেশনের ওপব দিয়েই যাব। ফাঁসিব মোড়ে না হয ছেডে দেব আপনাকে। ওখান থেকে বাঁহাতে ঘুরলেই স্টেশন। আপনিও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমাকে দেখে, বলুন, চমকাননি?'

—'না।'

—'উরি সাঁটি, হেব্বি সাহস তো আপনাব। আমার দেখুন বুক একনো ঢিবঢিব করচে। কালীপুজো বলে কথা। দাঁড়ান, একটু দম নিয়ে নিই। অনেকটা বাস্তা যেতে হবে।' লোকটা আধখোলা লেদার জ্যাকেটের ভেতবেব পকেটে হাত ঢুকোয়। বের করে। রণজয দেখল অন্ধকারেই ফস কবে বের কবে আনা চ্যাপটা শিশিটা চকচক করছে। ছিপি খুলে ডগডগ করে গলায় ঢালল।

—'আঃ প্রাণটা জুড়োল। দুচুমুক মারবেন নাকি?'

—'না। ওটা কি, মদ?'

—'হ্যাঁ, অ্যাডভেঞ্চার। পাওয়ার স্টেশনেব বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলুম। ওবা মাংসের চাপ খাওয়াল, হেওয়ার্ড হুইস্কি ফুইস্কি খাওয়াল। ওদের বুঝতে দিইনি যে অ্যাডভেঞ্চারটা লুকোনো রয়েচে। ও হুইস্কি ফুইস্কি আমার একদম ভালো লাগে না, মাল হল বাম। দাদার কী সিগ্রেট চলে?'

—'না।'

—'হেব্বি কন্টোল তো আপনাব। মাল না, সিগ্রেট না, খুব ভালো। অনেকদিন বাঁচবেন।'

ও সিগারেট ধরাল লাইটাব জ্বেলে। লাইটারের আলোতে ঘড়ি দেখল। ধোঁয়া ছেড়ে রণজয়কে বলল,

—'ধরবেন তো লাস্ট ট্রেন। ও ঢের দেরি আচে। সজ্জন লোক পেয়ে গেলুম। পুজোগণ্ডার দিন। সজ্জন লোকের দেখা পাওয়া হেব্বি পুণ্যের ব্যাপার।'

—'কী করে জানলেন?'

বহুদিন আগে এই কথাটাই মেখলাকে বলেছিল রণজয়। ঘরোয়া কোনো আসরে কবিতা পড়েছিল মেখলা। কোথায়? রণজয়ের আবছায়া মনে আছে যে মেখলাকে সে সামনের টিমটিমে রাস্তার আলোয় প্রশ্ন করেছিল, হাত দুটো সামনে মেলে ধরে,

—'কী করে জানলেন? দেখে কী মনে হচ্ছে? খুব ভাগ্যের ব্যাপাব?'

মেখলা পড়েছিল,

'স্বপ্নের হাত আমি দেখেছি
তাকে গড়ে তুলতে হলে ভেঙেচুরে ফেলতে হবে ঘুম
ভালোবাসার হাতও আমি দেখেছি।
না চাইলেও সে সকলকে আঁকড়ে থাকবে
বিপ্লবীদের হাত দেখা খুব ভাগ্যের ব্যাপার
একসঙ্গে তাদের পাওয়াই যায় না।
আর বোমা ফেটে তো অনেকের হাতই উড়ে গেছে।'

—'ও আমবা বুঝি। কে সজ্জন, কে হারামি মুখ দেকলে টকাটক্ বলে দেব। সারাদিন লোক মারিয়ে খাচ্চি। তারপর পাপ উগরোতে মাল খাচ্চি, রোজ খাচ্চি। ও, আজব মাল তো আপনি। নাম জানলেন না। নাম জানতেও চাইলেন না। আমার নাম প্রফুল্ল। আপনাব?'

রণজয় টেক নেমটা মনে করে।

—'কি হবে নাম জেনে?'

—'কি হবে? হিজড়ে না হলে হয় ছেলে নয় মেয়ে হবে। একটু পেসাদি কবে দিন না, নয়তো সবটা খেয়ে ফেলব, বউ ক্যাঁচম্যাঁচ করবে, হুলুস্থুলু লেগে গেলে বাবাব ঘুম ভেঙে যাবে। কি হয় নাম বললে?'

নিজের বলা কথাগুলো ধাক্কাতেই লোকটা মোটরসাইকেল ধবে টাল সামলায়। উল্টোপাল্টা বকে, তরেত্তর্ তরেত্তর্, মালমাগনা ভিত্তর, তরেত্ত্র, মালমাগনা ভিত্তর্...

রণজয় বলে,

—'আমার নাম রণজয়।'

—'বাঃ হেব্বি নাম। জানেন বাবার সঙ্গে আমার খুব খারাখারি। বন্ধকীর ব্যবসা নিয়ে। আমাব বাবার নাম বনবিহারী। ও বললে তল্লাটে কেউ চিনবে না। সবাই বলে বুনো বাঞ্চোৎ। বলুন, এতে ইজ্জত থাকে? সেই দুক্কেই তো মদগাঁজা খাই। নিন্ স্টার্টটা দিয়ে নিই, তারপর চাপবেন।'

মোটরবাইকে স্টার্ট দেয় প্রফুল্ল। গাড়ি গড়ায়। রণজয় উঠে বসে।

—'কি রকম বুঝচেন মালটাকে? মানে গাড়িটা!'

—'ভালো।'

—'রাজদূত। ওয়ান ডাউন টু আপ। তবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একটা চিংড়ির বিজনেস খুলচি। লেগে গেলে একটা ইয়ামাহা নেব। চারখানা গিয়ার। বাঘের বাচ্চা।'

ধুলো ওড়ে। ঠাণ্ডা বাতাস রণজয়ের মুখে দমকে দমকে ঝাপটা মারে।

—'গাড়িটা একটু ডাঁয়াবাঁয়া করবে। ঘাবড়াবেন না। মাল খেলে এরকম হবেই।'

রণজয় জবাব দেয় না।

—'আপনাকে মাইরি পেয়ে গেলুম বলে তাও দুটো কথা বলতে পারচি। আজ সকাল থেকে জানবেন কেমন কেমন লাগচে। ভাইপোগুলোর জন্যে বাজি কিনতে গেলুম—ওঃ কি যে ভিড়। এখানেই এই, তাহলে ভাবুন কলকাতায় কি কেলো। 'তা যে কথা বলেছিলাম—আটবছর ধরে

গাড়ি চালাচ্চি, লাগবি তো লাগ, আজকেই শালা একটা রগড়া লেগে গেল। আব সেও সিপিএম-এব জিপের সঙ্গে। তবে মা কালীব দযায় ঝুট-ক্যাচাল কিছু হযনি।'

আবার বাঁ পাটায় লাগছে। পায়ের আঙুল বেঁকিয়ে চটিটা চিপে ধরে রণজয় পা-টা ঝুলিয়ে দেয়।

—'এই মাইবি, দু-একটা কথা বলুন। কলকাতায যাচ্চেন, ওখানে ফ্যামিলি থাকে?'

—'না।'

—'এদিকে সার্ভিস করেন, না বিজনেস?'

—'স্টেশন আব কতদূব?'

প্রফুল্ল ঘাবড়ে যায়। ডান হাতে থ্রটল ঘুরিয়ে স্পিড বাড়ায়।

—'আমায় কিন্তু এদিকেব ভাববেন না। আমিও কলকাতাব ছেলে। গরানহাটায় মামাবাড়ি। এই স্টেশন একটু আগে। এদিকে সব সিপিএম, বুঝলেন? গাঁয়ে ভালো কাজ কবচে। তবে আমাদের বাড়িতে সবাই কংগ্রেস। আমি মমতা, আপনি? তা বলে কিন্তু আমার মধ্যে অন্য পার্টি করে বলে, কি যেন বলে, ওসব নেই। বাবা তড়পালে কী হবে—নিজের চোখে দেখলুম তো—সব শালা সমান। আসলে কি জানেন, মমতা-ফমতা নয, কোথাও আপনাকে খাতায় নাম লেখাতেই হবে। নিজের জোব বলে কিছু আছে আজ? ফাঁসির মোড় তো প্রায় এসে গেল। আপনি কিন্তু মুখ খুললেন না।'

রণজয়কে নামিযে দেওয়ার পব প্রফুল্ল যখন বাইক ফেব স্টার্ট দিচ্ছে তখন রণজয় প্রফুল্লর দিকে এগিয়ে যায়।

—'তুমি কবেই বলছি। তোমার কাছে রিভলভার আছে?'

—'অ্যাঃ।'

—'রিভলভাব আছে?'

—'আজ্ঞে না। কেন?'

—'থাকলে নিয়ে নিতাম। আমি আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন জোগাড় করতেই বেরিয়েছি।'

—'ও।'

—'আব একটা কথা, পুলিশে ইনফর্ম করার চেষ্টা করো না। করলে আমি জানতে পাবব। তখন আমার কাছে আর্মস থাকবে।'

—'ওরে বাবা, পুলিশে বলতে যাব কেন? ঘরেব ছেলে ঘরে চলে যাব। বিশ্বাস করুন!'

—'যাও।'

বাইকটা জোরেই ছুটিয়ে দেয় প্রফুল্ল। কালীপুজোর রাতে একি খেলা মা তোমার। বাপের ভাগ্যি যে গলা টিপে ধরেনি। জানতুম। সকালেই সিপিএম-এর সঙ্গে রগড়া। রক্ষে করো মা। কোত্থেকে ওই ল্যাংড়া মাল আমাব ঘাড়ে চাপালে মা। কি পাপ করেছি! নেশাফেশা সব পয়মাল।

বাইক থামিয়ে প্রফুল্ল আবার রাম-এর শিশি বের করে বাকি পুরোটা গলায় ঢালে। তারপর ফাঁকা শিশিটা ছুঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়।

রণজয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল টিকিটঘরটা বন্ধ। ট্রেন আসার মিনিট দশেক আগে খুলল। রণজয় পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছিল। নোংরা নোংবা ছেঁড়াফাটা নোট আর বিস্তর কয়েন ফেরৎ পেল। স্টেশনে বড়জোর ছ-সাতজন লোক ছিল। তার মধ্যে সকলেই কমবেশি মাতাল। এত রাতে একটা গরিব মেযেও তাব ঘুমন্ত বাচ্চাকে নিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসেছিল। ট্রেনটা ফাঁকা ছিল। কালীপুজোর রাতে, শেষ ট্রেনে, কে আব কলকাতায় যাবে? ট্রেনের জানলা দিয়ে

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল রণজয়। লাইন পাল্টানোর শব্দ। পাশে বড় বড় গাছ এলে কেমন সাঁ সাঁ করে শব্দ হয়। সবসময়, এই অন্ধকারের মধ্যেও মনে হয় যে দূরে একটা নদীর মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। এই যে এত, এত অন্ধকার জায়গা, মাঠ, ঘুমন্ত গাছ, গ্রাম আব কত কত ঘুমন্ত মানুষ—এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। অন্ধকারে কোথাও একটা আলো দূরে দেখা যায়। গাছে ঢাকা পড়ে। আর দেখা যায় না। উল্টোদিকে যে লোকটা র‍্যাপার জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল সে উঠে একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা বেশ ভালো লাগল রণজয়ের। তাহলে এদিকে যুদ্ধ হচ্ছে না। ওখানে একটা লোকাল অপারেশন চলেছে। তাকে প্রতিহত করতে, কোণঠাসা করতে, চূর্ণ করতে দরকার অস্ত্রের। 'চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চীনা গণমুক্তি ফৌজ ৩২০টি রাইফেল নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা না হয়, ৬০টি রাইফেল আব ২০০টি পাইপগান নিয়ে আমাদের প্রথম গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করব।' পলিথিনের চাদর ও চট দিয়ে জড়ানো মরা মানুষের মতো দেখতে সেই বান্ডিলের মধ্যে ঠিক কী কী অস্ত্র আছে তুমি মনে করতে পার রণজয়? দুটো রাইফেল ছিল, না?

১৯১৭-র ৮ এপ্রিল রাশিয়াতে ফেরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। স্টকহোম-এ অনেক ওজর আপত্তির পর কমবেড কার্ল রাদেককে এক জোড়া জুতো কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন লেনিন। সঙ্গে আরো জামাকাপড় দিতে চেয়েছিলেন রাদেক। লেনিন বলেছিলেন, 'রাশিয়াতে আমি তো একটা দর্জির দোকান খুলতে যাচ্ছি না।' ১৬ এপ্রিল, রুশ ভূখণ্ডের বেলুসত্রভ-এ যখন লেনিন পৌঁছলেন তখন সেখানে তাঁব সঙ্গে দেখা কবার জন্য ছিলেন কমরেড স্তালিন, কমরেড কামেনেভ এবং ভগিনি মারিয়া। পাঁচ বছব পরে কামেনেভেব সঙ্গে প্রথম দেখা। লেনিন বললেন, 'প্রাভদায় ওসব তুমি লিখছটা কী? তোমার কিছু প্রবন্ধ আমবা পড়েছি আর চুটিয়ে গালাগালি করেছি।' সেইদিনই লেনিন পেত্রোগ্রাদের ফিনল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছলেন। শুরু হল একের পর এক ভাষণ। এর মধ্যে একটি সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে, হাতে এক গুচ্ছ গোলাপ। দু-ঘণ্টা ধরে বলেছিলেন লেনিন। হাজার হাজার কণ্ঠে মার্সাই ধ্বনিত হচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম, স্টেশনের বাড়ি—সব বলশেভিক পোস্টার ও ফেস্টুনে ঢাকা। উদ্বুদ্ধ, উদ্বেল জনতার ওপর একটা সার্চলাইটের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

৩.১১.৯৪-তে, শেষরাতে রণজয় শেয়ালদায় পৌঁছল। বাইরে তখনও চকোলেট বোমা ফাটার শব্দ। স্টেশনের চত্বরে ফাটছিল। কোনো টিকিট চেকার ছিল না। রোজকার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঘরে মানুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ—সবাই ঘুমিয়ে। তিন বছর আগে তিনফলার একটা নিড়ানি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল রণজয়। সে কথা এবারে কলকাতায় পা রাখার সময় রণজয়ের মনে ছিল না। শেয়ালদা ফ্লাইওভারের একটা দোকান সারারাতই খোলা ছিল। চা আর বিস্কুট খেল রণজয়। ট্রেনে বিড়ির গন্ধটা বড় ভালো লেগেছিল। এক প্যাকেট বেঙ্গল বিড়ি আর দেশলাই কিনল রণজয়। দেশলাইকাঠির মাথায় মিশমিশে বারুদটা দেখে বড় ভালো লাগল রণজয়ের। কাঠিটা জ্বেলে আগুনটা দেখতে আরো ভালো লাগল। ফাটা পটকার কাগজ, তুবড়ির খোল, বমি, বোতল, প্যান্ডেলের আলো, গান সারা শহরে ছড়িয়ে। নিভে আসা কাঠিটা ছুঁড়ে দিল রণজয়।

২

২ ১১ ৯৪ রাত

কোবা মাকে বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিববে। গিয়েছিল কাছেই। সাইকেল নিয়ে। দীপাঞ্জনদের বাড়ি। রিভিউটা নিযে আলোচনা করতে। দীপাঞ্জনেব সঙ্গে সবসময কথা বলে নিয়ে তবে কলম ধরে কোবা। এখানকাব রক ব্যান্ডগুলোব প্রোগ্রাম নিযে লেখাব ব্যাপাবে যে কজন নাম করেছে কোবা তার মধ্যে একজন। এবং কোবাই প্রথম যে, ফ্যানদেব তুলোধোনা করতে ছাড়ে না। দীপাঞ্জন বলল,

—'কালীপুজো বলে বাবাকে ক্লায়েন্টবা অনেক কিছু পাঠিয়েছে। বিয়ার খাবি? ক্যানড্ অ্যামেরিকান একটা বিয়াব এসেছে, খেয়েছিস?'

—'না, তুই বরং কফি দিতে বল। তাহলে তুই মোটের ওপর এগ্রি করেছিস?'

—'ও ইযেস। এটা একটা জঘন্য ব্যাপার। ছি ছি, এনথুসিযাজম একটা ব্যাপার। কিন্তু এটা তো অসভ্যতা, শিয়াব হুলিগানিজম্।'

—'একটা লাইন শোন, এমনি ভেবেছি—ইট ইজ ট্র্যাজিক অ্যান্ড হিউমিলিয়েটিং। ইফ দা পিপল কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড 'হাই'—হোয়াই দা হেল ডু দে কাম ফর দা শো।'

—'আবো হার্ড হিটিং কবতে পাবিস। শালাবা, নন্দন বাগচীকে আওয়াজ দিচ্ছিস? ড্রামার হিসেবে ওব কনট্রিবিউশন জানিস। শালা, কালকা যোগী..'

তাডাতাডি ফিবেছিল কোবা। বাজি পটকা বোমা শুরু হযে গিয়েছিল। চর্কির ছেটকানো আলো ঘিবে বাচ্চাদেব ভিড। সাইকেলটা নিযে ফ্ল্যাট বাড়িব গ্যাবেজে সোজা ঢুকে যায় কোবা। পার্ক করা মারুতি আব অন্য গাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে। তারপর সাইকেলটা লক্ কবে রেখে লিফটে চারতলায। আজ কিন্তু কোবাকে আটকে দিল বাচ্চাদের দল। সেই সঙ্গে তাদের মায়েরাও। ওদেব জন্যে চকোলেট বোমা ফাটিয়ে দিতে হবে।

—'এই এত বোমা ফাটাব এখন? ভীতুব ডিম। জ্বালতে পারিস না তো কিনতে গিয়েছিলি কেন? হাতে ফাটাব, দেখবি? তোরা কিন্তু কবতে যাস না যেন।'

শুধু চকোলেট বোমা নয়। বোতলেব মধ্যে বসিযে কি করে হাউই ওড়াতে হয় তাও কোবাকে দেখাতে হল।

—'এই গাপ্পি! বলেছি না মুখটা দূরে সরিযে রাখবি। হ্যাঁ, হাতটা স্ট্রেট রাখবি। নে, আরে সলতেয় আগুনটা দিবি তো। আন্টি, আপনি খেয়াল রাখবেন।'

বাড়িতে ঢোকবার সময় ওপবে দেখে নিয়েছে কোবা। চারতলায় তাদের বারান্দাটা অন্ধকার। কোবা গেলে তবে মেখলা মোমবাতি জ্বালাবে। তারপর দুজনে বাজি পোড়াবে। সামান্য কিছু আলোর বাজি। কোবা জানে যে মা-র সবচেয়ে পছন্দের বাজি হল রং দেশলাই। আর কোবার যে বাজিটা সবচেয়ে পছন্দ সেটা মেখলা সহ্য করতে পারে না। বলে ওর গা গুলোয়। কালো একটা বড়ি পুড়পুড় করে জ্বলছে, বিকট ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং কদাকার একটা কালো ছাই বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। সাপবাজি।

চারতলায় লিফ্ট থেকে বেরিয়ে দেখল সামনের আলোটা জ্বলছে না। ফলে ল্যান্ডিংটা অন্ধকার। ওপর থেকে কেউ ডাকায় লিফ্টটা উঠে যেতে অন্ধকার আরো বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে উড়ন তুবড়ি বা রকেটের আলোয় জায়গাটা আলো হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। কোবার কাছে চাবি থাকে। বাডিতে ঢুকতেই পিংকি টলমল করে দৌড়ে এল।

বেবোবার আগে নিজের ফুটবল খেলার সময়ের ক্রেপ ব্যান্ডেজ পিংকিব ঝোলা দুটো কানে জড়িয়ে, বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। পটকাব শব্দে পিংকি ভীষণ আপসেট হয়। নিশ্চযই এতক্ষণ কোবার ঘবে বইয়ের র‍্যাক বা খাটের তলায় লুকিয়েছিল। পিংকিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর যেন মাথায় একটা অপাবেশন করা হয়েছে। নিচু হয়ে পিংকস্-কে কোলে তুলে নিতে নিতে কোবা দেখল পার্থকাকুর কোলাপুবি। কিন্তু তলায় তো ওর বংচটা ফিয়াটটা ছিল না। বাকিটা কোবাব জানা। বাইরের ঘরে ঢুকলেই পার্থকাকু কী বলবে। মা চুপ করে বসে থাকবে। এবং বাবার বন্ধু ও ঘুষ খায় না বলে বিখ্যাত সরকারি আমলা পার্থ ঘোষ, আপাতত এসেনসিয়াল কমোডিটিতে আছে, নিজেব পয়সায় বাংলা খায় বলে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন একটা পাঁইট নিয়ে আসবে। মেখলা ঠাণ্ডা জল দেবে, খাবে, বলে যাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে, অগাধ জ্ঞান, আজ হয়তো রিলকে, কালকে মেক্সিকোতে কত জাতের লঙ্কা হয়, নয়তো এক্সিস্‌টেনশিয়ালিজম, তার কত ভ্যারাইটি, সার্ত্রে কবে লিখেছিলেন ম্যান ইজ আ ইউজলেস প্যাশন থেকে ডযেটশার, কংকুয়েস্ট, তার ওপরে ওর কোন বন্ধু ইস্ট জার্মানি যখন ছিল তখন ভারতবর্ষে নামকবা কে কে নাৎসি পে রোলে ছিল সব দেখে এসেছিল আরকাইভে এটসেট্রা এটসেট্রা. .

ঘরে ঢুকতেই পার্থকাকু বাঁ হাতটা মুঠো কবে তুলে কোবাকে বলল,

—'লাল সেলাম, কমরেড অ-নি-র্বা-ণ'। পিংকি কোলে ছটফট কবছিল। কোবা জবাব দিল।

—'লাল সেলাম, নীচে তোমার গাড়ি দেখলাম না।'

—'দেখলি না কারণ এটা আমি আনর্স্ট ম্যান্ডেলেব থেকে শিখেছি।'

—'অ্যান্ড হু ইজ হি?'

—'ওঃ কোবা! বণজয় ওকে ঘেন্না করত। কাবণ হি ওয়াজ, অ্যান্ড পারহ্যাপস এখনো হয়তো ট্রটস্কাইট। কিন্তু ম্যান্ডেল হলেন রিয়্যালি একজন মহান অর্থনীতিবিদ। প্যারিসে, ছাত্ররা যখন আটষট্টিতে বাস্তায় নেমেছে, সময়টা ভাব, প্যারিস ওয়াজ বার্নিং তখন একটা গাড়ি পুড়ছে দাউ দাউ করে আর ম্যান্ডেল দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—এই হল বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!'

—'তার সঙ্গে তোমার ফিয়াট।'

—'যে গাড়িটা পুড়ছিল সেটা ছিল ম্যান্ডেলের নিজের গাড়ি। এবং ঠিক সেই কারণেই আমি চাই না যে আমার কষ্টার্জিত অর্থে ক্রয় করা পুরনো ফিয়াটটা আজ কলকাতার বিপ্লবী জনগণ বনফায়ার করে দিক। তার কারণ আই অ্যাম নো ম্যান্ডেল। আমি কি নিজেকে বোঝাতে পেরেছি, বস্?'

কোবা দেখল বাংলার পাঁইটটা ওয়ান থার্ড ভর্তি।

—'পারফেক্টলি।'

কাচেব লো টেবিলের ওপরে হিম শীতল জলের বোতল। গেলাশ। এতক্ষণে কথা বলল মেখলা। মেখলা খুব ক্লান্ত। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে যেন,

—'তোর এত দেরি হল। বললি যে তাড়াতাড়ি আসবি।'

—'এসেছিলাম মা। নীচে বাচ্চারা ধরল, ওদের বাজি পুড়িয়ে দিতে হল। জ্বালতে পারে না। বোমা, রকেট—কত কি!'

—'মামুর ফোন এসেছিল। তোকে চাইল।'

—'কী বলল?'

—'জানুয়ারিতে আসবে।'

কয়েক মিনিটের অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। মা টিউবটা জ্বালেনি কেন? ডিম একটা আলো জ্বলছে।

লেনিন রচনাবলীর ওপরে ছবিটা অন্ধকাব—বণজয়, মেখলা, কোবা।

—'আমি ঘরে আছি।' কোবা চলে গেল।

কোবা নিজের ঘবে গিয়ে পিংকিকে ছেড়ে দিল। বলটা টেবিল থেকে নিয়ে নীচে গড়িয়ে দিল। পিংকি কাৎ হযে শুয়ে বলটাকে থাবা দিয়ে দিয়ে কাছে এনে কামড়াতে লাগল।

কোবা ঘবেব আলোটা নিভিযে টেবিলল্যাম্প জ্বালল। লিখতে শুরু করল, ইংরাজিতে,

"ফারেনহাইটের প্রথম কনসার্টে সেদিন নতুন যে দুজন 'আইজ' থেকে এসেছে সেই লিড গিটারিস্ট সন্দীপ বোস এবং বাসিস্ট শুভাযন গাঙ্গুলি তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিল—আয়রন মেডেন, ডিপ পার্পেল, ব্রায়ান অ্যাডামস্—এইসব চেনা ক্লাসিক দিয়ে শুরু। বন জোভির 'রানঅ্যাওয়ে' দুর্দান্ত জমেছিল। অসবোর্নেব 'বার্ক অ্যাট দা মুন'-এর সময় কৌশিক একটা গিটাবকে স্টেজে আছড়ে ভাঙল। এটা হাস্যকব গিমিক। বিভাস চক্রবর্তী গিটার আর কি-বোর্ড-এব রণজয় দত্ত অসামান্য। কিন্তু 'ফাবেনহাইট' যখন পিংক্ ফ্লয়েডের 'অ্যানাদার ব্রিক ইন দা ওয়াল' বাজাতে যায় তখন দুঃখজনক হলেও থলির বাইরে ঘেয়ো বেড়াল বেরিয়ে পড়ল...

"এবপর এল 'হাই'। যাদের কতা নবীনতব প্রজন্ম কতটা জানে এই সমালোচকের জানা নেই কিন্তু ভারতীয় রক সঙ্গীতে 'হাই' এক প্রবাদ। ড্রামে ছিল নন্দন বাগচী। গিটারে লু হিল্ট, অমিত দত্ত ও অন্যান্যরা। 'টাইম টু গো হাই' ও 'আ প্লেস ইন দা সান' অসামান্য জমেছিল। হিল্ট-এব মাউথ অর্গ্যান কেউ ভুলতে পাববে? 'স্যাড স্টোবি' এবং 'টারপেন্টাইন গ্রাস' ভালো লাগল। কিন্তু অতীব দুঃখেব ব্যাপাব হল এব পরেই 'শিভা'-ব উন্মত্ত সমর্থকরা চিৎকার করে, আওয়াজ দিযে 'হাই'-এব অনুষ্ঠান বন্ধ কবে দিল। 'শিভা'-ব সমর্থকদেব সমর্থক না হলেও আমি না বলে পাবছি না ওদেব নতুন ভোকালিস্ট গ্যাভিন ডে কুনহা যথেষ্ট ক্ষমতাবান। 'শিভা' সেদিন বন জোভি, ইগল্স্, আয়রন মেডেন, ভ্যান হ্যালেন এবং পিংক ফ্লয়েডের বাছাই করা গানে অনুষ্ঠান জমিযে দেয়। তবে তাদের শেষ উপস্থাপনা, 'স্মোক অন দা ওয়াটার' খুব জমেছিল কি? রক তারকা হযে উঠতে হলে গাভিন ডে কুনহাকে কি আর একটু ভাবতে হবে না?

"তবে 'শিভা' 'হাই' এবং 'ফারেনহাইট' আমাদেব যা দিয়েছে তা এতই আনন্দের যে আমাদের ভেবে দুঃখ হয় না যে ব্রুস স্প্রিংস্টিন কখনো নজরুল মঞ্চে আসবেন না বা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কখনো 'উডস্টক' হবে না। তবে শেষে একটা কথা না বলে পারছি না, "ইফ দা পিপল কান্ট অ্যান্ডারস্ট্যান্ড 'হাই'—হোয়াই দা হেল ডু দে কাম ফর দা শো। নিও-রিচরা সমাজের সর্বস্তরে আলগা পয়সা দিয়ে অসভ্যতা কবছে। গানেব গ না বুঝলে কি হবে, পকেটে অঢেল রেস্ত।" লেখাটা শেষ করার পর কোবা কিছুক্ষণ আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকল। কিন্তু পিংকি কুঁই কুঁই করে ডাকছিল কোবাকে। কোবা অন্যদিন হলে পিংকিকে নীচে দিয়ে যেত। আজ ছাদে নিয়ে গেল। আটতলার ছাদে বাজি জ্বালানো বারণ। বেরোবার সময় দেখল পার্থকাকু যায়নি। ছাদে পিংকি একটু ছোটাছুটি করল। হিসু করল। রকেট আকাশে ফাটতে কোবার কাছে দৌড়ে এল। কোবা আর পিংকি কিছুক্ষণ ছাদে ছুটোছুটি করল। এরপর স্ক্যাম ধরার ব্যাপারটা দারুণ মজার। কোবা চিৎ হয়ে শুয়েছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওর বুকের ওপরে পিংকি শুয়েছিল। হঠাৎ পিংকি মাথা তুলে কিছুক্ষণ গর্‌গব্ করে অন্ধকারে কাকে তেড়ে গেল। ছাদের দরজার কাছে চেনা গলার চিৎকার, বাসন পড়ার শব্দ, পিংকির চিৎকার। কোবা গিয়ে দেখে এক কাণ্ড। রাতে ছাদে পিকনিক হবে। দারোয়ান, সুইপার আর ড্রাইভারদের। ওরা স্টোভ, বাসনপত্র, মাংস—সব আনছিল। অবশ্য পিংকি ওদের চিনতে পেরেছে বলে কামড়ায়নি। ওদের কাছে কোবা অতীব শ্রদ্ধেয়। কোবা যেন কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি মল্লিকবাবুকে কিছু না বলে।

মাঈজী যেন জানতে না পারে। কোবা সহজে ছাড়ার পাত্র নয়।

—'এখনই আমি মল্লিককে ডাকছি। আগে বল তোরা কালীপুজোর রাতে স্রেফ ভাত-মাংস খাবি? মাল নেই?'

—'না দাদা।'

—'নেই।'

—'রামকসম কোবাদা।'

—'ঠিক আছে। আমি মল্লিককে নিয়ে আসছি।'

তখন ওরা কোবাকে দেখাল ডিশ অ্যান্টেনার তলায় লুকোনো একটা বাজাব ব্যাগ। তাব থেকে বাংলার বোতলের ছটা ছিপি উঁকি মারছে। কোবা ওদের চল্লিশ টাকা দিল। পিংকিকে কোলে নিয়ে নামার সময় বলে এল কোনো বাওয়াল-ফাওয়াল হলে কিন্তু সে বলবে যে সে কিছুই জানে না। ওরা তো মহাখুশি। কোবাদা হল ভগবান। ভগবান জানলে তো ভালো। মল্লিকবাবু বহোৎ হারামি। ও না জানলেই হল। হবি তো হ ল্যান্ডিং-এ মল্লিকেব সঙ্গে দেখা।

—'কোবা, ও তুই! আমি বারান্দা থেকে কিছু সারেপটিশাস মুভমেন্ট লক্ষ কবলাম। ব্যাগ নিয়ে সুইপার ঢুকল। হোসেন তাকে জাপটে ধরল। স্ট্রেঞ্জ!'

মল্লিককাকু তখন ঈষৎ, যাকে বলে পগারু মানে পগার পেরোয়নি, কিন্তু পেরোব পেবোব করছে।

—'নাথিং অফ দ্যাট সর্ট, কাকু। আমি কোনো ঝামেলা হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে দা মোস্ট লাইকলি স্পট্—ছাদে গিযেছিলাম। শান্ত। কেউ নেই।'

—'নেই তো?'

—'কেউ নেই।'

—'ওঃ কোবা! তুই, রিয়্যালি। তোকে দিয়ে হবে। এতগুলো ছোটলোক নিযে ডিল করা।'

—'ও আপনি ভাববে না কাকু।'

—'ব্যাস্। নাউ আই ক্যান রিল্যাক্স!'

ফ্ল্যাটে ঢুকে কোবা দেখল পার্থকাকু চলে গেছে। টেবিল পরিষ্কার। মেখলা বারান্দার গ্রিলে মোমবাতি বসাচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড শব্দ। পাতার পর পাতা কালীপটকা একসঙ্গে ফাটছে। দোদোমা, চকোলেট ফাটছে। বিস্ফোরণের শব্দের মধ্যে কোনো ছেদ বা বিরাম নেই। কোবার মনে হল দুনিয়ার সব কটা রক ব্যান্ডের ড্রামাররা খেপে গেছে। অনেক বাড়িতেই মোমবাতি নিভে গেছে বা দু-একটা টিমটিম করছে।

—'মা, দেখ, যেন যুদ্ধ হচ্ছে। হরিবল্। তুমি এই রোগা রোগা মোমবাতিগুলো কিনেছ কেন? বাটির মতো ক্যান্ডেলগুলো কিনতে পারতে।'

—'রঘুর দোকানে এগুলো ছাড়া কিছুই ছিল না। তুই তো এখানে সেখানে যাস। আনতে পারতিস।'

—'এখন আনব?'

—'না, থাক। এগুলোই জ্বালি না। কিছুক্ষণ তো জ্বলবে। তুই বাজিগুলো নিয়ে আয়।'

কোবা বাজির প্যাকেটটা নিয়ে এসে দেখল ঝলমলে মোমের আলোয় মেখলা বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে। কিছু চুল পেকে গেছে—সেগুলো রুপোর জরির কাজের মতো। গত বছর বাথরুমে পড়ে গিয়ে মেখলার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। ডঃ হোম

চৌধুরী অপারেশন কবেন। হাডের জোড়েব জায়গায় স্টিলের বল বসানো আছে। মেখলা সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। বেঁকে বেঁকে হাঁটে। যেখানে না গেলেই নয় সেরকম জায়গায় যেতে হলে কোবা সঙ্গে থাকে।

মা আর ছেলে মিলে অনেকক্ষণ ধবে বাজি পোড়াল। মেখলা রং দেশলাই জ্বালল। শব্দহীন এইসব আলোর বাজি দেখতে পিংকিও এল। কিন্তু কোবা সাপবাজি জ্বালতে ভয় পেয়ে ভেতরে চলে গেল।

—'একটা কিছু বেখে তার ওপরে জ্বাল্ না। বিচ্ছিবি দাগ হয়ে যায় বারান্দাতে। ওঠে না।'

—'ও এত দাগ হযে গেছে যে আর কিছু হবে না। বরং এই দাগটা হওয়া দরকার।'

—'সে আবাব কি।'

—'বাঃ, দাগগুলো দেখলে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া পাওযা যাবে যে কতগুলো সাপবাজি জ্বালানো হয়েছে। ও এই সাপটাব সাইজ দেখ মা—শেষই হচ্ছে না।'

—'লোকে শুনলে কি বলবে? পঁচিশ বছরেব বুড়ো ছেলে সাপবাজি জ্বালছে।'

—'কি হযেছে? আর তুমি যে বং দেশলাই জ্বালছ সেই থেকে।'

—'রং দেশলাই-এব আলোটা কী সুন্দব দেখেছিস?'

জোবে বাতাস দিল। মোমবাতিব শিখাগুলো একদিকে হেলে গেল। উল্টোদিকের বারান্দায় বিরাট একটা বংমশাল জ্বালিযেছে অভীব বাবা। চারদিক আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় কোবা দেখল তাব মা-র ছাযাটা বিরাট হযে বাবান্দাব দেওযালে ঘুবছে। পিংকি আবার ফিবে এসেছে। সন্দিগ্ধ মুখে সাপগুলোকে লক্ষ কবছে। বিকট শব্দে বোমা ফাটল নীচে। পিংকি আবাব দৌড়ে পালাল।

রাতে খেতে বসে কোবা বলল, বাইবে বোমা ফাটছে,

—'আমি যা যা কবি সব কিছুই তোমাকে জানাই। কথাটা কি সত্যি?'

—'হঠাৎ?'

—'আঃ, যা বলছি সেটার উত্তর হয ইযেস আব নো। আমি কিছু লুকোই তোমার কাছে?'

—'নো'। মেখলা হাসে।

—'তাহলে তুমি লুকোও কেন?'

—'কী লুকিযেছি তোর কাছ থেকে?' খুব আস্তে, প্রশ্ন কবে মেখলা।

—'লুকিয়েছি।'

—'কী লুকিয়েছি বল?'

পিংকি চেয়ারের তলায শুয়ে কোবাব পা কামডাচ্ছে।

—'আঃ, কী হচ্ছে কী পিংকস্? অবশ্য আমি দেখিনি। কিন্তু গেরিক তোমায় দেখেছে। ও ফালতু কথা বলাব ছেলে নয়?'

—'কী দেখল আবার গৈরিক?'

—'বাঃ, চমৎকার। কী দেখল? তোমার সিঁড়ি ভাঙা বাবণ, একলা বেরোনো বারণ আর তুমি নকসালাইট মিটিং অ্যাটেন্ড কবতে সেই চৌরঙ্গিতে যাচ্ছ?'

—'একবারই তো গিয়েছিলাম। ভাবলাম তোর বাবার কোনো বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। আর এরকম ব্যাপারে যাওয়া উচিত? উফ্ যা নার্ভাস করে দিয়েছিলিস।'

—'তবে এগুলো তোমার করা ঠিক নয়। মেট্রো করে গিয়েছিলে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'অতগুলো সিঁড়ি। দবকার হলে বলবে—আমি নিয়ে যাব বা কাউকে বলব।'

—'আচ্ছা, আমার কাছে যে পার্থ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। তোব কিছু মনে হয় না?'

—'হ্যাঁ হয়। ও হল একটা পারপ্লেস্‌ড্ মোরন। এবং মোরনটার তোমার সম্বন্ধে উইকনেস আছে।'

—'আর আমার?'

—'যতদূর জানি নেই। হলে সত্যিই—রিডিকিউলাস।'

—'রিডিকিউলাস কেন হতে যাবে। ভালোবাসা তো ভালো। আচ্ছা, কৌশিকের কী হল বল তো? এল না।'

রাত্তিরে কোবা কিছুক্ষণ পড়ে। মেখলা ওর টেবিলে বুকলেটটা বেখে গেল।

কোবা পড়তে শুরু কবল। বাবার সময়ের অনেক, অনেক কিছু কোবা জানে। কিন্তু কোবাব জানা ছিল না যে...এখনো...

"সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর মামলা চালিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনেব অনুগামী ১৮ জন গরিব কৃষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত করা হয়েছে। সম্প্রতি বিচাব-প্রহসনে ঝবে গেছে দুটি অমূল্য তাজা প্রাণ। সর্বস্বান্ত গরিব কৃষক নিমাই সবকার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আবেক কৃষক একই কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। আমরা মনে করি এ ঘটনা নিছক আত্মহত্যা বা মৃত্যু নয়—রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। বাকি দেড় শতাধিক মামলাধীন সংগ্রামী মানুষও একই সম্ভাবনার সম্মুখীন।"

কোবা শুনতে পায় মেখলা দেবব্রত বিশ্বাসেব ক্যাসেট বাজাচ্ছে। বোমাব শব্দেব মধ্যে,

'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।'

মেখলা জানে কোবা ঠিক ওর বাবার মতো। কেটে কেটে কথা বলে। ঘুম আসে না মেখলার। কোবাও ঘুমোয়নি, অদ্ভুত সব নাম, যাদের মামলায় জড়ানো হয়েছে—বুধারী মারতি, নসীব দেবশর্মা, মাংতো রাজবংশী, তালা মুর্মু, ফেলু দেশি—কিশোর 'দেশদ্রোহী'র 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের' বিচার (?) চলছে জুভেনাইল কোর্টে নয়—

১) অশান্ত দেবশর্মা (ছোট)—ইটাহার ৩১(২)৮১ ; ৩৯৫/৩৯৭/১২০ বি ; ১৯৮১ সালের গ্রেপ্তারের সময় বয়স ছিল ১০ বছর।

২) সহদেব মাল—সিউড়ি সেশন কেস নং ৮০/৮৫ ; এস আর কেস নং ১৭২/২ গ্রেপ্তারের সময় বয়স ছিল ১১ বছর।

৩) শীতল দেবর্শমা (জন্মের তারিখ ৪-৫-১৯৭০) ইটাহার পি এস কেস নং ৩১ তাং ২৩-২-৮১ ; ৩৯৮/৩৯৭/১২০/১২০বি/৩৪ আই.পি.সি ; ২৫/২৭ আর্মস অ্যাক্ট . চার্জশিট তাং ২৫.১০.৮৪ ; যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত (?)

...পরে, মেখলা একসময় উঠে এসে দেখল যে কোবা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোবা বলে দিয়েছে চাকরি করবে না। যাদবপুর থেকে ইংরেজিতে এম. এ-র পর কোবা এক অনিশ্চিত রোজগারের জীবন বেছেছে। এই রক ব্যান্ডের প্রোগ্রাম রিভিউ করছে, এই আবার চলল কোল ইন্ডিয়ার কি এক ওয়ার্কশপের রিপোর্ট তৈরি করতে। চাকরি ভালো লাগে না। বেশি রোজগার করতেও

কোবা আগ্রহী নয়। তবে মেখলা জানে যে কোবা একটা উপন্যাস লিখছে। এবং সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল উপন্যাসটা বাংলায় লেখা হচ্ছে বলে শোনা গেছে। মেখলা কোবার ঘর থেকে বসার জায়গায় চলে এল। পার্থকে মেখলা বলেছে তুমি দিশি খাও, যা খাও যাওয়ার সময় বোতলটাও যেন নিয়ে যেও। কোবা ঠিক বলেছে। পাবপ্লেক্সড্ মোবন। মেখলা সেই ডায়বিটা লেনিন বচনাবলীর পেছন থেকে বের কবল। উনিশশো উনসত্তরে রণজয়-মেখলার বিযে হয। বণজয়ের সাতাশ, মেখলা পঁচিশ। সব গুলিযে যায়। মানুষের জীবনেব এত যে সমস্যা তার একটা বড় কারণ হল তাবা দুমুখু খোলা সময়ের মধ্যে নিজেদেব সময়ের হিসেব রাখে না। সময়ের পাশে পাশে পৃথিবী পাল্টাচ্ছে, পযসা পাল্টাচ্ছে, হিরো-হিরোইন পাল্টাচ্ছে, বাজনীতি পাল্টাচ্ছে—এরও হিসেব রাখে না। তাবপর একটা সময আসে যখন হিসেব রাখার ক্ষমতাও থাকে না। তখন মানুষ হয় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে চলে যায়। ডাক্তাবদের বড একটা হিসেব বাখাব কথা নয়। বাইরে রাখা ভিজিটার্স কার্ড নিযে ঘেমো হাতে রেলিং ধবে ধরে ওঠে বা লিফটেব সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদেবও হিসেব গুলিয়ে না যাওযার কথা নয। এসব হল তাও সেইসব প্রাত্যহিক ব্যাপার যার হয়তো লেখাঝোকা থাকে। আবার হিসেব যেখানে হয় না, যেখানে হিসেবের তলায় গণিতটা বডই জটিল—"২৭ আগস্ট, ১৯৯৪। ফলিডলেব শিশি গলায ঢেলে দিযেছিলেন নিমাই সরকার। মামলাব বোঝা বইতে না পাবাব ফলেই যে তিনি, আত্মহননেব পথ বেছে নিয়েছিলেন এই সত্যটুকুও গোপন করেছিলেন পবিবাব-পবিজন। ডায়রিয়াতে নিমাই মাবা গিয়েছেন এমনই প্রচার করেছিলেন তাঁবাই। কাবণ? পুলিশের ভয়। ১৯৮০ সালে সক্রিয বাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন নিমাই। ১৯৮১ সালে গ্রেপ্তার হন। একটি খুনেব অভিযোগে। ১৪ বছব মামলা চালাতে হয়েছে তাঁকে। গত ১৯ নভেম্বর বাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও বন্দী মুক্তি কমিটি এবং পিইউসিএল (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-ব একটি যৌথ তদন্ত দলেব প্রতিনিধিদের নিমাই সরকারের বিধবা মা সন্ধ্যারানী সবকারের দেওয়া সাক্ষাৎকাবেব ভিত্তিতে উক্ত ঘটনাটি জানা গেল।" বিয়ের বছরেই কোবা হয়। রণজয় ইতিহাসেব এম. এ। স্কুলে পড়াত। ১৯৭০-এ রণজয ধরা পড়ে। ১৯৭৩-এ ছাড়া পায়। ১৯৭৪-এ প্রথম লক্ষণগুলো ধবা পড়ে। ১৯৭৩ থেকে অ্যাসাইলামে যাওয়া অবধি বণজয কৌশিককে পড়িয়েছিল। দাদা অর্থাৎ কোবাব 'মামু'—তিযাত্তরে এসেছিলেন। তিনি রণজয়ের অ্যাসাইলামেব খরচা নিযমিত পাঠান। বেলজিযামে থাকেন। অবশ্য ইউ এন-এর কাজে আজ কিউবা, কাল নরওয়ে লেগেই আছে। মেখলার দাদার স্ত্রী ফরাসি মহিলা। ওঁদের এক মেয়ে। যে এখন পেরুতে, লিমা-র কাছেই একটি এনজিও-ব হয়ে কাজ করছে। বোমা ফাটল কোথাও। আকাশে আলো উড়ল। মামু মেখলাকেও টাকা পাঠান। অনেক টাকা। মেখলা আই এস আই-এর চাকবি ছেড়ে দিয়েছে। কোমর ভাঙার পর। সেভাবে বললে কোনো অসুবিধে নেই। এছাড়া মধ্যমগ্রামে রণজয়ের বাবা দেড় কাঠা জমিতে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন। বাবা ছাড়া রণজয়ের বলতে কেউ ছিল না। কারণ রণজয় কখনো কারো কথা বলেনি। রণজয় অ্যাসাইলামে যাওযার পর রণজয়েব বাবা কোবার নামে বাড়িটা লিখে দিয়ে চলে যান—পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। স্বদেশী যুগের দুই সহকর্মী ওখানে অনেকদিন ছিলেন। তাঁরাই ওঁকে যেতে বলেছিলেন। বাড়িটা তালাবন্ধ। মাঝেমধ্যে কোবা ওর বন্ধুদের নিয়ে যায়। বন্দী মুক্তির মিটিঙে হঠাৎ বৃষ্টি এসেছিল। অসংখ্য পুলিশ। খাকি পোশাকের। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চা খাচ্ছিল, ভারতের পার্লামেন্টের মতো বলয়াকৃতি প্রস্রাবাগারের সামনে কেউ কেউ খুঁচিয়ে কান পরিষ্কার করাচ্ছিল। বৃষ্টিটা থামতে মিটিং শুরু হল। শ-দুয়েক লোক।

কেউ মেখলাকে চিনতে পেরেছিল। সে গিয়ে বলায় মঞ্চ থেকে কাঁচাপাকা চুল, অল্প দাড়ি, সৌম্য চেহারাব একজন ভদ্রলোক নেমে এসে নমস্কার করে আলাপ করলেন। গৈরিক এসব 'কমি'-দের মিটিং শোনার ছেলে নয়। ও চৌরঙ্গিতে গিয়েছিল মেট্রোর গলি থেকে রিচার্জেবল ব্যাটারি কিনতে। দূর থেকে গৈরিক দেখল কোবার মা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। রণজয়দাকে চিনতাম। জানি, খবর পেয়েছি। আমার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এপিডিআর-এর—সুজাত ভদ্র ও পিইউসিএল-এর দেবাশিস আইচের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

আনসারি সাহেবের স্পেশাল শ্যামা-পার্টির থেকে ফিরে বসাক তাব একলার শোবাব ঘরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখল কণ্ঠা অবধি শুকিয়ে খস্ খস্ করছে ও তেড়ে পেচ্ছাপ পেয়েছে। বসাক সেই বিরল মানুষদেব মধ্যে একজন যারা যুক্তিনির্ভর স্বপ্ন দেখে। এবং দেখতে শুরু কবে গোড়ার থেকেই যখন চোখ দ্রুত এপাশ-ওপাশ করে। একে বলে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট বা আরইএম। এই নামে একটি রক ব্যান্ড রয়েছে কোবা যাদের খুবই পছন্দ করে। বসাক যা শুনেছে বা যা করেছে সেই ঘটনা বা অবস্থাকে যথোচিত ভাবে দেখতে পায়। সেদিন বসাক তাব খুঁটিয়ে পড়া একটি বইয়ের বিশেষ একটি অংশ স্বপ্নে দেখছিল। প্রথমে দেখল বড় বড় পাতাওয়ালা কচুগাছ। উপড়োনো তুলসীর গাছ যাব বিবিধ শেকড় আকাশে শুঁড় ওড়াচ্ছে। তারপর বীভৎস চিৎকার করে বোয়াল মাছের একটি খণ্ডবিখণ্ড মাথার ওপরে একযোগে জনাবিশেক কালো বেড়াল লাফিয়ে পড়ল যাদের সামনে পেছনে মিলিয়ে তিনটি পা বলে তারা প্রায়ই হাস্যকরভাবে পড়ে যায়, এ ওকে কামড়ায়, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে। এরপরই দেখা গেল দুর্বল মৃত ঘাসেব বৃত্তাকার বাসায় ছোট ছোট অসহায় ডিম এবং পায়েব তলায় সুড়সুড়ি। এ অবধি ঠিকই ছিল। তারপবই বসাক দেখল বেবাক বর্ষার ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে তিনফলা ত্রিশূলের মতো নিড়ানি কেঁচোগেলা মাটি খুঁড়ছে এবং কচুগাছ, তুলসী গাছ হটরপটর উল্টোচ্ছে। এবং এই উৎপাটনকে আলোকিত করে রেখেছে একটি হেডলাইট—একচোখ কানা পুলিশভ্যান। বসাক ঘুম থেকে উঠে রেগে গেল।

কোবার ঘুমিয়ে থাকা, মেখলার জাগরণ ও বসাকের নিদ্রাভঙ্গের সময়ে কোনো নামহীন স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। সেই নামহীন অন্ধকার স্টেশন টেমির আলোর পাশে কয়েকটা মুড়ি দেওয়া লোক বসেছিল। সেখানে রেডিওতে গান বাজছিল। রণজয় বিড়বিড় করে বলল, "গ্রামাঞ্চলে রেডিও নেওয়ার ব্যাপারে জোর দাও। পিকিং রেডিও প্রতিদিন শোনা একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হিসাবে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রায় প্রতিদিন নির্দেশ দিচ্ছেন, সে নির্দেশ আমাদের বুঝতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। আমি এখানে যদি কোনো নতুন ছেলে পাই তাহলে তাকে তোমাদের কাছে পাঠাব। উদাহরণ থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের অবশ্যই অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেন এরকম হল ভাব এবং তা থেকে শিক্ষা নাও—তাহলেই ভবিষ্যতের বিচ্যুতি থেকে বাঁচবে। বন্দুক সংগ্রহ কর, এটাই আজকের রাজনীতি।"

ঘুমের কোনো সমস্যা বসাকের কস্মিনকালেও ছিল না। বরানগর, বারাসাত, সন্তোষপুর, বেলেঘাটা—কত জায়গায় থেকে বসাক কত কাণ্ডের পরে রাত করে ফিরে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং পরে বহুবার সে সব কালান্তক দৃশ্য স্বপ্নে দেখে অকাতরে ঘুমিয়েছে এবং ঘুম থেকে নবোদ্যমে জেগে উঠেছে। বসাক অন্য মেকদারের মানুষ। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, স্নানের পরে বসাক কখনো গা মোছে না। ওর সবকিছু ঘড়িবাঁধা এবং আপাদমস্তক সে ফিটনেস ম্যানিয়াক। বিশাল অফিসে নিজের এসি ঘরে বসে বসাক এক্সারসাইজ করে। বাঁদিকের দাপনাটা

শক্ত কবল। আগলা করে দিল। ডানদিকের দাপনাটা শক্ত করল। আলগা করে দিল। টেবিলের উল্টোদিকে বসে যে লোকটা ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টি ফোব সম্বন্ধে বসাকের বিশদ জ্ঞান দেখে থ মেরে গেছে সে বুঝতেই পাবে না। পুলিশেব চাকবি হেলায় ছেড়ে দিয়ে ১৯৮০-তে দুর্গাপুরে এক ব্রিটিশ কোম্পানিতে সিকিউবিটি অফিসার হিশেবে যখন ডবল মাইনেতে বসাক ঢুকেছিল তখন কেউ বুঝতেই পাবেনি যে বসাক কী হতে চলেছে। গোটাদুয়েক লবি দিয়ে শুরু। তারপর নিজের সিকিউরিটি এজেন্সি। শুরু হতে না হতে ক্যুরিয়াব সার্ভিস। অথচ বসাকের সহকর্মীরা একসময় বলত এত বীভৎস টর্চার যে করতে পারে সে হয় খতম হয়ে যাবে নযতো পাগল হযে যাবে। সত্তরের ডামাডোলে বসাকের নিজস্ব ও একান্ত নিজস্ব ভোকাবুলাবি দেখে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার—ডি সি, এ সি-বাও চমকে যেতেন। বসাক কখনো নকশাল বলত না, বলত 'নুডকুৎ'। চোদ্দ থেকে ষোল—'নুংকু'। ষোল থেকে আঠাবো—'গ্যাঁজ'। আঠাবো অতিক্রম করার পব ক্রমানুযায়ী—'ডগা', 'ভাইডু', 'কোম্ভা' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কারণেই বসাক হল বসাক। বসাকেব বাড়িটি দোতলা। একতলায বউ, দুই ছেলে এবং তাদের বউ। দোতলায় বসাক। একা। তিনটি ঘব নিয়ে যাব একটি বসাকেব বেডরুম। আগেই বলা হয়েছে যে ঘুম নিয়ে বসাকের কোনো সমস্যা ছিল না। বলতে গেলে এখনো নেই। তবে তার নানাবিধ স্বপ্নেব শেষদিকে কখনো-সখনো তিনফলা নিডানির আবির্ভাব ঘটলে বসাক রেগে যায়, দুশ্চিন্তা হয় তাব এবং কিছু আফশোসও আসে। ববং একাদিক্রমে ঘুম না আসাব সমস্যাটা বছব তিনেক আগে বেড়েছিল বসাকেব বউ সন্ধ্যাব। থাইবযেডেব সমস্যায সন্ধ্যা বড মোটা। তারপব একদিন বাতে দেখা গেল নিদ্রাহীন সন্ধ্যা ছেলেদের ঘবের দবজা ধাক্কাচ্ছে এবং গালিগালাজ করছে। হাতে ব্রা। বসাক শলাপবামর্শ কবে ডঃ অঙ্কুশ মিত্রব কাছে সন্ধ্যাকে নিযে গিযেছিল। ডঃ মিত্র অনেকক্ষণ দুজনেব সঙ্গে কথা বললেন। তাবপব একসময বসাককে বললেন,

—'মিঃ বসাক, কিছু যদি মনে না কবেন আমি কযেকটা কথা ওঁকে একটু আলাদা করে জিজ্ঞেস করতে চাই। ইফ ইউ ডু নট মাইন্ড।'

—'না, না, এতে মনে কবাব কি আছে। আমি বাইরে আছি। আপনি কথা বলুন।'

বাইরেব ঘবটায় একটি মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। মেযেটিব স্বামী ও তার বন্ধুরা তাকে শান্ত কবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটা থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছিল,

—'আমি একটুও কাঁদব না। আগে বল, প্রিযাংকাকে তোমরা কোথায নিয়ে গেলে? আমায় কেন যেতে দিলে না? কেন?'

—'শোনো, সুমনা, শোনো—প্রিযাংকা কোথাও যায়নি, প্রিয়াংকার কিছু হয়নি। ডঃ মিত্র সবকিছু তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তুমি মিথ্যে মিথ্যে এত আপসেট হচ্ছ!'

বিরাট, ভয়ংকর, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়ার পবে তেমন কিছু হয়নি এমনি বোঝাবার এই চেষ্টা দেখে বসাকের মনে পড়ে গেল বসাক সরে যাবার পর শীর্ণ, ভীত যুবকটি যখন বিহুল হয়ে ঠোঁট চেটে চেটে নিজের রক্তের স্বাদ পাচ্ছে, একটা ভয়াবহ অধিবেশন সত্যি শেষ হল কিনা ভাবছে তাকে কেমন অবাক করে সুদর্শন কোনো এসবি অফিসার এসে বিস্মিত করে দিত।

—'এই ব্রুটালিটি আমি একেবারে সহ্য করতে পাবি না। সিগারেট খান তো? নিন। ইস্, ঠোঁট্টা ফেটে গেছে। সাইড দিয়ে ধরান। চা খান।'

সাময়িকভাবে এই 'মানবিকতা'র ফাঁকে ফাঁকে।

—আপনার ইউনিটে আব কে কে আছে?

—কার কাছ থেকে পার্টির কাজের টাকা পান?

—আপনাকে পার্টি কত টাকা দেয়?

—জীবনটাকে এইভাবে নষ্ট করলেন কেন?

বসাক খুব নিস্পৃহভাবে একটা তুলনা টানার চেষ্টা কবছিল। তারপর সহসা দেখল যে সুমনা নামক মেয়েটির, বেশ দেখতে যদিও এখন ন্যালাক্ষ্যাপা, মেয়েটির ব্যাপারে সে বলতে গেলে বিরক্তই এবং ভেতরে সন্ধ্যা নামধারী তার স্ত্রীর ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন—এবং এখনই তার নীল রং করা ট্রাক দুর্দান্ত গতিতে বীরপাড়া ফরেস্ট চিরে এগিযে চলেছে—গবম লাগল বসাকেব। বাইরের বারান্দাটা ঠাণ্ডা। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বসাক। ভেতরে মেয়েটা চেঁচাচ্ছিল। বারান্দায় একটা টুল আছে। তাতে গালে দাড়ি রোগা একটা লোক বসেছিল। বসাক হঠাৎ দেখল গরমকালে ওই লোকটা একটা পুরোহাতা গরম জ্যাকেট পবা। লোকটাবও নিশ্চয় গবম লেগে থাকবে। সে পেটচেবা শব্দ করে, চেন টেনে, জ্যাকেটটা খুলল। ভেতবে হাত ঢুকোল। মেয়েটা আবার চেঁচাচ্ছে। লোকটা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় তিরিশ পাওয়াবের আলো। কার সাধ্য যে মুখ চিনবে? রিফ্লেক্সগুলো আগের মতো থাকলে বসাক কি অমন ভুল কবত?

৩

৩ ১১ ৯৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই তৈবি এই বাড়িটা ছিল গোড়াতে ইস্কুল। চলেনি। পোড়ো হয়ে পড়ে ছিল। পরে কলকাতার এক ব্যবসায়ী বাড়িটা কিনে নিয়ে সম্ভবত পারিবারিক কোনো কারণে এটিকে পাগলখানায় পরিবর্তিত করেন। কেউ বলে তাঁর বউ পাগল ছিল। আবার কেউ বলে তাঁর ভাই ছিল পাগলের ডাক্তার। কলকাতায় তেমন পসার না পাওয়ায় এইখানে এসে দাদার কেনা বাড়িতে পাগলখানা খোলেন। যাইহোক, তারপরেও হাতবদল হয়েছে এবং পাগলখানাটি তাই রয়ে গেছে। চুপচাপ জায়গা। হৈহট্টগোল নেই। পাগলগারদ থেকে বেরিয়ে যেদিকে রণজয় অস্ত্রের খোঁজে গিয়েছিল তার উল্টোদিকে সাত কিলোমিটার মতো এঁকেবেঁকে গেলে পরে একটি পাওয়ার স্টেশন। বর্ষায় ইটভাটাগুলো থেকে জলের তাড়া খেয়ে সাপ পালায়। অনেক সময় পাগলখানায় এসে ওঠে। স্টেশনের ওপারে এখানকার পুরনো ডাক্তার থাকেন। ডাক্তার দাম, তিনি এখানে বাড়ি করেছেন। কলকাতা থেকেও সপ্তাহে দুজন ডাক্তার আসে। তারা কমবয়সী এবং কি যে হিজিবিজি বলে তা দাম ডাক্তার বুঝতে পারেন না। পারার কথাও নয়। তবে তিনি মোটের ওপর ওদের কথা শুনে চলেন। ওদের কথামতোই তিনি ফুলবাগানের সঙ্গে সবজির বাগান করিয়েছেন, পোলট্রি বানিয়েছেন। রোগীরাই এগুলো দেখাশুনো করে। একবারই শুধু তিনফলা নিড়ানি নিয়ে রণজয় পালিয়েছিল তিন বছর আগে। তার আগেও দুবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

কালীপুজোর পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দাম ডাক্তার উঠোনে মোড়ায় বসে রসুন তেল মাখছেন। হঠাৎ শুনলেন গেটে সাইকেলের ঘণ্টা। গোবিন্দ দারোয়ান, মালি, ওয়ার্ড বয়—অনেক কিছু।

—'ডাক্তারবাবু, রণজয়দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'অ্যাঁ। রণজয়। সব দিক দেখিছিস। বাথরুম।'

—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভেতরে কোথাও নেই।'

—'কাল রাত্রে ঠিক সময় তালা পড়েনি?'

—'পড়েছিল। তবে পুজোর রাত তো।'

ডাক্তারবাবুর নাতনি বেলী দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে দৌড়ে দিদিমাকে খবর দিতে গেল।

—'অ দিদা, একটা লোক না পালিয়েছে।'

তেল হলুদ মাখা হাত শাড়িতে মুছতে মুছতে ডাক্তারগিন্নী বেবিয়ে এলেন। দাম ডাক্তার রণজয়কে বড় ভালোবাসেন। নার্ভাস হয়ে পড়েন।

—'ফোন তো খারাপ!'

—'হ্যাঁ।'

—'তুই এক কাজ কব। পাওয়ার স্টেশনের দিকটা একবার দেখে, ওখানে কথা বলে থানায় চলে যা। দারোগাবাবুকে তো চিনিস। ওঁকে বলে, ওফ্ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে ফিরে আগে অফিস থেকে বণজযেব বাড়ির ফোন নম্ববটা নে। তারপব পাওয়ার স্টেশন হয়ে থানা। দাবোগাবাবুকে বলে একটা এফআইআর কর।'

—'সেই সেবার যেমন কবেছিলাম?'

—'হ্যাঁ, আর. আর.. দারোগাবাবুকে নম্ববটা দিয়ে বলবি একটা ফোন করে দিতে কলকাতায়, বলবি আমি বিশেষ করে বলেছি, আমাদের ফোনটা সেই কবে থেকে খারাপ হয়ে আছে। আর...আব.. না, আর কিছু নয়.. তুই চলে যা।'

গোবিন্দ রওনা দিতে দাম ডাক্তার তাড়াতাড়ি কুযোতলায় স্নান সারলেন। ধুতি, শার্ট পড়লেন। ভট্ভট্ করে শব্দ। বেলী এসে বলল পুলিশ এসেছে। আবাব ধড়াস ধড়াস। চশমা পবে চটপট গেটের কাছে গিযে দেখলেন পুলিশ নয়, মাথায ক্র্যাশ হেলমেট পবা কালো কোলো মোটাপানা একজন।

—'দাদু, আপনি পাগলখানার ডাক্তারবাবু?'

—'হ্যাঁ, কেন ভাই?'

—'খবর নিয়ে নিয়ে এলাম। কাল রাতে একজন লোককে স্টেশনেব কাছে ফাঁসির মোড়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম। উল্টোপাল্টা বকছিল। তখন বুঝতে পাবিনি। ভাবলুম মাতাল। পরে সকালে উঠে কেমন খটকা লাগল। ভাবলুম...'

—'আরে হাসপাতাল থেকে একজন তো কাল পালিয়েছে। নাম বলেছে? কেমন দেখতে...লম্বাটে, দাড়ি আছে...'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি নাম যেন বলল?'

—'রণজয়?'

—'হ্যাঁ, তবে ঠিক মনে নেই, হেব্বি গামবার্ট টাইপের, রিভলভার, আর্মস—এইসব বলছিল, ঘাবড়ে দিল।'

—'হায় ভগবান!'

—'ও আপনার লাস্ট ট্রেন ধরেচে। কলকাতার।'

—'আপনার নামটা?'

—'সে বলব না। কি হবে, পাগল কাকে ঝেড়ে দেবে আর আমি ফেঁসে মরব। স্রেফ আপনাকে বললাম। একটা ডিউটি যেন। আপনাকে নাম বলতে আবার কি—কিন্তু ওই পুলিশ কেসফেস যেন...'

—'না, না বাবা। তোমায় নাম বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।'

—'দেখুন, এখন খুঁজে পেলো ভালো। পায় চোট ছিল জানেন। লেংড়ে লেংড়ে হাঁটছিল। তবে হ্যাঁ, কথা না বুঝলে কিছু বোঝার জো নেই। কি ছিল দাদু, মানে ম্যাডকেসের আগে? ডাকাত?'

দাম ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

—'হ্যাঁ, তবে স্বদেশী ডাকাত, ভালো ডাকাত।'

—'তাহলে আমি চলি দাদু, পরে না হয় এদিক পানে এলে একবার খবব কবব।'

—'হ্যাঁ, এস বাবা। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

প্রফুল্ল বাইক স্টার্ট দিযে ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

এই ঘটনাব কিছুদিন আগে একদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে দাম ডাক্তাব দেখেছিলেন রণজয় খালি পায়ে ঘাসের ওপরে হাঁটছে।

'রণজয়, শিশিরভেজা ঘাসের ওপরে হাঁটছ?'

—'হ্যাঁ।' রণজয় হাসল।

—'ভালো লাগছে?'

—'খুব ভালো লাগছে।'

হঠাৎ রণজয় একটা লম্বা ঘাস নিচু হয়ে ছিঁড়ে নিযে দাঁতে কামড়ে ধবে বলেছিল,

—'ডাক্তারবাবু, আপনি একটা লোহার শেকল এনে আমাকে মারবেন?'

—'আমি তোমাকে কেন মারব বণজয়?'

—'শেকল দিয়ে জোরে জোবে মাথায় মারবেন। মাথা ফেটে বক্ত পডবে। ঠিক হবে।'

—'কী হয়েছে তোমার বলো তো? ভালো ঘুম হয়নি। ওষুধটা খাওনি? আমি তোমাকে কোনোদিনও মেরেছি?'

রণজয় তখন দাম ডাক্তারকে একটা গল্প বলেছিল। রাশিয়ার গল্প। বিপ্লবের আগে, অনেক আগে। ককেসাস অঞ্চলে খনি শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপবে জাবের পুলিশের বীভৎস অত্যাচার শুরু হল। দুপাশে সার দিয়ে মাতাল পুলিশ দাঁড়িয়ে—তাদের হাতে চাবুক, লোহার শেকল। মাঝখানের সরু পথ দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকরা হেঁটে যাচ্ছে। কারো পায়ে ছোঁড়া বুট, কারো পায়ে দড়ি দিয়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা। শ্রমিকদের মাথায়, বুকে পিঠে এলোপাথাড়ি চাবুক আর শেকল আছড়ে পড়ছে। কেউ পুরো লাইনটা পার হতে পারছে না। তার আগেই রক্তে ভেসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাচ্ছে। গোঙাচ্ছে। সবার পরে এলেন সেই বলশেভিক নেতা। এবং দু'সার পুলিশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করার আগে দাঁতে কামড়ে নিলেন ঘাসের একটি পাতা। মাথা ফেটে, রক্তে সারা শরীর ভিজে গেল। শেষ শেকলটি আছড়ে পড়ার পরও তিনি অবিচল। বিস্মিত পুলিশকর্তা দাঁড়িয়ে। হতবাক। একি মানুষ না অন্য কিছু? দাঁতের কামড় থেকে ঘাসের পাতাটি সেই পুলিশের কর্তার হাতে দিয়ে সেই বলশেভিক নেতা বলেছিলেন,

—'নিন, এইঘাসের ফলাটা রেখে দিন। এর ওপরে আমার দাঁতের দাগ নেই। এটা যখনই দেখবেন তখনই আমার নাম আপনি মনে করতে পারবেন। আমার নাম স্তালিন।'

দাম ডাক্তার আকাশের দিকে তাকালেন। ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভাসছে। রণজয় তাহলে কলকাতায়। গতবার তো ডঃ মিত্রর চেম্বারে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ছেলেটাই-বা কত বড় হল! কৌশিক বলে সেই ছেলেটার কী হল? হাসপাতালে সব ব্যবস্থা করে ডাক্তার দাম ঠিক করলেন

রাতের গাড়িতেই কলকাতা যাবেন। সেবার পুলিশ অফিসারটাকে মারতে পারেনি। এবারও কি তারই খোঁজে গেছে রণজয়? কলকাতায় বড় মেয়ের বাড়ি শ্যামবাজারে। সেখানে উঠবেন। ওখানে ফোন আছে। যোগাযোগ করতে সুবিধেও।

তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে আধ ঘণ্টা শুতে না শুতে গোবিন্দ আবার এল।

—'এফআইআর হয়েছে কিন্তু ফোন তো করা যাচ্ছে না। দারোগাবাবু বলচেন কলকাতায় ফোনের নম্বরটম্বর সব পালটে গেছে। তাছাড়া লাইনও পাওয়া এক হ্যাপা।

– 'ভালোই হল। আমি তো এরমধ্যে খবর পেয়ে গেছি যে রণজয় কালকের লাস্ট ট্রেনে কলকাতা গেছে।'

—'তাহলে আমি যাব না আর কাউকে পাঠাবেন? ঠিকানা টিকানা লিখে দিলে না হয় '

—'না রে, এ আমাকেই যেতে হবে। এ তো শুধু বাড়িতে জানান দেওয়ার ব্যাপার নয়। চেষ্টা করে দেখতে হবে যদি কোনো অনর্থ ঠেকানো যায়। তুই যা। একটু পরে আমি আসছি।'

গোবিন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে।

—'আর কিছু বলবি?'

—'ডাক্তারবাবু দোষটা আমারই। কিন্তু বড়জোর তিন চার মিনিট নীচটা খোলা ছিল।'

'সে না হয় একদিন হল। কিন্তু কাল, দুপুরের ওই হট্টিচাল্লির পর –তুই একটা এতদিনের বিশ্বাসী লোক হয়ে '

—'মাপ করে দিন ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন রণজয়দাদার জন্যে মনটা বড় কেমন কেমন করছে, ওনার কিছু হয়ে গেলে বড় পাপী হয়ে থাকতে হবে '

–'যাকগে ওসব কথা থাক। তুই এগো। কাল শুভঙ্কর ডাক্তারের আসার দিন। ওকে বলিস কেন কলকাতায় গেছি।'

হাসপাতালের ঘরে ঘরে ঘুরে দেখলেন দাম ডাক্তার। নিজের ঘরে চেয়ারে বসে নতুন কাচা ধুতি ও শার্ট পরা মহীতোষ কী একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। উঠে এলেন। নমস্কার করে বললেন,

—'এত করে আপনাকে বললাম অথচ শুনলেন না। যা বলেছিলাম তাই তো ঘটছে এখন। উঃ কি সীমাহীন আস্পর্ধা।'

—'মানে, কাল দুপুরের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা বলছেন তো?'

—'কী অসভ্যতা। এই এতগুলো বদ্ধ পাগল জুটিয়েছেন, ফলভোগ করতেই হবে। ও হ্যাঁ, সংবাদটি পেয়েছেন আশা করি।'

দাম ডাক্তার গত আট বছর ধরে একদিন দুদিন অন্তর সংবাদটি শুনে আসছেন।

—'আগামী মাসেই বড়ছেলে আমাকে অ্যামেরিকা নিয়ে যাবে। ছোট ছেলেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।'

—'বাঃ এ তো সুসংবাদ। খুব ভালো।'

—'এই অসভ্য জানোয়ারগুলোকে আর দেখতে হবে না।'

—'না, না। কজনের এমন সৌভাগ্য হয়? আমি তাহলে একটু নীচে যাই। কাজকর্ম আছে।'

–'হ্যাঁ, আসুন। বাড়ির সব ভালো তো?'

—'হ্যাঁ, ভালো।'

দাম ডাক্তার সিঁড়ির দিকে এগোন। মহীতোষের বড়ছেলে বছর নয়েক আগে আমেরিকাতে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ছোটছেলে বম্বেতে থাকে, ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করে। নিয়মিত বাবার জন্যে টাকা পাঠায়। ঘর থেকে খুঁজে রণজয়ের ডায়রি আর অফিস থেকে

রণজয়ের ফাইল থেকে কয়েকটা কাগজ নিলেন দাম ডাক্তার। বেশিরভাগ কাগজই হলদেটে, পুরনো। একেবারে প্রথম দিকে দেওয়া ডঃ মিত্রের প্রেসক্রিপশন। এই হাসপাতালের নাড়ি নক্ষত্র দাম ডাক্তারের জানা। কারচুপিগুলোও তাঁর অজানা নয়। এটাও দাম ডাক্তার জানেন যে ভ্যানরিকশা করে যে লোকটা মাছ দিয়ে যায়—সেগুলো পাওয়ার স্টেশনের কোয়ার্টাবে বিক্রির পর ঝড়তিপড়তি পেটগলা তেতো মাছ, কখনো কখনো মাথাটা পচতে শুরু করেছে। ওয়ার্ডবয়, দারোয়ান, মালি এরা যে নেশাভাঙ করে, ওদের দোষেই যে রণজয় দরজা খোলা পেয়েছে সেটাও ভালোমতোই জানেন তিনি। কিন্তু কী করা যাবে? কাকে চটালেন দাম ডাক্তাব? এই সাতাশজন পুরুষ আর পেছনেব দিকেরা নটি মেয়ের দায়িত্ব কেউ তাঁব মতো করে বুঝবে? হয়তো বুঝবে কোনোদিন। সকালে ও শোবার আগে মেডিটেশন করেন দাম ডাক্তার। চিত্তহীন হতে চেষ্টা করেন। ভাবো যে তোমার সামনে অপার নিস্তরঙ্গ সমুদ্র বা নীল মহাকাশ। অথবা নিজের কোনো প্রিয় দৃশ্য ভাবো। অথবা ইষ্টদেবতাকে মনে কব। কোনো প্রিয় মূর্তি। আজ রাতেই একা একা কলকাতা যাচ্ছেন দাম ডাক্তার। রণজয়ের জন্য দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ও আক্ষেপের সঙ্গে সারা রাত ধরে একা, এইসব কিছুর থেকে দূরে কলকাতায় চলেছেন ভেবে তাঁর আনন্দও হয়। বিকেলের মাঠে ইটভাটা দেখতে কি ভালো লাগছে। শীত কোথায় যে বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরোবে? দাম ডাক্তার সাইকেলের বেল বাজাতে একটা ছাগলছানা রাস্তার পাশে সরে যায়। নড়বড়ে পায়ে উৎকর্ণ হয়ে দেখে যে দুই ঘুরন্ত গোল চাকাব ওপবে এক বৃদ্ধ মানুষ কোথাও চলেছে। তারপরই অবোধ আনন্দে ছুটতে ছুটতে আবার দাঁড়িয়ে যায়, ঘাড় ঘুবিয়ে খোঁজে।

সন্ধেটা বড় ভালো কাটল মেখলার। কোবা ওর ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে ডায়ার স্ট্রেইটস্ শুনছিল আব ওর উপন্যাসটার তৃতীয় পর্ব লিখছিল। উপন্যাসটিব শুরু এইভাবে, কৌশিক বা মেখলা কেউ জানে না, 'মানুষেব কিছু অসম্ভব স্বপ্ন থাকে। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে কিছু কিছু, কোনো কোনো মানুষের। তারা এই স্বপ্নগুলোকে হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করে। কখনো ধরেও ফেলে। চেষ্টার সময় তার ক্ষ্যাপামি দেখলে গতানুগতিক, গৎবাঁধা লোকেরা প্রায়শই তাকে উন্মাদ আখ্যা দেয়। এই উপন্যাসটির রচয়িতা একরম একজন চলচ্চিত্র পরিচালক ও সুরস্রষ্টাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে যার একটা স্বপ্নও এখন অবধি, সে যেমন চায় তেমন করে সেলুলয়েডের ফ্রেমে বা স্বরলিপির চিত্রময় বয়ানে ধরা পড়েনি। কিন্তু তার সম্ভবনা যতটুকু আন্দাজ করা গেছে, ছিটেফোঁটা যা পরিচয় পাওয়া গেছে তা চমকিত করে। বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে উপায় থাকে না। তেমনই এক মানুষকে নিয়ে এই কাহিনী যা কল্পবিজ্ঞানের আওতায় হয়তো বা পড়ে। এখন অবধি সে যা করতে পেরেছে তা জানতে হলে পাঠককে বলে নেওয়া ভালো যে গত সপ্তাহে কিঞ্জল বুধবার রাতে এইরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল—ঝলসে যাওয়া শাদা একটা কংক্রিটে বাঁধানো বিশাল শুকনো চত্বর। চত্বরটা চৌকো। কিঞ্জল সেটা নানাভাবে দেখছে যেন। কখনো তার এক কোণে দাঁড়িয়ে। তখন তার মনে হচ্ছে এটা কি বিমান অবতরনের জন্য তৈরি? তারপরেই আবার কিঞ্জল যেন বিমান থেকে দেখছে—একটা শাদা রুমাল। সাঁ সাঁ করে বাতাসের শব্দ। এই বাতাসের এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে উড়তে উড়তে একটা খোলা কালো ছাতা চত্বরটাতে ঢুকল। যার ছাতা সে কিন্তু এল না। ছাতাটা উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিঞ্জল এই অবধিই দেখেছিল।'

'এবারে পাঠক, সামনে যে চলচ্চিত্রের মতো ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন সেদিকে মনোনিবেশ করুন। ওই যে শার্টের হাতা গোটানো হাতটা ভিসিআর-এ ভিডিও ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিল ওই হাতটা কিঞ্জলের। ওই দেখুন ভিসিআর-এর আলোগুলো জ্বলে উঠল। এবার দেখুন ক্যাসেটটা

চালানো হয়েছে কারণ লাল তীরচিহ্ন জ্বলে উঠেছে এবং দৃশ্যমান আলোকিত সংখ্যা ধীরে ধীবে পাল্টে যাচ্ছে। সংখ্যাগুলো বাড়ছে ০০৩৭, ০০৩৮, ০০৩৯, ০০৪০...এবারে চোখ সরিয়ে আনুন টিভি মনিটবের পর্দায়। প্রথমে শাদা কালো ঝিবি ঝিরি, কালোশাদা তুষার ঝড। এবার ভালো করে দেখুন হঠাৎ ঝিবি ঝিবি চলে গিযে অবশ একটা নীল আলো সারা পর্দা জুড়ে। তাব সঙ্গে ওই যে ভারি ড্রাম বিট শুনতে পাচ্ছেন তো। ওই নীলটা হল কিঞ্জলেব ঘুম। ওই ড্রাম বিট কিঞ্জলেব হৃদযন্ত্রেব। এবাবে সাবধান হতে হবে—দেখুন, এক আধ সেকেন্ড মাত্র দেখা যাবে—পুবো পর্দাটা শাদা আলোয ঝলসে উঠতেই কালো হযে গেল, সাঁ সাঁ বাতাসেব শব্দ। ওই তেতে ওঠা শাদাটা হল স্বপ্নেব সেই চত্বব আব কেন যে ছাতাটা আড়াল করল।'

'কিঞ্জল যখন ঘুমোয তখন ওব মাথায অনেক জাযগায় ইলেকট্রোড লাগানো থাকে। নিশ্চয়ই দেখেছেন ওর মাথায় কয়েকটা জাযগা খাবলা খাবলা। চুল নেই। গত তিন বছর ধবে স্বপ্নেব ছবি তোলাব চেষ্টা কবছে কিঞ্জল। ওই এক-আধ সেকেন্ডেব স্বপ্নেব ছবিটা ছাড়া আর কিছুই সে তুলতে পারেনি। কিন্তু স্বপ্নে শোনা শব্দ ধবাব ব্যাপার ওব কাজ অনেকটা এগিয়েছে।'

কৌশিকেব ফোন এল। দিনদুয়েকের মধ্যেই আসবে।

—'ভেবেছিলাম কালকে তুই আসবি।'

—'আরে, আমিও তো ভেবেছিলাম যাব। কিন্তু একটা বোম্যান্টিক জাযগাতে এমন ফেঁসে গেলাম সব গুবলেট হয়ে গেল। বিয্যালি সবি, মেলাদি।'

—'সেখানে জয়িতা ছিল বুঝি?'

—'ধুস্। জযিতা ছাডা আব মেযে নেই নাকি?'

—'ঠিক আছে, জযিতাকে বলে দেব।'

—'দিও। বাঁচা যায। আব হ্যাঁ, গ্র্যাহাম গ্রিনেব খবব কী?'

—'কি আবাব, কানে হেডফোন লাগিযে কি সব লিখছে খাটে উপুড হয়ে।'

—'চমৎকাব আইডিয়া তো। আজকেও কি রেটে ফাটছে দেখেছ তো। হেডফোন ছাড়া উপায় নেই।'

—'এদিকেও খুব আওয়াজ হচ্ছে। আজকে তো ভাসান।'

—'ও কেউ ভাসান দেবে না। চাবদিন ধরে রেখে বাঁদবামি করবে। যাইহোক, হয় কাল, নয পরশু, এনি টাইম গিয়ে উদয় হব। পুত্রকে সাবধান করে রেখ।'

—'আচ্ছা।'

—'আর ও মেলাদি, ফ্যান্টাসটিক একটা খবব পেলাম। তোমাকে না বলে পারছি না।'

—'কী?'

—'তুমি শোলে দেখেছিলে?'

—'না, একবার ওই কোবা ক্যাসেট এনেছিল। নোংরা পড়া ক্যাসেট। কিছু দেখাই যায় না।'

—'ও তোমাকে ভালো প্রিন্ট আমি দেখিয়ে দেব। শোন না, শোলের প্রডিউসার ডিরেক্টর সিপ্পিদের নাম শুনেছ তো?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি।'

—'শুনলাম যে ওদের বাড়িতে নাকি একটা ফ্যাবুলাস কালেকশন অফ মার্কসিস্ট লিটারেচার রয়েছে। কোনো ইউনিভার্সিটিতেও নাকি এমন নেই। ভাবতে পারো—ওফ্ এ শালা ভি বাঁচ গয়া—তেরা ও হাত মুঝে দে দে গব্বর—তার সঙ্গে মার্কসিজম। যাইহোক, এখন নীরব হচ্ছি। দেখা হবে।'

—'খুব তাড়াতাড়ি যেন হয়।'

—'ও সিওর। বাই। ঘ্যাচাং।'

ফোন নামাবার আগে কৌশিক 'ঘ্যাচাং' বলবেই।

আইএসআই-এর শুভব্রত-র মাধ্যমে কৌশিক রণজযেব কাছে আসে। কৌশিকের তখন ইতিহাসে অনার্স। ফার্স্ট ইয়ার। জেলের পরে যে বছরখানেক রণজয় কলকাতায় ছিল সে সময়টা কৌশিকের জীবনে এক অবিস্মরণীয় সময়। কোর্সেব পড়া নয়। রণজয় কৌশিককে একটার পর একটা বই পড়তে দিত। ঘণ্টার পব ওকে যুদ্ধের গল্প, স্তালিনগ্রাদ, লং মার্চ, ভিয়েৎনাম, কিউবার মুক্তিযুদ্ধ বর্ণনা কবে যেত। বণজয়েব মতো অসামান্য স্মৃতিশক্তি কৌশিক কোথাও দেখেনি—এবং বিশ্লেষণেব ক্ষমতা—যুদ্ধবিজ্ঞানের মতো একটি জটিল ব্যাপারকে কত সহজে ব্যাখ্যা কবত রণজয়। কৌশিক পরে জেএনইউ-তে যায়। সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। কিন্তু বিদেশে থাকাব ছেলে কৌশিক নয়। ওদেব বাড়িতে ব্যবসা কবে লক্ষপতি হয়নি কৌশিক একাই। কৌশিক দেশে ফিরে এখানে ওখানে পড়িয়েছে। বর্তমানে সেন্টার ফর সেন্ট্রাল এশিযান স্টাডিজ-এ আছে। ওব স্ত্রী জয়িতা অক্সফোর্ডেই ইংবাজি পড়ত। এখন যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।

বণজয় পাঁউরুটিটা কেনাব পবেও দোকানের কাউন্টাবে দাঁড়িয়েছিল। এমনিই। ওবা তখন কি ভেবে একটা পলিথিনের প্যাকেট দিল। এদিকটায় বিস্ফোরণের শব্দ কম। দূবে ফা৺ছে। রণজয় যে বাস্তাটা দিয়ে এগোচ্ছিল সেটা ওপরে উঠে গেল। ডবল বেললাইন পেরোল। তাবপর সোজা চলে গেল। ডানদিকে যে রাস্তাটা নেমে গিযেছে সেটা দিয়ে হাঁটতে থাকল বণজয়। একটু ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ঘুম নেই। বাঁ পায়েব ব্যাথাটা অবশ হয়ে গুম মেবে বয়েছে। যাবা ম্যারাথন হাঁটাব প্রতিযোগিতায় নামে তাদেব কোমবেব তলা থেকে আধখানা শবীব নিঃস্ব ভরবেগে এগিযে চলে। হঠাৎ দমকা বাতাস দিল। ধুলো উড়ছে। অন্ধকার বস্তি এলাকা। মাঝেমধ্যে ইলেকট্রিক বাল্‌বও জ্বলছে। ইট বের করা নিচু বাড়িগুলোর মধ্যে টিউব। টিভি-ব শব্দ। আবার অন্ধকার। পেছনে বড় গাড়িটা হেডলাইটের আলোয রণজয়ের লম্বাটে ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া রাস্তায় লম্বা করে ফেলে আবার গুটিয়ে নিয়ে পাশ দিযে বেরিযে গেল, বাতাসেব থাপ্পড মুখে লাগল, কাগজ উডল সেটা একটা ভাসান ফেরতা ট্রাক। লম্বা দুটো বরবটি বেলুন একটা ছেলে চেপে হাওয়ার বিরুদ্ধে ধরে রেখেছিল বলে বিকট একটা হাসিব শব্দ হচ্ছিল। ট্রাক থেকে কারা কাদা ছুঁড়ল। রণজয় ট্রাকটাকে দেখল। এক দঙ্গল লুচ্চা তার ওপরে লাফাচ্ছিল। বণজয় বুঝতে পাবল যে সাধাবণ, খেটে খাওয়া, অভাবী মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জন্য ফাসিস্ত লুম্পেনদের রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে চলেছে। রিভিশনিস্ট পণ্ডিত সুশোভন সরকার একেই বলেছিলেন, 'দুর্দম প্রসার-প্রবৃত্তি' তাঁব লেখা 'ফ্যাসিবাদের পশ্চাৎপট'-এই রণজয পড়েছিল, 'সাম্যবাদীরা যে-সময় রাশিয়ায় কর্তৃত্বস্থাপনে ব্যস্ত, তখন ইটালিতে ফ্যাসিজম নামে এক নূতন আন্দোলনের উদয় হয়। পরে এই ফ্যাসিস্ট মতোই সকল প্রকার সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইওরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ; মার্কসপন্থার প্রতিক্রিয়াই তার মূল প্রেরণা।' রণজয় রাস্তার ধারে একটা উল্টোনো ব্যাটারির খোল দেখে তার ওপরে বসে পড়ে। সামনে পা মেলে দেয়। দূরে একটা আলো ঝুলছে। তার তলায় ছেলেদের একটা জমায়েত কি যেন করছে। তারা রণজয়কে লক্ষ করেছিল। জনাদুয়েক এগিয়ে এল। রণজয় চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল পা টান করে। ওদের পায়ের শব্দ কাছে আসতেই রণজয় উঠে দাঁড়াল। এত ক্ষিপ্রগতিতে রণজয় উঠে দাঁড়াবে ওরা ভাবেনি। একটু হটে যায়। রণজয় চিৎকার করে উঠেছিল, 'দা স্ট্রাগল এগেন্স্‌ট ফ্যাসিজম মাস্ট বি কংক্রিটাইজড্।' বণজয় এগোয়, হাতে পাঁউরুটির পলিথিন

প্যাকেট ঝুলছে, দুলছে, ওরা দৌড়ে উল্টো আলোব তলায় চলে যায়। সেখানে ক্যারমবোর্ডে জুয়া চলছিল। কিছু পোকা উড়ে উডে বোর্ডে এসে পড়ে। ছোট, বড়, নানা সাইজের উচ্চিংড়ে ও শ্যামাপোকারা। তাদের মধ্যে যারা ভাগ্যহীন তারা স্ট্রাইকারেব বাড়িতে, ঘুঁটির অপ্রকৃতিস্থ নড়াচড়ায় থেঁৎলে যায়। ওবা ফিরে এসে বলে 'ও শুডঢা পাগলা হ্যায়'। রণজয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখে। বলে, 'স্ট্রাটেজি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স্, রণনীতি ও বণকৌশল কখনোই এক হতে পাবে না। কৌশিক, যদি গাধা হয়ে না থাকতে চাস তো দিমিত্রভ আরো মন দিয়ে পড। বাববার পড়। তবে তো বুঝবি।' বণজয় এগোয়। ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল যে রণজয় আলোর ওপাবে চলে যাচ্ছে।

ডঃ মিত্রকে ফোন করে বসাক তাব সহসা দুঃস্বপ্নেব কথাটি বলেছিল। ডঃ মিত্র বলেছিলেন লোবেল-১ একটা করে খান। ও কিছু নয়। খুব মাইল্ড। বসাক ওষুধটি আনিয়ে নিল। একটি ফোল্ডাবে চাবটি শাদা ট্যাবলেট। চাব বাতেব নিরুপদ্রব ঘুম। ব্রিটিশদেব আবিষ্কৃত এই অনাচ্ছাদিত বড়িতে বযেছে মাত্র এক মিলিগ্রাম লোরাজেপাম। সাহেব ডাক্তারদের কি মহিমা। মাত্র একটি বড়ি কর্মক্লান্ত দিনের শেষে মেবে দিলে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কোনো নিড়ানি নেই। শিডিউল 'এইচ' ড্রাগ।

কেউ যখন আসে না, কেউ বিবক্ত কবে না তখন এই রাত্তিবগুলোতে খেতে বসে কোবা অনেক ব্যক্তিগত কথা মেখলাব কাছে জানতে চায।

—'মা, বাবা খুব স্পেশাল কী ভালোবাসত খেতে?'

—'কোবা, অনেকবাব বলেছি বাবাব সম্বন্ধে পাস্ট টেন্সে কথা বলবে না।'

—'ও, আমি সবি মা। ছাড না বলো, কি খেতে চাইত?'

—'উঃ। ছোট মাছ। আমবা তখন বিযেব পরে। আমি তো মাছ-টাছ কাটতে পাবি না।'

—'তখন?'

—'সে মধ্যমগ্রামেব বাড়িতে। রাত্তিরে এসে বলল, দেখ, কী এনেছি। পাঁচশো গ্রাম খরশোল মাছ। বলল, মেলা, এ মাছ তুমি কখনো খাওনি। পাবশে কিন্তু পারশে নয। আমি তো বোকা, দাঁড়িয়ে আছি।'

—'তাবপর কি হল?'

—'কি আবার। যা হত। সেই রাত্তিবে তো দাদু এসে মাছগুলো কাটলেন। উনি, কি আর করবেন, বসে বসে দেখলেন। সেই মাছ ভাজা হল, খাওয়া হল।'

—'মা! খবশোল মাছ কিরকম খেতে?'

রণজয় এবার সত্যি একটা অন্ধকার জায়গায পড়ল। এই দোকানগুলো কেউ কি কখনো খুলেছিল? কারা কিনতো এসব দোকান থেকে? বড়ই অন্ধকাব। না কি এর উল্টোদিকে একটা বাজার রযেছে? এটা কি একটা গ্যারেজ? কেউ এর সামনে টায়ার আর মবিল মোছা তুলে পুড়িয়েছিল। লাথি মারলেই ছাই আকশে ওড়ে। অনেক বড়সড় একটা মরচে পড়া বন্ধ গেট। রণজয়ের পায়েব ধাক্কায় একটুকরো পিসবোর্ড উড়ে যায়। তাতে লেখা '৬৫ দিবস। আজ আমাদের অবস্থানের ৬৫ দিবস।' শুকনো সুতো সুতো ওই যে ন্যাকড়াটা বুকে জড়িয়ে হেঁটে গেল রণজয় সেটা একটা রক্ত পতাকা। কাদের? পশ্চিমবঙ্গে কার না লোহিত পতাকা নেই? রণজয় পাঁউরুটির কারখানা মাড়িয়ে যায়। উল্টোনো ভ্যানগাড়িতে অ্যাকসময় এসিডের বোতল যেত। ডিস্টিলড্ ওয়াটার যেত। কারা নিযে যেত রণজয়? শোনাশুনির বালাই নেই, রণজয় হাঁটছে। এই ছোট ছোট কারখানাগুলো যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—পাঁউরুটির, ছোট লেদ,

প্লাস্টিক ডাইস, গ্যারেজ—তখন কী আশা, কী উদ্দীপনা, কত ভরসা—আব—তারপর? একটা কী পায়ে লাগতে রণজয় তুলে নেয়। ছেঁড়া এক পাটি কেডস। পাশেই ওই যে আধপচা, পোকাখাওয়া বাঁশের খুঁটিটা মবা হাড়ের মতো মাটি ফুঁড়ে বেবিয়ে আছে। ওটা ছিল চারটে খুঁটির একটা যাব ওপরে পলিথিনের কালো চাদর বেঁধে লাগাতার অবস্থানের ঘাঁটি তৈবি করা হয়েছিল। যারা করেছিল তারা কোথায়! একরাশ ছোটো ছোটো মাটির ভাঁড—উল্টো, চিৎ ঝিনুকেব মতো নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে পাযে পায়ে পিষে যাওয়ার।

'শরীবে রক্ত থাকলেও মানুষের, অন্তরে বিবেক
মেনে নিযেছি আতসবাজি কারখানার শিশু শ্রমিকের
বিকেল
মেনে নিয়েছি বাড়ি তৌরিব মেয়ে কামিনদেব
দুঃখী হাসি
অ্যাসবেস্টস খনিব ফুসফুস-ফুটো মজদুর
অ্যাসিডে গলে যাওয়া গ্লাভস্
কনস্ট্রাকশন সাইটে খবরের কাগজে ঢাকা মৃতদেহ
পাতাল বেলের বাতিল মাটি কাটাদেব দল
কত কি মেনে নিয়েছি
কী ক্ষমতা আমার মেনে নেওয়াব'

সামনে অন্ধকার পর পর চালাঘর। তাবমধ্যে একটু ভেতরে ঢোকানো একটা চালায ঢোকাব মুখে একটা প্যাকিং বাক্স রাখা। সেইদিকে চোখ পডতে বণজয় কিছুক্ষণ তাকিযে রইল। প্যাকিং বাক্সর ওপরে একটা কুপি জ্বলছে। আলোটা দেখে কিছু একটা মনে পডেও পড়ে না। মেদিনীপুব? মুশাহারি? রাত করে কোনো সভা? সেখানে গেরিলা 'অ্যাকশন' সম্বন্ধে কমরেড মজুমদাবেব কথাগুলো বোঝাব ও বোঝানোর চেষ্টা করা? বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী হিসেবে সঙ্গে একটা ছোট পিস্তল ছিল? কিন্তু কমরেড, লড়াই-এব এই স্তরে কোনোবকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। রণজয় কুপির আলোটাব দিকে এগোয়। গেরিলা ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে দা, বল্লম, সড়কি, কাস্তের ওপরে আস্থা বাখতে হবে। 'না, কমরেড, এটা দেশি বন্দুক কেনা বা তৈবি করা বা বন্দুক দখলের পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। হাতে বন্দুক পেলেই কি আমরা রাখতে পারব? না। পুলিশ ঠিক ওগুলো দখল করে নেবে।' রণজয় ঘরটায় ঢুকে দেখল কেউ নেই। 'যদি তা সত্ত্বেও কিছু বন্দুক জোগাড় হয়ও, আমরা তা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না বা শত্রুর হাতে তুলে দেব না বরং ভবিষ্যতের জন্যে লুকিয়ে রাখব এবং এর নিস্ফল ব্যবহাবে বাধা দেব।' একা একা কুপির আলোটা জ্বলছে। কালো ধোঁয়া শিখার ওপর।

রণজয় দেখল ছোট ছোট বান্ডিলে বাঁধা আধহাত, একহাত করে খড়ের টুকরো সারা ঘবটায় ছড়ানো। পেছনে কাৎ হয়ে রয়েছে বাস বা লবির বিরাট একটা টায়ার। অনেকগুলো খালি বোতল। তিন-চারটে কার্ডবোর্ডের বাক্স। একদিকে একটার পর একটা বস্তা ডাঁই কবা। বস্তাগুলো জ্যালজেলে চটের ও ভর্তি। আলোতে চোখটা ধাতস্থ হলে বোঝা যায় ওগুলো কালো কালো কাচের বোতলে ভর্তি। এক কোণে অনেকগুলো ছিপি। রণজয় কুপি বসানো প্যাকিং বাক্সটার ভেতরে দেখল। এখানেও অনেকগুলো খালি শিশি ও বোতল। কিন্তু সেগুলো ওই কালো বোতলের মতো গোল নয়। এগুলো শাদা কাচের, চ্যাপটা। তার ওপরে দুটো ফানেল, প্লাস্টিকের। একটা বড়, একটা ছোট। প্যাকিং বাক্সের পেছনে তলায় বসার একটা জায়গা—পুরু

করে খড় বিছিয়ে তাব ওপবে বস্তা পাতা। রণজয় রুটির প্যাকেটটা ডাঁই করা বস্তার ওপরে রেখে পা দিযে দিযে অনেক খড়ের বান্ডিল এক জায়গায় কবল। তারপব রুটির প্যাকেটটা পাশে নিয়ে বস্তায় হেলান দিযে বসে পা ছড়িয়ে দিল। পা দুটোব একটু বিশ্রাম দবকার। না ঘুমোলেই চলবে। আব ঘুমই-বা কোথায়? শবীবটা আলগা করতে পিঠেব ওজনে বস্তার মধ্যে বোতলগুলোয় কাচের সঙ্গে কাচ ঘষাব শব্দ হল।

রণজয় প্যাকেট থেকে রুটিটা বেব কবে মোড়কেব কাগজটা ছিঁড়ল। তাবপর একটু একটু করে ভেঙে খেতে শুরু করল। তাবপবই শুনতে পেল কেউ এদিকে আসছে। বাঁ হাতের কাছে একটা বড় কালো বোতলেব গলাটা শক্ত কবে ধরল রণজয়। লোকটা লুঙ্গি আর ঢোলা শার্ট পবা। হাড়গিলে। মাথায় তামাটে লম্বা লম্বা ঘাড় অবধি চুল। সে গুনগুন করে গান করছিল। লোকটা শার্টটা তুলে কোমবে গোঁজা একটা খালি বোতল বার কবল। প্যাকিং বাক্সেব ওপবে বাখল। রণজয় দেখল সে যে বোতলটাব গলা ধবে বেখেছে বাঁ হাতে ওই বোতলটাও ঠিক একই বকম দেখতে। বণজয় হাতটা আলগা করে দিল। লোকটা গিঁট খুলে লুঙ্গিটা শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বলল,

—'মণ্ডল কোথায়?'

বণজয় লোকটাকে দেখল।

—'কে মণ্ডল?'

—'এ কি বে বাবা! মণ্ডলেব গলতায় বসে ঠ্যাং ছড়িযে পাঁউরুটি খাচ্ছ আর মণ্ডল কে জান না?'

—'না।'

—'যত শালা বিদঘুটে পাবলিক!'

বণজয় একটু উঠে বলে,

—'গালাগালি করলেন আমায়?'

লোকটা ঘাবড়ে যায়।

—'গালাগালি কবিনি তো। বলচি মণ্ডলকে চেনেন না, অবাক লাগচে। এটা মণ্ডলেবই ঠেক তো, তাই বলছিলাম।'

রণজয় আবাব হেলান দিযে শুয়ে পড়ে। পাঁউরুটি খায। খিদেব মুখে বেশ লাগছে খেতে। ওই কথার পবে লোকটা গানেব গলাটা একটু চড়িযেছে। এব মধ্যে মণ্ডল এসে ঢুকল। সঙ্গে বস্তা পিঠে দুটো লোক। ওবা বস্তা দুটো পেছন দিকে নামিয়ে চলে গেল। মণ্ডল একবাব রণজয়কে দেখল। কিছু বলল না। ওই লোকটা বলল,

—'কোথায় মাবাতে গিয়েচিলি? সেই থেকে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেদিয়ে যাচ্চি।'

—'এই, একদম আলফাল বকবে না। বুঝলে? মেজাজ একেবাবে খিঁচড়ে রয়েছে?'

—'কেন, কী আবাব হল তোর? বউ ঝ্যাঁটা মেবেছে?'

—'সকাল থেকে সেই একা একা ঠেক সামলাচ্ছি। বাড়ি যাব, সে রাত একটা-দেড়টা হয়ে যাবে। এরপর ঝ্যাঁটা মারলে বলার কিছু থাকবে?'

—'দে এবার মালটা দে। দেখে দিবি। ননীবাবুর মাল।'

মণ্ডল নতুন বস্তার থেকে খড়েব বান্ডিল বাঁধা একটা বোতল বের করে। বোতলটা বান্ডিল থেকে খুলে কুপির আলোয় উল্টো কবে দেখে এগিয়ে দেয়।

—'ও যে বাবুব মালই হোক না কেন, মণ্ডল তোমার ওই গ্যাঁজা ওঠা মাল কখনো দেয়

না।'

—'তোর ওই চামচাটার কী হল?'

—'আরে ওর জন্যেই তো আমার এ হুজ্জুতি। বলল বাড়ি যাবে, তা বললাম বেশ হাজারটা টাকা নিয়ে যা। বাড়িতে গেলে বলো, খরচ-খরচা হবেই।'

—'কদিনের জন্যে ছাড়লি?'

—'সে তো মাত্তর একদিন। এদিকে তিন দিন হয়ে গেল। ওই টাকা কিন্তু মাইনেব টাকা নয়। তার ওপর আমার বলাই আছে যে মাল যত ইচ্ছে খাও তবে ঠেকে বসে। ও রাম, হুইস্কি যা ইচ্ছে খাও। এত সুবিধে। তা তিনদিন হযে গেল।'

—'দ্যাখ্, ওই ভাইফোঁটা পাব কবে আসবে।'

—'তাই আমিও ভাবছি। তবে ও আমাকে যা একটা জিনিস এনে দিয়েচে যে দাম শুনলে কেলিযে যাবে।'

—'ও তোর সেই ভিসিআর?'

—'ভিসিপি। ন্যাশানালেব। দাম কত নিযেছে জানো? মাত্তব সাড়ে ছ-হাজাব। এখানে তুমি সাতেব তলাই ফুনাই পাবে না।'

—'না, না, ছেলেটা ভালো। দ্যাখ্ কাল-পবশুব মধ্যে এসে পডবে। চলি বে।'

—'এসো।'

লোকটা গুণগুন করে গান করতে কবতে চলে গেল। মগুল বণজয়ের দিকে দেখল। বলল,

—'আপনাব কী চাই বাবু, আমাব কাছে বাংলা, বিলিতি সব আছে।'

—'তোমার কাছে একটু জল হবে?'

—'জল। হ্যাঁ, এই তো?'

একটা বড বোতল এগিয়ে দেয় মগুল।

—'এটা মদ-টদ নয় তো?'

—'না, না, জল। আমি নিজে মদ জানবেন টাচ করি না।'

—'আমিও না। তবে ঘুমের ওষুধ খাই। না খেলে আমার ঘুম হয না। আজ বাতেও হবে না।'

বণজয় অধের্কটা পাঁউরুটি মগুলের দিকে এগিযে দেয়।

—'খাবে?'

—'না, না, আপনি খান না!'

—'নাও না, দিচ্ছি, নাও। কক্ষনো একলা খেতে নেই।'

মগুল নেয়। রণজয় খাওয়া শেষ করে জল খায়। তারপব চশমাটা খুলে বুকের ওপবে ভাঁজ কবে রাখে। দু-হাতে নিজের কপাল্টা টেপে।

—'মগুল তো তুমিই।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, কী করে জানলেন?'

—'ওই লোকটা বলছিল। শুনলাম। তো সে যাইহোক, আমি কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে চাই। কারণ আমার মনে হচ্ছে তোমকে কথাগুলো বলতে আমি পারি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না। যাইহোক, আমি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন কর্মী'। রণজয় হাত দুটো পাশে রাখে। চোখ বন্ধ।

—'দাদা, একটা কথা বলব সাহস করে?'

—'বলো।'

আপনি নকশাল, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক ধরেছি। ও আমার চোখ এড়াবে না। দাদা, আপনি কানাই বঙ্গ-র নাম শুনেছেন? আমাদের পাশের বাড়ির লোক ছিলেন। শান্তিপুরে আমার বাড়ি।'

রণজয় উঠে বসে। মণ্ডলের দিকে তাকায়।

—'কানাই! কানাই বঙ্গ! কানাই! কিলড ইন বেরহামপোর সেন্ট্রাল জেল টুগেদার উইথ এইট আদার কমরেডস ইনক্লুডিং তিমির বরণ সিংহ। আমি তখন কোথায়?'

—'দাদা, আমি তখন ছোট জানেন। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। বহরমপুর থেকে সার্চলাইট লাগানো সাতটা ভ্যানে ঘিরে কানাই কাকুর বডি এনেছিল- সে কি মিলিটারি, সিআরপি পুলিশ—গলায়, কানের কাছে, কিচ্ছু নেই—খোবলানো খোবলানো—দেখেছি, মনে আছে।'

—'ও হ্যাঁ, আমি বোধহয় তখন আলিপুর স্পেশাল জেলে। বোধহয়, না কি? মনে পড়ছে না।'

দুজন খদ্দের এসে গেল। দুটো পাঁইট কিনল। ওরা ওখানে ছিপি খুলে খেতে যাওয়ায় মণ্ডল বাধা দেয়।

—'এই, এখানে খাওয়া বারণ, জানো না?'

—'কী হয়েচে খেলে? খেয়ে বোতলটা দিয়ে চলে যেতুম।'

—'সে তুমি বোতল দেবে কি দেবে না আমার জানার দরকার নেই।'

—'ফালতু কিচাচেন করে লাভ নেই। চল্ খেতে বারণ করচে।'

—'আমি তো বারণ করবই। ওপর থেকে বলা আছে। আরো বলতে হবে?'

—'না, না, আমরা চলে যাচ্চি গুরু।'

—'হ্যাঁ, যাও। এই শালা রাত করে যত মালখোরদের ঝামেলা।'

ওরা চলে যাবার পরে চুপ করে শুয়ে থাকা রণজয়কে দেখে মণ্ডল ভাবল রণজয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

—'যাইহোক, মণ্ডল। অল্প কথায় ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করছি। আমি কলকাতায় থাকি না। কলকাতায় কিছু চিনতেও পারছি না। আমাকে যে করে হোক একটা জায়গায় যেতে হবে। যাদবপুর লেভেল ক্রসিঙের ওপারে। ওখানে গেলে আমি বাকিটা চিনতে পারব। কিন্তু কী করে যাব ওখানে? কাজটা সেরেই আমাকে ফিরতে হবে। ফেরার সময় সঙ্গে বেশ ভারি কিছু লাগেজ থাকবে...'

—'যাদবপুর। লেভেল ক্রসিং তো স্টেশনের সামনের রাস্তা দিয়ে। এখন আটকে দিয়েছে জানেন তো?'

—'মানে, যাওয়া যায় না?'

—'হ্যাঁ, গাড়ি যেতে পারে না। লোক, সাইকেল পারে। গাড়ি, বাস, মিনি সব সুকান্ত সেতু হয়ে যাচ্ছে।'

—'এই অন্ধকারে নয়, আমি একটু আলো থাকার সময় যেতে চাই।'

—'এই রাত্তিরে তো যেতেই পারবেন না। কাল না হয় আমি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব। দু-দুবার বাস পাল্টাতে হবে।'

—'কাল সকাল সকাল যেতে পারব।'

—'সকালে আমি উঠি না। তবে দাদা, আপনাব জন্য উঠব। আমি এসে আপনাকে নিজে না হয় বাসে তুলে দেব।'

রাত একটা নাগাদ মণ্ডল চলে গেল। আলোটা নিভিযে দিয়ে। বণজয় দেখল অসম্ভব মশা আসছে। অন্ধকাবে হাতড়ে হাতড়ে একটা বস্তা নিযে মুখেব ওপবে চাপা দিল। ইঁদুবেব শব্দ। কোথায় একটা কেউ চেঁচাল। অনেক দূরে বিস্ফোবণের শব। জেগে রযেছে রণজয়। মাথাব মধ্যে জেল, মদেব গন্ধ—সবকিছু তালগোল পাকাচ্ছে। ঘুম নেই। কোবা কী করছে এখন? ছোট্ট কোবা—নিশ্চয়ই মেখলা পাশ ফিরে আছে—আব তার বুকেব কাছে ঘেঁষে কোবা ঘুমোচ্ছে। মেখলার একটা হাত কোবার গায়ে আলতো কবে বাখা।

সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম চোখে মণ্ডল এসে দেখল কেউ নেই।

৪

১৯৭৭ সালের পশ্চিবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকাব রক্ষা সমিতি বাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদেব ওপরে রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র নিপীডন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্য। এর একটি কপি কৌশিকেব কাছে রযেছে। তাতে রণজযেব খবব দুটি ভিন্ন অংশে পাওযা যায়। উত্তরবঙ্গের যেখানে রণজযকে ধরা হয়েছিল সেটা একটা গ্রাম। তিন-চারদিন ধরে বণজয জাযগা পাল্টাচ্ছিল। এবং তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কিছু অভিজ্ঞতা অজান্তে প্রয়োগ কবে দেখেছিল রণজয়। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপাব। যেমন যে গ্রামটিতে শেলটাব নেওযাব কথা সেখানে পৌছতে, কেন জানি না একটা খটকা লাগল। অথচ শবীর তখন ভেঙে পডছে। তবুও কষ্ট করে অনেকটা পথ হেঁটে অন্য একটা গাঁয়ে চলে গেল রণজয়—এবং সেই রাতেই আগের গাঁ-টিকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। রণজয় যখন ধরা পড়ে তখন সূর্য হেলতে শুরু করেছে। রুক্ষ, ধারালো, চষা মাঠ। 'ধরার সাথে সাথে পিছন দিক দিয়ে কোমব ও কোমরেব তলায বেয়নেট চার্জ কবে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় ও তাবপরে আরো বেযনেট চালিযে শরীবের ওই অংশটিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্বভাবতই এই অবস্থায় তিনি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিলেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাঁকে প্রায় আড়াই মাইল পথ চষা জমির ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে থানায় তোলা হয়। পথে এক চায়ের দোকানে গ্রেপ্তারকারী ইএফআর (ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্) ও পুলিশের লোকেরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল ও চা খাচ্ছিল তখন তাদেরই কয়েকজন দোকানের উনুন থেকে জ্বলন্ত কয়লা উঠিয়ে তাঁর সাবা গাযে ছেঁকা লাগায়। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত সিগারেটের ডগা দিয়েও ছেঁকা দেওয়া চলতে থাকে। এরপরে পুলিশ হাজতে জিজ্ঞাসাবাদেব সময় তাঁকে ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হয়, আবার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ও সর্বোপরি চোখে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়। ইএফআর-এর এক কনস্টেবল হত্যার দায়ে এঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যে ইএফআর কনস্টেবল হত্যার মামলায় এঁকে জড়ানো হয়েছিল সেই ঘটনাটি সম্পর্কে পরবর্তী বিবরণ থেকে জানা যাবে।' এসবই কখনো কখনো স্বপ্নের মতো রণজয়ের মনে ভেসে ওঠে বা উঠলেও সে বোঝে না।

বসাক যে যুক্তিনির্ভর স্বপ্ন দেখে কালীপুজোর রাতে ঘুম ভেঙে উঠে সবিশেষ রেগে গিয়েছিল তার উৎসে রয়েছে একখানি বই যার নাম—'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সারকথা'। গ্রন্থকার হলেন

মহা মহাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ। এরপরে তাঁর আরো যা পরিচয় রয়েছে তা হল আয়ুর্বেদ বৃহস্পতি ডিএসও এবং গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। বসাক হল এথনিক। বসাক পড়েছিল,

'বীর্য্যস্তম্ভ অধিকার

ওল বা তুলসীর মূল তাম্বুলেব সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হয়। কাল বিড়ালের বামপদের অস্থি দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ করিয়া বতিক্রিযায প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যক্ষবণ হয় না। চড়ুই পক্ষীর ডিম নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা পাদদ্বয লেপন করিয়া রতিক্রিযায় প্রবৃত্ত হইলে যাবৎ ভূমিস্পর্শ না হয়, তাবৎ বীর্যপাত হয় না। নীলোৎপল, শ্বেতপদ্ম কেশব, মধু ও চিনি এই সমুদয় নাভিবন্ধ্রে লেপন কবিয়া স্ত্রীসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে বহুক্ষণ পর্যন্ত বীর্য্যক্ষবণ হয় না। এইজন্য অর্জকাদি বটিকা ও শুক্রবল্লভ রস বিশেষ উপকারী।'

বসাক এসব কিন্তু নিজের প্রযোজনে পড়ে না। বসাক আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের এক ব্যবসা ফাঁদতে চলেছে। নিজে তাই কিছু চটি বই কিনে পডেও দেখছে যাতে সঙ্গে যে আরো তিনজন পার্টনাব আছে তারা তাকে আরো বেশ কযেক কযেক কাঠি সবেস বলে মনে করে। বসাক তখনই দেখেছিল যে, যে উঠতি বযসেব পুলিশ অফিসাবরা মাও, চে গুয়েভারা বা কারলোস মাবিঘেল্লা ইত্যাদি আওডাত, কোথাকাব কোন টুপামাবো গেবিলাদের খবর রাখত—বড়কর্তারা তাদেব দিকেই বেশি নেকনজব দিত। তবে আসল কাজে লেখাপড়ার খুব একটা ভূমিকা ছিল কি? সাগবদ্বীপে অনেকটা জমি নিযে বসাকেব হার্বাল মেডিসিনেব প্রোজেক্ট। অবশ্য এখনো ভাবনাচিন্তাই চলেছে।

রণজযকে গ্রেপ্তার করাব দিনই আবেকটা ঘটনা ঘটেছিল। 'পুলিশ ও ইএফআর বাহিনীর একটি দল একজন নকশালপন্থী কর্মী সুনীলবরণ রায়েব খোঁজে তাঁব দাদা মালদহের একজন বিডিও অনিলবরণ রায়েব কোয়ার্টাবে হামলা চালায়। খানা তল্লাশেব নামে তারা যখন বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর শুরু কবে তখন সুনীল রায়ের স্ত্রী তাতে বাধা দিতে যাওয়ায় তাঁর ওপর ইএফআব ও পুলিশেব লাথি কিল ঘুসি নেমে আসে। হামলা শুরু হওয়ার সময় অনিল রায় বাডি ছিলেন না। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসে হামলাকারীদের কাছে জবাবদিহি চান যে একজন বিডিও-র বাড়িতে কোন অধিকাবে তারা বিডিও-র অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়েছে। জবাবে শ্রী রায়ের ওপর বেয়নেট চার্জ শুরু হয়। ঠিক এই সময়েই সুনীল বায় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেন। চোখেব সামনে দাদা ও স্ত্রীর ওপর এই ভয়াবহ অত্যাচার স্বভাবতই তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। ঘবের মধ্যে পড়ে থাকা কাঠ কাটার একটি কুড়ুল তুলে তিনি আক্রমণরত ইএফআর লোকেদের পাল্টা আক্রমণ করেন। তাঁর কুড়ুলের আঘাতে একজন ইএফআর-এর কনস্টেবল ঘটনাস্থলেই নিহত হন। সাথে সাথেই অন্য পুলিশ ও ইএফআর-রা সুনীলকে গুলি করে হত্যা করে।' অনিল রায়ের ওপরে ইএফআর কনস্টেবলের হত্যার মামলা চাপানো হয়েছিল। রণজয়কেও মিথ্যেভাবে এই মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়। 'লক্ষ্য করার বিষয়, কনস্টেবল হত্যার মামালায় দুজনকে মিথ্যাভাবে জড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সুনীল বায়কে হত্যার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না—যদিও জেলাশাসককে লিখিতভাবে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সুনীল রায়ের আত্মীয়স্বজনরা এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন।'

বসাক প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে লোকটা তার ওপর ওইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বসাক পড়ে গিয়েছিল আচমকা লোকটা লাফিয়ে পড়ায়। এবং বারান্দায় সাজানো টবের একটা বসাকের মাথায় লেগে ভেঙে যায়। ওরা দুজন কিছুক্ষণ ঝটাপটি করার পর চিৎ হয়ে পড়ে—বসাক

লোকটাব কাঁধ দুটো ধবে ওকে দূবে ছিটকে ফেলতে চেষ্টা কবছিল আব লোকটাব বাঁ হাতেব নখগুলো বসাকেব গলায বসে যাচ্ছিস। মুখ দিযে বোবা জানোযাবেব মতো শব্দ কবছিল দুজনেই। এইসময ডঃ মিত্রব কোনো বেযাবা বা অন্য কেউ দবজা খুলে বাইবে আসে। বেবিযে এই দৃশ্য দেখে লোকটা চিৎকাব কবে উঠেছিল আব গেটেব কাছে দুজন দাবোযানও শুনতে পেযেছিল। চিৎকাবেব ফলে বসাকেব আক্রমণকাবী একটু আলগা দিযেছিল। সেই সুযোগে বসাক তাকে উল্টে ফেলে তাব গলা টিপতে চেষ্টা কবে। এইসময বসাক হঠাৎ বুঝতে পেবেছিল যে তাব পেটে ধাবালো কিছু একটা ঢুকছে। জ্বালা কবছে। বসাক লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে লোকটাও উঠে দাঁডিযেছিল। হাতে তিনফলা নিডানি। বসাক দৌডে ঘবে এসে ঢুকেছিল। এবকম ভয সে কখনো পাযনি। ডঃ মিত্র, বসাকেব বউ, সেই মেযেটা, তাব স্বামী, স্বামীব বন্ধুবা দেখল পেটে বক্তমাখা বসাক ঘবেব কোণে টেবিল দিযে নিজেকে আডাল কবছে। বাঁ হাতে পেটটা চেপে ধবা। লম্বাটে, ছাঁটা কাঁচাপাকা হলদেটে চুল লোকটা বসাকেব দিকে এগোচ্ছে। হাতে বক্তমাখা নিডানি। খুব উঁচু গলায নয, অনেকটা নিচু গলায মন্ত্র বলাব মতো লোকটা বলে যাচ্ছে, 'নকশালবাডি লাল সেলাম, অমব শহীদ কমবেড চারু মজুমদাব লাল সেলাম শ্রীকামুলামেব অমব শহীদ লাল সেলাম।' ডঃ মিত্র চিৎকাব কবে উঠেছিলেন,

—'বণজয, কী কবছ কী?'

বণজয উত্তব দিযেছিল,

—'শ্রেণীশত্রুকে লিকুইডেট কবছি।'

বলে লাফিযে এগিযে গিযেছিল। দুজন দাবোযান আব ক্লিনিকেব অ্যাসিস্ট্যান্ট বণজযকে জাপটে ধবে ফেলাব আগেই হাত ঝটকা মেবে ছাডিযে নিযে বণজয নিডানিটা ছুঁডে মেবেছিল। সেটা বসাকেব কপালে লাগে। বসাক চিৎকাব কবে পডে অজ্ঞান হযে যায। ওবা বণজযকে বেঁধে ফেলেছিল। পুলিশ এসেছিল। মেখলাব কাছে খবব গিয়েছিল। কোবা তখন জামশেদপুবে গিযেছিল। কৌশিক তাব বন্ধুদেব নিয়ে এসেছিল। ট্রাঙ্ককলে খবব পেযে দামডাক্তাব এসেছিলেন। ভ্যানগাডি ভাডা কবে বণজযকে অ্যাসাইলামে ফিবিযে নিযে যাওযা হযেছিল। সঙ্গে গিযেছিল কৌশিক এবং ডঃ মিত্রেব একজন লোক। দূব থেকে ট্যাক্সিতে বসে দেখেছিল মেখলা। এটা পুলিশভ্যান ছিল না। বংটাও শাদা আব ছোট। গাডিতে ওঠবাব সময বণজয একবাব পেছন ফিবে তাকিযেছিল। মেখলা ভেবেছিল বণজয হযতো তাকে বা কোবাকে খুঁজছে। আসলে বণজয কাউকে খোঁজেনি। এমনিই তাকিয়েছিল। ফেবাব সময বণজযকে কিছু টাকা দিযেছিল কৌশিক।

বসাক এবপব এক সপ্তাহ নার্সিংহোমে ছিল। পেটেব ইনজিউবি এমন কিছু হযনি। নিডানিব ফলা ভেতবে খুব একটা ঢোকেনি। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপাবটা হল পেটে আব কাপালে কোঁচকানো দাগ হযে গেল আব আসল দাগটা হযে গেল মনে। খুব একটা স্পেসিফিকভাবে বণজয়কে মনেও কবতে পাবেনি বসাক। পবে মনে পডেছিল। আসলে ওই সময বসাক ঢক কবে বাম মেবে দিযে কাজে নামত—বণজয় নামটা তাব অবশ্যই জানা ছিল কিন্তু ঠিক কোন বাত্তে বা কখন ইন্টাবোগেশন হযেছিল, কী হযেছিল অত মনে ছিল না। তবে লোকটা তখন অনেকগুলো ইনজিউবি থেকে সেবে উঠছে। গায়ে ছ্যাঁকাবও দাগ ছিল। কোমবেব তলায় ব্যান্ডেজ ছিল। তখনও কাঁচা। তাই হাতেব ওপবে, মুখে গলায় বসাক এই ঘটনাব পবে বাইবে নেপালি দাবোয়ান বাখল। মান্না আব তাবক বলে দুটো বডিগার্ড বাখল। মান্নাকে দিযেছিলেন আনসাবি সাহেব। বলেছিলেন খুব তৈবি ছেলে। আব তাবক বসাকেবই লবিব ড্রাইভাব ছিল। ফবাক্কাব কাছে একটা ডাকাতিব সময় আচমকা জানা গিয়েছিল যে ড্রাইভাবিব মতো অন্য কিছু কাজও

তাবক ভালোই পাবে। ওকে নিয়ে নিল বসাক। মান্না ক্যারাটে জানে। যন্তবটন্তব চালাতেও জানে। তাবক অসম্ভব সাহস বাখে। ওদেব দুজনকে নিযে বসাক সব জাযগায় ঘোবাঘুবি কবে। বসাককে আবাব টালিগঞ্জেব ভগবতীবাবু বেয়াডা একটা গল্প বলে বেদম ভয ধবিযেছিল। এক শালা নকশাল নদে না কোথায় যেন সেলুনে কাজ কবত। সেখানে এক পুলিশ ইনস্পেক্টর নাকি তারই হাতে দাড়ি কামাতে এসেছিল। গালে সাবান-টাবান লাগিয়ে তো শান্তশিষ্ট হযে বসে আছে। আর এই নকশালের বাচ্চা ক্ষুরটা চামডায দুবাব এসপাব-ওসপাব করে হঠাৎ গোটা গলাটা! চাবটে কাবখানা, বেশ কয়েকটা গোডাউন আব কলকাতাব অন্তত গোটা দশেক বড ফ্ল্যাটবাডিতে বসাকেব সিকিউরিটি এজেন্সি পাহাবাদাবি কবে। লাইসেন্সড রিভলভাব বসাকের বরাববই ছিল কিন্তু বসাক চেম্বাবটা কাছে বাখত না। ওই ঘটনার পব থেকে কাছে বাখতে শুরু কবে। বসাক একটা মারুতি জিপসি করে ঘোবে। পাশে থাকে মান্না। চালায় তাবক। এবপর শহবেব আলো-আঁধাবিতে অনেকবাব বসাকেব ভুল হযেছে। এমন নির্ভুলভাবে সে রণজযকে নানা জাযগায দেখেছে যে যাচাই কবাব জন্যে ডঃ মিত্রকে ফোন কবেছে। ডঃ মিত্র বলেছেন যে তাঁর কাছে এরকম কোনো খবব নেই যে বণজয অ্যাসাইলাম থেকে পালিযেছে। বসাকেব সিকিউরিটি এজেন্সি কোবার ওপরেও নজর বাখে—যদিও সবসময নয়। ছোঁডাটা মোটেব ওপব হার্মলেস। তবে বসাক তাবপব থেকে সবসময তৈরি থাকতে চেষ্টা কবে। তৈরি থাকেও। তবে হিসেবটা বসাকেব গুলিয়ে যায। যা কবেছি, যখন করেছি তখন সেটা ছিল আমার ডিউটি। গভর্নমেন্ট যা চেযেছিল তাই কবেছি। হাত খুলে কবছি। মাবতে চেয়েছে, মেবেছি। ইন্টাবোগেশনেব সময কোনো গণ্ডি বেঁধে দেযনি যে মুখেব ওপবে ছ্যাঁকা দেওযা বা কাঁচা নখ উপডে নেওযা বা যা খুশি তাই কবা যাবে না। কিন্তু তাব জন্যে আজ যদি কেউ প্রতিশোধ নিতে তিনফলা নিডানি নিযে আড়ালে আবডালে ঘুবে বেডায? তাহলেও কিছু কবা যেত। কিন্তু পাগল? পাগলের বিরুদ্ধে মামলা চলে? আব লোকেই-বা শুনলে কী বলবে—শুনেছেন মশাই বসাক—হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবী বাযেব ডান হাত—সেই মাল নাকি এমনই ডরপুক হয়ে গেছে যে পকেটে চেম্বার আর দু'দুটো বডিগার্ড ছাডা কোথাও যায না। সামনে হযতো কিছু বলে না, কিন্তু অজান্তে হাসি-মশকবা কবতেই পাবে।

কিন্তু তিনবছর আগে তিনফলা নিড়ানি নিয়ে বণজয কি বসাককে খুন কবার জন্যে ডঃ মিত্রের চেম্বারের বারান্দায তিরিশ পাওয়ারেব আলোয় ঘাপটি মেবে বসেছিল? যে বণজয় তাব স্ত্রী, ছেলে কৌশিক কাউকে চিনতে পাবে না অর্থাৎ যেভাবে চিনলে ঠিক ঠিক চেনা সম্ভব সেটা পাবে না, সে বসাককে মনে বেখে দিয়েছিল যে বসাক অসংখ্য ইন্টারগেশনের মধ্যে চারটে বা পাঁচটা কয়েক ঘণ্টাব স্পেশাল সিটিঙে রণজয়েব সঙ্গে বসেছিল—এটা কি সম্ভব? আবার অসম্ভব নাও হতে পারে। ঠিক করে কী হয়েছিল সেটা জানার কোনো নির্ভুল উপায় কি আছে? ববং ডঃ মিত্রের চেম্বারে বণজয়ের যাওয়াব একটা যুক্তিসঙ্গত কাবণ খুঁজে পাওযা যায়। রণজয়েব অসুস্থতার প্রথম দিকে তাব চিকিৎসা ডঃ মিত্রের কাছেই শুরু হযেছিল। নিযমিত ওষুধে রণজয় ভালোই ছিল কিন্তু সেটা প্রথম দিকে। পরে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে ডঃ মিত্র তখন বললেন যে এ রোগীকে অ্যাসাইলামে না পাঠালে উপায় নেই। গোড়ার দিকে রণজয় মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠত বা বাথরুমে টপটপ করে জল পড়াব শব্দ শুনলে বিরক্ত হত। এরপর রণজয় প্রথমে দেওয়াল ঘেঁষে, তারপর ঘরের কোণে গিয়ে কুঁকড়ে বসতে শুরু কবল যাতে কোনোমতেই পেছন থেকে কেউ না আসতে পাবে। চুল কাটতে দিত না। দাড়ি কাটতে দিত না। নখ কাটতে দিত না। যাইহোক, এমন হতে পাবে যে রণজয় কলকাতায

এসে কিভাবে কেউ জানে না খুঁজে খুঁজে ডঃ মিত্রের চেম্বারে এসেছিল এবং সেইসময় বসাককে দেখে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বসাককে সস্ত্রীক ঢুকতে দেখে রণজয়ের হয়তো কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। ওইসময় রণজয়ের জীবনের ওই পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো অফিসার, জেলের ওয়ার্ডার, জেলার বা অন্য কেউ এলেও হয়তো একই ঘটনা ঘটত। তিনফলা নিড়ানি নিয়ে বসাককে আক্রমণ করার পরে পরে বা ফিরে গিয়ে কোথাও, কখনো রণজয় কিন্তু বসাকের নাম করেনি। জেল থেকে ফিরে মেখলা বা কৌশিকের সঙ্গে কত কথা বলেছিল রণজয়। কিন্তু বসাকের নাম কখনো কেউ শোনেনি। পশ্চিবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকাতে রণজয়ের অভিজ্ঞতার সামান্য এক অংশের কিছুটা বিবরণ রয়েছে। রণজয় বলেছিল, 'ঘরটার মধ্যে ঢোকাতেই সামনে যেকজন ইনস্‌পেক্টর, এসআই ছিল লাফিয়ে উঠল। জিজ্ঞাসাবাদের ধার দিয়েও গেল না। উলঙ্গ করে পেটাতে লাগল। তখন মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলছি। এমন সময় আরেকজন ইনস্‌পেক্টর কিংবা এসআই অশ্রাব্য গালাগালি করতে করতে আমার মুখে পেচ্ছাপ করতে এল। আর এতক্ষণ যাইহোক হজম করেছি, কিন্তু চোখের সামনে পুলিশ অফিসারের অণ্ডকোষ ঝুলতে দেখে আমার পেটের মধ্যে গোলাতে লাগল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ওরা দফায় দফায় আমাকে পিটিয়ে চলল।' রণজয় মনে করে খুব বেশি কিছু আর বলতে পারেনি কারণ তখন অসুস্থতার ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। ওই পুলিশ অফিসার কী বসাক? নাকি চোখের ওপরে মগজ শুকিয়ে ফুটিফাটা করে দেওয়া চড়া আলোর ওপার থেকে যে পুলিশ অফিসার রণজয়কে উদ্ভট প্রশ্ন করে কিছুটা কমিক আনন্দ দিয়েছিল সে-ই বসাক?

—'আচ্ছা, রণজয়বাবু, ইন্ডিয়া থেকে আপনাদের একটা ডেলিগেশন আলবানিযা যাওয়ার জন্যে ঠিক হয়েছিল। আলবানিয়ার প্রেসিডেন্ট এনভার হোজা-র সঙ্গে মিট করার জন্যে। আপনি এই ডেলিগেশনের একজন মেম্বার ছিলেন। বলুন, ঠিক না?'

—'আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল কনট্যাক্টগুলো আমরা জানার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, হল্যান্ডে আপনাদের লোক আছে না? না হলে কলকাতা থেকে অন্ধ্রে যাওয়ার রাস্তায় আপনাদের যে লিডার এনকাউন্টারে মারা যান, নামটা আপনি ভালো করেই জানেন—সে খবরটা কলকাতায় আমস্টার্ডাম থেকে কে পাঠিয়েছিল?

—'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে মারিঘেল্লার থিওরি আপনি জানেন? নিন, চা খান। আরে আপনার ব্র্যান্ড তো চারমিনার। দেখেছেন তো, আপনি আমাকে চেনেন না অথচ আপনার সব খবর আমরা রাখি। হিসট্রিতে এত ভালো রেজাল্ট আপনার, স্কুলে পড়াতে গেলেন কেন?'

প্রশ্নগুলো হাস্যকর বলে মনে হওয়ায় রণজয় উত্তর দেয়নি। একবার শুধু বলেছিল—'রিডিকিউলাস!'

সে কি বসাক ছিল? সম্ভবত নয়। আলোর পেছনে অন্ধকারে যে ছিল সে খচে গিয়ে বলেছিল,

—'রণজয়বাবু, কো-অপারেট করুন। বেঘোরে মরে লাভ কী? আর এই যে আপনারা দিনরাত মাও মাও করে এই খুনোখুনি করে চলেছেন সেই মাও, 'দা গ্রেট হেমসম্যান',—লোকটা মার্কসসিজমের ম-ও জানে না। আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেক্ট ফর মার্কসসিজম, বাট মাও—'পলিটিকাল পাওয়ার কামস্ আউট অফ দা ব্যারেল অফ আ গান'—ইউ কল দিস মার্কসসিজম!'

রণজয় হিংস্র আলোটার দিকে তাকিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল যে এই আলোটাই একচোখো প্রশ্নকর্তার চোখ। এটাও রণজয় জানত যে, এরপর আবার পেটানো শুরু হবে। হবেই। চা-টা শেষ করল রণজয়। সিগারেটটা একটা টান মেরে চায়ের কাপে ফেলে দিল। দরকারের সময়

যা পাওয়া যাবে না তা খেয়ে লাভ?

—'আমায় কিছু বলতে হবে?'

– 'বললে ভালো।'

—'হ্যাঁ, না বললে যে খারাপ সেটা আশা করি আপনিও জানেন। বললেও যে অন্য কিছু হবে না সেটাও আপনি জানেন। এবং এর পরে যা হবে সেটা জেনেই তো এসব চা, সিগারেট, মাও—তাই না?'

—'রণজয়বাবু।'

—'থামুন! ওই যে শেষ একটা সেনটেন্স বললেন না, ওতেই আপনার দৌড় আমি বুঝতে পেরেছি। অ্যামেরিকান মেরিন কোরের দুটো লোক মাও আর চে ট্রানশ্লেট করেছিল। সেই দুটো অনুবাদের অ্যান্থোলজিও আপনি কিন্তু পুরো পড়েননি। যাইহোক, ওই বইটাই পড়ে দেখলে আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।'

—'বলুন, রণজয়বাবু, শুনছি।'

—'শুধু একটা সময় জানলেই হবে। ১৯১৭ সাল। দুনিয়া কাঁপানো অক্টোবর বিপ্লবের বছর। মাও গ্র্যাজুয়েশন-এর পরে পিকিং ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর চাকরি পান। এই সময় লি তা চাও আর চেন তু শিউ যে মার্কসবাদী পাঠচক্রগুলো চালাচ্ছিলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন মাও। এখানে তিনি লেনিনের প্রবন্ধ, ট্রটস্কির ভাষণ এবং মার্কস ও এঙ্গেলস খুঁটিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে সাংহাই-তে যখন সিসিপি স্থাপিত হয় তখন মাও তাতে যোগ দেন। তখন তিনি গভীরভাবে মার্কসবাদ বিশ্বাসী। একজন আসল কমিউনিস্ট। আশা করি আপনার ভুল ধারণাগুলো পাল্টে নেবেন। অবশ্য না পাল্টালেও কিছু এসে যায় না।'

মেখলার দাদাই মেখলার সব। প্রায় বাবার মতো। ফার্ন রোডে একলাই ছিল মেখলা। অবশ্য পুরোনো কাজের লোক গৌরীদি আর ছোটবেলায় আসা গণেশ ছিল। মেখলার মা যখন ক্যানসারে মারা যান তখন মেখলা ক্লাস টেনে পড়ে। বাবাকে মেখলা কখনো দেখেনি। তারপর দাদাও তো চলে গেল। মাসীরাও একলা মেয়ের খোঁজ নিত না। নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও মিশতে দিত না। রণজয় অ্যাসাইলামে গেল। রণজয়ের বাবাও চলে গেলেন। মেখলা ছেলেকে নিয়ে আবার এসে ফার্ন রোডের বাড়িতে উঠল। তলায় ভাড়াটে। তারা নানারকম ঝামেলা করত। ভয় দেখাত। দাদা এলেন। এসে সবকিছু দেখেশুনে বললেন,

—'মেলা, আমি যা বুঝছি তাতে এই বাড়িতে তোর থাকা চলবে না।'

—'তাহলে আমি কোথায় থাকব দাদা?'

—'রাস্তার থাকবি। লাইক এ পেভমেন্ট ডুয়েলার। কলকাতায় কত লোক বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় থাকে। ঠাস করে একটা চড় মারব। ছেলে নিয়ে এই অসভ্য ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকতে হবে না। আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছি, সেখানে থাকবি। এই বাড়িটা প্লাস অল দা ইনেভিটেবল নস্টালজিয়া আমি বেচে দেব।'

এই সময় কোবা মামুর আনা একটি বিশাল, শাদা, মেরুভল্লুক সহ মামুর ওপরে লাফ দিয়ে উঠেছিল। মামু কোবাকে বুকে জড়িয়ে দুলতে থাকেন।

—'ব্যাং লাফানো ডোবা, মধ্যে বসে কোবা। মেলা, তুই ওই টিপিক্যাল কান্নাকাটিগুলো বন্ধ করবি? রিয়ালি, ইউ ওনলি ডিজার্ভ আ রিসাউন্ডিং স্ল্যাপ এবং ঢাকুরিয়া ফ্লাইওভারের তলায় আ ডুয়েলিং প্লেস। কি যেন বলে, দিল্লিতে খুব শুনলাম, ঝুগগি-ঝোপড়ি।'

মেখলা চোখ মুছে দাদার পাশে এসে বসে। দাদা কাঁদছে। সোনালি চশমাটা খুলে ফেলেছে।

—'মেলি' ডোন্ট বি আ সিলি গার্ল' আমি কাঁদছি কেন বল্ তো? আনন্দে। বাবাব কথা ভেবে। কোনো চিন্তা কববি না। বণজয হল একটা টাইটান। আমি ওব সব খবচ দেব। এটা আমাব প্রিভিলেজ। নতুন ফ্ল্যাটে তোব ফোন থাকবে। আমি খবব নেব। আব ওই ছেলেটা, কৌশিক' খুব ভালো ছেলে। মোট কথা, তুই কোনো কথা ভাববি না। তবে হ্যাঁ, আমাব ফবাসি বউ তাডিযে দিলে, ও অবশ্য তাডাবে না, আমাব একটা আনবিটেন ক্লেম বইল। বাবা নেই' মা নেই' তুই কি ভাবিস, তোব দাদা মবে গেছে?'

বণজযেব ধুতি আব পাঞ্জাবি পবা দাদা, মেখলাব সর্বস্ব যে দাদা, তিনি ডুকবে ডুকবে কাঁদেন। মেখলাও কাঁদে। মেঝেব ওপবে মেকভল্লুক চিৎ হযে পডে। তাব উল্টোনো চোখে ঘবেব ছাদ। অপবিচিত। কাবণ সে পশ্চিমেব আকাশ দেখে অভ্যস্ত। কোবা দাদাব কোলে মাকে মাথা বাখতে দেখে, লাফ দিযে নেমে, একটু দূব থেকে, মেকভল্লুককে কাছে টানতে টানতে বলে,

—'মামু, মাম্ মাম্ কি পাগল? গৌবী দিদি বলেছে বাবা পাগল। মাম মাম কি পাগল, মামু?'

ইস্কুলে না হলেও কলেজে প্রশ্নটা কোবাব কাছে ঘুবেফিবে এসেছিল। ক্যাথলিক স্কুলে কেউ খুব আগ্রহ নেযনি। পেবেন্ট টিচার্স মিটিঙে মেখলা যেত। কখনো মেখলা কৌশিক। ক্লাস নাইন-টেনে গণ্ডগোল শুক হয। একবাব স্কুলেব গেটে মামু এসেছিল। তাঁকেই সবাই ধবে নিল মিস্টাব মেখলা। তাহলে ওই ভদ্রলোকই বা কে? একবাব সাবা কলকাতা জুডে প্লাবন, ক্যামাক স্ট্রিটে ভাঙা, উপডোনো ক্যাকটাস ভাসছে। কৌশিকেব ফোন খাবাপ' পার্থ এসেছিল সবকাবি জিপ নিযে। পার্থই বা কে? এই প্রশ্নগুলো হাত ফেবৎ হযে কোবাব কাছেও এসেছিল। কোবা কলেজে। কোবা জযেন্ট দেযনি। কোবাবই কোনো অধ্যাপক, বিদেশি ডিগ্রিধাবী সদ্য এসেই,

—'অনির্বাণ তুমি বণজযেব ছেলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাবাকে তুমি চেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমাব বাবা কি বেঁচে আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমাদেব সঙ্গেই থাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

অথবা তাব বেশ কযেক মাস পবে,

—'অনির্বাণ, তুমি তো বণজযেব ছেলে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমবা একসঙ্গেই জেলে ছিলাম।'

—'ছিলেন?'

—'মানে?'

—'মানে একসঙ্গেই জেলে ছিলেন?'

—'তুমি কী আমাকে প্রশ্ন কবছ?'

—'না। আমি প্রশ্ন কবছি না। আপনি প্রশ্ন তুলছেন।'

—'অনির্বাণ?'

—'থামুন' আমিও কিছু কিছু খবব জানি।'

'অনির্বাণ।'

–'সাব। আমাব সঙ্গে একটা ডাযেবি আছে। ডাযেবি নয় নোটবুক। তাব থেকে কযেকটা নাম আপনি চিনতে পাববেন। অন্তত চেনাব কথা। প্রথমত আপনি একসঙ্গে ছিলেন না।'

– 'কোথায ছিলাম?'

– 'সেফ কোনো জাযগায। যখন আমাব বাবা সলিটাবি সেলে একলা মাথা ঠুকছিল। কোথায ছিলেন, মনে আছে? দমদম সেন্ট্রাল জেলে?'

- 'অনির্বাণ?'

– 'নাইনটিন সেভেন্টি ওযান, ফোর্টিনথ মে। কেষ্ট স্বপন, হেমন্ত, গোপাল, নবেন্দু, তপন, প্রণব, পার্থ, সুদীপ, বীবেন, সুজিত, শান্তি '

– 'অনির্বাণ।'

—'টেস্টেব বেজাল্ট নিযে আপনি আমাকে চমকাচ্ছেন, না?'

—'না, অনির্বাণ।'

– 'একটা নম্বব নিযেও আমাব যদি সন্দেহ হয তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে চমকাব।'

–'হাউ ডেযাব ইউ?'

'এই, গলা নামিযে কথা বলুন আপনি বাব বাব বাবাব কথা টেনে আনেন, কেন?'

'মানে বণজয, তুমি বণজযেব ছেলে

'থাক। প্রথমবাব আমি ঘাবডে গিযেছিলাম। হ্যা সবটা জেনেই আপনি ভাঁডামি কবেছেন। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে আমাব বাবা অ্যাসাইলামে। ভালোভাবেই জানেন যে আমি একা, হেলপলেস বাট ইউ আব বং। ইউনিযন কবি না কিন্তু আমাব এনাফ ক্লাউট বযেছে।'

'ভয দেখাচ্ছ, জান আমি কে?'

–'চুপ্। হ্যাঁ, ভয দেখাচ্ছি। একটা স্পাইকে ভয দেখাচ্ছি। এবপবে আব ভয দেখাব না। যেটা দবকাব সেটা কবব। ছিঃ। বাংলা বলে দিচ্ছি, শুনে নিন আমাকে টেস্টে খজবামি কবে ডিসঅ্যালাও কবলে আমিও আপনাকে ডিসঅ্যালাও কবে দেব।'

—'অনির্বাণ, তুমি আমাকে থ্রেট কবছ।'

–'হ্যাঁ, কবছি। এবপব অন্তত মুখে আব কবব না।'

–'জানো, আমি কী কবতে পাবি'

—'জানি। জেলে তো কবেই ছিলেন। এখন, আপনি আমাব ছিঁডবেন।'

—'অনির্বাণ।'

কোবা গটগট কবে বেবিযে এসেছিল। বণজযেব কাছে কৌশিক যে অনেক, অনেক কথা শুনেছিল কোবা সেগুলো কৌশিকেব কাছে শুনেছিল। দ্বিতীযত, গণতান্ত্রিক অধিকাব বক্ষা সমিতিব পুস্তিকাটি কৌশিক কোবাকে দিযেছিল। কোবা তাব বহু জাযগা মুখস্থ বলে যেতে পাবে। শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীব বায়চৌধুবী, মদন দাস, পার্থসাবথী ঘোষ ও প্রতীপ ঘোষেব মুণ্ডু-থ্যাৎলানো মৃতদেহেব বিববণ দিতে পাবে। বড, লাঠি, বুলেট, বেযনেট তবতাজা কযেকজন জোযানকে পিটিযে, থেঁৎলে, খুঁচিযে, চিবে কি বীভৎস চেহাবা কবে দিতে পাবে। পুস্তিকাতে ওই পাঁচজনেব ছবিই ছিল। মেদিনীপুব সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭০, ১৬ ডিসেম্বব। ৯ জনকে হত্যা কবা হয। ১৯৭১, ৪ ফেব্রুযাবি, ১ জন মাবা যায, ৫ জন আহত। বহবমপুব সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ২৪ ফেব্রুযাবি। ৯ জন মাবা যায—'নিহত একজন তরুণ বন্দীব (২৪) নাম তিমিবববণ সিংহ বলে জানা গেছে। এঁব বাড়ি কলকাতায ছিল। ইনি যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযের স্নাতকোত্তব শ্রেণীব (বাংলা) একজন

ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই গল্প, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ও মানবদরদী একজন তরুণ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ঘটেছিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে জানা গেছে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিমির সিপিআই (এমএল) দলে যোগ দেন এবং আবামপ্রদ জীবন ও ব্যক্তিগত উন্নতির পথ পরিত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদেব মধ্যে চলে যান। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর আত্মীয়দেব কাছ থেকে জানা যায় যে, লাঠিব আঘাতে তাঁর দেহ রক্তমাংসের এমন একটি পিণ্ডে পরিণত হয় যে তাঁর শবদেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। চোখদুটিও তাদের স্বস্থান থেকে উপরে উঠে এসেছিল। শবদেহের এই বীভৎস মূর্তির জন্য আত্মীয়রা তাঁর মাকে সন্তানের মৃতদেহ দেখতে দেননি। কড়া পুলিশ প্রহবায় তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়। ১৯৭২, ২০ ফেব্রুয়ারি। একজন নিহত, ৯ জন আহত—'একবছর আগে বহরমপুর জেলে নিহত তাঁদের সহকর্মীদের স্মরণে বন্দীদের সভা করাব প্রস্তুতিতে কারারক্ষীরা বাধা দেবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষটি ঘটে। দমদম সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ১৪ মে। ১৫ জন নিহত ও ৭৩ জন আহত—'জেলের রক্তপিপাসুরা জেলারের প্ররোচনায় পরিস্থিতিটাকে তাদের একটা উৎসবে পরিণত করল।...এটা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য নয়, হত্যার জন্য। একে একে তরুণেরা লুটিয়ে পড়তে শুরু করল। তাদের রক্তে মাটি ভিজে উঠল। কিন্তু তাদের জ্ঞানহীন শরীরের উপরই পেটান চলতে লাগল। কেউ কেউ সাথে সাথেই মারা গেল। অন্যেরা মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।...হাওড়া জেল, সিউড়ি জেল, আলিপুব স্পেশাল জেল, আসানসোল স্পেশাল জেল, আলিপুব সেন্ট্রাল জেল, হুগলি জেল, বর্ধমান জেল, বহরমপুব স্পেশাল জেল, বাঁকিপুর সেন্ট্রাল জেল, হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেল, ভাগলপুর স্পেশাল সেন্ট্রাল জেল, গয়া সেন্ট্রাল জেল...টেস্টে কোবা সেকেন্ড হয়েছিল।'

—'কৌশিক, এই বইগুলো তোমার কাছে আপাতত থাক। আমার এই অসুবিধেগুলো যখন থাকবে না তখন...মানে আমার তো এইভাবে শুয়ে বসে থাকলে চলবে না এত কাজ বাকি অথচ কি যে হল...কৌশিক, একবার দেখে এসো তো দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে শুনছে কিনা—আমি দেখলাম একটা শ্যাডো সরে গেল—ওঃ আচ্ছা কৌশিক, এই ওষুধগুলো কেন দেয় তুমি জান? অবশ্য তুমিই-বা কিভাবে জানবে। তোমার জানার কথা নয়। কেউ ছিল দরজার বাইরে? ছিল। তুমি যেতে সরে গেছে। আবার আসবে। কৌশিক, তুমি কিন্তু বইগুলো ভালো করে রেখ। অনেক কষ্ট করে জোগাড় করা। র‍্যালফ ফক্সের 'কমিউনিজম' তোমায় দিয়েছি, না? আই বট ইট ইন এলাহাবাদ। চকের কাছে—একটা লোক ডাঁই করে গোটা চল্লিশেক কপি নিয়ে বসেছিল। আট আনা করে। কিতাবিস্তানের বই। চারটে কপি কিনে এনেছিলাম। কোন ইয়ারে বলো তো? র‍্যালফ ফক্স, ডেভিড গেস্ট, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড—কৌশিক স্পেনের খবর কী তুমি জান? বার্সিলোনা বম্বড্ হচ্ছে? ওই তো আবার এসেছে। শ্যাডো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে কৌশিক। বইগুলো ভালো করে রাখবে। আমার লাগবে, মেলার লাগবে, তোমার লাগবে, বড় হলে কোবার লাগবে। কে আসছে। কে? কৌশিক, মেলা, তোমরা সরে যাও, কোবাকে সরিয়ে নাও, ওরা কাউকে স্পেয়ার করবে না।'

রণজয় দাঁড়িয়ে উঠে চোখ বন্ধ করে—হাত দুটো মুঠো করে বলে গিয়েছিল,

—'দ্যাখো, আকাশের উত্তোলিত হাতে সূর্যের গ্রেনেড
বিকেলের শেষে, রক্ত ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে
পশ্চিমে মুক্তিযোদ্ধারা
অন্ধকার পাহাড়ে চলে যাচ্ছে

ওই দ্যাখো, সকালের পূব
জ্বলে যাচ্ছে নিশানেব লালে
বিপ্লবের মৃত্যু হয না জিভ কেটে নিলে
বা ফাঁসিতে ঝোলালে।'

বণজয়ের বাবা ঘবে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বণজযকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

—'রন্টু মাই সান, মাই ব্রেভ সান। এট্টু থিব হও বাবা। আমি, আমি তো আছি।'

—'বাবা, আপনি?'

—'আমিই তো। আস, আস বাবা। বস।'

—'হ্যাঁ, বাবা, বাবা, আমাব না, আমাব মাথা ঝিম ঝিম কবছে। বাবা, ওরা না, ওবা আমায় ভীষণ মেরেছে। জানো...'

—'কে আমাব রন্টুরে মাবে, আসুক দেখি। আমি জিন্দা থাকতে কেউ আর তর কেশাগ্র স্পর্শ কবব না। বউমা, আমি বন্টুবে দেখতাছি, কোনো চিন্তা নাই, আমি থাকতে কোনো চিন্তা কববা না। তুমি এট্টু শোও দেখি বাবা। কোনো চিন্তা নাই। এই তো আমি বাবা!'

বণজয শুযে পড়েছিল। বণজয়েব বাবা ওব বুকে, মুখে, মাথায হাত বুলিয়ে দেন। ঘরের কোণে কৌশিক ডুকবে ডুকবে উঠে আসা কান্না গেলে। বণজয বলতে থাকে

—'বাবা, তুমি যখন জেলে আসতে, ওবা কথা বলতে দিত না। তুমি কতদূব থেকে আসতে, ওবা কযেক মিনিট পবেই আমাকে টানতে টানতে নিযে যেত। খুব খাবাপ লাগত আমাব। বাবা, তুমি কেমন আছ?'

—'আমি, আমি তো ভালো আছি। দিব্য আছি।'

—'তোমাব চশমাব ওই কাচটা ঘষা কেন বাবা? বাঁ চোখ তো। বাঁ চোখে তুমি দেখতে পাও না?'

ছানি কাটানোব ফ্রি আই ক্যাম্পে অপাবেশন করানোব পব বাঁ চোখটা বণজয়েব বাবাব নষ্ট হযে যায।

—'হাই পাওয়ার তো। তাই অমন কাচ। দ্যাখা, পডা, সব পারি। বউমা, আমারে এক গ্লাস জল দিবা?'

—'বাবা, তোমাকে পুলিশ আর ভয় দেখায়?'

—'কে পুলিশ? তুই চল্! কেউ তব ত্রিসীমানায় আইব না। পুলিশ, পুলিশরা সব ভয় পাইয়া পলাইছে।'

—'বাবা, মা-র সেই পায়ের ছাপ দেওযা ছবিটা?'

—'আছে!'

—'গাছগুলো!' রণজয়ের ঘুম পাচ্ছে।

—'গাছ মানে সেই পেয়ারা গাছ তো। আছে। বহালতবিয়তে। খুব পেয়ারা হয়। ছাওয়ালপাল আসে। সক্কলে খায়। বড় পয়মন্ত গাছ।'

—'বাবা!'

—'কও!'

—'বাবা!'

—'কও বাবা, আমি শুনতাছি!'

রণজয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

৫

৪ ১১ ৯৪ রাত

ট্যানারির চামড়ার গন্ধ এখানকার আকাশে বাতাসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সয়ে গেছে বলে তারা আর গন্ধটা পায় না। এতক্ষণ ধরে সোজা যে রাস্তাটা এসেছে তার আশেপাশে ছিল হয় ভেড়ি, নোংরার গাদা আর তরকারির খেত। প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চলে। দূর থেকে সাইরেনটা শুনে রণজয় একবার রাস্তার ধারে নেমে গিয়েছিল। সামনে এটা বড় পুলিশের গাড়ি। জিপ পরপর দুটো। মধ্যে কয়েকটা শাদা গাড়ি। পেছনে আবার পুলিশের গাড়ি। সাইরেনটা বাজছে। লাল আলো জ্বলছে-নিভছে। দেখলে মনে হবে লাল, শাদা, কালো—কয়েকটা গাড়ির রেস হচ্ছে। দঙ্গলটা চলে যাবার পরে পরেই রণজয় রাস্তায় উঠে এল। দঙ্গলটা তেড়ে আসার জন্যে যে লরি আর বাসগুলো রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল এবার তাদের যাওয়ার পালা। বড় বড় গাড়িগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে থতমত বাতাস রণজয়কে ধাক্কা মারে। বাতাসটা একটু ঠাণ্ডা এই সকালের দিককায়। ট্যানারির বিরাট উঁচু দেওয়াল ঘেঁষে রাস্তার ধারে চায়ের দোকান। দেওয়ালটা দেখতে অনেকটা জেলের দেওয়ালের মতোই। রণজয় বেঞ্চির এক কোণে বসে চা খেল আর দুটো নোনতা বিস্কুট। বিড়ি ধরাল। তারপর পকেট থেকে হলদেটে দোমড়ানো ভাঁজে ভাঁজে ছেঁড়া দাগ লাগা আজকের খবরের কাগজটা বের করে বিড়বিড় করে পড়তে থাকল,

—'সাতই নভেম্বর মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিন সৌধের মঞ্চ থেকে কমরেড স্তালিন ফ্রন্টের দিকে আগুয়ান লাল ফৌজের সৈন্যদের এক ভাষণে বলেছেন যে, পবিত্র রাশিয়াকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে!'

—'৩১ অক্টোবর জার্মান বিমানবাহিনী পঁয়তাল্লিশ বার মস্কোর উপরে বোমাবর্ষণ করে। ২৫ অক্টোবর মস্কো ফ্রন্টে প্রবল তুষারপাত। ২৯ অক্টোবর নাৎসি জেনারেল ভাগনার বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত যে মস্কো শীঘ্রই খতম, হবে।' ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯—'চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর করুন'—চারু মজুমদার। ১৭ নভেম্বর ভলোকোলামস্কের কাছে ট্যাংক-বিরোধী গোলন্দাজ এফিম দিসকিন মারাত্মক আহত হয়েও পাঁচটি জার্মান ট্যাংক ধ্বংস করে দেন। ৬ নভেম্বর বলশেভিক মহাবিপ্লবের চব্বিশতম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কমরেড স্তালিন মস্কোর পার্টি কর্মীদের বলেছেন জার্মান সেনারা হল, 'জন্তুর নীতিবোধওয়ালা মানুষ।...ওরা যদি নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ চায় তাহলে সেই যুদ্ধই তাদের দেওয়া হবে।' আজ ভারতের প্রতিটি কোণ অগ্নিগর্ভ থাকায় শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র লড়াই শুধু শ্রীকাকুলামেই আটকে থাকতে পারে না। খোকনের (অসীম চট্টোপাধ্যায়) ১১ মে তারিখের চিঠির জবাব...জেলের হত্যাকাণ্ডের বদলা নাও.. মাগুরজানে রাইফেল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গড়ার কাজ শুরু হয়েছে...চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড লিন পিয়াওে চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন...'

রণজয় উঠে হাঁটতে থাকে। ২৩ নভেম্বর জার্মান বাহিনী ইসত্রা গ্রামে পৌঁছেছে। ইসা থেকে মস্কোর দূরত্ব তিরিশ মাইল। লেনিনগ্রাদে নভেম্বরে ১১ হাজার নাগরিক খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। আকুলোভো গ্রামে, মস্কো-মোঝাইক হাইওয়ের ৬ মাইল দক্ষিণে জার্মান সৈন্যরা দূরে ক্রেমলিনের চূড়া দেখতে পাচ্ছে। রণজয় হাঁটছে তো হাঁটছেই। কোথায় যেন সেই জড়ানো মৃতদেহের মতো অস্ত্রসম্ভার? কোথায়? একটা গাড়ি প্রায় রণজয়কে ঘেঁষে চলে গেল। ড্রাইভার খিস্তি করল। শুনতে পেয়েছিল রণজয়। রণজয় চিৎকার করে দূরে মিলিয়ে যাওয়া গাড়িটার

দিকে কথাগুলো নিক্ষেপ করে--

'ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে।'

কোবা সকালে কোথায় যেন বেরিয়েছিল। তখন বেলা দশটা হবে। মেখলা মাথায় স্যাম্পু ঘষছিল। ফেনায় মুখচোখ ঢাকা। মেখলা সাবধানে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে স্নান করে। মেখলা শুনেছিল ফোনটা অনেকবার বেজে থেমে গেল। পিংকি ঘেউ ঘেউ করল। স্নান করে, হাউসকোট পরে বেরিয়ে এল মেখলা। পার্থকে বোঝে না মেখলা। একসময় রণজয়ের বন্ধু ছিল। অবশ্য গা বাঁচিয়েই। এখানে এসে বসে বসে ওই বিচ্ছিরি গন্ধের মদ খাবে, একটার পর একটা সিগারেট খাবে আর কী সব যে বলে মেখলা সবটা বোঝেও না। খলিল জিবরান, কলিন উইলসন, অ্যাডভেঞ্চারের বই, থ্রিলার আবার সেই সঙ্গেই জয়ের কবিতা, সিলভিয়া প্ল্যাথ, কমলকুমার--মেখলার মনে হয় পার্থ এইসব কথাগুলো হয় তার বউকে বলে না, বলতে পারে না বা কেনই যে বলে—পার্থর মুখটা কেমন পাঁউরুটি-পাউরুটি, অসহ্য গরমে নিয়মিত সিন্থেটিক কাপড়ের বুশশার্ট পরে—এলেই বলে—সে কি মেলা, তোমরা কেবল নাওনি। জিটিভি, সিএনএন বিবিসি-তে একটা ফিল্ম দেখলাম—অন বুখারিন—স্তালিন ওয়াজ আ ব্লাডসাকার—রণজয়ের কনভিকশনকে আমি অনার করি, কিন্তু—যাইহোক মেলা, চলো দুদিন আমরা কোথাও ঘুরে আসি-- তুমি তালসারি গেছ?

আবার ফোন বাজল। পিংকি ডাকল। মেখলা গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো।'

–'হ্যাঁ, হ্যালো। আচ্ছা, মিসেস সেনগুপ্ত আছেন? খুব শব্দ হচ্ছে ফোনে '

--'কথা বলছি।'

-'কিছু শোনা যাচ্ছে না। মিসেস সেনগুপ্ত আছেন?'

--'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

—'আমি ডক্টর দাম। নিউ লাইট হোম-এর ডক্টর দাম।'

–'হ্যাঁ, বলুন। আমি মেখলা বলছি। রণজয় কেমন আছে?'

—'হ্যাঁ, খুব শব্দ। আমি ডঃ মিত্রের চেম্বার থেকে বলছি। রণজয়কে দুই তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছেন?'

পিংকি ঘেউ ঘেউ করছে। তলায় বাচ্চারা খেলা করছে। বাড়িটা নেগেটিভ ছবি, আবার ছবি।

--'শুনুন। রণজয় কলকাতা এসেছে। গতকাল। আজ আমি এসেছি। আমি গিয়ে সব বলব! আজকেই যাব।'

ফোনটা কেটে গিয়ে হঠাৎ একটা মেয়ের গলা এল, সার্ভিস টু দা কলড্ নাম্বার হ্যাজ বিন টেমপোরারিলি উইথড্রন. .সার্ভিস টু দা কলড্ নাম্বার...

মেখলা ফোনটা রেখে বারান্দায় গেল। বাইরে দেখল। তলায় গেটের কাছে ইস্ত্রিওয়ালা ইস্ত্রি করছে। রোজ যেমন হয়। গাড়ি ঢুকছে। বেরোচ্ছে। রণজয় কলকাতায় এসেছে। কোথায়? রণজয় কি বসাককে মারতে যাবে? কিন্তু কোবা কোথায় গেল আজ? কোবা জানলেই-বা কী হবে? পার্থ সরকারী অফিসিয়াল। পার্থ কিছু করবে? কৌশিক! কৌশিক ছাড়া কে এখন মেখলাকে দেখবে? মেখলা কৌশিককে ফোন করল। ধরল জয়িতা।

—'কে? মেলা বউদি?'

—'হ্যাঁ। তুমি একটু কৌশিককে দেবে?'

—'কুশ তো বাথরুমে। ওকে বলছি বেরিয়ে তোমাকে ফোন করতে।'

—'হ্যাঁ, বেরিয়েই যেন করে। আমি রাখছি জয়িতা।'

—'তোমরা ভালো তো, কোবা, পিংকি?'

—'সবাই ভালো। রাখছি।'

মেখলা ঘুরে গিয়ে সেই ছবিটার সামনে এল। মেখলা কাঁদছে

—'তোমার কথা সবসময় অন্যরা বলে, তুমি বলো না কেন?'

হোপে—চাহার—শানসি এলাকার উ তাই শান জেলা এলাকার সীমান্ত বরাবর এইটথ রুট আর্মি গেরিলা তৎপরতার এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে...

সেনাবাহিনী সরে যাওয়ার পরেও সাংহাই উসাং এলাকার গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে...গেরিলারা তিউং পিউ-এর রেলপথ এবং পিং শিং গিরিবর্ত ও ইয়াং ফাং কু-এর মোটরযান চলাচলের রাস্তা ধ্বংস করে দিয়েছে...প্রত্যেকটি গেরিলা ব্যাটালিয়নের থাকবে ৩০৬টা রাইফেল, ৪৩টা পিস্তল, মেশিনগানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়...গেরিলা রেজিমেন্টের থাকবে ১৮৯টা পিস্তল ও ৯৫৪টা রাইফেল..

একটা অটো পাশে গতি ধীর করে। চোয়াড়ে চেহারার চালক দাঁতে একটা ফিল্টার সিগারেট কামড়ে।

—'বস্, চলোগে।'

রণজয় উত্তর দিলনা।

—'সরি বস্। টা টা। কালি কালি আঁখে.' সরস, যুবক অটোওয়ালা চলে যায়। একটা দানব একটা টায়ার তুলে ধরেছে—এমআরএফ-এর বিশাল হোর্ডিংটার দিকে তাকায় রণজয়। গিট্ গিট্ গিট্ গিট্ শব্দ করে একটা হেলিকপ্টার উড়ছে। রণজয় আকাশের দিকে তাকায়। হেলিকপ্টার।

—'সাইগন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে তিন দিয়া গ্রামে একের পর এক মার্কিন হেলিকপ্টার নামছে। নামছে না। নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে মেশিনগান চালিয়ে। প্রেসিডেন্ট জনসন হাসছেন। রবার্ট ম্যাকনামার হাসি। সর্বাঙ্গ নাপামে পুড়ে যাওয়া একটি শিশু। নগুয়েন ভ্যানত্রয়! হ্যাঁ, আমার জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এইটাই যে আমি ম্যাকনামারকে হত্যা করতে পারিনি।'

রণজয় হাঁটতে থাকে। তার পায়ে লেগে ফ্রুটির খালি স্ট্র ভরা বাক্স, পানপরাগের প্যাকেট, শাদা হয়ে যাওয়া নিঃশেষিত মশা তাড়ানোর ম্যাট, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ছেঁড়া খবরের কাগজ ছিটকে যায়। এতসব জিনিস কী তা রণজয় জানে না। ট্যাক্সি থেকে কেউ হাত নাড়ল?

—'কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, সমর্থক ও তাদের পরিবারবর্গকে হাজারে হাজারে হত্যা করা হচ্ছে। দূরের জেলাগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদের মহড়ার পর সামরিক ইউনিটগুলি হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হত্যা করছে। পারাং নামে চওড়া ফলার ছোরাতে সজ্জিত হয়ে উগ্র মুসলিমদের দল রাতে কমিউনিস্টদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে—নির্বিচারে সকলকে খুন করেছে এবং মাটি অল্প খুঁড়ে পুঁতে ফেলছে। পূর্ব জাভার গ্রামাঞ্চলে এই হত্যাভিযান এত নৃশংস হয়ে উঠেছে যে তীক্ষ্ণ বাঁশের ওপরে কমিউনিস্টদের মাথা গেঁথে গ্রামে গ্রামে দেখানো হচ্ছে। এত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যে, পূর্ব জাভা ও উত্তর সুমাত্রায় মৃতদেহ পচনের দুর্গন্ধ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সব অঞ্চলের খবরে জানা যায় যে, ছোট ছোট নদী এবং খাল অসংখ্য মৃতদেহতে আটকে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় জলপথে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

কোবার বেল বাজল। খুব কম সময়ের জন্যে, কিন্তু যারা শোনে তারা জানে আড়াইবার।

ধোপা, সুইপার, পার্থ বা অন্য কারো বেল বাজলে পিংকি ঘেউ ঘেউ করবে। শুধু কোবার বেল বাজলে কুঁই কুঁই করবে। কৌশিক অত্যন্ত অসভ্য। সে কদাপি বেল বাজায় না। হয় নীচ থেকে উৎকট হর্ন বাজায় বা দরজা ধাক্কায়। মেখলা দরজা খুলতেই কোবা ঢুকল। হাতে একগাদা বই, ক্যাসেট।

—'কোবা!'

—'কী হয়েছে মা!'

—'কোবা।'

—'কী হয়েছে বলবে তো।'

—'এইমাত্র ডক্টর দাম ফোন করেছিলেন। তোর বাবা মিসিং। উনি বললেন সে কলকাতাতেই এসেছে। এখন আমি..'

কোবা দেখল মেখলা ঘামছে। মুখটা একটু ফাঁক। ঠোঁট কাঁপছে।

—'আমি তোমাকে প্রথমে যেটা বলব সেটা হল প্যানিকি হয়ো না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু হতে একবার শুরু করলে দেয়ার ইজ নো এন্ড টু ইট—স্টেডি হও। কৌশিককাকুকে ফোন করেছিলে?'

কোবার কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। মেখলা বলল,

—'কৌশিকেরই ফোন।'

—'দাঁড়াও, আমি ধরছি।'

কোবা ফোন ধরল,

—'হ্যাঁ, আমি। আচ্ছা শোনো বাবা অ্যাসাইলাম থেকে, হ্যাঁ, সেই যে ডক্টর দাম, মাকে ফোন করেছিলেন এক্ষুনি। শুনে মা-র কি অবস্থা বুঝতেই পারছ। কথা বলবে, মা ধরো।'

—'বল্ কৌশিক..'

—'শোনো, একদম নার্ভাস হবে না। ও আমি ঠিক খুঁজে বের করব, দেখে নিও। যাইহোক, চিন্তা করবে না। এনিটাইম আমি যাব। ঠিক আছে? এখন রাখছি কারণ স্ট্র্যাটেজিটা একটু ভেবে নিতে হবে। আর শোনো, ওই বসাক লোকটা খবর পেলে যোগাযোগ করতে পারে। প্যানিক তো ওর হবার কথা..'

—'আমার ভীষণ ভয় করছে, কৌশিক। রণজয় যদি ফের কিছু করে বসে..'

—'ও তুমি ভেব না বলছি না। ও খবরটা পেলে দশটা তালা মেরে খাটের তলায় ঢুকে যাবে। মোর ওভার রণজায়দা ওর বাড়ি চেনে না, হোয়্যার অ্যাবাউট্‌স্ জানে না। সেবার বাইচান্স সামনে পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক যে কথাগুলো বললাম শুনো। রাখছি।'

বসাককে খবরটা দিয়েছিলেন ডঃ মিত্র। নিজের ভয়েই। বসাককে কৌশিকও ফোন করল।

—'খবরটা আমি পেয়েছি।'

—'পেয়েছেন? ভালো। মনে হল জানিয়ে দেওয়া দরকার, জানালাম।'

—'সে ভালো। আমি প্রিকশান যা নেবার নিচ্ছি। তবে এবার কিছু হলে—'

—'মানে?'

—'মানে যা বোঝার বুঝে নিন। আপনারা এডুকেটেড লোক...পাগল-ফাগল যাইহোক আমাকে তো নিজেকে ডিফেন্ড করতে হবে..'

—'সে তো হবেই। রণজয়দার খবর পেলে আপনাকে জানিয়ে দেব...'

—'আপনারা কী সব ফালতু অ্যাসাইলামে রাখেন বলুন তো, বার বার পালায় কী করে?'

—'সে কী মশাই, এত খবর রাখেন আর এইটা জানেন না?'

—'কী?'

—'অনেক খুঁজে এই অ্যাসাইলামটা আমি ঠিক করেছিলাম, এই কারণেই.'

—'কী কারণে?'

—'যাতে দুদিন অন্তর অন্তর পালিয়ে আপনাকে খুঁজতে পারে।'

—'ইয়ার্কি দিচ্ছেন? জানেন আমি কে?'

—'জানি, হরিদাস পাল।'

কৌশিক ফোনটা রেখে দিল। আবার মেখলাকে ফোন করল।

—'শোনো, বসাক খবর পেয়েছিল। আমিও বলে দিয়েছি। তোমাকে জানিয়ে দিলাম।'

—'এখন কী হবে, কৌশিক?'

—'ওফ্, বলছি তো কিছু হবে না। সবটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

—'আচ্ছা।'

বসাক মান্না আর তারককে ডেকে রণজয়ের একটা মোটের ওপর বর্ণনা দিল। বাড়ির আশপাশে ওরকম চেহারার লোক দেখা যাচ্ছে কিনা, পেলে কী করতে হবে, আবার ভুলচুকে বেশি কিছু না হয়ে যায়, এইসব। ওরা সব শুনেটুনে ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল কিন্তু বসাক ফের ওদের ডাকল।

—'আরো শোন্, বোগাপটকা দেখতে কিন্তু পাগল তো। রেগে গেলে ওদের গায়ের অসুরের মতো শক্তি আসে। যা কিছু করতে হবে সাবধানে। আর আমার বাইরের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল। শুধু কাল রাতে গ্র্যান্ডের উল্টোদিকে যাব—একটা দরকারি মিটিং আছে। যা।'

বসাক জানলা দিয়ে নীচে দেখল। স্বাভাবিক রাস্তাঘাট। কাগজ বিক্রিওয়ালা ওপর দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার থেকে চশমা পরা একটা মোটা লোক নেমে উল্টোদিকের বাড়িতে ঢুকে গেল। পানের দোকানের পাশে, রকে, পাড়ার ছেলেদের ভিড়। পালালি পালালি, আবার মরতে কলকাতায় আসা কেন রে বাবা! তারপর ওই কৌশিক নামে ছেলেটা—ঠিক সময় যদি হাতে পেতুম তাহলে একেবারে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিতুম। সেদিক দিয়ে হাত-পা বাঁধা। তবে সেবারেই দেখেছিল বসাক—বেশ কিছু ইয়ং আইপিএস অফিসার ওর বন্ধু। হত সেই টাইম...আফশোস হয় বসাকের। জামানা অনেক পালটে গেছে। আর তাছাড়া বসাকের বিজনেসগুলোও তো ক্লিন নয়। কানাঘুসো রয়েছে। এক্স-কলিগরা হিংসে করে। লবি নিয়ে ঝামেলা তো লেগেই আছে। তিন-তিনটে জমি কিনেছিল—সেখানে লোকাল লোকেরা প্রোমোটারদের বাড়ি করতে দেবে না। শালা সিপিএম-এর আইনও বসাকের বিরুদ্ধে। একের পর এক ফ্যাচাং। তার মধ্যে শালা, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, পাগলার ভয়। পাগলরা যে কেন সুইসাইড করে না। আরে বাবা, গাড়ি চাপা পড়লেও তো পারে, বাঁচা যায়। আর লোকে শুনলেই-বা কী বলবে—বসাক, যার নামে কত লোক মুতে ফেলত, সে কিনা পুরো শুড়চা হয়ে গেছে। পাগলটার আবার বউ, ছেলে রয়েছে। শালা নাকি ওদের চিনতে পারে না। ওদের চিনতে পারে না, তা আমাকে কী করে চিনতে গেলে বাবা! না চিনলে চলছিল না? তাও ভালো ছুরি-টুরি কিছু জোটাতে পারেনি। বা ভোজালি, কাতান, ক্ষুর বা সোর্ড। ক্ষুরের কথায় আবার সেই বিচ্ছিরি গলা নামিয়ে দেওয়ার অস্বস্তিকর গল্পটা মনে পড়ে গেল। গল্পটা নির্ঘাৎ ঢপ। কিন্তু থেকে থেকে মনে পড়ে যায়। চামড়ার ফিতেয় চকাচক ঘষছে আর ওদিকে গালে সাবান মেখে আয়নার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, জানে না যে ক্ষুর কেন ধার দেওয়া হচ্ছে।

কোনোমতে পাগলটা যদি একটা ফায়ার আর্ম পেয়ে যায়। ধরা যাক, কারো কাছ থেকে কেড়ে নিল। কেনার পয়সা ওর কাছে থাকার কথা নয়। কিন্তু যদি ফাঁকতালে পেয়ে যায়?

'বেলেঘাটার পুলিশবাহিনী আবার পাঁচটি তরুণকে ধরে গুলি করে হত্যা করেছে। সরকার আজ এই নীতিই গ্রহণ করেছে সমস্ত ক্ষেত্রে ও সমস্ত জায়গায়। তারা গুলি করেই বিপ্লবীদের হত্যা করবে। হত্যার বদলা একমাত্র হত্যার দ্বারাই সম্ভবপর। আজকে জনসাধারণকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সরকার। তাই জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে হত্যা দিয়ে এই হত্যার বদলা নেওয়া রাইফেল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে মাণ্ডরজান থেকে এবং ঘটেছে অনেক জায়গায়, এমনকি বেহালাতেও। এ অভিযান আমাদের রাজনৈতিক অভিযান, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।'

পড়ন্ত বিকেলে রণজয় যখন যাদবপুর লেভেল ক্রসিং পার হল তখন দুপাশে গেট পড়ে গেছে। রণজয় যখন হেঁটে এগোচ্ছিল তখন দুপাশ দিয়েই ট্রেন আসছিল। লোকজন চেঁচিয়ে উঠেছিল। রণজয় দুটো ট্রেনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চিৎকার, লোকের—ট্রেন থেকে কে যেন কী বলে চেঁচাল. খিস্তি করল। দুটো ট্রেন চলে যেতে রণজয় এগোচ্ছে দেখে,

'কী হল দাদা, সুইসাইড হল না। আবার ট্রাই করুন।'

'বেশি সাহস।'

'ছাড়ুন তো, দেখে বুঝতে পারছেন না? মাথার ঠিক আছে যে দেখে চলবে।'

ওপারে গিয়ে রণজয় সোজা হাটছিল। আলো কমছে পাশের দোকানে হঠাৎ দেখল ঘুগনি, রুটি। খাবারের গন্ধ। কিন্তু এমন সময় খাওয়ার পেছনে নষ্ট করা যায় না। রণজয় পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বের করল। পা চালাতে হবে। সামনে অনেক কাজ। মাটি খুঁড়তে হবে। তক্তা সরাতে হবে। মরা মানুষের মতো জড়ানো অস্ত্রগুলোকে বের করতে হবে। সেগুলো নিয়ে ফিরে যেতে হবে। কতদিন তুমি বাইরে আছ রণজয়? কতদিন? এর মধ্যে ছোট্ট কোরা স্কুল থেকে রিকশাভ্যানে বাড়ি ফিরে মেঝের ওপরে ভিজে পায়ের দাগ ফেলে ফেলে হেঁটেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করে রণজয়ের। কয়েক লহমার জন্যে। হঠাৎ দৃশ্যমান সন্ধ্যা. সন্ধ্যার আলো, রিকশা, ভিড় টাল খেয়ে গেল। কতদিন ওষুধ খাওনি, ঘুমোওনি, বাড়ি ফেরনি রণজয়? টিউবওয়েল থেকে একটা লোক বালতিতে জল ভরছিল। লোকটা বালতি সরিয়ে নিল। চলে গেল। রণজয় বাঁ হাতে কলটা চালিয়ে হাতে মুখ চেপে জল জমিয়ে খেল। তারপর সরে এসে কলটাকে ভালো করে দেখল। কলটা তো এখানেই থাকার কথা। তাই তো আছে হাত তুলে রাখা মানুষের মতো। তাহলে রাস্তাটা যে বাঁদিকে গেছে সেটা কী কলটার আগে না পরে? আগে তো বাঁদিকে কোনো রাস্তা নেই।

কৌশিক সারাদিন গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেককে খবর দিয়েছে। ফোন করছে। সন্ধেবেলা যাদবপুরে এইটবি স্ট্যান্ডে এসে রতনের খোঁজ করল কৌশিক। রতন রণজয়কে চেনে। এখন যাদবপুর গড়িয়াহাট রুটে অটো চালায়। রতন ওই সময় জঙ্গি ক্যাডার ছিল। রতনের অটোতে সামনে বাবা লোকনাথ। ধূপদানি। রতন দেবনাথের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াল কৌশিক। পেল অনেক পরে। রতন সবটা শুনল। শুনে বলল যে খেয়াল রাখবে। অবশ্যই রাখবে। কৌশিক বলল আরো কেউ যদি রণজয়কে চেনে তাকে যেন রতন জানিয়ে দেয়। সাড়ে আটটার সময় কৌশিক বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে মেখলার কাছে গেল। গিয়ে—দেখল মা, ছেলে মুখভার করে বসে আছে। ঢুকতেই মেখলা ঘরের টিউবআলো জ্বালল। মেখলার চোখ ফোলা। কোরা উস্‌কোখুস্‌কো।

—'বাঃ এই নাকি এঁরা স্টেডি থাকবেন। বলেছি না—পুরো দায়িত্বটা আমাব। তোমাদেব নিযে পারা গেল না।'

—'কী হবে কৌশিক?'

—'কী আবার হবে। বণজযদাকে আমি খুঁজে বেব করব। বহাল তবিয়তে ফেবত পাঠিযে দেব।'

—'কিন্তু যদি না পাওয়া যায়?'

—'ওফ্, এই নেগেটিভ কথাগুলো আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না। খুঁজে আমি পাবই। যাইহোক সাবাদিন ধরে ঘুরছি। এরপর হযতো সারা বাত ধবেও ঘুবতে হবে। এক কাপ স্ট্রং টি আব গেলবার মতো কিউট কিছু যদি থাকে দেবে, না চলে যাব?'

—'দিচ্ছি, তুই কোথায় কোথায় গেলি?'

—'সে জেনে তুমি কী করবে? পুবো এক বোতাল ঠাণ্ডা জল আনো তো।'

মেখলা জল আনতে গেল। কোবা চুপ কবে সোফাতে বসে ছিল। কৌশিক ওর পাশে ধপাস করে বসে কাঁধটা জড়িয়ে বলল,

—'কি রে, কৌশিককাকুব কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' কোবা ফুঁপিযে কেঁদে উঠল। মেখলা এসে জলের বোতলটা রেখে কোবাকে কাঁদতে দেখে নিজে কাঁদতে শুরু কবল।

—'সাবাদিন ধরে আমাকে বলছে স্টেডি থাকো, কেঁদো না। আব নিজে '

কৌশিক কোবাকে কাছে টেনে নেয়।

—'এই যে ইয়ং ম্যান। কী হচ্ছেটা কী শুনি? আমাব নিজেব কি খুব ভালো লাগছে। বাট্ ইউ, তোমাকে স্ট্রং হতেই হবে। যে কোনো এক্সিজেন্সি হলে কে আমাব সঙ্গে থাকবে? তোকেই তো থাকতে হবে। তোমার বাবা একজন সাহসী লোক। তাব ছেলেব কাছে এভরিওয়ান এক্সপেক্টস—বি স্টেডি কোবা। আরে! মা ছেলেতে মিলে তোমবা কী শুরু কবলে বলো তো?'

মেখলা চা করতে গেল। ফোন বাজল্। কোবা ধরে মাউথপিসটা চেপে ধরে কৌশিককে বলল,

—'বসাক!'

কৌশিক গিয়ে ফোনটা ধরল।

—'হ্যাঁ, বলুন মিস্টার বসাক।'

—'একি রে বাবা। গলা পাল্টে গেল। কে কথা বলছে?'

কৌশিক বুঝতে পারল বসাক কযেক পেগ চড়িয়েছে,

—'গলা শুনে চিনতে পারছেন না? সকালে আপনাকে এইচ. ডি পল বললাম?'

—'এটা কী মেখলা সেনগুপ্তর বাড়ি?'

—'ইয়েস, সার। এটাই মেখলা সেনগুপ্তর বাড়ি।'

মেখলা এসে দাঁড়ায়। কোবাও ঘেঁষে এসেছে। পিংকি ঘরে ঢুকে তিনজনের দিকে তাকিয়ে।

—'আপনি কে কথা বলছেন ত্যাড়াত্যাড়া।'

—'শুনন, লেটেস্ট খবর আপনাকে দিচ্ছি।'

—'ধরা পড়েছে? ক্যাপচার্ড?'

—'না, ধরা তো পড়েইনি। উপরন্তু এবার সঙ্গে কী আছে বলুনতো?'

—'কী?'

—'এ.কে ফর্টিসেভেন।'

—'সকালে আপনিই ইয়ার্কি দিচ্ছিলেন, না? এখন ওই বাড়িতে বসে ইয়ার্কি দিচ্ছেন!'

—'ইয়ার্কি নয়, মিস্টার বসাক। আপনি লালবাজারে একটা ফোন করে জানিয়ে দিন। রণজয়দা একটা এ কে ফর্টিসেভেন নিয়ে আপনাকে খুঁজছে। জানিয়ে দিন।'

—'ইউ নট নো হুম ইউ টক, আমি হলাম বসাক।'

—'চুপ। রাস্কেল। তাহলে তুমিও শুনে রাখ বসাক অ্যান্ড কোম্পানি, এখানে আর যদি তুমি ফোন করো তাহলে তোমার ওই হায়ার্ড ক্রিমিনাল দুটোকে আমি অ্যারেস্ট করিয়ে দেব। স্কাউন্ড্রেল।'

--'এই, এই মশাই, গালাগালি করছেন কেন? আমি তো কিছু বলিনি।'

—'বলবেন না। সকালে আপনাকে তো বললাম খবর পেলে জানাব। কোন সাহসে আপনি এখানে ফোন করেছেন?'

—'সাহসে নয় ভাই। টেনশন হচ্ছে তো। তোমাকে মানে আপনাকে অ্যাটাক করলে বুঝতেন।'

—'ঠিক আছে, টেনশন হচ্ছে তো আরো দুতিন পেগ মাল চড়িয়ে নিন। তবে জানবেন, ইউ আর আন্ডার সারভেইলান্স। অ্যান্ড নেভার ফরগেট, আমার নাম কৌশিক মিত্র। ঠিক আছে?'

—'খুব ঠিক আছে ভাই। তবে আমিও কিন্তু ত্যাঁদড়ামি করতে জানি।'

—'ফের বাঁদরামি হচ্ছে?'

কোরা হেসে ফেলে। মেখলাও হাসে।

—'কেন, কী বাঁদরামি করলুম?'

—'এখান ফোন করেছেন কেন? হোয়াই?'

—'আরে বাবা।'

—'কোনো আরে বাবা নয়। এখানে ফোন করবেন না। দরকার হলে আমাকে করবেন। বাড়িতে। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে—রণজয়দার কোনো হার্ম যদি হয় তাহলে আপনি ও আপনার ওই বডিগার্ড আর সিকিউরিটি ঘেঁচুকলা আমি একেবারে ফিনিশ করে দেব।'

—'এ তো থ্রেটনিং হয়ে যাচ্ছে ভাই?'

—'হ্যাঁ হচ্ছে। হবে। শোনো বসাক, কান খুলকে শুন লো, তোমার, তোমার বডিগার্ড, তোমার সিকিউরিটির ঢপ, সব কিছুর ওপরে পুলিশ নজর রাখছে। তোমার কিছু হবে না। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ। কিন্তু তুমি যদি উজিয়ে কিছু করতে যাও তাহলে কিন্তু হামসে বুরা কোই নেহি হোগা।'

এবারে কোরা জোরে হেসে ওঠে। মেখলা চা আনতে গিয়েছিল।

—'হাসল কে? বলছি হাসছে কে?'

—'কে হাসল? শুনবে? যার কাছে এ.কে ফর্টিসেভেন আছে, সে।'

—'অ্যাঃ আমি এখুনি লালবাজারে ফোন করব।'

—'লালবাজারে কেন, তুষার তালুকদারকে বলো, রণজয় সেনগুপ্ত এ.কে ফর্টিসেভেন নিয়ে তোমাকে খুঁজছে।'

—'বলব। তাই বলব।'

—'সকালে তোমাকে কী বলেছিলাম মনে আছে?'

—'কী?'

—'হরিদাস পাল।'

—'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

—'পুরোটা বলিনি। আগে একটা লাইন আছে।'

—'জানি, বালস্য বাল।'

কৌশিক ফোনটা রাখে। রেখে দুপাক ঘুরে যায়। বসে। টোস্ট খায়। চা খায়। ওরা তিনজনে রণজয়ের গল্প করে। নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার আগে মেদিনীপুরে কী হয়েছিল। কলকাতার এক সিম্প্যাথাইজার কবি বই-এর মধ্যে কুরে বসানো একটা রিভলভার ডেলিভার করতে এসে মাতলামি করে কী কেচ্ছা করেছিল। মালটা ডেলিভার করছিল ঠিকই কিন্তু ওকে পরে বালেশ্বর দিয়ে ট্রেনে ফেরৎ পাঠানো হয়। জেলে পট্টির মাল আর মাছ ভাজা খেয়ে, গলায় ঝিনুকের মালা পরা, তলায় শুধুই আন্ডারওয়্যার। বিকট সেই মদ্যপকে দেখে পুলিশ কিছু বুঝতেই পারেনি যে মাল ও প্রায় খায়নি। রণজয় সেই কবির নাম কৌশিককে বলেনি। কৌশিক তুখোড় ছেলে। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও কিছু জানতে পারেনি। ওকে কবি না বলে প্রাণী বলাই ভালো। ঝাউবনে ঘুমোত। দীঘার রে কাফের দোতলায় রুমালের ভাঁজ খুলে কাঁকড়া ছেড়েছিল। মহিলারা চেঁচামেচি করেছিলেন। সেই কবি ছিল রণজয়ের বন্ধু। কিন্তু রণজয় কখনো তার নাম বলেনি।

বাঁদিকের রাস্তাটা পেয়ে গেল রণজয়। গোড়ার দিকটা দিকটা তেমনই আছে। মাটি, খোয়া, এবড়ো-খেবড়ো। হ্যাঁ, সেই নিচু, নিচু আলো-কম ঘরগুলো পেরোতেই চোখে বাঁধা লাগে। এখানে একটা ডোবা ছিল। একটা ক্লাবের ছাদের ওপরে বাটির মতো একটা জিনিস উল্টো করে লাগান। জোরে গানের শব্দ হচ্ছে। রাস্তাটার গোড়ার দিকটা কিন্তু পাল্টায়নি। ডোবাটার পরেই অনেকগুলো কলাগাছ ছিল। রণজয় এগোয়। কাঁটাতারের বেড়ায় ধাক্কা খায়। একটা বোর্ড। জলের ফিল্টার তৈরির কারখানা। এখানেই তো দুই ভাই, চুনি আর বলরাম থাকত। ওদের বাড়িটার কাছ ঘেঁষে একটা জলা ছিল, না? জলাটায় বর্ষার সময় ভালো জল হত। মাছ ধরার মাচায় বসে বোমা বাঁধা হত। একি? কংক্রিটের রাস্তা কি জলা মাড়িয়ে তৈরি হয়েছে? জলাটারই এই কোণায় তো ইলেকট্রিকের পোস্টটা ছিল, যেটা থেকে উত্তর দিকে গেলে শ খানেক পা—রণজয় চারতলা, নতুন, আলো ঝলমলে বাড়িগুলোর সামনে থমকে দাঁড়ায়। তাহলে জলাটা কোথায়? ভীষণ আলোয় চমকে যায়। একটা মারুতি গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে। স্টিয়ারিঙে একটা মেয়ে। গাড়িটা হর্ন বাজায়। রণজয় সরে দাঁড়ায়। গাড়ির থেকে মুখ বের করে কয়েকটা বাচ্চা চিৎকার করে বলে,

—'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল।'

আবার টাল খাচ্ছে। তাহলে ওই যে কংক্রিট বাঁধানো জায়গাটায় সুন্দর চেহারার ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলছে আলোয় ওখানেই কি? নাকি, ওই দোকানটার তলায়? দোকানের মধ্যে টিভি চলছে। কোকা কোলা, পেপসি। এভারেডি ব্যাটারির চিৎকার—গিভ্ মি রেড। রণজয় রাস্তার ধারে বসে পড়ে। বড় দুর্বল লাগে। এইসময় যে লোকটা একটা পা ফেলে, দুটো ক্রাচে ভর করে এগিয়ে এসেছিল সে বলল,

—'বাড়ি খুঁজছেন? কত নম্বর?'

রণজয় উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি।

—'বাড়ি নয়, রাইফেল।'

লোকটা ঝুঁকে পড়ে রণজয়কে দেখে।

—'মিলনভাই, তুমি!'

টেক-নেমটা রণজয়ের মাথায় আছড়ে পড়ে।

—'তুমি, তুমি কে?'

—'মিলনদা, আমি সুশীল তুমি মিলনদা, বেঁচে আছ?'

রণজয় লোকটাকে দেখে।

—'সুশীল! সুশীল! সুশীল, আমাদের রাইফেলগুলো কোথায়?'

সুশীল রণজয়কে চুপ করতে বলে।

—'চুপ করুন। মিলনদা, আপনি।'

—'হ্যাঁ, আমি।'

—'ওর ওপর বাড়ি উঠে গেছে। সব ফ্ল্যাট বাড়ি। কিচ্ছু নেই।'

—'মানে?'

—'আশুদা মরে গেল। আপনি চলে গেলেন। কত কী হয়ে গেল মিলনদা। কোথায় ছিলেন তখন?'

—'কোথায় ছিলাম?'

—'মিলনদা, ও রাইফেল টাইফেল কিচ্ছু নেই। সব ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গেছে। ও জলা নেই। কিচ্ছু নেই।'

—'কিন্তু আমার রাইফেল। মাটির তলায় আমরা রেখেছিলাম না। খুব দরকার। ওরা মারছে।'

—'মদনদাকে তোমার মনে আছে। মিলনদা! সেই যে বোমা বাঁধার সময় বার্স্ট হয়েছিল। মুখ পুড়েও গেল। বলল, মদ দে, মদ দিয়ে আমাকে বেহুঁশ করে দে।'

—'হ্যাঁ, মদন কোথায়?'

—'নেই। ও রিকশ চালাত। পরে দণ্ডকারণ্যে চলে যায়। আমারও পা চলে গেল। এখন ইস্তিরি করি।'

—'কিন্তু আমার রাইফেল! আমার রাইফেলের কী হবে?'

—'ও নেই। সব বাড়ি উঠে গেছে। সেকি আছে? সব মাটি হয়ে গেছে। মিলনদা, আমি কিন্তু সিপিএম হয়ে গেছি। ইস্তিরি করি। এইসব ফ্ল্যাটবাড়ির জামাকাপড়। অনেক পাই।'

—'কিন্তু, কী নাম বললে, হ্যাঁ, সুশীল, আমার আর্মস-এর কী হবে? লড়াই যে আমাদের করতেই হবে সুশীল।'

—'মিলনদা, আমি বলব কি তুমি এখান থেকে চলে যাও। পুরনো লোকেরা চিনতে পারলে অসুবিধা হতে পারে। মানে ওই বন্দুক টন্দুকের কথা শুনলে।'

—'সুশীল, তোমার একটা পা নেই। কেন?'

—'দুইখানা গুলি লেগেছিল। বিষিয়ে গিয়েছিল। গেনরিন না কি যেন বলে।'

—'সুশীল, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। আমরা একটা গর্ত খুঁড়েছিলাম। মানুষের মাপের বড় গর্ত। তলায় ইট দিয়ে তার ওপরে পলিথিনের চাদর আর চট দিয়ে বাঁধা দু-দুখানা রাইফেল ..'

—'মিলনদা, চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।'

—'রাইফেল ছাড়া আমি কোথায় এগোব?'

—'ওসব আর ভেব না মিলনদা, ভুলে যাও। এখন থাক কোথায়?'

—'কী! থাকি একটা ঘাঁটি এলাকায়। কিন্তু রাইফেলগুলো আমার যে বড় দরকার ছিল।'

—'এস। তোমাকে চেনা রিকশা ধরিয়ে দিই। তোমাকে সুকান্ত সেতু অব্দি নিয়ে যাবে।

একটু হেঁটে উঠলেই মেলা বাস, মিনি পেয়ে যাবে।'

ব্রিজের তলায় রিকশার ভাড়া বের করতে গিয়ে রণজয়ের পকেট থেকে টাকা পড়ে গিয়েছিল। রিকশাওয়ালাও দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে এক ভদ্রলোক মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে দোমড়ানো টাকাগুলো পান। বেশি নয়—আশি টাকার মতো। ব্রিজের তলায় একটা ফাঁকা জায়গায় হরিসভার কীর্তনের আসর বসে। রিকশাওয়ালা, দোকানদার, সন্ধ্যাবাজারের ব্যাপারিরা হরিনাম করে। সেখানে প্রণামীর বাক্সে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

বাসে বসে বণজয় দেখল ফাঁকা। বাস উড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ব্যাগি স্পোর্টস শার্ট ফুলিয়ে দিচ্ছে। তুলকালাম স্পিড। কন্ডাক্টর বণজয়ের পাশে বসে টিকিট চাইল। রণজয় পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা, দুটো এক টাকার কয়েন আর পাঁচ টাকাব একটা নোট বেব কবল। আরো টাকা ছিল যে! অবশ্য টাকাটা ম্যাটাব করে না। রাইফেলই পাওয়া গেল না, রাইফেলেব ওপবে বাড়ি উঠে গেছে, ভিতের মধ্যে ঢুকে গেছে, প্রোথিত এক অজানা অন্ধকার মৃত্তিকাগর্ভে, সেখানে রাইফেলগুলো এক সময় মাটি হযে যাবে। রণজয় কন্ডাক্টরের দিকে বিষণ্ন মুখে তাকায়,

—'রাইফেল পাওয়া গেল না।'

কন্ডাক্টার বলল,

—'এ বাস আপনার বাইফেল রোড যাবে না।'

রণজয়ের কথাটা শুনে খুব হাসি পেল। টাকা নেই, রাইফেলও নেই। রণজয় হা হা কবে হেসে উঠতে কন্ডাক্টর ঘাবড়ে উঠে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল। বণজয় আরো জোরে হেসে উঠেছিল। বিপ্লবী হলেই যে কাঠখোট্টা হতে হবে কে বলেছে? বিপ্লবীবা হবে বোম্যান্টিক। ভেঙে পড়লে চলবে না। স্বপ্ন দেখতেই হবে। সেই সঙ্গে লড়তে হবে। বণজয় এখন যেটা করছে সেটা গেরিলা অ্যাকশন না মোবাইল যুদ্ধ? হঠাৎ কমরেড লিন পিয়াও-এর কথাটা মনে পড়ে গেল, 'তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়, আমরা আমাদেব কায়দায় লড়ি। যখন জিততে পারি তখন আমরা লড়ি, যখন জিততে পারি না তখন আমরা সরে পড়ি।' রণজয়, ভুলে যেওনা তুমি একজন পেটিবুর্জোয়া কমরেড। তোমার তো ভুলচুক হবেই! কিন্তু রাইফেলের ওপরে বাড়ি উঠে যাওয়ার ভুলটা কার? রণজয় ছুটন্ত বাসের জানলাব বাইরে ধাক্কা খাওয়া হাওয়াকে বলে, 'আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে লি লি সান বা ওয়াং মিং-দের মতো আমি পালিয়ে যাব।'

রণজয় যে জায়গাটায় বাস থেকে নামল তার উল্টোদিকে একটা পার্ক। পার্কের রেলিং ঘেঁষে ছন্নছাড়াদের ঘরবাড়ি। নোংরার গাদা। রণজয় একপাশে একটা উঁচু জায়গায় বসল। উঁচু জায়গাটা হল জমে যাওয়া কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা।

একটা বিড়ি ধরাল রণজয়। রাস্তায় হলদেটে চড়া আলো। চোখে কেমন গরম লাগে। বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে যায়। এই আলোগুলো দেখতে ভালো লাগছে না। এইসব আলোর মধ্যে বড় বেশি চিৎকার রয়েছে। রণজয় উঠে হাঁটতে থাকে।

৬

৫ ১১ ৯৪

বণজয়ের ডায়েরিটা মন দিযে পডছিলেন ডক্টর দাম। কোনো লেখাব ওপরেই কোনো তাবিখ নেই। দিন আলাদা করার জন্য বোধহয় আড়াআড়ি দাগ কেটে কেটে আলাদা করা।

'আজকে বিজয় খুব চেঁচাবে। হেক্সিডল ফোর্ট তিনবাব করে কোবা কোবা মেলি। বাকো। ইস্কুল ছিল না। চেকোস্লাভাকিযা সম্বন্ধে পবিমলবাবুব লেখার ভুল হল ক্যাপিটালিজম এরকমই কববে আমিলন বণ। মহিতোষ ন্যাংটা। বাব বাবু বাবা। শেয়াল ডাকল। শুনি চবম দজং লেনিন লেনিন।'

'একটা পিঁপড়েকে তেড়ে গেল। পোকা। পিঁপড়ে পালাল। ভুল হল। মসক বিচার হল। ঠিক হল। জিনভিয়েভ কামেনেভ বুখাবিন চকব ঠিক হল। মেলি ভালো। ঠিক হল। যাব। মহীতোষ ন্যাংটা। ঠিক হল। বাবা এল। গেট হল। ভুল হল। বথা পায়।'

আবার কখনো লেখা অনেক গুছনো।

'বিষ্টির জল পেয়ে উইপোকা বেরল। দুইজন গিবগিটি তাদের খেল। ফুলের বাগানে। কেউ দেখেনি। কোবা খুব ভিতু। ঘেরাও ও দমন। বণজয।'

'টানেল ও মাইন। কাগুজে বাঘ। জনগণেব ওপব ভবসা বাখুন। পার্টিব ওপব ভরসা বাখুন। শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যেকটি স্তবে বাজনৈতিক কাজের অগ্রাধিকাব দিতে হবে। এটাই চেয়ারম্যানের শিক্ষা। রণজয।'

ডক্টর দাম ডায়েরিটা বন্ধ কবলেন। ওষুধ না পডাব ফলে রণজয়েব কী হতে পারে সেটা ভাবতে লাগলেন। ঘুম আসার কথা নয়। বডজোব একটা ঝিমুনিব ভাব আসবে কিন্তু তাও থাকবে না। রণজয় কী করছে বা কী করতে চায় তাব ওপবে নির্ভর কববে ও কতটা উত্তেজিত হয়ে পড়বে। সেবকম কিছু হলে সাংঘাতিক বেগেও যেতে পারে। সামান্য যে চটকা আসবে তাব মধ্যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে। তখন খুব ভয পেয়ে যেতে পারে। বাগে বা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লে অনেক কিছু করে ফেলতে পাবে। তাছাড়া কী খাচ্ছে এই কদিন ধরে? ওই তো রোগা, হাড়জিরজিরে চেহারা। সারা গায়ে টর্চাবের দাগ। গত বছর একবাব দাঁতেব ব্যাথায় খুব কষ্ট পেয়েছিল। ইনফেকশন হয়ে গোটা মুখটা বীভৎসভাবে ফুলে গিয়েছিল। সেরকম যদি হয়। যদি চোট পায়! গাড়িচাপা পড়ে! ধাক্কা খায়। এই হাজার হাজাব গাড়িব মধ্যে রণজয নিজেকে বাঁচাতে পারবে? আবার রণজয়েব ডায়েরিটা খুললেন ডক্টর দাম। এবারে শেষ দিকের পাতাগুলো দেখলেন। শেষদিকে লেখা প্রায় নেই। কিন্তু ছবি আছে। মাছ আর পাখির ছবি। মাছের গায়েও পাখির মতো বড় বড় ডানা। কিছু ইংরেজি অক্ষর। আবার পাখির ছবি।

সকাল থেকে তিন-চারটে ফোন পেয়েছিল কৌশিক। বণজয়েব পুরনো বন্ধুদের। কেউই খবর পায়নি। এরই মধ্যে যাদবপুব থেকে রতনের ফোন পেল কৌশিক একটু বেলায়।

—'খবর পেয়েছি কৌশিকদা কিন্তু সেখানে নেই। চলে গেছে।'

—'কোথায়?'

—'সকালে সন্তোষপুরে গিয়েছিলাম, বোনের জামাইকে একটা খবর দিতে। ঠ্যাং-কাটা সুশীলের সঙ্গে দেখা হল। সুশীলকে চেনেন?'

—'না।'

—'খুব অ্যাকশন করত একসময়। ওর ওখানে কাল সন্ধেবেলা মিলনদা এসেছিল। ও দেখেছে

উল্টোপাল্টা বকছে। রাইফেল না কিসের খোঁজ করছে। ও রিকশ ধরে সুকান্ত সেতু পাঠিয়েছে। বলেছে ওখান থেকে বাস ধরে নিতে।'

—'কাল কখন?'

—'সন্ধে মানে এই আটটা ফাটটা হবে।'

—'আর কিছু বলল ওই সুশীল?'

—'বলল ভালোই দেখেছে। একটু যেন খুঁড়োচ্ছিল।'

—'ইস্, তোমার সঙ্গে দেখাটা হলে কত ভালো হত।'

—'আমি নজর রাখছি কৌশিকদা।'

—'আচ্ছা ভাই, অনেক ধন্যবাদ। কিছুটা চিন্তা কমল।'

—'রাখলাম তাহলে।'

—'আচ্ছা।'

ডঃ দাম আর মেখলাকে খবরটা দিল কৌশিক। কিন্তু কী বলল রতন? রাইফেলের খোঁজে! একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল কৌশিক। জয়িতাকে বলল আজ তাকে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে সেন্টারে যেতেই হবে। তাজিক একটা ডেলিগেশন আসবে। সে ব্যাপারে কয়েকটা চিঠিপত্র লিখতে হবে। খবর নিতে হবে। কোনো ফোন এল যেন জয়িতা তাকে সেন্টারে জানায়। কোনো ফোন আসেনি।

ফোন এসেছিল মেখলার কাছে। পার্থর। পার্থর ফোন যেমন হয়, চালাক ফোন। ধরেছিল কোবা। তখন মাথায় কোবার নতুন প্রমিস। বাবার যদি কিছু হয়ে যায়, যদি বাবা রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে বা কোনো কারণে, জলে ডুবে বা আগুনে পুড়ে বা বুট-বুলেটে জেরবার হয়ে মরে যায় তাহলে কোবা তার কল্প-বিজ্ঞান উপন্যাসের তিনটি পর্ব কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছাদ থেকে উড়িয়ে দেবে যার নির্গলিতার্থ হল স্বপ্নের শব্দময় ছবি তোলার কিঞ্জলের যে বিপুল আয়োজন তা বাতাসের ঢেউয়ের আসা যাওয়ার অনন্ত সমুদ্রে লোপাট হয়ে যাবে। এরপর কেউ আর কখনো জানবেই না কিঞ্জল কে ছিল, সে কী করতে চেয়েছিল, সে কে, কী এবং কেন। এই আলটিমেট মেজাজের বশেই পার্থকাকুর ফোন ধরে কোবা বলেছিল,

—'না, আজকে নয়। তোমার এখন আসাটা ঠিক হবে না। মা খুব ডিসটার্বড। আমিও। বাবা এখন কলকাতায় কিন্তু কোথায় আমরা কেউ জানি না।'

—'মানে রণজয় আবার অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়েছে?'

—'বাবা অ্যাসাইলাম নেই। বাবা কলকাতায়। কোথায় আমরা জানি না। দ্যাটস্ অল্। ঠিক আছে?'

—'না, ঠিক নেই। তুই মেলাকে দে।'

—'সম্ভব নয়।'

—'মানে?'

—'মানে সম্ভব নয়। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। মোরওভার, তুমি বেটার কালকে ফোন কোরো। ইনেব্রিয়েটেড লোকদের...'

—'কোবা!'

—'চেঁচালে, না? আমার ওপর চেঁচালে? ঠিক আছে। এসো, এসো। এখনই এসো। আমি নিচে অপেক্ষা করছি।'

—'এসব কথার মানে কী, কোবা?'

—'মানে আমি সহজেই এক্সপ্লেইন করে দেব। এইসময় তুমি এসে আর মাকে ডিসটার্ব করবে না, আমি অ্যালাও করব না।'

—'ঠিক আছে।'

—'রাখছি।'

ঠাস্ করে রিসিভার রেখে দিয়েছিল কোবা। কোবা বাবান্দায় এসে দাঁড়ায। শহর জুড়ে আলো। আজকাল লোডশেডিং কমে গেছে। দূর এ তো দিনের বেলা। এখন কিসের আলো। বোমা ফাটছে। একটা আধটা। অনেক অনেক দূরে। মাথা ধরেছে। মাথা ব্যথা করছে। দুটো ডিস্প্রিন এক গেলাস জলে ফেলল। ফেনামাখা ট্যাবলেট দুটো নাচছে। ভাসছে। অসংখ্য, অজস্র বুদবুদ। ফাটছে আব এক গেলাস জলের সমুদ্রে ছটফট কবে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। গেলাসের জলটা পুরো খেয়ে কোবা নিজেব ঘরে যাওযার পথে দেখল মা দাঁড়িয়ে। কোবা গিয়ে মা-র কপালে চুমু খেল। বলল,

—'বাবার কিচ্ছু হবে না মা। তুমি দেখে নিও।'

কোবা টর্চার এবং অত্যাচারিতের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বেশ পডাশুনো কবেছে এবং এ বিষয়ে সে নিজে একজন তরুণ মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধুব কাছেও গিয়েছিল। আসলে সে কোবার বন্ধু ছিল না। বন্ধু রঞ্জনেব বন্ধু। বন্ধু হযে গেল। বাঙ্গালোর থেকে এম. ডি করেছে। ভাযোলেন্ট মানসিকতাব নানা স্তর ও বিস্তৃতি নিয়ে একটা প্যান এশিয়ান স্টাডি হচ্ছে এক মার্কিন ফাউন্ডেশনের টাকায়—সেই প্রোজেক্টে আপাতত কাজ করছে। এব জন্যে যেমন খালিস্তানি, এলটিটিই, অন্ধ্রের পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ, বিহারেব এমসিসি ও নাগা, কুকি, মিজো, বোরো বিদ্রোহীদের ওপর স্টাডি চলছে, তেমনই চলছে পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও কাম্পুচিয়ায। কাম্পুচিয়াতে ১৯৭৫-এব এপ্রিল থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১,২০০,০০০।

ছেলেটির নাম সমীরণ। কোবার চেয়ে সামান্য বড়ই হবে।

—'দেখুন, টর্চার হল বলতে পারেন সর্ট অফ এক্সসেসিভ স্টিমুলেশন। যাকে করা হয়, ধরুন নখের তলায় সুঁচ ঢুকিয়ে দিল বা চোখের ওপরে ব্লাইন্ডিং আলো ফেলে বিশ্রি গালাগালি করল—এটা কোনো কোনো মানুষের কাছে আনইউসুয়ালি ক্যাটাসট্রফিক হতে পারে। ওই মানুষটা তো এর জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিল না। টর্চার জিনিসটা নর্ম্যাল হিউম্যান অভিজ্ঞতার বাইরে—আজকাল আমরা যেটা করতে চেষ্টা করি, খুব সাকসেসফুলি বলব না, কনসার্নড্ ইনডিভিজুয়ালকে নিয়ে একটা সাইকো-সোশিও-বায়োলজিক্যাল মডেল তৈরি করার চেষ্টা করি। দেখুন, আলটিমেটলি হল সকলের কোপিং সিস্টেম তো সমান নয়—এখানে তার ব্যাকগ্রাউন্ড, ফ্যামিলি সেট-আপ, পার্সোনালিটি ট্রেইট, হেরিডিটি, এনভায়রনমেন্ট—সবটা বোঝার দরকার। তবে এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে—এইগুলো ঠিক ঠিক ধরার জন্যে যে ইলাবোরেট সিস্টেম দরকার সে এখানে নেই। কখনো সম্ভব হবেও না। যাইহোক। টর্চারের ফলে যে গণ্ডগোলগুলো হয়—তাকে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বলা যায়। ও হ্যাঁ, সবথেকে ভয়াবহ টর্চার কী জানেন তো? এটা হল সলিটারি কনফাইনমেন্ট। এখানে অনেক সময় ইমপেনডিং ডেথের একটা ভয় হয়। এর ফলে ওরিয়েন্টেশন গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমি বেশ কয়েকটা কেস দেখেছি—যেখানে কনটিনুয়াস ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়া বা ধরুন খুব অ্যাকিউট ডেলিউশনাল ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে। ভিসুয়াল অ্যাগনোশিয়া হতে পারে...হিস্টিরিক্যাল অ্যামনেশিয়ার কেসও দেখেছি... প্যারানয়েড ডিলিউশান... ডিলিউশনাল বিলিভ সিস্টেম... টাইম

অ্যান্ড স্পেস... সাইকোলজিক্যাল টর্চার... তার ড্রিম নাইটমেয়ার, বিজার... লার্গাকটিল... হ্যালোপেরিডল... ক্লোরপ্রোমাজিন... হেক্সিডল প্লাস. নাইট্রোশান.. সেরেনেল... ফেনারগান..'

রণজয়ের সব পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল শেষ কেনা একটা কোয়ার্টার পাউরুটি যেটা বণজয় কুড়োনো একটা পলিথিনের প্যাকেটে ভরে হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। রণজয় সামনে একটু ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল এবং চারপাশ দিযে, নানাদিকে, যে অসংখ্য মানুষ যাচ্ছিল, আসছিল, থামছিল, উবু হয়ে বসে রেসের বই দেখছিল, সাট্টার নম্বব মেলাচ্ছিল বা নানাভাবে বেঁচে ছিল তাদেব কেউই রণজয়েব মতো করে, একটু ওপরের দিকে মুখ তুলে সেই মুখটিব দিকে তাকিয়েছিলনা। ধোঁয়া ধোঁয়া ধুলোয়, ডিজেল মবিল পেট্রলের ঝাঁঝে, চোখে দূষণ না কান্নার জ্বালা নিয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়েছিল রণজয়। একজন রণজয়কে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। রণজয় ফিবেও তাকাল না। লোকটি রাতকানা বলে সদ্য নেমে আসা সন্ধ্যায় তালকানা হোঁচট খেয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গেই রণজযের ধাক্কা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'সবি'। বণজয শুনতে পায়নি। ওই তো আলো পড়েছে মুখেব ওপব। লোহার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেবা। বন্দী। রণজয় ভাবল কমরেড লেনিন বিশেষভাবে তাকেই বেছে নিয়েছেন, তাব জন্যেই হাসছেন, এক্ষুনি নেমে আসবেন তারই বুকের মধ্যে, জড়িয়ে ধরবেন রণজয়কে, বলবেন,

—'কেমন আছেন কমরেড বণজয়!'

রণজয় শুনতে পেল। হাতে ঝুলন্ত পলিথিনের নোংরা প্যাকেটে পাউরুটি। রুটি! রুটি। রণজয়ের পেছনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দাঁড়িয়ে। ব্যানার, পতাকা, ফেস্টুন উডছে। ধবা গলায় গান ধরল একজন—

—ভেদী অনশন, মৃত্যু, তুষার ও তুফান.. লক্ষ কণ্ঠে কমরেড লেলিনেব আহ্বানেব গান একটা সমুদ্রের মতো শব্দ গড়ে তোলে। পেত্রোগ্রাদ! ওই তো, কমবেড লেনিন হাসছেন, স্পষ্ট দেখা গেল। একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠল,

—'কমরেড লেনিন আমাদের সাম্যবাদেব পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সবরকম কষ্ট সত্ত্বেও আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।' সমুদ্র সায় দেয়।

—'জমিদারেরা ফিরে এসে আমাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিতে পারে—এবকম ভয় পাবার কারণ নেই। লাল ফৌজের সঙ্গে ইলিচ ও বলশেভিকরা আমাদেব সাহায্যের জন্যে আসবেন।' সমুদ্র মুঠি তুলে সমর্থন করে।

—'কমরেড লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।'

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে রণজয়! না চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল! ওই, ওই তো সমুদ্র বলছে,

—'কমরেড লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।'

রণজয়, চোখ মুছে দেখ তো, লেনিন মূর্তির দুপাশে কাদের দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের দিকে, কাছে। হ্যাঁ, ঠিক তুমি কমরেড স্তালিনকে চিনতে পেরেছ। কমরেড জে ভি স্তালিন। ১৯১৯ সাল থেকে পলিটব্যুরোর পূর্ণ সদস্য। ওই দেখ কামেনেভ। এল বি কামেনেভ। ট্রটস্কি। ক্রেসতিনস্কি। জিনোভিয়েভ। বুখারিন। মলোটভ। কালিনিন। রিকভ। টমস্কি। কুইবিশেভ। এঁদের ওপরে আলোর কিছুটা পড়েছে তাই হয়তো দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এর পরেও রয়েছেন সকোলনিকভ, যেরঝিনস্কি, রুদজুতাক, ভরোশিলভ্, রুদজুতাক, পেত্রভস্কি, উগলানভ, অরজোনিকিদজে, আন্দ্রিয়েভ, কিরভ, মিকোয়ান, কাগানোভিচ, চুবার, কসিয়র, বমান, সিরৎসভ, বগদানভ, এইখে, ইয়েজভ, ক্রুশ্চেভ... লেনিনকে ধরলে তেত্রিশজন... এর মধ্যে একুশ জনের

মৃত্যু স্বাভাবিক নয়. . রণজয়...

রণজয় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে জানে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তাও জানে না। কী করে জানবে? লেনিন বলছেন,

—'রণজয়, শুনুন, আমি আপনাকেই বলছি. '

—'বলুন, কমবেড লেনিন!'

—'পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রথম জলোচ্ছ্বাস সবে গেছে, দ্বিতীয়টি এখনো ওঠেনি। এ বিষয়ে কোনোরকম বিভ্রম পোষণ কবা আমাদেব পক্ষে বিপজ্জনক হবে। আমরা সম্রাট জারেক্স নই যিনি সমুদ্রকে শেকল দিয়ে আঘাত কবতে আদেশ দিযেছিলেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরাকে এইভাবে বোঝাব অর্থ কি চুপ করে বসে থাকা, অর্থাৎ লডাই পরিত্যাগ করা?'

—'না, কমরেড লেনিন!'

—'ঠিক বলেছেন। কখনোই তা নয়। শিখুন, শিখুন, শিখুন! কাজ, কাজ, সবসময় কাজ কবে যাবেন!'

—'হ্যাঁ কমবেড লেনিন।'

—'আমাদের তৈরি হতে হবে, খুব ভালো কবে তৈবি হতে হবে যাতে ভবিষ্যতের বিপ্লবেব ঢেউ এলে তাকে সজ্ঞানে ও সবলে সম্যকভাবে কাজে লাগাতে পাবি। এটাই হল আসল কথা।'

—'আমি মনে বাখব. কমবেড।'

—'প্রযোজন হল অক্লান্ত পার্টি-আন্দোলন আর প্রচাব-কাজেব, আর তাবপব—পার্টির কাজ। কিন্তু সেই ধবনেব পার্টির কাজ যার মধ্যে এই ধরনেব হঠকাবী ধারণা নেই যে, সেটা জনগণেব আন্দোলনেব স্থান গ্রহণ করতে পারে। আমবা, যাবা বলশেভিক, নিজেদের একথা বলতে পাবার আগে জনগণের মধ্যে কী কঠিন পবিশ্রমই না কবতে হয়েছিল "প্রস্তুত, অগ্রসর হও।" অতএব, জনগণের প্রতি মন দিন। ক্ষমতা লাভের প্রাথমিক সোপান হল জনগণের হৃদয় জয় করা।'

হঠাৎ আলোগুলো নিভে যায়। অন্ধকাব। তখন উল্টো ফুটে হঠাৎ পুলিশের হকার ধরার বেড শুরু হয়েছিল। হল্লাব ভযে চেচাঁমেচি, চিৎকাব। এপাবেও কিছু লোক ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু কবল। বণজয় একটু দিশাহাবা হযে পড়ে। কমবেড লেনিন যদি আরো কিছু বলতেন! রণজয় চিৎকাব কবে উঠেছিল,

—'কমরেড লেনিন! কমরেড লেনিন!'

রণজয এগোতে গিয়ে একজনেব গায গিযে পডে। তাকে জড়িয়ে ধবেই টাল সামলায়—

—'কমবেড লেনিন, আমি রণজ-য়!'

লোকটা ভয় পেয়ে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িযে নেয়। সে ভেবেছিল ছেনতাই পার্টি। আচমকা অন্ধকাবের সুযোগ নিযেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আলো ফিবে এল। লোকটা দেখল, যে ছেনতাই করতে এসেছিল সে লেনিনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে কাঁদছে, গাল গড়িয়ে জল নামছে, হাতে স্বচ্ছ প্যাকেটের মধ্যে কোয়ার্টার রুটি দোল খাচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—

—'কমরেড লেনিন! কমরেড লেনিন। কমরেড. .'

লোকটা কাছে এসে রণজয়েব [illegible] হাত বেখেছিল,

—'এ বাবু, বাবু! ও তো [illegible] স্টাচু আচে। আপনি ডাকলে কথা কববে। কেয়া বেকার লেলিন, লেলিন করচেন।'

রণজয় লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তোবড়ানো গাল তার মতোই একটা ভাঙাচোরা মানুষ। রণজয় একটু হাসল। তারপর হাঁটতে থাকল। কিন্তু পায়ে অসহ্য ব্যথা। একবার ভাবল

রুটিটা খাবে। পকেটে দুটো বিড়ি আছে। একটু বসে নিলে হয়। পা-টা টান করে একটু জিরিয়ে নিলে আবার হাঁটা যাবে। তারপর কোথাও না হয় বসে রুটিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে রণজয়। বড় পেচ্ছাপখানাটার বাইরে যে পাঁচিল রয়েছে তাতে ঠেস দিয়ে বসে বসে ঝিমুনি এল রণজয়ের। ঝিমুনিতে দেখল আবছা আবছা ছবি দেখা যাচ্ছে। পরে বুঝল ওগুলো উল্টোদিকের আলো। পাশে তিন-চারটে ছেলে ছাতাব মতো একটা গোল চক্করে অনেক গেঞ্জি ঝুলিয়ে বসে আছে। ওরা একটা আলোও জ্বেলেছে হ্যাজাকের। খদ্দের নেই। দেখতে দেখতে আবার ঝিমুনি এল রণজয়ের।

বসাক নেই রাতে সিল্কের লুঙ্গি আর ঝোলা ফতুয়া পরেছিল। এটা বসাকের নিজের ডিজাইনের ফতুয়া—সাধারণ মাপের চেয়ে বড় এবং যেটা স্পেশাল সেটা হল এতে বড় কলার রয়েছে। ফতুয়ার দুটো পকেটই বেশ ভারি ছিল। একটাতে ছিল ছোট একটা অ্যামেরিকান রিভলভার। অন্যটাতে টর্চ। সন্ধেবেলা ভেবেছিল অল্প ফুরফুরে নেশার জন্য হুইস্কির একটা নিপ টুকটুক করে জল মিশিয়ে খাবে। কাজেব কথা বলতে গেলে নেশাফেশা একদম গণ্ডগোলের ব্যাপার। ঝামেলা হয়ে গেলে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে যেতে পারে। টেম্পার উঠে যেতে পারে। সাড়ে নটায় গ্র্যান্ড হোটেল আর্কেডের উল্টোদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। লোকটা ক্রিম রঙের কনটেসা নিয়ে আসবে। লোকটা পাঞ্জাবি কিন্তু পাগড়ি পরে না। ভবানীপুরে নতুন একটা বার খুলেছে। বসাকের তার সঙ্গে প্রোজেক্টটা অন্য ব্যাপারে। যাইহোক, যা হবার তাই হল। হুইস্কিব নিপটা ফুক করে শেষ হয়ে গেল। আবার বড় বোতল থেকে ঢালতে হল। দামি স্মিরনভ ভদকা। একটু বেশিই ঢালা হয়ে গেল। সেটা অনেকক্ষণ ধবে খাবার চেষ্টা করেছিল বসাক। আবার বেরোবাব মুখে মনে হল ওয়ান ফর দা রোড—এবারেরটাও বড় হয়ে গেল—পাতিয়ালা ধাঁচের। মারুতি জিপসিতে ওঠার সময়েই তারক আর মান্না দেখল বসাক মুচকি মুচকি হাসছে আর গুনগুন করে গান করছে। শ্যামসংগীত। তারক মান্নাকে চোখ মারল। মান্না ফিক করে হাসল। বসাক খচে গেল,

—'এই শালা মান্নার বাচ্চা। হাসলি কেন? হোয়াট ফর ইউ লাফ? আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে তোমার?'

—'কি যে বলেন স্যার। আপনি আসার আগে তারক এমন বটকেরা করছিল, তাই মনে করে হাসি এল।'

—'তাই মনে করে হাসি পেল?'

—'বিশ্বাস করুন সার।'

—'ঠিক আছে। যত খুশি হাস। শুধু আমাকে দেখে নয়। জানবে, বসাক ইজ বসাক।'

—'জানি সার।'

রাস্তায় একটা ফিয়াট বেগড়বাঁই করছিল। তারক মুখে কিছু বলেনি। বসাক না থাকলে খিস্তি করত। তারক যে খিস্তি করতে চাইছে বা ছোট্ট একটা ছোঁয়ায় গাড়িটার ব্যাকলাইটটা ভেঙে দেবার জন্য উসখুস করছে সেটা বুঝতে পেরে বসাক বলে,

—'তারক! না। একদম মাথা গরম করবি না। আমাদের তাড়া নেই। ও করছে বলে তোকেও করতে হবে? কক্ষনো না। অলওয়েজ মাথা ঠাণ্ডা। কুল!'

গাড়িটাকে ওভারটেক করল তারক বাঁদিক দিয়ে।

—'তারক! আবার নিয়ম ভাঙলি। খুব অন্যায়। তোদের কেউ ডিসিপ্লিন শেখাতে পারবে না। আমিই পারলুম না। এই মান্না!'

—'বলুন সার।'

—'তোর কাছে বিড়ি আছে?'

—'আপনি, বিড়ি খাবেন সার?'

—'কেন খাব না, দে।'

মান্না বিড়ি লাইটার দেয়। বসাক উল্টো ফুঁ-তে ধুলো ঝাড়ে। ধরায়।

—'বিড়ি বেটার। কাগজের ধোঁয়ার থেকে পাতার ধোঁযা ভালো। তারক, তুই বিড়ি খাস?'

—'হ্যাঁ, সার, দু-একটা।'

—'গুড। গুড।'

নেশা চড়ছে, নেশা চড়বে। হামা দিতে দিতে লালিপপ। বসাক নামল। এদিক-ওদিক দেখল। হাঁটাহাঁটি করল আলগা।

—'কটা বাজে রে?'

বসাক ঘড়ি পরে না।

—'নটা চল্লিশ, সার!'

—'তার কানে অলরেডি দশ মিনিট লেট! এ একেবাবে আমাব ধাতে সয় না। টাইম ইজ মানি, কী মনে হচ্ছে, মালটা আসবে, না আসবে না?'

—'কি মবে বলব, সার?'

হঠাৎ বসাক টলে যায়। মান্না ধরে নেয়।

—'এই, গায় হাত দিবি না। ও আমি ঠিক স্টেডি আছি। বসাক ইজ বসাক।'

আবো সময় যায়। বসাক আবার গাড়িতে উঠে বসে। সঙ্গে একটু মাল থাকলে ভালো হত। মাল না থাকলেও নেশার মিটার উঠতেই থাকে। বসাকও সেটা বোঝে। যে নিপটা মেরেছিল সেটা হল দিশি হুইস্কি, কানট্রি মেড ফবেন লিকার। কিন্তু ফরেনের মালের মজা হল নেশাটা টক করে ধরবে না। আস্তে আস্তে বুঁদ হয়ে ছড়াবে। আলোগুলো ফাটছে। ফেটে আলোর ভুরভুরি ছিটকোচ্ছে। অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছিল। বসে থাকার জন্যে আরো বেশি লাগছে। কিডনির ফাংশন সম্বন্ধে বসাক খুব সচেতন। রোজ দশ গেলাস জল খায়। সিস্টেমটা ক্লিন রাখে। কিছুক্ষণ হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে আর গুটিয়ে এক্সারসাইজ করে নিল বসাক। একইসঙ্গে ফোর আর্মের কাজটাও হয়ে গেল। দুটো মেয়ে ঘুবঘুর করছে। মাগিগুলো ছিল উল্টোদিকে। গাড়িটা তিনটে লোক নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে এপারে চলে এসেছে। কেলটে মুখে একগাদা পাউডার চাপানো। নাইলনের শাড়ি। শালা, চেরা শায়াতে শহরটা একেবারে ছেয়ে গেল! ফের গাড়ি থেকে নামল বসাক।

—'তোরা এখানে থাক। মালটা যদি লেট করেও আসে। এখানে লোকজন রয়েছে। আমি পেছনে একটু গিয়ে পুকুরপাড়ে পেচ্ছাপ করে আসছি।'

—'সেকি স্যার! একলা যাবেন?'

—'দূর। পেচ্ছাপ করব তার আবার বডিগার্ড!'

—'কিন্তু স্যার, সেই পাগলটা!'

—'ছাড় তো, কোথায় শালা পাগলা আর কোথায় আমি। তোরা দাঁড়া। আমি আসছি।'

বসাক টলমল করতে করতে এগোয়। দূরের আলোগুলো থেকেও মাল ঠিকরে বেরোচ্ছে। তলপেটে প্রচণ্ড চাপ। হামা দিলে কেমন হয়, বসাক? হামা দিতে দিতে লালিপপ। এ এক মালমৃগয়া বা অভাবনীয় শিকার। সত্তরে যা সম্ভব হয়নি চুরানব্বইতে তা কার সাধ্য যে রুখবে?

ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রথমটি যদি ট্র্যাজেডি হয় তাহলে দ্বিতীয়টিকে কি ফার্স হতেই হবে? মহামতি মার্কসের সব কথাই কি ঠিক?

রণজয় যখন মনোহর দাস তড়াগের পাশের উঁচুনিচু, কেৎরে যাওয়া, এবড়োথেবড়ো জমি ভেঙে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছিল তখন কাছাকাছিই কোথাও সিল্কের লুঙ্গি তুলে, আন্ডারওয়্যার গুটিয়ে, পেচ্ছাপ করছিল বসাক। রিভলভারটা ফতুয়ার পকেটে ভারি হয়ে ঝুলছে। রণজয়েব হাতের রুটির প্যাকেটটা দুলছিল। বসাকের হাতে টর্চ। জ্বলন্ত। সেই টর্চের আলোয় বসাক হলদেটে পেচ্ছাপের লাইনটা চিকমিকে করে তুলেছে। মোনা মালটা তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করল? হঠাৎ মুখ তুলে শহীদ মিনারের আলোটা দেখে পুরনো, প্রেত-তাড়িত জায়গাটায যাবার বিশেষ ইচ্ছে হল বসাকের যেখান থেকে কবে যেন আটটা ছেলেকে রাত্তিরে তুলে নেওয়া হযেছিল। পেচ্ছাপের তবোয়াল টিপনি ছুরির ফলা হয়ে ঢুকে গেল, টুপটাপ খুচরো ফোঁটা ও শিহরণ। যন্তরটাকে নেড়ে আবার সিল্কের লুঙ্গির তলায় আন্ডারগ্রাউন্ড। মহান্তি-টা মোক্ষম বলেছিল,

—'নিউটনের ফোর্থ ল জানো তো গুরু? যতই নাড়ো শেষ ফোঁটা আন্ডাবওয়্যাবে লাগবেই।'

সব শালা চুপ। নরম্যাল শহর কলকাতা। এখানে যত ক্রিমিনাল বাড়ছে, ড্রাগ বাডছে, প্রোমোটাব বাড়ছে, হাই রাইজ, এখানে সেখানে মেয়েছেলের মাংসের কারবাব বাড়ছে, লিভিং টুগেদার বাড়ছে, গ্রুপ সেক্স, গোপন 'সেক্সাশ্রম', সেক্সারসাইজ বাড়ছে তত নরম্যাল হযে উঠছে কলকাতা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শহরের মধ্যে এই জলসবুজ নোংরাব মধ্যে, টর্চের আলোয় আচমকা বসাক দেখল প্যাঙ্গোলিনরা ছুটোছুটি করছে। বসাক দেখল আবছায়া অন্ধকারে কী এক হারামি কুহকে প্যাঙ্গোলিনরা উধাও, বেপাত্তা, ফোট্‌লাস্। বরং ডানদিকের ডুমো স্লোপ বেয়ে উঠে আসছে বণজয়। টর্চের আলোয বসাক দেখল রণজয় ব্যাটম্যানের মতো ডানা নাড়ছে। শুওবেব বাচ্চাটাকে ইন্টারোগেশনের সময় লাথি মেরে ফেললে এভাবে অন্তত দেখতে হত না। এভাবে হত না এই অভাবিত, আকস্মিক, কাকতালীয় সাক্ষাৎকার। ব্যাটম্যান ঝটরপটর করে ডানা নাড়ে। নাকি বসাকই আসলে ব্যাটম্যান? নিয়ান্ডারথাল মানুষের ওপর যখন ডাইনোসোরাস উড়ে এসে এরকম করে ডানা নাড়ত তখন কী করত নিযান্ডারথাল মানুষ যে লড়ে লড়ে কায়েম করে চলেছিল তার তড়াগলগ্ন কিম্ভূত পৃথিবী? একেবারে দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা যে গৌতম চক্রবর্তীর চোখের তলা দিয়ে বুলেটটা ঢুকে ব্রেনের মধ্যে চলে যায় ও বহু বছর পরে অ্যান্টি-বডিতে ঘেরা সেই মরা বুলেট নিয়ে গৌতম চক্রবর্তী ফের রাজনীতিতে ফিবে যায়, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাকে কী বলা যায়? আজকে আবার জ্যান্ত বুলেট দিয়ে গৌতম চক্রবর্তীকে শেষ করে দিলে কে বা কারা ঢিঢিক্কার দেবে? কে বলতে পারে যে কিম্ভূত পৃথিবীতে গৌতমের আরো বুলেট বরাদ্দ নেই? যে বুলেট ওই ভুল করবে না! এইসব ভাবনা বসাকের তখন মাথায় এসেছিল কি আসেনি জানার কোনো উপায় নেই। জানার উপায় নেই মহানায়ক কুয়াশাচ্ছন্ন ময়দানে কোন নিধন ও শিরচ্ছেদ দেখেছিলেন এবং দুঃস্বপ্নতাড়িত ম্যাজিকের ওই মতোই সন্ত্রস্ত ধোঁয়াছায়ায় বসাককে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর হিরো দেখতে পেয়েছিলেন না পাননি বা এসব দেখা, না দেখা নিয়েই তো আমাদের এত চাওয়া পাওয়া। বসাক টর্চের আলোয় রণজয়কে ধরে। এবং রিভলভার চালায়। এই যে তুই দুমড়ে দুমড়ে নোংরা মাটিতে গড়াচ্ছিস এটা স্রেফ তোর ডান হাঁটুতে গুলি লেগেছে বলে। রণজয়কে যুগ যুগ ধরে মারলেও বসাকের মারার তেষ্টা মিটবে না। শালা, ভালো করে দ্যাখ্। কিম্ভূত পৃথিবীতে স্বাভাবিক শহরের মাটির ক্যারেকটার। তলায় মেট্রোর নল, আরো তলায় ব্রিটিশ সাহেবদের অধঃপতিত

কামানলিঙ্গ, ভূপৃষ্ঠে দুধ খাওয়ার পর মাদার ডেয়ারির ফাঁকা মাই। ইতস্তত উজবুক ঘাস ও বিষাক্ত পার্থেনিয়াম। কোথাও কোথাও সেই প্রসিদ্ধ থানকুনি। পরের গুলিটা কোমরের ওপরে। স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে। রণজয় উলটে যায়। টর্চের আলোয় বসাককে দেখে। আমার সঙ্গে ভেনডেট্টা মারাতে এসেছ? বসাক ইজ বসাক। এবার যেখান থেকে বেবিয়েছিলিস সেই জায়গাটা মনে কর্—শালা, সেবার আমাকে মাবাব জন্যে বাগানের নিড়ানি নিয়ে পালিয়েছিলে, না? উত্তবে রণজয় হাঁ করে। জলেব জন্যে। এও একটা প্যারাডক্স—মানুষ কেন মরার আগে জল চায়। জল তো ছিল। তোকে পেয়ে যাব জানলে পেচ্ছাপটা ফালতু খরচ করতাম না। অ্যামেরিকান ক্যানড্ বিয়ার খেয়ে যত পেচ্ছাপ আমি আজ অব্দি ধরে রেখেছি তোদের ওই হেঁপো চারু মজুমদার সাঁৎরালেও পার হতে পাববে না। বণজযের হাঁ মুখেব মধ্যে গুলি কবে বসাক। শাদাকালো দাড়িচুল, মোটের ওপর ইলিপটিকাল মাথাটা বুলেটেব বিদারণে রম্বাস হয়ে যায় এবং তার ভুজগুলি ফেটেফুটে হতবাক, অসহায় ঘিলু বেরিয়ে সাবেন্ডার করে। হাত, পা কাঁপে ও নড়ে। ও মুরগির গলা কাটাব পবে বসাক অনেক দেখেছে। এইসময় চারদিকে লোডশেডিং হয়। স্রেফ টর্চের আলো। মরা, কিলড্, লিকুইডেটেড রণজয়েব শবীবের ওপব থেকে টর্চের আলোকস্তম্ভ ঘুরিয়ে আকাশে ফেলে বসাক। কৃষ্ণ গহ্বব আলো শুষে নেয়। রণজয়ের বডিটা পা দিয়ে অনুভব করে বসাক। ধুকপুক নেই। থিতোচ্ছে। জ্যান্ত মানুষ মড়া হতে হলে থিতোয়। বসাকের হাওয়াই চটি পবা এক জোড়া চামড়া হাড মাংসেব পা হঠাৎ খিমচে ধরে রণজয়। বসাক চিলচিৎকাব কবে জানান দেয়। টর্চেব ব্যাটাবিটা কাজ কবছে না? নাকি, বিভলভাবে গুলি নেই? প্রাক-ইতিহাসের যুগ থেকে রণজযের দুটো হাত বসাকেব দুটো ঠ্যাং খিমচে খিমচে ওপরে উঠছে। লিফট উঠছে। বাস্কেটেব মধ্যে গেঞ্জিব বুকে লেখা 'ওয়াঙ্গ ইজ নট এনাফ' একটা নাতনির বযসী মেয়ের সঙ্গে বেলুনিং করছে বসাক। হঠাৎ বাস্কেটের মেঝে ফাটিয়ে ঘিলুমাখা রম্বাস বেবোয়। এবং বসাকের পা কামড়ে ধরে। বণজযেব মাথাটা ভেঙেচুরে ঝুরঝুরে হযে গেল কিন্তু তাব থেকে কোটি কোটি লাল পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে। তাদের অনেকেরই ডানা ছিল।

গুলির আওযাজ আব চিৎকাব ধাওযা করে মান্না আব তাবক এসে দেখল বসাক দাঁড়িয়ে। ছেৎরে যাওয়া একটা ডাবের খোলায় ওর পা আটকে আছে। কিছুতেই ছাডাতে পারছে না। ওবা বসাককে ধরে নিয়ে গেল। বসাক তখন গোঙাচ্ছে।

মনোহর দাস তড়াগের কোণে, প্রেস ক্লাবের দিকে যে শানবাঁধানো ছাদওয়ালা জায়গাটা রয়েছে সেখানে বসে বণজয় গুলির তিনটে আওয়াজ আব তারপব চিৎকার শুনেছিল। দেখেছিল টর্চের আলো জ্বলছিল। তারপর নিভে গেল। আবছা কি সব নড়াচড়াও দেখা গেল যেন। তারপরে সব শুনশান।

পায়ের ব্যথাটা বেশ বেড়েছে। কিন্তু ব্যথা পাটাই কি যেন শুঁকছে। তারপর বোধহয় রুটির গন্ধটা পেয়ে কালো, কাদামাখা কুকুরছানাটা রণজয়েব কাছ ঘেঁষে এসে বসল।

কুকুরছানাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রণজয়। কাদা শুকিয়ে শুকিয়ে রয়েছে। কুকুরছানাটা কুঁইকুঁই করে আরো কাছ ঘেঁষে এল। রণজয়ের পাশে, সারা গা দগদগে শাদা একজন কুষ্ঠরোগীও বসেছিল। সারা গায়ে ব্যথা। কুকুবছানাটা গা বেয়ে উঠে এল। উঠে, কুঁকড়ে শুল।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। বাইফেলের ওপবে সব বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ি। খুব বড়। বড় বড় বাড়ি। আমি কী করে খুঁড়ে বের করব। কত জোর আছে আমার গায়ে? কোবাটাও ছোট। ও বড় হলে... ভুল হল।'

রণজয়ের খুব কান্না পায়। ডুকরে ডুকরে কান্না পায়। কিন্তু কমরেড লেনিন যদি জানতে পারেন যে রাইফেল পায়নি বলে হাল ছেড়ে দিয়ে রণজয় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে চাইছে। কুকুরছানার গায়ের গরমটায় বেশ আরাম লাগছে রণজয়ের। গরমটা ব্যথার দিকে ছড়াচ্ছে। খুব ভালো লাগছে। কোবা পা টিপে টিপে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে কি বলছে, বলেই চলেছে, কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে রণজয় কিন্তু কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছে না, কোবার ঠোঁট কানে লাগছে রণজয়ের। ভালো হল। কুকুরছানাটা একটু নড়েচড়ে উঠে আবার গুটিসুটি হয়ে শুল, একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। ঠিক হল। জেল গেটের বাইরে হাতেকাচা ধুতি আর খদ্দরের শাদা, ময়লা পাঞ্জাবি পরে বাবা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা কাপড়ের থলি। তার মধ্যে একটা টিফিন বাক্স। দুবান্ডিল বিড়ি। দেশলাই। টিফিন বাক্সের ভেতরে কী আছে? বাবা নিজে তৈরি করে এনেছে না কিনে এনেছে? বাবা ভালো। মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে রণজয়। যেখানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাবা হোঁচোট খেয়ে পড়ায় নতুন কেনা মাটির কুঁজোটা ভেঙে গেল। তারপর বাবার মুখটা। বাবা ভালো। চট আর পলিথিনের চাদবে জড়ানো অনেকটা মানুষের মতো দেখতে শুয়ে আছে। কোবা কথা বলেই চলেছে কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কোবা ভালো, কোবা ছোট। ঠাণ্ডা বাতাস এসে মেলির আঙুল হয়ে চুলের মধ্যে দিয়ে, মুখের ওপরে বুলোয়। মেলি ভালো। জলের তলায় একটা ঘণ্টা বাজছে তাব আওয়াজ নেই। তাড়াতাড়া অন্ধকার। লেনিন কথা বলছেন। হাসছেন। তারও শব্দ নেই। কোনো আলো নেই, শব্দ নেই...কিন্তু জেগে থাকা আছে।

কুকুরছানাটা হঠাৎ উঠে গর্‌গর্‌ করে ওঠায় রণজয়ের চটকাটা ভেঙে গেল। কুকুরছানাটা লাফিয়ে মেঝের ওপরে নেমে সরু গলায় ডাকতে থাকে। কিছু একটা বড়সড দেখে ভয পেযে থাকবে। রণজয়ের বড় ভালো লেগেছে কুকুরছানাটাকে। কুকুরছানাটা আবার ফিরে আসে রণজয়ের কাছে। বসে লেজ নাড়ে। কুঁইকুঁই করে। ওর খিদে পেয়েছে টের পাওয়ার সঙ্গে রণজয় বোঝে যে তার নিজেরও খিদে পেয়েছে।

—'খিদে সকলেরই পায়। তোমারও পেয়েছে, আমারও। এইবার পাঁউরুটি খাওয়া হবে। দাঁড়াও, আগে ভাগ করি।'

পাঁউরুটিটা ভেঙে তিনভাগ করে রণজয়। কুষ্ঠরোগীকে বলে,

—'রুটি খাবে?'

ও হাত বাড়ায়। ওকে দিয়ে তারপর কুকুরছানাটাকে দেয়। সে রুটির টুকরোটা পেয়েই চারদিকটা একবার দেখে নেয়। কেউ আছে কিনা। তারপর পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে দুথাবার মধ্যে রুটির টুকরো ধরে আধশোয়া হয়ে খেতে থাকে।

একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে খায় রণজয়। এরকম কবে খেলে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া যায়। কুষ্ঠরোগীর টিনের কৌটো থেকে একটু জলও খায়। টিনের ধারটা ধারালো। মরচে পড়া খাওয়ার পর জামার ওপর থেকে গুঁড়োগুলো তুলে পাশে মাটির দিকে ছুঁড়ে দেয়। কুকুরছানাটা ওকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে ভেবে তড়াক করে উঠেছিল।

—'ওগুলো তোমার জন্যে নয়। তোমার চেয়েও ছোট পিঁপড়েরা আছে। আরো কত ছোটপোকা আছে। তারা খাবে না?'

কুষ্ঠরোগী হেসে উঠেছিল রণজয়ের কথায়। শাদা মুখের মধ্যে শাদা দাঁত। রণজয় পা দুটো মুড়িয়ে কাছে নিয়ে আসে। হাত বুলোয়।

পরের দিন ভোরবেলা কৌশিক বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। ভেবেছিল ময়দানের ধারে গাড়িটা

রেখে একটু হাঁটবে বা জগিং করবে। এমনিতে কৌশিক এই রুটিনটা ফলো করে। কিন্তু পার্কস্ট্রিটের মোড় অব্দি গিয়ে কৌশিক দেখল ভালো লাগছে না, গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফেরার রাস্তায় দেখেছিল প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে দিয়ে একজন হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাছাকাছি গিয়ে, ফার্স্ট গিয়ার, প্রায় থেমে থেমে, ফলো করেছিল। সেন্ট পলস্-এর পাঁচিলের সামনে রণজয়কে ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে গাড়িটা পার্ক করে নেমে এসেছিল। দশ হাত দূর থেকে, সামনাসামনি, বলে উঠেছিল,

—'রণজয়দা!'

রণজয় দাঁড়িয়ে যায়।

এগিয়ে এসেছিল কৌশিক।

—'রণজয়দা, আমি কৌশিক।'

রণজয় কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। মুখে চিনতে না পারার—হাসি।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। সব বাড়ি উঠে গেছে।'

—'এসো, গাড়িতে ওঠো! দাঁড়াও দরজাটা খুলে দিই।'

৭

কৌশিক রণজয়কে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। রণজযের ব্যাগি স্পোর্টস শার্টের পিঠের দিকটা ছেঁড়া, শুকনো রক্তের দাগ। টেবিকটনের প্যান্ট কাদা মাখা। কৌশিকদের পৈতৃক বাড়িটা পুরনো আমলের। গাড়িবারান্দা সংলগ্ন বিশাল বসার ঘব। সেখানে রণজয়কে বসাল কৌশিক।

—'রণজয়দা, চা খাবে?'

এই লোকটা কী স্পাই? স্পাইরা অনেক সময় অযাচিতভাবে ভালো ব্যবহার করে। রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নেয়। বাড়িতে নিয়ে যায়। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে। এই কদিনে বুঝে গেছে রণজয় যে বিরাট একটা ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক কাজ করছে। একদিকে প্রাণপণে রক্ষা করা মুক্তাঞ্চল যে লাল বাড়ির ঘাঁটি, পাহাড়ে নয়, সমতলে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সামরিক হামলা চলছে। অথচ অন্যদিকে আপাতভাবে দেখলে কলকাতায় দেখা যাচ্ছে চাপা উত্তেজনা থাকলেও, সমাজতন্ত্রের জন্য রাস্তার গরিব ভিখিরি ও কোনো প্রাণীর উৎসাহ থাকলেও, যুদ্ধ হচ্ছে না। অন্তত প্রত্যক্ষভাবে। অবশ্য কিছুই যে হচ্ছে না সেটাও ঠিক নয়। তা না হলে সেই পর পর পুলিশভ্যান, জিপ, অ্যাম্বাসাডরের কনভয় সাইরেন বাজিয়ে গিয়েছিল কেন? কেন রণজয়দের গোপন অস্ত্রাগার, যেখানে আচ্ছাদিত শবদেহের মতো অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার ওপর সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই হয়ে যায় এবং তার ওপরে একের পর এক বাড়ি তৈরি হয়? অবশ্য এই লোকটা যদি স্পাই হয়ও এবং শেষ অব্দি রণজয়কে ধরিয়েই দেয় তাহলেও কি খুব দুঃখজনক কিছু ঘটবে? যে অভিমান যা মিশনের জন্য রণজয় এসেছিল তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এটা নির্মমভাবে সত্যি। ওদিকে কতদিন স্কুল থেকে ফিরে কোবা তার মা-র সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ঘরে ঢুকে দেখছে তো দেখছেই যে বাবা নেই। নিরুদ্দেশ। কখন ফিরবে, কিভাবে ফিরবে, ফিরবে কিনা, কেউ জানে না। কিন্তু এই লোকটা নাম জানল কী করে? এই লোকটার সঙ্গে কি ওই লোকটার যোগাযোগ আছে যার ঘরে কুপি জ্বলছিল আর অন্য কারা যেন মদ কিনতে আসছিল। আবার সেই লোকটাব কি সেই, সেই রাতের লোকটার

সঙ্গে যোগাযোগ আছে যে মোটরসাইকেলে চড়িয়েছিল। আবার এদের সবার সঙ্গে কি ওই এক পা লোকটার কথাবার্তা হয় যে গোপন অস্ত্রগারের খবর রাখে? এরা কি সবাই মিলে নিজেদের কথাগুলো একজনকে গিয়ে বলে আসে? হঠাৎ কেন জানে না তিনফলা নিড়ানির কথা মনে পড়ে গেল রণজয়ের আর খুব হাসি পেল।

—'রণজয়দা, চা খাবে?'

—'হ্যাঁ, জিভ পুড়ে যাবে এমন গরম। কিন্তু রাইফেল পাওয়া গেল না।'

কৌশিক ওদের ড্রাইভারকে বলল ওখানে থাকতে।

—'আসলাম, তুমি একটু দাদার কাছে থাকবে। ওঁর যদি কিছুর দরকার হয়।'

কৌশিক ভেতরে গিয়ে জয়িতাকে বলল। জয়িতা বলল রণজয়দার কথা সে এত শুনেছে, একবার দেখবে।

—'একটু দরজার ফাঁক থেকে দেখ। খুব সামনে যেও না। কিভাবে বিয়্যাক্ট কববে জানি না। যাই হোক চা-টা আগে চটপট পাঠাও।'

কৌশিক প্রথমে ডঃ মিত্রকে বাড়িতে ফোন করল। ডঃ মিত্র শুনে বললেন যে ডঃ দাম-এব কনট্যাক্ট নাম্বারটা তাঁব কাছে রয়েছে। উনিই ডঃ দামকে খবব দেবেন। কৌশিক তারপব মেখলাকে ফোন করল।

—'মেলাদি, গ্রেট নিউজ! পেয়েছি। না, না, জামাকাপডগুলো নোংবা—আদারওযাইজ ঠিকই আছে। একটু লিম্প্ করছে বলে মনে হল বাট দ্যাটস নাথিং। কোবাকে খববটা জানিযে দাও। কী বলছ? তুমি আসবে? তবে আমি কি বলব, জানো—এসো, কিন্তু ডিবেক্টলি সামনে এস না। আমাকে চিনতে পারেনি। তোমাকেও ধরে নেওয়া যায় পাববে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একেবারে ইমোশনাল হচ্ছি না। এই সময় যেটা দরকাব সেটা হল ক্লিনিক্যল ডিটাচমেন্ট। হ্যাঁ, অলরেডি আমি ডঃ মিত্রেব সঙ্গে কথা বললাম। উনি ডঃ দামকে বলে, আই থিংক, নেসেসাবি অ্যারেঞ্জমেন্ট সবই করবেন। হ্যাঁ, যেতে পারি। আগে দেখি ওঁরা কী বলেন। আব নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে তোমাকে জানাব। আব শোনো, মেল্লাদি, তুমি কিন্তু আপসেট হবে না। কথা দিতে হবে। পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই টেনশনটা তো টাচ উড কাটল, এখন বণজয়দাকে আবার ওব নিজস্ব নিয়মের মধ্যে পাঠাতে হবে। এ-কদিন ওষুধ খায়নি তো বটেই, ঘুমোয়নিও নিশ্চয। যাই হোক আমি রাখছি।'

এমনিতে সিগারেট খায় না কৌশিক কিন্তু কখনোসখনো একটা আধটা খায়। ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট আর লাইটারটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল। প্যাকেট আর লাইটারটা পকেটে রাখল। লাইটারটার ওপরে লেখা রয়েছে। 'ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ'। তার তলায় 'হলিউড'। এটা যখনই কেউ লক্ষ করে তখনই খুব নির্লিপ্তভাবে কৌশিক বলে যে, এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক একটা কনফারেন্সে ওকে পল নিউম্যান এটা দিয়েছিল। এত পাজি যে জয়িতার দাদাকেও এটা বলেছিল।

—'নাউ, অপারেশন বসাক।'

ফোন করতে যাবে, এমন সময় ঘরে জয়িতা ঢুকল।

—'রণজয়কে খুঁজে পেয়েছ, সেই আনন্দে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে বুঝি?'

—'তোর কি রে হতচ্ছাড়ী? আজ শালা সিগারেট খাব, চোলাই খাব, খেয়ে বাওয়াল করব।'

—'জানো, তোমার রণজয়দাকে দেখে এলাম। ইনস্যানিটি বলো, যাই বলো, চেহারাটার মধ্যে একটা সেজলাইক ব্যাপার রয়েছে। এল গ্রেকোর আঁকা কোনো সেন্টের ছবির মতো।'

—'কথাটা মন্দ বলনি। দা কমপ্যারিজন ইজ বাদার গুড। গড, তোমার সম্বন্ধে আমার অ্যাসেসমেন্টটাই দেখছি পাল্টাতে হবে।'

—'পাল্টাও। এখন আমাকে কী কবতে হবে বলো!'

—'তোমাকে ও হ্যাঁ, এক্ষুনি মেলাদি আসবে, সঙ্গে কোবা উল্লুকটাও থাকবে। ওদের ভেতবে নিযে আসবে। মেলাদিকে সামনে যেতে দেওযাটা আমাব মতে ডক্টর দামের সঙ্গে কথা না বলে ঠিক হবে না। বুঝলে? আর, এখন চুপ কবে পাশেব ঘবে গিয়ে রিসিভারটা তুলে শুনে যাও আমি জনৈক মিঃ বসাককে কী বলছি।'

বসাকেব নম্বব ডাযাল কবল কৌশিক। বেশ কযেকবাব বিং হযে গেল কেউ ধবল না। কৌশিক বিসিভাব নামিযে বাখল। জযিতা পাশের ঘর থেকে বলল,

—'কী হল? পেলে না?'

—'দাঁড়াও তো! পেলে না? প্রথমে অ্যাডভান্স এলার্মটা দিলাম। এবার তুলবে।'

—'ও'।

আবাব ডাযাল কবল কৌশিক। আট বাব বিং কবাব পবে ঘুম জড়ানো গলায একটি পুরুষ কণ্ঠ,

—'কাকে চাই?'

—'তোব বাবাকে চাই। মানে, আপনি মিস্টাব বসাকেব ছেলে তো?'

—'হ্যাঁ। এত সকালে।'

—'একে এত সকাল বলে না সোনা। সকাল অনেকক্ষণ হযে গেছে। তুমি একটু তোমাব বাবাকে দেবে?'

—'বাবা এখন আসতে পাববেন না।'

—'আসতে তো বলিনি। ফোনটি শুধু দয়া কবে ধববেন। এই কথাটা বলে দাও দাদু।'

—'বাবা আসবে না, বাবা ঘুমোচ্ছে।'

—'ঘুমোচ্ছে? ঘুমিয়ে থাকলে মিটে যাবে সব। অ্যাঁঃ, ভেবেছ এই সাতসকালে আমি ইয়ার্কি দিচ্ছি। এক থাবডা মারব পাঁচটা উইকেট পড়ে যাবে।'

—'কে কথা বলছেন আপনি?'

—'আমি পুলিশের ডিসি। পাঁচুগোপাল ডিহিদাব। ডিসিডিডি পিকিউআরএল। বাবাকে ডাকো।'

—'কেন?'

—'কেন? ন্যাকামি হচ্ছে। তোমার নাম কী ছোকরা? তোমার, হ্যাঁ তোমাব বাবার সিকিউরিটি ঘেঁচুকলার লোকরা জোকার ফেরোকোটিং কারখানাতে ডিউটি করে। জানো?'

—'হ্যাঁ জানি।'

—'সেখানে ওঃ মার্ডার মোস্ট ফাউল, গতরাতে তেরোটা মার্ডার হয়েছে।'

—'অ্যাঁঃ!'

—'অ্যাঁ ফ্যাঁ নয়, থার্টিন জলজ্যান্ত মানুষ—সবকটি গার্ড, দাবোয়ান, অফিসার সব কচুকাটা, তেরোটি ছিন্ন মুণ্ডু গড়ায় ধরণীতলে, ডাক্ বাবাকে, হিঁচড়ে ঘুম থেকে তোল্। স্টুপিড।'

—'হ্যাঁ, ডাকছি।'

ঘটরঘটর করে রিসিভার রাখার শব্দ! ওদিকে হইচই শোনা যায়। জযিতা এবার হেসে কুটিপাটি হয়। শুনতে পায় কৌশিক।

—'কি হচ্ছে কি কুশ।'

—'কিছুই হচ্ছে না। একটু ডুশ দিচ্ছি। কৌশিক কু মাল তুমি জানো না, বসাকও জানে না। এইবার জানবে। ইয়ো হো হো অ্যান্ড আ বটল্ অফ রাম! ক্লাইভের রণবাদ্য শুনতে পাচ্ছ?'

দড়াম ধড়াম দরজার শব্দ। চটির শব্দ কাছে আসে। একবার রিসিভারটি হাত ফস্‌কে যাওয়ায় বিদঘুটে শব্দ হয়।

—'হ্যাঁ... লো?'

—'গতরাতে কত পেগ সাঁটিয়েছিলে চাঁদু যে হাত থেকে ফোন হড়কে যাচ্ছে?'

—'কে কথা বলছেন?'

—'কেন জোনাকি, আমার গলা তুমি চেন না, বস?'

—'ও, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আপনি সেই কৌশিকবাবু।'

—'সেই কৌশিকবাবু নয়, এই কৌশিকবাবু, এরকম মাল এক পিস তৈবি করে ভগবান ডাইস ভেঙে দেয়।'

—'তা এত সকালে কেন?'

—'ইয়ার্কি দেব বলে!'

—'মানে?'

—'চুপ! তোমাকে জানিয়ে দিলাম বসাক যে রণজয়কে পাওয়া গেছে!'

—'অ্যাঁঃ ক্যাপচার্ড! ক্যাপচার্ড!'

—'খুব আনন্দ হচ্ছে না?'

—'তা একটু তো হবেই।'

—'ঠিক আছে। এ.কে ফর্টিসেভেনটা এবার মিস করল। বেটার লাক নেক্সট্ টাইম।'

—'মানে?'

—'পরের বার আমি একটি হাইলি পাওয়ারফুল উজি সাবমেশিনগান হাতে রণজয়দাকে পাঠাব। নিজেই আপনার বাড়িতে নিয়ে যাব। উজি কী যন্তর জানেন তো? ওই সব তারক, মান্না, গুষ্টির পিণ্ডি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধুনে দেবে!'

—'আমি পুলিশে খবর দেব।'

—'হ্যাঁ, দিন। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করুন। তবে নেক্সট্‌বার পালানো অব্দি কোনো চিন্তা নেই। নামটা মনে রাখবেন, উজি। রাখলাম। ঘ্যাচাং।'

জয়িতা এ ঘরে এল। এসে কৌশিককে একটা চুমু খেল।

—'মুখে বিচ্ছিরি সিগারেটের গন্ধ। আর কি জঘন্য করে কথা বলতে পার!'

—'অনেক কিছু পারি জয়িতা, দুঃখ এই যে, কেউ বুঝতেই পারলো না। আমি নীচে গেলাম, রণজয়দার কাছে!'

ফোন বাজল। ডক্টর দামের ফোন। ডক্টর দাম বললেন যে উনি ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কৌশিকের বাড়িতে আসবেন। জায়গাটা ভালো করে জেনে নিলেন। জানালেন ডক্টর মিত্র লেক রোডের একটা জায়গায় বলে দিচ্ছেন, ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবে। আর ডক্টর দামকে রাস্তায় অ্যাসিস্ট করার জন্য দুজন ট্রেন্ড অ্যাটেনডেন্টকেও পাঠাচ্ছেন। নীচে নেমে কি সাত পাঁচ ভেবে আসলামকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিল কৌশিক ট্যাংক ফুল করে পেট্রোল আনার জন্যে। বাড়ির আরো দুজন কাজের লোককে গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কৌশিক। ট্যাক্সি এলেই যারা আসবে নিয়ে আসতে হবে। এইসব তাড়াহুড়োর মধ্যে হঠাৎ কৌশিকের মনে হল যে,

রণজয়দার সই করা একটা বই নিয়ে গিয়ে বলবে যে বইটা চিনতে পারছে কিনা। যেমন, ভিলহেল্‌ম্‌ লিবনেখত্‌-এর 'অন দা পলিটিকাল পোজিশন অফ সোশাল-ডেমক্র্যাসি' বা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে ক্লারা সেৎকিন-এব 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' অথবা 'রিডার্স গাইড টু দা মার্কসিস্ট ক্লাসিকস'—মরিস কর্নফোর্থেব—লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট লিমিটিড, ১৯৫৩ অথবা গিওর্গি দিমিত্রভের 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ দা ওয়ার্কিং ক্লাস এগেন্সট ফ্যাসিজম'। ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেব সপ্তম বিশ্বসম্মেলনে প্রদত্ত এই প্রতিবেদনটি কলকাতার 'কালচার পাবলিশার্স' ১৯৬৮-র মে দিবসে প্রকাশ কবেছিল। এই বই, আরো কত বই, রণজয়দাকে দেখাবে কৌশিক? রণজয়দা যদি চিনতে না পারে? রণজয়দা কেন বলল যে, রাইফেল পাওয়া গেল না?

ট্যাক্‌সি থেকে মেখলা আর কোবা নামল। কোবার কাঁধে একটা ওভাবনাইট ব্যাগ। মেখলার চুল আঁচড়ানো নেই। কোনোমতে শাড়ি পরেছে। কৌশিক তখন রণজয়ের কাছে বসেছিল। একটু আগে বলেছিল,

—'সিগারেট খাবে রণজয়দা?'

—'দাও।'

চশমাটা খুলে বড় টেবিলটার ওপর রাখল বণজয়। তাবপব পা ছড়িয়ে চোখ বুজে সিগাবেট খাচ্ছিল। হঠাৎ কাশি হল রণজয়েব। সিগাবেটটা চাযেব খালি কাপে ডুবিয়ে মারল। এই লোকটা কিভাবে যেন নামটা জেনে গেছে। বণজয় ভাবল মেখলা আর কোবাব কাছে কী করে ফিবে পাওয়া যায়। এমন সময় মেখলা আর কোবা ঘরে ঢুকেছিল। নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কৌশিক। চশমা না পরা চোখে দুটো আলোমাখা অবয়ব দেখল রণজয়। হাত নেড়ে ডাকল। এরপরের ঘটনাটার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না কৌশিক। কোবাও ছিল না। মেখলা হেঁটে হেঁটে রণজয়ের কাছে এল। পর্দা সবিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয়িতা। কোবা ঠায় দাঁড়িয়ে, কাঁধে ওভাবনাইট ট্র্যাভেলিং ব্যাগ। মেখলা রণজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হল। কোবা জানে মা-র ওরকম করে নিচু হলে কষ্ট হয়। জয়িতা এগিয়ে এসেছিল। কোবাও ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছিল। কোবাকে ধরেছিল কৌশিক। কোবা দেখল কৌশিককাকুর হাতটা তার ঘাড়ে খিমচে ধরেছে।

মেখলা রণজয়ের পাশে নিচু হয়ে রণজয়ের গলা জড়িয়ে ধবে রণজয়ের মাথায় চুমু খেয়েছিল আর এই চুম্বনের সময় নিজের কান্নাও খেয়েছিল মেখলা। রণজয়ের কপালে, ক্লান্ত চোখে, গালে, ঠোটে। রণজয়কে জাপটে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল মেখলা। মেখলার কান্না, মেখলার মুখের লালা, মেখলার নিঃশ্বাস রণজয়ের খাড়া খাড়া হলদেটে চুলে, দাড়িতে, বন্ধ করা চোখে। অনেকক্ষণ ধরে রণজয়কে কান্না দিয়ে আদর করার পর মেখলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই কোমরের ব্যথার জন্যে টলে যায় আর তখনই জয়িতা পেছন থেকে মেখলাকে ধরে নেয়। রণজয় হাতড়ে হাতড়ে চশমাটা নিয়ে পরল, শার্টের হাতায় ঠোটটা মুছল, তারপর হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে মেখলা আর জয়িতার দিকে তাকাল। ওদের থেকে চোখ সরিয়ে নিল রণজয়। সামনে যে দুজন দাঁড়িয়ে তাদের ওপারেও দেখা যায়। খুব নিচু গলায় রণজয় বলে। কিন্তু আস্তে বললেও শোনা যায়,

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। রাইফেলের ওপরে বাড়ি হয়ে গেছে। আমার গায়ে কি এত জোর আছে? কুকুর ছানা ছোট। ভালো হল। কুকুরছানা পারবে? ভুল হল। বাবা জেলে, বাজে জেলে, ভুল হল। মেলি ভালো। ঠিক হল। কোবা ভালো। ঠিক হল। বাবা জেলে, ভুল হল।'

রণজয় উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে এগোয়। কৌশিক গিয়ে আলতো করে রণজয়কে ধরে। কৌশিকের দিকে হাসিমুখে তাকায় রণজয়,

—'রাইফেল মাটির তলায়। ভুল হল। কমরেড লেনিন আমাকে বকলেন। ঠিক হল। আমাকে ধরিয়ে দেওয়া হল। ঠিক হল। কুকুর ছানা রুটি খেল, শাদা শাদাও রুটি খেল। ভালো হল। পিঁপড়েরা রুটি খেল। ঠিক হল। বাবা এল। বা..বা!'

বণজয় চিৎকার করে,

—'বাবা!'

বণজয় উঠে সামনে এগোয। কোবাকে থামিয়ে কৌশিক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

—'বাবা! ওরা খালি ভয় দেখায়। আর মাবে। রাইফেল নেই। বাবা নেই। বাবা।' কেঁদে কুটিপাটি হয় রণজয়। আবার শান্ত হয ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে।

—'জেলে হল। ভুল হল। কুকুরছানা এল। ঠিক হল। কোবা। ঠিক হল। মেলি! মেলি ভালো। মেলি খুব ভালো। মেলি কটি খায। ভালো হল। ঠিক হল।'

কৌশিক আবার বলে।

—'রণজয়দা, চলো। গিয়ে বসবে চলো।' বণজয বলে,

—হ্যাঁ, চলো।

রণজয় ফিরে এসে বসে।

—'পায়ে খুব ব্যথা।'

বাঁ পাটা ফুলেছে।

দামডাক্তাব এলেন। স্নানটান সেরে এসেছেন। সচরাচর প্যান্ট পরেন না। আজ প্যান্ট, বুশ শার্ট। শার্টটা নতুন। বড় মেয়ে দিয়েছে। সঙ্গে ছোট সুটকেস, কাপডেব ঢাকনা পবানো। উনি এসে বণজয়ের উল্টোদিকে চেয়াব টেনে বসলেন।

—'কেমন আছ রণজয়?'

—'ভালো হল। কিন্তু পায়ে খুব ব্যথা।'

—'দেখি পা-টা। ও আমি ওষুধ দেব সেবে যাবে।

স্প্রেন-টেনের কোনো মলম আছে নাকি?'

কৌশিক বলল,

—'আছে।'

—'নিয়ে এসো। আর এক গ্লাস জল। রণজয় একটা ওষুধ খাবে।'

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। সব বাড়ি উঠে গেছে।'

দাম ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে মেখলার কাছে গেলেন,

—'একেবারে আপসেট হবেন না। রণজয়কে এত ভালো অবস্থায় পাব বলে ভাবিনি। কোনো চিন্তা নেই। আর তুমিই তো অনির্বাণ, এসো, কাছে এসো—বাঃ ব্রাইট ইয়ং ম্যান, কী করছ কী এখন?'

মেখলা একটু নালিশ করে নেয় এই ফাঁকে,

—'দেখুন না, কিছুতেই চাকরি করবে না। বলে, করলে বড়জোর বাবার মতো পড়াতে পারি। কথা শোনে না।'

—'সে তো হবেই। বাপকা বেটা তো। জানো, এখনো মাঝে মাঝে তোমার বাবার কাছে এত চমৎকার সব কথা, গল্প শুনতে পাই যে প্রাণটা ভরে ওঠে। বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে

না, কেমন? সব দায় আমার। সে না হলে এই বুড়ো বয়সে ছুটে আসি?'

—'আচ্ছা ডাক্তারদাদু, বাবা এইভাবে, মানে, মাঝে মাঝে এসকেপ করেন কেন?'

দাম ডাক্তার একটু চোখ বুজে হাসেন।

—'দ্যাখো দাদু, হাঁপ ধরে যায়। আটকে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে যায়। সাবাদিন ধরে বাড়িতে থাকলে তোমার বা আমারই কি ভালো লাগবে? লাগবে না। মনে হবে যাই একটু ঘুবে আসি। ওরও তাই। এখন এই বেরোনোর, মানে ইচ্ছেটা, তার এইম আর কি, ও যে কিভাবে ঠিক করে সেটা আমরা জানি না।'

কৌশিক জল আর অয়েন্টমেন্ট হাতে দাঁড়িয়েছিল। দামডাক্তাব বুক পকেট থেকে ওষুধটা বের করেন। স্ট্রিপ থেকে নেওযা হলদেটে একটা ট্যাবলেট,

—'নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো। লক্ষ্মী ছেলে। এবাবে ফিরে যাব না আমরা, রণজয়?'

—'হ্যাঁ।'

—'সেই ফুলগাছ, শীত পডছে, কত ফুল ফুটছে।'

--'হ্যাঁ।'

দাম ডক্তার রণজয়ের পায়ে মলম লাগিযে দেন।

—'এই তো এবার ব্যথা কমে যাবে।'

বণজয় শান্ত হয়ে চুপ কবে বসে থাকে। দাম ডাক্তার গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন। কৌশিক বলল,

—'আমি আর কোবা যাচ্ছি, আমার গাড়িতে। বণজয়দা সেফলি পৌঁছে গেলে, সন্ধেবেলা আমরা ফিরে আসব।'

— ফিরবে কেন? একটা বাত তোমরা আমাব বাডিতেই থাকতে পার।'

—'সে তো পারিই। কিন্তু কাল খুব জরুবি কাজ রযেছে। আমাকে ফিরতেই হবে। তবে ডাক্তারবাবু, এবার ঠিক করেছি অন্তত দুমাস অন্তর আমরা একবার ঘুরে আসব, তখন থাকা যাবে।'

কৌশিক রেডি হতে চলে গেল। মেখলা দাম ডাক্তাব বলল,

—'ডাক্তারবাবু, রণজয়কে বড় বেশি রোগা লাগছে। মাস চারেক আগেও যখন দেখতে গিয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি।'

—'এখন যেটা দেখেছেন সেটাতে এই ধকলের ছাপটা রয়েছে। ওটা কেটে যাবে। তবে, আমি ওর ডায়েটটা এবার একটু সুপারভাইজ করব। আসলে কি জানেন, একা হাতে কত দিক সামলাব? ওর বলে নয়, নিজের মুখেই বলছি, খাওয়াদাওয়াটা ওখানে কিছুদিন হল বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কিছু একটা এবার আমাকেই করতে হবে।'

দাম ডাক্তার জানতে চাইলেন যে, রণজয় সকাল থেকে কী খেয়েছে? চা খেয়েছে এক কাপ।

'রণজয়? রণজয়?'

মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল রণজয়ের।

—'কি?'

—'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?'

—'না। রুটি ছিল।'

—'এখন কিছু খাবে?'

—'না। রুটি খেয়েছি। কুকুরছানা।'

দাম ডাক্তার মেখলাকে বললেন,

—'একটু ঝিম ধরা থাকবে। রাস্তায় থামতে তো হবেই। আমার সঙ্গে খাবার আছে, মেয়ে বেশি করে দিয়েছে। আর মিষ্টির দোকান পাব। ঠিক আছে।'

দশটার সময় কৌশিকদের বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি বেরিয়ে গেল। প্রথমে একটা শাদা অ্যাম্বুলেন্স। ওপরে নীল আলো বসানো। পেছনে ব্রাউন ওল্ড মডেলের মারুতি। গাড়ি দুটো বেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিল। বাঁদিকে, দূরে একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়েছিল। সেটাও চলে গেল। কেউ খেয়াল করেনি।

অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার আগে, কাছে গিয়ে রণজয়ের মাথায় হাত রেখে মেখলা বলেছিল,

—'ভালো থেকো।'

রাস্তায় রণজয় বেশিরভাগ সময়টাই চোখ খুলে শুয়েছিল। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করলেও ঘুমোয়নি। রণজয় দেখছিল ওপরে, টানা রডের গায়ে সার সার চামড়ার হাতল ঝুলছে, দুলছে। মনে হবে সার দিয়ে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। জয়া শুয়ার গল্প। ফুচিক। রণজয় চোখ বন্ধ করে। একটানা গাড়ির ইনজিনের শব্দ। কোবা আর মেলার কাছে ফিরে যাচ্ছে রণজয়। রাইফেল, সেই চট আর পলিথিনে জড়ানো মানুষের মতো দেখতে, হাঁটু ভাঙা, তলায় ইট বিছোনো, ওপরে পেরেক বের হয়ে থাকা কাঠের তক্তা, তার ওপরে ইট, মাটি, বাড়ি, তলায় মানুষের মতো দেখতে, কমরেড লেনিন, কী বলেছিলেন যেন। পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রথম জলোচ্ছ্বাস...জনগণের প্রতি মন দাও...ইঞ্জিনের শব্দ...অ্যাম্বুলেন্স যখন ধীর হয়ে যায়, হাম্প টপকায়, তখন তলা দিয়ে একটা ঢেউ চলে গেল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলেছে, লাল ফৌজ চলেছে, রণজয় চলেছে, হঠাৎ পকেটে হাত দেয় রণজয়, খবরের কাগজটা রয়েছে, লাল ফৌজের সাঁড়াশির আঁটুনির মধ্যে, অবিশ্রান্ত ট্যাংক চলার ঘর্ঘর শব্দ, স্তালিনগ্রাদ, কারা 'হুররা' বলে চেঁচাল, বরফ-রক্ত-মাংস-লোহা-বারুদের কাদা হয়ে গেছে, কামান, মর্টার, অ্যাম্বুলেন্সের ইঞ্জিনের শব্দ যার মধ্যে রণজয় চলেছে দুর্ভেদ্য লাল ঘাঁটিতে, টেলিফোনে মার্শাল রকোসভ্স্কির সঙ্গে কথা বলছেন কমরেড স্তালিন, মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে লড়াই চলছে, লড়াই হচ্ছে কুর্স্ক, লড়াই চলছে, লড়াই চলবে, কানের কাছে এসে রোগা কুকুরছানাটা শুঁকছে, তাকে বুকের ওপরে তুলে নিল রণজয়, সঙ্গে যাবে, কোবার সঙ্গে খেলা করবে, কোবা মুরগিদের ভয় পায়, কোবা বড় হচ্ছে, নিরন্তর যুদ্ধের মধ্যে কাঁটাতারের পেছনে লক্ষ লক্ষ শিশুর মুখ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস-চেম্বার, তার মধ্যে বড় হচ্ছে কোবা, কোবা পালাচ্ছে গেস্টাপোর হাত থেকে, অ্যাম্বুলেন্সের ছাদের রডের ফাঁসির দড়ি থেকে ঝুলছে পার্টিজানদের নিষ্প্রাণ দেহ...

দাম ডাক্তার কখনো বাইরে দেখছিলেন। কখনো খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া করার জন্য রাস্তার ধারে একটা বড় ধাবা দেখে গাড়ি থামানো হল। দাম ডাক্তার বললেন,

—'তোমরা ওখানে খাও। তড়কা-রুটি আমি রণজয়কে খেতে দেব না। খুব ঝাল, মশলা থাকে। আমি ওকে উল্টোদিকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাচ্ছি।'

কৌশিক, কোবা ও বাকি তিনজন ধাবায় গেল। মিষ্টির দোকানে দুজন গ্রামের লোক আলুর দম দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছিল। রণজয় খেতে চাইল। এরকম খাবার সে কখনো খেয়েছে। কখনো, কোথায়? না কি মুড়ি জল দিয়ে মেখে তার সঙ্গে আলুর চপ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিলে রণজয়। তোমার মনে পড়ে না? দাম ডাক্তারের খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রণজয় যখন চাইল তখন খাক। লোকে তো খাচ্ছে। রণজয় খুব তৃপ্তি করে খেল। হেসে বলল,

—'ঠিক হল।'

—'মিষ্টি খাবে রণজয়? চমচমটা বেশ টাটকা মনে হচ্ছে। খাবে?'

—'না।'

দাম ডাক্তার মেয়েব দেওয়া স্যান্ডউইচ আব সন্দেশ খেলেন।

—'সন্দেহ খাবে, রণজয়?'

—'না।'

বাকি রাস্তাটা বণজয় আর শোয়নি। বসেছিল। বাইরে দেখছিল। রোদ্দুরের তেজ কম। গাছপালা, মাঠ, লেভেল ক্রসিং সব কেমন আঁকা আঁকা। নিথর।

অ্যাসাইলামে ওদের পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল সাড়ে চারটে হয়ে গেল। দাম ডাক্তার রণজয়কে নিয়ে ওপরে গেলেন। রণজয়ের জন্যে গরম জল এল। খোলা বাথরুমে স্নান করার পর রণজয়কে কাচা পাজামা, শার্ট পরানো হল। রণজয় ঘবে বসে বিকেলের দুধ-পাঁউরুটি খেল। ওষুধ খেল। গোবিন্দকে একটা টুল দিয়ে বাইবে বসিযে বেখেছিলেন দাম ডাক্তার। রণজয় ছেঁড়া খবরের কাগজটা নিয়ে টেবিলের ওপব বাখল। তারপর পকেটে কবে যে রিফিলটা নিয়ে গিয়েছিল সেটা দিয়ে কয়েকটা খবরের তলায় দাগ দিল,

—'স্পেনে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ৪০,০০০ বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিক এসেছেন। এঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড।'

—' "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" নগুয়েন ভ্যান ত্রযের শেষ উক্তি, এগারোটা বাজতে দশ, ১৫ অক্টোবব, ১৯৬৪।'

—'বেলেঘাটা হত্যাকাণ্ড, ২০ নভেম্বর, ১৯৭০।'

—'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৩১.৭.৭২—'শ্রীকপুবী ঠাকুর অভিযোগ করেন যে "চারু মজুমদারকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি অসুখে মারা যাননি।" '

রণজয় গোবিন্দকে ডাকল। হাত নেড়ে।

—'কী চাই রণজয়দাদা?'

—'আমাকে একটা বিড়ি দেবে?'

—'নাও।'

বিড়িটা ধরিয়ে রণজয় ধোঁয়াটা ভেতরে নিল।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না।'

—'হ্যাঁ, রণজয়দাদা।'

—'ওপরে সব বাড়ি উঠে গেছে। ভুল হল।'

দূরে কোথাও বোমা ফাটল। অনেক দূরে।

কৌশিক আর কোবা ফুলগাছের বেডের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। দুজনেই সিগারেট খাচ্ছে। কোবা হঠাৎ বলল,

—'ফুলগাছের চারাগুলো কয়েকটা জায়গায় থেঁৎলে গেছে। দেখেছো!'

মরসুমি ফুল। ফুটতে শুরু করেছে। চন্দ্রমল্লিকা! ফ্লকস্। বোতামফুল। গাছগুলো আরো বড় হবে। ডালিয়াতেও ফুল ধরেছে। আরো বড় হবে। ভালো হল।

—'ওই যে মুরগির ঘর।'

—'ওটাই হল মডার্ন অ্যাপ্রোচ। বুঝলি কেন এগুলো করেছে। হোলিস্টিক একটা সেট-আপে পেশেন্টদের নিয়ে আসা।'

কোথাও কেউ চেঁচাল। গলাটা রণজয়ের নয়। দুজনেই সেই দিকে তাকাল। মুরগির ফোকর ফোকর ঘর পাঁচিলের গায়। পাঁচিলের ওপরে কাচ বসানো। তার ওপরে লোহার অ্যাঙ্গেলে লাগানো টান টান তিন সার কাঁটা তার।

—'একটা লোকের ওপরে আমার খুব রাগ আছে, জানো?'

—'কে?'

—'তুমি কাউকে বলবে না তো?'

—'না। রেশমির কথা আমি কাউকে বলেছি?'

—'বলবে। আর একটু স্টেবল হতে দাও আমাকে। তখন বলবে।'

—'কার ওপরে তোর রাগ?'

—'পার্থকাকু।'

—'আমারও আছে। তবে ওকে তুই আনঅ্যাভয়ডেবল নুইসেন্স হিসেবে ট্রিট করতে পারিস।'

—'তাই তো করি।'

—'দ্যাখ্, এটা একটা হোলি প্রেস। ওখানে রণজয়দা থাকে। এখানে আমরা না হয় ওই ভামটাকে নিয়ে কথা নাই বা বললাম।'

—'সেই ভালো।'

—'আজকের, মানে এই গোটা এপিসোডটার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা কী বল্ তো?'

—'তোমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া।'

—'হ্যাঁ। স্ট্রেঞ্জ। যাদবপুর আর প্ল্যানেটেরিয়াম। টেলিপ্যাথির মতো। ভাবা যায় না।

হো হো হাওয়া আসে। ফুলেরা নড়ে চড়ে। মুরগিরা কঁক্ কঁক্ করে ওঠে। গার্ডদের ঘবে রেডিও বাজছে? বাইরে আকন্দগাছ, কালকাসুন্দার বন দুলে দুলে উঠেছিল। ঠিক হল।

দাম ডাক্তার কৌশিক আর কোবাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ওরা হাতমুখ ধুল। পরোটা, আলুভাজা খেল। বেলী ক্যাসেটে সুমনের গান শুনছিল। দাম ডাক্তারও খেলেন। পরোটা, আলুভাজা। মেয়ের দেওয়া সন্দেশ। সবাই খেলো। পরে চা।

—'অনির্বাণ! তোমাকে আমি একটা কথা বলি, মনে রাখবে?'

ঘরে কেউ নেই। কৌশিক, কোবা আর দাম ডাক্তার।

—'বলুন, ডাক্তার দাদু।'

—'আমরা একবার পড়েছিলাম একটা কথা। এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনা আর ডিপ্রেশান, এর মধ্যের স্টেজটা হচ্ছে নরম্যাল অবস্থা। মানে, ওপরেও ওষুধ দরকার। নীচেও ওষুধ দরকাব। মধ্যে রণজয় কেন, আমরা সকলেই স্বাভাবিক। তখন কি ওষুধ লাগে?'

—'না!'

—'রণজয়! ইয়োর ফাদার! তোমার বাবা! সেই অবস্থাতেও থাকে। আমরা কথা বলি। গল্প করি।'

—'মানে, সেই অবস্থাটা আসে?'

—'হ্যাঁ, আসে।'

—'মানে রণজয়, রণজয়,—ওর একটা ভিশন রয়েছে...ও কিছু দেখে, না দেখলে কেন পালাতে যাবে? হোয়াই?...' শীতের উদ্বেল হাওয়া আসে। কৌশিক বলে,

—'ডাক্তারবাবু আমাদের ফিরতে হবে। সন্ধে হয়ে গেল।'

—'হ্যাঁ, সন্ধে হয়ে গেল।'

—'ডাক্তারদাদু, আমি একবার বাবাব সঙ্গে দেখা কবব।'

—'হ্যাঁ, করবে। আমবা সকলে কবব।'

—'কোবা, উল্টোপাল্টা কিছু বলিস্ না।'

—'না, কৌশিককাকু, আমি উল্টোপাল্টা কিছু বলব না।'

—'কোবা, দিস ইজ ক্রুশিয়াল। ডু নট একসাইট হিম।'

—'না, কৌশিককাকু।'

কৌশিকের মারুতি গাড়িতে অ্যাসাইলাম গিয়েছিল ওরা। ওপরেও উঠেছিল। শীত পড়ছে আর বাড়িব ভেতরটা ঠাণ্ডা। শনশন হাওয়া। দূরে কোথাও বোমা ফাটে। তার আওয়াজ হাওয়াতে ভাসে। লো ভোল্টেজ। টিউব জ্বলছে না। বণজয় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। বারান্দায় গোবিন্দ, দাম ডাক্তার, কৌশিক। কেউ চিৎকার কবল। আকন্দ গাছ, কালকাসুন্দার বন, ওপাবের জলা—সব আবছা হতে হতে অন্ধকার মাখছে মুখে। পতঙ্গের অবিবাম শব্দ। জানলাব সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বণজয়। প্রথমে জাল। তাব ওপাবে শিক। তলাগুলো মবচে ধবা, সরু। বণজয কাচা ডোরাকাটা শার্ট আর পাজামা পরা। ঘবে কেউ ঢুকতে বণজয সচকিত হয়।

—'কে?'

—'আমি।'

—'তোমাব কাছে বিভলভাব আছে?'

—'আমি, কোবা।'

—'তুমি এখানে কী কবছ?'

—'তুমি, বাবা, তুমি পালাও কেন? মা-ব কষ্ট হয। আমাদেব কষ্ট হয়।'

মস্কোর তিরিশ মাইলেব মধ্যে নাৎসিবা অপেক্ষা করছে' চীন' ভিযেতনাম। রাশিয়া। কমরেড লেনিন কথা বলছেন! কোথাও আবাব বোমা ফাটল, আকাশে আলো উঠল! আকাশ জুড়ে তাবা, উল্কা, বিস্ফোবণ, মেঘ, মেলা, মেখলা.'

—'বাবা!'

—'তুমি এখানে কী কবছ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ইউ আব অ্যান এবলবডিড ইয়ং ম্যান—তুমি জানো না? মস্কোব থেকে তিরিশ মাইল দূবে নাৎসিবা পৌছে গেছে। সকলে ফ্রন্টের দিকে যাচ্ছে। কমবেড স্তালিন বলেছেন হোযাট দা হেল ইউ আব ডুযিং হিযার? যাও, ফ্রন্টে যাও! মুভ' যাও।'

ফস্ফর স্বপ্ন ও স্নায়ু গ্যালাক্সি একাকার। তাব মধ্যে কালপুরুষ কোবা কোমরে তরোয়াল ও লুব্ধক কুকুরকে নিযে ফ্রন্টে চলেছে...

কোবা ফ্রন্টে চলেছে বরফ, কাঁটাতার মাড়িয়ে, নাকি কোবাই বণজয়কে ফ্রন্টে নিযে যাবে বলে হেঁটে আসছে, আর দেখা যায না, ঝাপসা হয়ে যায়, কান্নার জল চোখ পোড়ায় অথচ ঘুম নেই, ঘুম কি কোথাও আছে না কি, না ঘুমই আসছে নানা অছিলায যাব কোমরে তরোযাল, ছোট্ট ছোট্ট পা আর ঘেউ ঘেউ ডাক ছোট্ট কুকুব ছানাব।

৮

অন্তে, সকলেরই এটা জেনে রাখা ভালো যে এই আখ্যান রচনা বা পাঠের সমাপ্তির সঙ্গে রণজয়ের ঘুম আসা বা না আসার কোনো সম্পর্ক নেই।

খেলনা নগর

মর্ত্যশরীব

খেলনানগরের পশ্চিম দিকে, বাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় আবর্জনার পাহাড় যেদিকে ঢালু হয়ে পাড়ি নদীর ওপারে সমতলে, বালি-কাঁকরের মাটিতে গিয়ে মিশেছে, সেইদিকে নানারকম রঙের আভায় শীতের বোবা সূর্য ডুবছিল। তখনও আলো ছিল যা কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে ছায়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। খেলনানগরেব উত্তর ধরে যে টানা সিধে সড়ক চলে গেছে সেই রাস্তা ববাববই ধাতব ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কখনও জোরে কখনও আস্তে। পুতুল কারখানার ছাদের ওপরে তেপায়া কাঠামোর ওপরে যে বিশাল বার্বি পুতুল বাতিল রাজকন্যার মতো দাঁড়িয়ে আছে তার আধপোড়া চুলগুলো বাতাসে একটু একটু উড়ছিল। দিনটা ছিল দুহাজার চার সালের চৌঠা ডিসেম্বর। ঘটনাটা ঘটেছিল তার আগের দিন বিকেলে।

দুবছর আগে, দেশের উত্তর ও পশ্চিমে পাবমাণবিক আঘাতের ফলে যে ব্যাপক সর্বনাশ হয়েছিল তার রেশ মিলোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আঁচ করেছিলেন যে দেশের আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। কিন্তু বোমাগুলো, বিশদভাবে বললে দুটো বোমাই ১ মেগাটন করে হলেও নিউক্লিয়াব শীতেব মেঘ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম বোমাটিতে ৯০ লক্ষ ও দ্বিতীয়টিতে ৮৯.৩৬ লক্ষ লোক মারা যায়। দুহাজার চার সালে খেলনানগবে বেশ শীত পড়েছিল। উত্তরমুখী দিকটা ফাঁকা। ফলে শীতেব হাওযা যথেচ্ছ আসে। এসে খেলনানগর পার করে আবর্জনার পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আবর্জনা পাহাড়ের বিষাক্ত, ভারী নীল ধুলো একটু বিরক্ত হয়, আবার থিতিয়ে বসে।

পুতুল কারখানার সামনের যে চত্বর সেখানে কারখানার শেষ দুজন শ্রমিক তথা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য নগরের ৪৮৭ জন বাসিন্দার মধ্যে যে শ'দেড়েক মানুষ জড়ো হয়েছিল তারা চত্বরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শীতের বিকেলে মৃত্যুদণ্ড আয়েস করে দেখতে হয়। যারা রোদগরম সিমেন্টের খাটো দেওয়ালে হেলান দিয়ে ছিল তারা সেই অবস্থাতেই ছিল। শুধু যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের পড়ে যেতে হয়। পুতুল কারখানার ছাদের তেপায়া কাঠামো থেকে দুজনের মৃতদেহ পা বাঁধা অবস্থায় উল্টো হয়ে ঝুলছিল আর বাতাসে সামান্য দোল খাচ্ছিল। উলঙ্গ। মুখ ও মাথা থ্যাৎলানো। গায়ে ছুরি মারার ক্ষত ও রড পেটানো কালো দাগ। গলায় দড়ি দিয়ে দুজনেরই কাগজ বাঁধা। তাতে যথাক্রমে লেখা '৮' ও '৯'। এর আগের সাত জনকে মারা হয়। এই দুজনই বাকি ছিল। একটা ভুল শুধরে নেওয়া যায়। নগরের বাসিন্দার সংখ্যা ৪৮৭ না হয়ে ৪৮৫ হবে। কারণ দুজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে আগেই মেরে ফেলা হয়। এগুলো হয়েছিল ঘটনাটা ঘটার আগে। এই হিসেবে কিন্তু উইন্ডচিটার পরা লোকটাকে সঙ্গত কারণেই ধরা হয়নি। এই সুবাদে এর পর থেকে ওই লোকটাকে উইন্ডচিটার বলে ডাকা হবে কারণ ওর আসল নাম কেউ জানে না। এটাও ঠিক বলা হল না। কিছু লোক নিশ্চয়ই জানে কিন্তু তারা অন্য কাউকে বলবে না।

খেলনানগর খেলনার মতোই ছোট। আগে এখানে কিছুই ছিল না। কয়েকটা টিলা, কাঁটাঝোপ, একটা পরিষ্কার জলের ছোট্ট নদী, তার স্বচ্ছ স্রোতের উল্টোদিকে কয়েকটা মাছের

এগোবার চেষ্টা এইরকমই, আরও অনেক জায়গার মতো। তারপর কিভাবে এখানে খেলনানগর গড়ে উঠল সে কথা একটু পরেই জানা যাবে।

খেলনা কারখানার সামনের চত্বরে ঝুলন্ত দুই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীব মৃতদেহর কথা বলা হয়েছে। পনেরো দিন আগে হাতকাটা আর তার দলবল যে শকুনটাকে "হুব্বা! হুব্বা!" বলে চিৎকার করতে করতে তাড়া করে শিকার করে সেই মরা শুকনো কানা পাখিটাও ডানা ছড়িয়ে ঝুলছিল। ওই দুজনের পাশেই। তেপায়া কাঠামো থেকে।

চত্বর পেরোলেই যে চার-পাঁচ মানুষ চওড়া রাস্তাগুলো চলে গেছে তাব ধারে ধাবে অ্যাসবেস্টসের ছাদওয়ালা একঘর দুঘরের ছোট ছোট বাড়ি। রাস্তায় আলো নেই। কোথাও আলো নেই। বহুদিন ধরেই নেই। অন্য সময় রাসায়নিক আবর্জনায় নাক জ্বালা করা গন্ধটা খেলনানগর জুড়ে ম ম করে। হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাসে গন্ধটা দুহাজার চার সালেব চৌঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উড়ে গিয়েছিল আবর্জনার পাহাড়েরই দিকে।

বরবাদ হয়ে যাওয়া এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের দরজার ভেতরে অকেজো টেলিফোন লাগানো দেওয়ালে অকথ্য নোংরা কথা লেখা ও নোংরা ছবি আঁকা। তারই মেঝেতে পড়ে ছিল জিশা ও কুমাব। ওখানেই তাদের শেষ দেখা হয়। খেলনানগরের দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে চারটে কাঠের ঘর বেশ্যাদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তার ভেতরেই বেশ্যাদের মড়াগুলো পড়ে ছিল। ওদের ঘরের বাইরে কাশির ওষুধ কাফিড্রিল-এব শিশি ডাঁই করা।

সেলাই মেশিনের পাশে খাটিয়াতে বুড়ো দরজি শুয়ে ছিল। তাব ঘরের দেওয়ালে উইন্ডচিটার-এর চক দিয়ে আঁকা বেড়ালের ছবি। দমকা বাতাস ঢুকতে বুড়োব চুলগুলো হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, তারপরই সমান হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ হয়, খোলে, আবার বন্ধ হয। শব্দটা হাওয়ায় বার বার বাজে।

যারা রাস্তায় ছিল, কথা বলছিল বা জল আনতে যাচ্ছিল তারা বাস্তাতেই পডে আছে। কেউ চিৎ হয়ে মরা চোখে আকাশ দেখছে, কেউ উপুড় হয়ে পড়ে। হাত ও পা অস্বাভাবিকভাবে ছড়ানো যেন কিছু ধরার চেষ্টায় বেহিসেব.হয়ে গেছে। কারও হাতে আধ-কামড়ানো বিস্কুট ধরা, কারও হাতে জল তোলার টিনের কৌটোতে বাঁধা দড়ি। হাতকাটা আর তার দলের লোকেরা চত্বরে পড়ে ছিল। শেষ অবস্থায় হাতে যে ছুরি ও রড ধরা ছিল সেগুলো তেমনই ধরা ছিল। হাতকাটা বেশ মোটা। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে নেই। লুঙ্গি পরা। ওর লোমশ বুকে, গলায়, মুখে '৮' ও '৯'-এর রক্তের ছিটে শুকিয়ে। হাতকাটার আশপাশে ওর সাঙ্গো? পাঙ্গোরা যেভাবে পড়েছিল দেখলে মনে হবে ঘটনাটা ঘটার আগে ওরা দল বেঁধে হাতকাটাকে তারিফ করছিল। কয়েকজন হাত ধরাধরি করে আছে। একজনের হাতে ছিপি খোলা কাশির ওষুধের শিশি। শিশিতে কিছুটা নেশা করার কাশির ওষুধ তখনও রয়ে গিয়েছিল।

খেলনানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, পাড়ি নদীর এপারে যে ঘরগুলো সেগুলো অনেকদিন ধরে, সেই পুতুল কারখানায় আগুনের পর থেকেই, খালি পড়ে ছিল। আগুনে পুড়ে যারা মারা যায় ওগুলো তাদের ঘর। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঘরে সেই বামন থাকত, যার সঙ্গে উইন্ডচিটার -এর বিশেষ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বামন মরা অবস্থায় একটা চেয়ারে বসে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। দুটো হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরা। পায়ের কাছে ওর কিছু জামাকাপড়, এক টিন গুঁড়ো দুধ, চ্যাপটা টিনের কৌটোয় বাতাসবন্দী আরব সাগরের মাছ ও ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ একটি ম্যাপ ক্যাম্বিসের একটা তালিমারা ব্যাগে গোছানো ছিল। ঘরের কোণে একটা ছেঁড়া ছাতাও ছিল। গোছগাছ দেখে মনে হয় যে উইন্ডচিটার-এর মতো ওরও বোধহয়

খেলনানগর থেকে পালাবার পরিকল্পনা ছিল।

'৮' আর '৯'-কে যখন হাতকাটা আর তার দল কুপিয়ে কুপিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে মারছিল তখন খেলনা কারখানার পেছনের ভাঙা পাঁচিলের ফোকর থেকে সাদামুখ দেখছিল আর ভয়ে ঘামছিল। ওর হাতে ছিল একটা ভাঙা শিক যার মাথাটা ঘষে ঘষে ছুঁচলো করা। সাদামুখ জানত যে, '৮' ও '৯'-কে শেষ করার পর হাতকাটা তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে ও তার রেহাই থাকবে না। একটা ছুঁচলো ভাঙা শিক নিয়ে কতক্ষণ আব পাঁচ-ছ জনের একটা দঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব?

এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথ, যার মেঝেতে জিশা আর কুমার জড়াজড়ি কবে পড়েছিল, সেটা ছেড়ে রাস্তা দিয়ে শ'দুয়েক মিটার এগোলেই খাবারেব গুদাম। যুদ্ধের আগেই সামরিক কনভয় খেলনানগরে শুকনো ও টিনের খাবার দিয়ে যায়। অনেক। দুধ, বিস্কুট, মাছ, বিদেশ থেকে আনা নোনতা মাংস, ফল, টমেটোর সস, মেয়োনিজ ও আরও কত কী। বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা। এছাড়াও সামরিক বাহিনীর লোকেরা কিছু গ্যাস-মুখোস ও চিকিৎসার জিনিসও এনেছিল। এবং পর্যাপ্ত কাশির ওষুধ কাফিড্রিল যা খেলে নেশা হয়। দূরবর্তী ছোট ছোট 'হ্যামলেট'-এ এই ধরনের সরবরাহ-ই ছিল রেওয়াজ। দীর্ঘকাল ধরে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও জনবসতি যেন খাবাব বা নেশার জিনিসের অভাবে ধুয়ে মুছে না যায়। কাশির ওষুধ, নরম প্যাকেটের মার্কিনী সিগারেট ও স্বদেশি দেশলাই যে যাব মতো লুটপাট করে স্টক করেছিল। তখনও টেলিফোন বা ফ্যাক্সে যোগাযোগ কবা যেত। তখনও মাঝেমধ্যে কিছুটা সময় বিদ্যুৎ এলে টিভি বা রেডিও চলত। বাস্তায় আলোও জ্বলত। তারপর সব ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যায়। টিনের মধ্যে আটকে থাকা কবেকাব মাছ, মাংস বা ঝোলেব মধ্যে ডুবন্ত কড়াইশুটি বা রাজমার দানা পচে যেতে শুরু করে। খোলাব সঙ্গে সঙ্গে ছাতা পড়তে শুরু করে। পোকা কিলবিল করে। বরং দুধ ও বিস্কুট বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেলেও খাওয়া যায়। খেলে খিদে যায়। আর তাছাড়া নিয়মিত যদি কেউ কম করে খাবার পায় তখন ধীরে ধীরে তাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরকম যদি না হত তাহলে নাকি মৃত্যুশিবিবের কথা কেউ জানতে পারত না যেমন জানতে পারত না গণতন্ত্র বাঁচানো বা সামাজিক-এঞ্জিনিয়ারিং-এব ধুয়ো তুলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিলে তিলে বা সহসা হত্যা করার অসংখ্য ঘটনা। ক্ষুধা বা অখাদ্য একটা দুর্দান্ত অস্ত্র, এক মোক্ষম হাতিয়ার।

অস্ত্র বা হাতিয়ারের প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে যায়। গৃহযুদ্ধের সময় লুঠতরাজ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গত শতাব্দীর শেষ বছরে একটেরে হয়ে পড়া জনবসতিগুলোতে ছোট ও মাঝারি মাপের কিছু আগ্নেয়াস্ত্র বিলি করা হয়েছিল। খেলনানগরেও একসময় কিছু অস্ত্র ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল মূলত হাতকাটা ও সাদামুখদের হাতে। একসময় নেশা করার কাশির ওষুধের হাহাকার দেখা দেওয়ায় ওই সব অস্ত্র চোরা চালানদারদেব হাতে চলে যায়। তখনও উত্তরমুখো সিধে সড়ক দিয়ে কখনও কখনও একটা আধটা লজঝড়ে, গোলার আঘাতে তুবড়োনো বা মেশিনগানের বুলেটের ফুটো ফুটো চিহ্ন গায় লরি বা বাতিল ট্যাংকার খেলনানগরে আসত কাফিড্রিল নিয়ে। এরকমই একটা লরিতে ক্লিনার হিসেবে এসেছিল কুমার। এসে খেলনানগরে থেকে যায়। জিশার প্রেমে পড়ে।

একেই কড়া শীত। তার ওপরে চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। '৮' '৯' ও শকুন তো বটেই, বাকি ৪৮৫টা মৃতদেহ জমে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। খেলনানগরে কোনো পিঁপড়ে বা মৃতদেহর সদ্ব্যবহার করতে পারে এমন কোনো কীট, পতঙ্গ বা মানুষের মাংস ভালবাসে এমন কোনো

প্রাণী বা পাখি ছিল না। থাকলে মৃতদেহগুলো অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকত না। ঠাণ্ডার জন্যে পচনের প্রক্রিয়াটিও পুরোদমে শুরু হয়নি। শুধু হাতকাটার পেটটা একটু বেশি ফুলে গিয়েছিল।

এমনিতে সব আকাশই ধোঁয়া ধোঁয়া। তারা বা গ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখাই যায় না। অসুস্থ চাঁদও আসে কুয়াশা কুয়াশা ঘোলাটে আলো নিয়ে। কিন্তু দুহাজার চার সালের দোসরা ডিসেম্বর রাতে প্রচণ্ড ঝড়জল হয়। অপ্রত্যাশিত। তাই আকাশ দুদিন পরেও কিয়দংশে পরিচ্ছন্ন ছিল।

অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে যারা অনেক দূরের জেনারেটরের শব্দ বাতাসে ভর করে আসতে শুনেছে তাদের শব্দটা হয়তো চেনা। গুঁড়ি মেরে শব্দটা কাছে আসতে আসতে যান্ত্রিক গর্জনে পরিণত হয়। আরও বাড়ে। হিংস্র ঘুরন্ত পাখায় বাতাস কেটে চাপ চাপ অদৃশ্য কিমায় পরিণত হয়। তীব্র নীলচে সার্চলাইটের সন্ধানী স্তম্ভ আকাশে কাটাকুটি খেলে। ঝলসানো আলোয় লুকোচুরিতে খেলনাগর দৃশ্যমান হয়, আবার অতলে হারায়। তিনটে সামবিক পুমা হেলিকপ্টার খেলনানগরের চত্বরের ওপবে স্থির হয়ে বাতাস কাটে— বেপরোয়া হাওয়ায় বিশাল বার্বি পুতুলের আধপোড়া চুল খিলখিল করে ওড়ে। মধ্যে অবতরণেব উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা খোঁজে তিনটে হেলিকপ্টার।

সামবিক আলো এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের ধুলোর আস্তবণ পড়া কাচের মধ্যে দিযে ভেতরে বার বার ছুবলে পডায় মনে হয় জিশা ও কুমারের মৃতদেহ নড়ছে। চেয়ারে বসা মরা বামনকেও মনে হয় এই বোধহয় উঠে দাঁড়াবে বা কিছু বলে উঠবে।

চত্বরে ছড়িয়ে থাকা ইতস্তত মৃতদেহের মধ্যে অবতরণের লাগসই ফাঁকা জায়গা খোঁজে তিনটে হেলিকপ্টার। '৮' ও '৯' জোরে জোরে দোলে। মরা, ঝুলন্ত শকুনও পাক খেয়ে খেযে উড়তে চেষ্টা করে।

যোগাগ্নি শরীর

১৮ নভেম্বর ২০০৪

যে খেলনানগরে বলতে গেলে প্রায় কিছুই ঘটে না সেখানে এই দিন পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেল। কাফিড্রিল-এর ঘোর কাটিয়ে উঠে সত্যিকারের জেগে উঠতে খেলনানগরের অনেকটা সময লাগে। আবার বিকেল ফুরনোর পরে বেশিক্ষণ কেউ জেগেও থাকে না। চাঁদের আলো থাকলে ভালো। না থাকলেও ক্ষতি নেই। বরং অন্ধকারের যে নিজস্ব আলো রয়েছে তার মধ্যে কোনও মাতালের চিৎকার বা হাসি বা গালাগালি বেশ মানানসই লাগে। '৮' ও '৯' নেশাখোর নয়। তারা অনেক রাত অবধি ইউনিয়নের ঘরে বসে তাদের আগামীদিনের রণনীতি নিয়ে আলোচনা করে। করতে করতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। গতরাতে এইরকম কথাতে তাদের আলোচনা শেষ হয় :

—কাল আমরা তাহলে সাকুল্যে দশটা পোস্টারই মারব, না সবগুলোই খরচ করে ফেলব?

—কাগজ আর কালি যেভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে তাতে করে এই ক্যামপেন বেশিদিন টানা যাবে বলে মনে হয় না। তাই কয়েকটা পোস্টার হাতে রাখাই বোধহয় ভালো।

—তাই করব তাহলে। সবগুলো পোস্টার হাতছাড়া করব না।

—একেবারেই না।

—আর এবারে গতবারের ভুল করলে কিন্তু কমরেড আন্দোলন আবার চোট খাবে।

—ভুল নিয়ে তুমিও দেখছি ভেবেছ। আমিও ভেবেছি।

—কী ভেবেছ?

—আমার যেটা মনে হয়েছে সোজা বলে দিচ্ছি। গতবাবের পোস্টারগুলো মারার পর আমরা দুজনেই একটু ঢিলে দিয়েছিলাম। নতুন পোস্টার পড়ে কে কী ভাবছে সেটা জানতে চেষ্টা কবিনি।

—তুমি ঠিক আমাব মনেব কথাটা বললে। এবারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

এর উত্তবে আর কথা হয় না। অর্থাৎ ঘুমিযে পডেছে। অন্যজনও ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুজনেরই পাশে নিশান ওড়াবার ডাণ্ডা রয়েছে। বাতের অন্ধকারে যদি হাতকাটার দল চোরাগোপ্তা হামলা চালায়? শত্রুপক্ষ ও তাব দালালদেব কখনওই কমজোরী ভাবলে চলবে না। লড়াই কবতে হবে ও প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাণ্ডা ছাড়াও ইউনিয়ন ঘবে মার্কস ও লেনিন-এর ছবির তলায় ডাঁই করে ইট ও পাথর রাখা আছে। সর্বহাবাব অস্ত্র। '৮' ও '৯' সংগ্রামের স্বপ্নে সেই রুগী মানুষটিকে দেখতে পায় যাব পাথর কুড়িয়ে হাতিয়ার করে ফেলাব মূর্তি অমর হয়ে আছে কোনো এক উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত ভাস্করের দুরন্ত খোদাই করা কাজে। ওদের মধ্যে লাভা রয়েছে। তার আঁচে ওদের মুখ লালচে দেখায। ঘুমের মধ্যে ওদের চোখেব তারা ঘোরে। কপাল ঘামে। হাত মুঠো হয। দুই বিশ্বস্ত সৈনিকেব ঘুমেব সময় দেওয়াল জুড়ে পাহারায জেগে থাকেন মার্কস ও লেনিন। আন্দোলন থেকে এক আঙুলও পিছু না হঠার নির্দেশ বলবৎ রয়েছে।

বামন রোজই হাঁটতে হাঁটতে পুতুল কারখানার চত্বরে এসে বসে। একটা টিনে জল থাকে তাব সঙ্গে। চত্বরে রোদে বসে জলে ভিজিযে ভিজিযে ঠিক হিসেব করা দুটো বিস্কুট খায় ও বানান করে কবে নতুন কোনো পোস্টার থাকলে বিড়বিড় করে পড়ে। রোজকার মতো সেদিনও জিশা নদী থেকে জেরিক্যান ভর্তি জল মাথায় কবে ফিরছিল। বামনের চোখ পড়ল টিনের কৌটোর জলে। বিস্কুট ডুবোতে গিযে। নোংরা জলের আয়নায় বার্বি পুতুলের ছায়া পড়েছে। কিন্তু পুতুলের মাথায় ওটা কি? বামন ওপর দিকে তাকাতেই শকুনটা ডানা ঝটপট করে উঠেছিল। বোধহয় বেশি করে রোদ্দুর ধরার জন্যেই। বামন আঙুল দিয়ে ওপরে দেখাতে জিশাও একবার জেবিক্যানের ভার সামলে আডচোখে ওপর দিকে তাকিয়েছিল। শীতের রোদে জিশার ফ্যাকাশে নীলচে মুখটি বড়ই সুন্দর। জিশা জেরিক্যান মাথা থেকে নামিয়ে ভালো করে দেখল। ও কখনও শকুন দেখেনি। বিরাট পাখিটা ফের ডানা নাড়ল। জিশা কথা বলতে না পারলেও খুব উত্তেজিত হলে কখনও কখনও অবুঝ একটা চিৎকারের মতো শব্দ করে ককিয়ে। জিশা চিৎকার করে উঠল। তারপর ছুটল বাতিল এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের কামরায় ঘুমন্ত কুমারকে ডাকতে। কুমারের হল কুম্ভকর্ণের ঘুম। ওর ঘরে একটা শাহরুখ খানের বড় ছবি আটকানো। কুমার কোনো সময় ঘরে না থাকার সুযোগে কেউ কখনও ছবির মুখে খানদানি পাকানো গোঁফ এঁকে দিয়ে গেছে।

জিশার মা-র রোজকার মতো ঘুম আগেই ভেঙেছিল। সে-ই জিশাকে অন্যদিনের মতো ঘুম থেকে ওঠায়। গায় কালো প্যারাশুটের কাপড় জড়িয়ে দেয়। জিশা চলে যাওয়ার পর সে অন্য তিনজনকে ডাকতে গিয়ে দেখে যে শীতের অন্য যে কোনো রাতের মতোই তারা একটা মিলিটারি তাঁবুর ক্যানভাসের কাপড়ের তলায় জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। রোজ রাতের মতো গতরাতেও তারা কলাই করা গামলায় জল ভরে তাতে প্লাস্টিকের পুতুল ভাসিয়েছিল। পুতুল যদি জলের মাঝখানে গোল হয়ে ঘোরে তাহলে বুঝতে হবে খেলনানগরে আকস্মিক কিছু ঘটতে চলেছে। আর যদি ভাসতে ভাসতে কানায় গিয়ে ঠেকে তবে মানে হল যে কে সেই ভাবেই

চলবে খেলনানগরের বিচ্ছিন্ন, একটেরে, অন্তহীন জীবন। তিন বুড়ি বেশ্যার এটা হল প্রায় রোজকার রাতের তুক বা খেলা। ওদের অন্য খেলাও আছে। সেটা ওরা কারও ওপর রাগ হলে খেলে। পুড়ে যাওয়া খেলনা কারখানার গুদাম থেকে খুঁজেপেতে ওরা একটা আধপোড়া পুতুল আনে। সেটাকে গামলার জলে ভাসিয়ে দেয়। বিড়বিড় করে কী বলে সেটা জিশার মা জানে না। হাসে। আর কাঠি দিয়ে চেপে ধরে পুতুলটাকে ডুবিয়ে দেয়। আবার ভাসায়। ফের ডুবিয়ে দেয়। যাকে ভেবে এটা কবা হয় সে দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নের রাক্ষস গলা টিপে ধরে তার দম বন্ধ করে দেয়। সারা রাত তবে এভাবে কাটে। ঠিক কী হয় তা বলা কঠিন কারণ কাফিড্রিল খেলে নানাবকমই হতে পারে। অবশ্য যারা এটা জানে তারা ওই তিনজনকে ভয় পায়। হাতকাটা ভয় পায়। সাদামুখও ভয় পায়। '৮' ও '৯' এসব বিশ্বাস করে না।

বামন কয়েকবার নিজের জল খাওয়ার টিনটাকে চত্বরের পাথরে ঠুকল। শকুনটা নড়াচড়া করল না। দু-একজন করে লোক জমতে শুরু করল। যারা দল বেঁধে ঘোরে তাদের মধ্যে প্রথমেই একা এল সাদামুখ। চেঁচাতে চেঁচাতে। উত্তেজিত হলে ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

—কী হয়েছে কী? জিশা দৌড়োতে দৌড়োতে গেল।

বামন উত্তর না দিয়ে ওপরে দেখাল। শকুনটা তখন যেন সাদামুখকে দেখাবাব জন্যেই ডানাদুটো ছড়াল।

—কী ওটা?

সাদামুখ কখনও জীবনে শকুন দেখেনি এমন নয়। কিন্তু তখন উত্তেজনায় সব গুলিয়ে গিয়েছিল।

—শকুন! মড়াখেকো শকুন!

সাদামুখ চেঁচাতে চেঁচাতে সকলকে জানাতে গেল।

—শকুন! শকুন! শকুন এসেছে!

শ...কু...ন।

ওর পুড়ে যাওয়া সাদা মুখে জলের বিষের নীল নীল ছোপ। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে।

সাদামুখকে যদি একটি নিউট্রন ধরা যায় তাহলে সে চেঁচাতে চেঁচাতে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম-এর নিউক্লিয়াস-এ আঘাত হেনে দুটো সমান অংশে বিভাজিত করে দিচ্ছিল যাকে ফিশন ফ্র্যাগমেন্ট বলা হয়। নিউক্লিয়াস যখন ভাঙে তখন এর জড়ের সামান্য অংশ বিপুল পরিমাণ শক্তি বা এনার্জি-তে পরিণত হয়। এইসঙ্গে আরও দুই বা তিনটি নিউট্রন মুক্ত হয়। এরা আবার অন্যান্য নিউক্লিয়াসে-এ আঘাত হানে। এই প্রক্রিয়াটিকে যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয় যেখানে প্রতিটি বিভাজিত নিউক্লিয়াস অন্যান্য নিউক্লিয়াসকে ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় নিউট্রন সরবরাহ করে। অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এই চেইন রিঅ্যাকশন একটি ফিশন বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। তবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেইন রিঅ্যাকশন-এর জন্য এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ বিদারণযোগ্য পদার্থের দরকার— এর নাম হল ক্রিটিকাল মাস।

মার্কস-এর মুখের ওপরে ত্যারচা হয়ে সকালের রোদ্দুর এসে পড়েছে। লেনিনের মুখে পৌঁছায়নি। বাইরে লোকের হট্টগোলে '৯'-এর ঘুম ভেঙে গেল। সে কিছুক্ষণ আওয়াজগুলো শুনল তারপর পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে '৮'-কে ডাকল।

—ওঠো। শুনছ! বাইরে খুব হট্টগোল।

'৮' ধড়মড় করে উঠে বসে।

—অ্যাটাক করছে নাকি?

—বোঝা যাচ্ছে না। হাতকাটা হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছে।

—আবাব এমনও তো হতে পাবে যে কারখানা খোলার কোনো খবর এসেছে!

—সবগুলো সম্ভবনাই আমাদেব মাথায় রাখতে হবে। তবে সেদিনের ভুলটা করো না।

—কী ভুল?

—পোস্টার মারাব পরের দিন। মনে নেই? তুমি ফাঁকা হাতে বেরিয়েছিলে।

'৮' জবাব না দিযে ডাণ্ডা তুলে নেয়। শতছিন্ন অলিভ গ্রিন সামরিক প্যান্টের পকেটে দুখানা ভাবী পাথব ঢোকায়।

—আমার মন বলছে এমনও হতে পারে যে মালিক এসে পডেছে।

—ফের ভুল করছ। ওসব মন বলাটলায় আমবা বিশ্বাস কবি না। মন অনেক কথাই বলে। বাস্তব পরিস্থিতি সেই কথাগুলোকে তছনছ করে দেয়।

লেনিনের মুখে রোদ পৌছায অবশেষে।

কুমারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিশা যখন চত্বরে পৌছল তখন বিরাট ভিড় জমে গেছে। খিস্তি আব হাসির হবরা ছুটছে। শকুন ঝটপট করে বার্বি পুতুলেব মাথা থেকে কারখানার ছাদে নেমে আসে। হাততালি পড়ে। সিটি দেয় কেউ। এক মাথা-ন্যাড়া-ন্যাবা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে মাটিতে গডাগড়ি দেয়। ফলে তার সামনে পেছনে সবকিছুই দেখা যায়। ভিডের থেকে বেশ কিছুটা দূবে আকাশের দিকে হাঁ মুখ কবে থাকা একটা বরবাদ অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট্ কামানের পেছনে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কবে '৮' ও '৯'।

—আমাদের কাজটা ভেস্তে গেল।

—কেন? পোস্টার মাবব না?

—আজ মেরে লাভ নেই। কেউ পড়বে না। এবপর ওবা শকুনটাকে মারার চেষ্টা করবে। তারপর সেই নিয়ে মশগুল থাকবে।

—কিন্তু শকুনটা তো উড়েও পালাতে পারে।

—দেখে মনে হচ্ছে কমজোরী বা চোট খাওয়া।

—একটা কাজ করলে কেমন হয়?

—কি?

—হাতকাটা আর সাদামুখের দলের মধ্যে তো আকচা-আকচি আছেই। সেটাকে এই তালে চাগিয়ে দিলে কেমন হয়!

—মোক্ষম। ঠিক সময়ে ব্যাপারটা মাথায় খেলেছে তোমার।

—মানে, হঠাৎ মন বলল এটাই আমাদের এখন প্রধান কাজ।

—ফের সেই মন বলল। মন বলার কোনো দাম নেই। কথাটা হাজারবার বুঝিয়েছি তোমায়। মন বলা ফালতু। মাথা খেলানোটাই হল আসল।

—বার বার আমার কমরেড এই ভুলটা হয়ে যায়।

জিশা-র মাকে বুড়ি বলা চলে না। অন্য তিন বুড়ি বেশ্যার চেয়ে সে আগে আগে ছোটে। ওরা তিনজন তিনটে শিক বেরোনো ছেঁড়া ছাতা নিয়ে পেছনে পেছনে সরু গলায় চিৎকার করতে করতে আসে। তিনজনের একজন ডাইনে বাঁয়ে থুথু ছিটোয়। একজন বিড়বিড় করে মন্তর বলে নেয়। তারপরেই চিলচিৎকার দিয়ে হেসে ওঠে। অন্যজন ছাতা বনবন করে ঘোরায়। উপুড় হয়ে শোয়া ন্যাড়া পাগলের নিতম্বে আধবুড়ো একটা লোক কাঠি দিয়ে খোঁচায়। ন্যাড়া

পাগল উল্টে যায়। জিশা আনন্দে বোবা চিৎকার করে। কারণ শকুনটা ফের ডানা ঝটপট করছিল। নাচ শুরু হয়ে যায় চত্বরে। দঙ্গলের মধ্যে তিন বুড়ি বেশ্যার ছেঁড়া ছাতা চক্কর খায়।

কারোরই খেয়াল হয়নি যে অনেক দূর থেকে গোটা ঘটনাটা লক্ষ করছিল একজন। অনেক রাস্তা হেঁটে সে খেলনানগরে সবে ঢুকেছে। এতটা পথ হাঁটলে, বিশেষত পিঠে ছেঁড়া হ্যাভারস্যাকে অত রাবিশ মাল থাকলে জাঁকাবারই কথা। হ্যাভারস্যাকের সঙ্গে আবার বিবর্ণ নাইলনের দড়ি দিয়ে দুটো সাইকেলের চাকা বাঁধা। প্রায় ৬ ফুট লম্বা। এত দাড়ি আর বড় চুল যে চিনতে অসুবিধে হয় না লোকটা হয় পাগল নয় ফেরার ডাকাত বা পলাতক সৈনিক। অবশ্য নিছক নির্জলা হোব বা ভাবঘুরে হতেও আপত্তি নেই। জিপ খোলা একটা উইন্ডচিটার পরা। ভেতরে নোংরা শার্ট। দুটো হাঁটুতেই তালি মারা জিনস। গলায় কালো কারে বাঁধা একটা ছোট্ট বালিশের মতো দেখতে তাবিজ। দুটো হাতেই তিনটে করে আংটি। পাঁচটাতে ধ্যাবড়া ঘষা সস্তার পাথর। একটাতে রেড ইন্ডিয়ান যোদ্ধার ধাতব মুখ। নাকটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। উইন্ডচিটার যে শুধু দূর থেকে ভিড়ের দিকেই তাকাচ্ছিল এমন নয়। পেছনের বিষাক্ত পাহাড, আকাশে দাঁড়ানো আধপোড়া চুল বার্বি পুতুল, ছেঁড়া ছেঁড়া ধোঁয়া রঙের মেঘের ব্যান্ডেজে তাপ্পি মারা জখম আকাশ, অচেনা হয়ে যাওয়া ভূ-চরাচর—সবকিছুই সে দেখছিল।

'৮' আর '৯' আলাদা হয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। '৮' গেল জটলার সেই দিকটায় যেদিকে হাতকাটা তার দলের কয়েকজনকে নিয়ে দাপাচ্ছিল।

—উফ্, এই শকুনটাকে ঘায়েল যে করবে সে মায়ের দুধ খেয়েছে মানতে হবে। যা ডানার জোর। পাহাড়ী শকুন বলে কথা।

হাতকাটার দলের ঘেয়োব কানে কথাটা গেল।

—জীবনে ক'টা শকুন দেখেছ যে চিনলে ওটা পাহাড়ী শকুন। লাল বই-তে লেখা আছে?

—আছে আবার নেইও বটে।

—মানে?

—মানে ফানে জানি না। লক আউটের সময় দেখেছি যারা রেল লাইনে গলা দিত তাদের পাহাড়ী শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। পুবদেশে। এটাও সেই জাতের। মদ্দাই হবে।

—নিকুচি করেছে মদ্দা শকুনের!

ঘেয়ো একটা কাফিড্রিলের ফাঁকা শিশি ছোঁড়ে। পৌঁছয় না। ওদিকে '৯' দলের হালকা সাদামুখদেরও তাতিয়ে দিয়েছে। সাদামুখের হাতে গোনা দুজন সাকরেদ—বস্তা আর রুমালী। তারা তাল ঠুকে এগিয়ে যায়। কারখানার বাড়ির জাল বসানো জানলা বেয়ে একতলার আলসেতে উঠে পড়ে। হাতকাটা তাদের একটা লাঠি এগিয়ে দেয়। লাঠিটার ডগায় একটা ভাঙা ঝাঁটা বাঁধা। সেটা হুশ হুশ করে শূন্যে দোলাতে শকুনটা ভয় পায়। হঠাৎ উড়ে ভিড়ের দিকে নেমে আসে। লোকজন এদিক ওদিক ছিটকে যায়।

এরপরই শকুনটা অদ্ভুতভাবে ডানদিকে নড়ানড়ি করে কয়েকটা পা হাঁটে। অনেকটা কাঁকড়ার মতো। তারপর উড়ে দরজির ঘরের ওপরে গিয়ে বসে। টাল সামলায়। এদিকে হাতকাটা আর তার দলের অন্যরা বরকন্দাজ, ঘেয়ো, দাগী সবাই মিলে বলতে শুরু করে, মন্ত্রের মতো নিচু স্বরে।

—হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা! হুব্বাঃ লোকেরাও তাদের সঙ্গে গলা মেলায়। সাদামুখরা গলা মেলায় না। তারা দলে কম। বুঝতে পারে যে শকুন শিকারের অধিকার ওই বিচিত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাতকাটারা শকুনটাকে ধাওয়া করে। ইটপাথর

ছোঁড়ে। ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। দেরি করে যাবা হল্লা দেখতে আসছিল তারা হাতকাটাদের দৌড়োবাব জন্যে ফাঁক হয়ে বাস্তা করে দেয়। ওদের পেছনে জনতা ছোটে। সাদামুখরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। '৮' আব '৯' ওদেব কাছে যায়।

—কি হল? তোমরা শকুন মারতে গেলে না?

ওরা জবাব দেয় না।

—শকুন মারার পরে হাতকাটাব দর বেড়ে যাবে। লোকে ওকেই খেলনানগরের রুস্তম বলে মেনে নেবে।

এবারে সাদামুখ বেগে ওঠে।

—আমরাই তো শকুনটাকে নামালাম। ওদের ধকে কুলোতো? কত বলে কুস্তম দেখলাম।

—ওসব কথা লোকে শুনবে? যে মাববে তাবই নাম থাকবে। বাকি সব ভক্কা!

—হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা!

চিৎকাবটা দূর থেকে উইন্ডচিটারেব কাছে আসে। ও হ্যাভাবস্যাক থেকে গায় ফেল্ট জড়ানো একটা ওয়াটার-বট্‌ল বের করে। ঠোঁট ভিজোবাব মতো এক চুমুক জল খায়। ছিপি বন্ধ করতে করতে দূরে দেখে।

পুবো খেলনানগব ঘুবে বিজয় মিছিল ফিরছে। লুঙ্গি পবা পেটমোটা হাতকাটা সকলের আগে। সে এগোচ্ছে দড়িতে বাঁধা পায়ের নখ, রক্তাক্ত মাথা, ঠোঁট ছেঁড়তে ছেঁড়তে চলে হাতকাটার পেছনে পেছনে। বরকন্দাজ, ঘেয়ো, দাগী সকলেই শকুনেব এক একটা পালক ছিঁড়ে হাতে নিয়েছে। তিনটে ছেঁড়া ছাতা সাঁই সাঁই করে পাখসাট মারে ও উলু দেওয়ার মতো সরু চিৎকার সমবেত হুব্বা। হুব্বা-র সঙ্গে সঙ্গত কবে। খেলনানগবে কাউকে যখন দল বেঁধে মারা হয় তখন তাকে কারখানার ছাদে, বার্বি পুতুল দাঁড়াবার তেপায়া স্তম্ভ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সরব উল্লাসের মধ্যে মরা শকুনকেও ঠ্যাঙে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিকেল পড়তে না পড়তে কাফিড্রিল-এর আসর জমে ওঠে। জিশাব মা-কে হাতকাটা ডেকে পাঠায়। সাদামুখ নেশায় চুরমার হয়ে নিজের দলের লোকদেব বেইমান বলে দুষতে থাকে। '৮' আর '৯' সারাদিনের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ও আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘুমে ঢলে পড়ে।

বামন সেই রাতে ঘুমোয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাব শবীরটাও ভাল থাকে না। বার বার পেচ্ছাপ করতে উঠতে হয়। পাশাপাশি অতগুলো ফাঁকা ঘরের মধ্যে থাকতে তার ভয় করে না। বামন বাইরে এসে দেখল চাঁদ বেশ আলো দিচ্ছে নিশুতি খেলনানগরে। সকালে সে-ই প্রথম শকুনকে দেখেছিল। এবারও সে-ই প্রথম। উত্তরদিকে খেলাননগরে ঢুকতেই যে ডানহাতি ঘর, যেখানে গার্ডরা রাতে বসে থাকত, সেই ঘরটায় ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। খেলনানগরে কেউ তো আলো জ্বালে না। একবার শীতের হাওয়ার মতোই ভয়টা এল। আবার চলেও গেল। বামন ঘরে ঢুকে বিছানা থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়াল। বালিশের তলা থেকে ভাঁজ করা ক্ষুরটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিল শব্দ না করে। পাড়ি নদীর বিষাক্ত জল চাঁদের আলোয় অসংখ্য রুপোলি চুমকিতে সেজেছে। বামন চাদরে কান মাথা জড়িয়ে নেয়।

আবজানো দরজায় টোকা পড়ে। ঠক ঠক ঠক।

—দরজা খোলা আছে।

বামন দরজাটা ফাঁক করে তাকায়। একটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোতে হুমড়ি খেয়ে

উইন্ডচিটার একটা বই পড়ছিল।

—তুমি কে?

—আমি? আমি বিদেশি নই। আজই এসেছি।

—নাম?

—যখন যেখানে যাই সেখানে লোকে যা ভালো লাগে তেমন একটা নাম দিযে দেয।

—ভবঘুরে?

—বললে আপত্তি নেই। ওই প্যাকিং বাক্সটায় বসা যাবে? বামন বসে। উইন্ডচিটার চশমাটা খোলে। ভাঁজ করে।

—আমার কাছে কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই।

—মানে?

—তোমার পকেটটা ছোট মাপের। তাই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে। বামন পকেটের ক্ষুরেব ওপর দিয়ে হাত চাপা দেয়।

—থাকুক না। বেব না কারলেই হল। ভাঁজ করা ছুরি হতে পারে। তার মনে হচ্ছে ক্ষুর। খুব খারাপ জিনিস।

বামন বিষয় পাল্টায়।

—ওটা কী বই? কতদিন বাদে একটা ইংরেজি বই দেখলাম।

উইন্ডচিটার বইটা এগিয়ে দেয়। বামন মলাটটা পড়ে—'দা নিউক্লিয়ার উইনটার'।

—এখন আব এই বই পড়ে লাভ?

—লাভও নেই ক্ষতিও নেই।

—এই জায়গাটার নাম তুমি জানো?

—হ্যাঁ। রাস্তায় কয়েকটা দিকচিহ্ন রয়েছে। তাতে লেখা আছে।

—রাস্তায় ডাকাত বা ঠগীরা ধরেনি?

—ধরেছিল। আমার কাছে নেবার মতো কিছু নেই। খেলনানগর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি? অসুবিধে না থাকলে।

—আজই?

—আপত্তি না থাকলে।

—না মানে, অতটা পথ, আজ রাতটা জিরিয়ে নিলে হত না?

—জিরিয়ে নিয়েছি। শকুনটাকে মারার পর উত্তেজনা যখন ঝিমিয়ে গেল তখন আমিও একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

—শকুনটাকে মারা তুমি দেখেছ?

—ঠিক দেখিনি, তবে মারা যে হয়েছে সেটা দূর থেকেই আঁচ করলাম। একটা ফাঁড়া কাটল।

—কিসের ফাঁড়া?

—শকুন। শকুন আসা ভালো নয়। অমঙ্গল হয়। ওটাকে মারতে না পারলে খুব ক্ষতি হয়ে যেত তোমাদের।

বামন আর উইন্ডচিটার কথা বলতে থাকে। মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয় উইন্ডচিটার। ওদের কথা চলে। বামন উইন্ডচিরটারকে বলে খেলনানগরের বিচিত্র ইতিহাস।

মরা শকুনটা হাওয়ায় সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে শক্ত হয় আর দুলতে থাকে। পাখিটাকে যারা পিটিয়ে মেরেছিল ও তারপর বার্বি পুতুলের তেপায়া থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তারা খেয়ালই করেনি

যে শকুনটার ফুটো কোটর কানা বাঁ চোখটাব ভেতবে একটা প্রায় অদৃশ্য সবুজ কাচ বসানো আছে এবং ওর পালকেব ফাঁক দিয়ে দিয়ে চুলেব মতোই সরু দুটো তাব বুনে বুনে পেটের দিকে গিয়েছে যেখানে তীরটা মাংসের ভেতবে ঢুকে একটা মাইক্রোব্যাটাবির সঙ্গে জোড়া।

হিবণ্য শবীর

খেলনানগরেব ইতিহাস বলার সময়ে বামন কযেকবাব ভেবেছিল যে উইন্ডচিটাব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা নয়। শেষ রাতে বামন যখন বাড়ি ফেবে তখন উইন্ডচিটাব তাকে কিছুটা এগিযে দিযেছিল। তাবপব উইন্ডচিটাব আলো ফোটা অর্বধি পাড়ি নদীর পাড়ে যে বড বড় কযেকটা পাথব রয়েছে তার একটার ওপবে বসেছিল।

একজন ব্যবসায়ী খেলনানগবেব পত্তন কবে। তাব আগে জাযগাটা কেমন ছিল সেটা প্রথমেই বলা হয়ে গেছে। তখন এই জাযগাটাকে ঘিবে বেশ কয়েকটা গ্রামও ছিল। সাদামুখেব মতো অনেকেই এখনও খেলনানগবে বযেছে যাবা ওই সব গ্রামে থাকত।

ওই ব্যবসায়ীর বংশগত বাবসা ছিল খুবই বড ও লাভজনক—ববদাদী জাহাজ ভাঙার কাববার। কিন্তু যা হয, শেষ অবধি ভাইদেব সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে নিজের অংশ বেচে দেয। দিযে এই খেলনানগব তৈবি কবে। এখানে যা তৈবি হত তাকে বলা হয স্টাফড্ টয়—নানারকম। খেলনানগবে কিন্তু বার্বি পুতুল তৈবি হত না। ওই ব্যবসাযীব একমাত্র মেযে বার্বি পুতুল খুব ভালবাসত বলে সে দোতলা কাবখানাব মাথায় তেপায়া স্তম্ভের ওপরে ওই বিশাল বার্বি পুতুল বসায়।

কাবখানাব দোতলা পোড়া বাড়িটা এখন ভূতেব মতো পডে রয়েছে কিন্তু তখন ওর জেল্লা ছিল খুবই। লোকটা ব্যবসা শুরুই কবেছিল আঁটঘাট বেঁধে—কানাডা আর ইতালিতে খেলনা পাঠাবাব মোটা অর্ডার ছিল তাব কাছে। স্টাফড্ টয বানাবার জন্যে যা যা প্রধানত দরকার হয় তা হল ফাইবার, ফোম রবার ও উলের কাপড়। কারখানার একতলাটা ছিল গুদাম। এখানে ওই সব মাল বাখা থাকত। দোতলার ছিল পুতুল তৈবির ব্যবস্থা। এখানে কুকুর, ভালুক, খবগোশ, হাতি, বাঁদর, কুমির, কচ্ছপ, পেঙ্গুইন, ডলফিন, জেব্রা, বেড়াল, তিমি মাছ, বাঘ, ক্যাঙারু ইত্যাদি নানারকম জীবজন্তুর আদলের কাপড় কাটা হত, তারপর ভেতরে মাপমতো ফোম রবাব দিয়ে সেলাই কবা হত। এই সেলাই করার বেশিটাই হত হাতে যদিও কয়েকটা সেলাই মেশিনও চলত। দোতলায় ছিল দুটো ডিপার্টমেন্ট, প্যাকিং আর সিউইং। গোড়ার দিকে, সবে খেলনা তৈরি শুরু হয়েছে, এমন সময় কম মজুরি দেওয়ার জন্য শ্রমিক বিশেষত মেয়েরা ধর্মঘট করায় বেশ কিছুদিনের জন্য কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর নতুন ম্যানেজার এনে নতুন করে কাজ শুরু হয়।

বাইরে থেকে ব্যবসায়ী জনা দশেক দক্ষ পুরুষ শ্রমিক আনিয়েছিল। তাদের মধ্যে '৮' আর '৯' বেঁচে আছে। ধর্মঘটের সময় কারখানার সশস্ত্র গার্ডদের গুলিতে '১' থেকে '৫' মারা যায়। পরে যখন গুণ্ডামি করার জন্যে হাতকাটা ও অন্যদের আনা হয় তখন রাস্তা অবরোধ করার আন্দোলনে '৬' ও '৭' খুন হয়েছিল। এখানে কোনোদিনই কোনো আইন চলত না। কারখানায় আগুন নেভাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ী যখন গাড়ি যাতায়াতের পূর্ববর্ণিত উত্তবমুখী সিধে সড়ক বানায় তখন আগুন লাগতে

পারে কি না দেখার জন্যে একজন ইন্সপেক্টর এসেছিল কিন্তু তাকে মোটা ঘুষ দিয়ে সার্টিফিকেট আদায় করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। লোকটা তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। প্রথমে গাঁইগুঁই করেছিল যেমন গোড়ার দিকে সকলেই করে। কিন্তু পরে যখন বোঝে যে হয় ওপরতলায় উল্টো রিপোর্ট চলে যাবে বা হাতকাটার দল খুন করে নদীর পাড়ে পুঁতে রেখে দেবে তখন সব মেনে নেয়। দোতলায় শ্রমিকরা ঢুকে যাওয়ার পরে গ্রিলের দরজা তালা দিয়ে দেওয়া হত। কেউ যাতে মাল চুরি না করতে পারে সেইজন্যে প্রত্যেকটা জানলায় শিক তো ছিলই, বাইরে থেকে জালও লাগানো হয়েছিল।

—আগুনটা লেগেছিল কবে?

—বলছি। একটু জল হবে?

—হবে।

অন্ধকারে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। উইন্ডচিটার ওয়াটার বটলের মুখ খুলে এগিয়ে দেয়। বামন জল খায়।

—এই জলের স্বাদটা অন্যরকম। পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয।

—তোমরা কোন জল খাও?

—আমরা ওই নদীর জল খাই। জানি বিষাক্ত, কিন্তু উপায় কোথায? তাই আমাদের হাতের তেলো, পায়ের চেটো ও মুখে দেখবে নীল নীল ছোপ। পরে ওগুলো ঘা হয়ে যায়। আর সারে না।

—জলটা বিষাক্ত! কেন?

—বলছি। আগুন, জল, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, খেলনানগর একটা মরা জায়গা, একটা ভাগাড়। একটা কথা বলি। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও।

—আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না।

—এত কিছু শুনেও খারাপ লাগছে না?

—না। আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি। নানারকম দেখেছি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাষ্প হয়ে উবে যায় তখন আর কিছুতেই অবাক লাগে না। এটা সওয়া হয়ে যায়।

—এই কথায় মনে পড়ল। কারখানার মালিক ওই ব্যবসায়ী রাজধানীতেই থাকত। ওখানেই তো প্রথম বোমা পড়ে।

—হ্যাঁ। তারপর বন্দর—শহরে।

—জানি। তবে একটা বাঁচোয়া। খেলনানগরে কখনও বোমা পড়বে না। হয়ত আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরব। কিন্তু বোমায় পুড়ে মরতে হবে না।

যুদ্ধের আগে, বিশ্বায়নের রমরমা বাজারে প্রথম বিশ্ব থেকে খেলনার অর্ডার অনেক বেড়ে যায়। '৯৮-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আগে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক টয় ফুটবলের অর্ডার এসেছিল। তাই জন্যে আরও বেশি শ্রমিক, বিশেষত সেলাই জানা মেয়েদের দরকার হয়ে পড়েছিল। পুরোদমে যখন কাজ চলছে তখনই আগুনটা লেগেছিল। তখন দিনরাত মিলিয়ে চারটে শিফটে কাজ চলছিল। ইঁদুরে কাটা হাই ভোল্টেজ তারে শর্ট সার্কিট হয়ে একতলার গুদামে আগুন লাগে। দিনটা ছিল মে দিবস ১ মে। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। দোতলায় ওঠার যে একটাই সিঁড়ি সেটা ছিল কাঠের। ওপরে, হিসেবমতো বলা হয়েছে ৮১জন পুড়ে মারা যায়। ৬ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলেছিল। যারা মারা যায় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মেয়ে। এরা আশপাশের গ্রাম থেকে আসত বা বাইরে থেকে এসে

খেলনানগবে থাকত। মৃতেব সংখ্যা অবশ্য কখনওই ঠিক কবে জানা যাবে না। কাবণ অনেককে আলাদা কবে চেনাই যাযনি।

—আব একটা ব্যাপাব আমি নিজেব চোখে দেখেছি বলে ভালো কবেই জানি। বেশ কিছু বাচ্চাও বডদেব আইডেনটিটি কার্ড নিযে কাজ কবতে আসত।

—মালিক কোনও ক্ষতিপূবণ দিযেছিল?

—কিসেব ক্ষতিপূবণ? ববং যাবা আহত হযেছিল তাদেব হদিশই পাওযা যাযনি। যদিও বলা হযেছিল যে চিকিৎসাব জন্যে তাদেব বাইবে পাঠানো হযেছে। আহতদেব মধ্যে একমাত্র সাদামুখ লুকিয়ে সেবে ওঠে। '৮', '৯' আব বুড়ো দবজি বেঁচে যায। কিন্তু দুর্ঘটনাব পবে ওদেব তিনমাস আটকে বাখা হযেছিল যাতে খবব না পাচাব হয।

—তোমাকে?

—আমি হিসেব কষতাম। দিনমজুবি দিতাম। আবও অনেক কাজ কবতাম। ওবা জানত যে আমি বলব না।

—কেন?

—ভয়ে।

- আমাকে যে সব কথা বললে।

—এখন বলা না বলাতে কিছু যায আসে না। '৮' আব '৯' কিন্তু সেই থেকে কাবখানা খোলাব জন্য আন্দোলন চালিযে যাচ্ছে। আমাব তো মনে হয ওবা পাগল।

—কেন?

—কে কাবখানা খুলবে? কে টাকা দেবে? আব কাবখানায কাজ কাবা কববে? কে অর্ডাব ধববে? কী কবে কী হবে?

—কেন? খেলননাগবে যাবা থাকে, তাবা পাববে না?

—ওবা কিছুই কবতে পাববে না। যতদিন মজুত খাবাব আব কাফিড্রিল আছে ততদিন। তাবপব শুকিযে মবে যাবে।

—'৮' আব '৯' কী কবে?

—ওবা দুজনে মিলেই মিছিল বাব কবে। পোস্টাব মাবে। লোকে বুঝতে চায না, শুনতে চায না তবুও বোঝায, বলে। তবে একটা ব্যাপাবে ওদেব আমি তাবিফ কবি।

—কী ব্যাপাবে?

—এ তল্লাটে সবাই হাতকাটাব দলেব ভযে থাকে। ওদেব সঙ্গে লাগলে আব বক্ষে নেই। ওবা কিন্তু হাতকাটাদেব ভয পায না। এটা কম কথা নয। আজই তো হাতকাটাব বমবমা আবও বেড়ে গেল। কাল থেকে দেখবে ওদেব ডমফাই ডবল হযে গেছে।

—কেন?

—ওবাই তো শকুনটাকে মাবল। তোমাব কথায বড একটা ফাঁডা কাটল। এই ব্যাপাবগুলো আমি বুঝি না।

—কী?

—এই ফাঁডা, বিপদ, অশুভ সব ব্যাপাব। '৮' আব '৯'-এব সঙ্গে এ ব্যাপাবে আমি একমত।

—তা হতে পাবো। কিন্তু আমাব কথাগুলো মিথ্যে নয। শকুনটাকে কাবা ডেকেছিল বলতে পাববে?

—কে আবাব ডাকবে? শকুনকে কেউ ডাকে?

—ডাকে। তা না হলে মরা নেই, ভাগাড় নেই, কিচ্ছু নেই, হঠাৎ করে শকুন আসবে কেন? ডাক পেয়েছে তাই এসেছিল।

—কারা ডেকেছিল?

—যারা পুড়ে মরেছে তারা। ওরা এখনও জ্বালায় ভুগছে, খিদেয় পুড়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তোমবা বুঝতে পাব না?

—না।

—ওদের চিৎকার বা কান্না শুনতে পাও না?

—না। তবে কেউ কেউ বলে রাতে নাকি দোতলার থেকে আর্তনাদ শোনা যায়।

—সেটাই তো স্বাভাবিক। কেউ কেউ নয়, সকলেই শোনে বা একদিন শুনবে। বাধ্য হয়ে শুনবে। আমি এরকম অনেক দেখেছি।

পুতুল কারখানায় আগুনের পরই এককথায় বলতে গেলে খেলনানগর মরে গেল। তারপব থেকে যেটা বেঁচে আছে সেটাকে হয়ত বা খেলনানগবের ভূতই বলা যায়। খেলনা আব পুতুল ঘিবে যে ছোট্ট উপনিবেশটা গড়ে উঠেছিল সেটা যে আব বেঁচে বর্তে নেই বা খবচেব খাতায চলে গেছে সেই খববটা নির্ঘাৎই ওপর মহলে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তা নাহলে যুদ্ধ লাগার কয়েক মাস আগে অর্থাৎ দেশ জুড়ে যখন ঘোব গৃহযুদ্ধ চলেছে তখন হঠাৎ খেলনানগবেব পশ্চিম দিকে তেজস্ক্রিয় ও বাসায়নিক আবর্জনা ফেলে কৃত্রিম পাহাড় বানাবাব পবিকল্পনা নেওয়া হবে কেন? বা এমনও হতে পারে যে এখানে ওই আবর্জনা ফেলার পরিকল্পনা যারা কবেছিল তাদের হযত এটাই বলা হয়েছিল যে একসময়ে ওখানে পুতুল তৈবিব কাবখানা ছিল, লোকজন থাকত কিন্তু আগুন লেগে কারখানা ভস্মীভূত হয়ে যাওয়াব পরে সেখানে আব মানুষজন নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে যে মানুষ এসে আবাব সেখানে থাকবে এমন কোনো সম্ভবনাও নেই।

—আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। তাজ্জব এক কাণ্ডকারখানা। পরের পর ট্রাক আসছে, পোড়াপাথর বা রবারের দলার মতো দেখতে জিনিস ফেলছে তাবপর ফের ওই আবর্জনা আনাব জন্যে ফাঁকা ফিরে যাচ্ছে। নিয়ম মেনে যেরকম পিঁপড়েবা সার দিয়ে কাজ করে সেরকম। ট্রাকগুলো সড়ক ধরে আসত। তারপব খেলনানগরে ঢোকার মুখে ডানদিকে বাঁক নিযে নদীব ওপর দিয়ে পেছন দিকে চলে যেত। এই ট্রাকগুলো খুব বড় আর চাকাগুলো দেখতে খাঁজ কাটা কাটা—ট্র্যাক্টবের চাকাব মতো। আমরা ট্রাকগুলোর নাম দিয়েছিলাম বেলচাগাড়ি। বেলচাব মতোই গাড়িগুলোর পেছনের মাল নেওয়ার জায়গাটা উল্টে আবর্জনা ফেলত।

—কখন তোমরা বুঝতে পারলে যে ওই আবর্জনা বিষাক্ত!

—পরে। ওরা আবর্জনা ফেলেছিল শুখা মরশুমে। তখন কিছু হয়নি। ওদিকে যাওয়াও বারণ ছিল। তবুও সাহস করে যারা যেত তাদের কেউ কেউ পায়ে জ্বালা করার বা পরে ছোট ছোট ফোস্কার মতো হওয়ার কথা বলত। তখনও আমরা বুঝিনি।

—তারপর?

—বোঝা গেল বৃষ্টির পর। নদীর জলের রঙ পালটে গেল। মাছ মরে গেল। গাছপালা এদিকে এমনিতেই কম কিন্তু নদীর পাড় দিয়ে একজাতের কাঁটা ঝোপ হত। ওতে হলুদ ফুল হত। সেই ঝোপগুলোও মবে গেল।

—তোমরা ওই নদীর জল খাও?

—উপায় কী? ওই জলই খাই। জানি বিষ খাচ্ছি কিন্তু কী করব? অন্ধকার রয়েছে, তা না হলে দেখতে আমার হাতে পায়ে নীল নীল দাগ। সকলের এরকম আছে। কালকে আলোয়

দেখো। গৃহযুদ্ধের সময়েও যারা খেলনানগর থেকে পালিয়েছে মনে হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁচতে পেরেছে। বাকিদের তো এই অবস্থা।

বামন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। উইন্ডচিটার আর বামন দুজনেই দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে কিছুক্ষণ।

—এমন বিষ যে পোকা, মাছি, মশা কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। শকুনটাকে যদি হাতকাটারা না মারত তাহলেও এমনিই মরে যেত। মারতে হত না। তাই তোমাকে বলছি যে যতই দেখে থাক না কেন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ততই মঙ্গল। এখানে কেউ আসে না। কতদিন কেউ আসে না। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গেছি। ওই যে ট্রাক আসত আবর্জনা নিয়ে তার এক ড্রাইভার নাকি '৮' আর '৯'-কে বলেছিল এইসব আর্বজনা নাকি আমাদের দেশ অনেক, অনেক টাকা পাবার জন্যে বিদেশ থেকে এনেছে। ওরা নিজেদের দেশে, বড়লোকদের দেশে এসব আবর্জনা তৈরি করলেও জমতে দেয় না, গরিব দেশগুলোতে পাচার করে দেয়। এটাই নাকি এখন দুনিয়ার নিয়ম। তোমার কি জানা আছে? এটাই নিয়ম?

—ঠিক লেখাপড়া করা নিয়ম বা আইন রয়েছে কি না জানি না। তবে কথাটা বোধহয় ঠিকই। গোটা দুনিয়া জুড়েই এরকম একটা অন্যায় চলেছে। গরিব দেশগুলোর লোক ভুগছে। করবেটা কী?

—উত্তরটা আমি জানি। কিচ্ছু করতে পারবে না। কিচ্ছু না। এক এক সময় ভাবি। '৮' আর '৯' না হয়, যতই পাগলাটে হোক, একটা বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছে। একদিন না একদিন পুতুল কারখানা নাকি খুলবেই। তা সে মরুকগে ওরা ওদের বিশ্বাস নিয়ে। অত যে নচ্ছার, ওই হাতকাটারও বেঁচে থাকার একটা কারণ হয়ত আছে। কিন্তু আমি বেঁচে আছি কেন? বামন হয়ে জন্মালাম, আস্ত মানুষ কিভাবে বেঁচে দেখেই গেলাম। অতবড় আগুন লাগল, অতগুলো লোক জ্যান্ত পুড়ে মরল আমার গায়ে আঁচটুকুই লাগল। তার বেশি নয়। তারপরেও দেখলাম জলের বিষে কত লোক মরে গেল এদিকে আমি যে কে সেই, ভূষণ্ডীর কাক হয়ে জ্যান্ত মরার মতো তিলে তিলে দগ্ধাচ্ছি। কবে যে এর শেষ হবে বলতে পার?

—বলতে হয়ত পারলেও পারতে পারি, কিন্তু সত্যি যদি বলতেই হয় তাহলে বলব এসব কথা জানলেও বলতে নেই। আমাকে বরং তুমি একটা কথা বলবে?

—কি?

—'৮' আর '৯'-এর যে বেঁচে থাকার একটা কারণ রয়েছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু হাতকাটা? ও এখানে পড়ে থাকল কেন?

—আরে ও তো এসেছিল সেই ব্যবসায়ীর পোষা গুণ্ডা হিসেবে। আগে ওই বন্দর শহরে চোরাচালানের কাজ করত। আগুন লাগার পরে ওর তো থাকারই কথা নয়। কিন্তু ও থেকে গেল। ও যা যা জানে তার জন্যে অন্য জায়গায় গেলে ওকে লুফে নেবে। কিন্তু ও যাবে না। কিছুতেই না।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে আজ যত কথা বলেছি তত বোধহয় গোটা জীবনে আর বলিনি আর বলবও না। যদি কথা দাও যে বন্ধুত্বের মান রাখবে, কথাটা কাউকে বলবে না, কাউকে না, তবেই বলতে পারি।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি।

—আগুন লাগার সময়ে কারখানার যে ম্যানেজার ছিল সে-ই একদিন নেশার ঘোরে আমাকে

বলেছিল। খেলনানগরেরেই কোথাও নাকি ওই ব্যবসায়ীর অনেক সোনার বিস্কুট লুকোনো রয়েছে। কথাটা নাকি হাতকাটাও জানে। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায়, তা ওই ম্যানেজারও জানত না, হাতকাটাও জানে না।

—সেই ম্যানেজাব এখন কোথায়?

—আগুন লাগাব পবেই সে তল্লাট ছেড়ে পালায়। কোথায় কোনো হদিশ নেই।

—তুমিও কি বিশ্বাস কবো যে সেই ব্যবসাযীর সোনার বিস্কুট রয়েছে? এই খেলনানগরেই?

—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কী এসে যায়? তবে আমি গোপনে নজর রেখে দেখেছি যে হাতকাটা অনেক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করছে বা লোহাব ডাণ্ডা দিয়ে শানের ওপবে বাড়ি মেবে মেরে ফাঁপা আওযাজেব তল্লাশ কবছে। আমার নিজের চোখে দেখা।

—আমি একথা কাউকে বলব না ঠিকই, তবে একটা কথা। আমি যদি ওই সোনার বিস্কুট খুঁজে পাই তুমি তোমার ভাগ নেবে?

—আমার ভাগ। মানে?

—মানে খুবই সোজা। তুমি না বললে আমি তো কিছুই জানতে পারতাম না। আমি যে সোনার বিস্কুট খুঁজে পাব এমন কথাও বলছি না। কিন্তু যদি পাই তুমি কি নেবে তোমাব ভাগ?

বামন জবাব দেয় না। তার জোরে জোবে নিঃশ্বাস পড়ে। কাশে।

—এখন বলতে হবে না। অনেক বাত হয়েছে। ঘরে ফিবে যাও। গিযে ভাবো। কাল বা পরশু আমাকে বললেই হবে।

উইন্ডচিটারের কথাব ধাঁচটা এতই গম্ভীব ঢঙেব ও আত্মবিশ্বাসে ভবপুর যে বামন কোনো জবাব খুঁজে পায না। তার জবাব খুঁজে না পাওযা মৌন সম্মতিরই সামিল।

—চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।

—আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

—সে তো পারবেই। আমি কি বলেছি তুমি পারবে না। আসলে আমারও এখন ঘুম আসবে না। বরং ঠাণ্ডায় কিছুটা হাঁটতে ভালোই লাগবে। চলো!

আদিত্য শরীর

বামনের পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠতে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উইন্ডচিটারের ঘুম ভেঙেছিল আগেই। জেগে উঠে উইন্ডচিটার দেখল এখন তার না উঠলেও চলে। তাই সে ভাবল এই অবশ জেগে থাকার মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলে কেমন হয়? স্বপ্নে সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কেউ কেউ বলে স্বপ্নে বা আধা জাগরণে মানুষ নাকি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে— অ্যাসট্রাল ট্র্যাভেল বা আউট-অফ-ডি এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে একসময় পাগলামি কম হয়নি। বিশেষত ৯০ দশকে যখন ওলটপালট করা ঝড় এক মেরু বিশ্বের দিকে বাঁক নিল তখন তথাকথিত নয়াচিন্তার নামে হাবিজাবি আজগুবি ভাবনা কিছু কম হয়নি। স্বপ্নের মতোই। স্বপ্নটা কি চেনা কোনো জায়গা বা ঘটনা থেকে শুরু করা যায়? অথবা গায় পড়া উইন্ডচিটার, তার দাঁত ভাঙা জিপ ফাসনার থেকেই। কোথায় পড়েছিল যে জিপ ফাসনারের সঙ্গে রেলপথের একটা মিল আছে। কোথায়? কিন্তু দাঁত ভাঙা জিপ ফাসনারের জন্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এলে গলা অবধি টেনে দেওয়া যায় না। এটা ঠিক স্বপ্ন নয়। একটা

বাস্তব সমস্যা। এর মধ্যেই থাকতে থাকতে উইন্ডচিটাব শুনতে পেল অনেক দূরে চড়া গলায় কেউ বকাবকি করছে। ঠিক তা নয়। কারণ তালে তালে কেউ বকে বা ধমকায় না। ঢংটাও অচেনা নয়। ওটা শ্লোগান।

শকুন মারার পর হাতকাটার দলের ওজন যে বেশ বেড়ে যাবে এটা '৮' আর '৯' ভালোই বুঝেছিল। সাদামুখদের তাতিয়ে কোনো লাভ হয়নি। অবশ্য এটাও মনে বাখতে হবে যে ভবিষ্যতে কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ, যা অনিবার্য, তা যখন হবে তখন হযত সাদামুখবা লড়াকু শ্রমিকদের পক্ষই নেবে। মোটের ওপর এরকমই ছিল '৮' ও '৯'-এব ধাবণা। চত্বরে ওবা চারটে পোস্টাব মেরেছিল—'মালিক তুমি পালিয়ে পাব পাবে না।' 'জঙ্গি শ্রমিকদেব পাশে দাঁড়াও।' অমর শহিদ লাল সেলাম।' ও 'দুনিয়ার মজদুব— এক হও।'

উইন্ডচিটাব গত রাতেব কথাব সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পাবল যে '৮' ও '৯'-এব আন্দোলন চলছে। শ্লোগানগুলো দূবে সরে যেতে লাগল। '৮' আব '৯' একজাযগায থেমে নেই। ওবা খেলনানগব পবিক্রমা কবছে।

—বন্ধ কাবখানা খুলতে হবে। কোনো জবাবী শ্লোগান নেই।

—কী হল? আওযাজ কোথায?

—পাবছি না। গলায কষ্ট হচ্ছে।

—পারছি না আবাব কি? কষ্টফষ্ট ভুলে যাও। গলা চিকক।

—দুঃখিত কমরেড। শ্লোগান দাও।

—মালিকেব কুত্তা গুণ্ডা-বদমাশ হুঁশিয়াব।

—হুঁশিযাব। হুঁশিযাব।

—দালালদেব হালাল কাব।

—হালাল করো। হালাল করো।

—পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যায় না, যাবে না।

ফেব জবাবী শ্লোগান নেই।

—কী হল?

—এবাব কমবেড তোমাবই ভুল। আমাব গলাব নয়। পুলিশ কোথায?

—ঠিকই তো। অভ্যেস হযে গেছে বলে বলে। গুলি মারো। আচ্ছা, আজকের কর্মসূচিতে স্ট্রিট কর্নাব ছিল না?

—দাঁড়াও। একবার দেখে নিই।

'৯' পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বেব করে। পড়ে।

—হ্যাঁ, কারখানার চত্বরে।

—তাহলে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

—হ্যাঁ, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি। ওরা যখন জিরিযে নিচ্ছিল তখনই বরকন্দাজ দেখেছিল যে, দূরে গার্ডের ঘরেব কাছে একটা লোক, লম্বা, দাড়িওয়ালা, উইন্ডচিটাব আর জিনস পরা এদিক ওদিক দেখছে। লোকটা বাস্তা থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিল। পকেটে রাখল। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বরকন্দাজ দৌড়োল হাতকাটাকে খবর দিতে।

অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট কামানের গায়ে হেলান দিয়ে জিশা আর কুমার বসেছিল। কুমার একটা কুড়িয়ে পাওয়া বই-এর পাতায় যতটুকু পড়া যায় সেটা পড়ছিল আর জিশা ওর কাঁধে মাথা রেখে চুপ করেছিল। পাতাটার ওপর দিকে পাশাপাশি তিনটে নকশা আঁকা— একটা লম্বাটে

পাইপের মতো, একটা গোল আর তিন নম্বরটা অনেকটা গেলাশের মতো—তিনটে ছবির ওপরে যথাক্রমে ইংরেজিতে ছাপা-গান-টাইপ ফিশন বম্ব, ইমপ্লোশন টাইপ ফিশন বম্ব ও থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড। প্রত্যেকটা ছবিব আবাব বিভিন্ন অংশের পরিচয় তীবচিহ্ন দিয়ে লেখা। যেমন তিন নম্বর ছবিটার তিনটে ভাগ— লিথিয়াম ডিউটেরাইড, ইউ-২৩৮ এবং ফিশন ডিভাইস। পাতাটা হাতে মুচড়ে দলা পাকিয়ে কুমার দূরে ছুঁড়ে দিল আর ঠিক সেই সময়ে, কাছেই, চত্বর থেকে স্লোগান শোনা গেল :

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ।

—ভুখা মজদুর করে পুকাব।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

কুমার জিশার মাথায় একটা চুমু খেল। জিশার শরীব জুড়ে আদর খাওযা বেড়ালেব মতো একটা স্পন্দন।

'৯' গলা খাঁকারি দেয়। তারপব বলে ·

—কমরেডস, পুতুল কারখানাব শ্রমিক ইউনিয়নেব সাধারণ সম্পাদক ও আপনাদেব প্রিয় শ্রমিক নেতা কমবেড '৮' এখন বক্তব্য বাখবেন।

'৮' ভাষণ শুরু করে।

—কমবেডস, খেলনানগরেব নাগবিকবৃন্দেব কাছে আজ আমাদেব আন্দোলন. নানা ধরনের প্ররোচনা চলছে... কিন্তু আজ অবধি ন্যায্য ক্ষতিপূবণ নিযে মালিক পক্ষ আমাদেব সঙ্গে আলোচনায় বসা তো দূবেব কথা বিশ্বাযনেব নামে দুনিযাব সমস্ত গরিব দেশের মেহনতি মানুষকে নিঃস্ব করে দেওয়ার এই চক্রান্ত. বুজরুকি আমবা অনেক সহ্য করেছি. আমবা জানি যে আমাদের কাবখানায যে পুতুল তৈবি হত তাব চাহিদা এতটুকুও কমেনি . বাজাব অর্থনীতিব এই চক্রান্ত... আমাদের আবেদন যে আপনাবা নিরাশ হবেন না, ভেঙে পড়বেন না, মালিকেব দালালের মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পা দেবেন.না . আমবা ওদের জানিয়ে দিতে চাই যে নতুন করে হামলা চালাবার ঝুঁকি যদি ওবা নেয তাহলে আমবাও প্রস্তুত. আমবা হিংসা ও সন্ত্রাসেব বিরোধী ঠিকই কিন্তু... যেন মনে রাখে আমাদের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে . যুদ্ধ কাবা বাধিয়েছে আপনারা ভালোভাবেই জানেন... এই যুদ্ধ. এই অপরিসীম ক্ষযক্ষতি, এই প্রাণহানি পরিস্থিতি যে একান্তই জটিল তা আমবা অস্বীকার কবি না.. আমাদের যে কমবেডরা সশস্ত্র পুলি ও মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণে শহীদ হয়েছেন.. কমরেডস. দুনিযাব যে মনগড়া ব্যাখ্যাই ওবা দিক না কেন আমরাই তাকে পালটাবার ক্ষমতা রাখি.. তাই আজ আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে যে... আমাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই... আমরা জানি যে আমাদের এই লড়াই একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম... শেষ রক্তবিন্দু না ঝরা পর্যন্ত... আপনাদেব সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে ও আগামী দিনে আমাদের এই লড়াইকে আরও তীব্র আরও জোরদাব করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে... ইনক্লাব জিন্দাবাদ, পুতুল কারখানার লড়াকু শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।

ভাষণ শেষ করে '৮' হাঁপায়। '৯' ওব কাঁধে চাপড় মারে।

—দারুণ হয়েছে।

—কিছু বাদ যায়নি তো!

—তেমন কিছু মনে পড়ছে না তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচিব ব্যাপারটা একটু আগাম

জানিয়ে রাখলে হয়ত...

—কিন্তু তোমাব সঙ্গে সিটিং না কবে সেটা কি কবে বলব?

—তা অবশ্য ঠিক।

—একটু জল খাওয়াতে পাবো?

উইন্ডচিটার বলল, —পাবি। '৮' আব '৯' চমকে উঠেছিল। এত কাছে, মাত্র কয়েক হাত দূবে, একটা সিমেন্টেব চাঙড়েব ওপারে বসে লোকটা যে ভাষণ শুনছিল সেটা ওরা খেয়ালই করেনি। অথচ না দেখতে পাওয়াবও কথা নয়। চারদিকে ধা ধা আলো। উইন্ডচিটাব ওয়াটারবটল এগিযে দেয়।

—বক্তব্যটা আমাবও বেশ মনে ধবেছে। যদিও তোমাদেব মতো ব্যাপারটা আমার জানা নেই।

—তুমি কি মালিকেব লোক?

—মনে তো হয় না।

—তোমাব নাম?

—যা ইচ্ছে দিতে পাবো। শেষ যে শহরটায ছিলাম সেখানে ওবা আমাকে উইন্ডচিটাব বলে ডাকত।

—তুমি কি ছাঁটাই শ্রমিক?

—না।

—আর্মি থেকে পালিযেছ?

—না। তাও নয়।

—তাহলে তুমি কী?

—উইন্ডচিটার। নাও, জল খাও। অনেকক্ষণ চেঁচিয়েছ।

'৮' ওয়াটারবটল খুলে জল খায়। উইন্ডচিটার বার্বি পুতুলকে দেখে। মুখে হাসি। ওদের দিকে জিশা আব কুমাব এগিযে আসে। '৮' ওযাটারবটল ফেবৎ দেয়।

—খুব মিষ্টি জল। এটা আমাদের নদীব জল নয়। তেতো ভাবটা নেই।

—শেষ যেখানে আমি ছিলাম সেখানে একটা কুয়ো থেকে এই জলটা ভবে নিযেছিলাম।

—সেটা কত দূরে?

—অনেক।

—কবে এসেছ?

—কাল।

—দেখিনি তো।

—আমি ওই ঘরটায় আছি।

উইন্ডচিটার দূরে গার্ডদের ঘরটা দেখায়।

—কাল এই শহরে একটা কাণ্ড ঘটেছে। জানো?

উইন্ডচিটার ঝুলন্ত শকুনেব দিকে তাকায।

—জানি। কাণ্ডটা না ঘটলে খুব ক্ষতি হয়ে যেত তোমাদের।

—মানে?

—শকুন খুব অশুভ।

—তুমি ওইসব শুভ অশুভ মানো?

উইন্ডচিটার জবাব দেয় না। জিশা আর কুমারকে দেখে। চেনা লোককে যেভাবে চেনা লোক দেখে। '৮' আলাপ করিয়ে দেওয়ার কাজটা করে।

—এ হল জিশা। ও কথা বলতে পারে না। ও হল কুমার। ভালো মেকানিক। আমাদের বন্ধু।

কুমার হাত বাড়িয়ে দেয়। উইন্ডচিটার হাতটা ধরে। ধরে '৮' আর '৯' এর সঙ্গে কথা বলে।

—তোমরা তো চাও যে কারখানাটা খুলুক।

—আমরা কেন? সবাই চায়।

—তাহলে সবাই তোমাদের কথা শোনে না কেন?

ওরা জবাব দেয় না।

কুমার বলে, আমি ওদের বলেছি। এসব বেকার হল্লাবাজি করে কি লাভ আছে? কে শোনে কার কথা? আরে, কারখানা কি নিজে নিজে খুলবে। কে খুলবে? বলছি হাতের কাজ জানো। চলো, দূরে কোথাও চলে যাই। ফালতু এখানে পড়ে থেকে লাভ?

—ওরা যদি না যায় তাহলে তুমি জিশাকে নিয়ে চলে যাও না কেন?

কুমার থতমত খায়।

—বাইরে, ঠিক ভরসা হয় না।

—আমি তো বাইরে থেকেই এলাম। যাই হোক, এখন চলি। আমার খুব ঘুমোনোর দরকার। পরে দেখা হবে।

যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় উইন্ডচিটার। শকুনটাকে দেখে। পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে। লাইটার। ধরায়।

—কেউ নেবে সিগারেট?

কুমার এগিয়ে যায়। কুমারকে দুটো সিগারেট দেয়। কুমার লজ্জা লজ্জা ভাব করে একটা বুকপকেটে রাখে। একটা ধরায়।

—চলি।

উইন্ডচিটার হাঁটতে থাকে। কুমার ফিরে আসে।

—বেশ দিলদরিয়া লোকটা। '৮' আর '৯' কিছু বলে না। হাওয়ার দমকে দড়িতে বাঁধা শকুন গোল হয়ে ঘোরে। ঠাণ্ডায় শুকোয়। কুমার যে ছেঁড়া পাতাটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তাতে ওই তিনটে নকশা ছাড়াও কিছু কথা লেখা ছিল। যেমন তীব্র তাপে হালকা ওজনের নিউক্লিয়াসের ফিউশন থেকে থার্মোনিউক্লিয়ার আয়ুধ তার ক্ষমতা পায়। এর জন্য দরকার সূর্যের কেন্দ্রের যে তাপ বা তারও বেশি—প্রায় ১৫,০০০,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ফিশন বিস্ফোরণ দিয়ে এই ত্রাস সৃষ্টি করা হয় বলে থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রকে ফিশন-ফিউশন বোমাও বলা হয়। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিল ফিশন বোমা। হিরোসিমার বোমাটি ৭০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মানুষকে হত্যা করে। বর্তমানের থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র এর চেয়ে ৮ থেকে ৪০ গুণ শক্তিশালী। এক মেগাটনের একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ২০০,০০০,০০০ কামানের গোলার সমান। এইসব আরও অনেক কথা ওই পাতাটাতে ছাপা ছিল যা পুরনো হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে 'দা নিউক্লিয়ার উইন্টার' নামে যে বইটা বামন উইন্ডচিটারকে পড়তে দেখেছিল তার বক্তব্যও পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু মজা এইখানেই যে মানুষ যতটা জানে ততটাই বেশি করে জানতে শেখে বা চায়। যতটা সে জানে না তা নিয়ে তার মাথাব্যথা কম।

বা থাকলেও অন্যের ভাবনা, সঁপে দেওযা, মানুষেব কাছে নয়। শুধু খেলনানগর নয়, নিউইয়র্ক, মস্কো, বেজিং, কলকাতা সব জাযগাতেই এই কথা খাটে।

গতরাতে বামন কিন্তু একটা আস্ত স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নটা হল পুতুল কারখানায় হাজার হাজার পুতুল-বামন তৈবি হচ্ছে। সেই পুতুলগুলো স্টাফড্ টয নয়, ফাঁপা। পেছনে, মলদ্বার যেখানে থাকে সেখানে বাঁশি লাগানো। ফলে টিপলে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে। এই পুতুল ছাপ মেবে বাজারে পাঠাবার পবে অনেক বামন এসে এইসব পুতুল কেনে। এবং তাবাও গিয়ে বামন পুতুল তৈবির কাবখানা বসায়। সেখানে আরও বামন তৈরি হয় এবং কানাডা ও ইতালিতে পুতুল পাঠাবার অর্ডার যে পেযেছিল সেই মালিক অর্থাৎ আসল মালিক এবার বামনকে বলে গোটা ব্যাপারটার হিসেব কষতে। ঘামতে ঘামতে ঘুম থেকে উঠে বামন দেখল তাকে ধাক্কা দিযে বুড়ো দবজি ডাকছে।

—কী ব্যাপার। স্বপ্ন দেখছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবলাম, বেলা গড়িয়ে গেল, তুমি এলে না, শরীর খারাপ টারাপ হল কি না।

—কাল একজন খেলনানগবে এসেছে।

—কোথা থেকে?

—জানি না।

—নাম?

—নাম বলেনি।

—কাল বাতে কী হয়েছে জানো?

—কী?

—পুতুল নাকি গোল হযে ঘুবেছে। শুধু তাই নয। ডুব সাঁতাব দিয়েছে আবার মাথা তুলে হেসেছে।

—তুমি কী কবে জানলে?

—আমি যখন আসছিলাম তখন জিশার মা বলল। ও নাকি তিনজনের কাছে শুনেছে।

—বলল আর তুমি বিশ্বাস করলে?

—ঠিক তা নয়।

—ওরা বলেছিল শকুন আসবে?

—জানি না।

বুড়ো দরজি আর বামন গার্ডদের ঘরে গিয়ে দেখল উইন্ডচিটাব নেই। ওর হ্যাভারস্যাক খুলে সব ছড়ানো ছিটোনো।

দুটো মাইকেলের চাকা, কয়েকটা মোমবাতি, একটা ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিও, কযেক প্যাকেট বিস্কুট, একটা টিনের কৌটোয় কিছু চুরুট ও ভাঙাচোরা কিছু ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের টুকরো, জং ধরা কয়েকটা ব্যাটারি, তামাক খাওয়ার পাইপ, কয়েকটা শিশিতে কিছু ট্যাবলেট, তিন চারটে বিদেশি ম্যাগাজিন ও দুটো বই। হাতকাটা তার দল নিয়ে ওর ঘরে এসেছিল। এসে হ্যাভারস্যাক উপুড় করে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু সন্দেহজনক পায়নি। দাগী বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। উইন্ডচিটার আসেনি। বামন ও বুড়ো দরজিও উইন্ডচিটারের দেখা পেল না।

মুখে মুখে সকলেই জেনে গেল যে খেলনানগরে একজন নতুন লোক এসেছে। এ ধরনের খবর চাউর হলে এটাই স্বাভাবিক যে আগন্তুকের সঙ্গে নগরের বাসিন্দারা দেখা করতে চাইবে,

আলাপ করবে, দুটো নতুন কথা শুনবে। কিন্তু পর পর তিনদিন উইন্ডচিটারকে কেউ খুঁজে পায়নি। অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে ওইসব ভাঙাচোরা জিনিসপত্র বা ছেঁড়াখোঁড়া হ্যাভারস্যাকটা নিতে লোকটা আর আসবে না। নিজেব মর্জিতে এসেছিল। নিজের মর্জিতেই চলে গেছে। '৮' আর '৯' সবগুলো সম্ভবনাই খতিয়ে দেখেছিল।

—মুখে না বললেও আমার মনে হচ্ছে যে লোকটা আদতে মালিকেবই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চলে গেছে।

—কী বুঝতে পেরেছে যে চলে যাবে?

—আমি এইভাবে ব্যাপারটা দেখছি। ওকে পাঠিয়েছিল মালিক কাবণ তাব নিজেব আসার সাহস নেই। ও এসেছিল আমাদের আন্দোলন জাবি বযেছে কি না এই খবরটা নিতে। এসে দেখলটা কী? দেখল আমাদের আন্দোলন শুধু চলছেই না, ববং নতুন উদ্দীপনা নিযে আরও জোরদার হতে চলেছে। ভুলে যেও না যে গোটা মিটিংটা ও বসে বসে শুনেছে। শুনেছে শুধু তাই নয়, মিটিং-এর পরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের হাবভাবটাও ভালোভাবে জেনে নিযেছে। এমনকি খোলাখুলিভাবে এ প্রশ্নও করেছে যে সবাই আমাদের কথা শোনে না কেন। সব মিলিয়ে যখন আঁচ করেছে যে কিছুতেই আমবা লড়াই থেকে সবব না তখন চলে গেছে। মালিক হয়ত এই আশাতে ছিল যে আমবা ঝিমিয়ে পডেছি।

—তোমার কথাগুলোয যুক্তি নেই তা বলছি না তবে এরকম নাও হতে পারে। লোকটা হয়ত ওসব কিছুই না, নিছকই ভবঘুরে। এ শহর ও শহব ঘুবে ঘুবে বেডায।

—দেশের যা হাল তাতে এভাবে ঘুরে বেড়ানোর মানে হল নিজের ওপব বিপদ সেধে ডেকে আনা। পাগল না হলে সেটা সম্ভব নয়। আমার কিন্তু লোকটাকে মোটেও পাগল বলে মনে হয়নি।

হাতকাটার দলেও উইন্ডচিটারকে নিয়ে আলোচনা হয়।

—ওস্তাদ, তোমার কি মনে হয় যে লোকটা '৮' আর '৯' কে মদত দিতে এসেছিল?

—কুমারের কাছে যতটুকু শুনেছি তাতে তেমন লাগেনি। বরং ও নাকি বলেছে যে শকুন মারার কাজটা ভালো হয়েছে। না মারলে অশুভ কিছু ঘটত। আব ওর মালপত্তর দেখেও আমার খারাপ কিছু লাগেনি। গোলমেলে লোক হলে বোঝা যেত। অত ভুল আমার হয় না।

—তবে লোকটার চেহারাটা বেশ রংবাজের মতো। দূর থেকে দেখেছি। ইয়া লম্বা।

—সে যাই হোক, লোকটা যখন কেটে পড়েছে তখন আর ওকে নিয়ে ফালতু কথা বলে লাভ নেই।

হাতকাটাকে একজন ছিপির প্যাঁচ কেটে কাফিড্রিলের শিশি এগিয়ে দেয়। হাতকাটা অন্যদের মতো জল মিশিয়ে খায় না। নিট গলায় ঢলে। ধকটা মৌজ করে অনুভব করে। ফের্ ঢালে।

—'৮' আর '৯' লোকটাকে দলে টানতে চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি। ওরা সাদামুখকেও দলে টানার ধান্দা করছে। ভাবছে এইভাবে দল ভারী করে আমার সঙ্গে টক্কর দেখে।

—আমি কিন্তু দেখেছি যে অনেকে কাছাকাছি না থাকলেও অন্তত গোপনে গোপনে ওদের কথাগুলো তারিফ করে। শুধু মুখে বলতে সাহস পায় না।

—সাহস পাবেও না। খেলনানগরে হাতকাটার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বুকের পাটা কারও নেই। আসলে '৮' আর '৯'কে খতম করার জন্যে আমার একটা মওকার দরকার। ঠিক ঠিক হাওয়া

না উঠলে সেটা হবে না।

—কিভাবে হাওয়াটা উঠবে?

—হাওযা কি নিজেব থেকে উঠবে নাকি! ওঠাতে হবে। সময় হলে সব আমি বলে দেব।

২২ নভেম্বব, দুপুরবেলা জিশাব মা নদী থেকে জল আনতে গিযে দেখেছিল উইন্ডচিটার বালির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জুতো পবা দুটো পা নদীব জলে। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে জিশাব মা নিশ্চিত হয়েছিল যে কোনো জ্যান্ত লোক ও'ভাবে পড়ে থাকতে পাবে না। ওব চিৎকার শুনে লোকজন দৌড়ে আসে। সাদামুখ ওকে চিৎ করে বুকের ওপবে কান রেখে বলে উঠেছিল।

—মবেনি। ধুক ধুক কবছে।

মুখ দিযে গ্যাঁজলা বেবোচ্ছে। চুল দাড়িতে বালি মাটি লেগে। সাবা গায়ে কাদা। সবাই মিলে ধরাধবি করে ওকে নিযে গিযে গার্ডদেব ঘরে শোওয়ায। বামন আর বুড়ো দরজি দেখল জ্ববে গা পুড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতটা অস্বাভাবিক ফুলে গেছে। চোখগুলো আধবোজা। বিডবিড কবছে।

বুড়ো দবজি অনেকক্ষণ ধবে নাড়ি দেখল।

--হাতে বিষাক্ত কিছু কামড়েছে বলে মনে হয।

—কিন্তু কী আছে এখানে যে কামডাবে।

—হযত দূবে কোথাও গিযেছিল।

হাতকাটা একটিন গুঁড়ো দুধ দিযে গেল। জিশা আব বামন পালা করে উইন্ডচিটাবের কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। শীত বাডল। জ্বরও বাড়ল। সন্ধেবেলায জিশাকে নিযে গেল কুমার। ওকে বাড়িতে পৌছে এস টি. ডি-আই এস. ডি বুথে নিজেব ডেবায় ফিরবে। আলো কমে এলে জিশাকে বাইবে থাকতে দেওযা নিবাপদ নয। রাতে বামন আব সাদামুখ উইন্ডচিটারের কাছে থাকল। আরও বাতে এল '৮' ও '৯'।

—ওর ওই শিশিগুলোর মধ্যে যে ওষুধগুলো রয়েছে সেগুলো কাজে লাগবে না?

বামন জলপট্টি পাল্টাতে পাল্টাতে বলল, আমি ওষুধগুলোব নাম পড়ে কিছু বুঝিনি। রাতটা ভালোয় কেটে গেলে কাল বরং দরজিকে দেখতে বলব ও চেনে কিনা।

হিমেল বাতাসে শকুন এদিক ওদিক দোলে। বার্বি পুতুল তার আধপোড়া চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। গামলার জলে গোল হয়ে ঘোরে প্লাস্টিকের পুতুল। জিশা ঘুমেব মধ্যে গোঙায়। জিশাব মা ওকে থাবড়ে শান্ত করে।

শেষ রাত থেকে শুরু হয় উইন্ডচিটারের ডিলিবিয়াম।

সৌম্য শরীর

বুড়ো দরজির কাছে অনেক পুরনো, কার্যকবী থাকার মেয়াদ বহু আগে ফুরিয়ে যাওয়া কিছু ট্যাবলেট ছিল। আন্ত্রিক জ্বরেব। দুদিন দেখার পরে বুক ঠুকে তাই খাইযে দেওয়া হয়েছিল। গত রাতে ভুল বকাটাও কমে গিয়েছিল। বারবার জেগে উঠছিল। হাতের ব্যথায় ককাচ্ছিল। সকালে বামন দেখল ঘেমে সপ সপ কবছে। তবে একটু পরে জ্ঞান এল। খুব শান্ত দেখায় উইন্ডচিটাবকে। একটু দুধ খায়। পুরোটা গিলতে পাবে না।

—আমি কোথায়?

কথাটা প্রথমে বামন বুঝতে পারেনি কারণ বড়ই জড়িয়ে জডিযে বলা। পবে স্পষ্ট হয।

—আমি কোথায়?

—খেলনানগরে। গার্ডদের ঘরে। এখন কেমন লাগছে?

—ভালো। আমার কী হয়েছিল?

—জ্বর।

—আমার হাতে খুব ব্যথা।

—ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—বলছি। একটু জল খাব।

জিশা জল দেয়। উইন্ডচিটার হাসে। '৮' আর '৯' এসেছে। উইন্ডচিটাব ডানহাতটা তোলে।

—আমি কী বলছিলাম জ্বরেব ঘোবে?

—আবোলতাবোল সব কথা জল, বিষ, পাথর, পাহাড়, যুদ্ধ— নানা কথা। কোনো মানে নেই।

—মানে আছে। খুব বড় মানে আছে। একটু উঠিযে বসাও আমাকে। মনে পড়ছে।

—মাথা ঘুরে যায় যদি!

—ঘুরবে না। মাথা ঘুরবে না। আমি সেবে গেছি।

—কোথায় চলে গিয়েছিলে?

—কোথাও চলে যাইনি। আমার হ্যাভারস্যাক, মালপত্র সবই তো এখানে ছিল। আমি গিয়েছিলাম আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে।

—সে কি! সে তো অনেক দূর!

—হ্যাঁ। অনেক দূর। পাহাড় পেরোবার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। বাঁ হাত কেটে গিয়েছিল।

—তার মানে বিষ ঢুকেছিল তোমার শরীরে।

—বিষ বলে বিষ। সে কি মারাত্মক যন্ত্রণা। হাতটা এখনও ভারী হয়ে আছে। যাই হোক ভালোই হল। অশুভটা আমার ওপর দিয়েই গেল। আমি জানতাম কিছু একটা হবে। তোমাদের নদীর জলটাও আমার সহ্য হয়নি।

—এই বিষই তো আমরা দুবেলা খাই।

—কথা আছে, এই নিয়েই কথা আছে। আমি জলের খোঁজ পাব। ভাল জল।

—কিন্তু আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে, অতদূর থেকে জল আনা যাবে কী করে?

—ওপারে যেতে হবে না। এপারেই জল পাওয়া যাবে। আমি জল খুঁজতে জানি। জল বলে দেবে কোথায় আছে।

'৮' আব '৯' বুঝতে পাবে না।

—জল কথা বলে?

এব উত্তবে উইস্ডচিটাবেব চাইনিটা একেবাবেই অন্যবকম। গলাব আওযাজেও যেন সম্মোহনেব কুহক মেশানো।

—জল কথা বলে। জল কথা না বললে গাছ, প্রাণী মানুষ ওবা কেউ থাকতে পাবত না। জল হচ্ছে মানুষেব সঙ্গে অসীমেব যোগাযোগেব এক মাধ্যম। তুমি যখন জলকে স্পর্শ কবো তখন আবও কত কী যে তোমাদেব স্পর্শ কবে তোমবা ভাবতে পাববে না। তোমবা কি মনে কবো জল মৃত, তাব প্রাণ নেই?

—জলেব প্রাণ?

—হ্যাঁ, জলেব প্রাণ। জল বিষমুক্ত হতে চায। নিজেব চেষ্টাতেই সে বিষমুক্ত হয। তোমাদেব এত কাছে সে বযেছে অথচ তোমবা তাব কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমি পাচ্ছি।

—তোমাব কথাব কোনো মানে হয না।

—কে বলেছে হয না? আসলে তোমাদেব কান নেই, বোধশক্তি নেই— থাকলে শুনতে জলেব আন্দোলন, জলেব শ্লোগান, তোমাদেব চেযে কত বড একটা কাণ্ড সে ঘটিযে চলেছে—আসলে তোমাদেব দোষ দিযে লাভ নেই। মানুষই ভুলে গেছে এসব কথা। মানুষ জলে বিষ মিশিযেছে, জলকে আহত কবেছে কিন্তু জল সবসময মানুষকে ক্ষমা কবে এসেছে, জানো? ওই হলুদ শিশিব থেকে দুটো বডি আমাকে দাও। ওটা বিষেব ওষুধ। আমাব খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ওবেলা তোমবা সবাই এস। কোথায জল আছে আমি বলে দেব। আমাব কাছে আব কাউকে থাকতে হবে না। আমি ঠিক হযে গেছি।

উইস্ডচিটাবেব কথা আদেশেব মতো মেনে নিযে সকলে চলে যাচ্ছিল। উইস্ডচিটাব ওদেব ডাকে।

—শোনো। আজ কত তাবিখ?

'৮' আব '৯' জানে না। বামন বলে, ২৫ নভেম্বব।

—২৫? পাঁচ আব দুযে সাত। ভালো দিন আজ। ৭ হল ম্যাজিক সংখ্যা—অপাব বহস্য লুকিযে আছে। সপ্তশবীব, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগব—ভাবতে থাকলে পাগল হযে যাবে। ঠিক আছে। এবাব যাও। তোমাদেব অনেক ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট কবেছো আমাব জন্যে। ও, আব একটা কথা। কথাটা মনে বেখ। আমি আবর্জনা পাহাডেব ওপাবে কেন গিযেছিলাম জানো?

—কেন?

—জল আমাকে ডেকেছিল বলে। এবকম অনেক কিছু আমায ডাকে। যাও।

ফেবাব বাস্তায নিজেদেব মধ্যে কথাবার্তা হয। '৮' আব '৯' বেশ ফাঁপবে পডেছে। '৮' আবও বেশি কবে।

—আমাব কেমন যেন সব গুলিযে যাচ্ছে। কিছু থই খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ওব কথাগুলো কি সত্যি?

বামন মাথা নাডে।

—জানি না। আব কতটুকুই বা বুঝি আমবা। তবে একটা ব্যাপাব মানবো। আমাব কিন্তু মুখেব ওপব না বলায় সাহস হয়নি। জ্বব থেকে ওঠা ইস্তক একেবাবে অন্য মানুষ, অন্য হাবভাব।

—সেটা আমাবও ঠেকেছে। এখন মনে হচ্ছে ও অনেক কিছু জানে যেগুলো আমবা বুঝি

না।

'৯' নদীর দিকে তাকায়।

—ও যদি সত্যি আমাদের ভালো জলের সন্ধান দিতে পারে আমি ওর কথা মেনে নেব।

—আমিও। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে আমাদের কারখানা খুলবে কি খুলবে না সেটা ও বলে দিতে পারে।

—তা হয়ত পারে। কিন্তু তা বলে আমাদের আন্দোলনে ঢিমে দিলে কিন্তু চলবে না।

ওরা চলে যাওয়ার পরে উইন্ডচিটার কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকল। বাঁ হাতটা কষ্ট করে কয়েকবার ভাঁজ করল, সিধে করল। গোটাকয়েক বিস্কুট আর একটু জল খেল। তারপর জং ধরা দুটো ব্যাটারি নিয়ে ভাঙা ট্র্যানজিস্টার রেডিওতে লাগাল। তারপর উইন্ডচিটারের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধবাল। খুব কাশি হল প্রথমে। তারপর সয়ে গেল। শবীবটা খুবই দুর্বল। জ্বলন্ত সিগারেট হাতেই ঘুমিযে পড়েছিল। সিগারেটটা আলগা আঙুল থেকে পড়ে একটু গড়িয়ে গিয়ে থেমে থাকল। তারপর জ্বলে জ্বলে পুরোটা ছাই হয়ে গেল।

বামন গিয়েই কুমারকে বলেছিল সে যেন হাতকাটা, সাদামুখ ও যতজনকে পাবে বলে দেয় ওবেলা উইন্ডচিটারের কাছে যেতে।

জলের বিষের থেকে শরীরে যে নীল নীল ছোপগুলো হয় সেগুলো পা থেকে শুরু হয় তারপর হাত ও শেষে মুখে দেখা দেয। এর ঘাও শুরু হয় পা থেকে। যাদেব হয তারা অসহ্য ব্যথায় হাঁটতে পারে না। পায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পুরু করে জড়িয়ে বেঁধে নিতে হয়। তা না হলে পা ফেলা যায় না। শীতকালে কষ্টটা একটু কমে কিন্তু গরমে অসহনীয় হয়ে ওঠে। বয়স যাদের কম, যাদের যুঝবার ক্ষমতা আছে তাদের রোগটা ধরতে সময় লাগে। আর সবাবই যে সমানভাবে হয় এমনও নয়। জিশার হয়েছে। কুমারের এখনও হযনি। জিশার মারও হয়েছে। তিন বুড়িকে তো সেই কবেই ধরেছে।

বিকেলে সবার আগে এসেছিল হাতকাটা। এসে দেখল উইন্ডচিটাব ঘুমোচ্ছে। পাশে ট্রানজিস্টার। হাতকাটা একাই এসেছিল। তারপরেই এল '৮' ও '৯'। ওরা হাতকাটাকে দেখে বিরক্ত হল। কথা বলাবলি নিজেদের মধ্যেই।

—আর কেউ তো আসেনি দেখছি।

—এসে পড়বে। আর ওর বিশ্রামেরও তো দরকার।

নিচু গলায় কথা বললেও উইন্ডচিটারের ঘুম ভেঙে গেল। উইন্ডচিটার হাসল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

—হাতের ব্যথাটা কমেছে?

—অনেকটা। ফোলাটা রয়েছে। তবে কমছে।

হাতকাটা বলে, তুমি যন্ত্রণা কমাবার জন্যে কাফিড্রিল খেয়ে দেখতে পারো। আমরা ওটা নেশা করার জন্যে খাই।

'৮' বলে ওঠে

—খবরদার কাফিড্রিল খেয়ো না। ওটাও বিষ। আমাদের জলের চেয়েও খারাপ। উইন্ডচিটাব হেসে দুপক্ষকেই থামায়।

—যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে। কোনো ওষুধেরই আর দরকার হবে না। কেউ একজন বাইরে গিয়ে কয়েকটা পাথর নিয়ে এসোতো।

হাতকাটা বলে, আমি যাবো।

—তোমাকে তো একহাতে আনতে হবে। বরং অন্য কেউ যাক।

—এত হাতেই যা ভেলকি বয়েছে সেটা অনেক দুহাতই পারবে না।

—তা কি জানি না? শকুনটাকে যা মেবেছিলে তুমি। সব শুনেছি।

—একটা প্রশ্ন কবব?

—বলো।

—তুমি ওই ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিওটা দিয়ে কী করো?

—কিছুই করি না। ও অনেকদিন আমাকে অনেক কথা, খবব সব শুনিযেছে। এখন আমি ওকে কথা শোনাই।

—এটা তো হেঁযালি হয়ে গেল।

—হেঁয়ালি নয়। আমি বানিয়ে একটাও কথা বলি না।

'৯' কয়েকটা পাথর নিয়ে আসে। কুমাব, বামন, সাদামুখ, বুড়ো দবজি সকলেই একে একে এসে পড়ে। উইন্ডচিটাব এক টুকরো নাইলনের সুতোর সঙ্গে একটা ছোট পাথর বাঁধে। কয়েকটা পাথবকে সাজায়।

—তোমাদের কেন আমি ডেকেছি নিশ্চয়ই জানা আছে। ওবেলাই বলেছি। যারা ছিল না তাবাও নিশ্চযই জেনে গেছে। কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে সকলকে।

—কী কথা?

—জল কোথায আছে আমি বলে দেব। ববং বলতে পাবো জল নিজেই বলে দেবে। কিন্তু তাব জন্যে হাতেনাতে যে খাটনি সেটা কিন্তু সবাই মিলে কবতে হবে। হাত মিলিয়ে। তোমরা পারবে?

—হ্যাঁ পারব।

—এই একটা কাজ মনে রাখবে কেউ নিজেব জন্যে কবছ না। সবাব জন্যে করছ। কোনো দলাদলি থাকলে চলবে না।

সকলেই চুপ করে থাকে।

—তাহলে ধবে নিচ্ছি যে আমার কথা তোমবা মানবে। এখন ভালো করে দেখো—এই তিনটে পাথর কী বলো তো? বলতে পাবলে না তো। আচ্ছা এটা যদি ধরে নেওয়া যায় যে নদীর রাস্তা অর্থাৎ এই দিকে নদীটা বয়ে চলেছে তাহলে এপারে কি তিনটে বড় বড় পাথব নেই?

—হ্যাঁ, এপারেও আছে, ওপারেও আছে।

—না, ওপারে বেশি পাথর আছে কিন্তু সেগুলো বেশ দূরে। হাতে গুণলে পাঁচটা। আমি এপারের কথা বলছি। এখন ভাবছি কি বোকাই না আমি। তিন পাথরকে জিজ্ঞেস না করে আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে কেন মরতে গিয়েছিলাম? কেন?

—কেন?

—কোনো অশুভ শক্তি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে চেয়েছিল যে ভালো জলের খোঁজ যেন আমি না পাই। জ্বর, হাত বিষিয়ে যাওয়া সব, সব তার চক্রান্ত। যাই হোক সেটা কাটিয়ে উঠতে পারা গেছে। আচ্ছা সবাই তোমরা একমনে ভাবোতো যে এক জায়গায় পরিষ্কার, ঠাণ্ডা, শান্ত জল রয়েছে। এত শান্ত, এত চুপচাপ যে তাতে কোনো ঢেউ নেই। স্বচ্ছ, মিষ্টি জল। মন দিয়ে ভাবো। আর কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করো না। তাহলে আমার কাজটা সহজ হবে।

উইন্ডচিটার সুতোয় বাঁধা পাথরটা ঝুলিয়ে দেয়। স্থিরভাবে ধরে রাখে। দোলকটা প্রথমে কিছুটা এদিক ওদিক করে স্থির হয় তারপর প্রথমে অল্প ও পরে বেশ জোরে দুলতে থাকে। দোলকটা উইন্ডচিটারের হাতটা সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপব তিন পাথরেব ওপরে এসে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্থির হয়। উইন্ডচিটার খুব ধীরে দোলকটা নিচু করে।

—এই তিন পাথর দেখবে একটা জায়গায় মিলেছে। আসলে মেলেনি। ওখানে একটা চ্যাপটা পাথর রয়েছে। তিন পাথরের মধ্যে এমনভাবে ওই পাথরটা রয়েছে ওকে আলাদা করে চেনা যায় না। জল রয়েছে ওখানেই। ওই পাথর ভাঙলে জল উঠবে।

—কিন্তু অত বড় পাথর ভাঙা যাবে?

—খুব বড় নয়। ভাঙা যাবে না কেন? তবে কাজটা কঠিন। কারণ জায়গাটা অপরিসব। গাঁইতি চলবে না। শাবল আছে তোমাদের কাছে?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে? কুমার বলে, শাবল আছে। বড় স্টিলের রডও আছে।

—ওতেই হয়ে যাবে বলে মনে হয়। আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার। আজ তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

কুমার সাদামুখকে নিয়ে ওগুলো আনতে যায়।

—এটা কিন্তু, আবার বলছি, একার কাজ নয়। সকলকে হাত লাগাতে হবে।

হাতকাটা বলে, কিন্তু পাথর ফাটিয়ে যদি জল না পাওযা যায়?

—না পাওয়া গেলে শাবলটা দিয়ে আমার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ো। আব কিছু বলবে?

—ছি, ছি, আমি কি তাই বলেছি?

—তুমি তো বলনি! বলেছি আমি। তবে জেনে রেখো জল কিন্তু বেশি উঠবে বলে মনে হয় না। দেড় হাত মতো উঠবে। ওখান থেকেই পাত্র ডুবিয়ে নিতে হবে। আব সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। কোনোমতেই যেন নদীর জল ওখানে এসে না মেশে। বর্ষায় কি জল খুব বাড়ে?

—খুব একটা না। হলেও কখনওই বড় পাথরের ওপরে ওঠে না।

—তাহলে তো ভালোই হল। এখন তোমরা যাও। কাল সকালে আমাদেব কাজ শুরু হবে। সকলে এসে যেয়ো। আমি ঠিক আলো ফোটার মুখে পৌঁছে যাব।

কুমার আর সাদামুখ শাবল আর রড নিয়ে আসে।

—শাবলটা আব একটু লম্বা হলে ভাল হত। কষ্ট হবে। কাজ চলে যাবে।

পরদিন উইন্ডচিটারের ঘুম ভাঙতে আরও দেরি হত বামন এসে না ডাকলে।

—ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভাবলাম তোমায় না ডাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

—ভালই করেছ ডেকে। তা না হলে উঠতে কত দেরি হত কে জানে?

—এখন কি অনেকটা সুস্থ লাগছে?

—পুরোই বলা চলে। হাতের ফোলাটাও নেই। ভাল কথা, এখন কেউ নেই। তোমাকে কালকেই বলব মনে করেছিলাম। খেলনানগরের একটা ম্যাপ কি করে পাওয়া যায় বলতে পারো?

—খেলনানগরের একটা খসড়া প্ল্যান আমার কাছে আছে। সেটা ম্যাপের মতোই। কিন্তু তাতে আমি যেখানে থাকি সেখানকার ঘরগুলো দেখানো নেই। ওগুলো পরে বানানো।

—ওতেই খুব ভালো করে চলে যাবে। তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে।

—কী ব্যাপার বলো তো? কী দেখবে তুমি ওতে।

—দেখব সত্যিই সেই মালিকের সোনার বিস্কুট কোথায় থাকতে পারে। এই সব কাজে ঠিক

ঠিক ম্যাপ পেলে খুব সুবিধে হয়।

—জল যদি পাওয়া যায় আমি তোমার প্রত্যেকটা কথা মেনে নেব।

—দেখা যাক কী হয়। জল না পাওয়া গেলে হাতকাটা কেন, তুমিও যে আমাকে ছাড়বে না সেটা ভালোভাবেই টের পাচ্ছি।

তিন পাথবেব মধ্যে একটা ফোকব বয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা একটু ত্যাবচা হওয়ায় শাবল পৌঁছলেও ভালোভাবে মারা যাচ্ছিল না। কুমার ঠাণ্ডাব মধ্যেই ঘেমে নেযে গেছে। ওই এতক্ষণ শাবল চালাবার চেষ্টা কবেছিল। উইন্ডচিটাব শাবলটা নেয়। ফোকর দিয়ে নিচ অবধি নামায়। একটু তোলে। আবার নামায়। ঠং কবে একটা শব্দ হয। যথেষ্ট জোরে নয়।

—বুঝতে পেবেছি। আগেই বলেছিলাম জাযগা খুব কম। এত সরু সেটা অবশ্য ভাবিনি।

—কী হবে তাহলে?

—কী আবার! উপায একটা বযেছে। বড়, খুব বড লোহাব হাতুড়ি আছে?

কুমাব মাথা নাড়ে।

বুঝতে পেবেছি কিন্তু অত বড হাতুড়ি নেই।

—তাহলে ভাবী লোহা বা পাথডেব চাঙড দিযে মাবো। একজন শুধু শাবলটা ধবে থাকবে।

হাতকাটা এক হাতে শাবলটা ধবে। '৮' একটা বড পাথর দিয়ে মাবে। এই প্রথম বহুদিন পবে ওদেব কথা হয

--দেখো, ফস্কে গেলে কিন্তু আমাব হাত বলে কিছু থাকবে না।

—ঘাবডিও না। ফস্কাবে না।

'৮' প্রচণ্ড জোবে জোবে মারে আব প্রত্যেকটা আঘাতেব পব পব হাতকাটা শাবলটা একটু ঘুবিযে দেয়। শব্দটাও ধাবালো হয। পাথরে নির্ঘাৎ চিড ধবছে বা কিছুটা জাযগা গুঁড়ো গুঁড়ো হযে শাবলকে জাযগা কবে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিছুটা পবে ওবা দুজনে হাঁপিযে পড়ে। হাতকাটা হাত ঝাডে।

—একটা কাপড জড়িয়ে নিলে ভালো হয়।

এবারে রুমালি আর '৯' ওদের জাযগা নেয়। '৯' শাবল ধবে। রুমালি মাবে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে। দুজনে হাঁপিয়ে পড়তেই হাত বদল হয। ঘণ্টা দুযেক যায়।

—দাঁডাও তো! এইবাব মাবো। আমি আওযাজটা শুনব।

—ঠং।

—শাবলটা বাব করো।

—শাবলেব ফলাটা শুকনো। গরম।

—এবারে স্টিলেব রডটা ঢোকাও তো। ঢুকেছে? হ্যাঁ, এইবাব মারো। আরও জোরে! হ্যাঁ, আরও জোরে। রডটা একটু বেশি ডেবে যায়। উইন্ডচিটাব চেঁচিয়ে ওঠে

—চিড় ধরেছে। পাথরটা এইবার ভেঙে যাবে। রডটা আর একটু ডেবে যায়।

—বের কবো তো!

বডের মুখটা ভিজে ভিজে।

—জল উঠছে। এবারে বেশি নয। অল্প মারো। হ্যাঁ। আব একটু জোবে! আর একটু। বের করো।

ফোকরটা ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। একটু একটু করে জল উঠছে। জলটা কালো দেখায়।

—প্রথম দিকের কিছুটা ফেলে দাও। ধুলোটা চলে যাক।

টিনে করে জলটা তুলে সকলে দেখে। টিনটা হাতে হাতে ঘোরে। তিনদিকে পাথর ঘেরা বলে জলটা কালো দেখায় কিন্তু টিনের মধ্যে বেশ স্বচ্ছ। উইস্ভচিটার কিছুটা জল খায়।

—আমার তো ভালোই মনে হচ্ছে। এবার তোমরা দেখ! জলটা আর একটু উঠবে। তবে তোমাদের ইচ্ছেমতো নয়। নিজের ইচ্ছেমতো।

সকলে জল খায়। মুখে মাথায় মাখে। এ ওর গায়ে ছিটিয়ে দেয়। উইস্ভচিটার একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। ওদের দেখে। কেউ শুয়ে পড়ে হাত ঝুলিয়ে জল ধরার চেষ্টা করছে। কুমার ওর কাছে এগিয়ে আসে।

—তুমি সত্যিই যাদু জানো। একটা সিগাবেট চাইব? অবশ্য আপত্তি না থাকলে। উইস্ভচিটাব সিগারেট প্যাকেট ও লাইটার এগিয়ে দেয়। নিচু গলায় বলে, তুমি জিশাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলে না?

—হ্যাঁ, সবসময় ভাবি।

—আমি তোমাদের নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি। কিন্তু কাউকে বলা চলবে না।

—না, আমি জিশাকেও এখন বলব না।

—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলো।

—পুতুল কারখানার পেছনে একটা লোহালক্কডেব জাংক ইয়ার্ড আছে?

—আছে।

—সেখানে আমি অনেক কিছু দেখেছি। আমার কাছে দুটো সাইকেলেব চাকা আছে। ওখান থেকে বাকিটা পাওয়া যাবে?

—মানে, চলে এমন একটা সাইকেল!

—হ্যাঁ, চলে এমন একটা সাইকেল। মানে হলে ভালো হয়। কাজটা তোমায় করতে বলতাম না, কিন্তু খেলনানগরে কোনো সাইকেল আমার চোখে পড়েনি।

—তুমি খুঁজেছ?

—খুঁজিনি। দেখেছি।

—আমি তোমাকে একটা সাইকেল দিতে পাবব। আছে।

—কোথায়?

—আছে হাতকাটার বাড়ির পেছনে একটা ফাঁকা শেডের তলায়।

—ও জায়গাটা তাহলে আমি দেখিনি।

—কেউ যেন না জানে।

—কেউ জানবে না। কিন্তু তুমি চলে যাবে? তাহলে আমার আর জিশার যাওয়ার কি হবে?

—সেটাই তো ঠিকঠাক করতে হবে আমায়। আমাকে একটু যেতে হবেই।

—তুমি কি আবার ফিরে আসবে?

—না। আমি তোমাকে খবর পাঠাব।

—কি ভাবে?

—ফোন করে।

—ফোন করে?

—হ্যাঁ। আমি যে সময় বলব ঠিক সেই সময় তোমার ঘর অর্থাৎ ওই বাতিল এস. টি.

ডি-আই এস ডি বুথের অকেজো ফোনটা বেজে উঠবে। তাব আগে অমন বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটবে। মাথা ঘামাবে না। যাই হোক না কেন। উইস্‌ডচিটার যা বলে তার অন্যথা হয না। আমাকে কোনো প্রশ্ন কববে না।

—সাইকেলটা আমি বাখব কোথায়?

—পরে বলে দেব। ওরা আসছে। চুপ কবো। অন্য কথা বলো।

—এই জলটা খেলে কি ওই নীল দাগ হবে না?

—না। এই জল ওই নদীবই জল কিন্তু এত পাথব আব বালিব মধ্যে দিয়ে ওকে আসতে হয়েছে যে ওব মধ্যে বিষ নেই।

অন্যবা এসে ওদের ঘিবে বসে।

—এই জল হল পবিত্র একটা শক্তি। ওব সততা আব মাযা ঐশ্ববিক, কখনও জলকে অসম্মান কববে না। সমীহ কববে। যে কোনো আকার যে নিতে পাবে তাব অলৌকিক ক্ষমতা বযেছে। ব্যাপাবটা ভেবো। এর ওপবে ধ্যান কবলে আবও ভালো। দেখবে জল তখন কত কথা বলবে তোমাদেব সঙ্গে।

সবাই চুপ কবে থাকে।

—তোমাদেব মতো অসহায় মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। জল একা কেন, আরও কত কি যে তোমাদেব অপেক্ষায বযেছে তোমবা জানো না। সব আনন্দ, প্রাচুর্য, সুখ, সব কিছুব চাবিকাঠি তোমাদেব কাছেই বযেছে কিন্তু তোমবাই নেই।

--বুঝতে পাবলাম না।

--মানে যেভাবে আছ সেটাকে থাকা বলে না। এভাবে বাঁচাব কোনো মানে হয় না। এভাবে থাকলে তোমবাও একদিন ক্ষুধার্ত প্রেত হযে যাবে। অন্যেব অমঙ্গল কবাব চেষ্টা কববে। শকুনের মতো অশুভ পাখিকে ডেকে আনবে। তোমাদেব বক্ষা কবে এবকম কোনো অদৃশ্য প্রাণী নেই। কী অসহায তোমবা। থাকলে শকুন আসতে পারত না। কিছুতেই পাবত না। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো জীবজন্তু বা পাখি কিছু পুষেছিলে কোনোদিন?

সবাই চুপ কবে থাকে। বুড়ো দবজি বলে, খেলনানগবে নয, এব আগে আমি যেখানে থাকতাম আমাব একটা বেড়াল ছিল। এখানে আসাব সমযে সেটাকে ফেলে এসেছিলাম।

—তুমি বেড়ালটাকে মনে কবতে পারো?

—হ্যাঁ, পাবি।

—এমনিই মনে করা নয়। তার বং, তাব চলা, তাব চলার ধরন, তাব থাবা চাটাব ভঙ্গি, খাবারের জন্যে ডাকাডাকি, অন্ধকাবে তাব স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, জ্বলন্ত চোখ, ঝগড়া করার সময় ফুলে ওঠা ল্যাজ ও বেঁকে যাওযা শবীব, তাব পাযে মাথা ঘষে ঘষে আদর পাওযার চেষ্টা, আদর কবলে আস্তে আস্তে তাব গোটা শবীব জুড়ে আবামের শব্দ, সবকিছু মনে করতে পারো? এমনভাবে মনে কবতে পারো যেন সে তোমার কাছেই বয়েছে। একেবাবে কাছে। ইচ্ছে কবলেই তুমি তাকে স্পর্শ কবতে পারো। এভাবে পাবো তাকে কাছে রাখতে?

—না।

—পারবে। একটু চেষ্টা কবলেই পাববে। আমি কাল তোমার বাড়িতে গিয়ে সেই বেড়ালটাব একটা ছবি এঁকে দিযে আসব। তারপর তুমি ওই ছবিটাকে ঘিরে আমি যেভাবে বলেছি তাকে ভাববে। তারপর এই ভাবনাটা সহজ হযে যখন তোমার নিজেব, একান্ত নিজের হযে যাবে তখন দেখবে ও তোমার কথা শুনবে, নানা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে, আবও কত কিছু

করে দেবে যে তুমি কল্পনাও করতে পাবব না।

—তুমি না এলে এই কথাগুলো আমরা জানতেই পারতাম না।

—মজার ব্যাপাবটা তো এইখানেই। মানুষ থার্মোনিউক্লিয়ার আত্মহত্যার রাস্তায় অনেক এগিযে গেছে, এ ব্যাপারে তার দক্ষতা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে অথচ এই সহজ ব্যাপারগুলো তার মনে নেই। অথচ এগুলো মনে রাখতে পারলে তার এই দশা হত না।

উইন্ডচিটার উঠে পড়ে। শীতের ঝোড়ো হাওয়া তার ঝাঁকড়া একমাথা চুল এলোমেলো করে দেয়।

—আজ অনেক কাজ হল। আমার মাথাটাও শাবলেব আঘাত থেকে বেঁচে গেল। কাল কথা হবে। আমি চললাম।

সেইদিন রাতে '৮' '৯' কে বলেছিল :

—উইন্ডচিটার ঠিক বলে দিতে পারবে আমাদের কাবখানা খুলবে কিনা।

—বলে দেওয়া তো ওব কাছে জলভাত, আমাব মনে হয় ইচ্ছে করলে ও নিজেই এই কারখানা খুলে দিতে পারে। ওর সে ক্ষমতা আছে।

—তাহলে আমাদেব আন্দোলনের এখনকাব কর্মসূচি কী হবে?

—কি আবাব। আন্দোলন চলবে যেমন চলছে। কাল আমরা বাকি পোস্টাবগুলো মাবব।

সেই রাতেই বামন গিয়ে উইন্ডচিটারকে খেলনানগবের প্রাথমিক খসড়া প্ল্যান দিয়ে এসেছিল।

আকাশশরীর

—বেড়ালের ছবিটা ঠিক হয়েছে? মানে একেবারে তোমার বেড়াল যেমন ছিল তেমন হবে না। আসল ব্যাপারটা হল ছবিটাকে ঘিরে যে মণ্ডল তুমি ভাবনায় গড়ে তুলবে তাব মধ্যে তোমাব সেই বেড়াল, যাকে ফেলে এসেছিলে, সে ঘোরাঘুরি কবতে পারলেই হয। বুঝেছ?

—অনেকটা। আচ্ছা তুমি এইসব আশ্চর্য ব্যাপার জানলে কি কবে?

—সে কথা থাক। আমি আগেই আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু দুদিন আমি বলতে গেলে ঘব থেকেই বেবোইনি।

বুড়ো দরজি ওর বিছানার তলায় কী খোঁজে। পায় না। একটা জং ধবা তোরঙ্গ খোলে। পুরনো জামাকাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে।

—কী খুঁজছ?

—তোমাকে দেব বলে একটা জিনিস।

—কী?

—দাঁড়াও আগে খুঁজে পাই।

তোবঙ্গতে নেই। এইবার খাটের তলায় উপুড় হয়ে ঢুকে পড়ে। একটা ডালাভাঙা, ধুলোপড়া বাক্স টেনে বের করে। তার মধ্যে কয়েকটা মরচেপড়া কাঁচি, সেলাই মেশিনের ববিন, দরজির ফিতে—এই সবের তলায় কাপড়ে জড়ানো ছিল।

—এটা একটা রিভলভার। খুব ভালো। আমার হাতে এসেছিল। কোনো কাজে লাগে না। কয়েকটা গুলিও আছে।

—আমি কী করব রিভলভার দিয়ে?

—কেন? তুমি ভবঘুবে লোক। ফেবাব বেপাত্তা মানুষের মতো ঘুরে বেড়াও। যদি ডাকাতটাকাত ধবে।

—কী নেবে ডাকাত আমার কাছ থেকে?

—তা হোক, এটা তুমি বাখো।

—না। আমার অস্ত্র রাখা বাবণ। ছোঁযাও বারণ। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। যেভাবে বললাম সেটা করলে তোমার কেন সকলেবই ভাল হবে।

উইস্ডচিটার রাস্তায় বেবিযে আসে। হঠাৎ দূব থেকে একটা বিস্ফোরণেব শব্দ আসে। নাকি শব্দটা ঝোড়ো হয়ে ওঠা শীতেব হাওযা নিয়ে এসেছিল? উইস্ডচিটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন লোক রাস্তায় বেবিয়ে এল। তাবাও শব্দটা শুনেছে।

—কোন দিক থেকে এল শব্দটা?

উইস্ডচিটার উত্তর দিকে তাকায। জবাব দেয় না। সিগারেট ধবায়। হাঁটতে থাকে। আরও দুটো শব্দ হয় বিস্ফোরণের। এবার একটু জোবে। শব্দগুলো আবর্জনা পাহাড়েব দিকে চলে যায। বাস্তায় জল নিয়ে যারা ফিবছিল তাদের মধ্যে জিশাও ছিল। সকলেই জানে যে এই লোকটাই তাদের পবিষ্কার খাওয়ার জলেব সন্ধান দিযেছে। সবাই কথা বলতে সাহস পায়নি। গার্ডেব ঘরের দবজার সামনে টিনেব খাবাব, বিস্কুট বা গুঁড়ো দুধেব বাক্স বেখে এসেছে। এক প্যাকেট সিগাবেটও ছিল, কিন্তু খাওয়া যাযনি। নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনিয়নের ঘবে '৮' মার্কস আব লেনিনেব ছবি থেকে ধুলো ঝাড়ছিল আব '৯' মেঝেব ওপবে ছড়িয়ে একটা তিন বছবেব পুবনো খববেব কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ দবজায় আলো ঢাকা পড়তে দুজনেই ঘুবে তাকাল। প্রায গোটা দরজা জুড়ে উইস্ডচিটাব দাঁডিয়ে আছে।

—তোমরা শব্দগুলো পাওনি?

—কিসের শব্দ?

—বিস্ফোবণেব শব্দ। একটা নয। প্রথমে একটা। পবে দুটো হল।

—আমবা তো পাইনি।

'৯' হলদেটে খববের কাগজটা ভাঁজ করে বাখে।

—আমি এসেছিলাম তোমাদেব সঙ্গে একটা জরুবি আলোচনা কবতে গোপন।

'৮' আর '৯' উত্তেজনায় শিহরিত হয়।

—তুমি বসো। আমরা একবার চারদিকটা দেখে নিই। কেউ আড়ি পেতছে কিনা। কিছুই বলা যায় না।

—ঠিক আছে দেখে নাও।

'৮' বাঁদিকে ও '৯' ডানদিকে চলে যায়। গলিটা দেখে নেয়। কেউ নেই। ওরা ফিরে আসে।

—কেউ নেই। তবুও সাবধান থাকতে হবে। ফিশফিশ কবে কথা বলতে হবে।

—তোমরা কি বুঝতে পেরেছ আমি কে?

—হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু পারো। আমাদের বন্ধু।

—এখনও পুরোটা বোঝনি। সেটা অবশ্য তোমাদের দোষ নয। আমি তোমাদের বুঝতে দিইনি।

—তার মানে? তুমি কমরেড?

—চুপ! যা বোঝার বুঝে নাও। এবারে বলো, কারখানা খুলতে চাও? আমি আর রেখে

ঢেকে কথা বলতে পারব না। অনেক হয়েছে।

—আলবাৎ চাই।

—এখুনি চাই। ই..ন...কে!

—চুপ। এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লে আমাদের গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে।

'৮' রেগে যায় '৯'-এর ওপর।

—অল্পতেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। কত বলেছি।

—আমি আর ওরকম করব না।

—মনে থাকে যেন!

—যাই হোক, এবার দুজনেই মন দিয়ে শোনো। কারখানা খোলার জন্যে আমাদের মালিকের দরকার নেই। মূলধন আমাদের কাছেই আছে।

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। মালিক শ্রেণী ছাড়া অত টাকা কাদের কাছে থাকবে?

—শোনো, তোমাদের সেই মালিক, যার আর খোঁজ নেই, তার অনেক সম্পদ এই খেলনানগরে লুকোনো আছে। টাকা নয়, সোনা। সোনাকে টাকা করে নিতে কতক্ষণ? সেটাই আমাদের দরকার।

—সেটা আর কেউ জানে?

—কেউ না। শুধু তোমরা দুজন।

'৮' আর '৯'-এর কপালে ঘাম। থরথর করে কাঁপছে '৯'-এর ঠোঁট।

—এইবার আমাদের আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হবে। যা বলছি মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। মনে রাখতে হবে, জয় আমাদের হবেই।

—জয় আমাদের হবেই। বলো কী করব আমরা। পুরো জান লড়িয়ে দেব।

—আজ ২৯ তারিখ। কাল নভেম্বর, আমাদের প্রিয়, ঐতিহাসিক নভেম্বর মাস শেষ।

এবার ফের বিস্ফোরণের শব্দ হল।

—এবারে শুনতে পেয়েছ? শব্দটা-উত্তরদিক থেকেই আসছে।

—কি করে বুঝলে?

—উত্তুরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়াতেই শব্দটা আসছে। গুলি মারো, কাল নভেম্বর ফুরোবে। আমার অন্য কাজ থাকবে। পরশু অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর আমি পাকা খবর পেয়ে যাব যে সোনাটা কোথায় রয়েছে। তারপর সেটা যদি বের করতে হয় তোমাদের লাগবে।

—আমরা তাহলে এখন কী করব?

—একনম্বর হল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টা করবে না। যখন দরকার হবে আমি করব। দুনম্বর এখনই তোমরা দুজনে বেরিয়ে যাবে। জল খুঁজে পাওয়ার পর থেকে খেলনানগরে দলাদলির ভাবটা কম। এটাকে কাজে লাগিয়ে নিঃশব্দে যাচাই করবে যে আমাদের এই পরিকল্পনার কোনো আঁচ ঘুণাক্ষরেও কেউ পেয়েছে কিনা। তিন নম্বর, কাউকে না জানিয়ে মাটি খোঁড়া যায় এমন কিছু খন্তা বা শাবল জাতীয়, না পেলে সিক বা বড় ছুরি জোগাড় করবে। কুমারের কাছে চাইবে না। কেউ জানবে না আমরা কী করতে চলেছি। যখন জানাব আমরা তৈরি হয়েই জানাব।

'৮' আবেগে ও আনন্দে কেঁদে ফেলে।

—কমরেড! কমরেড!

—তুমিও তো দেখছি আবেগপ্রবণ কম নও। একটু আগেই না '৯' কে বকছিলে। আর চার

নম্বব, শেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ কি হতে পাবে সেটা বলতে পার?

'৮' ও '৯' নিরুত্তব।

—ধবো সব যদি ওলটপালট হয়ে যায়, আমাদের এই দীর্ঘদিনের দাঁতে দাঁত লড়াই যদি পবাজিত হয়, আমাদের স্বপ্নেব ইমাবত যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তাহলে আমরা বীবেব মতো মবব। কিন্তু শত্রু বা মালিকেব দালালদের কাছে মাথা নিচু করব না।

তিনজনে তিনজনেব হাতেব ওপবে হাত বাখে।

– আর একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে নাও। আমি চলে যাব।

ওবা দেখে আসে। কেউ নেই।

—বিদায় কমবেড!

উইন্ডচিটার বেবিয়ে যায়। '৮' ও '৯' পরস্পবকে বুকে জড়ায়। দুই বিশ্বস্ত সৈনিকের এই আনন্দঘন মুহূর্ত মার্কস ও লেনিন দেখে যান।

খেলনানগবেব চত্ববে বামন বসে বোদ পোযাচ্ছিল। বিস্ফোবণেব শব্দে অনেকেই সেখানে বামনকে ঘিরে জড়ো হয়েছে। ওরা দেখল একটা ফাঁকা টিনেব কৌটোয় লাথি মেবে এগোতে এগোতে উইন্ডচিটাব আসছে। হাতে সিগাবেট। বামন বলে, আওযাজ পেযে সবাই ভয পাচ্ছে।

—আমিও পেযেছি। কিন্তু তাতে লাভ কী? আব পবে মনে হল আওযাজটা অনেক দূবে হচ্ছে। বাতাসে নিযে আসছে। ধাবে কাছে কিছু ঘটছে বলে মনে হচ্ছে না।

শুনলে তো। ভয়ের কিছু নেই। এ আমাব কথা নয।

ভিড হালকা নয। বামন নিচু গলায বলে,

প্ল্যানটা কাজে লাগল?

—লাগছে। হলে বলব।

জল আনতে গিযে হাতকাটাব সঙ্গে '৮'-এব দেখা হয। অস্বস্তি কাটিযে ওবা কথা বলে।

—এটা কিন্তু একটা বিবাট ব্যাপার হল।

—ব্যাপাব বলে ব্যাপার। এই জল খেলে আব আমাদেব নীল দাগ হবে না। সবাই বাঁচতে পারব।

—উইন্ডচিটার কিন্তু যা বলে তাই হয।

—জল খুঁজে পাওয়াটা বলছ?

—শুধু তাই নয়' বলেছিল জলটা হাত দেডেকেব বেশি উঁচুতে দাঁড়াবে না।

দূরে, এবার বিস্ফোরণের শব্দ হয়। একটু হালকা, পবপব একসঙ্গে টানা শব্দ।

—মনে হচ্ছে মেশিনগানেব আওয়াজ।

—আমাবও তেমনই লাগল।

—কার সঙ্গে কার লড়াই চলছে বোঝার উপায নেই।

—কিন্তু দ্যাখো, লড়াই হলে পাল্টা আওয়াজও হত। ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।

এস. টি. ডি —আই. এস. ডি বুথের দরজাটা খুলে জিশা অবাক হল। কোনোদিনও সে কুমারকে ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেনি। কুমাব কানে লাগিয়ে কিছু শুনছে? জিশা ইশারায় জিজ্ঞেস করে। কুমার হাসে।

—এমনিই ভাবলাম কোনো শব্দ যদি শোনা যায়।

জিশা মেঝেতে বসে। কুমার আধখানা আধপোড়া সিগারেট বের করে।

—দূর ছাই! আগুন নেই। ধরানো যাবে না।

ফের আধপোড়া সিগারেটটা পকেটে রেখে দেয়। দূর থেকে একটা এরোপ্লেনের শব্দ কাছে আসে অথচ একেবারে ওপর দিয়ে নয়, খেলনানগরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

জিশা ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল ছড়িয়ে এরোপ্লেনের ডানা বানায়। মাঝের তিনটে আঙুল এরোপ্লেনের শরীব। এরোপ্লেনটা কুমারেব মুখের কাছে এসে একটু ছুঁয়ে ফের দূবে উড়ে যায়। ফিরে আবার ঘুরে আসে। আবার চলে যায়। কুমাব কিছু একটা ভাবছে। খুব মন দিয়ে ভাবছে। এরোপ্লেনটা ফের জিশার হাত হয়ে যায়। হাতেব জ্বলজ্বলে টানা ভাগ্যরেখা, আয়ুরেখা ও অন্যান্য রেখার মধ্যে নীল নীল দাগ।

তারপবের দিন কোনো বিস্ফোবণের শব্দ হয়নি। কুমার সকালে একবার এসেছিল। শব্দ নেই। ফের ঘুরে এসেছিল বেলায়। তখনও দবজা বন্ধ কিন্তু মনে হযেছিল ঘরের মধ্যে উইন্ডচিটাব কথা বলছে। দরজায় শব্দ কবেছিল কুমার।

—কে?

—আমি, কুমার।

—দাঁড়াও, খুলছি।

একটু সময় লাগে। উইন্ডচিটার প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে খুলে দেয। বোধহয শুযেই ছিল।

—আমি আব একবার এসেছিলাম।

—কখন?

—সকালে।

—আজ ঘুমটা কিছুতেই ভাঙতে চাচ্ছিল না। সিগাবেট খাবে?

সিগারেট জ্বালাবার সময় কুমার দেখে ভাঙা ট্র্যানজিস্টার বেডিও। জং ধরা ব্যাটারি।

—এখুনি একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম। এব আগে যে শহবটায ছিলাম সেখানে ফিবে গেছি।

—স্বপ্ন দেখতে দেখতে কথাও বলছিলে।

—তাই?

—শোন, তোমার সাইকেল বেডি।

—কোথায়?

—বলছি। লুকনো রয়েছে।

—কেউ দেখেনি তো?

—কেউ না।

—বলো।

—উত্তরমুখো যে সোজা সড়ক আছে সেটা দিয়ে কিছুটা এগোলে, তা বেশ কিছুটা হবে, বাঁদিকে একটা ভাঙা দেওয়াল পাবে।

—আসার সময়ে ডানদিকে পড়ে। দেওয়ালে একটা আড়াআড়ি শিক দেওয়া জানলা রয়েছে।

—ঠিক। ওই দেওয়ালটার ওপারে সাইকেলটা দাঁড় করানো আছে।

—চলবে তো?

—চলবে। আমি ট্রায়াল দিয়েছি। তবে চেনটা কমজোরি। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় বার বার পড়ে যাবে। আর প্যাডেল একটা নেই। ব্রেক নেই। বেলও নেই।

—তুমি কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না। সময়টা ভালো নয়। আমার মন বলছে খুব বিপদ আসছে।

—তাহলে আমাদেব কী হবে? আমার, জিশাব? আমাদের যাওয়ার? ফোনটা আমি দেখেছি। একেবারে ডেড। কতদিন কেউ জানে না। ওটা বাজবে কি কবে?

—আমি তো তোমাকে বলেছিলাম। দিন আব সময়টা বলব। বাকি কোনও কিছু নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আমি জিশাকে কিছু জানাইনি।

—জানাবে না। এর মধ্যে কাবও নজবে না পড়ে এইভাবে যা না হলেই নয় এরকম কিছু জিনিস গুছিয়ে বাখবে।

—তোমাব সঙ্গে আর যদি দেখা না করি তাহলে কি কবে জানতে পাবব যে কবে, কখন ফোন বাজবে?

—আমি এখনই বলে দিচ্ছি। তিন তাবিখ। থার্ড ডিসেম্বর। বিকেল পৌনে পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটার মধ্যে। তুমি জিশাকে নিয়ে বেডি থাকবে। আব আগেই তোমাকে বলেছি। তাব আগে অনেক কিছু ঘটবে। মাথা ঘামাবে না। আমি তোমাদেব নিয়ে যাবই। আমার কখনও কথাব খেলাপ হয় না।

—আমি তাহলে এখন যাই?

—যাও। শোনো, এই সিগারেট প্যাকেট আব লাইটারটা নিয়ে যাও। দিয়ে দিলাম।

—তোমার?

—আমার আব সিগারেট খাবাব দবকার নেই। অনেক খেয়েছি। কুমার চলে যাওয়াব পরে উইস্ডচিটাব দরজাটা বন্ধ করল। ঘরেব মেঝেতে বসে জং ধবা ব্যাটাবিগুলো ভাঙা ট্রানজিস্টার বেডিওতে লাগাল।

১ ডিসেম্বর খেলনানগবেব ঘুম ভেঙেছিল খুব নিচু দিয়ে জেট ফাইটাব উড়ে যাওযার বুক কাঁপানো শব্দে। যাবা গতবাতে কাফিড্রিল খেযে চুর হয়েছিল, তাদেরও ঘুম ভেঙে যায়। গতরাতে তিন বুড়িব সামনে গামলায-ভাসানো প্লাস্টিকের পুতুল ভাসতে ভাসতে ধাবে গিয়ে ঠেকেছিল যার অর্থ হল তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটতে যাচ্ছে না। জেট ফাইটারগুলো চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ কিন্তু কোনো শব্দ হয়নি।

বামন ঘুম থেকে উঠে ভেজানো দরজাটা খুলল। বাইরে বেরিয়ে পেচ্ছাপ কবল। তারপব ফিরে এসে কৌটো থেকে বরাদ্দ দুটো বিস্কুট বের করার সময় দেখল যে কৌটোর ওপরে খেলনানগরের খসড়া ম্যাপটা রাখা আছে। ম্যাপটা সে লুকিয়ে ফেলল।

'৮' আর '৯' দেখল পোস্টার লাগাবার আঠা আর নেই। তখন তারা ঠিক করল যে চত্বরে ওগুলো নুড়ি পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিয়ে আসবে।

—যা শব্দ কবে প্লেনটা গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

—দেওয়ালের ফটোগুলো দেখি নড়ছে। আমি ভাবলাম কী কাণ্ড। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

—ফের যুদ্ধ লাগবে? কী মনে হয়?

—এতে মনে হওয়ার কি আছে! লাগলেই হল। যুদ্ধ মানেই তো মুনাফা।

—সে যাই হোক। কারখানা খুলবেই। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ।

ওরা দুজনে ইউনিয়নের ঘর থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে চলছে। হাতে পোস্টার। নিঃশব্দে কখন যে উইস্ডচিটার পেছন থেকে এসেছে ওরা বুঝতে পারেনি। চমকে গিয়েছিল দুজনেই।

—দাঁড়াও। সময় নষ্ট করবে না। যা বলছি শোনো। কাল, দু তারিখ। রাত ১২টার পরে বার্বি পুতুলের তলায় আসবে। ঠিক তলায়। খোঁড়ার জিনিস জোগাড় হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ভালো। ওগুলোতে দরকার হলে কাপড় জড়িয়ে নেবে। শব্দ যত কম হয় ততই মঙ্গল। আর কেউ যদি এসে পড়ে তাহলে কী করবে?

—কী করব?

—জানে খতম করে দেবে। হত্যা কবায় আমরা বিশ্বাস কবি না কিন্তু কারখানা খোলার পথে কোনো বাধা আমরা সহ্য করব না।

—না।

—আমি চললাম। আর শোনো, যাই ঘটুক, বিচলিত হবে না। জয় আমাদের হবেই। কাল রাতে।

তিনজনেই ডান হাত ওপবে তুলে মুঠো করে।

সেদিন দুপুরেব পর থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডাটা কমে গিয়ে আকাশে মেঘলা দেখা দিল। গুমোটও হল। রাতে কযেকবার মেঘও ডেকেছিল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিতে ভিজে গেল বার্বি পুতুলের আধপোড়া চুল ও মরা, শুকনো শকুনেব শক্ত হয়ে যাওযা পালক। পবদিন সকালে উইন্ডচিটারের ঘরেব দবজায় দুম দুম কবে ধাক্কা মারাব শব্দ। বৃষ্টির শব্দও রযেছে। ঘুমচোখে উইন্ডচিটাব দরজা খুলে দেয়। বাইরে অনেকে। তার মধ্যে চেনা অচেনা অনেকে বযেছে। সকলেই ভিজে। উইন্ডচিটার শুধুই শার্ট পরা। হাতকাটা চিৎকার কবে ওঠে,

—সর্বনাশ হয়ে গেছে'

—কী? কী সর্বনাশ!

—এ জলের মধ্যে. কেউ বিষ মিশিয়েছে।

—মানে?

—পাহাড় থেকে আবর্জনা এনে জলের মধ্যে ফেলেছে। অনেক। ধারেও পড়ে আছে।

—তোমরা দেখেছ?

—আমরা সেখান থেকেই আসছি।

—দাঁড়াও, আমি উইন্ডচিটারটা পবে নিই। বৃষ্টি পড়ছে।

উইন্ডচিটার ওদের সঙ্গে এগোয়। ও আগে আগে যায়। হাঁটে না। প্রায় হোঁচট খেতে খেতে দৌড়োয়। একবার পা পিছলে পড়ে যায়। সাদামুখ ওকে হাত ধরে তোলে। ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়। দৌড়োয়। অন্যরাও দৌড়োয়। বামন আর বুড়ো দরজি দৌড়োতে পারে না। ওরা জোরে হাঁটতে চেষ্টা করে।

তিন পাথরের ফোকরে জল আর দেখার উপায় নেই। পোড়া রবার আর গলানো ধাতু মিলিয়ে নীলচে ছাই ছাই দলা পাকানো মণ্ডের মতো বিষাক্ত জিনিস তিন পাথরের মধ্যে অপরিসর ফোকরটা প্রায় ভরিয়ে ফেলেছে। পাথরের ওপরেও ছড়িয়ে আছে বিষ।

উইন্ডচিটার উপুড় হয়ে শুয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। একদলা তুলে ছুঁড়ে দেয়। আবার তোলে। ওপরে ছড়ানো বিষধোয়া জলও বিন্দু বিন্দু করে গড়িয়ে ফোকরের মধ্যে যাচ্ছে।

—একটা শিক নিয়ে এস। জলদি। লম্বা একটা শিক।

দুজন শিক আনতে যায়।

—এত লোকের পরিশ্রম। আমার সব চেষ্টা। সব কথা। সব নষ্ট করে দিল? আমিও দেখে

নেব। আমাব নাম উইন্ডচিটাব। ঠিক খুঁজে বেব কবব।

—কিন্তু একাজ কে কবতে পাবে?

—তুমি কবতে পাবো, ও কবতে পাবে, সে কবতে পাবে। কে এখন আমি জানি না। কিন্তু জানব। নির্ঘাৎ জানব। যাব মনে অত বিষ সে ধবা দেবেই। বিষেব জ্বালাতে নিজেই ধবা দেবে।

বিস্ফোবণেব শব্দ হয। বেশ জোবে। সকলেই বুঝতে পাবে এটা মেঘেব ডাক নয। শিক নিযে দৌড়ে আসে দুজন। ভিজে সপ সপ কবছে।

—শিক দিযে খুঁচিযে দেখ। যদি ফাটলেব ভেতবে ঢুকে যায কিছু কবাব নেই।

—কী হবে এখন?

—জানি না কী হবে? হাত ঢুকিযে ঢুকিযে সব বিষ বেব কবতে হবে। এখন এ জল নদীব জলেও চেযেও বিষাক্ত। কাটতে অনেক সময নেবে।

তাবপব?

—আমি আব জানি না। জানাব ইচ্ছেও আমাব নেই। আবাব কেউ এসে বিষ মিশিযে দেবে না কেউ বলতে পাবে? এই তো, হাত দিযে তুললাম বলে জ্বালা কবছে।

উইন্ডচিটাব হাত বৃষ্টিব জলে ধুতে চেষ্টা কবে।

—এখন আমবা কি কবব?

—পাববে যা কবলে কাজ হবে কবতে? যাও। গিযে খবব নাও কাল বাতে কে ঘুমোযনি। কে বেবিযেছিল। কে এই আবর্জনাব পাহাড়ে গিযে বৃষ্টিব মধ্যে পিঠে কবে বিষ নিযে এসেছে। খবব নাও যদি পাবো। যদি ধবতে পাবো তাকে নিযে যা ইচ্ছে তাই কবতে পাবো তোমবা। আমাকে জানাবাব দবকাব নেই। আমি চললাম।

উইন্ডচিটাব বৃষ্টিব মধ্যে চলে যায। সাদামুখ, হাতকাটা, '৮', '৯', বামন, বুড়ো দবজি, অন্যবা—সকলে নিজেদেব দেখে। চাহনিগুলো পালটে যাচ্ছে। বিস্ফোবণেব শব্দ হয। সবাই উত্তবেব দিকে তাকায। বৃষ্টি বাড়তে থাকে। মেঘেব ডাক ও বিস্ফোবণেব শব্দ জড়িযে যায। ফোকবেব মধ্যে বৃষ্টিব জল জমা হয। বিষধোযা জল নিচেব বিষাক্ত জলেব সঙ্গে মিশে এক হযে যায। বৃষ্টি আবও বাড়ে।

বামনই একবাব সন্ধেব মুখে উইন্ডচিটাবেব ঘবে গিযেছিল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বামনেব একটা ছাতা ছিল। ঘবে আলো নেই।

—কে?

—আমি।

—ম্যাপটা পেযেছি। তোমাব কি কাজ হযেছে?

—কী কাজ?

—সোনা খোঁজাব কাজ?

—জলেব ব্যাপাবটাব পব সত্যি বলতে কিছুই আমাব মাথায নেই। মাথা কাজই কবছে না।

—আমি বলি কি ওই সোনাব বিস্কুট খুঁজে ববং লাভ নেই। আব ওব ভাগ নিযে আমাবই বা কী হবে? পেলে তুমিই সবটা নিতে পাব?

—তুমি কি মনে কব সোনাব আমাব খুব দবকাব?

—তা বলছি না। তুমি এখনও কত জাযগায ঘুববে। কত দেখবে শুনবে। ওই সোনা হযত তোমাব কাজে লাগবে।

—এর আগেও আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। অনেক কিছু দেখেছি। তার জন্যে সোনার দবকাব হয়নি। তুমি বরং এখন যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বামন চলে যাওয়ার পরে উইন্ডচিটার অন্ধকারেই হ্যাভারসাক গুছিয়েছিল। পকেটে একটা ওষুধের শিশি রেখেছিল। বৃষ্টি একটু ধরেছে।

'৯' ইউনিয়ন ঘরের দরজার সামনে বসে বিদ্যুতের আলোয় ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পাঁচ। '৮' লেনিনেব ছবির তলায় মাথা ঠেকিয়ে চুপ কবেছিল। '৯' কাঁধে হাত রাখল।

—কমরেড! সময় হয়েছে।

—চলো।

'৯' দুটো কাপড়ে জড়ানো মাটি খোঁড়াব জিনিস নিয়ে নেয়। একটা খুর্পি। একটা মোটা লোহার পাত। ছোট শাবল ওরা পায়নি। দুজনেই খালি পাযে। প্যান্ট গোটানো। গায়েব জামার বোতাম খোলা। পেটেব কাছে গিঁট দিযে বাঁধা।

অন্ধকারেই মিশে উইন্ডচিটার দাঁড়িয়েছিল। ওবা প্রথমে দেখতে পায়নি। উইন্ডচিটার এগিযে আসাতে দেখতে পেল।

—তোমাদের সুবিধের জন্যে জায়গাটা আগে চিনিয়ে দিই। আমাকে একটা হাতিযাব দাও। দাগ দেব।

—নাও। তোমার কী মনে হয় জলে বিষ মিশিযেছে কে?

—তোমরা যাকে ভাবছ আমিও তারই কথা ভাবছি। কিন্তু একহাতে ও এতটা পাববে?

—বিস্তর জোর আছে ওব ওই হাতে। আমবা জানি।

—এই জায়গাটা। আস্তে আস্তে খুঁড়বে। শব্দ কববে কম। ঠাণ্ডায় '৮' আব '৯'-এব দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

—এই ট্যাবলেট দুটো দুজনে মুখে রাখো। ঠাণ্ডাটা কম লাগবে। আমিও একটা নিই। শীত করছে। তোমরা শুরু করো। আমি চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

'৮' আর '৯' কাজ শুরু করে। বৃষ্টিটা অল্প বাড়ে। চত্বরটা শান বাঁধানো হলেও সেটা স্ল্যাব ফেলে ফেলে করা। স্ল্যাবগুলো বেশ বড়।

—এই ফাঁক বরাবর গভীর করতে পারলে চাড় দিয়ে স্ল্যাবটা তোলা যাবে।

—চাড় দিলে স্ল্যাবটা ভেঙেও যেতে পাবে।

—ভাঙুক। তলায় তো মাটি।

ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুই স্ল্যাবের মধ্যে ফাঁকটা চওড়া করে।

চাড় দেয়। স্ল্যাবটা অল্প কিছুটা ভেঙে যায়। টুকরো ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয়। আবার চাড় দেয়। এবার আরও বেশি ভাঙে। তলায় মাটি। বৃষ্টিটা বাড়ে। দুজনেই অঝোরে ভেজে।

—ভালো দেখা যাচ্ছে না। উইন্ডচিটার আসছে না কেন বল তো?

—বলল তো, চারদিকটা দেখে আসছে।

—ঘুম পাচ্ছে নাতো তোমার?

—না। তোমার?

—আমারও পাচ্ছে না।

স্ল্যাবেব আধখানা ভেঙে উঠে আসে। এপাশটায় মাটির বদলে খোয়াপাথরের গাঁথনিও আছে। কাজটা একটু বাড়ে।

—মাথা ঝিমঝিম করছে না তোমার?

—না। তোমার?

—আমারও না।

উইন্ডচিটাব আসে। পকেট থেকে সুতোয় বাঁধা পাথবটা বেব কবে ঝোলায। ফের পকেটে বাখে।

—ঠিক আছে। এখানেই রয়েছে। হাত দুযেক খুঁড়লেই পাওযা যাবে। বাক্সটা লোহার হতে পারে। সাবধানে। বেশি শব্দ না হয়।

—বাক্সটা কী কবব আমবা।

—আমাদেব ঘবে নিযে যাবে। কিছু চাপা দিযে লুকিযে রাখবে।

—তোমাব ঘবে?

—না, না, তোমাদেব ঘরে। এখন আর থেম না। খুঁড়ে যাও। দাঁড়াও, কিছুটা মাটি আমি সরিযে দিই।

—কেউ নেই তো!

—কোথাও কেউ নেই। আর তা ছাড়া আমি তো নজব বাখছি' ওবা খোঁড়ে আব পাশে মাটি তুলে রাখে। হঠাৎ একটা শব্দ হয। একটা পাথর। ওবা সরিয়ে পাশে বাখে। হাতখানেক খোঁড়া হয়ে গেছে।

—এক মিনিট জিবিযে নেব।

—আমিও।

—ঘুম পাচ্ছে না তো তোমাব?

—না। তোমাব?

—আমাবও না।

বৃষ্টি জোরে হয়। গর্তটা বেশ চওড়া হয়েছে। আবও কিছুটা খুঁড়তে হবে। তাবপর দুজনে মিলে বাক্সটা নিয়ে যেতে হবে। কতটা ভাবী হবে বাক্সটা! ওই বাক্সটা দিয়েই কারখানা খুলবে।

উইন্ডচিটার এসে দেখল দুজনেই ঘুমিয়ে রযেছে। হাতে লোহাব পাত আব খুরপি আলগা হয়ে গেছে। উইন্ডচিটার পকেট থেকে চকচকে একটা গোল ধাতব মুদ্রা বের করে। গর্ততে ফেলে দেয়। হাঁটতে থাকে। ঘবের সামনেই হ্যাভাবস্যাকটা রাখা ছিল। নিয়ে নেয।

পরদিন অনেক বেলায়, দুপুর গড়াবাব মুখে '৮' আর '৯'-এর যখন ঘুম ভেঙেছিল তাব আগেই ওরা হালকা আধো ঘুম আধো স্বপ্নের মধ্যে এত লোকের একসঙ্গে কথা বলার শব্দ পাচ্ছিল যে মনেই হতে পারে যে কারখানা খুলছে ও তাই নিয়ে সকলে আলোচনা করছে। ঘুম ভাঙতে তারা দেখল অবশ লাগছে। হাত ও পা বাঁধা। ঘুমের মধ্যেই কারা তাদের জামা, প্যান্ট সব খুলে নিয়েছে। হাতকাটা, বরকন্দাজ, ঘেয়ো দাগী, এরা তো আছেই। আরও অনেক লোক। সকলের হাতেই কিছু না কিছু। ছুবি, রড, শাবল এমনকি গতরাতে যে দুটো জিনিস ওদের হাতিয়ার ছিল সেই খুরপি ও পাতটাও ওদের হাতে।

—কি রে। শুয়োরের বাচ্চা! এবাব কোন উইন্ডচিটারের বাপ তোদের বাঁচাবে? হব্বা.. হব্বা... হব্বা ..

'৮' আর '৯' কিছু বুঝতে পারে না। হাতকাটা ও অন্য সকলেব মুখে কাফিড্রিলের ঝাঁঝালো গন্ধ।

—সব সোনা নিয়ে উইন্ডচিটার ভেগেছে আর তোদের জন্যে এইটা রেখে গেছে।

হাতকাটা একটা চকচকে স্বর্ণমুদ্রা দেখায়।

—এইটা সঙ্গে দিয়ে তোদের জ্যান্ত কবর দেব। হুব্বা... হুব্বা...

—আমরা কিছু জানি না। উইন্ডচিটারকে ডাকো। আমরা কাবখানা খোলার জন্যে সোনা খুঁজছিলাম।

—মাজাকির আর জায়গা নেই। কারখানা মারাচ্ছে। সোনা তোরাই খুঁড়ে দিয়েছিস উইন্ডচিটারকে।

—উইন্ডচিটারকে ডাকো না একবার। ও জানে।

—হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

কুমার চোখ বন্ধ করে। কারণ, হাতবাঁধা '৯' কে ছুরি খেতে দেখে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই '৮' চিৎকার করে ওঠে

—ইনকেলাব...

—হুব্বা... হুব্বা . হুব্বা. .

তার মাথায় রড পড়ে ও জনতা উল্লসিত হয়ে ওঠে। ছুরিটা অল্প ঢুকিয়ে বের করে দেয় হাতকাটা। ভিড়ের পেছন থেকে বামন চলে যায়। তার গা গুলোয়। '৮' মাথা উঁচু কবে দেখে যে দুজনের হাতে তাদেরই দুটো পোস্টার। উলটো ধরা। তাতে লেখা '৮' ও '৯'।

হুব্বা... হুব্বা . হুব্বা .. হুব্বা .

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে অনেকক্ষণ ধবে ওদের মারা যায়। কখন যে ওবা মবে গিযেছে সেটা বোঝাও যায়নি। মরার পরেও কেউ কেউ মারছিল নিশ্চয়ই। এবপর বিকেল হতে না হতে ওদের বার্বি পুতুলের তলাব তেপায়া কাঠামোয শকুনেব পাশাপাশি পা বেঁধে ঝুলিযে দেওয়ার তোড়জোড় চলে।

বামন ওর ঘরে ওব যা কিছু আছে তালিমারা ক্যাম্বিসের ব্যাগে গুছিযে হাঁপিযে গিয়ে চেয়ারে বসে ছিল। কুমার জিশাকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে। জিশা কখনও ডুকরে, কখনও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল আর কুমার তাকে আদর.করার ফাঁকে ফাঁকে ফোনটার দিকে তাকাচ্ছিল।

শদেড়েক লোক চত্বরে দাঁড়িয়ে যা আয়েস করে বসে দেখল উলঙ্গ অবস্থায় '৮' ও '৯' কে ওপর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তলায চলছিল হাতকাটার দলেব নাচ ও কাফিড্রিল খাওয়া।

হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

অনেক ওপরে একটা এরোপ্লেনের শব্দ। অনেক, অনেক ওপরে ছোট্ট প্লেনটা দেখা যায়। তার থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসে। প্যারাসুট খুলে যায়। দুলতে দুলতে নামছে। প্লেনটা চলে যাচ্ছে। নামছে ধীরে। অনেক সময় ধরে।

বার্বি পুতুলের অনেক ওপরে, ঝুলন্ত '৮', '৯' ও শকুনের অনেক ওপরে, খেলনানগরের ওপরে প্যারাসুটটা ধীরে ধীরে নিচে যেখানে মানুষ থাকে সেই জায়গাটায় বাঁধা জিনিসটার ভারে নামার সময় একটা তীব্র ঝিলিক ও তুমুল একটা শব্দ... আকাশ একটা ঝুলন্ত বিস্ফোরণ... তার হাল্কা ও স্বল্পস্থায়ী ঝড় তোলা শব্দ...

এর পর মর্ত্যশরীর।

অশরীর

আমি উইন্ডচিটার। উইন্ডচিটার আমার নাম নয়। আমাকে চিটাব বলা যেতে পারে। কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি কেউ বলতে পারে না। প্রথম কথাটাই হল সত্যি বলে কিছু নেই। গালফ যুদ্ধের সময়ে আমার সামরিক সংবাদদাতা হিসেবে হাতে খড়ি। সারা দুনিয়া জানত যে সাদ্দাম ইরাকেব মরুভূমিতে দুর্ধর্ষ সৈন্য ও দুরন্ত সব কামান সাজিয়ে বেখেছে। এমন পরিখা রয়েছে যা দুর্ভেদ্য। এইসঙ্গে বয়েছে বাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র। এসব কথা বানানো। যা হযেছিল তা হল একতরফা এক গণমেধ, যেখানে ট্যাঙ্কের সঙ্গে বা বুলডোজাবের সঙ্গে যান্ত্রিক লাঙল লাগিয়ে ১০০,০০০ মানুষকে বালির মধ্যে পিষে মারা হয়। এই পদ্ধতি এর আগে বিশ্বের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কতজন জানে এই কথা? এখনও কতজন? অথচ সেই যুদ্ধ নাকি টিভিতে দেখানো হযেছিল। হয়েছিল?

খেলনানগরে আমাদেব ছিল একটা টপ সিক্রেট সামরিক তৎপবতা যাব নাম 'অপারেশন ভালচার'। রিমোট সেন্সিং-এর যন্ত্র বসানো শকুন তখন অনেক ওরকম বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হ্যামলেটে পাঠানো হয়। দেখা হয সেখানকার মানুষ কী মানুষ বযেছে, না অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে যাদেব খরচ কবে ফেলা যায়? এবকম অনেক জায়গাই ছিল এবং আমাব মতো অনেক উইন্ডচিটাবই সেখানে গিয়েছিল।

সংক্ষেপে বললে আমাব কাজ ছিল মাইক্রোলেভেলে সবটার ব্যবস্থা কবা এবং বিনা ঝামেলায, চোখেব আড়ালে, কাউকে না জানিয়ে কী কবে কাজটা সফল করা যায় সেটা সুনিশ্চিত কবা। এব আগে ফিশন ও ফিউশন অস্ত্র আমবা তৈবি করেছি, এব আঘাত যেমন খেয়েছি তেমন এব আঘাতও হেনেছি। খেলনানগবে আমবা পবীক্ষা কবেছি নিউট্রন বোমা যাব বিশেষ পাবদর্শিতাব জন্যে কেউ কেউ একে 'ক্যাপিটালিস্ট বম্ব'-ও বলে থাকে। খেলনানগবের ওপরেই আমাদেব নিউট্রন বোমার প্রথম পরীক্ষা হয ও সেই পবীক্ষা সম্পূর্ণ সফল। 'এনহানস্ড্ রেডিযেশন ওযাবহেড' বলে অভিহিত এই অস্ত্র নিউট্রন ফিশনেব ওপরে নির্ভবশীল। এব বিস্ফোরণেব ফলে যে তাপ ও ঝটিকাঘাতেব সৃষ্টি হয তা তুলনামূলকভাবে ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ওই জায়গাটুকুর মধ্যে নিউট্রন ও গামা তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপক তরঙ্গ ওঠে যা বর্ম বা পুরু আস্তরণ অক্লেশে ভেদ করে ও যে কোনো জীবন্ত কোষকে নিমেষে ধ্বংস করে। সম্পদ বা অন্য কিছু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। স্বল্প পবিসবের মধ্যে এব ধ্বংসক্ষমতা পর্যাপ্ত এবং এব রেশ দীর্ঘমেয়াদি নয়। তাই ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে বণকৌশলগত অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার খুবই কার্যকর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবং এই অস্ত্র যেখানে ব্যবহৃত হবে তার কয়েক মাইল দূরে যদি জনবসতি থাকে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা খেলনানগরের ওপরে বিমান থেকে নিউট্রন বোমা ফেলেছি। কিন্তু ল্যান্স ক্ষেপণাস্ত্র বা ৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০ সেন্টিমিটার হাউইটজার কামানের সাহায্যেও নিউট্রন বোমা ছোঁড়া যায়।

আমাদের একটা ভয় ছিল। সেটা হল খেলনানগবের ওপরে আমাদের এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি সফল না হয় তাহলে বা কেউ বেঁচে এখান থেকে পালাতে পারলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। এই কাজে সবচেয়ে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারত '৮' ও '৯'— ওদের রোখ এতই জোরদার যে ওদের মতো মানুষকে নিয়ে কোনো পরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। তাই ওদের সম্বন্ধে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ওখানে পাথরের গঠন দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে জল পাওয়া যেতে পারে। তার

জন্যে দুবে, এমনকি আবর্জনা পাহাড়ের কাছেও যে পাথরের আউটক্রপ বযেছে সেগুলো আমাব দেখার প্রয়োজন ছিল। ওখানকার কোনো বড় পাথরই বোল্ডার বা বিচ্ছিন্ন পাথরের খণ্ড নয়। চিটারদের অনেক কিছুই জানতে হয়। এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে আপাতভাবে দেখলে যা মনে হয় সেই ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিও ও জং ধরা ব্যাটারি আসলে অন্য কিছু। আমার বলা কথা যে ট্রানজিস্টর রেডিও শোনে সেটা অবশ্য আমি রাখঢাক না করে বলেই দিয়েছিলাম। এরকম অনেক কিছুই আমি বলেছি যার মধ্যে অনেক মানে ছিল। কেউ যদি বুঝতে না পারে তাহলে কিছু করার নেই। জলে বিষ মিশিয়েছিলাম আমিই। আমারই পাঠানো বার্তা পেয়ে উত্তরদিকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে খেলনানগর থেকে কেউ না পালায়। সোনার বিস্কুট আমার কাছে ছিল না। একটি স্বর্ণমুদ্রা আমি খবচ করেছিলাম যদিও চত্বরে পড়ে থাকা হাতকাটার লাশেব হাতে ওঠা ছিল। ওঠা আর আমি নিইনি। যদিও নিতে পাবতাম।

খেলনানগরের কথা আর কেউ জানতে পারবে না। জানার কোনো উপাযই নেই। সমস্ত লাশ এনে বার্বি পুতুলের সামনের চত্বরে ডাঁই কবে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওযা হয়। আমি কথা দিযেছিলাম কুমারকে যে জিশা ও ওকে আমি নিয়ে যাব। আমি কথা রেখেছি। মেল ও ফিমেল বডিতে চড়া নিউট্রন ও গামা রেডিয়েশন কী ঘটায় তা ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে জানার জন্যে ওদের দুজনকে প্লাস্টিকের জিপ ফাসনাব টানা বস্তায় হেলিকপ্টাবে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

কাঙাল মালসাট

১

কাতাব দিয়ে কাটা মুণ্ডু আদি গঙ্গার পাড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। অর্থাৎ রাতে ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। বস্তা কবে মুণ্ডুগুলো ডাঁই করে রেখে সটকেছে? ধড়গুলোর তাহলে কী হল? কুপিয়ে কাটা না পোঁচ দিযে দিয়ে? মুণ্ডুগুলো কি ব্যাটাছেলেব না ফিমেল? এবকমই ছিল একটি ভাষ্য। অপরটি হল সাইক্লোনজনিত ঘোলাটে আকাশেব তলায় খলবলিযে মাথার খুলি নাচছে। আগে অনেকগুলো নাচছিল। কিন্তু যেই পুলিশ এল অমনি বাকিগুলো ভ্যানিশ হয়ে মাত্র তিনটে রইল। আব পুলিশ যখন ভাবছে পা বাড়াবে কি বাড়াবে না, নতুন কোনো কেচ্ছায জড়িয়ে পডার মন্দ ভালো সাত-পাঁচ ঠিক সেই সময় ঐ তিনটে খুলিও মুচকি হেসে উদ্বেল জোয়ারে লোপাট হযে গেল। পাবলিক এই সূত্র ধরে উবু হয়ে বসেছিল কিন্তু সন্ধেবেলায় বেসবকারি একটি বাংলা চ্যানেলেব সংবাদে দেখা গেল লম্বামুখো এক পুলিশ অফিসাব বলছে যে ঐ খুলিগুলো শিরিটির শ্মশান থেকে এসেছিল। এক জোযাবে এসেছিল, পবেব জোয়াবে আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। পুলিশেরই অন্য একটি মহলেব মতে তথাকথিত ঐ 'ড্যান্সিং স্কালস্' শিরিটিব মাল নয়, ক্যাওড়াতলাব। জোযারের টানে পলিব্যাগ, হাওযাই চটি, কলাব খোলা, ফুল ইত্যাদি ইন্যানিমেট অবজেক্টের সঙ্গে ডাউন সাউথ মহাবীবতলা চলে গিয়েছিল।

মনে হয় এই বিচিত্র ও বিশিষ্ট ঘটনাটি সম্বন্ধে পাবলিক বা পুলিশ যাই ভাবুক না কেন আমাদেব উচিৎ হবে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানই গ্রহণ করা বা যে কোনো অবস্থানই পরিহার করে চলা। ঘটনাটি ঘটেছিল ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯—শুধু তারিখটা মনে রাখতে হবে। আগে থেকে সব জেনে যাবা ঘটনা এলে সেই পরিচিত হাসিটি হাসে তাদেব গেঁড়ে মদনা না বলার কোনো কাবণ আছে কি? অগণিত কবোটি শোভিত এই শতাব্দীব শেষ লগ্নে কী ভেবেছিলেন আপনারা? বুলবুলিপাখি ডিগবাজি খাবে? পাড়ায পাড়ায় নহবৎ বসবে? সাধনার যে স্তরে ইলবিলা ইড়বিড়া ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যেব আভা দেখা যায় বাঙালি তার ধারে কাছেও নেই। অতএব কেঁদে ককিযে লাভ তো হবেই না, উপরন্তু বিপদ বাড়বে। জাতির এরকমই এক মহাসংকট কালে শ্রী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯৭০) হিন্দি ভাষায় একটি গান লিখেছিলেন, যেটি ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস সম্মেলনে সগৌরবে গাওয়া হয়েছিল।

ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল।
খাক মিট্টি জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল।

হিন্দি গান শুনলেই সকলেই ভাবে সিনেমার গান। এ গান সে গান নয়। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে আরও জানিয়েছেন। 'স্বদেশী সভায় তিনি একটি নূতনত্বের আমদানি করেন ; উহা—সভার সূচনায় ও শেষে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতের আয়োজন। নিজে সুগায়ক না হইলেও সঙ্গীত রচনায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশী সভায় যোগদানকালে তিনি দুইজন বেতনভোগী সুকণ্ঠ গায়ককে সঙ্গে রাখিতেন...'। ঠিক এরকম না হলেও কাছাকাছি কোনো সুরে মন বেঁধে আমাদের করোটি নৃত্যের ব্যাপারটি ভাবতে হবে। তবে যদি কিছু হয়। আপাতত এটুকুই আয়ত্তে থাকলে যথেষ্ট যে খুলি-ড্যান্সের অনুষ্ঠানটি আরও

বড়, অভাবনীয় রকমের বড় এক প্রকাণ্ডকাণ্ডের ইঙ্গিত।

এই বার আমরা অবলীলায় চার দিন পেছিয়ে যেয়ে ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯-এর আনন্দবাজার পত্রিকাব রবিবাসরীয় চতুর্থ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১২ নং পাতাব নিম্নার্ধে মনোনিবেশ করব। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, এরকম আমরা অবশপাঠক হিসেবে করেই থাকি যেহেতু এইটুকু বুদ্ধি আমাদের হয়েছে যে পিছিয়ে পড়ার চাইতে পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়াও ভাল। কর্মখালিব পাঁচটি কলামের মধ্যে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টিতে একটি বিজ্ঞাপন বয়েছে যার বয়ান,

দেশ বিদেশ ভ্রমণ

২৭ বৎসর সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর আনন্দ-র সাংস্কৃতিক দলের জন্য আকর্ষক সুন্দর তরুণ, তরুণী, কী বোর্ড প্লেয়ার, ড্রামার, বেঁটেমানুষ, অনুভবি ছুতোব মিস্ত্রি লাইসেন্সড পারসন, ম্যানেজার এবং ইলেকট্রিসিয়ান চাই। আকর্ষণীয় বেতন, শিক্ষা, আসা-যাওয়া, খাওয়া-থাকা, মেডিক্যাল সুবিধা। তিনদিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। সময় : সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ঠিকানা : যাদুঘর আনন্দ, C/o ম্যাজেস্টিক হোটেল, রুম নং ২০৭, ৪সি ম্যাডান স্ট্রিট, কলি-৭২ (নিউ সিনেমার পাশে)।

প্রথমেই আমরা এই ভেবে সচকিত হই যে, ভোজবাজির চেয়েও রহস্যমণ্ডিত এই কাকতালীয় কাণ্ড। ২৪ তারিখের পর থেকে যোগাযোগেব তিনদিন ধরলে ২৫, ২৬ ও ২৭ গেল—চতুর্থ দিবসেই খুলির নৃত্যানুষ্ঠান! ম্যাজিকের কি এই তবে শুরু? আমবা জানি যে, পুলিশ আমাদেব আবেদনে কর্ণপাত করবে না ; কিন্তু ব্যাপাবটি কি যথেষ্ট রহস্যঘন নয়? এ বিষয়ে পুলিশেব চেয়ে রসবেত্তা আর কে হতে পারে? এরপরেই সন্দিগ্ধ মনে যে ফ্যাকড়া ক্রমেই আস্তানা গাড়ে তা হল নামের এই মিল অর্থাৎ যাদুকব আনন্দ ও আনন্দবাজার পত্রিকা—আনন্দেব ভেতবে আনন্দ—একি নিছকই ভবেশ্বরের খেলা না পিশাচসিদ্ধ হেঁয়ালি না ঘোমটাপরা ঐ ছায়ার মায়াময় হাতছানি? তবে আমাদের মনের এই ফ্যাকড়াকে কেউ যেন আনন্দবাজার পত্রিকার মতো সুমহান প্রতিষ্ঠানের পেছনে কাঠি করা অপচেষ্টা বলে না ভাবেন। দুইহাতে সংবাদ ও সাহিত্যের মন্দিরা যে প্রতিষ্ঠান নিয়তই বাজিয়ে চলেছে তার পোঙায় লাগতে যাওয়া মোটেই ফলপ্রসূ হতে পাবে না। উল্টে হুলো হয়ে যেতে পারে।

এই হুলো কী বস্তু তার একটি টিপিকাল কেস হল মিঃ বি. কে. দাস-এর জীবন। ঘটনাটি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে কোনোমতেই জড়িত নয়। মিঃ দাস ইংরেজি ভাষায় স্বল্প দৈর্ঘ্যেব উপন্যাস লিখতেন। মাত্র দুটিই তিনি লিখেছিলেন— 'দ্যা মিসচিভাস ইংলিশম্যান' এবং 'অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ অ্যালিগেটরস।' তখন কলকাতার নামী ইংরেজি দৈনিক ছিল 'দ্যা ডেইলি প্লেজার' —সেখানে গ্রন্থ সমালোচনার পাতা দেখতেন মিঃ প্যান্টো এবং ঐ পাতাতেই 'লিটেরারি স্নিপেট্স' লিখতেন মিঃ পি.বি.। মিঃ বি.কে. দাস বার বার তাঁর নিজের খরচে বার করা দুখানি চটি নভেল নিয়ে উপরোক্ত পত্রিকার দরজায় কড়া নেড়েছেন তা গোনা যায় না। রিসেপশনে একটা গুঁফো গুণ্ডা বসত। তার নাম মিঃ শান্টু। এর নামে মার্ডার কেস ছিল বলেও জনশ্রুতি ছিল। এর কাজ ছিল লোক তাড়ানো। মিঃ বি. কে. দাস চার চারবার মিঃ শান্টু-র কাছে মিঃ প্যান্টো ও মিঃ পি.বি.-র জন্য দুখানি করে বই রেখে এসেছিলেন। প্রতিবারই নক্সাদার বিলেতি মার্বেল কাগজের মোড়কে লাল রিবনে বাঁধা অবস্থায়। মোট আট প্যাকেট 'দ্যা মিসচিভাস ইংলিশম্যান' ও 'অ্যান আফেয়ার উইথ অ্যালিগেটরস' জলে গেল। কী হয়েছিল জানা যায়নি।

অনুমান করা যায় যে মিঃ প্যান্টো ও মিঃ পি.বি ঐ দুটি উপন্যাস ফেলে দিয়েছিলেন। অথবা ফেলে দেবেনই এরকম অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা থেকে মিঃ শান্টু রিভিউ সেকশনে বইগুলো পাঠায়নি। এবং মার্বেল পেপারেব মোড়ক দিয়ে নিজের সংগ্রহেব পর্নোগ্রাফির ফটো বইগুলোব মলাট দিয়েছিল এবং বইগুলি ওজনে ঝেড়ে দিযেছিল—এমন হতেই বা বাধা কোথায়? কিন্তু মিঃ বি. কে. দাস ফঙ্গবেনে ধাঁচেব ছিলেন না, যেমন মোটা ঘাড় তেমন ছিল তাঁর নলেজ ও রোখ। তিনি লেখা ছেড়ে দিয়ে আসামের জঙ্গলে ময়াল সাপের ভয়াল জগতে পাড়ি দিলেন—ময়ালের বাচ্চা ধরে এনে নানা চিড়িযাখানায সাপ্লাই দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। এবং এই কাজ করতে কবতেই তিনি ফৌৎ হন। ভালুকের ছানা টুপিতে ভবে আনবাব সময় সহসা, দুর্ভাগ্যবশত, সেই ছানাটিব অভিভাবকরা এসে পড়েছিল। ভালুক শাবক সম্পর্কিত এই নির্মম অথচ যুক্তিসঙ্গত ঘটনাটি ঘটার মাত্র সাত দিন আগে কটকে পোযেট-ফ্রেন্ড জি এস. রায় কে-তিনি বাংলায একটি চিঠি লিখেছিলেন। যা পবে উইতে খেয়ে নেয়। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'মিঃ প্যান্টো-র প্যান্টোমাইম আর টলারেট করা যায না। বিভিউ যদি নাও হয় 'লিটেরারি স্লিপেটস্'-এ একবাব মেনশন হইতে পাবিত। এই পি বি-টি কে? আমি বাংলা ভালো জানি না কিন্তু এটাব নাম পরার্থলোভী বকবাক্কস বা পাযুকামী বোম্বেটে দিয়াই স্যাটিসফাযেড থাকিলাম। ভাবনা করিয়াছি কযেকখানি পাইথন লইয়া উহাদেব গাযে দিব। বেষ্টন কবিয়া ভক্ষণ কবিবে।'

আজকাল কেন বহুদিনই স্বল্প দৈর্ঘ্যেব উপন্যাস নিযে ভাবনাচিন্তা চলে আসছে। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত শ্রী সুরেশচন্দ্রব চক্রবর্তী 'কাশ্মীবে বাঙালি যুবক' একটি উদাহরণ। তবে লেখক এ ঘাটে বেশিদিন জল খাননি। 'অল্প বয়সে একবাব কেবল ইংরাজী শিলিং উপন্যাসেব অনুকবণে, কতগুলি ছোট উপন্যাস বাঙ্গালায লিখিবাব ইচ্ছা হইয়াছিল।' উপন্যাসটি মোটের উপর কেউ কেউ ভালো বললেও লেখকেব ভাষায় 'ঐরূপ বই লিখিয়া কিংবা পড়িয়া, কেহ কি এখনকার দিনে সময় নষ্ট কবিতে ইচ্ছা করে?' শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব 'বলিলেন বইখানি তাঁর এবং তাঁব স্ত্রীব ভাল লাগিয়াছে, তবে তাঁর কাকা পড়িযা কিছু বলেন নাই।' এই কাকাটি রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক মিঃ বি. কে. দাস-এব মতো একেবারেই স্বতন্ত্র্যও অভিনব। 'এখনকার পাঠক খচ্চর ও তালেবর হয়ে উঠেছে। এদের জন্যে নো বাইটাব গুড ওয়েস্ট হিজ টাইম। কেহবা বলে পাঠকেব সময কম। মাই ফুট। আমি বলি লেখকেব সময় কম।' তত্ত্ব হিসেবে এটি কতটা ভারালো সে না হয় বিজ্ঞজনেরা বুঝবেন। আমরা জানলাম যে লিটেবাবি এসটাব্লিশমেন্ট লেখককে কী কবতে পারে। আজ যদি কোনো লেখক আনন্দবাজাবকে খচায় তার কী দশা হবে ভেবে আতঙ্কিত হওয়া যাক।

আজকাল বাঙালি জীবনে বিশিষ্ট বাঙালিদেব জীবনী পড়ার বেওযাজ প্রায নেই। যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে সেই গুণবান পাঠক যেন ঔপন্যাসিক মিঃ বি.কে দাস-কে বৈমানিক বিনয়কুমার দাস (১৮৯১-১৯৩৫)-এব সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন। বৈমানিক মিঃ বি.কে. দাস-এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'ব্যাটরা ইঞ্জিনিযারিং ওযার্কস' নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৫ সালের ২৮ এপ্রিল বেলা ১০টা। ভাবলেই গায় কাঁটা গজায়। দমদমা খপোত ঘাঁটির নিকটস্থ গৌরীপুর গ্রামের আকাশ। বিনাশক শক্তিব এমনই গোঁ যে বি কে. দাস-এব বিমান ও ডি.কে. রায়ের বিমানে ধাক্কা লেগে গেল। তখন এখনকাব মতো উন্মত্ত বিমান আনাগোনা হত না। আকাশও সস্তা ছিল। পাওয়াও যেত প্রচুর। বাঙালি অবশ্য অচিবেই সেই শোক কাটিয়ে ওঠে। তার জিনগত অভ্যাসই হল আলুথালু হযে হাঁউমাঁউ করা পরক্ষণেই পাল্টি খেয়ে দাঁত ক্যালানো। এই প্যাটার্ন অ-বাঙালি অর্থাৎ নাগা, রুশ, জার্মান বা হাবসি ইত্যাদিব মধ্যে দেখা যায় না।

এখান থেকে লেনিনীয় নির্দেশে এক পা আগে-র পবে যদি দুই পা পিছোনো যায় তাহলে সেই আনন্দবাজার প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এমনই হওয়া বরং শ্রেয যে আনন্দবাজার পত্রিকা ও ম্যাজিসিয়ান মিঃ আনন্দ আলাদা, দুইয়েরই কক্ষপথ ভিন্ন, ডি. এন এ ইত্যাদি দুরূহ ছকে গঙ্গা গঙ্গা ফাঁক অতএব একটিকে খপ কবে ধবে ক্লোন করলে অন্যটি হবে না। যাদুকর আনন্দ 'বেঁটে মানুষ' চেয়েছেন 'বেঁটে লেখক' চাইলে ববং সন্দেহেব অবকাশ থাকত। তবে একথা না বলা বোধহয় অন্যায় হবে যে আনন্দবাজার না থাকলে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙালি লেখক মালদার হয়ে উঠেছেন তাঁদেবও এতটা ফুলে ফেঁপে ওঠা সাধ্যে কুলোতো না। হাতে হ্যারিকেন হয়ে যেত। বাঙালিদের মধ্যে কিন্তু হ্যাবিকেন হাতে লেখকেব ঘাটতি নেই। সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার দিকে যে মাদী ও মদ্দাবা থিয়েটারে ভিডত তাদেব সম্বন্ধে বসরাজ অমৃতলাল বসু যা লিখেছিলেন তা হ্যারিকেন হাতে লেখকদের ক্ষেত্রেও খেটে যাচ্ছে,

নিজ পরিবাব মাঝে বিবক্তিকারণ।
কুটুম্ব সমাজে লজ্জা নিন্দাব ভাজন॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।
সরে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ট্র্যাজিক ফিগার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব ১৩১৯ সালের ২১ আশ্বিন আমেরিকাব ইলিয়ন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন,

'বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আমাব মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমাব বই ছাপাব ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালযের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পাবে। সেইজন্য আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রি কবিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস কবিবাব ভবসা আমার চলিয়া গিয়াছে।'

আজ কলকাতায় যখন বইমেলা হয় তখন আনন্দ পাবলিশার্স-এর সামনে বাঙালি যেভাবে দীর্ঘ লাইন লাগায় তা দেখলে মনে হয় আহা! এমন একটি নয়নাভিবাম দৃশ্য যদি রবীন্দ্রনাথ দেখতেন তাহলে তাঁর কী সাতিশয় আনন্দই না হত!

আমাদের জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথকে ট্র্যাজিক ফিগাব বলাব জন্য অনেকেই কুপিত হবেন এবং নুলো হলেও আস্তিন গুটোবেন। তাঁদের আমবা আগে ভাগেই জানিযে রাখি যে এরপব যে রামধোলাই তাঁরা খেতে চলেছেন তা কিন্তু ঝাপটের ঢাল দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়।

নলেন! ন-লে-ন! এই শুয়োর ব্যাটা নলেনের বাচ্চা! কানে কি হোগলা গজিয়েচে? ভদি ছাদ থেকে চেঁচাচ্ছে। কাকের দল ছাদের এককোণে কাকবলির খৈ খাচ্ছে। ভাঙা টবে মরা তুলসীগাছ। তার গোড়ায় পচাফুল। ন্যাড়া ছাদে শ্যাওলা। খোবলা ইঁটের ফাঁকে গোল গোল গেঁড়ি। বটেব চারা বেরিয়েছে। ছাদে রোজকার মতোই তেলচিটে, ধার ছেঁড়া মাদুর পাতা। তার ওপরে বাখা তুলো ভরা বার্লির পুরনো জং ধরা টিনের কৌটো, মান্ধাতার আমলের একটি ম্যাগনিফাইং লেন্স, লাল নীল কাচের টুকরো, ইঁট চাপা দেওয়া একটি সেইদিনের আনন্দবাজার পত্রিকা যার ফর ফর করে ওড়ার চেষ্টা নিরন্তর। ভদি ন্যাড়া ছাদের ধারে গিয়ে তলায় উঠোনের দিকে তাকায়। নলেন পেতলের সাজিতে টগর ফুল তুলে তুলে রাখছে।

—গাঁক গাঁক করে চিল্লোচ্চি, শালা, কানে ঢুকচে না?

—আঁজ্ঞে, শুনতে পাইনি। যাব?

—হ্যাঁ, যাবে। ক্যাওড়াতলায় যকন মুখে নুড়ো জ্বালব তোর তকন যাবি। বেচামণি কী কবচে?

—গিন্নিমা তো পাইখানায়।

—বেকলে বলবি ঝটপট চান-ফান সেরে চাবির গোছটা বের কবতে। ক-ঘব ভরল?

—আঁজ্ঞে, দুটো। তিন আর এক।

—আবও আসবে। তুই ব্যাটাও ধোয়া-পাখলা কবে চান সেবে ফেলবি। গঙ্গাজল আনতে হবে।

—কেন? এত সকালে।

—যা বলচি তাই কব। আজ শালা চাকতিব ঘর খোলা হবে। মা! মা গো! মা!

২৪ অক্টোবব, রবিবার, সকালে এমনটিই হয়েছিল। ভদি যাদুকব আনন্দব বিজ্ঞাপনটি পড়ে এবং গূঢ় নির্দেশ পায় যে চাকতির ঘব খুলতে হবে। হ্যারিকেনেব ভূতুড়ে আলোব দপদপানিতে এ পর্যন্তই এখন দেখা থাকল।

শীত পড়তে অল্প বিস্তব দেবি। কিন্তু শীতেব কবিতা লেখা শুরু হযে গেছে। একটি স্যাম্পেল দেখা যেতে পারে।

ওই দ্যাখো ঢুলু ঢুলু গ্রাম,
মাঝে মাঝে হাঁটে জলপিপি,
ক্যাঁতামুড়ি চাষা, চাষা-বউ
নাক ডেকে যায় ফুলকপি।

অনবদ্য এ কবিতাটি কাব? ভদিই বা কে? চাকতির ঘবে কী আছে? হঠাৎ এই কবিতাটিই বা শান্টিং কবা হল কেন?

হুজ্জত-এ-বাঙ্গালা, হিক্‌মৎ-এ-চীন!

(চলবে)

২

প্রথম পর্বের মিলেনিয়াম অন্তে চারটি প্রশ্ন উঠেছিল। নেমে গেছে। অথবা সাফ সাফ জানিয়ে দেওয়াই হল মুরুব্বির কাজ—ওসব জবাব-ফবাব এখন হবে না। এখানে কেউ ইস্কুলেব পরীক্ষা দিচ্ছে না যেখানে পরীক্ষার খাতার ওপরে টুকলিবাজদের জন্যে লেখাই থাকত, 'মনে রাখিবে যে নিজে চেষ্টা করে ঈশ্বর তাহার সহায় হন'। তবে পাঠান ও মোগল সম্বন্ধে যাদের অনুসন্ধিৎসা প্রবল তাদের শ্রী বিমলাচরণ দেব সেই কবেই জানিয়ে রেখেছেন, 'হুজ্জত-এ-বাঙ্গালা, হিকমৎ-এ-চীন' এর অর্থ... 'যদি হাঙ্গাম হুজ্জুতের কথা বল, তাহা হইলে বাংলাকে হারানো শক্ত, যদি শিল্পীর শিল্পচাতুর্যের কথা বল, তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো শক্ত'। আজ যে রাজ্য বনাম কেন্দ্রের লড়াই আমরা স্বচক্ষে দেখি তা সি.পি.এম শুরু করেছে বলে অনেকেই মান্য করে। বাংলার রাজারা বরাবরই ডাকাবুকো টাইপের ছিল। মোগল-পাঠানদের হুকুমদাবি মানত না। 'একটা হাঙ্গাম ভালো করিয়া থামিতে না থামিতে আবার একটা হাঙ্গাম আরম্ভ হইত,' বাংলার এ এক মহান ঐতিহ্য। ১৯৯৯-এর শেষ দিকটায় সেই একই কেলো। ম্যালিগন্যান্ট

ম্যালেরিয়া ও চলচ্চিত্র উৎসবের রণবাদ্য শেষ হতে না হতে বাস চাপা ও বাস জ্বালানোর দামামা বেজে উঠল। ফাঁকফোঁকরে কিছু কিডন্যাপ, কবিতা উৎসব, মার্ডার আর তহবিল তছরুপের টুকটাক প্রোগ্রাম। এইসব থিতোতে না থিতোতে বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনের বিউগল ও ব্যাগপাইপ। বাজারে কানাঘুষো নতুন ইংরেজি বছর অবিরাম কেক-ভক্ষণ প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হলেও আচমকা নাকি অন্যদিকে মোড় নেবে। তাই বুঝি কেমন একটা গা-ছমছমে, কী হয়, কী হয় ভাব। এই স্টেজে খোঁচাখুঁচি না করাই বুদ্ধির কাজ।

বড়িলাল বরাবরই ছোট সাইজের কিন্তু তাকে ঠিক বেঁটে মানুষ বলা যাবে না। হালদারপাড়ায় তার ছোট একটা দোকান আছে যেখানে রঙিন চক, নানা রঙের মার্বেল কাগজ, রাংতা, উপহারের প্যাকেট বাঁধার জরিদার ফিতে, পেন্সিল, নানা আকৃতির গন্ধওয়ালা ইরেজার, স্কেল, খুবই হালকা ও নানা রঙের প্লাস্টিকের বল, প্লাস্টিকের শাটল কক, কাগজের বাক্সে জালি বার্বি পুতুল, খোঁচা-ওঠা টিনের এরোপ্লেন, সেলফোন-সদৃশ পেন্সিল বাক্স, ক্রিকেট প্লেয়ারদের স্টিকার, মিনি ক্রিকেট ব্যাট, লুডো, প্লাস্টিকের ডাইনোসর সেট 'জুরাসিক পার্ক', সাব-মেশিনগান, পিস্তল, পিচকিরি, একই বাক্সে রান্নাবাড়ি সেট, ঐ ডাক্তারি, টিকটিকি, তেঁতুল বিছে— এইসব ও আরও কত কী পাওয়া যায়। পুরো ঝাড় না হলেও দোকান খুব ভালো চলে না। বড়িলাল যা হয় তাতেই খুশি থাকে। 'বর্তমান' কেনে ও আদ্যোপান্ত পড়ে। বড়িলাল জানে যে লজেন্স, বাদাম-বিস্কুট, টফি, চকোলেট রাখলে বিক্রি বাড়বে। এ-বুদ্ধিটা অনেকেই তাকে দিয়েছে।

—রক্ষে করো বাবা! তারপর যকোন পিমড়ে-আঁশোলায় ছেঁকে ধরবে তকোন! এমনিতে তো গ্যাদাখানেক টিকটিকি— চারদিকে হেগে ছয়লাপ করচে।

—তা সবাই যা করে তেমন মুখ বন্ধ বয়ামে রাখবে। মালকে মালও থাকল পোকামাকড়ও ঢুকল না।

—ও তুমি চেনো না। ঠিক ফিকির করবে। শালারা খুব হারামি। আমার খুব ভালো আইডিয়া আচে।

—তোমার যত ফালতু ভয়! লোকে যেন করচে না।

—করবে না কেন? করচে। তেমন মরচে। ডাঁস, আঁশোলা, তারপর তোমার গিয়ে মাকড়সা, উইপোকা। এদের চেনো না। কেউ আড়ালে-আবডালে বই, কাপড় সব খাচ্ছে, টুঁ শব্দটা হচ্ছে না। কেউ-বা আবার চেটে দিল তো হয় ঘা নয় চুল উঠবে না।

মোটের ওপর বড়িলাল যে থিওরিতে দোকান চালায় তাকে স্মল ইজ বিউটিফুল হয়তো বা বলাই যায়। বড়িলাল বিয়ে করেনি। চেতলায় বাপের ভাগের এক ঘরে থাকে। হোটেলে খায়। কোনো ঝক্কি নেই। তবে ঘরে বজরংবলি হনুমানের ফটো আছে। সেখানে নকুলদানা, জল দেয়। ছোটবেলায় থানায় কনস্টেবলদের কুস্তি দেখে ঠিক করেছিল, কুস্তিগীর হবে। তারকদার আখড়াতেও গিয়েছিল কয়েকদিন। আখড়ার দেওয়ালে গোবর গুহ, বড় গামা, ছোট গামা, জিবিস্কো ও স্যান্ডোর ছবি ছিল। দড়িতে সার দিয়ে মরা বাদুড়ের মতো ল্যাঙট ঝুলছে। হুপ্-হাপ্ শব্দ। তারকদার রোগা প্যাঁটকা এক চেলার মিডিয়াম একটা রদ্দা খেয়ে বড়িলালের ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল। কুস্তিগীর না হয়ে শেষে দোকানদার। তবে হনুমানজীকে ছাড়েনি। তার অন্য কারণও আছে। হনুমানজী বাদে অন্য কোনো ঠাকুরের ভূত তাড়াবার ক্ষমতা নেই। বরং ভূতেরা এমনই খচ্চর যে যার যে ঠাকুর হয়তো সেই চেহারা নিয়েই হাজির হল। তুমি তো আহ্লাদের কাঁকুইদানা হয়ে ভাবছ যে, এমন ডাকা ডেকেছি যে ইষ্টদেবতা বাধ্য হয়েছেন দর্শন

দিতে। ভূতেরা এইসব রগড় করে। উল্টো পড়িয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে পালায়। তাছাড়া কিছু ঢ্যামনা লোকও আছে যারা ভূত পোষে। যাব ওপর বাগ তাকে ভূত দিযে সাইজ করায়। অবশ্য এসবই বড়িলালেব শোনা কথা। শোনা কথা যে সহসা সত্যি হয়ে যেতে পাবে সেটা বডিলাল জানত না। আমবাও। অজানাকে জেনে জেনেই আমাদেব এগোতে হবে। পাঠক্ষেত্রটিও আখড়াবিশেষ। সেখানে নিয়তই পাছড়াপাছড়ি চলেছে। গাপ হয়ে বযেছে বলে সবসময় বোধগম্য হয না। যাই হোক, পোকামাকড় ও ভূত সম্বন্ধে সদাসতর্ক বডিলালেব মধ্যে কিন্তু কোনো মজ্জাগত গর্ভচেটবৃত্তি ছিল না। এই প্রথমে নির্বাক ও পবে সবাক শতকের হাফটাইমের বেশ কিছু আগে জন্মালেও বডিলাল চাকর, খানসামা বা খিদ্‌মদগারেব মনোভাব নিয়ে কোথা মনিব, কোথা মনিব বলে কেঁদে বেড়াত না। ববং হযতো বড পালোয়ান হযে একমণি লোহার মাদুলি পবে গঙ্গাতীবে প্রাতঃভ্রমণ কবত বা পাড়াব গবা-ঘণ্টে-পল্টনদের একজোট করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করত। জন্মেব টাইমেব হেবফেরে নানা হেবাফেবি হয়। এই কথা যে কত অকাট্য সত্য তা পবে জানা যাবে।

২৪ অক্টোবব, ববিবার, ১৯৯৯ সকালে বড়িলাল দেখল তাব সামনে তিনটি সম্ভবনা। সে সিনেমা দেখতে যেতে পাবে। বেলঘবিযাতে তাব একমাত্র বোন করবী-ব শ্বশুববাড়িতে যেতে পাবে। অথবা কিছুটা আত্মনির্ভব হওযাব জন্য কেওড়াতলায গিয়ে মানবাকৃতির জাবিজুরি ফাঁক স্টাডি কবতে পাবে। কোনো গোপন কারণে বডিলাল দেখল, কেওড়াতলাই তাকে টানছে। বডিলাল সেই টানে বডি ছেড়ে দিল।

কেওড়াতলা শ্মশানে কোনো গাইডেড ট্যুবের ব্যবস্থা নেই। 'এবাবে পুজোয কেওড়াতলায় চলুন' বা 'চলুন, সবান্ধবে কেওড়াতলা ঘুবে আসি' বলে কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি বিজ্ঞাপনও দেয় বলে জানা নেই। কিন্তু বডিলাল দেখেছে যে, অদৃশ্য কোনো গাইড জীবন্ত দর্শকদেব প্রথমেই অবধারিত ভাবে শ্মশানের সেই অংশে নিয়ে যায যেখানে বিদ্যুৎচুল্লি বডিব সাইজ ও ওজন অনুযায়ী হাঁ ও কপাৎ, হাঁ ও কপাৎ কবে চলেছে। অবশ্য বিগড়ে না গেলে। এবং কখনোই সব চুল্লি একসঙ্গে চালু এবকম অলৌকিক দৃশ্য কেউ দেখেনি। অন্যদিকে মড়াব কোনো কমতি নেই। এক একসময় এমন লাইন পড়ে যায যে, কেওড়াতলায় হাউসফুল দেখে মড়ারা শিরিটি বা গড়িয়ায় বোড়ালে গিয়ে অবযবমুক্ত হয়। দর্শকরা বিদ্যুৎচুল্লি দেখেই শ্মশান দেখার তৃপ্তি ও মানব-জীবনের অকিঞ্চিৎকর তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হযে দৃপ্ত পদক্ষেপে খাবারদাবারের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। অথচ আগে লোকে মরলে কাঠেই পুড়ত। বিদ্যুৎচুল্লি তো সেদিনের ব্যাপার। এখন অবশ্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন নামে ঐ চুল্লিরই একটি মিনি সংস্করণ সম্পন্ন গৃহে গৃহে জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য এই চুল্লি ছাইভস্ম তৈবি করে না , রোস্ট, তন্দুর, গ্রিল, বেক ইত্যাদি কবে। এবং সচরাচর মানুষকে নয়। বড়িলাল কখনোই ঐ অদৃশ্য গাইডের ইঙ্গিতে সম্মোহিত হয়ে পড়ে না। সে চেতলা ব্রিজ দিয়ে নেমে রাস্তা পার হয় এবং উল্টোদিকের পানের দোকান থেকে বিড়ি কিনে দড়ি থেকে ধরায় ও ফের রাস্তা পেরিয়ে কাঠের চুল্লির অঙ্গনের দিকে অগ্রসর হয়।

আজ সে অঙ্গনে নজর করে দেখল, ভোররাতে কেউ কাঠে পুড়িয়েছে কারণ ব্যাপক ভস্মের মধ্যে কয়েকটি পোড়া কাঠ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ভারতীয় দড়ির খেলা দেখাচ্ছে এবং পাশেই এত পুরনো, কালো ও অংশত ভেজা একটি ফাটা তোষক পড়ে যে কেউ নিয়ে ঝামেলা বাড়ায়নি। সাইড দিয়ে অঙ্গনটি অতিক্রম করে বড়িলাল শ্মশানপ্রান্তের গেট দিয়ে ঢুকে ঘাটের আগেই বাঁদিকে ঢুকল। ইতস্তত জল জমে আছে। গুমোট গন্ধ। দুটি কুকুর আপসে

কামড়াকামড়ি করছে। ডানদিকে তাকাতেই,

স্মরণীয়

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম	মৃত্যু
১৭ই আষাঢ়	১০ই জ্যৈষ্ঠ
১২৭১ সন	১৩৩১ সন।

হায়, রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। হায়, কলকাতা কর্পোরেশন। কী হাল সমাধিমন্দিরের। নোংরা, রংচটা, ফাটল-ধরা, পক্ষীপুরিষে চিত্রিত। ওপরে একটি ধেড়ে বটগাছ। তারই একটি ছানা তলায় গজিয়েছে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বট কোম্পানির অমোঘ বিধ্বংসী শেকড় গুঁড়ি মেরে মেরে এগোচ্ছে। হায়, বাংলার বাঘ যিনি সন্দেশের মাংস খেতে বড়ই ভালোবাসতেন। হালুম!

অবশ্য আশুতোষকে আর বাংলার বাঘ বলা ঠিক নয়। কারণ নিত্যযাত্রীরা অবশ্যই অবহিত যে, ল্যান্সডাউন-পদ্মপুকুর সংযোগস্থলে দুটি বাম্বুতে লাগানো বোর্ডে দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন লেখা ছিল,

বাংলার বাঘ
সোমেন মিত্র
জিন্দাবাদ।

এখন লিখন অন্যরূপ।

সোনার বাংলার
সোনার ছেলে
সোমেন মিত্র জিন্দাবাদ।

এরই নাম ম্যাজিক। এই ছিল বাঘ। সাট্ করে সোনার ছেলে হয়ে গেল। আজ যিনি শার্দুল কাল তিনিই গৌরাঙ্গ। বোঝাই যায় যে, কংগ্রেসিদের মাথার জায়গায় যে লক্ষ্মীব ভাঁড় ছিল সেখানে মা ভবানী গেঁড়ে বসেছেন।

মরুক গে যাক্। স্যার আশুতোষের উল্টোদিকে মুখোমুখি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এনার কেসও গোলমেলে। পাতাখোর ভ্যান্ডালরা বেদি ফাটিয়ে শেকল ঝেড়ে দিয়েছে। খুব যদি ভুল না হয় তা হলে এঁর সম্বন্ধেই শ্রী সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার ন্যায় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কোনো বাঙালিরই নাই।' শ্বেতাঙ্গ তো দূরের কথা, লর্ড লেডিদের বাদ দেওয়াই ভালো, কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভ লুম্পেনরা অবধি এখন তাঁকে পাত্তা দেয় না। এঁর মাথায় একটি ঘোড়ানিম।

বড়িলালের আরো বাঁদিকে ঘোরার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল কারণ বমি, শ্যাওলা, গু ইত্যাদির সংগ্রহ পেরোতে হবে। উপচে ঐ সমাহারের দিক থেকেই একটা বাতাসের ঝলক আসাতে বড়িলাল ওখান থেকে কেটে পড়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করল। বড়িলাল জানে, এখন কী করতে হবে। ডানদিকে গেট তালাবন্ধ। তারা মার মন্দিরে চাবি থাকত। ডুপ্লিকেট শ্মশানের অফিসে। কিন্তু ক্যাওড়াদের ভয়ে এখানে আর চাবিই রাখা হয় না। অতএব ঘাটের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে বড়িলালকে ব্যাঁকাত্যাড়া রেলিং টপকাতে হবে। পথের দাবি মেটানো বড়ই দুরূহ।

ঘাটের দুধারে বসার রোয়াক। বাঁ-দিকটাতে তিনজন বসেছিল। একজন ঢ্যাঙা, একজন বেঁটে-মোটা আর তিননম্বরকে দেখলেই বোঝা যায় পাগলাখ্যাঁচা। উল্টোদিকে লুঙ্গি আর হলদে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একটা তাগড়াই মাল চোখ বন্ধ করে বিড়ি টানছিল। বোঝাই যায় যে, লোকটা

এলিতেলি নয়। 'আমাকে ঘাঁটিও না, আমিও ঘাঁটাব না' ধাঁচেব। বড়িলাল ডানদিক ওপরে উঠে গেল। গঙ্গায় জল বাডছে। এবারে টপকাতে হবে। কুঁচকিতে খিঁচ না লেগে গেলেই হল।

এই ফাঁকে বলে নেওয়া যাক যে, বাঁ-দিকেব তিনজন হল ফ্যাতাড়ু যাবা গোপন একটি মন্ত্রেব বলে উড়তে পাবে এবং নানা ধবনের অনুষ্ঠান বা সুখেব সংসারে ব্যাগড়া দিয়ে থাকে। ফ্যাতাড়ু আবও অনেক আছে। কিন্তু আপাতত এই তিনজনকে চিনলেই কাফি। ঢ্যাঙা মালটা হল মদন। ওব ফলস্ দাঁত পকেটে থাকে। বেঁটে-কালো-মোটাটা হল ডি. এস। ঐ নামে একটি হুইস্কি আছে— ডিরেক্টরস্ স্পেশাল। ওর তোবড়ানো-মচকানো ব্রিফকেসেব দু-পাশে নাম ও পদবীব আদ্যক্ষব সাঁটা আছে যদিও পড়া কঠিন। তিন নম্বব স্যাম্পেলটা হল কবি পুরন্দর ভাট। এবা মোটেব ওপরে আমোদগেঁড়ে। পুরন্দব বলে উঠল,

কত না ফুলেব তোড়া
কত ফটো তোলাতুলি
ভাঙিলে লাগে না জোড়া
কত বৃথা কোলাকুলি।

জয় গঙ্গা. জয় বাম
কবি পুবন্দব দ্যাখে
মড়া আসে অবিবাম।
টুটিছে কত না জোড়া
ফুটিছে কত না শাঁখা
বড়বাবু ও বেয়াবা
দেখি পাশাপাশি বাখা।

মড়া আসে অবিবাম
কবি পুরন্দর বলে
জয় গঙ্গা, জয় রাম।

এই এলিজি গোছের কবিতাটি শুনে ডি. এস ঘাবড়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল,

—একটু ঝিমুনি ধবব-ধবব করছিল। কিছুর মধ্যে কিছু নেই— মড়ার কেত্তন শুরু করল।

—তা শ্মশানে মড়াব কেত্তন হবে না তো কি বিয়ের পদ্য লেখা হবে? যেমন তুমি তেমন তোমার আক্কেল।

মদনের ঝাড় খেয়ে ডি. এস একটু চুপসে গেল।

—না, সে কারণে বলিনি।

—তো কী কারণে বলেছ?

—পুরন্দরের কবিতায় একটা বি. জে. পি লাইন চলে আসছে, তাই বললাম।

এতক্ষণ পুরন্দর কিছু বলেনি। সে 'যাঃ বাঁড়া', বলে স্বগতোক্তি করে একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ির প্যাকেটের খচর-মচর শুনে ডি. এস বলল,

—বেঙ্গল বিড়ি! দেখি একটা ছাড়ো তো!

উল্টোদিকে হলদে স্যান্ডো গেঞ্জি একধারে হেলে প্রবল নাদে এক বাতকর্ম করে উঠে চলে গেল।

—বুড়ীমা-র চক্‌লেট বোম!

মদন ফের খ্যাঁক্ করে উঠল,

—সবকিছু নিয়ে কিছু বলতেই হবে।

পুরন্দর এই তালে ঝাল মিটিয়ে নিল,

—মদনদা, ডি. এস-এর কিন্তু কোনো দোষ নেই। ওবকম হবেই।

—মানে?

—হাফছুটির বারবেলায় পয়দা হলে ওরকম হয়।

বড়িলাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমাধি-মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। বাঙালি জাত ও বাংলা সাহিত্যেব দশা এমনই। ধুলোমাখা শরৎচন্দ্রের মাথাটি সামনে গ্রিল না থাকলে গলা কেটে উঠিয়ে নিয়ে যেত। কারো কাবো যেমন নিয়ে গেছে। অবজ্ঞা, অপমান ও উপেক্ষাব অন্ত নেই। ডানদিকে চোখ রেখে সবই দেখছেন। গলায একটি শুকনো গাঁদাফুলের মালা। সেই মালা থেকে মাকড়সাব জাল ছড়িয়েছে। ভেতবটা ঝুল নোংরায় ভর্তি। সৌধেব সামনেব দিকটা ভাঙাচোবা। ভেতবটি একটি সংগ্রহশালা বিশেষ। ভাঙা বাঁখারির টুকবো, মবা পায়রাব সাদা পালক, শুকনো পাঁচটা মালা, পাতা কাগজ, পানপবাগের প্যাকেট এবং হাজার হাজাব কালো পিঁপড়েব আনাগোনা। এদিকটায় বন্ধ থাকলেও অনেকগুলো কুকুর। এদের সকলেবই নাম 'ভেলু' দেওযা হল।

শরৎচন্দ্রের পাশেই শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব-এর শ্মশানসৌধ। মহামহোপাধ্যায গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেবের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। গন্ধবাবার ভক্তজন আছেন কাবণ গ্রিলটি রুপোলি রং কবা। তারপব আবার সেই উপেক্ষিতেব স্মৃতি। পবপব। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পরেরটি কাব, বোঝার উপায় নেই। চাকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। দেশপ্রেমিক কৃষ্ণকুমাব চট্টোপাধ্যায়। অজিতেশ্বর ভট্টাচার্য। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। সুববালা ঘোষ। চাবদিকে ছড়িয়ে-ছিটিযে সোনালি জরি, গাঁজার কলকে, মিষ্টির বাক্স, ডাবের খোলা, প্লাস্টিকের জলের বোতল ও গ্লাস ও অসংখ্য নোংরা পলিব্যাগ। এবং সর্বত্রই সেই বিচিত্র গন্ধ।

বড়িলাল ঘাটে এসে দেখল, ভুঁড়ো একটা লোক নানা সাইজেব বিলিতি মালেব বোতলে গঙ্গাজল ডুগবুগ-ডুগবুগ করে ভরে একটা বিগশপার ব্যাগে ভরছে ও বাঁ-দিকের রোয়াক থেকে বেঁটে-মোটাটা দেদারে আওযাজ দিচ্ছে।

—ওই, ঐ পলকাটা বোতলটা হল স্কচ-হুইস্কির। এক বোতল কিনতে গেলে গাঁড় ফেটে যাবে। শালা, কত আর দেখব। মালের গন্ধ যায়নি, ওর মধ্যেই গঙ্গাজল ভরছে। এই, এইটা হল হারকিউলিস রামের। ডিফেন্সের ঝাড়া মাল।

মদন কিন্তু এবারে আপত্তি করেনি। বরং মুচকি-মুচকি হাসছিল।

—ওরে, তোর মনিবটা তো জব্বর মাল। কোনো পাঁইট, নিপ এসবের কারবার নেই। সব বোতল। এত জল দিয়ে কী করবি? হেভি চোদনা টাইপের লোক তো! এত বলছি, কিন্তু রা কাড়ার নাম নেই। ভালো-মন্দ কিছু একটা বল। না হয় দুটো খিস্তিই কর। তিনজনে আছি বলে ভাবছিস, ক্যালাব? শালা, বোধহয় জন্মবোবা। নয়তো হাড়হারামি।

ভুঁড়োর শেষ বোতলটি ভরা হয়ে গেল। বোতলটা বিগ শপারে ভরে সে উঠে দাঁড়াল। অতগুলো জল-ভরা বোতল কিন্তু কোনো ক্যাঁ-কোঁ নেই। যেন তাকিয়া বগলে আসরে চলেছে। লোকটা ব্যাগ হাতে ঘাট থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই অদ্ভুত কাণ্ডটা হল। ঠিক দড়ি-বাঁধা কুকুর যেমন হ্যাঁচকা মেরে মনিবমুখো হয় তেমনই তিনজন ঝাঁকুনি খেয়ে রোয়াক থেকে নিচে নামল। তারপর লোকটার পেছনে সুড়সুড় করে রওনা দিল। মুখে কোনো শব্দ নেই। উল্টোদিকে

একটা মেয়ে এসে পড়েছিল বলে ভুঁড়ো ডানদিকে হেলল। ঐ তিনটেও ডাঁযা ভাঁজ মারল। বড়িলাল ওদের ফলো করতে শুরু করল। মড়া নিয়ে একটা কাচেব গাড়ি এল। পেছনে দুটো টেম্পো-ভরা লোক। নলেন নমস্কাব কবল। ওরাও নমস্কাব কবল। নলেন বাঁদিকের দাবনা চুলকোতে চুলকোতে বাস্তা পেরোল। মদন, ডি. এস ও পুবন্দর ভাটও নিজের নিজের বাঁদিকের দাবনা চুলকোতে চুলকোতে বাস্তা পার হল। তারপর এ-গলি, সে-গলি পেরিয়ে একটা বড় উঠোনের মতো জাযগা ফেলে, নর্দমা টপকে, হবিণঘাটাব দুধ দেওযার ভাঙা খাঁচা বাঁ-দিকে রেখে ফের একটা গলিতে ঢুকে যে বাড়িটার দিকে নলেন চলল সেটা যে ভদির একতলা ন্যাড়াছাদ-ওলা বাড়ি তা আমরা জানি। বাড়িব ওপরে একটি লজঝড়ে অস্পষ্ট সাইনবোর্ড কেৎরে ঝুলছে। একটু ঘাড় কেলিযে পডতে হয়। বড়িলাল দেখল, লেখা আছে এবড়ো-খেবড়ো অক্ষরে, 'বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাডা দেওযা হয'।

'ওই বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম'।

(চলবে)

৩

আজকাল কোনো শিশুই 'লাল কালো' পড়ে না। অতএব কে অন্ধকাবে হাঁ করতে পাবে, এই ভয কেন বিকট-দর্শন ডেঁও জল্লাদকে ঘর্মাক্ত কবে তোলে প্রভৃতি প্রশ্নাবলী ওঠে না। গিরীন্দ্রশেখব স্বপ্নের জগৎ থেকে সুষুপ্তির জগতে নির্বাসিত। যেমন নির্বাসিত দক্ষিণারঞ্জন, ধনগোপাল, হেমেন্দ্রকুমার, সুনির্মল, খগেন্দ্রনাথ, সুখলতা ও খ্যাত-অখ্যাত শত শত সাহিত্যিক যাঁরা শিশুদের জন্য লিখতেন। এখন সাহিত্যিক-শিশুদের যুগ। ছোটরা কেবলই ফেলুদা বা টিনটিন পড়ে। বাপ-মাগুলোও অগা। ছোটবেলা থেকে হাই প্রোটিন, ব্রেনোলিয়া, সুলভ ব্রয়লার, কেলগ ইত্যাদি গিলে অকালেই কেঁদো কেঁদো হযে ওঠে। তাবপবই দেখা যায হয কমপিউটার শিখছে বা লুচ্চামি। বিগ বং-এব বাচ্চারা হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট এমনকি চেঙা-বেঙা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ছোটবেলা থেকেই এত স্বার্থপব ও খচ্চর অন্য কোনো দেশের শিশুরা হয না। যেমন পাশেই বিহার দেশের কথা ধবা যায়। অথবা নেপাল। সেখানে সরলমতি শিশুদের দেখা পাওয়া যায়। হামেশাই। আপাতত বড়িলাল।

ফলের বাক্সের কাঠের গায়ে বিস্কুট-টিন কেটে পেরেক মারা বেঁকাতেড়া দরজাটায় ফুটো ছিল বলে বড়িলাল দেখতে পাচ্ছিল ভেতবে অর্থাৎ ভদির উঠোনে কী হচ্ছে। ভদি ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বেরিয়ে এল।

—এই তিনটে বানচোৎকে আবার নিয়ে এলি কেন?

—খুব দেখি বোলচাল দিচ্ছে। ভাবলুম ধবে নিয়ে যাই। পবে সাইজ করা যাবেখনি।

—দাঁড়া, দাঁড়া। অত সোজা কেস নয়। ভাবচি, এই দিনে হঠাৎ ফাঁদে পা দিল কেন?

—জলছিটে দিয়ে দিন। মাথাগুলো কেটে ফেলি। বলিও হল, ধড়, মুণ্ডু সব সাধনার কাজেও লেগে গেল। কিছুই ফেলা গেল না।

—মন্দ বলিসনি। কী গো, মালে ঝালে একেবারে কন্দর্পকান্তি। খুঁড়ছিল কেঁচো...

—বেরিয়ে পড়ল ঘুরঘুরে। এবারে রা কাড়ছে না যে? ওফ্, সে খিস্তির একেবারে খই ফুটোচ্ছে।

প্রথম ডি. এস এবং তার দেখাদেখি পুরন্দর ও মদনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বড়িলাল শুনতে পেল আশপাশে কেউ মন্তর পড়ছে। ন্যাকড়াপোড়া গন্ধ। নলেন এব মধ্যেই গিয়ে ল্যাগব্যাগে একটা টিনের খাঁড়া নিয়ে এসেছে যা দিয়ে কিছুই কাটা সম্ভব নয়। এটা দেখেও ওদের কান্না থামছে না। ভদি তিনজনের সামনে পায়চারি কবছে আর থেকে থেকে চেঁচাচ্ছে,

—এসপার ওসপার হবে যখন হয়েই যাক। নিন্দে যখন শালা একবার বটেচে তখন বিয়েই করব। মুণ্ডু নেচেচে। মুণ্ডু নাচবে। উফ্, ইয়া বড় চাকতি মাপের মুণ্ডু গাঁথা মালা। এসপার ওসপার। মুণ্ডু নির্বিকার। ধড় শুধু ধড়ফড় করছে। হাত খিঁচোচ্ছে। পায টান মারছে।

ফ্যাতাড়ুরা এবার সমস্বরে একেবারে রোলারুলি কান্না জুড়ে দিল। এতক্ষণ বড়িলাল ভাবছিল বাজারে মুরগির মুণ্ডুকাটা দেখলেই তার গলায় কেমন শিরশির করে আর তিন-তিনটে জলজ্যান্ত মানুষের মুণ্ডু... এরা কি কাপালিক-টাপালিক... নরবলিব দু-একটা খবর তো এখনও কাগজে বেরোয়... নাকি এখনই গিয়ে থানায খবর দেবে...

বেচামণি একেই বেজায় মোটা তায় পাটভাঙা লাল-সোনালি বেনারসি পবেছে বলে খোলতাই আরো বেড়েছে, স্যাম্পু করা চুল,

—ফের... ফের সেই অশৈল?

ভদিব গর্জন।

—ব্যাটাছেলের ব্যাপারে নাক গলাবে না কতবার বলেছি'

নলেনের আবেদন।

—গিন্নি মা, খাঁড়া চুলকোচ্ছে, রক্ত ছেটাছেটি হবে, আপনি থাকবেন না

বেচামণির মুখে সেই মহামায়া সুলভ হাসি

—পুজোগণ্ডার দিন। ফেতুড়ে অতিথি এয়েচে। তা সে ভয়ডর দেখিয়েচ ভালো কবেচ। শান্ত হয়ে বসো তো বাছা তোমরা। কেউ মুণ্ডু কাটবে না। ওসব হল গদির বটকেবা। নলেন, ওদের জলবাতাসা দিয়ে বসা।

—তাহলে বলি দেব না বলচ?

—ফের সেই অলুক্ষুণে কতা। দেখচ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপ ধরেচে।

—বারণ যখন করচ এত করে, তখন... যাঃ, এ যাত্রা ছেড়ে দিলুম। তবে যেখানে সেখানে অজানা অচেনা লোক দেখলে পোঁদে লাগা মোটেও ভালো কতা নয়। এই বলে দিলুম।

ডি. এস ফুঁপোতে ফুঁপোতে বলে,

—আঁজ্ঞে গদির বটকেরা কী? ওইটে বুঝলুম না।

বেচামণি ঘোমটা দেয়। ভদির প্রসন্ন ব্যাখ্যা।

—আমার নাম হল গে ভদি। তা বউ হয়ে তো সোয়ামির নাম মুখে নিতে পারে না। তাই বলে গদি। এবারে বুঝলে গদির বটকেরা।

পুরন্দর ও মদন বসে। ওদের দেখাদেখি ডি. এস-ও। তিনটে ভাঁড় আর এক বোতল বাংলা নিয়ে নলেন সামনে রাখে।

—গদির বটকেরা তো দেখলে, এবার একটু নলেনের গুড় চেখে দেখ।

—তখন উল্টোপাল্টা অনেক বলে ফেলেছি। কিছু মনে রেখ না ভাই।

—দ্যাখো ভায়া, তোমরা হলে ফ্যাতাড়ু। ফ্যাতাড়ুর কাজ ফ্যাতাড়ু করেছে... আর...

ভদি নলেনকে হাত নেড়ে থামায়।

—এবারে আমাকে বলতে দে। আজ এক মহাযোগের দিন বুঝলি। লাস্ট এই দিনটা এসেছিল

কমবেশি দেড়শো বছর আগে। চাকতিব খেলা যখন শুরু হয তখন চোক্তাবের সঙ্গে ফ্যাতাড়ুরা এক পার্টি হযে যায়।

—আজ্ঞে, চোক্তাব কী? মোক্তার, ডাক্তাব হয বলে জানি .

—আরে উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, পেশকাব ওইসবের যেমন ফ্যাতাড়ু মেলে না তেমন চোক্তারও মেলে না। আমবা ঠিক বলিযে কইযেদের দলে পডি না। তাই কেউ টেবও পায না যে আমরা আছি। এই যেমন ধর তোবা—তোরা যে ফ্যাতাড়ু সেটা কটা লোক জানে? খববেব কাগজে নেই, খাসখববে নেই, কোথাও নেই। সেইবকম চোক্তাবদেব বেলায। কোথাও নেই। লোকে জানেই না। নে মাল ঢাল। ও নলেন ছিপি খুলেই দিয়েচে। চেতলাব মাল। রসা ডিস্টিলারির বলে একটু গন্ধ লাগবে। এদিকে আবার ফাবিনি-ব ছাপটা দেয না। সব হল গওবমেন্টের হাবামিপনা। তা বাবা মদন, মুখেব কুলুপটা এবাবে একটু খোল।

—আমি অবাক হযে ভাবচি আপনাকে কোথায় যেন দেখেচি দেখেচি।

—ওরে চোক্তারের ওপরে ফ্যাতাড়ুর জন্মেব টান। এতে অবাক হওয়ার কী আচে। একি এক-দুদিনেব সম্পক্ক। নাও, ভাটকবি, এক্ষুণি যে পদ্যটি ভাবলে বলে ফেল তো,

—বলব?

—বলবি না তো কি গিলে বসে থাকবি। বল,

পুরন্দব গলা খাঁকাবি দেয।

—আমার এই কবিতাটিব নাম 'যাব যা কাজ'।

ডি এস অমনি বলে ওঠে,

—ওবকম নাম কবিতায চলে না। 'যাব যা কাজ'। দেখলেই লোকে পাতা উল্টে চলে যাবে।

—কেন?

—এই কারণে যে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা জ্ঞানেব কবিতা। লোকে কবিতা পড়বে আনন্দ পেতে, ওসব জ্ঞানমারানি ঢপ লোকে শুনতে চায় না।

মদন বলে

—ডি. এস তুমি থামবে? না শুনেই আগে ঝগডা।

—বাগড়া দিও না ভাই। আনন্দ তো অনেক পেযেছ। এবাবে ভাবার আগে শুনে নাও, আমার কবিতা হল, 'যার যা কাজ'

শশধব ধবেছে শশক
মহীতোষ মেরেছে মশক
উভয়েই স্ব স্ব কাজে পটু
পেট থেকে পড়া ইস্তক।
বনমালী করে বন খালি
ডালে বসে গোড়া কাটে কালি
ডাকে তারা যাহা থাকে ঝাড়ে
যমদূত দেয় করতালি।

ভদির মুখে হাসির ময়ান।

—বাঃ বাঃ বেড়ে হয়েচে। এই, এই হল কবিতা। রস আচে, অলঙ্কার আচে, গভীর অর্থ আচে, চনমনে ছন্দ আচে। এই না হলে পদ্য। আজকাল কী যে সব বালের ছাল লেখে। কোনো কাক-কাঁকুড় বালাই নেই। কেমন লাগল, ডি. এস।

—ভাবতে হবে। জ্ঞানমারানি পদ্য তো, ঝপ্ করে কিছু বলব না। তবে, মনে হচ্ছে পুরন্দর এর মানেটা বুঝে লেখেনি। পেয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে। কী, ঠিক বলিনি!

—নেহাৎ ভদিদা, বউদি, মদনদা সব সামনে বলে কিছু বললাম না। অবশ্য পুবন্দর ভাটের জীবনে এটা নতুন কিছুই নয়। যুদ্ধ যারা করে তারা মশার কামড় নিয়ে মাথা ঘামায় না।

—তার মানে আমি মশা?

—হ্যাঁ, অ্যানোফিলিস।

—আঃ, তোরা থামবি? বেকার ঝগড়া কবে কোনো লাভ নেই। পবে আমি ওকে পদ্যটা না হয় বুঝিয়ে দেব।

টিনের দরজার ফুটোর সঙ্গে চোখ সাঁটানো বড়িলাল হঠাৎ বোধ করল তার পা বেয়ে কী একটা উঠছে। চোখ সরিয়ে দেখল একটা ডেঁও পিঁপড়ে। তাকে সরাতে গিয়ে টিনের দরজায় হাঁটু ঠুকে ডুম করে একটা আওয়াজ হল। অন্য কেউ না খেয়াল করলেও শব্দটা নলেনেব কান এড়ায়নি। সে উঠতে যাবে কিন্তু ভদি তাকে থামাল।

—ও কিছু নয়। সাক্ষী। সবকিছুর সাক্ষী থাকে। থাকতে হয়। পাত্তা দেবার দরকার নেই। এবারে তোরা কী জানতে চাস কম কথায় বল।

—আঁজ্ঞে, চোক্তার তাহলে ঠিক কী?

—এ কথার কোনো মানে নেই। ফ্যাতাড়ু কী? তেমনই চোক্তার কী? চোক্তার হল চোক্তার। তবে এটুকু বলতে পাবি হুজ্জত লাগাতে চোক্তাবের কোনো জুড়ি নেই। তবে ঠিক টাইম না হলে কিচ্ছুটি হবার উপায় নেই।

—খোলসা হল না।

—হবে কী করে! আজকে তো সিরিয়ালেব পয়লা এপিসোড। তিনশো পেরিয়ে গেল, 'জন্মভূমি'-তে ঠিক কী হচ্চে লোকে শালা বুঝতে পারছে না। আর এক নম্ববেই তোরা এত বড় কাণ্ডটা সাইজ করবি সে কী করে হয়? আর আমিই বা গাণ্ডুর মতো অত বড় ঘোমটা দিতে যাব কেন যাতে পোঁদ বেরিয়ে পড়ে!

বেচামণি লজ্জা পায়।

—গদির মুখটাই ওরকম। খুব অশৈল।

—থামো তো। অশৈল! ভেতরে ভেতরে রাবড়ির জাল দেবার থেকে পেট খুলে দুটো খিস্তি করা সাধুসন্তের লক্ষণ। ঝটপট বলে যা আর কী বলবি।

এবারে পুরন্দর ভাট।

—আচ্ছা ভদিদা, তোমার দরজায় সাইনবোর্ড লেখা 'অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়'। এর মানে?

—দ্যাখ্, রোজ, নিত্য, অন্তহীন অশুভ অনুষ্ঠান চলচে। আজকের জীবনে পার হেড দশ-বিশটা করে শত্তুর। লোক চেনা দায়। মামলা, জালি কারবার, বউ ভাঙানো, ভোট মারানো, অর্ডার ধরা, খুচরো দুসমনি, চিটিং কেস, টাকা গাপ, চোরকাঁটা দিয়ে ডাকাতকাঁটা তোলা, মাগি চালান, পলিটিক্যাল চুদুড়বুদুড়, নমিনেশন— এই সব কম্মোকাণ্ড নিয়ে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, ব্ল্যাক ম্যাজিক নিত্য চলছে। সেই কারণে, শ্রেফ এইসব যারা করে তাদের আমি ঘর ভাড়া দিই। বিয়ে, অন্নপ্রাশন তারপর গিয়ে শ্রাদ্ধফাদ্দ-তে আমি নেই। এখনই তো একটা ঘরে চলচে তাকিয়াচালান, অন্যটায় কী কেস রে নলেন?

—আঁজ্ঞে কিছু বলেনি। দাড়িওলা একটা লোক মাঝবয়সী একটা মেয়েমানুষ নিয়ে দরজা

বন্ধ করে রেখেছে। ঠিক কী কবছে জানি না। তবে ন্যাকড়া পুড়িযেচে।

—গাঁড মেরেচে। দবজা ধাক্কে বের কর। টাকা বুঝে নিযে লাথ মেবে পেছনেব দরজা দিয়ে তাড়া।

নলেন উঠে গেল। তাবপর ধুপধাপ, কাঁইমাঁই।

—ও নিত্যকার ব্যাপার। ধাওয়া খেযে চলে যাবে। এই শালাদেব জন্যেই তো পুলিশ খচড়ামিব চান্স পেযে যায়।

—তাকিযাচালানটা কী কেস ভদিদা?

—ভেবি ইন্টাবেস্টিং। কংগ্রেস, তারপব গিযে কংগ্রেস ভেঙে অনেক দল যেসব হয়েছে ওবা তো ফরাস আর তাকিযা নিযে বসে। ভালো তাকিযাচালান হলে পিঠ হেলাতে গেল কি তাকিয়াও গড়িয়ে সবে যাবে। ঠেসই দিতে পারবে না। চিৎ হয়ে পডবে। মানেই হ্যাটা। মানেই কেবিযাবের পুটকিজাম। এবকমই কত কী—শ্মশানবন্দ, ভূত লাগানো, পেটপোড়া, ক্ষুর চালা, চুবির তুক, কলেবা বা প্লেগেব তদ্‌বিব, নিশির ডাক কাটানো, হাগা বাণ, বাঁড-ঢ্যামনা কাটার মন্তব— এইজন্যে ঘব ভাডা। দিচ্ছে কে? চোক্তাব ভদি। মাথায কিছু ঢুকছে?

—না ঢুকে পাবে? একেবাবে চাম্পি বিজনেস।

—তবে হ্যাঁ। সব বড় বড খদ্দেব। মিনিস্টাব, সিনেমা স্টাব, ক্রিকেট প্লেযার, ডাক্তাব, ব্যাবিস্টাব— কেউ বাদ নেই। খুব আবডাল বাখতে হয। লোক জানাজানি হলে বক্ষে নেই।

- কিন্তু সাইনবোর্ড দেখেই তো জানবে।

—ওইখানেই তো চোক্তাবেব ফন্দি। হেঁজি-পেঁজি এল তো এল। পেছনে অন্য দবজা আছে। দবকার হলে বোবখা, ছাতাব কাপডেব আলখাল্লা, ফলস্ দাড়ি, পবচুলা— সব ব্যবস্থা আছে।

—পুলিশ ঝামেলা কবে না?

—কববে না কেন? নতুন ও সি. ফোসি হলে গোডার দিকে একটু লপচপানি মারে তাবপর সাইজ হযে যায— যেখানকাব যা নিযম। হাত মে মাল্লু, ঘর যা কাল্লু। ব্যাস্, কোনো ঝুটঝামালা নেই। গ্যাঁট হযে বসে থাকো। আব মোলাযেম কবে মেবে যাও। চোক্তাবেব কারবাবেব এই হল ধম্মো। তবে সি. পি. এম-এব গওবমেন্ট তো. যে কোনো টাইমে খচডামি কবতে পাবে। কবলেই লাইন উপড়ে সাইনবোর্ড পাল্টে দেব।

—কী কববে অমন হলে?

—নার্সিং হোম খুলে দেব। নামও ঠিক করা আছে। 'মৃত্যুদূত নার্সিং হোম'।

—উরিঃ সাঁটি। ঐ নাম শুনলে কেউ আসবে!

—আসবে মানে? পিলপিল করে আসবে। সকলেই জানে যে বোগী কোথাও বাঁচে না। অতএব মরুঞ্চে মাল হলেই এখানে চালান কবে দেবে। নার্সিং হোমেও দেওয়া হল, দাঁত কেলিয়ে পটলেও গেল। নো প্রবলেম। দুটো ডাক্তারও আমি ফিট কবে রেখেচি। ওদের হাতে আজ অবদি একটা রোগীও বাঁচেনি! ঐ দুটোকে রাখব। তারপর বেচামণি আচে, নলেন আচে .

—আমরাও আছি, ভদিদা।

—সে তো বটেই। এই রে! বাবা এসে গেচে। এবাবে ঝটপট কাজ না এগোলে খচে যাবে।

—বাবা মানে? কোথাও কেউ তো নেই!

নলেন ফিক্ ও বেচামণি খিলখিল করে হাসি জুড়ে দেওয়ার ফলে আতঙ্কময় মুহূর্তটি অচিরেই প্রার্থিত মাত্রা পেয়ে যায়। বড়িলালও খটকায় দুলছে। ভদিরই কোনো বিশিষ্টার্থক হেলদোল নেই। ন্যাড়া ছাদের আলশের দিকে হাতজোড করতে ফ্যাতাড়ুর ছটি ও বড়িলালের দুটি চোখ সেইদিকে

ধায়— আলশের ধারে একটি সুবৃহৎ, প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ দাঁড়কাক বসে চোখ পাকিয়ে সব দেখছে।

—চাকতির ঘর খুলবে। মন্তরে মন্তর, যন্তরে যন্তর— সব মিলে গেল। জানতুম বাবা না এসে পারবে না।

যে বাংলা ভাষা আর কখনোই হাসিল হবে না সেই বাংলায় এই পাখিটিরই নাম দণ্ডকাক। দণ্ডকারণ্যে হয়তো এই ধরনের কাক দেদাবে দেখা দেয় এমন হতে পারে। না হলেও কোনো খিঁট নেই। এই টাইপের কাক কলকাতায় বেশি দেখা যায না। তবে বেগম জনসনের আমলে কলকাতায় দাঁড়কাকের ছড়াছড়ি ছিল বলেই শোনা যায়। বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) প্রসঙ্গে আমাদের পরে যখন না এসে উপায় নেই তাই একটু আগেই গাওনা গেয়ে রাখা ভালো। এই কলকাতাতেই তিনি সেন্ট জনস চার্চ গোরস্থানে জব চারনক ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের কাছেই কবরস্থ অবস্থায় আছেন। ভূমিকম্প জাতীয় কিছু না হলে ওভাবেই থাকবেন এ আশা দুরাশা নয়। আপাতত ভদির পিতৃরূপী গাঢ় একটি কর্কশ আবার নিক্ষেপ করল যা আব যাই হোক 'কা...আ...' কখনোই নয়।

—কী চাইছ বাবা? আনন্দলাড়ু খাবে?

এইবাব দাঁড়কাক নির্ভেজাল মনুষ্যকণ্ঠে বলল বা বলিল,

—অতীব আনন্দঘন কাল। মন্তর ও যন্তব সব মিলে গেছে, আনন্দবাজারে আনন্দ, চোক্তাবের ঘরে ফ্যাতাড়ু, চারদিন পরে কাটা মুণ্ডুব ভোজবাজি সবই যখন ডগোমগো তখন আর কালক্ষয কেন?

—এঁজ্ঞে, আপনি না এলে..

—চোপরাও। ফের কতা বললে মুকে আঁশবঁটি ভরে দেব। খোল্, শালা চাকতিব ঘব।

ভদি আর কালবিলম্ব না করে বেচামণির কাছ থেকে চাবির গোছাটি নেয়। চাকতির ঘবের তালাটি কোম্পানির গোড়ার দিকের দাসলক। চাবিটিও তেমনই আখাম্বা। দরজাব ওপাবে বোঁ-বোঁ শব্দ—যেন হাজার খানেক ভীমরুল পাখসাট মারছে। ঘর খুলতেই ছোট সাইজের কয়েকটি চাকতি বা উড়ন্ত চাকি সাইরেনের মতো শব্দ কবে তেড়ে বেরিয়ে ঘোলাটে আকাশে উধাও হয়ে গেল। বড় চাকতিগুলো বন্‌বন্ কবে ঘুরছে কিন্তু বেরোচ্ছে না।

—দরোয়াজা খোলাই থাক। ওরা ইচ্ছেমতো বেরোবে, ঢুকবে। তোরা তোদের কাজ করে চল্। ঠিক টাইমে আমি ফের এসে পড়ব।

দণ্ডকাক হুস্ করিয়া উড়িয়া গেল।

বড়িলাল দেখল এবারে কেটে পড়াই ভালো কারণ খিদে পেয়ে গেছে। পবে না হয় এসে দেখা যাবে জল কতটা গড়াল। ঠাণ্ডার দাঁত না থাকলেও মাড়ি বয়েছে। আবার গরমও লাগছে। ফেরার রাস্তায় বড়িলালের চোখ পড়ল দেওয়ালের গায় বিরাট এক দাড়িওয়ালা মুণ্ডু এবং তারই পাশে কামান দাগার মতো জাঁদরেল লেখা 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা বিজ্ঞান'। এই লিখন যে নোনাধরা দেওয়ালের গায় সরব তার নিচে নর্দমা। তাতে জমা জলে কালচে তন্বী শ্যাওলা কোমর দোলায় ও হাজার হাজার মশার লার্ভা নাচানাচি করে।

'সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!
কেহ অশ্বে কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ-চতুর্দোলে, কেহ যায় পুষ্পরথে ;
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে।'

(চলবে)

৪

এখন চলছে ক্যুইজের যুগ। পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, কলতলায় কলতলায় চলেছে অবিরাম ক্যুইজ। মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, মানুষের বাচ্চাদের হেডপিস যত সরেস হচ্ছে ততই অবধারিত হয়ে উঠছে ক্যুইজের প্রয়োজনীয়তা। কলকাতায় কবে প্রথম পেচ্ছাপখানা চালু হল, লন্ডনে রাস্তায় হাগলে কত পাউন্ড জরিমানা হয়, কপিলদেবের দাদুর নাম কী, শান্তিনিকেতনে কোথায় কোথায় মাল কিনতে পাওয়া যায়, হাতিবাগানের শেষ বেবি-ট্যাক্সির ড্রাইভার কে, ক্রিকেট ব্যাটে ঘুণ ধরে না কেন—এরকম নানা প্রশ্ন ও তদনুযায়ী জবাবও মজুত রয়েছে। কিন্তু এই সিরিয়াল নভেলটি-র গত এপিসোডের শেষে ঐ কবিতাটি কার লেখা? অনেক ক্যুইজ মাস্টারও কেলিয়ে পড়বে। এবং শিশুদের প্রশ্নটি করে লাভ নেই। তাদের বাপগুলিও জানে না। তার আগের কোম্পানি হয়তো বা জানত কিন্তু তাদেরও বেশিরভাগ অন্তর্হিত। সেই কবি এখনকার কাব্যকারদের মতো ঢ্যামনামি জানতেন না। তবে দুনিয়ায় হারামির হাট তখনও যে বসেনি এমনটি নয়। না হলে তিনি কোন দুঃখে লিখতে যাবেন,

'একটুকু ভালোবাসা একটি স্নেহের ভাষা,
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই!
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই!
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।'

এঁরই সম্বন্ধে ১৩৫৫ সালে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন, ইনিই 'বাঙ্গালাদেশের শেষ, জাতীয় বাঙ্গালী কবি' এবং তাঁর আশা ছিল কেন, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে 'একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।' বলাই বাহুল্য যে কেউই এসব কথায় বিশ্বাস করে না। সেটা সম্ভবত আগেভাগেই আঁচ করেছিলেন শ্রী কৈলাসচন্দ্র আচার্য। ঐ কবির কাব্যসংকলনের তিনিই ছিলেন প্রকাশক যার ভূমিকা লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঐ ভূমিকাটিতে আর কী কী ছিল জানার বোধহয় আর উপায় নেই কারণ 'প্রকাশকের কথা'-য় কৈলাসবাবু সাফকথা শুনিয়ে দিয়েছেন 'কাগজের অভাবের জন্য বিশেষ অনিচ্ছায় ঐ ভূমিকার অধিকাংশ বাদ দিয়া তাহা মুদ্রিত হইল।' ১৩৫৫ সালে পুঁজিবাদী বাজারে কাগজের ক্রাইসিস হয়েছিল, না হয়নি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক চলবেই। যে কবিকে নিয়ে এত কিছু তাঁর কিন্তু অনেক সহজ সমাধান জানা ছিল,

'গু মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?'

বাঙালি তাঁকে মনে রাখেনি। রাখবেও না। অবশ্য তাতে স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কিছু আসবে যাবে না।

জানা আছে, যে নানা অভিযোগ উঠবে। বেশ বাঁশবেড়ে-গুপ্তিপাড়া রুট খুলেছিল, আচমকা ধরতাইটা ভারিক্কি ধাঁচের হয়ে গেল কেন ঠাকুর? কিন্তু অনাদ্যন্ত চ্যাংড়ামি চলবে এরকম কোনো গ্যারান্টি কি ছিল? লেখকের মার্জি, তার খোলতাই, প্যাঁচ লড়াবার ধান্দা, বিশেষত আওকাৎ যদি ঠিক থাকে তাহলে ফলানা ডিমকা থেকে এক ডাইভে হেথা নয়, হেথা নয় হয়ে যেতেই পারে। আধুনিক আখ্যান খুবই অনেকান্তবাদী। ঐ হা হা হাসি, এই হু হু হাওয়া। এরকমই এখন চলবে। থেকে থেকে লেখকের নাক ডাকবে কারণ সে লেখার স্বপ্নে বিভোর। পাঠক কিন্তু সজাগ। যে প্রান্তরে পাঠানরা যুদ্ধ করেছিল এখন সেখানে পাঁঠা চরছে। এমতাবস্থায় পাঠককে

জেগে থাকতে হবেই। সাহিত্য নামধারী বিশাল জঞ্জালের পাহাড় থেকে একটি কুটোও যেন না হারায়। গেলে রক্ষে নেই। মাত্র কিছুদিন আগে এরকম ছিল না। তখন পাঠক সাহিত্যকর্মকে পাশবালিশ বা বাঁটরটুপি মনে করত। এখন আর তা হওয়ার উপায় নেই। টিকিট কেটে হাতি চড়ার যুগ বিগত। চিরতরেই। এখন টিকিট নয়, খাল কাটাব যুগ। এবং খাল কাটলে যা ঢোকার তা ঢুকবেই। বৃহত্তর, চক্রাকার জিলিপির প্যাঁচের মধ্যে এ হল একটি ছোট্ট পয়জার।

সব সিরিয়ালে না হইলেও বেশ কয়েকটিতে রিক্যাপ বলিযা একটি অংশ থাকে। ইহার ফলে আগে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মর্মসার বুদ্ধিমান দর্শক অচিবেই আত্মসাৎ করিযা ফেলে এবং মাঝে মধ্যে ক্লাস 'বাংক' করিলেও মূল বিষয়টিব অসংখ্য ডালপালার কোনো কুসুম হতেই নেশাচুর ভ্রমরের মতো কদাচ চ্যুত হয় না। সেমতোই এমনও নিশ্চয় ঘটিবে যে কোনো পাঠক হয়তো এই পর্ব হইতে বা ধরা যাক, এই বড় করিয়া ৵ হইতে এই মেট্রো নভেলটি পড়িতে শুরু করিলেন। এমনও প্রাযশই ঘটিয়া থাকে যে তিনি ইহাব পূর্বে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' পাঠ করিয়া এমনই তুবীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন যে 'মাধবীকঙ্কন' তাঁহার নিকট নিতান্তই রাবিশ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি হয়তো নিতান্তই স্নেহবশত বা আধিখ্যেতা করিয়া নভেলটি-ব নাম ভাবিলেন 'বাঙালী জীবন-নাইট'। অবশ্য এসবই মৃতপাঠ কারণ আগেভাগেই বড় করিয়া ৵ আছে। সিরিয়াল নভেলটিতে বিক্যাপ চলিবে? শেষেব সেদিন যদি আজ না হয় তাহলে পাঠক তুমি নিরুত্তর কেন? দিবসেব শেষে তোমাকে কুমিবে নেবে। কিন্তু তাবও দেবি আছে। এত তাড়া কিসেব?

বড়িলাল কেটে পড়ার ঘণ্টাদুয়েক বাদে ফ্যাতাড়ুবাও ভদিব বাড়ি থেকে টলমল পাযে বেবিযে এল। যদিও মাথা যথেষ্ট টরটরে।

—উফ্ এতদিন কী খামকাজটাই না কবে এসেছি!

—যেমন?

—ভাবতুম আমাদেব কেউ ডিঙোতে পারবে না। ফ্যাতাড়ুদের সঙ্গে টক্কব দেনেওযালা কোনো মায়ের লাল পয়দা হয়নি। এখন দেখছি...

—কী দেখচ?

—দেখচি কোথায় বাঘেব রোঁয়া, কোথায় ঝাঁটেব লোম। চোক্তাররাই তাহলে টপ। যাক বাবা, ভাগ্যে দলে ভিড়িয়ে নিল। ভাবো তো, তিনজনের মুণ্ডু কেটে যদি টগবগাছের গোড়ায় ধড়সুদ্ধু পুঁতে দিত কোনো মামা বাঁচাতে পাবত? নো পুলিশ কেস, নো ট্রেস।

—আমার তো বাঁড়া ওদিকে অন্য চিন্তা। লাইফ-টাইফ নিয়ে ডি. এস ঘাবড়ায় না কিন্তু বউ-এর আট মাস চলছে। ছেলেটাকে একবার বাপের খোমাটা অবদি দেখাতে পারব না।

—ঢপ মেরো নাতো, সবার আগে ব্রেক ডাউন করল কে? বল মদনদা।

—মদনদা কী বলবে? ছেলেটার কথা ভেবেই তো কেমন যেন ডুকরে উঠল...

—আহা হা, কে আগে কাঁদল তাতে কী আসে যায়। বাংলা কথা সকলেরই পোঁদে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, হেভি!

—যাইহোক সে ভয়টয় কেটে গেছে অতএব ওসব নিয়ে ফালতু চুদুড়বুদুড় করে কোনো লাভ নেই।

—একদম না।

—এখন ঠাণ্ডা মাথায় বসে আমাদের ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। এতদিন

ফ্যাতাড়ুই ছিল বড় তবফ। শের। কিন্তু চোক্তার দেখা যাচ্ছে সেবের বাবা, পাঁচ পো। গপ্পোটা জানো তো?

—আমি জানি।

—আমি জানি না।

—ঠিক আছে, ডি এস এক ফাঁকে তোমাকে বলে দেবে। মোট কথা, এখন আমাদের চোক্তারেব চামচাগিবি করতে হবে। চোক্তাব লিডাব, আমবা ক্যাডাব। চোক্তাব কাঁঠাল, আমরা লিচু।

—চোক্তাব তুমি এগিযে চল! ফ্যাতাড়ু তোমাব সঙ্গে আচে।

—কুত্তাব বাচ্চাবা কবে ঘেউ ঘেউ।

—চোক্তার কেঁদোবাঘ, ফ্যাতাড়ুবা ফেউ।

—এইসব কথার মধ্যে বানালে?

—জানবে।

—মদনদা, পুরন্দব একটা জিনিস। আব ঝগডা কবব না।

—আব একটা বানালুম। তবে জোবে বলা যাবে না।

—আস্তেই বল না। কযেকটা ঝি বাসন মাজচে। কী কববে শুনলে?

—বাগানে শোভিছে কত

সি পি এম ফুল

তলায ঘাপটি মেবে

বাড়ে তৃণমূল

—ঝিগুলো কিন্তু তাকাচ্ছে।

—তাকাবেই তো। এই পাডায আগে কংগ্রেসেব হেভি বোযাব ছিল। পরে মেজরিটি সি. পি. এম হয়ে গেল। এখন আবাব তৃণমূল বাডছে। যে কোনো টাইমে ক্যালাকেলি লেগে যেতে পাবে।

—তুমি এতসব জাহাজেব খবর জানলে কী কবে?

—আরে বাবা, কবি হলেই তো হল না। চোখকান খুলে বাখতে হয। আমবা হলুম জানবে পলিটিক্যাল পোযেট। ওসব ন্যাকডামো পদ্য-ফদ্য লিখি না। সবসময়ে তবতাজা। জ্যান্ত ট্যাংবা। একবাব কাঁটা মেবে দিলেই সেপটিক। ক্যাপসুল না ঝাডলে উপায় নেই। মাথায ঢুকল?

—ওসব পদ্য-ফদ্য মাথায় ঢুকিযে মরি আব কী। হাজারটা চিন্তা। এক কান দিয়ে শুনলুম। আর এক কান দিয়ে বেবিয়ে গেল। খেল খতম।

—তাই তো হবে। দু-কানের মধ্যে স্রেফ ফাঁকা। ধরবে কীসে? ভগবান যে কতবকমের গাণ্ডু বানিয়েচে।

মদন বুঝল ফের ক্যাচাল শুরু হবে,

—থামো তো! যে যেমন বুঝেছ তাই নিয়ে থাকো। ভদিদা যা যা বলেচে সেগুলো মনে আচে? ডি. এস বলো তো চোক্তাবেব গুষ্টির আদিপুরুষ কে?

—শুনেছিলুম। কিন্তু মনে নেই।

—এই যে কোনো কিছু মন দিয়ে শোনো না, এর ফলে কিন্তু একদিন মোক্ষম ফেঁসে যাবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই শুনলে আর ভুলে মেরে দিলে?

—মাল খেলে এরকম হবেই।

মদন রেগে দাঁত খুলে পকেটে ঢোকায়।

—বাল! আমি আজ অবদি যত মাল খেয়েচি তুমি সাঁতরে পার হতে পারবে না। মাল খেলে এরকম হবেই!

—ঠিক আচে বাবা। খেয়াল কবে শুনিনি, গোক্ষুরি হয়েচে। এবার বলে দাও। আব ভুলব না।

—জানি না বাবা, ভদিদা সব জানতে পারচে কিনা। ভদিদা খচে গেলে কী হবে আন্দাজ আচে?

—আরে বাবা, আচে বলেই তো এই নাও দু কান ধরচি। এমন আর কক্ষুনো করব না।

—ঠিক আচে। পুরন্দর, তোমাব?

—মানে তখন বউদির মাথায় ঐ শ্যাম্পু করা চুল দেখে একটা কবিতা ঘুরছিল তাই.

—বাঃ চমৎকার, একেবারে ভুগিতবলা। ওটা কী শ্যাম্পু মনে আচে?

—না।

—ওটা হল ডগ স্যাম্পু। সায়েবরা কুকুরদেব মাখায়। সাযেবদের কুকুব দেখেচ? ইযা বড বড় সোনালি লোম। ঠাণ্ডাব দেশের কুকুর তো। বরফেব মধ্যে হাগতে বেবোয়।

—তাহলে ভদিদা বউদির জন্যে ঐ স্যাম্পু আনতে গেল কেন? নিজের বউ বলে কতা।

—বলচি। সাধনা কবে কবে বউদির মাথায এমন জট পডে গিযেছিল যে এমনি স্যাম্পুতে হত না। তখন ভদিদা নলেনকে দিয়ে ঐ স্যাম্পু আনাল। গাযে কুকুবের ছবি। কেরোসিনে গোটা মাথা ভিজিয়ে নিল। উকুন-টুকুন সব হাওয়া হযে গেল। জটও আলগা হল। তাবপব ডগ স্যাম্পু। এখন চুল দেখো না! চুল তো নয়, যেন পেখম।

এর পরপর যে ঘটনাটা ঘটল তা বড়ই দুষ্প্রাপ্য। বস্তুত, ইন্টাবনেটেব মশারিব মধ্যেও এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভেবে ফেলাও খুবই সাহসের কাজ বটে। এই ঘটনাটিই তখন তার চেতলার বাড়ির ভাগের ঘরে শুয়ে বড়িলাল স্বপ্নে দেখেছিল। তার পেটে তখন প্রায় টেবিল চেয়ার ওল্টানো হোটেলের কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগানো ঠাণ্ডা কাঁটা কাঁটা ভাত আর পুরো ফুটে যাওয়া, সজারুর মতো দেখতে ফুলকপি ও আলুর ডালনা এবং পাকা মাছের লেজের তেলতেলে ছাল সব ওলটপালট খাচ্ছিল। বড়িলালেব স্বপ্নটিতে সাউন্ড ট্র্যাক এক থাকলেও দৃশ্যটি সাদাকালো।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন, টগবগ টগবগ, সাঁই সপাশ্ সাঁই সপাশ্ ও ক্যাচকোঁচ ক্যাচকোঁচ শব্দ। আচমকা এই সশব্দ দৃশ্যটি ফ্যাতাড়ুদের প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ায় তারা ত্রস্ত নেটিভের মতো অবিকল দক্ষতার সঙ্গে রাস্তাব ধারে ছিটকে সরে যায়। এই হল কলকাতার সেই প্রসিদ্ধ 'হাওয়া খানা' বা ('eat the air')—ঝকমকে পালিশ করা ফিটন গাড়ি। সামনে চোখ বাঁধা আসল ঘোড়া, বেতো খচ্চর নয়। সহিসের মাথায় পেল্লায় পাগড়ি। মনে হবে রাজ্যপালের এডিকং। খোলা ফিটনে বিশাল আকৃতির এক মেমসাহেব বসে। ইনিই তিনি অর্থাৎ যার কথা আগেই বলা আছে সেই বেগম জনসন। চোখ প্যাটপ্যাট কবে রাস্তাব দুধাবই নেকনজরে রাখছেন। উল্টোদিকের সিটে তন্বী দুটি কচি মেম। ঘুমন্ত বড়িলাল ও জাগন্ত ফ্যাতাড়ুদের কানে অদৃশ্য কোনো নম্র প্রেত বলে গেল, 'বাঁ-দিকেরটিকে—চিনলে? উনি মিস স্যান্ডারসন। পাশেই মিস এমা র‍্যাংহাম!' চারজনেই ফটাফট সেলাম ঠোকে। উরি গুরুঃ। ফিটনের পরেই একেবারে ব্রিচেস ও হাতঢোলা সাদা সার্ট পরা দুই সাহেব। স্ব স্ব ঘোড়ায় দুলকি ঢঙে চলেছে। দুই সাহেবই একযোগে মুখ তুলে সিনেমার হোর্ডিং-এ রানি মুখার্জির পাগলা করে দেওয়া ছবিটা একবাব

মেপে নিল। এবং তারপরই দুই কচি মেমেব দিকে। এবারে প্রেত-কণ্ঠের দরকারই হয় না। চারজনেই বুঝে যায় যে, অবধারিতভাবে একজন যেহেতু মিঃ স্লিম্যান সুতরাং অন্যজন মিঃ শেবউড হতে বাধ্য। ১৭৮১ সালে ক্যালকাটায় এরকম একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় (আনন্দবাজাবে নয়)—'To be sold by private sale · Two coffree boys, who play reasonably well on the french horn , about eighteen years of age , belonging to a portuguese padre lately deceased' এই দুটি কাফ্রি যুবককে মিঃ স্লিম্যান ও মিঃ শেবউড খরিদ করিযাছিলেন। এই 'হাওযা খানা'-ব শব্দময় দৃশ্যটি যেমন অতর্কিতে এসেছিল তেমনই ভ্যানিশ করে যায়। এ তো সবে শুরু। এবকমই এখন হতে থাকবে। ১০ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিট ছিল বেগম জনসনেব ঠিকানা। অন্য দুই মিসিবাবাব ঠিকানাও হয়তো একদিন আমবা পেযে যাব।

—কী বুঝলে? ডি এস?

—মেম দুখানা কিন্তু কাঁচা মাল, কিন্তু মুটকিটাকে দেখলে ভয় কবে।

—শোনো, ওদের সম্বন্ধে সমঝে কথা বলবে। একবাব যদি সাযেবদেব কানে ওঠে তাহলে দফাবফা। পুরন্দর?

—আমি ভাবছি এসবই কি চাকতির চক্কব? ভদিদা যে বলল সব তুলকালাম কাণ্ড হবে।

—এ তো কলিব সন্ধে। এখন তো আসব সবে বসতে শুরু কবেচে। যাত্রাপার্টি এসে পৌঁছযনি।

—মানে, জল আরও গড়াবে বলচ?

—অনেক দুব। সোজা কথা হল চোক্তাবি পবোযানা একবাব জারি হযে গেলে আর কেউ থামাতে পাববে না।

স্বপ্ন ফুরোবাব পবে বড়িলালের ঘুম আবও গাঢ় হল। একই স্বপ্নে রানি মুখার্জি, মিস স্যান্ডারসন ও মিস এমা ব্যাংহাম-কে পাওযা যেমন সুখের তেমনই বিবক্তিকর বেগম জনসন ও দুই কামুক সাযেবকে সহ্য করা। এতক্ষণ একটা কগ্ন মাছি হনুমানজীর সামনে বসে নকুলদানা খাচ্ছিল। এবারে কী খেয়ালে সে বড়িলালের নাকে এসে বসল এবং এর ফলে ঘুমের ঘোরেই বড়িলাল পাশ ফিরে শুল। ঘোড়াব রেস চলছে। বড়িলালেব ইতিহাস নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। থাকতেই বা যাবে কেন? কিন্তু এই শিক্ষাপ্রদ ঘুম তাকে ছাড়বে কেন? এবারে আর সাহেব মেম নয়, ঘোড়া। ঘোড়াব জল খাওয়ার চৌবাচ্চা বড়িলাল দেখেছে। এবাবে সে জেনে ফেলল যে, ১৮১০ সালে বর্তমান বেস কোর্সটির পত্তন হলেও, এর আগেই, গার্ডেন রিচ-এব শেষ মাথায় একটি রেস কোর্স ছিল। হিকি'স গেজেটে ১৭৮০ সালেই রেস মিটিং ও রেস বল-এর খবর পাওয়া যায়। বেঙ্গল জকি ক্লাব স্থাপিত হয ১৮০৩ সালে। বলাই বাহুল্য যে জকিগিরিব সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ নিবিড় বলে কোনো সোচ্চার তথ্য পাওয়া যায়নি। যদিও ঘোড়ায় চড়ে হাগতে যাওয়া যে বাঙালির হাতেব পাঁচ তা কে না জানে? বড়িলাল উপুড় হয়ে শুল।

—তবে একটা কথা। ভদিদা যা বলেছে তা কিন্তু কাউকে বলতে যেও না। মানে এমন ভাবটি দেখাবে যে, তুমি কিচ্ছু জানো না।

—খেপেচ? যার ভরসায় থাকা তার নাম মুখে আনা নেই।

—টুঁ শব্দটি না। ভদিদা বলেচে কয়েকদিন আমাদেব ওপর নজর রাখবে। তারপর একটা দুটো করে কাজ দিয়ে শুরু করবে।

—আচ্ছা, ঐ যে কয়েকটা চাকতি যে উড়ে বেরোল সেগুলো এখন কী কবে বেড়াচ্চে

বল তো?

—জানবার যো নেই। সব গোপন খেলা। তবে ঐ যে 'হাওযা খানা' ফিটন গেল, এটা চাকতিরই কারবার।

—ছোট করে একটু আঁচ দিযে গেল। তাই না মদনদা?

—তা তো বটেই। তবে ভদিদা বলেচে এখন দিন তিনচার বেশি কিছু হবে না। ডি এস মালকড়ির খবর কী?

—আজ আমার পকেট সাকুল্যে চাব টাকা।

—পুরন্দব?

—কত লাগবে?

—বেশি না। অন্ধকারটা না জমলে উডতে পারব না। এই ফাঁকে একটু চা-বিস্কুট প্যাঁদাব ভাবছিলুম।

—সে হয়ে যাবে। টাকা বাবো আছে।

—আমি নেই।

—কেন?

—একবার মাল স্টার্ট হয়ে গেলে তারপর চা-ফা খেতে আমাব ঘেন্না কবে। চার্জিং বল তো আচি।

—পকেটে তো চার টাকা। কী চার্জিং করবে। পোড়া ডিজেল?

ডি. এস ওর তোবড়ানো ব্রিফকেসটা বাস্তাব ওপবে বাখল। তাবপব প্যান্ট আব পেটেব তলার মধ্যে হাত গলিযে জাঙিয়াব ভেতব থেকে সরু কবে ভাঁজ কবা একটা একশো টাকাব নোট বের করল। ভাঁজ খুলতে নোটটা হাওয়ায দুলতে লাগল।

—আমার নাম ডি. এস, বুঝেচ? পুজোব বাজারে আমার কাছে অল টাইম একটা দুটো বড় পাত্তি থাকবেই।

—উবি শালাঃ হেভি হারামি তো!

—তবে! কীরকম দিলুম মদনদা। বল!

—শোনো, তুমি যদি জাতক্যাওড়া না হতে, তোমাকে আমি ফ্যাতাড়ু কবতুম?

—নতুন এনার্জি এসে গেল। কেমন যেন ন্যাতাজোবড়া লাগছিল।

—কোথায় যাবে? গাঁজা পার্ক না গরচা?

—কোনোটাতেই না। দুটো ঠেকেই নানা উল্টো পাল্টা পাবলিক। তার চেয়ে ববং টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে চল। জায়গাটা ছড়ানো। ভিডভাট্টাও কম।

—এখানে কিন্তু মালটা সবসময় আসলি দেয় না, জানো তো? জল পাঞ্চ করে।

—ছাড়ো না। আমাব সঙ্গে জালি করা অত সোজা নয়। ওবা লোক চেনে।

ফ্যাতাড়ুরা খুবই আনন্দময বডি ল্যাঙ্গুযেজ সহযোগে টালিগঞ্জগামী একটি ২৯ নম্বর ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে গেল। এবং ট্রামটিও কালবিলম্ব না করে সংরক্ষিত ডাঙা দিয়ে ঝ্যাডব ঝ্যাড়র শব্দ করতে করতে গড়াতে শুরু কবল। এই লাইনের দুপাশেই কিছু ঘাস, কিছু বেঁটে মাপের টোপাকুল গাছ, কিছু অজানা গুল্ম ও অনেক পরিমানে গু-এর পিরামিড দেখা যায়। দুপাশেই পিচ রাস্তা দিয়ে বিস্তব গাড়ি। দূষণের ধোঁয়া সবকিছুতেই এক মায়াময় মলিনতা আনে। আর ঝোড়ো বেযাড়া বাতাস দিলেই দেখা যায় শান্তির সেই সাদা কবুতরের মতোই নানা মাপের পলিব্যাগ ওড়াউড়ি করছে। যারা পথে তাদের বাড়িব দিকে মন। যারা বাড়িতে তাদের টিভির

দিকে। অতএব এসব খুচবো অলৌকিক দৃশ্য দেখার জন্য কাবোবই টাইম নেই। অবশ্য পাগল ও চামচিকেবা এ বিষয়ে খুবই সমঝদার। যে কলকাতাকে ভেঙে, দুমড়ে, ঝলসে, গলিয়ে, থেঁৎলে, খুবলে অজানা এক ধাতু ও সিন্থেটিক পদার্থের বিকট সমাহারে ঢেলে পাল্টানো হচ্ছে সেই কলকাতার আসল বন্ধু হল পাগল ও চামচিকেবা। সেই সঙ্গে কযেকটা রঙ-মাখা মেয়ে, কুকুব, বাদুড, বেড়াল, প্যাঁচা, ইঁদুর, ছুঁচো, আবশোলা, ভিখিবি ও পিঁপডেবাও রয়েছে। মশা, মাছি ও শেষ কযেকটি প্রজাতির শ্বাসরুদ্ধ প্রজাপতি ও মথ এবং চড়াই, শালিখ, কাক, চিলরাও এই দলে যোগ দিল। কেউ যদি বাদ পডে যায তাদের জন্যেও এই জায়গাটা খোলা থাকল বলে ছেদচিহ্ন দেওযা হল না

কাবোর মুখের ওপবে দরজা বন্ধ কবে দেবাব মধ্যে কোনো বাহাদুবি নেই। কেউ শুনুক বা না শুনুক এর জন্যে চেষ্টা একটা চালাতে হবেই। লেখায, না লেখায—সব জায়গায়। সব সময। তবেই না আসতে পাববে। আবে বাবা, সব থেকে যাব গুমোব সেই গনগনে চুল্লির দরজাকেও খুলতে হয়। ফুরসৎ পেলে এসব ভাবনায় তো ফিরে আসাই যায়।

সেই বাতেই টালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাংলার ঠেকে ঢোকবাব গলিতে ছোলাভেজা কেনার সময় ডি এস-এর সঙ্গে একজন গাল তোবডানো, খোঁচ' দাডি আধবুড়ো ড্রাইভারের আলাপ হল। ওব বগলে একটা পাঁইট ছিল। পকেটে একটা প্লাস্টিকেব গেলাশ। মুখে নেভা বিড়ি। দাঁতে কামডানো। ডি এস তাকে বগলদাবা করে বাকি দুজনেব কাছে নিযে এসে বসাল। লোকটা মালে জল মেশায না।

—আমি এখানকাব রেগুলাব খদ্দের। বোজ আসি। একটা পাঁইট খাই। তাবপব কেটে পডি। কোনো ঝুটঝামেলা নেই। পাঁইট ফুবোবে, আমিও হাওয়া। এক ফোঁটাও বেশি খাব না। কমও খাব না।

—সব সময় হিসেব ঠিক থাকে?

—বাখতে হয। সব শিখেছি কাকে দেখে জানেন। আমাব মালিককে দেখে। হেভি ঠাণ্ডা মাথাব লোক। আজ অবধি কোনোদিনও বলবে না, বলাই, দেবি হয়ে যাচ্চে। ঐ গাড়িটাকে ওভারটেক কবো। ওকে চাপো। বরং বলবে যাব বেশি বাপেব বিযেব তাড়া তাকে রাস্তা দিয়ে দে। সত্যিই বলুন। আপনাকেও যেতে হবে। আমাকেও যেতে হবে। এব মধ্যে গাঁড় মাবামারি করে কোনো লাভ আছে?

—এই কথাটাই তো লোকে বুঝতে চায় না।

—একেই জানবেন রাস্তা কম। তারপব নিত্যি নতুন গাড়ি বেরুচ্ছে। আন্‌কা ছোঁড়াগুলো স্টিয়ারিং ধরেই ভাবছে কী হনু রে। আরে বাবা, এর নাম কলকাতা। একানে রংবাজি করেচ কি মরেচ।

পুরন্দর মালের গেলাশে আঙুল ডুবিয়ে একটা পোকা তুলল।

—ভাগ্যে আপনার গেলাশে পড়েনি। নিট মালে কখন সাইজ হয়ে যেত।

—সে ওর যা ভাগ্য তাই হবে। সব কপাল।

—আপনি ভাগ্য-ফাগ্য মানেন?

—আগে মানতুম না। আমার চার বছরের ছেলেটা, আজকে থাকলে জোয়ান হয়ে যেত, বুঝলেন, ডাক্তারের উল্টো ট্রিটমেন্টে মরে গেল। সেই থেকে মানি।

—কী হয়েছিল কী?

—ওর আপনাব একটা খিঁচ ধরত বুঝলেন। মিগি টাইপের। আমাদেব মাতাতে কী যে ভব করল। পাড়ার ডাক্তার ছেড়ে বড ডাক্তার দেখাতে গেলাম। ছেলেটা তখন সদ্য হাম থেকে উঠেচে।

—এখনকার বড় ডাক্তার মানেই হারামি। খালি পয়সা খ্যাঁচার ধান্দা। গবিব ধবো আব বাঁড়া মুরগি বানাও।

—আমাকে অনেকে তাতিয়েছিল। বলল ডাক্তারের সঙ্গে কেস করতে। আমি বললুম কেস করলে আমরা, গরিবরা কোনোদিনও পাবব? কেউ পেরেচে? উকিল, পুলিশ—সব ওদেব হাতের পাঁচ।

—আর কেসে জিতলে কি ছেলে ফিবে পেতেন?

—সেই না কতা। ওর ভাগ্যে যা ছিল হয়েচে। কী করা যাবে?

একটু দূরে একটা ছেলে উবু হয়ে বমি করছে। বমিটা মেঝেতে ঢাল আছে বলে গড়াচ্ছে। বমি টপকে টপকে খদ্দেররা ঢুকছে। বেরোচ্ছে।

—ঠিক আচে ভাই। দেখা হবে। নামটা মনে রাখবেন। বলাই। আমি কখনো মুখ ভুলি না।

বলাই চলে যাবার পরে ডি. এস একটা চারমিনার ধরাল।

—এই দুক্কেব কতা শুনলে কেমন মুড অফ হযে যায়। আমি আব একটা বোতল নিয়ে আসি।

—আবার বেশি নেশা হযে যাবে না তো। তারপর বাসট্রামে লোকে খিস্তি কববে।

—কে খিস্তি করবে? কোন ল্যাওড়া খিস্তি করবে?

ডি. এস বেশ জোরেই চেঁচায়। ফলে আশপাশের লোকজন ওকে দেখতে থাকে।

—কী হচ্ছে কী? লোকজন সব দেখচে। মাল আনবে তো মাল আনো, এর মধ্যে আবাব। ফালতু হুপহাপ আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না।

এইবার ডি. এস বুক পকেট থেকে মাঝে মাঝে দাঁত ভাঙা একটা ময়লা চিকনি বের কবে চুল আঁচড়ে নিতে নিতে টলমল করে দাঁড়ায়। মুখে প্রায় হাসি।

—খিস্তিটা কাকে করলাম সেটা বলতে পাববে?

—পারব।

—কাকে?

—ওই বোকাচোদা ডাক্তারকে।

চাকতির ঘরে তুমুল বোঁ বোঁ-র হট্টিচাল্লি। নানা মাপের চাকতি সারা ঘরে চরকি খাচ্ছে। কয়েকটা ম্যানহোলের সাইজের, তারপর বগিথালা, রেকাবি, সোডার বোতলের ছিপি— ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোল মালের আদলে। তাজ্জব ব্যাপার হল এই বিকট বোম্বাচাকের মধ্যে কিন্তু চাকতি-চাকতি কোনো ধাক্কাধাক্কি বা ট্যাকলিং নেই। কেবল যখন তারা ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করতে করতে খুব কাছে এসে পড়ছে তখন নীলচে ফুলকি উড়ছে। চাকতির ঘুঘুচক্কর এখন যেহেতু বহাল থাকবে অতএব আমরা বরং চাকতির ঘরের সামনে বারান্দায় কী হচ্ছে সেইদিকে ধাবিত হতে পারি। একই দৃশ্যে আবদ্ধ থাকলে চোখে ঝিঁঝি ধরে যেতে পারে এমন বিপদও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বারান্দায় পঁচিশ পাওয়ারের একটি নোংরা ছাতাপড়া ডুম জ্বলছে বলে সবই কেমন ঘোলাটে ও ছত্রাকাছন্ন। গায়ে একটি আরশোলায় ফুটো করা চিম্নসে র‍্যাপার জড়িয়ে ভদি বসে আছে।

পাশেই জবার মালা পবা বেচামণি। মালাটি হল জালি। প্লাস্টিকের জবাফুল, মধ্যে মধ্যে জবির জাঁক। ভদিব সামনে গোটা পাঁচেক শুড়ঢা আব শুড়টি থেকে থেকে ভদিকে স্যালুট করছে এবং তাদেব ক-হাত পেছনে ধুনুচিতে হাতপাখা মাবছে নলেন। ভদি একতরফা তার ভলান্টিযাবদের ডেঁটে যাচ্ছে।

—গত বছর পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীতে আমি কী বলেছিলুম? কী?

—আঁজ্ঞে, সময় হলেই মহাচক্রপালা শুরু হবে।

—আর কী বলেছিলুম?

যে জবাব দিচ্ছিল সে মশা কামডানোব ফলে মাথাব জাযগায় পোঁদ চুলকোয়।

--ঠিক স্মবণে নেই।

—গাণ্ডু হলে থাকবে কী কবে? আমি বলিনি যে, সেইদিন সমাগত প্রায।

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—যা বলব নামতা না কবতে পারলে বাড়ি গিযে লিকে বাখবি। শালা! একটা পদ্য পড়েছিলুম। কেউ বলতে পারবি?

—আঁজ্ঞে পারব।

--তো বল্।

সেই শুড়ঢাটি গলা খাঁকাবি দিয়ে বেডি হয কিন্তু আচমকা বেচামণি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠায ঘাবড়ে যায়।

—ও কিছু না। ভব হচ্ছে তো! এবকম হবে! তুই বলে যা।

—মুণ্ডু মাবেন উঁকি
ফিক্ লো কালো খুকি
জয মহাভয় চাকতিব জয
ধুকপুকি ধুকপুকি

—বাঃ বাঃ তোব হবে। বলে দিলুম তোব হবে।

আনন্দলাড়ুব মধ্যে আনন্দবটিকা
যবন বর্ষশেষ, ঘোব বিভীষিকা।

কী বুঝলি?

—আপনাব শাস্ত্রকথা, আমরা কী কবে বুঝব?

—বুঝবি। আমাকে বোঝাতে হবে না। পবের ইংরেজি মাসের সাত তারিকে কালীপুজো। ওইদিন দুনিয়া বুঝবে। আর চাবদিন পরেই একটু জানান দেবে। নে এবার কেটে পড় তো। একদিকে ভলান্টিয়ার, দিনটা খেল ফ্যাতাড়ু, একন আবার বউ-এর ভর। নকড়া ছকড়া করে দিল।

নকড়া ছকড়া করে দিল। ওরে নলেন। নলেন রে!

পাঠান, পাঁঠা, পাঠক, পাঠ— এইরকমই হবে। যাইহোক, আনন্দলাড়ুর মধ্যে আনন্দবটিকা মানে যে আনন্দবাজারে যাদুকর আনন্দের বিজ্ঞাপন সেটা ক্লিয়ার হল। যবনবর্ষ মানে ১৯৯৯-এর ২৪ অক্টোবরেই আমাদের বলির পাঁঠাটি ঘুরপাক যাচ্ছে। এরপর নভেম্বব, ডিসেম্বর। ঘোর বিভীষিকা। ২৮ তারিখ যে মুণ্ডু-ড্যান্স হয়েছিল তা সকলেই জানে। অতীব সংস্কৃতিবান পাঠক নিশ্চয়ই মুণ্ডু-ড্যান্সকে ক্যান্ডি-ড্যান্সের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। ফেললেই বা কী? যাহা ক্যান্ডি

তাহাই মুণ্ডু। যে কোনো মোমেন্টে বিশৃঙ্খলা বিশালত্ব পেতে পারে। ভদি ভীমনাদে 'বেচামণে!' বলে ডেকে উঠতে পারে। এবার দেখা যাক কালীপুজোয় কী হয়। সাহিত্যেও আজকাল বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ১ বিশেষ জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

ওপারে যেওনা ভাই ফটিংটিং-এর ভয়
তারা তিন মিনষে মাথা কাটা, পা-য় কথা কয়। (চলবে)

৫

(চলবে) বলে যে লেখার এক একটি পক্কড় শেষ হয় তার সঙ্গে তুলনীয় হল অতীব ভয়াবহ ঘাপটি মারা সাবমেরিন। 'কাঙাল মালসাট' নামক সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজটি মাসে একবাব সুনীল ও ঘোলাটে জলরাশি, জেলিফিশ, টাইটানিকের দীর্ঘশ্বাস ও মবণোপম চৌম্বক মাইনের মধ্যে পিঠ দেখায় এবং তারপরই ক্যাপটেন নিমো-র নির্দেশে পুনরায় তলিযে যায়। শুশুকেরাও এরকমই করে যদিও তাদের কোনো পেরিস্কোপ, টর্পেডো ও আক্রমণাত্মক বাসনা থাকে না। এত খোলসা করে বলার টার্গেট একটাই। ডুবোজাহাজ ফুটো হয়ে জল ঢুকে যে কোনো সময কেলো ও ট্র্যাজেডি ঘটে যেতে পারে। এই বিপদ এখন আসন্নপ্রায় কারণ পূর্ববর্তী '(চলবে)'-ব শেষে যে ফটিংটিং-এর ভয় দেখানো হয়েছে তা মোটেই আজগুবি মাল নয। স্রেফ লেখা বা লেখক নয়, এক একটা গোটা সমাজব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য যখনই ফটিংটিং-দেব এলাকায মাজাকি মারতে গেছে তখনই যা ঘটেছে তাকে গন-ফট্ বলা যায়। অতএব সে বিপদ যে থেকে গেল শুধু তাই নয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা। অনেকেই আশা করেছিল যে ছড়া, প্রবাদ, পুরাণকল্প ইত্যাদি মিলিয়ে কিছু একটা হয়তো বা বলা হবে। কেন নায়করা নির্ভয় সীমান্ত পেরিয়ে অজানা বিপদের পথে যাবেই? প্রথমে ঝাড় খাবে, তারপর জ্ঞানী কোনো শুড্ঢা গাণ্ডুব পাঠশালায় কয়েকটা কোচিং নিয়ে ড্রাগন বা রাক্ষসের ব্যবসায় লালবাতি জ্বালাবে এবং মরচে ধরা, ঢপ কোম্পানির ডবল ডানা এরোপ্লেনে কবে চাম্পি একটি মাল নিয়ে ব্যাক করবে। এই ঢ্যামনামির গল্পের রকমফের নানা দেশে চালু আছে। এবং আশু বিলুপ্তির কোনো আভাসও নেই। তবে এ বিষয়ে আমরা কিন্তু ঝেড়ে কাশার দলে নেই। পেরিস্কোপে দেখা যায়,

দিকে দিকে জ্বলছে ধুনি,
ভিড় করেছে জ্ঞানী-গুণী
(পুরন্দরের একটা অনবদ্য কাপলেট)

যা বলার ঐ শালারাই বলবে। চিরদিনই বলে আসছে। আমাদের কাজ হল ওদের খচানো, ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিক সেদিক নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তেরপল চাপা দিয়ে প্যাঁদানো। খেঁটো বাঁশ দিয়ে বেধড়ক ক্যালাও।

কী নির্জীব, কী নির্জীব,
নির্ঘাৎ ওটি বুদ্ধি জীব।
(পুরন্দরের আর একটি)

২৭ অক্টোবর ১৯৯৯ সকাল সাড়ে নটার সময় ভদির উঠোনের কোণে ঝুলন্ত, তলাখোলা বালতির মধ্যে কাকের ঠোঁটে এসে পড়া একটি মান্ধাতার আমলের কাঁটাচামচ নাচানাচি শুরু করাতে ধাতব সংঘাতের আধা সুরেলা শব্দ হতে থাকে এবং বেচামণি ঠাস্ করে একটি ভাঙা

থালা উঠোনে আছড়াতেই ভদি দুড়দাড় করে ছাদ থেকে নেমে এসে ফোন ধরে। বস্তুত পাঠকের পক্ষে এটা হজম করা বেশ কষ্টকরই হবে যে ইন্টারনেট ও সাইবারসেক্সের যুগেও এই টেকনোলজি বেশ বহাল তবিয়তে চালু আছে। এ হল সেই টেলিফোন যা একযুগে বাঙালি শিশুরা বানিয়ে খেলা করত। ভদি প্রাচীন ও জংধবা বেঙ্গল শটি ফুডেব টিনটি কানে লাগায় যা একাধারে মাউথপিস ও রিসিভাব।

ফোনটির অপরপ্রান্ত গেছে পাশেব ফালি, এঁদো জমিটুকু পাব হয়ে তেরচাভাবে অবস্থিত বাড়ির দোতলায়। মধ্যবর্তী ফালি জমিটুকুতে বুনোকচু গিজগিজ করছে এবং তার তলায় চার পাঁচ পুরুষের জঞ্জাল। চোর ছাড়া আর কেউ সেখানে ঢুকতে সাহস পাবে না এবং ঢোকাব পবে চোরও ঘাবড়ে যাবে কারণ গিবগিটি, ব্যাঙ, বিছে ও সব জাতি ও প্রজাতির মশা সেখানে দুর্ভেদ্য জুরাসিক পার্ক তৈবি কবে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। এবই ওপর দিয়ে ডবল তার চলে গেছে। একটি একটু আলগা, অন্যটি টান টান। আলগাটিতে ঠনকালে ফোন বাজে। ও বাড়িতে ঘণ্টা দোলে, এখানে বালতির মধ্যে কাঁটাচামচ। কোনো ঝামেলা নেই। এ বললে ও শুনবে। ও বললে এ। একইসঙ্গে দুটো চলবে না।

যে শব্দটি বা কথা আসে তা খুব স্বাভাবিক নয়, একটু খোনা ধাঁচের, একটু ভূত ভূত ভাব। ভদি বলে,

—কী হঁল আঁবাঁর?

—কিঁছু নাঁ। অঁল ক্লিঁয়াব।

–কাঁল কঁটা গেঁল?

—অ্যাঁঃ

--বঁলচি কাঁল কঁটা গেঁল?

উল্টোদিকের থেকে চারটে টোকাব শব্দ। ভদি ঠিক শুনল কিনা যাচাই করার জন্যে চারটে টোকা দেয়। উল্টোদিক থেকে,

—ছেঁড়ে দিঁলুম।

—আঁচ্চা!

বোজই সকালে ভদির কাছে ক-বালতি মাটি সবল সেই খবরটা এসে যায়। সরখেলের সঙ্গে এরকমই ব্যবস্থা চালু আছে। এই মহতী প্রকল্পটিকে ঘিরে ভদি ও সরখেলেব উচ্চাশার অন্ত নেই। কিন্তু ভদির থেকে থেকেই প্রামাণিকের সেই সাবধানবাণী মনে পড়ে যায়। ও. এন. জি. সি থেকে অনেকদিনই রিটায়ার্ড। কিন্তু একাধারে ভদির ভলান্টিয়াব ও ক্রিটিক। দেড় বছর আগে সাধনোচিত ধামে গমন করলেও প্ল্যানমাফিক স্বপ্নে সাক্ষাৎকার বহাল আছে। মরার পরে ভাষাও বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। আগে প্রতিটি বাক্যেই কয়েক কিলো করে ভক্তি থাকত। এখন বড় তিরিক্ষে ও সিনিক।

—সরখেল বানচোৎ কী করছে?

—যা করার। মাটি সরাচ্ছে।

—বাল সরাচ্চে। টপ সয়েলে আঁচড়াচ্চে। বগল চুলকানোর মতো। তখন কত করে বললাম। যে মাল হবার নয় তাই তুমি সরখেল হইয়ে ছাড়বে।

—ছাড়বইতো! আমার নাম ভদি।

—যদি হয় নিজের নাম পাল্টে ফেলব। অনাদি প্রামাণিক হয়ে যাবে চুদির ভাই পরামাণিক। দু কান কেটে ফেলব। চশমা পরতে পারব না। মরে গেছি তো কী হয়েচে।

—এখনো জার্নাল টার্নাল পড়ি। আপ-টু-ডেট থাকার চেষ্টা করি। সব ছেড়ে দিয়ে, বলা যায় না, হয়তো একটা বিয়ে থা-ই করে বসব। পাগলে কী না করে!

—আজকাল প্রামাণিক বড় অল্পে খচে যাও। মরলে তোমার মতো জ্ঞানী গুণী লোক কেমন থুম্বো মেরে যায়। দেখলেই মনে হয় গুলি খেয়ে ঝিমোচ্চে। কেবল তোমারই দেখচি সব সময় ছটফট ছটফট কেমন কুকুরক্ষ্যাপা ভাব! এ তো ভালো নয়!

—তোমার হিসেব তোমার কাছে। এখানে সব ভেন্ন। আর তোমাদের ওখানে কী হল না হল তাতে আমাদের ভারী বয়েই গেল। স্রেফ ছাগলামি দেখলে টেম্পার চড়ে যায়।

—তার মানে তুমি বলতে চাও আমি আর সরখেল ছাগলামি করছি? বলি যে ঐ সন্ধান কে দিয়েছিল? আমরা কি জানতাম।

—আমি বললাম একটা কথাব কথা, একটা জ্ঞানের কথা। আর অমনি ওনাবা নেচে উঠলেন।

—চোপ! মরে গিয়ে ভেবেচে মাতা কিনে নিয়েচে!

—ওই মাথা কেনার থেকে একটা ডাবেব খোলা কুড়িয়ে নিলেও লাভ আছে।

এই ধরনের বাদানুবাদের মধ্যেই ভদিব গোঁ গোঁ শব্দ ও ভাবভঙ্গি দেখে বেচামণি ধাক্কে ওর ঘুম ভাঙায়।

—অ্যাঃ

—অ্যা আবার কী? পেট গরম হয়েচে। বুঝেচ? পেট গরম।

—অ।

—কী যে কতার ধারা কিছু বুজি না বাবা।

ভদি উত্তর দেয় না। ঘটি থেকে জল গলায় ঢালে। কিছুটা জল হাতে নিয়ে ভুঁড়িতে মাখে। ঘাড়ে, গলায় দেয়। বেচামণি শুয়ে পড়ে।

—কত বলি যে অত মাল খেওনি।

—থামো তো। কী হচ্চে না হচ্চে তা ঐ ঘটে ঢুকবে? প্যাকব্ প্যাকর্ করছে। মাগ মাগের মতো থাকবে।

—ও...ও...কী একেবারে পাটরানি করে রেখেচে আর দুবেলা মাগ্, মাগ্

—তা মাগ্‌কে মাগ্ বলবে না তো কী বলবে?

ঘোর কলির এই অন্ধকারে বেচামণির ফুঁপ্ ফুঁপ্ শোনা যায়। অনুতপ্ত ভদি অন্ধকারে ওপর দিকে হাত বাড়ায়। সেই হাত বেচামণির স্যাম্পু করা চুলরাশির ওপরে বিলি কাটার ধান্দা কবে। বেচামণি নিজের হাতে ভদির হাতটি ধরে সরিয়ে দেয়। হাতের বালা-চুড়ির শব্দ হয়। ভদি কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে। ফুঁপ্ ফুঁপ্। নাক টানার শব্দ করে বেচামণি। ফের ভদির হাত ওপর দিকে বাড়তে থাকে।

অক্টোবর, '৯৯-এর শেষ হপ্তায়—কলকাতায় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু পাবলিক, বিশেষত বাঙালি পাব্লিক আজকাল এত আমোদগেঁড়ে হয়ে পড়েছে যে কোনো কিঁছুই টিভিতে না হলে তাদের নজরে পড়ে না। অতীতে যে মনস্বী বাঙালিরা ছিলেন তাঁদের এক জায়গায় জড়ো করা সহজ নয়। কিন্তু নেতাজী ইনডোর বা সল্টলেক স্টেডিয়ামে তাঁদের একটি জমায়েৎ বানিয়ে 'ব্রজাঙ্গনা'-র দুটি লাইন (পুরন্দরের নয়, মাইকেলের) প্রশ্ন হিসাবে রাখাই যায়।

'কেন এত ফুল তুলিলি সজনি, ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী তারার মালা?'

যাই হোক, যা হবার তা হবেই। এতে ভগবানের থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের

কোনো হাত নেই। একটা আস্ত জাত যখন ভোগে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয তখন তার জন্যে ইনিয়ে বিনিযে কোনো ফায়দা নেই। যাচ্ছে নিমতলায। হাতে সেলফোন। এমন আঁট করে ধরে আচে যে শেষ অবদি ছাড়ানো গেল না। শেষে বাধ্য হযে সেলফোনসমেতই।

এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি হল টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের পেছনেব ফাঁকা জায়গা থেকে যখন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে ঢোকে তখন একটি বিশাল দাঁড়কাক চার নম্বর কামরার ছাদে গুটি হয়ে বসেছিল। একাধিক দিনই এরকম ঘটে। বোঝাই যাচ্ছে যে দাঁডকাকটি ডানাব পরিশ্রম বাঁচাচ্ছে। এবং সে এসপ্ল্যানেড, চাঁদনি ও সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মে নাচানাচিও করেছিল। এই দাঁড়কাকের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। শুধু মেট্রোবেল নয, তাকে ট্রামের ছাদে বসেও এদিক ওদিক ট্রিপ মারতে দেখা গিয়েছিল যদিও কাবোবই নজবে পড়েনি। আগে ভদির বাবাকে কালীঘাট চত্ত্বরেই হিঁযা হুঁয়া ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনো খানকদেব ঘবের চালের ওপরে বসে ঠুকরে ঠুকরে পাঁউরুটি খাচ্ছে বা মাযেব মন্দিবেব পেছনদিকে ভিড়ভাট্টাব ওপবে বসে পাঁঠাবলি দেখছে। একই ট্রেনে চাঁদনি থেকে জালি বার্বি পুতুল নিযে বড়িলাল কালীঘাটে এসে নেমেছে। কিন্তু তার কামরাব ওপরেই যে দণ্ডকাক আসীন তা সে টেবই পায়নি। নানা আড়াল এইভাবে বিভিন্ন চরিত্রকে স্বস্ব ক্ষেত্রে দিকপাল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এরকম আড়ালই বিবিধ প্রস্রাবাগাবে আমবা দেখেছি। অবশ্য এখানেও উঁকি মারামাবি চলে। যারা উঁকি মাবে তাবা যে সকলেই হোমো এমনটিও নয়। এ নিযে ববং পবে কিছু ফাঁদা যেতে পাবে। তখন কিন্তু ভাই কোনো বাখঢাক থাকবে না।

২৭ অক্টোবব ১৯৯৯ বিকেল যখন চলছে, তখনই ভযানক এক দুর্ঘটনাব কবাল গ্রাস থেকে কমবেড আচার্য যেভাবে বেঁচে যান তা আব কেউ না জানলেও কমবেড আচার্য জানেন। সেদিন পার্টি অফিসের দোতলায কোনো ঘবে কেউ ছিল না। এমনটি কমই হয। টেবিলের ওপর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কালো পাথবেব মুণ্ডুটি একদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কমরেড আচার্যের ঝিমুনি ধরেছিল। একে ঠিক ঘুম বলা যায় না। এমনিতেই নানাবিধ ধকল ও পার্টিব মধ্যে কট্টরপন্থী ও উদাবপন্থীদের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধেব জেরে সব নেতাই অল্পবিস্তর নাজেহাল। তার মধ্যে আবার কমরেড আচার্যের অবস্থাটা একটু করুণ সুবে যেন বাঁধা। তার কাবণ এই আভ্যন্তরিক খিঁচ-এ ঠিক কোন সাইড নিলে ঠিক হবে এটা তিনি কিছুতেই হদিশ করতে পারছেন না। ঝিমুনির ঘোর ঘিরে এল। এর পরের ধাপটাই হল ঘুমেব সেই ভাগ যেখানে চোখের তারা বড বেশি নড়াচড়া করে। স্মৃতি সততই সুখের। কমরেড আচার্য দেখলেন যে তাঁর মার্কা মারা সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি নয়, গরম প্যান্ট, ঝোলা ওভারকোট ও মাথায রুশ বনবেড়ালের চামড়ার টুপি পরে তিনি উত্তর কোরিয়ার পিয়ংগিয়ং বিমানবন্দবে দাঁড়িয়ে আছেন। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে। সামনেই কমরেড কিম ইল সুং-এর এক মূর্তি। মিলিটারি টিউনিক পরা। কিন্তু জীবন এতই জটিল দ্বান্দ্বিকতায় পরিপূর্ণ যে কমরেড আচার্য এই অনুপম দৃশ্যটি অর্থাৎ কমরেড কিম ইল সুং-এর নিথর, নির্বাক স্ট্যাচুটির দিকে মনোনিবেশ করে ধ্যানস্থ হতে পারছেন না অথচ সেটাই দরকার ছিল। এটাতে বাদ সাধছে একটি গান যাব রচয়িতা ইন্দরজিৎ সিং তুলসি এবং সুর ববীন্দ্র জৈন-এর। 'চোর মচাযে শোর' ছবিতে কিশোর কুমারের সেই সুপারডুপার হিট,

ঘুঙ্ঘুরু কি তরহ বজতা হী রহা হুঁ ম্যায়ঁ
কভি ইস পগমে কভি উস পগমে...

চটকাটি টুটে যেতে বিস্মিত কমরেড আচার্য দেখলেন যে কমরেড কিম ইল সুং হাওয়া কিন্তু জানলা দিয়ে কিশোরের কণ্ঠস্বরটি আসছে। হায়, ঘুঙুরের কী নিদারুণ যন্ত্রণা। দিল্লিতে

বসে কম্পিউটার ঘাঁটাঘাটি করলে যদি সব কিছু বোঝা যেত তাহলে তো চিন্তাই ছিল না। ফোন বেজে উঠল। বাজুক। না ধরলেই হবে। কিন্তু এই ঝিমুনি! সেটার কী হবে? উপায়ান্তর না দেখে কমরেড আচার্য একটি কিংসাইজ সিগারেট ধরালেন এবং এই সিনথেসিসে উপনীত হলেন যে ভেতরের বারান্দায় একটু লং মার্চ করে নিলে কেমন হয়? এই সিনথেসিস যে আলেয়ার আলোর ভৌতিক আয় আয় ডাক তা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী প্রজ্ঞা কি কখনো মানতে পারে? কখনোই না। এবং যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সবে হাঁটতে শুরু করেছেন, এমন সময়,

—পড়বি! পড়বি!

সতর্কবাণী যখন কানে ঢুকেছে তখন কিন্তু কোলাপুরি চটিতে ধুতি জড়িয়ে কমরেড আচার্য পতন ও মূর্ছার ঠিক আগের সিঁড়িতে। ভাগ্যে সামনের রেলিংটা ছিল। বিপদ কেটে গেছে। বাঁ হাতই বাঁচিয়েছে তাঁকে। সাবাস। কিন্তু কে বলে উঠেছিল,

—পড়বি! পড়বি!

কেউ তো নেই। তবে রা কাড়ল কে? পরিশুদ্ধ বাংলা। যাকে যোগ্য মর্যাদা দেবাব জন্য আজ বাংলা মা-এর কতিপয় দামাল ছেলে উঠেপড়ে লেগেছে। একেবারেই সেই বাংলাতেই, হুবহু, কোনো জর্জিয়ান টান নেই,

—ভেবেছিস ফটো বানিয়ে রেখে দিয়ে পার পেয়ে যাবি?

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে কমরেড আচার্যের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে পাইপেব ধোঁয়ায়।

—কমরেড স্তালিন!

—থাক্। ওসব ন্যাকামি আমি অনেক দেখেছি। ভেবেছ মালটা কিছু বোঝে না। আমি বুঝি না। অ্যাঁঃ আমি বুঝি না, তুই বুঝিস। কালকা যোগী। ঠিক টাইমে হাতে পড়লে তোর এই দোনামোনা ন্যাকড়াপনা ঘুচিয়ে দিতাম।

—সে তো জানি কমরেড।

—ঘেঁচু জানো। আর ফের যদি আমাকে কমরেড বলবি তো এক থাবড়া মারব। বিপ্লব করেছিস? কাকে বলে জানিস?

কমরেড আচার্য মাথা চুলকোন।

—করিস তো শালা ভোট। আর কিছু করতে পারবি বলেও তো মনে হয় না। যেগুলো আলটুফালটু গাঁইগুঁই করছে সেগুলোকে এত তোয়াজ করছিস কেন?

—ঠিক তোয়াজ নয় স্যার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আত্মপক্ষ..

—থামলি কেন, বলে যা—

—মানে স্যার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ওদের আত্মপক্ষ সমর্থনেব জন্য যেখানে দু মাস বরাদ্দ সেখানে তিন মাস...

—কেন? সময় কি মাগনা না ফাউ? আর তুই, ওদের কথা বাদ দে, তোর মনটা কোন দিক? সেটা ঠিক করেছিস?

—আজ্ঞে, আপনিই বলে দিন। কিছু তো ভেবে উঠতে পারছি না।

—আর পেরে দরকার নেই। তোরও ভাগ্যে দেখছি... যাক্ শোন, যা বলি মন দিয়ে। আমার মতে এটা কোনো প্রবলেমই না। কুকুর যেভাবে বমির কাছে ফিরে যায় সেভাবেই ওরা বুর্জোয়া গলতায় গিয়ে ঢুকবে... তুইও কি ওদের দলে ভিড়ে...

—না স্যার যা ভাবছেন তা না... আমি শুধু চাই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...

—আমার কাছে ওসব প্যানপেনে ওজর শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। গণতন্ত্র! হাতি ঘোড়া

তল পেল না, কালকা যোগী উনি এসেছেন গণতন্ত্র মাবাতে, গণতন্ত্র, তবে শুনবি? শুনবি কীভাবে ব্যাটাদেব টিট কবতে হয়? বুকেব পাটা আছে?

--আঁজ্ঞে ইদানীং হার্টটাই থেকে থেকে ধড়ফড় কবে।

—তাই তো করে। করতে করতে এক সময় আব কববে না। খুবই যুক্তিপূর্ণ ও সহজ সমাধান. . হাঃ হাঃ হাঃ কীবকম লাগছে? লৌহ মানবেব হাসি? একনাগাড়ে ক বোতল ভদকা খেতে পাববি?

—ক বোতল কী বলছেন? একটু খেলেই তো

—তোদেব দৌড় আমাব জানা আছে। সাধে কি আব দুনিযা জুড়ে এই হাল? ভুলটার জন্যে এখনও হাত কামড়াই।

—ভুল, মানে আপনাব?

—আমাব না তো কার? অতগুলোকে মাবলুম, নামের লিস্ট আসত। নামের পাশে লিখতাম— নীল পেন্সিলে 'For Execution J St ' আর্মিতে যখন পার্জ চলছে তখন একটা নামেব পাশে শুধু 'The camps' লিখেছিলাম। বুঝলি? অন্য কাজ ঘাড়ে এসে পড়লে লিস্টগুলো যেত মলোটভ, কাগানোভিচ, ভরোশিলভ, শ্চাদেনকো বা মেখলিস-এব কাছে। ওরা ঝুটঝামেলায় না জড়াবাব জন্যে 'For Execution'-ই লিখত। বুঝলি, সে একটা সময ছিল। সেই তালে ইউক্রেনেব মোটকাটাকেও ঝেড়ে দিলে হত।

মানে, নিকিতা খ্রুশ্চভ?

— লেখাপড়া কবেছিস দেখছি। যতটা ছাগল ভেবেছিলাম ততটা নয। অবশ্য বেশি লেখাপড়া কবা ভালো নয়। ট্রটস্কি বা বুখাবিন তো কত পড়েছিল। কোনো লাভ হল? বেশি পড়লে মাথা গুলিযে যায। কিছু একটা কড়া সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মনে হয আ-ও হয অ-ও হয়। এব ফলে সময হাতছাড়া হয। এবং ঐ হাতছাড়া সময়টাকে কাজে লাগিযে প্রতিবিপ্লবী ঘোঁট আবো মুঠো শক্ত কবে ফেলতে পাবে। তাই এখন মনে হয আমাব আবো নির্মম হওয়া উচিত ছিল। আরো। আবো। অথচ আমি ভেবেছিলাম আমাব শত্রুব শেষ না বাখাব নীতিটা সফল হবে।

- -হযনি?

—হলে এই দশা হত? ১৯৩৫ এব ২৪ আগস্ট কী হযেছিল জানিস? পাইপের ধোঁযা ঘুবপাক খায। স্লাভ ভাষায কিছু চিৎকাব। গুলিব শব্দ।

—আজ্ঞে না।

—জিনোভিয়েভ, কামেনেভ আর স্মিরনভকে গুলি করে মারা হয। তখনই স্মিরনভের বউ আর মেয়ে ওলিয়া-কে গ্রেপ্তাব কবা হয়। ১৯৩৭-এ দুজনকেই গুলি করা হয়। ঐ বছরেই জিনোভিযেভের ছেলে স্তেপান রাদোমিস্‌লস্কি-কে গুলি করা হয়। কামেনেভ-কে মারাব কযেকদিনের মধ্যেই তার প্রথম ও দ্বিতীয স্ত্রীকে গুলি করা হয়। ১৯৩৯ সালে কামেনেভের বড় ছেলে আলেকজান্ডারকে গুলি করা হযেছিল। অবশ্য এব আগেই,১৯৩৮-এব ৩০ জানুয়ারি কামেনেভেব আর এক ছেলে ইউবিকে গুলি কবা হযেছিল। ছেলেটার বয়স তখন ১৬ বছর ১১ মাস। কামেনেভের নাতি ভিতালিকে গ্রেপ্তার কবা হয় ১৯৫১ সালে। ওর বয়স তখন ১৯। ২৫ বছরের কারাদণ্ড হয় তার। ছেলেটা ১৯৬৬-তে মাবা যায়। এত মেরেও এত ধরেও পারলাম না। কোথাও একটা নবম হযে পড়েছিলাম। কোথাও একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। যা বললাম এবার বসে বসে ভাব। আলগা দিবি কি মববি। বুঝলি?

—আঁজ্ঞে বুঝেছি।

—যাই হোক, আমি আবার আসব। সামনেব ইতিহাসে অনেক স্তালিন আসবে। স্তালিন

যেমন আসবে তেমন জানবি হিটলার, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, টিটো সব ফের আসবে। তবে সবই ডামি। আসলি মাল আর হবে না।

—কী হবে তাহলে?

—তোর মতো উটকো কতগুলো ভোঁদড় জল ঘোলা করবে। আবার কী হবে?

পাইপের ধোঁয়া কমরেড জে. ভি. স্তালিনের ফটোর কাচের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে শুরু করে। সব চুপচাপ। হাতের কিং সাইজ সিগারেট কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মাথা তো নয়, চাকতি।

কমরেড আচার্য ধীব পায়ে নিজেব ঘরে গিয়ে বসলেন। মাথা ধরেছে। মাথাটাই বোধ হয় একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। ডিপ্রেশন না অ্যাংসাইটি— কী কারণে এমন হচ্ছে?

২৭ অক্টোবর, সন্ধেবেলায় কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে একটি প্রাচীন ৩০ নম্বর ট্রাম ঢুকছিল। তার মাথার সেই দাঁড়কাক বসেছিল। এরপর সে পার্কের দিকে উড়ে যায়।

গোড়ার থেকে যাঁরা সস্নেহ মেহনত সহযোগে 'কাঙাল মালসাট' নামক ডুবোজাহাজটি (এখনই ডুবন্ত বা জাহাজডুবি জাতীয় অমাঙ্গলিক শব্দ ব্যবহার ঠিক হবে না) ফলো কবছেন তাঁরা কেন, ভূভারতে সকলেই জানে যে, ২৮ অক্টোবর সেই খুলি নাচ হয়েছিল (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য)। এরপর সাবমেরিনটি আবার ভুস করে ২১ কার্তিক অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ভেসে উঠবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেছেন। যাঁবা অভব্য বাগাডম্বর পছন্দ কবেন না, খিস্তি শুনলে যাঁদের কানে তালা লাগে তাঁরা স্বচ্ছন্দে এই ঘোরালো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা না কবে একের পর এক মুহ্যমান ও নেয়াপাতি গাধাবোট দেখে যেতে পারেন। তবে ছোট করে দুটো কথা। বেশি রাত অবদি গঙ্গাব ঘাটে বসে না থাকাই ভালো। এবং ২১ কার্তিক অর্থাৎ ৭ নভেম্বর কালী পুজো।

২২ ৬ ৬
১৮ ৪ ৩
১৬ ৪ ৪
২৫ ১০ ৪ ৩ ১ (চলবে)

৬

গত কিস্তিতে বা আগের অধ্যায়ের শ্বাস ওঠার সময় আমরা পর পর চারলাইনে যে রহস্যময় সংখ্যাগুলি সাজিয়ে ছিলাম তার প্রথম তিনটি পাতি লাল উড়ন তুবড়ির এবং শেষেরটি ইলেকট্রিক উড়নের ভাগ। আজকাল মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে যে নিরামিষ কালীপুজো চলছে তা এক অকহতব্য নিগ্রহ। বুড়ীমা-র চকোলেট, বাচ্চু ক্যাপটেন, সাচ্চু ক্যাপটেন, কালীবোম+পটকা +ধানী কলকাত্তাওয়ালীকে, একেই ন্যাঙটো আরও হতশ্রী করে তুলেছে। উড়ন অবশ্য ৬৫ ডেসিবেলের ক্যাচালের আগেই ব্যানড্ হয়েছিল। তারও আগে আমরা নিষিদ্ধ হতে দেখেছি চটপটি, ছুঁচো বাজি, লোকের পিঠে মারার ভুঁই পটকা। এখনো গরিবদের পাড়ায় একটি দুটি মুহ্যমান চকোলেট বা আশার আলো চাগিয়ে তোলা উড়ন দেখা যায়। আতশবাজি কোনো নক্সাল চক্রান্ত নয়। বছরে একবার ধুন্ধুমার বাজি পোড়ালে ধোঁয়ায় নানা অপকারী ও উপকারী কীটপতঙ্গ যেমন শ্যামাপোকা ও মশা, খতম হয়। গন্ধকের ধূম কিছু হিংস্র জীবাণুকে ত্রাসে আক্রান্ত করে।

পরন্তু ঐ একটি দিন বাঙালি যুদ্ধের একটু আঁচ পায়। কিন্তু কিছুই হবার উপায় নেই। যারা ছোটবেলা চাবিকামান দিয়ে হাত পাকিয়েছিল পরে তারা সহজেই পাইপগান ধাতস্থ করে ফেলে। মাইখেকো বাচ্চারা অবদি তুড়ি মেরে ৭২-১১-১১ ভাগে বারুদ বানিয়ে দড়ি বোমা বানাত। এই দিয়ে যার অচেনার ভয় কেটেছে সে তো পরে মলোটভ ককটেল না ঘেঁটে ছাড়বে না। নিদেন পক্ষে পাতি পেটো তো বাঁধবেই। সবাই এখন দাদু নাতি নির্বিশেষে ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছে বা অসীম সাহসে বাপের মালের বোতলে বসিয়ে রকেট ছাড়ছে। এই বাঙালি ভবিষ্যতে ল্যাকটোজেন দিয়ে ভাত মেখে খাবে আর যৌবনে বগলে পাউডাব দিয়ে সরকারি নন্দন চত্বরে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে ঠেক খুঁজবে। অথচ এই বাঙালিই হেভি মারাকু টাইপের ছিল। বাঙালি, স্মরণ করো যে পেলের ব্রেজিলের স্বাধীনতাব লডাইতে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের অঙ্গুলি হেলনে কামান গর্জন, স্মবণ করো সেই নমস্য বাঙালিদেব যাঁরা নেটিভ রাজাদেব জন্য মেশিনগান ও কামান বানাতেন। তুমি কি মউজার পিস্তলের গর্জন বিস্মৃত হয়েছ? লুইস গান, দমদম বুলেট, উইনচেস্টার রিপিটার ইত্যাদি নাম কি তোমাদের হুঙ্কাব ছাড়তে প্রলুব্ধ কবে না? তবে তুমি মাযের ভোগে যাও। বহু জাত যেখানে গেছে। যেখান থেকে কেউই ফেরে না কারণ ভিসা পাওয়া যায় না। অবশ্য এতে কবে নিজেদেব স্পেশাল টাইপের ঢ্যামনা ভাবার কোনো কারণ নেই। আজ যারা বেশি প্যাঁকপ্যাঁক করছে কাল তারাও একই গলতায় যাবে। সেখানে আগে থেকেই ডাইনোসব ও ম্যামথেরা মালা হাতে করে দাঁড়িয়ে বয়েছে। ইতিহাস হল এক ঝকমারি প্রহেলিকা। আগে শুনতাম আরামবাগেব গান্ধী। এখন আরামবাগ বললেই বাঙালি জানে যে কেঁদো কেঁদো রাক্কুসে চিকেনেব কথা বলা হচ্ছে। সেই চিকেনেব একটি ঠ্যাঙ দেখলেই ভয় কববে। ভাগ্যে তাদেব জ্যান্ত দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, বাঙালিব ফুড হ্যাবিট খুবই আগুয়ান। সে এখন বাডিতেই রেঁধে, অবহেলায়, চিকেন মাঞ্চুবিয়ান খায়।

১৯৯৯-এর কালীপুজোয় এবার 'কাঙাল মালসাট' ঢুকবে। এটি বেশ বড়ো স্টেশান। জংশন। তার আগে দুটি টিকিয়াপাড়া মার্কা ছোট স্টেশানে গাড়ি না দাঁড়ালেও বলে রাখা দরকার যে :

(১) কবি পুরন্দর ভাট অবজ্ঞাব গ্লানি আব সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করেছে। ছিটকিনি টানা বন্ধ ঘরেব থেকে বিকট পচা গন্ধ পেয়ে লোকে দরজা ঠেলে দেখে মড়া নয়, মরা ইঁদুর। দেওয়ালে পুরন্দর ভাটের একটি ছবি। মালা পরানো। এবং তলায় সুতো দিয়ে বাঁধা একটি কাগজ যাতে ব্যর্থ কবি পুরন্দর ভাটের ইহজীবনের শেষ কবিতাটি লেখা। লেখাটি দেখলে অবশ্যই জ্ঞানী পাঠকদের এসেনিন ও মায়াকোভস্কিব আত্মহননের আগে লেখা শেষ কবিতাগুলির কথা মনে পড়বে। না মনে পড়লেও ক্ষতি নেই। বক্তব্যটি এই প্রকার।

চুতিয়া পৃথিবী
পুরন্দর ভাট
(১৯৪৮-১৯৯৯)

আমার জীবনে নাই কেন কোনো ড্রামা
তাই দিব আমি কার্পাস ক্ষেতে হামা
আমার জীবনে নাই কেন কোনো ড্রিম
টিকটিকি আমি, পোকা খাই, পাড়ি ডিম
আমার মরণে হয় না তো হেডলাইন
প্রাসাদ গাত্রে মুতিয়া ভাঙিব আইন

আমার মরণে কাঁদিবে না কোনো মেনি
লেডি ক্যানিং-এর নাম থেকে লেডিকেনি
এক পা স্বর্গে, এক পা নরকে, ঝোলা
একটি কামান, দুটি কামানের গোলা।

কবিতাটি পড়ে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় ইস্কুল মাস্টারের সংলাপ :

—কিছু বুঝলেন?

—মারাত্মক।

—মানে?

—অ্যাসটাউন্ডিং ইমেজ সব। অথচ কোনো রেকগনিশন পায়নি। আমি তো নামই শুনিনি।

—পুরন্দর ভাট? নামটা কী? বেঙ্গলি?

—সে বলা যায় না। বিহার বা উড়িষ্যা বর্ডারেরও হতে পারে। বোধহয় ভট্ট থেকে ভাট হয়েছে।

—বাঃ এই তো একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট পাওয়া গেল। ফ্রম ভট্ট টু ভাট।

—কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

—ওসব পোয়েট ফোয়েট মানুষের কিছু বলা যায় না মশাই। হয়ত গঙ্গায় ডাইভ দিযেছে। এতক্ষণে স্যান্ডহেড।

—অসামান্য। কবিতাটি আমি টুকে নেব?

—নিন। বুঝতে পাবছি কেসটা সুইসাইড। কিন্তু কনফার্মড না হওযাতক আমাদেব লিখতে হবে 'মিসিং'।

—বডি পাওযার পবে?

—চুকে গেল। ফাইল ক্লোজড্।

(২) গোড়ার দিক থেকে যারা এই আখ্যানটি স্টাডি করছেন তাঁবা নিশ্চয়ই ভালুকের হাতে নিহত উপেক্ষিত ঔপন্যাসিক মিঃ বি. কে. দাসেব কথা ভুলে যাননি। তিনি তাঁর ডায়রিতে (যা পবে ইঁদুরে খেয়ে নেয়) লিখেছিলেন :

'আমি বড় সাহিত্যিক তাই মাই জব ইজ পাঠককে বানানো ও পরে জবাই কবা। মাই পেন ইজ আ নাইফ, ইফ নট আ সোর্ড। ছোটখাটো যে সব ট্র্যাশ অথরস্ আছে তাবা রিডারদের মশা বানায় এবং পরে সেই মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া হয়ে মরে। আমি অনলি দুইটা নভেল লিখিয়াছি। আর ইহাদের ওটি পেন না পেনিস কে বলিবে? কেবল পয়দা করিতেছে। গড আমাব সহায়। এখন ডেভিল যদি একটু মায়ালু হন তো আই ক্যান শেক দা ওয়ার্ল্ড'।

পাঠককে মুরগি বা মশা বলে মিঃ বি. কে. দাস যে ভালো করেননি তা কে না জানে। আসামের জঙ্গলে আচমকা ধৃত ভালুক শিশুর ক্রন্দন, ধেড়ে ভালুকদের ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ আস্ফালন, মিঃ বি. কে. দাস-এর অন্তিম গোঁ গোঁ আর্তনাদ, ভীত বাঁদরদের চ্যাঁ চ্যাঁ চিৎকার— এই ট্রাজেডি 'হেকটব বধ' হইতে কোনো অংশে কম যায় না।

অরিজিন্যাল টালিগঞ্জ থানার অবস্থা এখন প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার মতো। মাফিয়া, ছেনতাইবাজ, হেরোইন পেডলাব, সাট্টাবাজ, চামড়াচোর (মানে রেপ-এর আসামী) স্মাগলার এবং নতুন গজিয়ে ওঠা লালু ক্রিমিনালদের সঙ্গে রাউডিদের সংখ্যা এমনই কোয়ান্টাম ধাক্কায় বেড়ে চলেছে যে সেসব সামলানো এক থানার কম্মো নয়। ফলে টালিগঞ্জ থানা ভেঙে দু-টুকরো করা হয়েছে। কিন্তু শ্মশান সেই টালিগঞ্জ থানারই আওতায়। বেলগ্রেড যেমন অবশিষ্ট এক ফালি

যুগোশ্লাভিয়াতেই থেকে গেছে। তা হলেও, পুবনো হাতি বলে কথা।

৭ নভেম্বর ১৯৯৯, মা কালীব পূজা। সকাল থেকে নীববে নিরুপদ্রবেই কাটছিল সিভিল সোসাইটিব কালীপুজো। মালের দোকান বন্ধ। প্রত্যেকবারই থাকে। তাতে কার কী ছেঁড়া যায়, কেউ জানে না। কারণ আগের দিন দোকানে দু-তিন মাইল লাইন পড়ে। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল। এশীয় বর্বরতার চিহ্নমাত্র নেই। উপরন্তু পবিশ্রমী ব্ল্যাকাববা বস্তা বস্তা মাল নিযে গিযে স্পেশাল স্টক করে। কলিকাতাব কালীপুজোর আগেকাব রূপটি আমবা যেমন বসঘনভাবে প্রেমাঙ্কুব আতর্থীর 'কালীপুজোর বাত'-এ পাই যে তারপব আর কোনো পাঁচুকেই ভাবা যায না। সবই প্রায় আলগা ঠাসা বসন তুবড়ি যা থেকে থেকে ভ্যাঁস ভ্যাঁস কবে এবং অচিরেই নিঃশেষিত তামাশায় পর্যবসিত হয। কলিব কলকাতায হালফিল সাহিত্য ও বাজি বানানো মোটেব ওপব একই চেহাবা নিযেছে। সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা বাদেও কতই না পদার্থেব যোগান পড়িত। তখন অবোধ শিশুরাও বলিযা দিত লাল তাবা চাহিলে ভূষা কালি ও গন্ধক ছাড়াও পটাস্ ক্লোরস্ ও শুকনা নাইট্রেট অফ স্ট্রান্সিরা লাগিবে। এমনই একটি জায়েন্ট লাল তাবা ক্রেমলিনেব উপবে জ্বলিত। সবুজ তারা চাও? নাইট্রেট অফ ব্যারাইট ও হবিতাল জোগাড় করো। নীল তারা না হইলে মন ভবিতেছে না? কিন্তু ভাই, নিদেনপক্ষ দুই ভরি কাশ্মিরী জাঙ্গাল তো লাগিবেই। অবাক কাণ্ড যে বাজি-বোম ইত্যাদিব সঙ্গে কাশ্মীবেব যোগ সূত্র কী প্রাচীন! ফুলেব মালা, বাতাসা, মতিয়া, লাট্টু, আনাবসী, চন্দ্রমল্লিকা, দাযুদী, হাজবা, গাঁদা, জুঁই, নসবিন— এ সবই নানা ধাঁচেব তুবড়িব ডাক নাম। হায! হায! তখন দাদুগণ বলিত, 'বোমা? এতো ছেলেখেলা। নারিকেলেব ছোট খোলে ছিদ্র কবিয়া বন্দুকেব দানা-বারুদ পুবিবে এবং ঐ ছিদ্রে লম্বা পলিতা দিযা খোলেব চর্তুদিকে উত্তমরূপে পাট জড়াইবে। এই বাজি পুষ্কবিণীতে ফেলা ভালো। স্থলে পোড়াইলে বিপজ্জনক হইতে পাবে।' আজ বাঙালি এইসব শুনিলে ভ্যাবাচ্যাকা মাবিযা যায়। বাঙালি যে কেবল বোম দিযা সাহেব বা স্বজাতি মারিত এমনই নয। দেশ স্বাধীন হইবার পব একটি ভারতীয সেনা অভিযাত্রী দল পিণ্ডারি গ্লেসিযারে যায। সেই দলে ছিলেন ক্যাপটেন শ্রী হেমেন্দ্র চন্দ্র কব, এম-এ। তিনি লিখিযাছেন— 'আমাদেব রাস্তার পাশেই সরযু নদী। পথ চলিতে চলিতে আমাদের হঠাৎ মাছ ধবিবাব সখ হইল। সময অল্প। তাই এক অভিনব উপায় অবলম্বন করা গেল। একটা গ্রেনেড (হাত বোমা) জলে ছুড়িযা ফেলা গেল। অমনি জলের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হইল এবং ছোট বড় প্রচুব মাছ জলের উপব ভাসিযা উঠিল। মাছগুলি সংগ্রহ কবিলাম।' সেই বাঙালি আজ ত্রস্ত বেড়ালেব মতো, ভীত মার্জাবের ন্যায় মাছের বাজারে চক্কব মাবে ও ম্যাও ম্যাও কবিযা ক্রন্দন কবে। বাঙালিব লোম পড়িতেছে, লেজ ভিজা ও গোঁফ যা আছে তাহাতে তা দেওযা সম্ভব নয়।

সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা— দুটোর একটা হবে— থানার ঘোড়েল ইনফর্মাব গগন চূড়ান্ত উত্তেজিত হযে টাকলা ও. সি ব ঘবে ঢুকে পড়ে। মুখে অল্প বামের গন্ধ। হাতে স্তম্ভিত বিড়ি।

—স্যার! স্যার! ওফ্ ল অ্যান্ড অর্ডাবের একেবারে গাঁড় মেরে দিয়েছে স্যার। আপনি ফোর্স নিয়ে না গেলে বানচোৎদের ট্যাকল করা যাবে না।

টাক্‌লা ও. সি ঘপ্ করে টুপিটা পরে নিল।

—কোথায়? কোন শালা?

—ওফ্ শ্মশান পেরোলেই দেখবেন। আদ্যিকালে এপাবে ওপাবে উড়নের ফাইট হতো। হাজারে হাজার, মানে অত না হলেও অন্তত শয়ে শয়ে উড়ন ছুটছে। সে কি খিস্তি আর খিল্লি। মাদি, মদ্দা সব লাফাচ্ছে আব ডিং মেরে মেরে চিল্লোচ্ছে।

—উড়ন? ইউ মিন উড়ন তুবড়ি। মালটা তো ব্যান্ড। পাচ্ছে কোত্থেকে?

—আপনি মাইরি বড় আলফাল বকেন। ব্যান্ড! গিয়ে দেখবেন চলুন ঐ বালের ব্যান্ড কেউ মানছে না। ওপারে জেলেপাড়া ন নম্বর বস্তির সব মাল। এপারে কালীঘাটের যত ক্যাওড়া। সেইসঙ্গে বোম যা ফাটছে। একেবারে ফ্রন্ট বলে মনে হবে স্যার।

—এই। এই, কী যেন নাম তোমার। গাড়ি বের করতে বল তো। আমার জিপ যাবে। সঙ্গে ...ফোর্স নেব?

—আগে আপনি দেখুন। গাদাগাদা লোক। হ্যাজাক জ্বেলে নানা দলও আসছে। কেমন যেন ঠেকচে। গায়ে তেল, হাতে কানচাপা লাঠি। ঠিক বুঝতে পারছি না কেসটা। আচ্ছা স্যার, বামফ্রন্ট গওরমেন্ট ফলটল করেনি তো?

—কি যে বকো না তুমি? কথার একটা ছিরিছাঁদ নেই। মালটাল পেঁদিয়ে কি দেখতে কি দেখেছ।

টালিগঞ্জ থানা থেকে জিপটি বেরিয়ে রাসবিহারীর দিকে ঘুরেই বাঁ দিকের গলতা ফুটো করে ঢুকে গেল। টাকলা ও. সি, খোঁচর ও কনস্টেবল্ কেউই জানল না যে ওপবে কালো জোব্বা পরে মদন ও ডি. এস উড়ে উড়ে ফলো করছে। ডি এস ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদছে।

—শালা পুবন্দরের বাচ্চা। সুইসাইড করে কালীপুজোটা একেবাবে ঝুলিয়ে দিল। কত কী ভেবে বাংলা-র স্টক করলাম। আর... আমি কিন্তু ভেতর থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সুইসাইড অথচ আমরা টের পেলুম না?

—আমার বাবা না আঁচালে বিশ্বাস নেই। ব্যর্থ কবি। সুইসাইড করতেই পাবে। কববি তো বাবা বেগন ফেগন কিছু চোঁ চাঁ মেরে দে। তা না, লাশের কোনো পাত্তা নেই। কি জানি, মাথায় ঢুকচে না।

—অপঘাতে মৃত্যু! আবার ভূতফুৎ যদি হয়ে যায় তো বিপদ। কম খচিয়েছি ওকে? এখন বাদ দাও। নিচে দেখ। উরিঃ শালা। একসঙ্গে কতগুলো উড়ন ছাড়চে দেখেচ?

—এঁদো গঙ্গায় রিফ্লেকশন হয়ে আরো বেশি দেখাচ্ছে। বোম কালী।

ডি. এস এবং মদনের চেয়ে অনেক হায়ার অল্টিচুডে গোয়েন্দা উপগ্রহের মতো উড়ছিল বিকট সেই ভদির বাবা দাঁড়কাক। এবং সেও একা ছিল না।

—ডি. এস, আমাদের ভদিদা বলেচে ছাদে বসে সবটা ওয়াচ করতে। কিন্তু সব ছাদে তো লোক।

—বরং আমরা ঐ ঘোড়ানিম গাছটায় গিয়ে বসি। ওখান থেকে বিস্তর দূর অবদি দেখা যাবে।

—প্ল্যানটা মন্দ বাতলাওনি। এদিকটাও ক্লিয়ার। ওপরটাও। এদিক ওদিক দুদিক দেখে চুমুক মারো দুধের বাটি।

টাকলা ও. সি জিপ থেকে নামতেই অভ্যর্থনা জানাতে যারা দল বেঁধে এগিয়ে আসে তাদের হেডলাইটে দেখে ফিসফিস করে ইনফর্মার বলে,

—এদের ঘাঁটাবেন না স্যার।

—কেন! আর্মড?

—না স্যার, এরা কেউ মানুষ নয়। ভূত। এরা শ্মশানের রংবাজ ছিল। কবে মরে গেচে।

—বল কি ভায়া?

—হ্যাঁ নক্সাল আমলে অনেকে রিটায়ার্ড।

—আসুন স্যার! আসুন! সব কিছু একেবারে শান্তিতে চলছে। কোনো ঝুট ঝামেলা নেই।

ইনফর্মার কানে কানে বলে চলে,

—ওদেব পেছনে সব বেপাড়ার মস্তান। আজ ওদের গেস্ট। জগা, ভানু, মংলা, ভুতনি, টালি, লন্ডন আর আব ঐ লম্বা কাবলেটা কে জানেন?

টাকলা ও.সি বেজায ভয় পেয়ে গেছে।

—ও হল সাব মিনা পেশোয়ারি। দাঙ্গাব সময়ে মার্ডার হয়েছিল।

মাটি কাঁপিয়ে চকোলেট ও দোদমা ফাটে। একটা বড হাউই আকাশে উঠে গিয়ে বুম করে ফেটে নেতাজির মুখ হয়ে গেল।

—এসব বাজি আব দেখবেন না স্যার। চিনা বাজারে অর্ডার দিতে হয। আসুন স্যার।

এব মধ্যেই কাচের গাডি কবে একটা বডি এল। ও. সি ঘামছে।

--মড়াটাও ভূত নাকি?

—হতে পাবে স্যার। সবই হতে পাবে। আপনি কোনো ট্যা ফুঁ করবেন না।

—পাগল নাকি। খেযে দেয়ে কাজ নেই আমার।

গঙ্গাব দুপাড়ে বস্তা বস্তা উড়ন। এপাব ওপার চার্জ হচ্ছে। একদিক থেকে অ্যাটাক কমে গেলেই উল্টোদিক থেকে বহুস্ববে 'দুয়ো! দুয়ো!' রব উঠছে। উড়ন কখনো ছোঁড়ার দৌলতে ব্যাংবাজির মতো জলে বাউন্স করে ওপাবে ধাওযা করছে। মাঝে মধ্যে একটা আধটা পটাশ বা ইলেকট্রিক ঝড়েব উড়ন, বাতকে দিন কবে দিচ্ছে। সেই শৈল্পিক আভায় দীন ও আনন্দময় ভূতগুলিকে স্পষ্টতর দেখায। বেশিরভাগই খালি গা ও গামছা পবা। এদেবই বাড়ির মেয়ে ভূতেবা অক্লান্ত পবিশ্রম কবে মশলা ঝেড়েছে, গুঁড়িযেছে, ছেঁকেছে, বোদে দিয়েছে। ভূত শিশুরা লাল উডনের 'সিটি' খোল ও ইলেকট্রিক উড়নেব 'মতিয়া' খোলগুলো ছোট ছোট আঙুলে মশলা দিয়ে ভবেছে যদিও ঠাসাব কাজটা সিনিয়ব ভূতদের সাহায্য ছাড়া হয় না। অবশ্য কলকাতাব লোকেদেব এটা জানা দবকাব যে কালীপুজোর পবদিন ভোরে যে শীর্ণ শিশুরা আধপোড়া বা নিভে যাওযা বাজি কুডোতে বেরোয় তাবা ভূত নয় বরং ছোট সাইজের জ্যান্ত মানুষ। ছেঁড়া প্যান্ট দিয়ে নুনু বা পোঁদ দেখা গেলেও তাবা লজ্জা পায় না। ঐ আধা-ন্যাংটো হাড় জিরজিরে শিশুদেব প্রতি 'কাঙাল মালসাট' এব উপহাব।

সোরা	গন্ধক	কয়লা
১০	৩॥	৩।
১০	২	৪
১৮	৩	৩
১৬	২॥	২
১৫	২	২
১৫	২	৩

ওপরের এই ভাগগুলো হল বন্দুকের বারুদের। এ বিষয়ে আর যা যা করণীয় তা ঠিক সাহিত্যের আওতায় পড়ে না।

হ্যাজাকের আলোয় লাঠির বোঁ বোঁ ঘুরণ ও ঠকাঠক সংঘর্ষ। তৎসহ লেঠেলদের লম্ফ ঝম্প ও সিংহনাদ।

টাকলা ও. সি-র কানে এবার অদৃশ্য ভৌতিক রেডিও বাজতে থাকে— 'এরা হচ্ছে সব বাঙালি লাঠিয়াল— নানা আখড়ায় এবা শিক্ষা পেয়েছে। যোগীন্দ্র চন্দ্র, হরিমোহন, কৃষ্ণলাল,

নারায়ণচন্দ্র, মতিলাল আর প্রিয়লাল বসুব আখড়াগুলোই আদি। ঐ যারা পাখসাট মারতে মারতে আসছে ওরা সব নতুন নতুন আখড়ায় শিখেছে। নুটুবিহারী দাস, গোপাল চন্দ্র প্রামাণিক, পাপড়ি আব্দুল, ডেঙো খলিফা, পচা খলিফা— কত নতুন নতুন আখড়া। ঐ ওই তো প্রফেসাব এন. সি বসাক। ওঁর বুকের উপরে ১০২৬ পাউন্ডেব একটা পাথর রেখে লোহাব হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হয। ঐ মহিলা হলেন টুকুরানি—বাববেল তোলায ওস্তাদ, তিরিশটা লোক বসা গরুব গাড়ি বুকেব উপরে চালায়।' একটি চকোলেট বোমা এসে টাকলা ও. সি-ব পাযেব কাছে ফাটে ফলে ও.সি তিড়িং করে লাফিযে ওঠে।

—ঘাবড়াবেন না স্যার। ছেলে ছোকবার কাণ্ড। পুজোগণ্ডার দিন বলে কতা, আসুন, আমাদেব বাঙ্গাজবা কম্পিটিশনটা একটু দেখে যান। সবে শুরু হযেচে।

—রাঙাজবা কম্পিটিশন, মানে? কালীপুজোয আবাব ফুলেবও কম্পিটিশন বাঃ বাঃ।

এবারে ইনফর্মাব গগন অ্যাকটিভ হয়। এবং তাব ব্যাখ্যাব সঙ্গে হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায দেয় আদি কলকাতার গুণ্ডারা।

—না, না, এটা ফুলেব ব্যাপাব নয়। বলচি। একটা বড় ড্রাম থাকে। বুঝলেন। বড, গোল, কালো ড্রাম। ওতে যে যা মাল আনবে সব ঢালা হয়।

—ককটেল?

—শুনুন না। ককটেলেব বাবা। স্কচ, বাংলা, চোলাই, ব্র্যান্ডি, রাম, ভদকা, জিন, ওযাইন— সব এক জায়গায। ভবে গেলে একটা ববাবেব টিউব ডুবিযে দেওয়া হয। একটা স্কেল লাগানো থাকে। তাব গাযে আলতো করে ঠেকিযে একটা বাঙা জবা ভাসানো থাকে।

—তাবপব?

—এবার ঐ রবারের টিউব দিযে একেবাবে টেনে বাঙাজাবা কে বেশি নামাতে পারে সেটা স্কেলে মাপা হয়। এবারে বুঝলেন?

—বুঝলাম।

—অবশ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, লাস্ট সব ওখানেই গড়াগড়ি যায। অতবকম মালেব মিশেল। বুঝতেই পারছেন। আমি কখনো টেস্ট কবিনি তবে শুনেচি হেভি ধক্। তাবড়, তাবড মালখোরকেও ঝট করে ফেলে দেবে।

—চলুন স্যাব। একটু না হয় প্রসাদ করে দেবেন। শ্মশানকালী বলে কতা।

—না, না, আমি ওসব খাই টাই না। আপনারা কমপিট করুন। আমি না হয় হাততালি দেব।

—সেকি হয়। আপনি না হয় স্যার আলাদা করে একটু হুইস্কি খান। জাহাজী মাল। এখনো ক্রেট খোলা হয়নি। আর সেই সঙ্গে একটু কষা মাংস। না বললে শুনব না স্যার। আগে স্যার কত মান্যগন্য লোক আসতেন। ওঃ কী যুগ ছিল। গোপালদা এলে তো মেয়েরা উলু দিত।

—গোপালদা, মানে?

—গোপাল পাঁঠার নাম শোনেননি স্যার? তারপর আপনাব গিয়ে রাম চাটুজ্জ্যে!

—আরে, শুনব না কেন। কে না শুনেছে? কী গগন, তুমি কী বলো? এনারা এত করে বলচেন।

—তা তো বটেই! তা তো বটেই!

—তাহলে দুপাত্তর টেনে ব্যাক করা যাক। রিফিউজ করলে খারাপ দেখাবে।

—কারেক্ট ডিসিশনটা নিয়েচেন স্যার। ওনলি দুপাত্তর। আপনি যান স্যার। আমরা বরং

এখেনে অপেক্ষা করি।

—সেও কি হয়? মায়েব পুজোয় আপনাবা সব স্যারেব সঙ্গে এসেচেন। সবাই হলেন অতিথি।

থানায় যখন জিপ ফিবল তখন বাত সাড়ে এগাবোটা। সকলেই বেশ টঙ্গুর।

—তাহলে গগন, শেষে ভূতের হাতে মাল খাইযে ছাডলে। কুঁক্। মাংসটায বড় ঝাল দিয়ে ফেলেচে। কুঁক্। ভেরি হট!

—তবে মালটা কিন্তু সলিড।

—লেবেলটা পড়েছিলে? কুঁক্।

—হ্যাঁ স্যাব। হোযাইট অ্যান্ড ম্যাকে।

—এসব যে সে মাল নয বুঝলে? আসলি স্কচ। এক একটা ঝবনাব জল এক একটা কোম্পানিব হুইস্কিতে, বুঝলে? স্কটল্যান্ড। স্কচ। আবে দূব, নামটা গুলিয়ে গেল।

—হোযাইট অ্যান্ড ম্যাকে স্যার।

—থ্যাংক ইউ। কুঁক। কত ভালো ভূত বলো তো। মাল খাইযে কী আপ্যায়ন। অথচ ইচ্ছে কবলেই ক্যালাতে পাবত। কাবো বাপ ছিল না বাঁচায।

—ঠিক বলেচেন স্যার।

—তবে ভূতের হাতে মাল খাওয়ার কেসটা না জানাজানি হলেই ভালো, বুঝলে? বদনাম হয়ে যাবে।

--আমি তো এই খিল বন্ধ কবলুম কিন্তু ঐ শালাবা মানে কনস্টেবল

—ধ্যাৎ, এমনিতেই বুদ্ধি কম। তা না হলে দুনিযায এত কাজ থাকতে কনস্টেবল হয়? যে বেটে মাল পেঁদিয়েচে তাতে কাল কিস্যু মনে থাকবে না। কুঁক্।

-স্যাব, একটা কতা বলব।

—কী কতা?

-কেমন স্যাব ভয ভয কবচে।

—মা কালীব নাম কবে লেটে যাও। আমরা তো আব ভূতেব হাট বসাইনি। কুঁক্।

সবাবই অলক্ষ্যে বড়িলাল একটা বকে বসে একটা একটা কবে মুড়ি-লজেন্স খাচ্ছিল। এবাব সে বাড়িব দিকে পা বাড়াল। ডি. এস আব মদন হঠাৎ দেখল সব ভোঁ ভাঁ। জিপ যেই গেল অমনি ফুশ্ করে সব ভ্যানিশ! টিকে পচা, কেলে পচা, লেঠেল, প্রোফেসার বসাক সব হাওয়া। আকাশে যুদ্ধ বিমানের শব্দ। দুজনেই ওপবে তাকাল। গোটা চাবেক আলোকিত চাকতি উড়তে উডতে খেলা করছে। এই চাকতিরই বাহারী নাম ইউ. এফ. ও বা আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।

ভদি বারান্দায় বসেছিল। ডি. এস আর মদন উঠোনে নেমে মরা ডুম আলোয় ঝিম মারা বারান্দায় উঠল। নলেন স্ট্র দিয়ে চুক চুক করে ফ্রুটি খাচ্ছে। ভদি মাল সাজিয়ে বসেছে। পাশে বেচামণি গুটিগুটি মেবে ঘুমোচ্ছে। উঠোনে একটি বেড়াল বসে।

—কেমন জমেছিল?

—জব্বর। টাকলা ও. সি পুরো ধাঁ হয়ে গেছে।

—হুঁ হুঁ বাবা। বুঝবে। ধীরে ধীরে বুঝবে। এই মালটা কী জানো?

—ফরেন!

—না। এটা হল গোয়ার ফেনি। আজই হাতে এল।

ভদি ঢালে। হঠাৎ বেড়ালটা দুদ্দাড কবে পালায় কারণ বিশাল দাঁড়কাক নেমে আসে।

—আমার জন্যেও ঢাল্। বাটিতে।

ভদি নলেনকে বলে,

—যা, বাবার বাটিটা নিয়ে আয়। আপনার ডানার বাত কেমন আছে বাবা? তেলটাতে কাজ হল?

—বাল হয়েচে। যেমন হারামি তুই তেমন তোর তেল। আব একটা গেলাসেও ঢাল।

—কে আসবেন বাবা?

—আসবেন টাসবেন না। এসে ওপবে ঘাপটি মেরে বসে আছে' ওরে। ঢের হয়েচে। এবার নেমে আয়।

হুস করে যে নেমে আসে তার নাম কবি পুরন্দর ভাট। মুখে একগাল হাসি। ডি এস ভয় পেয়ে মদনকে জাপটে ধরে।

—তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল। সুইসাইড নোট দিয়ে কেটে পড়লাম। এবারে বুঝুক শালাবা। আমার হল এই টেকনিক। কয়েকদিন এক ঠেকে কাটাও। তারপর সুইসাইড নোট ঠেকিয়ে দিয়ে কেটে পড়।

—কিন্তু পুলিশ তো ছাড়বে না। ধবলে ফ্রড কেসে ফেলে দেবে।

—ছিঁচকে চোব ধরতে গেলে যাদেব লাল সুতো বেবিয়ে পডে তারা ধরবে আমাকে? আই অ্যাম পোয়েট পুরন্দর ভোট। এই জানবে। ভদিদা তোমাকে আমি আগেই সবটা বলে রেখেছিলুম।

—হ্যাঁ, আমি কেসটা জানতাম।

বেচামণি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু কবে।

—ওঁ নমঃ কট বিকট ঘোররূপিণী স্বাহা।

ওঁ বক্র কিরণে শিরে বক্ষ ভয়ে মাযা

হ্যা মৃতা স্বাহা

ওঁ সর্ব্বলোক বশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটে ঝাপটে বউমাকে হাওয়া কবে।

ভদি রাগি মুখ করে খপ্ করে এক গেলাস মেরে দেয়।

—মাগির গলায় একদিন পা তুলে দেব। এই বলে দিলাম। নয়ত শাবলের এক বাড়িতে মাথা ফাঁক।

ডানার হাওয়া পেয়ে আনন্দিত বেচামণি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ঘুমের মধ্যেই। ভদির বাবা খচে যায়। খ্যাঁচম্যাঁচ করে নখ ঠোঁট নাড়ে। চোখদুটো টর্চের মতো।

—ফের বউমার নামে একটা কথা বললে কিন্তু আমি আর চুপ করে থাকব না। অন্যায় করবি আবার চোপাও চালাবি! নলেন বানচোৎ সব জানে। জেনে চোদনা সেজে থাকে। দেব, দেব ফ্যাতাড়ুদের সামনে হাতে হাঁড়ি ভেঙে?

—বাবা! আপনি পরিবারের হেড। দাঁড়কাক হলেও। আপনি সব ফ্যামিলি সিক্রেট ফাঁস করে দেবেন?

—বেশি তেড়ি বেড়ি করলেই দেব।

হঠাৎ নলেন চেঁচিয়ে ওঠে,

—ওই দ্যাখো!

বেচামণিও ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে ওঠে।

—কী হযেচে? বলবে তো?

কেউই জবাব দেয় না। সবাই যেদিকে তাকিয়ে বেচামণিও সেইদিকে দেখতে থাকে।

হাউইটি উঠে অনেক ওপরে গেল। তারপব ফুটফাট ভুটভাট কবে ফাটতে ফাটতে একটা লালচে কাস্তে হাতুড়ির চেহারা নিল। তারপর ধীবে ধীবে নামতে লাগল। (চলবে)

৭

পর্বে পর্বে চোক্তার ও ফ্যাতাড়ুদেব মধ্যমণি বানিয়ে এই যে গেঁতো মালগাড়ি চলেছে তা পাঠকদেব মধ্যে, বলাই বাহুল্য, বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি কবেছে। এ বিষয়ে কিছু বলার আছে এবং বলা হবেই। কিন্তু তার আগে কিছু না বলা কথা ট্র্যাজিক অবলার মতো নির্বাক থেকে বাব বার সেমিজে চোখ মুছুক এমনটি নিশ্চয়ই হওয়া বাঞ্ছিত নয়। বাঞ্ছতিত তো নেভার-ই নয়।

হাউই আকাশে উঠে কাস্তে হাতুড়ি হয়ে গেল এবং কক্ষপথে চিবতবে প্রোথিত না হয়ে ভস্মাকারে স্থাপিত হওয়ার জন্যে ধরাধামে নেমে এল— এ কাণ্ড অনেকেই মেনে নেবে না। কবুল কবা ভালো যে, গত পর্বে একটু 'তাও' দর্শন ঢুকে পড়েছিল— যা কিছু ওঠে তা নামে এবং যাহা কিছু নামে তাহা উঠে। সোভিযেত ইউনিযনের কমিউনিস্ট পার্টি যদি একটি ধানি পটকাও না ফাটিয়ে (যদিও এখানে কলকাতা হাইকোর্টের নিয়ম মানা হয় বলে কোনো পাকা খবব নেই) গোটা দেশটাকে মাফিয়া ও মাগি সাপ্লাযারদের হাতে তুলে দিতে পাবে তাহলে অসম্ভব বলে কিছু থাকল কি? এ মামলায় আর ফুট কাটতে আমাদেব বয়ে গেছে। বেচামণি! বেচারি বেচামণি! ঘুমের মধ্যে ডগ স্যাম্পুতে চুল খোলতাই বেচামণি যে মন্ত্র বলে উঠেছিল এবং যা শুনে ভদি খচে যায় এবং দাঁড়কাক বাবার কাছে থ্রেট খায় তা হল বশীকরণ মন্ত্র। বেচামণির মধ্যে নিবন্তর এই ভয় হিডেন অ্যাজেন্ডা-ব মতো কাজ কবে চলে যে ভদি তার ভক্তদের মধ্যে কয়েকটি ফিমেলকে হুমা করার ধান্দায় আছে। সন্দেহটি অমূলক নয়। অজানা তো নয়ই। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভদি জবাব কবতে পারে যে বেচামণিকেও সে ঝাড়ির টার্গেট হতে দেখেছে। নলেন হয়তো তাতে সায়ও দেবে। কিন্তু এই বিবাদে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চলবে না। মাগি-মন্দার কারবারে আদ্যিকাল থেকেই এই ঢং। ঠাকুর দেবতারাও এই লাইনে যথেষ্ট বলশালী। এসব চলবেই এবং এর রকমফের নিয়ে আধবুড়ো কিছু গাণ্ডু শারদীয় কত কী-তে আধলা নামাবে এবং বাঙালি পাঠকরা মলাঙ্গা লেন বা মঙ্গোলিয়া, যেখানেই থাকুক না কেন সেগুলি পেড়ে ফেলবে। পড়ে তো ফেলেই। এই অসুখের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ট্রিটমেন্ট হল হনুমানের বাচ্চা। কিন্তু সেখানেও ফ্যাকড়া। পশুপ্রেমীরা হাঁউ হাঁউ করে উঠবে। নিরপরাধ, ঐতিহ্যবাহী, রামভক্ত হনুমানের বাচ্চাদের আপনারা কোথায় পাঠাচ্ছেন! জায়গাটা খাঁচা হলেও বা একটা কথা ছিল!

যাই হোক 'কাঙাল মালসাট', ইতিমধ্যেই, মানে, ধারাবাহিক পর্যায়েই, অর্থাৎ, গ্রন্থাকারে যন্ত্রস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াতে ঢুকে পড়ার আগেই, ফিডব্যাক পেতে শুরু করেছে যার কিছু নমুনা টেস্ট করা যেতে পারে। নাম, ঠিকানা, গুহ্য রাখা হল।

১। ...চোক্তার ফোক্তার নিয়ে এই কাঁচড়াবাজি আর সহ্য করা যাচ্ছে না। 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য'— কবে দেখতে পাব? ...কলম না বকলম ...গর্দভেব সন্দর্ভ।

২। লেখা স্মার্ট কিন্তু মার্কসীয় freedom from এর ঘেরাটোপেই খাবি খাচ্ছে, freedom to নিয়ে সেই ভাবনাচিন্তা কোথায় যা আমরা পশ্চিমের অধুনা আখ্যানে .

৩। . .চাম্পি! পারি না! . .ঘ্যাম হচ্ছে। একটাই অনুরোধ—সহসা, কয়টাস্ ইন্টেরেপটাস্-এর মতো থামিয়ে দেবেন না। অথবা যেমন শীঘ্রপতন ঘটে যায়।...

৪। . .মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক শোধনবাদী গাঁটছাড়া-র দালালি করে হাততালি কেনাব এক ঘৃণ্য চেষ্টা .

অবশ্য কেউ যদি বলেন যে এবকম কোনো চিঠি কেউ লেখেনি, পুরোটাই জালি কেস তাহলেও কিছু বলার নেই। সবই হতে পারে। অনন্ত সম্ভাবনা যুক্ত হযে বযেছে অপাব রহস্যের সঙ্গে যা আবার অজানার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে কালো ছাতা মাথায়—কোথায়? সবটা বলা যাবে না। আপাতত বেঙ্গল ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের খোদকর্তার দপ্তবে।

উপরোক্ত সংস্থাটিকে অধিক বুদ্ধিমানেরা যেন নিম্নোক্ত সংস্থাটির সঙ্গে গুলিযে না ফেলেন –WEST BENGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (A Govt of West Bengal Enterprise) 5, Council House Street, Calcutta- 700 001 Phone . 91-33-2105361-65 Fax . 91-33-2483737 E-mail wbidc@vsnl.com, Internet www.wbidc com.

ফেললেই কিন্তু ক্যাচাল হযে যেতে পাবে। সকলেই জানে এবং বিশেষত দেশ-বিদেশের শিল্পপতিবা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নতুন জোযাব আসছে। এবং এতে আড্ডাব গুরুত্ব অপবিসীম।

আড্ডা বলতে আমরা যা বুঝি এটা কিন্তু তা নয়। এখানে গ্যাঁজানো বা গজালি কবাব কোনো স্কোপ নেই। এই আড্ডা হল ADDA, আসানসোল প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন এবং দুর্গাপুব ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এক হয়ে তৈবি হযেছে আড্ডা বা ADDA যা হল আমাদেব অর্থাৎ ভারতের রুর। হাওড়া যেমন ভারতেব শেফিল্ড। সুন্দরবন যেমন ভাবতের আফ্রিকা। দিল্লি যেমন ভাবতেব লন্ডন।

আমাদের একান্ত পরিচিত বড়িলাল একবার তার বোনের দ্যাওরেব বউ-এব বাপের শ্রাদ্ধ খেতে দুর্গাপুর গিয়েছিল। সেখানে হবি তো তখন WBIDC-র এক দারুণ মিটিং ছিল। বড়িলাল বাপের জন্মে যা আর দেখবে না তাই দেখল। কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে সব হোমবা চোমবা ও শিল্পপতিরা স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ হাজির। দুর্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি কনটেসা গাড়ি দাঁড়িয়ে যেন সেও ট্রেনে উঠবে। চেয়ারম্যান সাহেব ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেসায় চেপে বসলেন এবং কনটেসা রওনা দিল। বড়িলাল তখনই অনুভব করল যে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ গোটা দুনিয়াব পুঁটকি মেরে দেবে। Making things happen—এই স্লোগান নির্দোষ বাতাকর্মের মতো ফাঁকা আওয়াজ নয়।

ডিসেম্বর ৯৯ এর শেষ পাদে যেন বা হাওয়া একটু ঠাণ্ডাটে হয়ে উঠেই থাকবে কারণ তা না হলে বেঙ্গল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের সামনে বেলা এগারোটা নাগাদ যে ট্যাক্সিটা এসে থামবে তা থেকে কোট প্যান্ট ও হ্যাট মাথায় ভদি, রোঁয়া ওঠা আদ্যিকালের মেমেদের লম্বা কোট পরা বেচামণি ও স্যান্ডো গেঞ্জি ও শর্টস পরা বৃদ্ধ বিদেশি একে একে নামবে কেন? বুড়ো সায়েব এসব কলকাতার শীতফিত নিয়ে যে মাথা ঘামায় না সেটা বোঝাই গেল।

চেয়ারম্যানের কাছে একটি কার্ড গেল। তাতে লেখা—

আ.কু.৪৭
(একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান)
মালিক : শ্রী ভদি সরকাব, শ্রীমতী বেচামণি সবকার
ব্যবসায়িক উপদেষ্টা মিখাইল কালাশনিকভ
হিসাবরক্ষক শ্রী নলেন

এই ঘটনাটির আগের দিন সল্টলেক এলাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক নিত্যকর্ম'-তে এই মর্মে একটি খবর বেরোয় যে কলকাতার আকাশে একাধিক উড়ন্ত চাকি দেখা দিচ্ছে। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠছে। কেন এই চাকতির আবির্ভাব? কী চায় এই চাকতি? এই চক্কর কতদিন চলবে? সরকার নীরব কেন? বিজ্ঞানীরা কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন? 'নিজস্ব সংবাদদাতা'র এই সবব প্রতিবেদনেব সঙ্গে সম্পাদকীয় সংযোজন— 'পশ্চিমী মনোবিদ য়ুং-এর কথা মানিলে মানুষ যাহা দেখিতেছে তাহা ঈশ্বরের চক্ষু। এই চক্ষু প্রতি মানুষেব মধ্যেই মুদিত রহিয়াছে। সহস্রাব্দের মুখে কেন এরূপ ঘটিল তাহা জানা যায় নাই। পশ্চিমে উফো-চর্চা প্রবল। পূর্বে বিরল। কেহ যদি গোপনে উফো-চর্চা কবিয়া থাকেন তাহলে এ ব্যাপারে আলোকপাত কবিতে পারেন। তবে বিনা দক্ষিণায। নাম ও ঠিকানা গোপন বাখা হইবেক।' এই প্রতিবেদনটি কোনোই আলোড়ন সৃষ্টি করতে অপাবগ হয় কাবণ 'দৈনিক নিত্যকর্ম'-ব প্রচাব সংখ্যা ৫ হইতে বাড়িয়া এই বছরই ৭ হইয়াছে। কলকাতায় বেশ কিছু ছিটিযাল মাল বাস কবে। ববাবরই। বলা যায় এরকমই রেওয়াজ।

ওরা তিনজন ঘবে ঢুকতেই হুমদো চেয়াবম্যান দাঁড়িযে ওঠে। হেঁড়ে গলা।

—হাউ ডু ইউ ডু..

ভদিও গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে,

—নো হাডুডু। আমি বাঙালি। মাই বেটাব হাফ বেচামণি বাঙালি। মিঃ কালাশনিকভ রাশিয়ান। কুছ পরোয়া নেই। আপনিও বাঙালি। বাংলাতেই বাৎচিত চলতে পারে।

—ইযেস! পারেই তো। আচ্ছা, ইনি রাশিয়ান?

—স্পাসিবা। দোবরে উতরো!

—সে কী! বিখ্যাত লোক। আপনি মিঃ কালাশনিকভেব নাম শোনেননি?

—ঠিক প্লেস কবতে পারছি না। তবে শোনা শোনা লাগছে।

বেচামনি ফট্ করে কুমিবের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ খোলে এবং একটি ফটো এগিয়ে দেয়।

—দেখুন তো, চেনা চেনা লাগছে?

—অ্যাঃ এটা তো বন্দুক।

—হ্যাঁ। এ. কে. ফর্টি সেভেন।

—মাই গড্।

—এই এ. কে-র 'কে' হলেন কালাশনিকভ। মিখাইল কালাশনিকভ। এটা ওঁরই আবিষ্কার।

—ও লর্ড! আপনাকে ম্যাডাম কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।

—অসম্ভব। আমি কোথাও যাই না।

—না, না। একবার হিথরো-তে আলাপ হয়েছিল।

—ভুল করছেন। আমি নয়। অন্য কেউ হবেন। আপনি বোধহয় বম্বের মিসেস পোচখানেওয়ালা-র সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অনেকেই ফেলে।

—তা হবে। সরি ম্যাডাম।

এইবার চেয়ারম্যানের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত কারণ মিঃ কালাশনিকভ হঠাৎ বলে উঠেন,

—খারাশো! খারাশো। রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয়। বাজ কাপুর। ভারতকে আমি ভালোবাসে। আওয়ারা। জন-গণ-মন শুনি। মিঠুন। ডিস্কো ডান্সার।

—আরে, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।

—খারাশো। অচিন খারাশো। ভডিবাবু, আপনি প্রোপোজাল প্রকাশ করুন। আমডাগাছি অনেক হইয়াছে।

—হ্যাঁ, ভদিবাবু, বলুন।

—বলচি। ব্যাপারটা টু সিক্রেট। নো গ্যাঁগো বিজনেস। ছুপকে ছুপকে করতে হবে। করলেই সব লাল হো যায়গা।

—ভডিবাবু, আপনি ঐ চুড়ুড়বুড়ুড় হইতে বিরত থাকুন। কাজের কথা বলুন।

—ইয়েস মিঃ কালাশনিকভ!

আমরা একটি রাইফেল কারখানা বানাব।—

—রাইফেল! কোথায়?

—এনিহোয়্যার। হলদিয়া, দুর্গাপুব, আসানসোল— ওপবে থাকবে অন্য জিনিস। ডিকয়। তলায় আসলি মাল। এ. কে. ফর্টিসেভেন— টি গিগ্ —টিগ্-টিগ্-টিগিটিগিটিগ্

—বলেন কী?

—শুনুন, ওপরে লোকে জানবে ক্যানড্ জুস বা টমাটো পিউবি তৈবি হচ্ছে বা পিভিসি ব্যাগ অ্যান্ড স্পেশালিটি পলিমারস্! তলায় লে ধড়াধ্ধড় .

—ইন্টারেস্টিং।

বেচামণি বলে এবার আপনি প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বলুন.

—ভেরি সিম্পল। রেগুলার আর্মি হোক, গেরিলা গ্রুপ হোক— সবার মন পসন্দ হল এ. কে. ফর্টিসেভেন। আমারই তনয় বলিয়া নয় ইহা অতীব উপাদেয় অ্যাসল্ট বাইফেল। অ্যামেবিকান আর্মালেট এর ধারে কাছেও আসে না। সত্যি বলিতে এ. কে. ফর্টিসেভেন হল এক উন্নত সাব-মেশিনগান যা মিডিয়াম পাওয়ার কার্ট্রিজ ফায়ার করে। যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

—সে প্রায় না জানালেই ভালো। বিশেষত এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার...

—থাক, থাক, আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি। আজকাল দরকার র‍্যাপিড ফায়ার পাওয়ার যাকে আরও মজবুত করিয়া মার্চিং ফায়ার বলা যায়।

চেয়ারম্যান ঢোক গেলেন,

—কিন্তু এদিয়ে আমরা কী করব? মিলিটারি তো আমাদের হাতে নয়...

—চোপ্, মিলিটারির দরকারটা কী? আশপাশে, এভরিহোয়্যার গেরিলা অ্যাকশন চলছে... এ. কে. ফর্টিসেভেন সকলের মনের কথা।

ভদি মাথা থেকে হ্যাট নামায়।

—ফিজি, সেচিলিস, নেপাল, বর্মা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বিহার, আসাম, মেদিনীপুর, সাউথ চব্বিশ পরগণা, চেচনিয়া, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান—ডিম্যান্ডটা একবার ভেবে দেখেছেন? সাপ্লাই দিয়ে কুল পাবেন না। স্রেফ বন্দুক বেচে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাল হয়ে যাবে। বাঙালির ঘরে ঘরে নোটের তাড়া আর কার্বাইন— ভাবা যায়?

—সে সব ঠিক আছে। কিন্তু...

চেয়ারম্যান ভদিদেব কার্ডটা দেখেন।

—কিন্তু এখানে তো লেখা আ কু. ৪৭, কেমন আকুপাংচার টাইপেব নাম।

—প্রথমত নামে কি আসে যায়? দ্বিতীয়ত.

বেচামণি ভদিকে থামিযে দেয়।

—তুমি থামো ডার্লিং, লেট মি এক্সপ্লেন! এই নামটার একটা গভীর অর্থ আছে। ৪৭ হল স্বাধীনতার বছব আর আ. কু. মানে হল আকাশকুসুম।

—অ্যাঁঃ আকাশকুসুম!

—ঠিক তাই। ডিমের কুসুম নয। ৪৭ সাল থেকে বাঙালি বন্দুকেব স্বাদ পায়নি। প্রথমে আর. সি. পি. আই, পরে নক্সাল— সবই আনপ্রিপেযার্ড স্ট্রাগল। অথচ স্বপ্ন দেখা তো থামেনি। সেই বন্দুক আজ আমরা হাতে হাতে, ঘবে ঘবে

—মিঃ চেয়ারম্যান, আমি কবিয়া ছিলাম কী জার্মান এম পি ৪৩ ও এম পি. ৪৪ যা থেকে ৭.৯২ মিমি কুর্জ এমিউনিশন ফায়াব হইত.

—প্লিজ মিঃ কালাশনিকভ ওসব টেকনিক ডিটেল আমার মাথায় ঢুকবে না..

—নিয়েৎ, আপনারা চাইলে আমি এ কে ৭৪ অবধি বানাইতে পারি। ইহাতে এন. এস. পি নাইট সাইট এবং তার কাটার নাইফ-বেযনেট ফিট হইতে পাবে।

চেযাবম্যান ঘামতে ঘামতে বেল বাজান।

—স্যাব!

—চাব ঠাণ্ডা লে কে আও। না কি বিয়ারই বলব?

ভদি হ্যাট পরে ফেলে।

—বলবেন না, বিয়ার আমরা খাই না।

—তা হলে স্কচ!

বেচামণি বলে ওঠে,

—আমি শুধু পেপসি।

চেয়ারম্যান একটু হিসু করাব অছিলার সংলগ্ন লাক্সারি টয়লেটে ঢুকে টাকে কোল্ড ওয়াটার স্প্রে করেন। আয়নায নিজেকে দেখেন। কেউ নেই অথচ কানে ভৌতিক বেডিও বেজে ওঠে,

—নতুন প্লাস্টিক ম্যাগাজিনে ৩০ বাউন্ডই ভরা যায়। প্রত্যেকটা বুলেটেব ওজন ৫৩.৫ গ্রেইন, সেকেন্ডে ৯০০ মিটার যায়, ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরি ধরলে ৪০০ কেন, প্রায় ৫০০ মিটাব...

—ওরে বাবা, এসব জেনে আমি কববটা কী?

—হিসি।

—ঠিক আছে। করছি।

—হ্যাঁ, ঠিক করে করো আর যা বলছি শুনে যাও। কালাশনিকভ অ্যাসল্টরাইফেলেব সব মডেলই হল গ্যাস অপারেটেড।

—তাতে আমার কী?

—এক রাউন্ড ফায়ার করার সময় যে গ্যাস তৈরি হয় সেটা ব্যারেলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওপরের গ্যাস সিলিন্ডারে চলে যায়...

—আমি শুনতে চাই না।

—কেউই চায় না কিন্তু শুনতে হয়। সিলিন্ডারে ঐ গ্যাসটা প্রসারিত হয়ে পিস্টনটা পেছন দিকে ঠেলে দেয়।

—আমি শুনব না।

—এবারে একটা ঝাপড়া মারব। শুনব মা। মামাবাড়ির আবদার। চোপ্। পিস্টনটা লাগানো থাকে বোল্টের সঙ্গে যেটা পেছনে টান খায়। ফলে বুলেটের ফাঁকা খোলটা ইজেক্টর দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং ফায়ারিং হ্যামারটি কক্‌ড্ অবস্থানে চলে আসে। বোল্টটা চলার সময় একটা রিটার্ন স্প্রিং-এ চাপ দেয় সেটা আবার বোল্টটিকে...

—নিকুচি করেছে। এই আমি কানে আঙুল দিলাম।

—দে। কানে কেন। যেখানে পারিস দে। রিটার্ন স্প্রিংটা বোল্টটাকে এনে দেয় সামনে এবং এর মধ্যে ম্যাগাজিন এর থেকে নতুন এক বাউন্ড বুলেট চেম্বাবে ঢুকে যায়। বোল্টটি তখন ফায়ারিং পোজিসনে লক্‌ড্ হয়ে যায়...

—বাঁচাও! বাঁচাও!

টয়লেটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন চেয়ারম্যান। গেলাস-এর ঢাকনাটা হাত দুয়েক ওপরে উঠে বনবন করে ঘুরছে। ঘরে কেউ নেই। কমপিউটারের পর্দায় একটি এ. কে. ফর্টিসেভেনের নকশা নানাদিক থেকে দেখা যেতে থাকে। টিভি সেটটি সহসা চালু হয় এবং তাতে দেখা যায় মুখে কালো কাপড় বাঁধা একটি লোক চেয়াবম্যানের দিকে এ. কে. ফর্টিসেভেন তাক করছে, সেল ফোন বাজে, কানে ধরতেই ক্রমাগত ফায়ারিং-এর শব্দ... দ্বিবিধ পানীয়েব বোতল, গেলাস বরফ, চিমটে ইত্যাদি শোভিত ট্রে নিয়ে যে বেয়ারাটি ঢোকার কথা ছিল সে ঢুকল কিন্তু তারও হাতে অগ্নিবর্ষী এ. কে. ফর্টিসেভেন..

গুলিবিদ্ধ না হযেই চেয়ারম্যান কেলিয়ে পড়লেন। পড়েও স্বস্তি নেই। মিঃ কালাশনিকভের সেই প্রসিদ্ধ রুশী হাসি ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে যার সঙ্গে স্তলিচনাইযা ভদকার গন্ধ ও জোসেফ স্তালিনের পিঠ চাপড়ানি মিলেমিশে এক তাজ্জব সমাহার বানাইয়াছে .. টিগিগ্ . .টিগ্ . টিগিগ্ ...টিগিটিগিটিগ্...

এতক্ষণ যা ঘটল তা-যেমন আকাট সৃত্যি তেমনই তিন সত্যি হল ঘটনাটা ঘটাব সময় ভদি ও বেচামণি কালীঘাটে ছিল এবং মিঃ মিখাইল কালাশনিকভ ছিলেন মস্কোতে। এসব হুজ্জুতিতে মাইরি আমাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু সমালোচকেরা ছাড়বে না। ছাড়তে পারে না। কেননা তারা প্রত্যেকেই এক একটি তিলে খ।

প্রায় অন্ধকার বারান্দা। ভূতুড়ে নোংরা ডুমটি জ্বলছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটি ভদির বাড়ি। রাত এইটিশ বলা ভুল হবে। উত্তরের থেকে হিমেল হাওয়ায় কত মৃত সভ্যতার দুর্বোধ্য ই-মেল যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। কী বার্তা যে তারা পাঠাতে চায় তা বোঝা শিবের বাপেরও সাধ্যে কুলোবে না। এবং বিশেষভাবে উচ্চাবিত হওয়ার দরকার যে পাঠোদ্ধারের কোনো চেষ্টা নেই। সকলেই যখন গা এলিয়ে দিয়েছে তখন আমাদেরও এ নিয়ে গাঁড় মারিয়ে কোনো লাভ নেই।

একটি নড়বড়ে টুল। তেপায়া। তার ওপরে বসে বিশাল দাঁড়কাক। সামনে ভক্তবৃন্দের মধ্যে ভদি, বেচামণি ও অন্য সকলকেই দেখা যাচ্ছে। র‍্যাপারে কান-মাথা ঢাকা দিয়ে বড়িলালও এক ফোঁকরে ঢুকে পড়েছে। সাক্ষী গোপাল সকলেরই ঘরের লোক। কিন্তু সাক্ষী বড়িলাল?

টুলের ওপরে দাঁড়কাকের সামনে বাটিতে বাংলা ঢালা হয়েছে। দাঁড়কাক ঠোঁট ডুবোয়। গলাধঃকরণ করার জন্য মাথা উঁচু করে। তারপর বলতে শুরু করে—'এই যে ভদি বাঞ্চোত গাঁড়ে জটা নিয়ে গুরুগিরি করচে, ওকে আমি বলেছিলুম, দ্যাখ্, ভালো যদি চাস তো ভক্তের সংখ্যা বাড়াবি না। কিন্তু শালার হেভি খাঁই— স্রেফ মাল খাওয়ার ধান্দায় এলিতেলি ধরে ধরে

শিষ্য বানিয়েচে। দ্যাখ, মাল সাপ্লাই কর বা নলেনকে তেল দে— আমাব কিন্তু জানতে বাকি নেই কার পোঁদে গু। ভদি এখনো জানে না কিন্তু সেও একদিন বুঝবে। আমি সোজাসাপটা বলে দিলুম— যে বেইমানি কববে আমি কিন্তু গাঁড মেরে খাল করে দেব।'

সামনে থেকে আওয়াজ ওঠে—

—না, না, প্রভু, না।

—আমবা বেইমানি করব না।

—ছুটকো ছাটকা কিছু অশৈল কবে থাকলে ক্ষমাঘেন্না করে দিন।

দাঁড়কাক ফেব চুক্ চুক্ করে বাটি থেকে বাংলা খায়। এক পা তুলে ঘাড় চুলকোয়। ফের শুরু করে

—নতুন যাবা এসেচে তাদেব বলছি— আমবা হচ্চি আত্মাবাম সবকাবেব বংশধব। বুঝলি? সুবল মিত্তিরের সবল বাঙ্গালা অভিধানে, নামও শুনিসনি বোধ হয, যা আছে মেমরি থেকে কোট করে যাচ্ছি— 'আত্মাবাম সবকাব বঙ্গেব বিখ্যাত ভোজবিদ্যাবিশারদ। ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সঠিকরূপে জানা যায় না। 'ভাবতবর্ষ' পত্রে গঙ্গাগোবিন্দ বায লিখিয়াছেন যে, আত্মারাম "বনবিষ্ণুপুব মহকুমাব অন্তর্গত প্রকাশছিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু আত্মাবামেব বংশধব জীবনকৃষ্ণ সরকাব উক্ত পত্রেই লিখিযাছেন যে, আত্মাবামেব বাসস্থান হুগলী (বর্তমানে হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুব গ্রামে ছিল। আত্মাবামেব পিতাব নাম মাধববাম সবকাব। মাধবরামেব ৪ পুত্র, ১) বাঞ্ছাবাম, ২) আত্মাবাম, ৩) গোবিন্দবাম, ৪) বামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছাবাম ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতাব বংশ নাই। উল্লিখিত জীবনকৃষ্ণ সবকার বাঞ্ছাবামেব বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ. '

দাঁডকাক ফেব বাংলা খায। ঘাডেব পালক ফোলায়'

—ফেব কোট ঝাড়চি—মেমবি দেখেছিস ..'শোনা যায, আত্মাবাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিযা আসিয়াছিলেন, এবং দেশে আসিয়া বাজিকবদিগেব কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া বাজিকরেবা অদ্যাপি তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে। তাঁহাব সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি চালুনি দ্বারা শিবিকা বহন কবাইতেন। শেষে ভূতেবাই নাকি ছিদ্র পাইয়া তাঁহাকে মাবিযা ফেলে।' আনকোট। কাজেই খুব সাবধান। ভদির বোতলবাজি দেখেচিস। কিন্তু খালি বোতলে ভদি কী পোবে, কী বল ভদি— কাজেই খুব সাবধান। খুললেই সব বেরিয়ে আসবে। এইসা কেলাবে যে...

সামনে ফের কলরোল,

—খুলবেন না দোহাই।

—ভদিদা জিন্দাবাদ। দণ্ডবাযস জিন্দাবাদ। বেইমানি নেহি চলেগা। নেহি চলেগা, নেহি চলেগা।

—চোপ। এত চ্যাঁ ভ্যাঁ করলে সব জানান হয়ে পড়বে। সায়লেন্স। তা আমাদের গুষ্টির নিয়ম হচ্ছে জন্মে জন্মে আমরা একবাব কবে মহাচক্রেব খেলা, মহামণ্ডলের ঘুঘুচক্কর দেখিয়ে যাব। সেইমতোই চলেছে ভদির এই চাকতিব মোচ্ছব। বুঝলি? আজ চেয়ারম্যান শালা নার্সিংহোমে গেছে, এর পরে দেখবি কী হয়। কোনো ঢপবাজকে আমরা রেয়াৎ করব না। কম করে ৫০ হাজার ছোট বড় কারখানা হয বন্ধ নয় হাঁপের টানে ধুঁকছে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই, বাঁড়া, ডাউনস্ট্রিম মারাচ্ছে। ফরমুলা ওয়ান রেসিং। হোটেল! কাব পার্কিং প্লাজা! সামলাও এবার চাকতি?

ফের রব ওঠে।

—চাকতি কা খেল জিন্দাবাদ।
ডাউনস্ট্রিম মুর্দাবাদ

—বেচামণি বউদি জিন্দাবাদ।
কমরেড নলেন জিন্দাবাদ।

—চেয়ারম্যানেরা নিপাত যাক্।
নিপাত যাক। নিপাত্ যাক।

এরই মধ্যে পুরন্দর ভাট দুই লাইনের একটি মাল রেডি করে ডি. এস-কে কানে কানে বলে দেয়,

—জয়, জয়, আত্মারাম
চেয়ারম্যানের পুঁটকি জাম।

—বাঃ বেড়ে হয়েচে। ছাপতে দেবে না কি?

—ভাবচি।

ভাষণের শেষে দাঁড়কাক বলে

—'মহাপুরুষের বাণী শোন্। এটাও মেমারি থেকে কোট করচি। সাধুসন্তের কথা তো। বলতে গেলেই চোখে জলে এসে যায়।'

দাঁড়কাক ডানা দিয়ে চোখ মোছে। ভক্তবৃন্দের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেউ, কেউ ডুকবে ওঠে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। দাঁড়কাক দুটি ডানাই দুপাশে মেলে দেয়। এ এক, এ এক অপার্থিব স্বর্গলোকেরই যেন বিজ্ঞাপন—

—'বৎস! আমি যে ভগবান ভুলিয়া তোদেরই সার করিয়াছি— তবে ভুলিব কাকে? তোদেব ভুলিলে আর আমার থাকিবে কী? তোরা যে আমাব হৃদয়-নিকুঞ্জের পোষা দোহেলা। সন্ধ্যা-সকালে তোদের কাকলি হৃদিতন্ত্রে না বাজিলে আমি যে অস্থির হইয়া পড়ি। ..তোরা দুঃখ পেলেও আমার তাতে আনন্দ হয়, আমি তোদের ভাবে বিভোর হইয়া থাকি।'

এই বাণী কার? মূঢ় পাঠক, তুমি বলিতে পারো? পাবার চান্স খুবই মিহি। যাইহোক, চেষ্টা মারানোতে দোষ নেই। ভুলভাল বললেও গর্দান যাবার চান্স নেই। একেই বোধহয় পণ্ডিতেরা বলেন বা বলবেন— গোলকায়নের বোম্বাচাক!

(চলবে)

৮

গত অধ্যায়ে একটি সাধুমার্কা কোটেশন ঝেড়ে পাঠকদের ডিরেক্ট চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। কিন্তু জানাই ছিল যে, ঈশ্বর-বিমুখ বাঙালি পাঠকরা সে-চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে না। নিদেনপক্ষে কোনো ক্ষীণ প্রচেষ্টাও আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সে ভেলিগুড়ে বালুকার ঢল নামিয়াছে। ঘেন্না ধরে গেছে। আজ বাঙালি কথায় কথায় সেমিনারে বাখতিন, ফুকো ঝাড়ে, ভবানীপুর এলাকায় পাঞ্জাবি ও গুজরাটিদের দাপট ও রোয়াব সম্বন্ধে গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব আওড়ায়, বিগ ব্যাং হইতে স্মল ব্যাঙাচি সকলই তার নখের ডগায় ডগোমগো হইয়া রহিয়াছে, অথচ সে শালা পরমহংস শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের বাণী সম্বন্ধে কিছুই জানে

না। এবিষয়ে আমাদের কিছু করিবার নাই। হিসাব কষিলে দেখা যায় যে, আর কোনো জাতিতে এত সংখ্যক পরমহংস জন্মান নাই। রেলাবাজেব সংখ্যাও ততোধিক। কিন্তু অধঃপতনে কোনো জাতই এত পটু নয়।

মহামতি সাহেববা বাঙালিকে মানুষ করিবাব একটি পবিকল্পনা কবিয়াছিলেন যাহাকে বলা যায়— 'বেবুন থেকে বাবু'। হল না। কিছু বেবুন থেকে গেল, কিছু মধ্যপথে বেবুনবাবু ও বাবুবেবুন এবং অবশ্যাম্ভাবী কিছু বাবু। পববর্তী ব্লু-প্রিন্ট বিবেকানন্দের। তিনি বললেন, শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে ফেলে দিযে ফুটবল খেলতে। প্রথম দিকে বাঙালি তাঁব কথা শুনেওছিল। না শুনলে ১৯১১ সালে গোরা একাদশকে মোহনবাগান ক্যালাতে পাবত না বা ইযোরোপের করিন্থিয়ানরা ঢাকায ল্যাজেগোবরে হত না। কিন্তু খচডামি যার বন্ধ্রে বন্ধ্রে তাকে বাঁচাবে কে? আজ বাঙালি অন্য নানা খেলার মতো ফুটবলেও কেলিয়ে পড়েছে এবং ক্রিকেট বা টেনিসে গুচ্ছের টাকা বলে বাঙালি বাপ-মায়েবা বাচ্চাগুলোকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে নাকি হুদো হুদো কোচ, যাবা ববং কোচোয়ান হলে আবও ভালো হত। এরপর কংগ্রেস ভেবেছিল বাঙালিরা সবাই ডেকরেটারের ব্যবসা খুলবে এবং নানা কংগ্রেস সম্মেলনে তাকিয়া সাপ্লাই দিয়ে লাল হয়ে যাবে। নকশালদেব কোনো পবিকল্পনা ছিল কি? থাকলেও আগেভাগেই তো তাবা মরে গেল। এরপব এল সি. পি এম। এঁদের পরিকল্পনাটি খুবই মহতী। কাবণ শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসা, প্রোমোটারি ইত্যাদি বিভিন্ন মহলেব কৃতী দিকপালদের পরামর্শের সঙ্গে অভ্রান্ত বিজ্ঞানেব মিশ্রণ ঘটিযে এঁরা বাঙালিব সামনে যে মডেলটি বাখলেন, তাব নাম 'বাঁদব থেকে সি পি এম।' মানেটা খুবই সহজে— প্রথমে বাঁদব, তাবপর বনমানুষ। এইভাবে নিয়ানডাবথাল-অস্ট্রেলোপিথেকাস-বামাপিথেকাস-পিকিং ম্যান হয়ে হোমো কোম্পানির নানা ঘাটে জল খেয়ে লাস্টে দৃপ্ত সি. পি. এম—কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বাঙালি পুরুষ ও নারী কোনো অজানা কিন্তু মায়াময় রক্তিম ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিকল্পনাটি সাধু। যেমনই সবেস হল 'বঙ্গ' বা 'কলকাতা' বানানো। কিন্তু এর জন্যে সি. পি. এম-কে প্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হল, এই বাঙালিকে দিযে অত খাটনির কাজ হবে না। দ্বিতীয়ত, যত ঘটা করেই ২৫ বৈশাখ আর ২২ শ্রাবণ হোক না কেন, বাঙালি মজ্জাগতভাবে ভালগার ও খিস্তিবাজ। যেখানে ভালগারিটির তিলমাত্র সুযোগ নেই, সেখানেও সে অপ্রতিরোধ্য। তা না হলে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামনে বাস দাঁড়ালে বাঙালি কন্ডাকটর 'টেস্টিকেল! টেস্টিকেল!' বলে চেঁচাবে কেন? কেনই বা বালিখালগামী বাসেব কন্ডাক্টব (অবশ্যই বাঙালি) বর্ণবিপর্যয় ঘটিয়ে 'খালিবাল' বলে নান্দনিক পরিবেশ দূষিত করবে। কেনই বা বাঙালি রেসের বই বিক্রেতা বনেদিপাড়ায় সাইকেল নিয়ে 'হোলরেস' বা আরও সংক্ষেপে 'হোল!' 'হোল!' বলে গর্জন করবে? জানি না বাপু কী করে কী হবে। বাঙালি সম্বন্ধে তৃণমূলেরও নির্ঘাৎ একটি রমণীয় ছক রয়েছে, যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য করার সময় হয়নি এখনও। আর যে যাই বলুক, মুড়ি দিয়ে চা খাওয়াটা মোটেই নতুন কিছু নয়। বরং এর সঙ্গে তেলেভাজা জুড়লে প্রস্তাবটি জম্পেস আড্ডার প্রারম্ভিক পর্ব বলে ভাবাই যায়। এতই যখন হল, তখন বি. জে. পি-ই বাদ যায় কোন সুবাদে। রাধানাথ শিকদার এভারেস্ট মেপে নাম কবেছিল। অপর এক সদাহাস্য শিকদারের কর্মসূচি খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর— 'মানুষ থেকে হনুমান।'

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, যা অবধারিত তাই ঘটল। ঘটাং! ব্যাপারটি যে কী ঘনত্বের, সেটা বুঝতে গেলে এটুকু বুঝলেই হবে ইংরিজি বছরেব শেষ দিনে পালে পালে, দঙ্গলে দঙ্গলে ভদির চেলার দল গুরুদেবকে নানা টাইপের মাল এবং চানাচুর, ডালমুট, মুড়ুক্কু, চিপকি ছোলা,

ঝালবাদাম, কাজু ভেট দিতে এসে দেখেছিল ভদি নেই। নলেন হেভি ভলুমে এফ. এম রেডিও বাজাচ্ছে এবং ভদিব উঠোনে ওল্ড স্টাইল মেমেদের পোশাক-পরা বেচামণি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ব্যালে টাইপের কিছু নাচছে এবং তার হাত দুটি বেড় দেওয়াব ভঙ্গি থেকে বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, তার নাচের পার্টনারটি কোনো সাহেবের অদৃশ্য ভূত। নলেন সকলকেই বিষাদ ও হতাশায় নিমজ্জিত কবে জানিয়ে দিল যে গত রাতেই জরুরি এত্তেলা পেয়ে সামরিক তৎপরতায় ভদিকে চলে যেতে হয়েছে।

—সেবার জন্যে যে না এনেচো রেকে মানে মানে কেটে পড়। হুড়ুমতাল কবেচো কি মরেচো। নতুন বছরে দেখা হবে বলে গেচে। আরও বলেচে...

—কী? কী?

—বলেচে এঁড়ে বাছুবের ছোট টুঁ-তে দোষ নেই। কিন্তু গুঁতোগুঁতি কবলে শিং ভেঙে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেবে।

—বছরের শেষ দিনটায় প্রভুর অন্তর্ধান ঘটল। জাপটে ধরে রাখতে পারলে না?

—এইজন্যেই তো বোকাচোদা বলতে ইচ্ছে করে। যিনি কথায় কথায় সূক্ষ্মদেহ ধাবণ করেন, তাঁকে কি জাপটে ধরে বাখা যায় রে পাগল!

বেচামণি হঠাৎ খিলখিল হাসি-সহ অদৃশ্য ভূত পার্টনারের সঙ্গে ওয়ালজ্-এর ঢঙে ঘুরপাক খায়। এটি একটি আত্মারাম সরকারেব আশীর্বাদপুষ্ট ম্যাজিক আইটেম (ম্যাজিক রিয়ালিজম নয়) যার নাম গিলিগিলি পাম্প। কেন এই নাম তা কোনো গবেষক কোনোদিনও হদিশ কবতে পাববে না। সে না হয় না পাবল, কিন্তু 'কাঙাল মালসাট' যে রাবড়ির জালের থিওবিতে ঘ্যাঁতাচ্ছে সেটা লুক্কায়িত কর্মসূচি বা হিডেন এজেন্ডা থাকছে না। বুদ্ধিভ্রংশ পাঠক, তুমি বাবু লুচি বা নুচি কাহাকে বলে জানো? সেই লুচিব ফোসকা দিয়ে রাবড়ি প্যাঁদানোব যে নাবকীয় আনন্দ তাহা কখনই উপলব্ধি করিয়াছ? এই সান্ধ্য জলখাবারের পর যা অবশ্যকরণীয়, তা হল মাগিবাড়ি যাওয়া। পরের অধ্যায়ে দেখিবে যে সাক্ষী বড়িলাল কী অবলীলায় মাগিবাড়ি যাওয়া রপ্ত করিয়াছে। আরও দেখিবে যে, এমনও মানবশিশু আছে যাহারা ধরাধামে পা বাখিয়াই অধরা মস্করায় লীলাবান হয়। কখনও ঘুণাক্ষরেও ভুলিবে না যে পাগলের হাতে সংসার। যে-কোনো মোমেন্টে হাম্পু চলে যেতে পারে। পরে, আরও পরিপক্ক টুকটুকে মাকাল হইলে বুঝিবে সাহিত্যের শব্দসাধনা এক অলৌকিক ঠগবাজি যাহার পিছনে কাতিন অরণ্যে এন. কে ভি. ডি দ্বারা নিহত ১৩,০০০ পোলদেশীয় অফিসার গুরুগম্ভীর মুখে বার্লিওজ-সৃষ্ট 'সিম্ফনি ফ্যানতাস্তিক'-এর 'মাচ' টু দা স্ক্যাফল্ড' অংশটি শুনিতেছে, আলি সরদার জাফরি উদাত্ত কণ্ঠে 'লোহু কি পুকার' হইতে আবৃত্তি করিতেছেন এবং রক্তস্নাত পেশোয়ার এক্সপ্রেস নিরন্তর শব বহন করিতেছে। লেখক বা পাঠক বা প্রকাশক বা সমালোচক— কেহই রেহাই পাইবে না। আপাতত— ঘটাং! কিন্তু তার আগে পায়খানা ধোলাই করার অ্যাসিডের সুইমিং পুলে যে লেখকরা বারমুডা পরিয়া লাফাইতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের জন্য রচিত পুরন্দর ভাটের কয়েকটি অমোঘ লাইন—

আজ্ঞাবহ দাস, ওরে আজ্ঞাবহ দাস
সারা জীবন বাঁধলি আঁটি,
ছিঁড়লি বালের ঘাস,
আজ্ঞাবহ দাসমহাশয়, আজ্ঞাবহ দাস!
আজ্ঞাবহ দাসবাবাজী, আজ্ঞাবহ দাস,

যতই তাকাস আড়ে আড়ে,
হঠাৎ এসে ঢুকবে গাঁড়ে,
বাম্বু-ভিলার রেকটো-কিলার,
গাঁট-পাকানো বাঁশ,
আজ্ঞাবহ দাস রে আমার, আজ্ঞাবহ দাস।

ঘটাং শব্দে মাটি খোঁড়ায় বাধাপ্রাপ্ত সরখেল আবও কয়েকবার শাবল চালাল কিন্তু মোদ্দা ফল হল শাবলের ডগা ভোঁতা, সরখেলেব হাতে ফোসকা এবং গুবলেট। তখনই সরখেল পূর্ববর্ণিত টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভদিকে খবর দেয এবং ভদি সরখেলকে অবিলম্বে অপারেশন বন্ধ করতে বলে।

—'মাঁটি খোঁড়া বঁন্দ বাঁখো।'

—'তাঁবপঁর?'

—'অ্যাঃ দাঁতও বাঁদাবেঁ না। কীঁ যেঁ বাঁল বঁলো।'

—'বঁলচি, তাঁরপঁব?'

—'চুঁপচাঁপ থাঁকো। আঁমি যাঁবো।'

—'কঁখন?'

—'ভোঁরবাঁতে। যঁকন সঁব শাঁলা ঘুঁমোবে।'

—'আঁচ্ছা!'

একে শীতকাল, তায় ভোববাত। আদিগঙ্গাব ধাবে তখন শামুক-পচা কুযাশায একপাল প্রায় ন্যাংটো মানুষ শুভ কাজে লিপ্ত। এবা প্রেতযোনি প্রাপ্ত নয। ফ্যাতাড়ু নয়। চোক্তাব নয। স্রেফ মানুষ। এদের কাজ হল আদিগঙ্গাব ফাঁকফোঁকব, নিমজ্জিত টাযাব, ইঁট, জুতো, মালসা, খুবি ইত্যাদির গা থেকে কুচো কেঁচো ধরে লাল-নীল মাছেব দোকানে সাপ্লাই কবা। এবা কখনো তালা, টাইমপিস ঘড়ি, মবচে-পড়া নেপালা ও চেম্বাবও পায। এবা চালু মাল। ওই জলে নামলে পা কেটে টুকরো হয়ে যেতে পারে। তাই এরা টায়াবের চটি বা শক্তপোক্ত কিছু পরে নেয। আবার হয়তো দেখা যাবে, কাবো পায়ে অ্যাডিডাস, লট্টো বা নাইকি-ব স্নিকার। কীভাবে এত দামি জুতো এদের পায়ে আসে? আসলে সব সময় হিঁযা থেকে হুঁয়া মাল লেনদেন হচ্ছে। জালি, আসলি, চোরাই, লুট— নানা মালে বাজার ছযলাপ। এমনটিই তো হবে-হবে শোনা গিয়েছিল। হলও এবারে। ঠেলাটা বোঝো। আসলে সব বকমের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধেই লোকের আইডিয়া হল হাতি পাদেগা, হাতি পাদেগা—ফুশ্। উল্টোটা যখন হয় তখন শালাদের চোখ খোলে না। কিন্তু তাহাতে আগচ্ছমান মহাহুলোর একগাছা লোমের ক্ষতিও হয় না।

ভোররাতে সরখেল ভদির পোশাক দেখে অবাক। একেবারেই সামরিক পোশাক। অলিভ গ্রিন প্যান্ট। পায়ে হান্টার জুতো। গায়ে ছোপ-ছোপ দাগ-মাবা কম্যান্ডো উর্দি এবং তার ওপরে যে মিলিটারি জ্যাকেট, তা সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে বেড়াবাব সময হামেশাই চোখে পড়ে।

—'নো হ্যাংকিপ্যাংকি। নো গাঁইগুঁই। প্রবলেমটা কী?'

—'সে তো আমাব ঘটেও ঢুকছে না। হাত পাঁচেক খোঁড়ার পরেই ঘটাং।'

—'শাবল মেরে ডেপথ্ চার্জ-এর মতো উড়িয়ে দাও। সাবমেবিনকে যেভাবে ক্যালাতে হয়।'

—'হুঁঃ, শাবলই বলে উড়ে যাচ্চে। এই দ্যাখো না, হাতে গেলে-যাওয়া ফোসকা। বোরোলিন লাগিয়েচি।'

—'ওরে, ব্যাটলফিল্ডে বোবোলিন-ফোরোলিন চলে না। যেখানে চোট লাগবে অ্যাম্পুট

করো। হাত, পা, মুণ্ডু সব পড়ে থাক। শুধু এগিয়ে চলো।'

—'তুমি এগোবে তো এগোও। আমাব আর ধকে কুলোচ্চে না। তাব ওপর ভয়ও আচে।'

—'কিসের ভয়? কাকে ভয়? যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়! হাসালে তুমি আমাকে সরখেল!'

—'ওসব সোনাই দীঘি-মার্কা ডায়লগ আমিও দু-চারটে ছাড়তে পারি—

'দূত এসে বলল, মহাবাজ! মহারাজ! দূর্গে শত্রু-সৈন্য ঢুকে পড়েচে। মহাবাজ বলল, এই রে, গাঁড় মারিয়েচে। প্রম্পটার প্রম্পট্ করে শোনা নাহি যায়। চলো, বানি, অন্তঃপুরে গিযে প্রস্রাব করি।'

ভদি চুলবুলিয়ে হেসে ওঠে। গড়ায়।

—'টপ! টপ! ওঃ সরখেল, সলিড ছেড়েছ। এইবার গা-টা গবম হযেচে। বলো, ভয পাচ্চো কেন গো?'

—'আমি ভাবচি মোটা লোহাব পাইপ। হয় শালা ভেতবে ইলেক্ট্রিকের তাব নযতো সায়েবদের বসানো গু-মুতের লাইন। ভাঙতে গিয়ে হয় কাবেন্ট, নয়তো নফর কুণ্ডু কেস!'

—'শোনো, অনেক কাঠখড় পুড়িযে, অনেক খোঁজপত্তব করে তোমার বাড়িব এই স্পটটা বাছা হয়েছিল। এখান দিয়ে লাইন যেতে পাবে না। জল না, কাবেন্ট না, গু না, কিচ্ছু না।'

—'তবে, ঘটাং করল কীসে?'

দুজনকেই চমকে দিয়ে ফিকে অন্ধকারে কেউ বলে উঠল,

—'কামান।'

বিশাল দাঁড়কাক অন্ধকাব মেখে এমনভাবে ঘাপটি মেরে আছে যে বোঝবার জো নেই।

—'বাবা!'

—'হ্যাঁগো ভদিসোনা'।

—'এই ঠাণ্ডায়, একেবারে আদুল গায়ে ..'

—'থাক, আর পিতৃভক্তি মারাতে হবে না। এবার যা বলচি শোন— আমার চোখে হঠাৎ নাইট-ভিশন এসে গেল— পষ্ট দেখলুম ওটা কামান।'

—'তাহলে কী হবে?'

—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। কামানটা বড় নয়, ছোট। বলতে পাবিস নুনুকামান।'

—'আঁজ্ঞে, দুমদাম কিছু হতে পারে?'

—'ভয়েতেই গেলি। ভেতরে গোলা নেই, বারুদ নেই। স্রেফ মাটি। হাত দেড়েক ছেড়ে বাঁদিকে ঝপাঝপ দুজনে মিলে খোঁড়্। তাহলেই হারামিটাকে তোলা যাবে।'

ভদি শাবল চালায়। সরখেল ভাঙা গামলায় মাটি সরায়। ভদি ঘেমে গিয়ে জ্যাকেটটা খুলে ফেলে। ঘপঘপ শাবল চালায়। এদিকে মাটিটা ঝুরঝুবে ছিল, তাই বেশি সময় লাগে না। শাবল ঢুকিয়ে বোঝা যায় যে কামানের একটা দিক শেষ হয়েছে।

—'মাথায় তোদের ভগবান বুদ্ধি বাদে সব দিয়েচে। এবার শাবলেব কাজ আর নেই। শিক দিয়ে এপাশ ওপাশ আলগা কর। তারপর নেমে টেনে তোল।'

রোগা বলে সরখেলই নামে। কিন্তু শিক চালাবার পরেও কামান নড়াতে পারে না।

—'এ তো ঝকমারি হল! মাল নড়চে না।'

—'নড়বেও না। তলা দিয়ে দড়ি ঢোকা। তারপর ওপরে উঠে দুজন মিলে দু-দিক দিযে টান। ব্যাটা না উঠলেও কেৎরে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর তুলবি।'

আরো বেশ কিছুক্ষণ কসরত করার পরে হাত দুয়েক বেবি কামানটি ডাঙায় উঠে আসে।

আকাশে বেশ আলো ধরেছে। রোজই ধবে।

সরখেল চেঁচে চেঁচে মাটি সরায়। গোড়াব দিক, মানে তোপ দাগাব দিকটায় ডুমো মতো। মুখটা আবার সিংহের আদলে।

—'কাদের মাল এটা বুজলি?'

—'ধোয়া-মোছা করলে হয়তো লেখা-ফেখা কিছু বেরুবে।'

—'সে বেরুক্গে। মালটা পোর্তুগীজ জলদস্যুদের। তখন তো আদিগঙ্গা ওখান দিয়ে বইত না। বিস্তর নৌকাও চলত। পোর্তুগীজ হার্মাদদের বোটে এই কামানগুলো থাকত। বজরা-ফজবা হলে এক গোলাতেই কুপোকাত। যে সে কামান নয়। খোদ 'লিসবনে বানানো।'

—'এখনও মালটা চালানো যাবে?'

—'যাবে না কেন? তবে যত্ন-মেহনত কবতে হবে। বারুদ চাই। গোলা চাই।'

—'তাহলে কি মালটা আমরা স্টক করব?'

প্রশ্নটা সরখেলেব। কাবণ ভদি গোপনে যে অস্ত্রাগারটি বাড়িযে চলেছে তার দেখভাল সরখেলই করে।

—'যাদুঘব বা সাযেব ধবে বেচে দিলে ভালো মাল্লু পাওয়া যাবে। সব পুরনো মালেব এখন হেভি বাজাব।'

—'পাত্তি কিছু হবে। কিন্তু এই লোহা, এই মেকদার আর হবে না। আমি বলি কি, মালটা ধোলাই-ফোলাই কবে কেবোসিন দিয়ে পালিশ কর। আমাদের স্টকেই থাক। এখনও গুছিযে ঝাড়তে পাবলে একশো হাত দূরে পুলিশভ্যানের বিচি উড়ে যাবে।'

—'বাবা যখন বলচেন সবখেল তকন আব কতা বাড়িযে লাভ নেই মালটাকে আমরা স্টক কবব।'

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটাল।

—'তোরা বরং কামানটাকে রেডি কর। বছরের শেষ দিনে ভাল কাজ করলে ফল পাবি।'

—'আপনি থাকবেন না। তা হলে আমাদেব গাইড করবে কে?'

—'আরে বাবা, এখন আমাদেব এলিয়ট বোড যেতে হবে। সেখানে বেকারির পোড়া কেক্ খেয়ে সায়েবদেব গোরস্থান। সেখান থেকে নিমতলা। এখন আমার দিনভর কাজ। পরে আমি আসব। এখন তো শুধু সাফসুরৎ করা। দুমদাম সব পবে।'

দণ্ডবাযস প্রশস্ত ডানা মেলিয়া উড়িযা গেল। কাক, চড়াই, শালিখ ইত্যাদিরা ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। এই প্রভাত বড়ই মঙ্গলময়।

ভদি ও সরখেল পোর্তুগীজ কামানটি বহন কবে দ্বিতলেব কক্ষে নিয়ে যায়।

—'বাবা ঠিকই বলেচে। কত বছর মাটিতে পোঁতা ছিল কে জানে, কিন্তু কোনো মরচেফরচের বালাই নেই।'

—'পোর্তুগীজরা ভাল কামানিয়া ছিল বলতে হবে।'

—সে তো ছিলই। কোথায় এক এক রত্তি দেশ। সাত সমুদ্দুব পেরিয়ে এসে আদি গঙ্গায় দমাদ্দম্ কামান দাগচে। টাকা, গয়না, মাগি— সব দুহাতে লুটচে। ভাবলেই ভয় করে।'

—'আমি একজন পোর্তুগীজ রংবাজের নাম জানি।'

—'কী?'

—'কারভালো।'

—'দূর! ও তো থিযেটারেব দেওয়া নাম। এককালে কারভালোর পার্ট বলে ভূমেন রায়—

হেভি নাম করেছিল।'

—'তা হবে।'

—'হবে না, হয়েচে। যাক আমি তো এদিকে ভেবে হাল্লাক হচ্চি যে মাটি খোঁড়া যদি ভেস্তে যায় তাহলে কিসের জোরে আমবা লড়ব?'

—'চিন্তাটা আমারও হয়েছিল। এত বড় একটা যুদ্ধের হুক।'

—'যাই হোক, ভগবান সহায়। বুজলে? তা না হলে শালা কিচুর মধ্যে কিচু নেই, হঠাৎ আমাদের হাতে পোর্তুগীজ কামান। ওফ্, একেবারে কামাল করে দেব। লাগুক না একবাব।'

—কী কী মাল আমাদের জোগাড় হল তার একটা লিস্ট করতে হবে। তবে আমাব একটা খটকা লাগছে!'

—'কিসের আবার খটকা?'

—'বন্দুকের লাইনে আমবা কিন্তু বেশি কিছু করতে পাবিনি। একটা দোনলা গাদা তাও সেই মান্ধাতার আমলের। আব দুটো ঢপের পিস্তল।'

—'কমটা কি হে? কামান, বন্দুক, পিস্তল।' এরপর তোমার গিয়ে ছুরি, কাঁচি তাবপব তোমার গিয়ে শাবল— সব এক করে ভাবো।'

—'কিন্তু যে প্ল্যান আমাদের...'

—'রোসো সরখেল, বোসো। কোনো মিলিটারি জানবে একদিনে তৈবি হয় না। আজ আমাদের অস্ত্রাগার দেখলে লোকে বলবে, হাসি পায় বিজিয়াব চাপদাড়ি দেখে। কিন্তু যখন দেকবে আদিগঙ্গায় ডুবোজাহাজেব পেরিস্কোপ উঁকি মারচে, ঘাটে ঘাটে মাইন ভাসচে, জাহাজী সব ছ-ঘরা, দশ-ঘবা হাতে হাতে ঘুবচে তখন? ভযতে পোঁদ শুকিয়ে যাবে। আব আব-একটা জিনিস মনে রাখবে। মোক্ষম।

—কী?

—নিজেদের মাল তবিল নিযে এমন ক্যামপেন চালাবে যে শত্রুব কানে যখন পৌছবে তখন ব্যাটা চমকে উঠবে। কানাঘুষো শুরু কবে দিতে হবে। তবে টাইম বুজে। যেমন, আমাদেব বলতে হবে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স— সব আমাদের আচে।

—নেভি? এয়াবফোর্স।

—ও কোনো ব্যাপারই না। একটু মাথা খাটালেই সাবমেরিন বানানো যায়। কিচুই না। নৌকো প্লাস ডুবসাঁতার ইজইকুযালটু সাবমেরিন।

—কিন্তু এযারফোর্স?

—কেন? চাকতি তো উড়চেই। কী ফোর্স। তারপর ফ্যাতাড়ুরা যদি হাই অল্টিচুড থেকে পেটো ড্রপ করে! বাবা আচেন।

—তাইতো। ভুলেই গিয়েছিলাম।

—এইতো সরখেল, নিজেব তাগৎ নিজেকে জানতে হবে। এটা হল যুদ্ধের একেবারে গোড়ার কতা। অন্যটি করেচো কি মরেচো। এরপর হল প্ল্যান। শত্রু হয়তো ঢুকচে। আয় বাবা, আয বাবা করে তুমি ঢুকতে দিচ্চো। সে বানচোৎও ভাবচে যে কেল্লা ফতে করে এনিচি। আচমকা শালা সাঁড়াশি থিওরিতে দুপাশ থেকে ধুমা ক্যালাও। এইরকম আব কী। আসল ব্যাপাব হল ঘটে মাল থাকতে হবে। ইতিহাসে দেকবে বড় বড় সব দেশ— ইয়া আর্মি, তারপর গিয়ে উড়োজাহাজ— ছোট কোনো দেশেব পোঁদে লাগতে গেল। তাবপর হেগেমুতে এক্সা। এইসা ঝাড় যে ছোঁচানোর টাইম অবদি দেবেনা।

কথাবার্তার এই ধাঁচের মধ্যে ক্রমশ সত্যই কি প্রতীয়মান হয় না যে চোক্তাদের পরিকল্পনায় সম্মুখসমর বা ওই জাতীয় কিছু ভালোভাবেই রয়েছে? তবে এখনই পাঠক কি জানতে চায় যে পোজিশনাল ওয়ারফেয়ার না গেরিলা সংঘর্ষ--- কোনদিকে 'কাঙাল মালসাট' চলেছে? মাও, লিন পিয়াও, টিটো, গিযাপ, ফিদেল, চে— কোন কায়দায় লড়াই হবে? দুপক্ষই কি বাঙালি হবে না বিদেশি ভাড়াটে সেনারাও আসরে নামবে? আব যদি সত্যিই একটা বেধড়ক ক্যালাকেলি শুরু হয়ে যায় তাহলে পাঠক কোন দিকে ভিড়বে? এই সব ক-টি প্রশ্নই খুবই খুবই মূল্যবান, মাল্যবান ও জরুরি। কিন্তু এই হিমভোরে সদ্য কামান বেবোবাব বণনীতি বা কৌশল সম্বন্ধে যার তিলমাত্র ধারণাও আছে সে-ই অনুধাবন করবে উপবোক্ত অবস্থান কতটা যুক্তিসঙ্গত। এই বোধ যদি ঘরে ঘরে জাগ্রত হত তাহলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বলে হেদিয়ে মরতে হত না। বাপ্ বাপ্ বলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈবি হত এবং বীবত্বে সকলকে ধুড় বানিয়ে ছাড়ত।

চন্দননগরেব জনৈক বিখ্যাত বাঙালি একবাব লিখেছিলেন,

'হাবান চক্রবর্তী মহাশয় যথেষ্ট বলশালী ছিলেন। তিনি উদয়চাঁদ নন্দীব বাগানে একটি বড় লিচু গাছ বিনা অস্ত্রসাহায্যে ফেলিযা দিয়াছিলেন। দুইজনে সজোবে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেও তিনি একটি রম্ভা গলাধঃকরণ কবিতে পারিতেন। গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত ঘোড়াকে ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পালপাডাব বীবচাঁদ বডালের বাটীতে পালপাডাব দলেব উদ্যোগে ফবাসী গভর্নব বাহাদুবকে দেখাইবার জন্য ব্যায়ামক্রীডার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লাটসাহেব তাহা দেখিযা বাঙালীব ছেলেব বল ও সাহসেব ভূযসী প্রশংসা কবিযাছিলেন।'

কে তিনি? তিনি কে গো? কে গা? এর একমাত্র জবাব বাঙালিব নিরবচ্ছিন্ন নীববতা। লজ্জায় আব কত অধোবদন হইতে হইবে? (চলবে)

৯

যে সন্দেহ এইবার বার বার উঁকি মারিবে ও ফিক্ কবিযা হাসি করিয়া ফেলিবে তাহা হউক এই যে 'কাঙাল মালসাট' কপর্দকহীনদের জন্য এক ব্যাদড়া কুইজ নাকি অন্য কোনো অভিসন্ধিমূলক অভিযান? যে কোম্পানি এই অহৈতুকি ব্যবসা খুলিয়াছে তাহাদেব মুখে হয় লুপ নয়তো কুলু। এমন কেন হল গো? এও কি চাকতির হুজ্জতি। ইজ এনিবডি আউট দেয়ার? শুনশান। অনেকটা পায়খানার দরজায় আকুল ধাক্কার মতো? ভেতরে কে? সায়লেন্স। এই ঝুটঝামেলা অত সহজে মেটাব নয়। এবং এর সমাধানের জন্য বঙ্গবালক ও বঙ্গবালিকাদের যে পদ্ধতি ইস্তেমাল কবতে হবে তা যেমনই দুর্লভ তেমনই অনায়াস। 'আট'-এর শ্বাস ওঠার সময় চন্দননগরের জনৈক বিখ্যাত বাঙালির একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের কিয়দংশ মুদ্রিত হয়েছিল যদি না প্রেসের ভুলে উড়ে যায়। সেই বাঙালিকে আমরা টুনি লাইটের আলোকসজ্জার মধ্যে গবাক্ষে হাস্যময় বলে ভাবতে পারি। তিনি ছিলেন অথবা হইলেন হরিহর শেট। ভবিষ্যতেও থাকিবেন। যেমন থাকিবে ডাইনোসরের ডিম, তবলার বিড়ের মতো দেখতে একটা জিনিস মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ও পৃথিবীর নানান গলতায় প্রোথিত টাইম ক্যাপসুল। কারো কোনো ওজর আপত্তি ধর্তব্যে নেওয়া হবে না। এরই মধ্যে পুনরায় সেই পরিচিত ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি!

মালের ধুনকি যদি কাটে, বাগিচায় খোঁয়ারি যদি ভাঙে তাহলে সাহস সঞ্চয় করে পাঠককে ইন্টারোগেট করা যায় যে উপরোক্ত ওঁয়া ওঁয়া-র একটি আগাম সতর্কবাণী আগেই আছে এবং তা কোথায়? কোনো হাত ওঠে না কারণ সবগুলিই চুলকাতে ব্যস্ত। ধিক্। শতধিক্। অক্টোবর '৯৯-এর শেষ হপ্তার মুখে ডি. এস-এর কবুলিতে কি জানা যায়নি যে তার বউ-এর আট মাস চলছে। চলছে মানে শুরু হয়েছে এমনই বা না হবে কেন? বরং দশ মাস দশ দিন, চিনতে না পারলে গলায় দড়ির দাগ, মা হওয়া কি মুখের কথা— সব অঙ্ক মেলানোর জন্যে তেমনই হতে হবে। হলও।

২০০০-এর জানুয়ারিতে, আগেকার কথা মতো, 'শিশুমার মেটারনিটি হোম'-এ, ড গজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরি বা যে নামে তিনি অধিকতর পরিচিত সেই গায়নো গজার নার্সিং হোম-এ সিজারিয়ান পদ্ধতিতে ডি. এস-এর কালো, মোটা, অল্প গোঁফওয়ালা ব্যাঙের মতো বউ-এর পেট কেটে জালি বা আসলি (দ্বিমত আছে) সহস্রাব্দের প্রথম ফ্যাতাড়ু জুনিয়রকে বের করা হল। নার্সিং হোমটির নাম শুনলে অবধারিতভাবে মনে হবে যে এখানে শিশুদের মেরে ফেলাটাই বিশেষত্ব। তা কিন্তু নয়। 'শিশুমার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ জলকপি বা শুশুক। গজেন্দ্রকুমার শিশুকালে বাবার কোলে বসে দেখেছিল গঙ্গা বক্ষে শুশুক হু হু করে উঠছে ও তলিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ জলকপির দল এরকমই করেই চলেছে, করে চলেছেই। এই দৃশ্যটি গজেন্দ্রকুমারের শিশু মনে গভীর দাগ কাটে। এভাবেই তাঁর মধ্যে শুশুকের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে। তারই ফল পরিণামে হল 'শিশুমার মেটারনিটি হোম।'

বাইরে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষামান ডি. এস, মদন ও পুরন্দর ভাট। সেখানে আরো পাবলিক রয়েছে। শীতের পোশাক কিন্তু উত্তেজনার গরম। ফুটের দোকান থেকে চা আনে পুরন্দর। সে নিজে আনে না। খাঁচাসদৃশ বস্তুটিতে গেলাস বসিয়ে আনে একটি পেটমোটা শিশু শ্রমিক। পুরন্দরের হাতে বাতিল লটারির টিকিটে মোড়ানো তিনটি বিস্কুট।

—ফার্স্ট বাপ হবে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বলির পাঁঠা।

—আঃ পুরন্দর। সংসারধর্ম করনি তো। আলপটকা ওরকম বলা যায়। ডি. এস-এর অবস্থায় পড়লে বুঝতে।

—ক্ষ্যামোতা থাকলে একটা বিয়ে করেই ফেলো না। হিম্মত দেখি!

—তোমাকে হিম্মত দেখাতে গিয়ে গাঁড় মারাবার চক্করে আমি নেই। আর কবিদের কেসটা আলাদা। সব মনে মনে হয়।

—মানে?

—পরে একদিন বুঝিয়ে দেব। আরে বিস্কুটটা কামড়াবে তো।

—ভুলেই গেছি যে হাতে বিস্কুট।

—এরপর হাতে হ্যারিকেন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ঠিক এই সময়েই কালো পাথরের কানা উঁচু থালায় জল জমিয়ে ভদি উবু হয়ে বসে দেখছিল। নলেন জমাদারের সঙ্গে নালি পরিষ্কার করা নিয়ে ঝগড়া করছিল। বেচামণি স্নান সেরে পিঠের দিকে গামছা ধরে মাথা হেলিয়ে চুলে সপাট্ সপাট্ ঝাড়ছিল এবং ভদির বাবা ছাদের আলসেতে বসে দেখছিল যে বউমা-র মাথা থেকে জলকণাগণ সহসা উড়িয়া উঠিতেছে ও রোদ্দুরে রামধনুর রং এই আছে, এই নেই।

—যাক বাবা, ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল।

বেচামণি আপনসুখে বলে,

—কী হল গো ভালোয় ভালোয়?

—ডি. এস-এব বাচ্চা হল। তা না তো কি তোমাব পিণ্ড হবে?

—কতা বলার ও কী ধরণ গো?

দাঁড়কাক ঘ্যাঁক কবে ওঠে,

—ভালো কবে মুখ না ছুঁচোলে অমন হয়। ছেলে না মেয়ে হল সেটা বলবি তো?

—ছেলে হযেচে। এই নাদাপেটা।

বেচামণি খিলখিলিযে ওঠে,

—আমি আগেই বলেছিলুম।

ভদি ফেব খিঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপেব কথা ভেবে গুটিযে যায়।

দাঁডকাক ডানা ঝাপটায়।

—বাবা কি চললেন নাকি?

—যাই, বনি বেবি হযেচে, বেগম জনসনকে খপবটা দিয়ে আসি। আগে হলে গড়ের বাদ্যি বসত। হিজডেব নাচ হত।

দাঁডকাক উড়ে চলে গেল

টাকলা ও সি-র টেবিলে ফোন বাজল।

—হ্যালো।

—ওঁযা। ওঁযা।

—হ্যালো!

—ওঁয়া। ওঁযা।

পার্টি অপিসে কমবেড আচার্য-ব ফোনও ডেকে ওঠে। কিন্তু কমবেড আচার্য না থাকাতে ফোন বেজে বেজে থেমে যায়। কমবেড আচার্য, আপনি আগামী সম্মেলনের জন্যে খচড়া প্রস্তাব বচনায় লেগে থাকুন। ওদিকে যা হওয়াব তা হযে গেল। এব দাম আপনাকে দিতে হবে। আপনি চান বা না চান চোক্তাববা চমকাবে এবং ফ্যাতাড়ুদেব বংশবৃদ্ধি ঘটবে। চাকতি উড়বে। বেগম জনসন গ্র্যান্ড পার্টি ডাকবেন। পাতিযালাব মহাবাজা ১০০১ টা নীলচে সাদা হীরের ব্রেস্টপ্লেট পরে উদোম ন্যাংটো হয়ে বছবে একবাব কবে নগর পরিক্রমায় বেরোবেন। জন স্টুয়ার্ট মিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে ভাবত একটি vast system of outdoor relief for Britains's upper classes হয়ে উঠেছে। চার্চিল বলবেন, I hate Indians, they are absolutely people with a beastly religion কাপুবথালায একবাব পালে পালে পঙ্গপাল ঢুকে ফসলেব দফা বফা করে দিয়েছিল। এখন যেমন পঙ্গপাল ছাড়াই কাজটা হয। তখন প্রজাদের হাঁউ মাউ কান্না শুনে কাপুরথালার মহা মাগিবাজ মহারাজা বলেছিলেন, Let the locasts dance, we are going to dance in Paris কমরেড আচার্য, আপনি খচড়া প্রস্তাব লিখতে থাকুন। আমরা তা অক্ষবে অক্ষরে পালন করব। আপনি আমাদেব ওপর ভরসা বাখতে পারেন। আমরা চোরাবালির মতোই মমতাময়।

গোলাপি লিপিস্টিক চুলবুলে ঠোঁট আবছা ফাঁক কবে ট্রেইনি নার্স মিস চাঁপা এসে ফিসফিসিয়ে উঠল,

—মিঃ ডি. এস কে আছেন?

—অ্যাঁ।

—আপনি মিঃ ডি. এস?

—ইয়েস।

—ডক্টর রেচাউড্রে কথা বলবেন। প্লিজ কাম উইথ মি।

ডি. এস ঘামতে ঘামতে মিস চাঁপার সঙ্গে গিয়ে দেখে গায়নো গজার হাল খুবই বেসামাল। মালটা ঠ্যাংদুটো টেবিলে উঠিয়ে দিয়ে চেয়ারে কেলিয়ে রয়েছে। মাথায় ভিজে তোযালে দেওয়া। এবং সিনিয়র মেট্রন মিসেস পোড়েল গজার বাঁহাতটা মালিশ করচে।

—আপনি?

—কী?

—না, মানে, ওই যে ছেলেটা হল সেটার বাপ আপনি?

—ছেলে হয়েছে?

—ওপর ওপর দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি, তারপর গিয়ে আপনাব বউ—আপনারা কী বলুন তো?

—মানে?

—মানে, সোজা, আপনারা কি মানুষ না ভূত-ফুৎ কিছু?

—কেন বলুন তো?

—কেন? দুনিয়ায় যত বাচ্চা পয়দা হয় সব কেঁদে ওঠে। আপনার ছেলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল আর নাভি কাটার পরই, লাইক আ বার্ড, উড়তে শুরু কবল—

—কেমন আছে ওরা?

—ভালো আছে। মা-র জ্ঞান ফিরবে একটু পরেই। কিন্তু...

ডি. এস কিছু বলার আগেই পেছন থেকে মদন আর পুবন্দর ঢুকে পড়ে।

—কোনো কিন্তু ফিন্তু নয়। মা, বাচ্চার কোনো এদিক ওদিক হলে কিন্তু গাযনো কোম্পানির তেশ মেরে দেব।

—আপনারা?

—চোপ। কোনো বেগড়বাঁই নেহি চলেগা। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা মানুষ। কিন্তু আবার মানুষও নই। দেখবেন ছোট করে একটা ঘুঘুচক্কর?

ড. রায়চৌধুরি ওরফে গায়নো গজা, মিসেস পোড়েল এবং মিস চাঁপার বিস্ফারিত চোখের সামনে তিন ফ্যাতাড়ুই টেক অফ করল এবং হাত পাঁচেক উঠে হেলিকপ্টারের মতো দাঁড়িয়ে গেল। দুপাশে হাতগুলো ডানার মতো ওঠা নামা করছে। তিনজনেই দাঁত কেলিয়ে দিয়েছে। ডাঙায়ও তিনজন। তাদের প্রায় দাঁতকপাটির জোগাড়। ছটি স্তম্ভিত চোখের সামনে তিনজনেই ল্যান্ড করল।

ড. রায়চৌধুরির নির্দেশে তড়িঘড়ি মিসেস পোড়েল ও মিস চাঁপা কেটে পড়ল।

—কদিন লাগবে?

—হপ্তাখানেক তো বটেই। মানে মাদার, একটু বেশি বয়েস তো তাই ভাবছি...

—ও সে যা ভাবাভাবির আপনি করে ফেলুন। আমাদের কিছুটি বলার নেই। ডাক্তারি ব্যাপারে আমরা নাক-ফাক গলাচ্ছি না।

—'ডাক্তারি করে ডাক্তার
মোক্তারি করে মোক্তার
ফ্যাতাড়ুরা খেলে হারামির হাটে
চোক্তারি করে চোক্তার।'

কী বুঝলেন?

—আমার বুঝে কাজ নেই। যা বলার আপনারাই বলুন।

—তার মানে আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার।

—শুনুন। অপরাধ নেবেন না। আমাদেব হাতে পয়াকড়ি হেভি টাইট বুঝলেন। এদিকে আমাদের আগেভাগেই তো গাঁড়ে হনুমানেব বাচ্চা চলে যাওয়াব জোগাড়। আপনাব ছুরি ধরা, ও টি চার্জ, বেড ভাড়া, আয়া— অত খরচা আমবা দিতে পাবব না।

—পারলেও দেব না।

গরিবেব গাঁড় যারা মারে।

ফ্যাতাড়ুরা হাগে তার ঘাড়ে।

—দোহাই, ওইটি করবেন না। আমি তো আপনাদের কোনো কথাতেই না বলিনি। আপনাদের যা প্রাণ চায় দেবেন। আমার কিছু বলার নেই।

—আমাদেরও আর কিছু বলার নেই।

—আপনি কি মাল খান?

—আমি?

—হ্যাঁ, তবে কি আমবা?

—আঁজ্ঞে, দিনান্তে সামান্য একটু ধরুন পেগ দেড়েক ব্রান্ডি!

—খুব ভালো। আপনাকে ভালো মাল খাওয়াব, ফবেন। মা বাচ্চাকে ভালো করে দেখুন। দেখবেন আপনার জন্যে কেমন জান লড়িযে দেব। কোনো অসুবিধা হবে না। এবপর একদিন আপনাকে ভদিদার ঠেকে নিয়ে যাব। দেখবেন ছপ্পড় খুলে যাবে। মাটাডোবে কবে টাকা নিযে যেতে হবে। যা কিছু হচ্ছে সবই ভদিদার কৃপা।

—যাব। নিশ্চয়ই যাব। ওঁর কি কোনো আশ্রম আছে?

—আবে ওসব ভগবানেব বাচ্চা ধরার কেস নয়। ভদিদা হল আপনার আমার মতোই। তবে হেভি কৃপা।

—নিশ্চয় যাব। আসবেন যখন ইচ্ছে।

—না, অন্যায়টা আমাদের করতে বলবেন না। ভদিদার বারণ আছে। আমরা ভিজিটিং আওয়ারেই আসব। বেটাইমে আসত যাব কেন?

—বেটাইমে এলে দারোয়ান দাঁত খিঁচোবে। আমরাও বেকার খচে লাথ-ফাত ঝেড়ে দেব। মধ্যে থেকে আপনার নার্সিং হোমের বদনাম। কোনো ক্যাচালে আমরা নেই।

—আজ তাহলে আমরা আসি?

—আসুন ভাই। আসুন। কী কপাল যে আপনাদের দেখা পেলাম। ভদিদাকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন। একটু যদি কৃপা করে দেন। তেতলায় একটা এ. সি. ওয়ার্ড খুলব বলে মনে ভেবেছি। মাড়োয়ারিরা এ. সি চায়। পলিটিকাল লিডাররাও।

—সব হয়ে যাবে। ভদিদা একটু ছোট কবে একটা মুচকি দিলেই কারো বাপ ঠেকাতে পারবে না।

শিশু ফ্যাতাড়ু ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া বেড়ায় ও শূন্যে ডিগবাজি খায়। ডি. এস-এর বউ-এর জ্ঞান আসে এবং সিজার কেসে সচরাচর যা হয় তেমন নয়। কোনো ককানি ফকানি নয়। বেদনায় কাতর মুখমণ্ডল নয়। উড়ন্ত শিশুর দিকে হাসিমুখে মা দুহাত বাড়িয়ে দেয়। অমনি সেই শিশু বোঁ করিয়া দুধভরা মাই লক্ষ করিয়া ডাইভ মারে।

কলকাতার পোজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের তারাবীক্ষণ যন্ত্রে সহসা বহুত সংখ্যায় উড়ন্ত চাকি দেখা গিয়েছিল। সেন্টারের ডিরেক্টর মিঃ সিকদার স্বচক্ষে একাধিক চাকতি দেখেছিলেন। কিন্তু মানেননি। কারণ আসলি বিজ্ঞান উড়ন্ত চাকি-ফাকি মানে না। কল্পবিজ্ঞান বা পবাবিজ্ঞানকে আসলি মালের সঙ্গে ঘেঁটেঘুঁটে পয়মাল করে দেওয়ার যে অব্যর্থ চক্রান্ত চালু হয়েছে মিঃ সিকদার তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। নানা সেমিনারে, বিতর্ক সভায় ও টিভিতে তাঁর হুংকারে চমকে ওঠার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। অবশ্য এই 'আমাদের' মধ্যে বিজ্ঞানমস্ক পাঠকরাও কি পড়েন? ছোট্ট বন্ধুদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে? ছোট্ট বন্ধুরাই বা কারা? আসরেই কি সব পাওয়া যায়? গল্পদাদুর বউ কি গল্পদিদিমা? এরকম ২০০০টি অসমাধিত হেঁয়ালির বই 'আনি মানি জানি না'-র চতুর্দশ সংস্করণের কয়েকটি কপি এখনও পুস্তকরাজির ছাইভস্মের মধ্যে ছুপা রুস্তম হযে গা ঢাকা দিয়ে আছে। 'এটির মধ্যে ওটি দিয়ে, মাগভাতারে রইল শুয়ে।' এর মানে কিন্তু যা ভাবা স্বাভাবিক তা নয়। এর অর্থ হল খিল। হেঁয়ালির জট খুবই জটিল। রুবিকের কিউব যেমন। ওপথে মহাজনদের শনৈঃ শনৈঃ যাওয়া আসা চলতে থাকুক। রাত বেড়েছে। চাদরমুড়ি দিয়ে বড়িলাল এই শীতের রাতে কোথায় যায়? কেন যায? কেচ্ছার চান্সটা যেহেতু এই দিকেই তাই সেই দিকেই মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

মন্দিরের পেছনের গলি দিয়ে বেরিয়ে বড়িলাল কিন্তু থমকে গেল। আদিগঙ্গার দিক থেকে একটা আঁশটে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কিন্তু সে কারণে বড়িলাল দাঁড়ায়নি। একটা ভারি গাড়ির আওয়াজ জোরে হচ্ছিল। তার একটা হেডলাইট জ্বলছিল বলে ফুটপাথের এক সাইডেই বেশি আলো এবং হবি তো হ বড়িলাল পড়েছিল সেই দিকেই। গোঁ গোঁ, ঝড়ব লঝড় শব্দ আব কার হতে পারে। ক. পু-র একটি ভ্যান যা কালবিলম্ব না করে ওজন দরে ঝেড়ে দিলেও গরিব ও বঞ্চিত সরকারের ঘরে কয়েকটা পয়সা আসবে। ভেতরে ড্রাইভারের পাশে বসে টাকলা ও. সি। পেছনে তিনটে ঝিম মারা কনস্টেবল। এদিকটায় আনকা যাবা মাগিবাড়িতে যায় তাদের ডবল ছেনতাই হয়—ছেনতাইবাজরা ঝেড়েঝুড়ে নেওয়ার পরে পুলিশের হাতসাফাই। এসব জৈব ভয় বড়িলালের না থাকলেও সে স্ট্যাচু হয়ে রইল এবং একচোখে ভ্যানটিকে নিবাপদ দূরত্ব অবধি যেতে দিল। চাদরমুড়ি বড়িলালের কাঁধে একটি বিবর্ণ বুদ্ধিজীবী ব্যাগ যাব মধ্যে কাগজে জড়ানো একটি রামের পাঁইট। অতিবিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া বড়িলাল মালমুল টাচ্ করে না কিন্তু যখন খায় তখন ছ্যাঁচোড়ের মতো খায় না। বড়িলালের এই হিসেবী সংযম নিশ্চয়ই পাঠকদের একাংশ অনুকরণীয় বলে মনে করবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব পাঁড় ও টুপভুজঙ্গদের অন্তরে কোনো বিবেচনার ঢেউ তুলবে না। তার কারণ কিন্তু হারামিপনা নয়। দেদারে যারা মাল প্যাঁদায় তাদের গুরু ও লঘু মস্তিষ্কে কিছু ভাইটাল রদবদল ঘটতে থাকে। সেই নিউরন-সমাহারগুলি অলস তাসা পার্টির সঙ্গে তুলনীয় যারা বায়না ফিরিয়ে দেয়। এর পরিণতি বিবেচনাবোধেব হ্রাস, গতরাতের বাওয়াল ভুলে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সিনড্রোম যা নিয়ে আর গবেষণা করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, গাঁজা নিয়ে গবেষকরা কিন্তু একমত নন। এ পর্যন্ত এর বেশি কেউ জানে না। আর অত জেনেই বা কী বালটা হবে?

কয়েক ঘরের শীতার্ত মাগিপাড়া। সব খানকির পাকা ঘরও নাই। বড়িলাল কিন্তু যে ঘরটির সামনে দাঁড়াইল সেটি কাঁচাপাকা। নানাদিক হইতে ত্যারচা গোয়েন্দা আলো ও এলোমেলো তস্কর ছায়া এসে এক অনির্বচনীয় মিশেলের সৃষ্টি করিয়াছে। বড়িলাল দরজায় দুইবার টুকটুক করিয়া গাঁট্টা মারিল এবং অনুচ্চ স্বরে ডাকিল,

—কালী। কা...লী...

ঘুমচোখে যে দরজা খোলে সেই কালী তা আবার নাই বা বলা হল।

—এসো। ভাবলুম আর না হয় এলে না। বসে বসে ঘুম ধরে গেল।

কালী ম্রিয়মান হ্যারকেনটির শিখা উস্কাইয়া দিল। ফলে অপ্রশস্ত দেওয়ালে নানা ঠাকুর দেবতার ছবির ওপর বড়িলালের রাক্ষুসে ছায়া পড়ল।

—সাবান আর একটা কাচা কাপড় দে।

বড়িলাল উঠানে গিয়া অর্ধ গোলার্ধের ন্যায় কাপড় কাচা সাবানে হাত, পা, মুখ ধুইয়া কক্ষে ফিরিল এবং চৌকাঠে শায়িত চটের টুকরোটিতে পা ঘসিয়া মুছিল। এবং ঘরে আসিয়া নিজের কর্মক্লান্ত বেশভূষা ছাড়িয়া কালীর কাচা কাপড়টি যাহার নমনীয়তা মায়াময় এবং কেমন চাঁদ চাঁদ গন্ধ, লুঙ্গিগ করিয়া পরিল।

ইতিমধ্যে কালী দুইখানি গ্লাস ও একটি রেকাবিতে ছোট চিংড়ির মাথা ভাজা ও বড় বোতলে জল সাজাইয়া বসিয়াছিল। বড়িলাল কালীর চিরুনী দিয়া চুল আঁচড়াইল। তাহার পর কালীর মেঝেতে পাতা ঢালাও বিছানাতে আধশোয়া হইয়া রহিল। হাতের উপর মাথাটি রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার বাইসেপটি ফুলিয়া ওঠে। কালী বলে,

—হাত ব্যতা করবে। ওই কোলবালিশটা টেনে নাও।

কালী মাপ করিয়া ওল্ড অ্যাডভেঞ্চারার রাম ঢালে। জলের বোতল ধরে।

—আমার দিকে কী দেকচ? জল ঢালচি দেকবে তো।

আমরা জানি যে কালীকে যৌনকর্মী বলা উচিত না উচিত নয় তা নিয়ে সমাজের চিন্তাশীল অংশের মধ্যে বিতর্ক, বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা প্রায়ই ঘটে। দুপক্ষই এমন লড়াকু যে পারে তো এখনই এ উহার গুহ্য মারিয়া দেয়। এই ঘোলা জলে ইচ্ছা করিলে দু একটি মৎস্যও যে ধরা যায় না তা নয়। কেবল একটি খ্যাপলা জাল বেড়ি রাখতে হবে।

কালীর ঘরে লণ্ঠন ওরফে হ্যারিকেনের আলো কমিয়া গেল। 'শিশুমার মেটারনিটি হোম' হইতে ওঁয়া ওঁয়া শোনা যায়। রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তা রক্ষা করার দায়িত্ব সকলেরই হইলেও রাজাদেরই বেশি।

এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আলমোড়া হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় মহারাজকুমার শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন 'তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে অত্যন্ত সহিষ্ণু হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে অনেক অন্যায় অবিচারও তোমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে—তখন তোমার তেজস্বিতা যেন তোমাকে আত্মবিস্মৃত না করে। নীরবে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে— নিজের দিকে না তাকাইয়া নিজের কর্তব্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের রাজাকে ও রাজ্যকে যাহাতে কোনো প্রকার দুর্বলতা আক্রমণ করিতে না পারে— ক্রমে ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া যাহাতে সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পার সে জন্য তোমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। হঠাৎ যাহাতে কোনো বিপ্লব বাধিয়া না উঠে, সে জন্যও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইবে।'

· ওঁয়া ওঁয়া। (চলবে)

১০

দশ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করার অভিসন্ধি নিয়েই 'কাঙাল মালসাট' শুরু হয়েছিল কিন্তু গত অধ্যায় বা কিস্তিটা ছাপার সময় ভূতের খপ্পর কাকে বলে তা বোধগম্য হল। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। প্রথম প্রুফ যেই এল তখনই নজরে পড়ল যে শেষে যেখানে (চলবে) বলা থাকে সেখানে বেরিয়েছে (চলবে না)। সংশোধনের পরেও সেই আশাভঙ্গকারী 'না'। কমপিউটারের মাউস বা ক্যাট কেউই বাঁদরামি করছে না, তারা শুদ্ধ, ভাইরাস মুক্ত এবং যে পত্রিকায় এক এক পক্কড় করে ধরাশায়ী হচ্ছে সেখানেও কুচোকাচা কেউ ঢ্যামনামি করেনি। (চলবে না)—এর চেয়ে বরং ঢলবে না, টলবে না হলেও মুখরক্ষে হত কিন্তু (চলবে না) অবশ্যই অপমানজনক। লেখকের মধ্যে তখন খুবই প্রাকৃতিক ডাকের মতো যে উপলব্ধি পাওনা হল তা হল এ নিশ্চয়ই সম্পাদকের হারামিপনা। হয়তো তা প্রমাণিতও হত। এই নিয়ে বাদানুবাদের সময় সম্পাদক বরং শেষমেশ অপারগ হয়েই লেখকের দিকে পাণ্ডুলিপির জেরক্স ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এটা কি আমার বাপের হাতের লেখা? লেখকের নিজেরই লেখা। অবিকল সেই হস্তাক্ষরে, নির্ভুল বানানে লেখা— (চলবে না)। সম্পাদকের কবুলতি হল চলুক বা না চলুক—কিছুতেই তার এক গাছাও ছেঁড়া যায় না। একই মত লেখকেরও। একইরকম গোঁ সব শালাবই। রহস্য সায়ার মতোই রহস্যময়ী। আসল কারণ কেউই জানে না। প্রেতলোক অনেক সময়ই অটোমেটিক রাইটিং বা ওই জাতীয় কোনো ছলের আশ্রয় নিয়ে অপরিবর্তনীয় ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু মানুষের ধাতে ভূতের নির্দেশ মানাব কোনো সদিচ্ছা নেই। অবধারিত নিয়তি এভাবেই নির্জন জলার কাছে, আলেয়ার হাপসু গ্যাসালো আলোর নিকটস্থ নীরবে অপেক্ষারত দক্ষ ঠ্যাঙাড়ের সান্নিধ্যে ভ্রাম্যমাণ পথিকবরকে নিয়ে যায়। অতএব বোঝা যাক যে এবারেও তার অন্যথা হবে না কিন্তু যতক্ষণ হাতেনাতে না হচ্ছে...

দুই খিলানের ওপরে নির্মিত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ঝুলন সেতুটির টঙে বসে দাঁড়কাক কলকাতার এক একটি বিশিষ্ট এলাকা যেমন খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, গঙ্গা নদীর গায়ে ডক চত্বর, একগাছা লোমের মতো মিলেনিয়াম পার্ক, ইডেন গার্ডেন, ময়দান, আখাম্বা মনুমেন্ট, চৌরঙ্গী এলাকার হিজিবিজি, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ভার্জিন কলেজ গার্লদের নগদা বাজার, ভবানীপুর, বিকট ধোঁয়াটে কুহকে ঢাকা উত্তর কলকাতা, বালিগঞ্জের সেইসব এলাকা যেখান থেকে জীবনানন্দের গল্পের হেমেন প্রমুখ চরিত্ররা মোটা বউ নিয়ে বাসে উঠত বা ট্যাক্সি হাঁকাত তারপর ফারপোতে গিয়ে চপ-কাটলেট প্যাঁদাত, অথবা আরেকটু ঘাড় ঘুরিয়ে বাইপাস, সল্টলেক, কসবা কানেক্টর ইত্যকার বিবিধ হুলিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল আর খিস্তি করছিল।

ভদি বানচোৎকে ধরে আড়ং ধোলাই দিতে হবে। এরকম একটা জালি, খুপরি খুপরি শহরে কোথায় গেরিলা হুজ্জুতি ধান্দা করবে, তা না, গাণ্ডুটা একেবারে আর্মির ঢঙে পজিশনাল ওয়ারের ছক কষছে। নুনুকামান দিয়ে পজিশনাল ওয়ার। এঁড়ে চোদা। বললুম লড়ালড়ি পরে করবি আগে লেখাপড়া কর। হদিশও দিলুম। মাও, গিয়াপ, চে, মারিঘেল্লা, টিটো— এগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নে তারপর কাগজ কলম নিয়ে মাদুরের উপরে পোঁদ উল্টে নিজের মতো ছক কর। যুদ্ধ করা সোজা ব্যাপার। হাওদা, হাতি, মাহুত— সব নখদর্পণে থাকতে হবে। তা না ল্যাওড়া কেবল তড়পাবে। দেদারে তড়পাবে। আমার কি। উলটোপালটা দেখলে বাঙলা কথা—আমি নেই। এত যদি তোর আব্বা বেগম জনসনের কাছে আরলি যুদ্ধের স্টোরি শোন— টিপু কী করেছিল, হায়দার আলি কী খুঁচিয়েছিল, সিরাজ ফোর্ট উইলিয়ামের পুঁটকি মেরে দিল কিন্তু

সাহেবদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কী কবে? তখন তাবা জাহাজে কবে মাঝ গঙ্গায নোঙব মেবে ঘাপটি মেবে আছে। কেটে পড়, ছিপে যাও, তাবপব যেই দেখবে এনিমি মাল মাগির ফোয়াবা খুলেছে ওমনি 'শোলে'-ব স্টাইলে ঝাড় লোহে গবম হ্যায়, লাগা দো হাতোডা। তা না বাঁড়া কেবল লম্ফ ঝম্ফ। টঙে বেশ ঠাণ্ডা তো। ডানঝাপটাবো? হাই অলটিচুড তো, ইংলিশ হাওয়া লাগছে। ওফ্ এই একটা জাত, কবে হাওযা ছেডে কেটে পড়েছে, এখনও যেমন ফুরফুবে তেমন গন্ধ।

দাঁডকাক ডানা ঝাপটাল। একটি পালক খসে উডতে থাকল। পালকটিকে সাধারণ ক্রো ফেদার ভাবাটা বোধহয় ঠিক হবে না কারণ পালকটি পাক খেতে খেতে গঙ্গায পডল এবং শুভ্র ধাবমান সিলভাব জেটেব গায়ে জল ছবিব মতো আটকে বিনা পযসায় হলদিযা চলে গেল। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কেন লাটে উঠছে তা বুঝতে হলে এই ঘটনাটিকে ধরেই এগোতে হবে। এখানেই বয়েছে ভাইট্যাল ক্লু। এব বেশি বলা বাবণ আছে। কাবণ আলিমুদ্দিনে খববটা গেলেই গেঁতো গবরমেন্ট নড়ে চড়ে বসতে পাবে। সে হ্যাপা সামলানো 'কাঙাল মালসাট'-এব ধকে কুলোবে না। অবশ্য এতক্ষণে নিশ্চযই রটে গেছে যে আমবা আনন্দবাজার বা সি পি এম অথবা তৃণমূল কিংবা ঘাড়ভাঙ্গা কংগ্রেস কোনো মালকেই খচাতে চাই না। কিন্তু নিজে নিজে, আপন গবজে কেউ যদি খচিযান হযে ওঠে আমাদের কিছুই কবাব নেই। এরা তো এলিতেলি —বিশ্বজোডা যার বোযাব ছিল সেই ব্রিটিশদেবও জীবনে এই আনন্দেব পূবকি তো পরক্ষণেই নেমে আসত বেদনা বিধূব মূর্ছনা। ভাণ্ডিভাস Wandi wash, আরকট, পলাশী, বক্সার বা সেবিঙ্গা পত্তনামে যুদ্ধ জয়েব সে কি উল্লাস! কিন্তু যেই ব্ল্যাক হোল (মহাবিশ্বেব খতরনাক কৃষ্ণ গহ্বরের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলাই ভালো) বা পাটনা ম্যাসাকার, অমনি ক্রুদ্ধ ক্রন্দন ও পাঙ্খাওযালাকে খিস্তি। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ট্রাজিকমিক বোধ জাগ্রত কবাব জন্য আমাদেব ইভব এডওয়ার্ডস স্টুযার্ট নামধাবী এক অতীব খচ্চব সাহেবের হাত ধবে বাবংবার বেগম জনসনেব গলতায যেতে হবে কারণ বেগম জনসনই সেই দুর্বার মহিলা যিনি চাবটি বিযে করার ফাঁক ফোকরে স্বচক্ষে সিবাজৌদ্দল্লাকে দেখেছিলেন, ক্লাইভ ও ওয়াটসনেব মতো প্রতিভাধরদের সঙ্গে গালগপ্প চালিয়েছিলেন এবং গভীর আনন্দেব সঙ্গে লক্ষ কবেছিলেন যে হোলকাব, সিন্ধিযা ও এমনকি ভীতিপ্রদ মারাঠাও কিভাবে জন কোম্পানির সামনে সেঁতিয়ে গিয়ে 'জো হুকুম জো হুকুম' কবছে। এই জন্য বেগম জনসনের কাছে আমাদেব চিবকাল নতজানু হয়ে থাকতে হবে। অন্যটি হবাব উপায় নেই।

'জয় মা গ্যাঞ্জেস' বলে বিশাল দাঁড়কাক দ্বিতীয় সেতুব টঙ থেকে উড্ডয়ন করল এবং তখনই তাব নজবে এল কয়েকটি উড়ন্ত চাকতি ঝাঁক বেঁধে খেলা করতে করতে হাওডার দিকে যাচ্ছে। বা খেলার ছলে হাওড়ায় চলেছে বললেও অতিকথন হয় না। উড়ন্ত চাকতির খেলা অনেকটা বাজারের আমিষ অংশেব আকাশে মাছিদেব ওড়াউডিবই সামিল। কিন্তু কিছুক্ষণ এমত ক্রীড়ায় মাতোয়াবা হওয়াব পব মাছিবা কী করবে সেটা বলে দেওয়া যায় কিন্তু উড়ন্ত চাকতিদের যে কি মতলব তা শিবের বাপেরও অসাধ্যি। হঠাৎ হয়ত ভাটিযালি গানে মুহ্যমান মাঝির দিকে তেড়ে গেল বা গঙ্গাতীরে স্নানরতা যুবতীদেব দেখে মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে গেল। এব কোনটি যে হবে তা কেউ বলতে পারে না। শুধু কোয়ান্টাম জগত নয়, অন্যত্র এইভাবে ওয়ারনার হাইজেনবার্গ-এর আনসারটেনিটি প্রিন্সিপাল প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। দাঁড়কাক উড়ন্ত অবস্থাতেই স্ট্র্যাটেজিক দক্ষতায় কিছুটা পুরিষ ত্যাগ কবিল যা হাওয়ায় ডানা মেলে দিলেও মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ টানে নেমে আসতে বাধ্য হয এবং পড়বি তো পড়ে দুঁদে ট্র্যাফিক সার্জেন্টেব

গগলস্-এর ওপরে। দুঁদে সার্জেন্ট 'শিট' বলিয়া আক্ষেপ করে ও মোটর সাইকেলটি সাইডে ভেড়ায়। কিছুটা মোটা ভুরুতে বাকিটা রেব্যান-এর গা দিয়ে গড়াচ্ছে। সার্জেন্ট-এর পরবর্তী ডায়লগ হল 'ভালো রুমালটার গাঁড় মাবা গেল।' দীর্ঘ কালো চঞ্চুতে কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়ে দাঁড়কাক উড়তে থাকে এবং আরও বেশ কিছুক্ষণ ফ্লাইটের পব ভিক্টোরিয়ার মাথায় পরীর পাশে নিখুঁত ল্যান্ডিং কবে। সেই সময়েই ঝটকা বাতাস এলো এবং দীর্ঘদিন পরে কাছে আসার অভিমানে পরী মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে জায়গাটি অচেনা হবার কথা নয়। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ আজকাল খুব বেশি পিস্ পড়ে না। গম্বুজের ওপরে পরী ও দাঁড়কাক। কিন্তু দাঁড়কাকের চোখে পড়ল এক কাণ্ড। এক তরফা গোলকাযনেব সুলভ শৌচের পরিবেশে একদঙ্গল ব্রিটিশ টুরিস্ট নানাবকম ক্যামেরা ও ভিডিওক্যাম সহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে বেড়াচ্ছে এবং বাইবে যাবার নুড়ি মারানো পথে দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ায় কিউরেটর তাদেব ড্যানিয়েল, জোফানি ও ভেরিশ্চেগিনের আঁকা ছবির মহিমা বর্ণনা করছে। ইনি শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর তথা ডিবেক্টরই নন, কলকাতার স্বল্প দৈর্ঘ্যের ইতিহাসেব ওপরে যারা ঘ্যাম তাদের মধ্যমণি বলা চলে। নিজেব জীবনের উত্তরোত্তর উন্নতিব বাঁকে বাঁকে তিনি জায়গা বুঝে একটিই কথা কখনো অস্ফুটে, কখনো সজোরে বলে এসেছেন— 'সবই চার্নকেব দযা!' আজও অন্যথা হল না। মূর্খ সাহেবদের দলটি হাহা হিহি করিয়া বিদায় গ্রহণেব পব কিউবেটব মহাশয় এই ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে ফিবিয়া আসিলেন যে, প্রাচীন কলকাতায় মাগিবাড়ি সম্বন্ধে নানা তথ্য ইতস্তত ছত্রাকাব হইয়া রহিয়াছে—সেগুলিকে একত্র কবিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে বাধা কোথায়—এই গ্রন্থটি বাংলায় হইলে ভাল না যুগপৎ ভাবে ইংবেজি হওয়াও আবশ্যক— মালটাকে ডাগব কবে তুলতে হলে কত কাঠখড় পোড়াতে হবে— এই সাতপাঁচ ভাবনার শেষে চেয়াবে গা এলাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, 'সবই চার্নকেব দযা'।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানলার দিক থেকে জবাব এল, 'কেন, তোর বাপ কী দোষ কবল?'

এ এক রূপকথার দৃশ্য। ঘরেব মধ্যে মহাপণ্ডিত ও জানালার বাইরের অপ্রশস্ত অংশটির ওপরে কলকাতার ওলডেস্ট দাঁড়কাক ওরফে ভদির বাবা। মুখর মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিয়েই দাঁড়কাকটি ঠোঁট চুলকোয়।

তবে কি দাঁড়কাকই কথা বলিল? না ভূত? কিউরেটর সাহেব লহমাভর এই চিন্তা করিলেন যে তিনি হয়তো বা অজান্তেই মৃত। কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই জীবিত ছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার ভৌতিক জগতে প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে। প্রেতপুরীতে দাঁড়কাক কেন, মশা, ব্যাঙ, গোসাপ সকলেই অবলীলায় বোধগম্য বাক্য চালনা করে। এমত চিন্তা করিয়াই ধুরন্দর মাথায় অন্য মতলব খেলিল। এমনও তো হইতে পারে যে আমি জীবিত দণ্ডবায়সের মুখে হয়তো নিজেই কল্পিত উক্তি ভাবিয়া তামাশা ফাঁদিয়াছি। অতএব কেঁচে গণ্ডুষ করে দেখাই যায়। তাই কিউরেটর ফের বলিলেন— 'সবই চার্নকের দয়া!'

দাঁড়কাক চোখ পাল্টায়।

—একটা ঠোক্কর খেলেই বুঝবি কার দয়ায় করে খাচ্ছিস। হারামির হাঁড়ি কোথাকার। যা, অভিশাপ দিলুম তুই পরের জন্মে গুয়ের পোকা হয়ে জন্মাবি। তাও, এখেনে নয়। ধর বর্ধমান বা মানকুণ্ডুতে। গুয়ের ডাব্বায় গুয়ের পোকা। গু খাবি, গু মাখবি তারপর একদিন গুয়ে ডুবেই পটলে যাবি।

কিউরেটর ভাবিয়াছিল সজোরে একটা পেপারওয়েট ছুঁড়িবে কিন্তু সাহসে কুলায় নাই।

—বুঝেছি আপনি বুলি কপচাতে শিখেচেন। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে মানুষ যে সুপারম্যানের

দিকে এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে কিছুই আপনি জানেন না। অবশ্য কাক-ফাকের এসব জানারও কথা নয়।

—বটে! কাক-ফাক। তাহলে শুনে রাখ্, এই শালা কাকই তোর ওই গণ্ডাকয়েক অরবিন্দ আর নীটশেকে ট্যাঁকে রাখতে পারে। সুপারম্যান মারাচ্ছে। সুপার গুয়ের পোকা আগে হ, তারপর সুপার বাল, তারপর সুপারম্যান হবি। তোঁরমতো ছকবাজ যত কম জন্মায় ততই মঙ্গল। সবই চার্নকের দয়া! এক ঝাপড়া মারব ফের ওই নাম মুখে আনলে। চার্নক। ফাক চার্নক।

—চার্নক ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান। উনি না এলে কলকাতা হত? কলকাতার তিনশো বছরে ঘোড়ার টানা ট্রাম চলত? অত পত্র-পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু বেরোত? অত সেমিনার হত? এবং সব জায়গাতেই আমি আমার অগাস্ট প্রেজেন্স নিয়ে হাজির থাকতাম? কোথাও সভাপতি, কোথাও প্রধান কোথাও বিশেষ, ভেরিয়াস টাইপের অতিথি— বলুন এসব হত? সব ইমপরট্যান্ট মিনিস্টারদের সঙ্গে।

—চার্নক ওয়াজ এ গ্রেট বাল। ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাতার পত্তন করল— তোর মতো হারামি না হলে ওই লুটেরা মাগিবাজটাকে আদিপিতা বলে চালানো যেত? ছাগলের দেশে রামছাগল যা বলে সেটাই অকাট্য যুক্তি। আর তোদের গভরমেন্টেরও বলিহারি যাই। কলকাতার জন্মদিন মারাচ্ছে। তেমন তোদের সব মিনিস্টার। তেমন তুই। পাঁঠার সভার সভাপণ্ডিত। রামপাঁঠা।

—সে আপনি যা বলেন বলুন, তাতে চার্নকের গ্রেটনেসে এতটুকুও আঁচড় লাগে না। যা ট্রুথ আমি তাই তুলে ধরেছি।

—চোপ্। ট্রুথ তুলে ধরতে হয় না। ট্রুথ ঝুলঝাড়ু নয়। ট্রুথ শেখাচ্ছে। জোসেফ টাউনসেন্ডের নাম জানিস?

—আজ্ঞে, শোনা শোনা মনে হচ্ছে.

—ঢপ দিস না। টাউনসেন্ড ছিল বেণ্ডিবাজ এক গ্যাঞ্জেস পাইলট। চার্নকের সাগরেদ। মাগিবাজিতে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়।

—আই প্রোটেস্ট। এ কথাটা আপনি আগেও বলেছেন। চার্নক সতীদাহ থেকে একজন বিধবাকে উদ্ধার করে তাকে বিয়ে করেছিলেন। আর তার নামে .

—বেশি প্যাঁক প্যাঁক করিসনাতো। পোঁদে নেই ইন্দি, ভজবে গোবিন্দি। বিধবা উদ্ধার। তবে শুনবি? ভাইটাল একটা হিস্টোরিকাল ডকুমেন্ট। কবিতার ফর্মে। নে, লিখে নে। অ্যাঃ টেপ করবি? তো ক্যাসেটা লাগা। ডবকা ফিমেল, ঢলো ঢলো ভাব ওই মাল চার্নক জিন্দা থাকতে পুড়িয়ে নষ্ট করবে? মাগি কি ঘুঁইতুবড়ি না নসরিন?

—বলুন, কী হিস্টোরিকাল ডকুমেন্ট?

—বলচি, এটা পড়বি, ভাববি। বলে আমি চলে যাব। তিনদিন পরে আসব। তখন বলবি। নে বোতাম টেপ! জোসেফ টাউনসেন্ডের কবরের ওপরের লেখা— আটটি লাইন, ইংরাজিটা একটু আর্কেইক তবে তোর মতো খচড়া ঠিক ধরতে পারবি— নে...

"Shoulder to shoulder, Joe my boy.
Into the crowd like a wedge!
Out with the hangers, messmates,
But do not strike with the edge!
Cries Charnock Scatter the faggots,
Double that Brahmin in two.

The tall pale widow is mine Joe,
The little brown girls for you,"

দাঁড়কাক ঝটিতি উড়িয়া গেল। কিউরেটর টেপ বন্ধ করিলেন। ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করিলেন। প্লে লেখা বোতাম টিপিলেন, দাঁড়কাকের গলায় জোসেফ টাউনসেন্ডের এপিটাফ ধ্বনিত হইল। কিউরেটর ঢোঁক গিলিলেন। জলপান কবিলেন।

—অ্যাসটাউন্ডিং!

পরক্ষণেই তাঁহার মনে ঝিলিক দিল যে, পরজন্মে তাঁকে গুয়ের ডাব্বায় গুয়ের পোকা হইয়া জন্মাইতে হইবে।

নলেনের কাছে দুঃখজনক সংবাদটি শুনে ভদি বমকে গেল। চারটে ঘরের মধ্যে মাত্র একটা ভাড়া হয়েছে। তাও এসেছে পাগলখ্যাঁচা টাইপের একটা পাবলিক এবং তার সঙ্গে নাকি মালসা-ফালসা ছিল।

—এঃ চুলপোড়ার গন্ধ ছড়াচ্ছে। বানচোৎ করচেটা কী?

—হবে তুকতাক। পোড়াচুলের ধোঁয়া শিশিতে ধরচে বোধহয়। ফুটো দিয়ে দেকব?

—দেকে আয়। চুল পোড়ালে ভালো। তবে গায় না আগুন দেয়।

নলেন প্রতিটি ঘরের দরজাতেই সংলগ্ন গোপন ছিদ্রের একটিতে উবু হয়ে বসে চোখ লাগায়। এবং বিশেষ ওই অবস্থান গ্রহণ করার জন্যই সম্ভবত একটি সহিংস বাতকর্ম ঘটে যায়। অমনি ভেতর থেকে সেই পাগলখ্যাঁচা খেঁকিয়ে ওঠে,

—দরজায় আড়ি পেতে পাদা হচ্ছে! এরপরে ভাড়া চাওয়ার সময় বুঝিয়ে দেব। চুতিয়া কোথাকার।

নলেন চলে এসেছে ছিটকে। এবং মুখ দেখে বোঝা যায় যে চমকেছে। ভদি মিষ্টি হাসে,

—পয়মন্ত খদ্দের। টনক আচে। দেকলি কিছু?

—ওই যা ভেবেছিলুম। হোমোপাথির ছোট ছোট শিশিতে চুলপোড়া ধোঁয়া ধরচে আর ছিপি দিয়ে দিয়ে বন্ধ করচে।

—ওই ধোঁয়া দিয়ে কী হয় জানিস?

—কী আবার? তুকতাক!

—কিন্তু স্পেশাল। ওই ধোঁয়া কোনো বেধবা মাগির ঘবে ছাড়লে তেরাত্তিরের মধ্যে চুম্বকের টানে আলপিনের মতো চলে আসবে। এক এক শিশি হেভি দামে ঝাড়বে। আর খদ্দেরের অভাব নেই। হাজার হাজার লোক বেওয়া মাগি তাক্‌ করচে।

—কিন্তু টেনে আনা এক জিনিস আর জব্দ করা, সে তো খুবই ঝামালা। কতায়ই তো বলেচে, গলায় দড়ির গিঁট আর বিধবা মাগের হিট।

—সে যার চিন্তা তার চিন্তা। আগে মদনানন্দ মোদক খেত, ইয়াকুতি হালুয়া খেত, হাকিম বাড়ি যেত। এখন শুনছি আমেরিকা থেকে কী একটা ট্যাবলেট আনচে। এক বাক্স কিনতেই ফতুর। তবে হ্যাঁ, একটা টপ করে গিলে ফেললেই হল। কলকাতার যেমন মনুমেন্ট তেমন তোরও হয়ে যাবে। সেই যে দাঁড়াবে আর শোওয়া বসা নেই।

বিস্ময়ে নলেনের মুখে হাঁ হয়ে যায়।

—সেও তো বিপদ।

—বিপদ বলে বিপদ। ঘোর বিপদ। যা হোক ওই মালটাকে আর ঘাঁটাসনি। এরপরে বেইমানির ওজর তুলে ভাড়া দিতে গাঁইগুঁই করবে।

—ও আমি ঠিক সাইজ করে নেবখন।

—নিস্। আমি এট্টু বেরুচ্চি। জয় বাবা দণ্ডবায়সের জয়। জয়, ঘুবঘুবে চাকতির জয়।

ভদি বেরিয়েই যাচ্ছিল কিন্তু বেচামণি ডাকল,

—এই নলেন, এট্টু ডাক তো।

—সেই পিছু ডাকলে। যা ভয় করেছিলুম তাই।

—বউ পিছু ডাকলে কিছু হয় না। কি বল্ নলেন।

নলেন গাণ্ডুর মতো মাথা নাড়ে।

—এসব নকড়া ছাড়ো তো। কী বলবে বলো, ঝটপট বলো দিকি।

—বলচিলুম ঠাণ্ডা পড়েচে। চামড়ায় টান ধরচে। গাল চড়চড় করচে। একটা গ্লিসারিন সাবান আনবে তো মনে করে।

—কেন? তেল মেকে হচ্চে না? কী আমার কাননবালা রে, গ্লিসারিন সাবান না হলে চলচে না। একেই মাগগির বাজার। ওসব সাহেবসুবোরা মাখে। কত দাম জানো? মাত্র এক ঘর ভাড়া হয়েচে।

—তোমার ক-ঘরে লোক বসল আমার জেনে দরকার নেই। ও আমি ঢের দেকেচি। এরপর কিন্তু কিস্ খাবার সময়ে বলবে না যে— রেচু, তোর গালটা অমন খসখসে কেন রে?

নলেন ফিকফিকিয়ে হাসে। চুলপোড়া ধোঁয়ায় সকলেরই নাক জ্বালা করছে। ভদির মুখটা দেখে মনে হচ্ছে হিট উইকেট হয়েছে।

—মুখের একটা আব্রু নেই। ঘরের বউ কেউ বলবে?

—তো কী বলবে? বলো! লোককে জিগ্যেস করেই দেখো না। কী বলবেটা কী? বাজারখোলার খানকি? একটা গ্লিসারিন সাবান চেইচি, তাই কত চোপা!

বেচামণি যে ভ্যাঁ করে ককিয়ে উঠবে সেটা ভদি ঠিক আন্দাজ করেনি। উপরন্তু ধারে-কাছে দাঁড়কাক বাবা আছে কিনা সে ভয়ও আছে। খচে গিয়ে হয়তো মাথার মাঝখানে ঠুকরে দেবে বা জোড়া ডানার ঝাপড়া।

—আঃ, য়্যাতো দিন যাচ্চে তত খুকিপনা বাড়চে। আমি কি বলেচি যে গ্লিসারিন সাবান আনব না? ঠাট্রা বটকেরা কিচুই বুজবে না।

বেচামণি ফোঁপায়।

—থাক্। আর সোহাগ দেখিয়ে অ্যাদিক্যেতা করতে হবে না। নলেন, আমি গেলুম। খুকিকে চোকে চোকে রাকিস। চুলপোড়াও না পালায়। কোতায় একটা দরকারি কাজে বেরোর না হাঁউমাউ করে সব ঘেঁটে দিল। গ্লিসারিন সাবান। কত বাঁড়া গ্লিসারিন সাবান দেখলুম।

ভদি চলে যেতে নলেন বেচামণিকে মক্ বকাঝকা করে।

—আর তুমিও পারো বাবা বউদিদিমণি। জানো তো, লোকটার মুকই ওইরকম। কিন্তু অন্তরটা। জানবে যে লোকের মুখে মধু তার অন্তরের বিষ কেউ টের পায় না। দাদাবাবুর হল উল্টোটা। ছোবলাবে কিন্তু মধু ঢেলে দেবে।

—সে না হলে করেই বাপের বাড়ি চলে যেতুম।

—বালাই ষাট! অমন কথা বলতে আচে?

এই ইন্টিমেট, ট্রান্সপারেন্ট ও টাচিং কথোপকথনের মধ্যে ঘটাস্ ঘটাস্ করে ঘর খুলে, গলা খাঁকারি দিয়ে, কাঁধে ঝোলা, পাগলখ্যাঁচা টাইপটা বেরিয়ে আসে। ঝোপঝাড়ওয়ালা পরপুরুষকে দেখে বেচামণি বড় করে ঘোমটা দিয়ে অন্যদিকে চলে যায় এবং তার পায়ে পরা রুপোর

গয়না থেকে ঘুঙুরমার্কা ছমছমা শব্দ হয়। পাগলাখাঁচা আডচোখে বেচামণিব ব্যাক্‌টি সার্ভে করে নেয়। এরকম অবশ্য যাবা পাগলখাঁচা নয় তাবাও কবে থাকে।

পাগলখাঁচা তেলচিটে বুকপকেট থেকে টাকা বেব কবে। দুটো কুড়ি টাকা আব ছটা দশ টাকাব নোট গুণে গুণে নলেনকে দেয। ওর ঝোলার মধ্যে শিশিতে ঘষা খেযে মিহি কিঁচমিচে শব্দ হয। নলেন একটা কুডি টাকাব নোট ফিরিযে দেয।

—কী হল?

—ও জোডা টাকা, চলবে না।

—কোথায় জোড়া?

—মাঝখানে এটা কী? কাগজ সাঁটা জ্বলজ্বল করচে।

—ও ওরকম থাকে। সব চলে।

—চলুক। এখানে চলে না।

—নাও বাবা, পাল্টে দিচ্ছি। মালিক আব মালকিনে খিঁট চলছে বলে ঠাহব হচ্ছে। কী ঠিক বলিনি? এই নাও। ধবো। ভালো টাকা। কী, ঠিক বলিনি?

—টগবগাছতলায় ওই খেঁটোটা দেখতে পাচ্ছ? ওইটা যখন গাঁডে ঢুকিযে দেব তখন টেব পাবে কী চলছে?

—যাঃ বাঁড়া। কী বললুম আর কী বুঝল?

—ঠিকই বুঝেছি। বাল পুডোনো ধোঁয়াতে কী হয জানো?

—আমার আব জেনে দরকাব নেই বাবা। পাগলাখাঁচা আব কালবিলম্ব না কবে কেটে পডে। নলেন এগিয়ে দবজার হুড়কোটা লাগিয়ে দেয। অন্তবীক্ষে একই সঙ্গে বোযিং এবোপ্লেন ও চাকতিব শব্দ। বোযিং সেভেন ফোব সেভেনেব পাইলট উড়ন্ত চাকতিব উন্মত্ত ও স্বচ্ছল খেলা দেখে বিস্মিত হয়। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ কবে।

এই যে অত্যন্ত ভূতুড়ে মহাকাশ আমাদেব প্রায়ই অনন্ত নশ্বরতাব বোধে আকুল কবে তোলে এবং হালকা হাতছানি দিয়ে 'আয়! আয'-বলে ডাকে তাতে ওডাউড়ি কবাব অধিকাব যেমন বোয়িং-এর আছে তেমন ভদির ঘবের উড়ন্ত চাকতিদেবও আছে। ঠিক এই কথা বলাব জন্যে না হলেও বাংলার এক কবি লিখেছিলেন,

ক্ষিত্যপতেজব্যোম ও মরুৎ
সকলেরই তরে এই পঞ্চভূত।

এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ববং কয়েক ফার্লং এগিযে গিযে, —সাম্যেব আদর্শে বলীযান হয়ে, অপারেশন বর্গার কত আগেই বলেছিলেন,

আকাশ-আলো-জল-বায়ু—চাব
—এ সকলে যদি থাকে অধিকার
সব মানুষের, ভূমিতে কেবল
দু-চাবজনের রহিবে দখল?

লড়াকু মনোভাবে ভবপুর এই মহান কবিতাটির শিরোনাম— 'সবৈ ভূমি গোপালকী'। কিন্তু সেই কবির নাম কী? মালটাকে কেউ আইডেনটিফাই করতে পারবে? (চলবে)

১১

বাংলার কবিদের যদি একটি আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড আয়োজিত হয় তাহলে উড়ন্ত চাকতির উচ্চতা থেকে দেখলে মনে হবে পিঁপড়েদের এক মহামিছিল চলছে যার সামনের দিকটি অর্থাৎ মুণ্ডু যখন মিশরের পিরামিডের ছায়া পেরোচ্ছে তখন তার ল্যাজ হয়তো ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে। এত কবি পৃথিবীব কোনো দেশে হয নাই, অদূব ভবিষ্যতে কোথাও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। সেই মিছিলে যেমন কাহ্নপাদ ও ভুসুকপাদ চলিতেছেন, তেমনই চলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বিষ্ণু দে ও কে নয়? এই মহামিছিলেই দেখা যাইবে 'সবৈ ভূমি গোপালকী'-র কবিও আগুয়ান। কিন্তু কেহই সেই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে বিজযলাল চট্টোপাধ্যায়কে শনাক্ত কবিতে পাবিবে না। হয়তো মাইকেলকে চেনা গেল বা কাহাকেও দেখিয়া মনে হইল ইনিই তবে নজরুল কিন্তু বিজয়লালকে কে আইডেন্টিফাই কবিবে? সেরূপ পণ্ডিত বা কবিপ্রেমী আজ বিবল যেরূপই বিবল আর্মাডিলো বা স্নো-লেপার্ড।

জীবনে বাড়িবে আবোও একগোছা ভুল,
'চাওয়া আব পাওয়া' আজও নয় সমতুল।

বলো তো বাছা কার লেখা এইটি? চিনতে পাব? পারিলে না তো। উনিটি হলেন গোপাললাল দে।

কত না নবীন সৃষ্টি – আকাশে ও সাগবেব নীলে
বজনীগন্ধাব বৃন্তে একান্তে যে কবিতা লিখিলে,
আমারে দেখাবে সেই সংখ্যাহীন কবিতা তোমার
তুমি কবি, আমি কবি— আমাবও কামনা দুর্বার।

কোন হ্যায় ইয়ে পোয়েট? হায়, হায— আ. ন. ম বজরুল রশীদ।

খপ্ করে কোনো আঁতেলকে টুকরো প্রশ্ন কবে দ্যাখো। 'বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা' বা 'কুহুর গিযাছে দিন কেকা আজ কাঁপায অম্বর'— বলিতে পার কার কলমের খোঁচায় এই দুটি লাইন খোদিত? শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বলিয়াছেন, ইঁহাব 'কাব্যে সুরার তীব্রতা নাই, শীতল পানীযের স্নিগ্ধতা আছে'। কে তিনি? যাঁর কবিতায় বাংলার কিক্ নাই, পেপসির মোলায়েমতা রয়েছে। কালিদাস রায় জানিযা যান নাই যে 'কবিশেখর' উপাধি তাঁহাকে চিরকাল পাঠক-মুকুরে ধরিয়া বাখিতে পারিবে না।

বাংলা কবিদের মহামিছিল মহাকালেব ফলস্ দাঁত পবা মুখগহ্বরেব দিকে ধাবমান থাকুক। আমাদের অন্য গলতায় ডিউটি পড়েছে। আমরা ববং সেইদিকে ভাঁজ মারি...

সন ২০০০-এর বইমেলাতে অন্যান্য সববারেব মতোই (অবশ্য আগুন লাগাব বছরটি বাদে) আনন্দ ও বাজার, আনন্দ ও বাণিজ্য, আনন্দ ও আইসক্রিম ইত্যাদি কোনোটিই গরহাজির ছিল না। একদিকে ধর্মের ধ্বজা উড়িতেছে তো এই নাও জিরাফের অন্তরঙ্গ জীবনী। তবে বড়ই দুঃখের বাত এই যে, এই মেলায় 'লন্ডন রহস্য' পাওয়া যায় না। এবং সাবি দিয়া দণ্ডায়মান পুলিশকে কেহ এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া বলিয়া ভুলও কবিতে পাবে। মধ্যে এই মেলা বুক ফেয়ার না হইয়া কুক ফেয়ারে পরিণত হইয়াছিল। যারই ফল-পরিণামে সেই লেলিহান সার্কাস যাহাতে আগুন ও ধোঁয়া যথাক্রমে ক্লাউন ও ট্রাপিজের খেলা দেখাইযাছিল। এবং এইসব সম্ভব করিয়াছিল মজুত একখানি ফায়ার ব্রিগেডের নল লাগানো বিকল পাম্প-সহ গাড়ি। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। এক দলের মতে ইহা ট্রাজিকমেডি। অন্য দলের মত— না, ইহা কমিট্রাজেডি। এই

ডেমোরিপাব্লিকান ঢ্যামনামিতে ভাসিয়া গেলে আমাদের বাপু চলিবে না।

'কাঙাল মালসাট' যে বৎসরে তার অভিশপ্ত যাত্রা শুরু করে সেই ১৯৯৯ থেকেই কলকাতা বইমেলা লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কারণ বিদেশি, স্বদেশি— নানা টাইপের হারামি আছে। এবং তারা আছে এবং ভালোভাবেই আছে এটা জেনেশুনে এত বড় মেলাটা অরক্ষিত রাখা যায় না। বলাই বাহুল্য যে, এই নেকনজরের মূলে রয়েছে জনৈক মন্ত্রীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা। মেলায় নানা গোয়েন্দার নানা কাজ। তার মধ্যে প্রতিবারই গোলাপ মল্লিক পুং প্রস্রাবগারের ডিউটি পায়। ছোট, বড় চোতা পোস্টার নিত্যই পড়ে। নানা মাপের ও ঢঙের। সেগুলির স্যাম্পল জোগাড় করা তার কাজ। অর্থাৎ গোলাপ মল্লিকের ডিউটি।

১৯৯৯-তেই গোলাপ মল্লিক মেলায় চতুর্থ দিনে একটি জেবক্স করা পোস্টার দেখে হতবাক হয়ে যায়— পোস্টারটির বাঁদিকে রয়েছে—

শ্রীঘৃত সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী

এবং ডানদিকে

Santiniketan, Bengal

বাংলাদেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালিকে জীবনধারণে সহায়তা করুক— এই কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ বৈশাখ, ১৩৪৪

পোস্টারটি সযত্নে জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খুলে গোলাপ মল্লিক লালবাজারে নিয়ে যায়। সেখানে বড়বাবু দাঁ মালটি স্টাডি করে গোয়েন্দা তারকলাল সাধু-র কাছে পাঠালেন। তিনি গোলাপকে বললেন—

—দ্যাখো মিঃ বোজ, এই যে কলকাতা শহরটা দেখছ না এর মধ্যে অন্তত লাখ দশেক পাগলা রয়েছে। তারা নিজেরাও জানে না যে তারা পাগল। যারা তাদের সঙ্গে থাকে তারাও বুঝতে পারে না। ডেইলি ওঠাবসা করছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। এমনই গাণ্ডু। বুঝলে?

—হ্যাঁ স্যার। আমি ভাবছিলুম গাণ্ডুর নাম্বার তাহলে লাখ পঞ্চাশেক হবেই।

—সে তো হবেই। এছাড়াও উদ্‌গাণ্ডু, তেঢ্যামনা, হাড়হারামি রয়েছে পালে পালে। তার মধ্যে কে ক্ষতিকর বা ফরেন সোর্সের এজেন্ট সেটা স্মেল করাই আমাদের কাজ। তোমার এই পোস্টারটা ইন্টারেস্টিং। রচনাবলীতে নেই। তবে এটা কেন জেবক্স করে মারতে গেল— এ. নির্ঘাৎ পাগলা কেস।

—কিন্তু স্যার, আমি ভাবছিলুম যদি কোনো কোডেড মেসেজ হয়? কোনো গোপন নির্দেশ বা কিছু। হতেই পারে সার।

—এই অ্যাঙ্গেলটা তো ভেবে দেখিনি। জব্বর ধরেছ গোলাপ। ফ্যাকড়াতে ফেলে দিলে।

—না, মানে হঠাৎ মনে হল সেয়ানা পাগল বা ট্যাটনও তো হয়।

—সে তো হয়ই। আমি ফালতু রিসক্ নেব না। কী বলো? একটা নোট দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিই—

—হ্যাঁ, সেই ভালো স্যার। পরে যদি কোনো ঝুটঝামেলা হয়ে যায়।

তারকলাল নোট-সহ ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। একটি ফাইলে। ফাইল একদিন পরে ফেরত এল— ওপরে স্কেচ পেনে লেখা— 'বাল'।

এই ঘটনার থেকে গোলাপ এই সিদ্ধান্তে আসে যে ওপরতলাতেই যখন সম্ভাব্য চক্রান্ত

বা অন্তর্ঘাত সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই তখন সে-ই বা কোন দুঃখে সাপের সন্ধানে কেঁচো খুঁড়ে খুঁড়ে হাল্লাক হবে? তারকলাল সাধুব মতো পোড়খাওযা ঘোড়েল গোয়েন্দা অবদি ব্যাপারটার গ্রাভিটি বুঝেছিল। কিন্তু তাব ওপবে?

—আমাব কী ল্যাওড়া। এবপর যা দেখব চুপচাপ দিযে দেব। তারপর বাপ্তোৎবা যা করবি কবগে যা। এইসব ছোল দিয়ে দেশ চলবে! পড়ত বাঁড়া ব্রিটিশ সাযেবদেব হাতে। গাঁড়ে রুল দিযে নাচাত।

এই উপলব্ধি গোলাপকে বড়ই উদাস ও বিবাগি কবে তোলে। ২০০০-এব বইমেলাতে এই ধবণেবই একটা হু-হু মনোভাব নিযে গোলাপ পেচ্ছাপখানা টু পেচ্ছাপখানা খুবই আলগা পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বড়ই শ্লথ সে পদচাবণা। সন্ধেব মুখে গোলাপ ভাঁড়েব চা খেযে চা-ওলাকে পাস দেখাল। তাবপব ছোট সাইজেব একটা ক্যাপস্টেন সিগাবেট ধরাল। প্রায তাব ধোঁয়াব ধবতাই ধবে ফোক্‌লা লোকটা গোলাপকে বলল,

—ধবে ফেলিচি। না বললে চলবে না।

—অ্যাঁঃ।

—গোপাল। টালিগঞ্জ থানাব সামনে। সিমেন্টেব বেঞ্চিতে। নকশাল টাইম। নিযারলি টুয়েন্টি ইয়ার্স বাট নো চেঞ্জ।

—সবখেল।

—তবে।

একটা ভুল কবেছ। গোপাল নয, গোলাপ।

—কুড়ি বছরেব গ্যাপ। মাইনব ভুল। হতেই পাবে।

—বিটাযার করেছ?

—কবে?

—হাতে এত কাটাকুটি, কড়া. .

—ওই, মাটি খুঁড়তে . খুঁড়তে

সবখেল নিজেকে সামলে নেয়।

—কেন? মাটি খুঁড়ছ কেন?

—আরে, বাগান করচি। চুটিয়ে বাগান কবচি। এক-একটা গ্যাঁদা দেকলে ভাববে বাঘের মুণ্ডু।

—তাই বলো। বউদি?

—সে তো এইট্টি সিক্সেই...

—ও।

দুজনে ফের এক ভাঁড় করে চা খেল। সরখেলই খাওয়াল। তারপর কাঁধে ঝোলানো সাইডব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা চোতা গোলাপকে ধরাল।

—এটা রাকো। বেশি ছাপিনি তো। লোক বুজে বুজে দিচ্চি। ফ্রি। পরে পড়ে নিও এক ফাঁকে। তবে হালকা ব্যাপার নয়।

—তারপর, মেলায় কিছু কিনলে-টিনলে?

—কী কিনব? কেনার মতো কিচু আচে? সবই আলবাল। তবে কিনিনি তা নয়। ভূত সিরিজের তিনটে আমার ছিল না। এই তালে হয়ে গেল।

—দেখি?

—তিনটি বই। চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতার বেশি নয়। 'মানুষখেকো ভূত', 'মস্তান ভূত' ও 'রেলগাড়িতে ভূত'।

—এই বুড়ো বয়সে তোমাকে ভূতে ধবল?

—তা বলতে পার। ওই সাবজেক্টটাই কবচি একন। তোমার নির্ঘাৎ ডিউটি চলচে।

—বুঝতেই পারছ।

—আমি তাহলে এগোই। আব গোটা দশেক আচে। বিলি হযে গেলে কেটে পডব। যা ধুলো উড়চে। লেখাটা পড়বে কিন্তু!

—সে তো পড়ব। কিন্তু ফের দেখাটা হবে কবে?

—সে হবে খন। এই মেলাতেই হবে। পড়বে কিন্তু ভায়া। বড় খেটেখুটে লিখেচি।

সরখেল চলে যাওয়ার পর গোলাপ মল্লিক ভাঁজ করা ফর্দেব মতো কাগজটা খুলল।

পিঁপিড়ার ডানা ওঠে...

কে. জি. সরখেল
অবসরপ্রাপ্ত করণিক, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া

'পিঁপিড়ার কেন ডানা ওঠে তা সকলেই জ্ঞাত হয়। উড়িবাব তবে। কবে হইতে এই ডানা গজানো শুরু হইল তা আমার সঠিক জানা নাই। কিন্তু বিভিন্ন প্যালিয়েন্টোলজিস্ট নির্মিত ক্ল্যাডোগ্রাম হইতে এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীবা উপনীত হইয়াছেন যে ডাইনোসবদেব নানা প্রজাতির মধ্যে থেবোপড ডাইনোসর হইতেই পক্ষীকুল গজাইযাছে। জন অসট্রম বলেন যে, অবনিথোলেসটেস, ডেইনোনিকাস ও অরনিথোসুকাস ইত্যাদি থেবোপড ডাইনোসরদেব সঙ্গে প্রাচীন পাখি আর্কিওপটেরিক্স-এর বড়ই মিল। ডাইনোসরবিদ্ গ্রেগ পল বলেন, যে কম্পসগন্যাথাস নামক ডাইনোসরটি আর্কিওপটেরিক্স-কে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য ধাওয়া করিয়াছিল সেই ধাওয়া সামলাইতেই আর্কিওপটেরিক্স উড়িতে বাধ্য হয়। অবশ্য আমি এ-বিষয়ে ঠিক একমত পোষণ করি না। তাহার কারণ এই যে, ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রাচীন পাখিরা অর্থাৎ আর্কিওপটেরিক্স (উৎপত্তি ১৫০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে) ইত্যাদি লুপ্ত হয়। তাহারা কী করিত না-করিত কেউই জানিতে পাবে না। এই ধ্বংসরেখাব নাম কে-টি দুর্ঘটনা অর্থাৎ ক্রিটেসিয়াস ও টার্সিয়ারি যুগের সন্ধিক্ষণে এই প্রলয় ঘটিয়াছিল। পাঠকভায়া, তুমি নিশ্চযই অবগত আছ যে তুমি সেনোজয়িক যুগের প্রথমাংশে জীবনযাপন করিতেছ। সেনোজয়িক যুগের হিংস্র ও উড্ডীয়ান আর্কিওপটেরিক্স, অ্যাপাটরনিস, প্যালিওকারসনিস, হেসপেরনিস, সিনোসরোপটেরিক্স প্রাইমা ও বহুশ্রুত টেরোড্যাকটিল দাঁড়ের ময়না বা কাকাতুয়া ছিল না। চিল-শকুনও নয়। সেসব অচিন পাখি খাঁচায় আসা-যাওয়া করিত না।

'প্রথম অনুচ্ছেদে আমি যাহা কিছু বলিলাম তা একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও অবান্তব। প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে ইহা হইতে ওড়াউড়ি যে মান্ধাতার আমলের ব্যাপার তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। অবান্তর এই কারণে যে আমরা বিহঙ্গের পাখা বন্ধ হইল কী হইল না তা ভাবিয়া কেন মরিতে যাই? আমরা প্রমাণ করিতে চাহি যে, মানুষ কোনো বিশদ বিবর্তন ছাড়াই উড়িতে সক্ষম। উড়ন্ত মানুষের ফসিল পাওয়া যায় না। যাবেও না। কিন্তু জীবন্ত উড্ডুক্কু মানুষ আছে। শুধু আছে নয়, ধারে-কাছেই। শুনিয়া তাজ্জব বনিলে তো! এই রচনায় আমি পুরা কেচ্ছা ফাঁস করিব না। কেবল ইঙ্গিত দিব। তাহার কারণ আমি চাই না যে উড্ডুক্কু মানুষরা ধরা পড়ুক। অথবা তাহারা বিব্রত হোক। আমি কেবল চাই যে দেশ ও মান্যবর সরকার (রাজ্য ও কেন্দ্র) জানুক যে মানুষ উড়িতেছে। তাহাদের একটি বিশেষ নামও আছে। আমি কয়েকজনকে চিনিও। কিন্তু এই রচনায় সব কিছু প্রকাশ হইয়া যাক— এরূপ ইচ্ছা

আমার নাই। কিন্তু আমি, কে জি সরখেল, এই প্রথম তাহাদেব কথা বলিলাম। আব মাত্র কয়েকটি কথা বলিয়া দায়িত্ব হইতে খালাস পাইব। কিন্তু পাঠক, তোমাব ঘাড়ে উড্ডয়নেব নেশা ভূতেব মতোই চাপিযা বসিবে। বারংবার তুমি গগনেব দিকে তাকাইবে। দেখিবে মেঘ উড়িতেছে। তোমারও উড়িয়ে ইচ্ছা যাইবে। উটপাখি, মুবগি ইত্যাদি হতভাগ্য কযেকটি পাখ-পাখালির কথা না ধরিলে দেখিবে কত না পতঙ্গ ও পাখি ওডাউড়িতে মাতিযাছে। উড়িতেছে বিমান। কৃত্রিম উপগ্রহ। বকেট। বেলুন এমনকি শ্মশানের ধোঁযাও উড়িতেছে। আব তুমি ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়াইযা হাত কামডাইতেছ। কোমোডো দ্বীপেব ড্রাগন সদৃশ ভযাবহ গির্বাগিটি ও তোমাব মধ্যে কেমন মিল। সে চাবি পাযে ও তুমি দুপাযে চবিতেছ। এই জন্যই কবি পুবন্দর ভাট লিখিযাছেন—

উড়িতেছে ডাঁস, উড়িছে বোলতা, উড়িতেছে ভীমরুল,
নিতম্বদেশ আঢাকা দেখিলে ফুটাইবে তাবা হুল।
মহাকাশ হতে গু-খেকো শকুন হাগিতেছে তব গায়,
বাঙালি শুধুই খচ্চর নয়, তদুপবি অসহায়।

এমন কবি ও কবিতা যে দেশে অনাদৃত থাকে, এই চাবিটি লাইন ব্যাখ্যা কবিবার জন্য যখন বাংলা এম. এ ব প্রশ্নপত্রে দেওযা হয না তখন অধিকাংশ বাঙালি ভূ-চব হইয়াই থাকিবে। খ-পোত বন্দবে ক-জনই বা যাইতে পাবে বা চডিতে পাবে? উপবন্তু খ-পোত মোটেই নিরাপদ নয়। বিশেষত খ-পোত ছিনতাই-এব বিপদ যখন মডার ওপব খাঁড়া হইযা ঝুলিতেছে। যাহা হউক, আমবা আবেগেব বশে বেপথু হইতে বসিযাছি। ফেব আমবা বিষযেব সদর দপ্তরে কামান দাগা ববং শুরু কবি।

'আমি জানি যে একদল পণ্ডিত হাঁ হাঁ কবিযা উঠিবে। মানুষ উড়িতে পারে না। আমার কাছে ওই আপত্তি শেয়াল-পণ্ডিতদেব হুক্কা-হুযা ব্যতিরেকে আব কিছুই না। কারণ প্রমাণ হাতে না লইয়া কে জি সবখেল আখডায় আসে নাই। তাঁহাব সহিত মহড়া নেওয়া হত সহজ নয়।

'শিবসংহিতায় আছে, 'যিনি সর্বভূত জয় করত আশাহীন ও জনসঙ্গশূন্য হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন কবেন, তাঁহার মনোনাশ হয এবং তিনি ব্যোম পথে গমনাগমন কবিতে সমর্থ হন।' ঘেরণ্ড-সংহিতায বাযবীধাবণামুদ্রা আছে। এই মুদ্রাও শূন্যদেশে ভ্রমণশক্তি প্রদান কবে। অত কথার কী প্রয়োজন? কাবাগাবে যোগসাধনাকালে শ্রী অরবিন্দ একদিন ভূপৃষ্ঠ হইতে উপবে উঠিযাছিলেন।

'সাহেবদের দেশেও এমনটি ঘটিয়াছে। 'ফিওবেত্তি' হইতে জানা যায় লা ভের্না পর্বতে উপাসনাকালে সন্ত ফ্রান্সিস জমি ত্যাগ করিযা উপরে উঠিয়াছিলেন। সন্ত থেরেসা-র (মূর্খ পাঠক, ইনি কিন্তু মাদার টেবেসা নন) জীবনেও এমন ঘটনা ঘটিযাছিল এবং সর্বসমক্ষে। নানদেব তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন ঘটনাটি যেন তাহারা বলিয়া না বেড়ায। কুপেরতিনো-র সন্ত জোসেফ শুধু নিজে উড়িতেন এমন নয়, ভারী লৌহ নির্মিত ক্রুস-ও সঙ্গে রাখিতেন। সন্ত আলফোনসাস লিগুয়োরি এবং ব্লেসেড টমাস অব্ কোবাই সম্বন্ধেও একই কথা শোনা যায়।

'কিন্তু আমার পরিচিত যে মানুষগুলি উড়িতে পাবঙ্গম তাহারা সাধক বা সন্ত কিছুই নহে। ববং উল্টাটি বলিলে খুব একটা ভুল হয় না। আমি তাহাদের কথা এই কারণে বলাবলি করিলাম কারণ আমাব উপর তেমনই নির্দেশ আছে যাহা অমান্য করিযা আমি ইহলোকে আমার বরাদ্দ মেয়াদটুকু আনন্দে কাটাইতে পারিব না। আমার এই বিনামূল্যে বিতরিত রচনাটির লক্ষ্য সরকার ও প্রশাসনকে আগাম হুঁশিযাবি দেওয়া। কারণ এক প্রলয়াত্মক সংঘাত ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। কাহারও ক্ষমতা নাই এই লড়াই হইতে আমাব পরিচিতদের মালসাট মাবিয়া লাফাইয়া পড়া হইতে ঠেকায়। এই পক্ষে

উড়িতে সক্ষম ও অক্ষম— দুই ধরনের পালোয়ানই আছে। আছে যাদুটোনা। কুহকছাতা। ও নানা সাইজের হনুরন ছানা যাহারা নানা মাপের রন্ধ্রে ঢুকিতে সক্ষম। সরকার ও প্রশাসন যদি মোকাবিলাব পথ বাছিয়া নেয় তাহা হইলে রচনাটির শিরোনাম স্মরণ করিতে বলিব। সেই পাখা যদি গজায় তবে তাহা উড়িবাব তরে গজাইবে না। মরিবার জন্য গজাইবে।'

(সমাপ্ত)

এই 'সমাপ্ত' যে কে. জি. সরখেলের বচনার, 'কাঙাল মালসাট'-এর নয়, তা খোলসা করে বলার কোনো প্রযোজন আছে কী? অবশ্য কোনো পাঠক ওই 'সমাপ্ত'-কে অন্তিম বা খতম জাতীয় কিছু ভেবে গোটাটাই পড়া বন্ধ করে দিতে পাবে। এমন হুমকিও দিতে পাবে। অধুনা যেমত সব খাজামার্কা আখ্যান লেখা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল যে কোনো পরিস্থিতিব সঙ্গে টক্কর দেবার মুরোদ রাখা। 'কাঙাল মালসাট'-এব সে মুরোদ আছে কি নেই তা অচিরেই প্রমাণিত হবে। কুস্তিপ্রিয় বড়িলালের লাল ল্যাঙট দড়িতে ঝুলছে। নুনুকামানও রেডি। তাব ভালোর জন্যই পাঠককে সাবধান কবা খুবই সাধু প্রস্তাব। পবে ক্যাঁক-ম্যাঁক করে কোনো লাভ হবে না।

গোলাপ রচনাটি পড়ে প্রথমে ভেবেছিল যথারীতি কালই বড়বাবুকে দেবে কিন্তু পরে ভেবে দেখল সরখেল বন্ধুলোক, কী লিখতে কী ছাতা-মাথা লিখেছে! দাঁতফাঁত পড়ে গেছে। ওকে আর ফাঁসানো ঠিক হবে না। বইমেলা থেকে বেরোতে বেরোতে এই সিদ্ধান্তেই গেড়ে বসাব দিকে যাচ্ছিল গোলাপ কিন্তু উল্টোদিকেব অন্ধকার মাঠে আনকা ছুকবিফুকরি হয়তো বাজাবে নতুন এসে নেমেছে এরকম একটা উটকো সম্ভাবনা তাকে ফুঁসলে মাঠের দিকেই টানল।

মাঠের মধ্যে কিছুটা এসে গোলাপেব মনে হল, খাম কাজ হয়ে গেছে। সালোযার-কামিজ বা শাড়ি— কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বরং মাঠে ঢুকতেই ঠাণ্ডাটা বেড়ে গেছে আর ভয়-ভয় করছে। গোলাপ একটা সিগারেট ধরাল আব মাঠ ছাড়ার মতলব করল। মাঠ ছাড়ছিলই গোলাপ কিন্তু গাছের ওপর থেকে ডায়লগটি তাকে স্ট্যাচু কবে দিল।

—সরখেলের চোতাটা কালই দপ্তবে জমা দিবি। বুঝলি?

গোলাপ ফাঁকা টোক গিলে 'রাম, রাম' বলতে শুরু করেছিল কিন্তু তাতে খুব একটা ফয়দা উঠল না।

—আমায় কি শালা ভূত পেয়েচ যে রাম-রাম করচ! ওসব রাম-ফাম আদবানিকে গিযে দেখিও। আমরা অনেক হার্ডনাট টু ক্র্যাক।

—আঁজ্ঞে, কিন্তু কে আপনি! ভূত না হলে গাছের ওপরে কেন?

হুম্ করে যা নেমে এল তা খতরনাক হলেও অন্তত মনুষ্যরূপী ভূত নয়। বিশাল দাঁড়কাক।

—গাছে যদি শুধু ভূতই থাকবে তাহলে পাখি-বাদুড়রা সব কী করবে? লালবাজাবে ঘর ভাড়া নেবে?

গোলাপ ভয়েতে কাঠ। মুখে নাহি কথা সরে। কপালে বিন্দু বিন্দু কালঘাম ফোটে।

—স্পিকটি নট্ দেখচি যে! ওদিকে তো খুব রোয়াব। চা খেয়ে পয়সা দেবার নাম নেই। কাল কী করবি মনে আছে?

—সরখেলের লেখা জমা করে দেব।

—হ্যাঁ, জমা করে দিবি শুধু তাই না, সাধু মালটাকে বলবি যে জম্পেস নোট দিয়ে যেন চোতাটা ওপরে পাঠায়।

—তাই বলব স্যার।

—আবার স্যারফ্যার কেন? এটাও কী লালবাজাব নাকি? অনেক বযেস তো হল। এবার মাগির ধান্দাটা ছাড়্। অনেক তো হল। ওদিকে নাতিপুতি হযে গেল।

—আর কবব না স্যাব।

—ফের স্যার! আমাদের টাইমের ক্যালকাটা হলে এতক্ষণ তোব দফা গযা হযে যেত। কেন্ বল্ তো?

—আপনার টাইম মানে?

—অত তোকে জানতে হবে না। বর্মা থেকে এক দঙ্গল ফাঁসুড়ে এসেছিল। অন্ধকাব মাঠে ঘাপটি কেস। অসহায পথিক বা তীর্থমাবার্নী হলেই ঘ্যাক। ফাঁসে টান আব গ্যাঁজলা তুলে মাল ফিনিশ। পযাকড়ি যা পাও হাতিযে হাওযা। এবকম বাতে বেশ কিছু মার্ডাব করে ব্যাক টু বেঙ্গুন। সাদা হাতি। চুপচাপ মাঠ পেবিযে চলে যা।

—সে যাচ্ছি কিন্তু আপনাব পরিচযটা পেলাম না।

—দেখতেই তো পাচ্ছিস দাঁড়কাক। বযসেব কোনো গাছপাথব নেই। আর ঘাঁটাসনি। তেড়ে ফুটে যা। তোবও মঙ্গল। আমিও ঠাণ্ডায গাঁড় মারানো থেকে বাঁচি।

—যেমনটি বলেছেন তেমনটি কবছি। একটু কৃপা কববেন। বুঝেছি আপনি এলি-তেলি নন।

—ঠিকই ধবেচিস। যা, সরখেলেব বন্ধু আমাদেবও বন্ধু। কোনো বাপ্পোৎ তোব একটা বালও যদি ছেঁড়ে আমাকে জানাবি।

—আজ্ঞে, ক্রাইসিসেব সময আপনাকে পাব কী কবে?

—ভেবি ইজি। পব পব দুরাত তোব ওই ছুঁচো কিচকিচে ধচা ছাদে উঠে খুব প্রেমসে আমার কতা ভাববি। এই চেহাবাটা মনে কববি। ক্ষ্যাপাটে চোখ, খ্যাজাব্যাজা পালক, চোখ খুবলে নেবে এমন নখ—চোখ বুঁজে ভাবলেই আমি চলে আসব। প্রথম বাতে সিগন্যালটা পেযে যাব। এ তোমার মোবাইল নয। মোবাইলের বাবা। তবে হযতো তখন দূরে থাকব। ধর, ব্যান্ডেল চার্চের টঙে। তেমন হলে সিগন্যাল রিসিভ কবে ডাউনলোড কবে বেখে দেব। সেক্ষেত্রে পবদিন। আর ধারেবাড়ে হলে এসে পড়ব। একডাকেই. ।

—আমি আসি তাহলে।

—আয়।

এবাবেও বড়বাবু দাঁ গোলাপ মল্লিকের হাত থেকে সরখেলেব 'পিঁপিড়াব ডানা ওঠে..' পড়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

—কী মাল জোগাড় করেচ গোলাপ! এ তো রীতিমতো ডিক্লারেশন অফ ওয়ার। এক কাজ করো। দলিলটা নিয়ে তুমি মিঃ সাধুর কাছে চলে যাও। আমি বলে দিচ্ছি। আমার ব্যাপারটা ভালো ঠেকচে না। সাফ বলে দিলুম।

অতএব মালটি নিয়ে গোলাপ পৌঁছে গেল তারকলাল সাধুব কাছে। শ্রী সাধু তখন খুনের ব্যবহৃত বুলেট এবং খুনের কাছে পাওয়া কানট্রিমেড পিস্তলে টেস্ট ফায়ার করা বুলেট মিলিয়ে দেখছিলেন।

—আরে, রোজ ফুটেচে আজ। কী ব্যাপার!

—আর রোজ ফোটাতে হবে না। কী ফোটে এবার দেখুন। মালটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

পড়তে পড়তে সাধুর নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে।

—ইন্টারেস্টিং। আমার তো বাবা দৌড় ওই টিভিতে জুরাসিক পার্ক দেখা অবদি। এ সব

ঘ্যাটম্যাট আমার মাথায় ঢুকবে না।

—আপনি বরং শেষ প্যারাটা পড়ুন।

একটু সময় গেল। সাধুর ভুরু কুঁচকোনো। কপালে ভাঁজ পড়ল। চক্ষু হইল চড়কগাছ।

—তার মানে? ফের প্যাঁদাপেঁদি। ফের ব্লাড বাথ। এই সরখেল বাঞ্চোৎ কি নকশাল নাকি? যাক গে বাবা, সে যা হবার হোক। সরকার ও প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। আমি রিস্ক না নিয়ে নোট দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুদিন পরে ফাইল ফেবত এল। ওপরে স্কেচ পেন দিয়ে লেখা— 'পাগলচোদা'।

বেগম জনসন দণ্ডবায়সের নিকট সব শুনিলেন। নিকটে দণ্ডায়মান একটি স্লেভ গার্লের পিঠে আপনমনে ঘামাচি মারিতে মারিতে বলিলেন, 'বাট্ মিস্টার ম্যাজিশিয়ান, এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইহার কোনো ম্যাচিউরিটি নাই। শালারা এত বড় একটি দলিল হাতে পাইল কিন্তু মর্ম বুঝিল না। আই অ্যাম রিয়্যালি স্যরি। বাংলার ভাগ্যাকাশে এখন সাইক্লোনিক ডিপ্রেশন। আপনি মন খারাপ করিয়া কী করিবেন? ড্যাম ইট। বাই জোভ, এরূপ আহাম্মক কেউ দেখিয়াছে যে পশ্চাতে ধাবমান শূল দেখিয়াও রেকটাম সরাইয়া নেয় না? আমি একাধারে বিউইলডার্ড ও অ্যামিউজড্ বোধ করিতেছি।'

এরূপ বলিয়া বেগম জনসন স্লেভ গার্লটিকে আদর করিয়া একটি লাথি মারিলেন। এবং সেও এই বটকেরার জবাবে খিল্লি দিয়ে হাসি করিয়া দিল। একেই কী যায়সা কী ত্যায়সা বলে? কেউ জানে?

(চলবে)

১২

বিগত 'এগারো' নম্বর ঝটকাটিতে একটি ব্যাপার কোনো টাইপের নজর, তা সে শকুনেরই হোক বা পাতাখোরেরই হোক, এড়াতে পারে না। সেটা হল কড়াপড়া মোলায়েম ধাঁচে চোক্তার-ফ্যাতাড়ু স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স-এর যুদ্ধ ঘোষণা। জুতোর মধ্যে পেরেক ওঠার মতোই নিরীহ কিন্তু যথেষ্ট ঝামেলাদার। সরখেলের ফতোয়া সম্বন্ধে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ওপরমহল যতই অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য (পাগলাচোদা) করুক না কেন ব্যাপারটি নিরীহ ছিল না। বরং এরকম একটি আগাম হুঁশিয়ারি যে ছাড়া হবে তা নিয়ে কোর কমিটির যে মিটিং হয় সেখানে বৃদ্ধ দণ্ডবায়স, ভদি, বেচামণি, সরখেল, নলেন ও মদন ছিল। এবং দরজায় আড়ি পেতে পুরো মিটিং-এর চাপান-উতোর সবই 'সাধু। সাধু' মুখ করে শুনেছিল এবং ব্রেনে টেপ করে নিয়েছিল মহান সাক্ষী বড়িলাল। দীর্ঘকালব্যাপী সেই আলোচনায় 'ইনসারেকশন', 'নামিয়ে দাও', 'পার্লামেন্টারি পোঁদ মারামারি', 'চট্টলার অস্ত্রাগার লুঠ', 'টেগরা', 'টুপামারো', '১৯৬৯ এতে কারলোস মারিঘেল্লার মৃত্যু', 'কলম্বিয়াতে এফ. এ. আর. সি-র গেরিলা নীতি', 'আশু মজুমদার', 'রেজি দ্রেব্রে-র ফোকো ইনজারেসিওনাল বা অভ্যুত্থানের গলনচুল্লি', 'সুশীল ধাড়ার মৌন মিছিল'—ইত্যাদি নানা চিত্তাকর্ষক শব্দবন্ধ ও বিষয় উঠেছিল। মিটিংটি যেহেতু গোপন তাই এর বেশি জানানো এখন সঙ্গত কারণেই ঠিক হবে না। বরং 'জানি কিন্তু বলব না' গোছের একটা ভাব দেখাতে হবে। এর সুবিধে ডবল। আগামঘোষিত সেই ক্যাচালে 'কাঙাল মালসাট' বড়িলালের কুস্তির ল্যাঙট ধার করে আঁট করে পরে নেমেও পড়তে পারে আবার বেগড়বাঁই

দেখলে 'আমি বনফুল গো...' গাইতে গাইতে সাইডিং-এও ভিড়ে পড়তে পারে। সর্বত্রগামী না হলেও চলবে। তবে বিচিত্র পথে যাওয়ার সম্ভবনা খুলে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও লেখক-শিল্পীদের ঢ্যামনামি নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। সাঁতরাগাছির প্রসিদ্ধ ওল-অরণ্যে 'ওলে! ওলে!' শোনা যায় না। দমদমাব নলবনে দুষ্টু শিশুদের মতো ডাক্তার-ডাক্তার খেলাতেও তারা প্রশিক্ষিত হতে চায় না। সব ব্যাটার ধান্দা হচ্ছে সেই শান্তিনিকেতনে একটি কম্পাউন্ড-ওলা বাড়ি বানানো এবং সেই বাড়িব ভেতরের বারান্দায় গুজরাটি দোলনা লাগিয়ে ফিসচুলা, ভগন্দর, নালি ঘা ও পদ্ম-কাঁটা শোভিত বহু-মারানো নিতম্বগুলিকে দোলানো। উইকএন্ড হলেই অল বোকাচোদাস বোলপুর চলল। এছাড়া পৌষ মেলা, দেদোল দোল, দাড়িপুজো, ভাঙা গানের তালে ফুটো খোল প্যাঁদানো—ববীন্দ্রনাথ কি জানতেন যে জ্যোৎস্না বাত হওযার জো নেই, আগেভাগেই ঢ্যামনাব পাল গিয়ে ফবেস্ট পলিউট করবে! এ ব্যাপারে কিছুই কি কবণীয় নেই? আছে। সেটা হল এখনও, দেদারে ঝাড় খাওয়াব পরেও, যে সাঁওতালরা আছে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বডি-ল্যাঙ্গুয়েজেব ইঙ্গিতে সব সংগীত থামিয়ে দিয়ে বস্তা খুলে পাগলা বেড়াল ছেড়ে দেওয়া। জাহাজী ইঁদুর হলেও চলবে। সাধু অভিপ্রায় নিয়ে যা শুরু হয়েছিল তা এখন খজড়ামিব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অতএব, যে ব্যামোব যা দাওয়াই। হাইলি কনজারভেটিভ বংদের একটি বৃহৎ অংশ এতে 'কাঙাল মালসাট'-এর ওপরে খচবে। 'কাঙাল মালসাট' যাতে সদাশয় ছত্রাকেব মতো পাঠক মনকে বিস্মমুক্ত করতে না পারে তার জন্য এজেন্ট-অবেঞ্জ ছড়ানো হবে। কিন্তু ডার্লিং, বালেব প্লেট নিযে চাকতিব ঠেকদাবেরা মাথা ঘামায় না। তাই এবার হতে আক্ষরিক অর্থেই মুণ্ডুপাত। মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) যুগ যুগ জিও। জালি রাজাব মুকুটহরণ (আনক্রাউনিং) হচ্ছে সকল কার্নিভাল ও কার্নিভালেব সমগোত্রীয় উৎসবেব মূল উল্লাস।

> পতনের গতি কারও দ্রুত অতি, কারও কিঞ্চিৎ ঢিমা
> সীমা শেষে গিয়া সব হবে 'হিবোশিমা'।
> পরিণামে এক শ্মশানে সবাবই ঘব
> সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
> লয়ের আঁধাব হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

জয়, শ্মশানের জয়। জয়, জয়, চাকতির জয়। জয় চোক্তাব ফ্যাতাড়ুর জয়। জয়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জয়।

এবারে একটি মিহি ইন্টেলেকচুয়াল সমস্যা টুক করে ছুঁয়ে নেওয়া যায়। প্রেতাত্মা, স্পিরিট (মেথিলেটেড নহে) বা গোভূত—কাদের চুতিয়াপনা এর পেছনে আছে আমরা সহমত নহি—'কাঙাল মালসাট' ক্রমেই কিন্তু জাগতিক সময়, ভর, মাইধ্যাকর্ষণ, চুদিট্রন—এসবের আওতায় আর থাকতে চাইছে না। ওয়ের্নার হাইজেনবার্গ নামধারী এক ঘ্যাম জার্মান পদার্থবিদের আত্মজীবনীর মলাট-নাম হল 'ফিজিক্স অ্যান্ড বিয়ন্ড'। ভূতিয়া ললাট-লিখনের ফলে 'কাঙাল মালসাট'-এ 'বিয়ন্ড'-এর টান ধরেছে। সে আর ফিজিক্স-এর আওতায় থাকিতে চাহিতেছেনা। লেখা বা ছাপা অক্ষরে যেন সে অধরা হইয়া পড়িতে চাহে। ছিল বাড়ির বউ, হয়ে যেতে পারে খানকি। অতএব চরিত্রবান পাঠকেরা সাবধান। রেট-ফেট জেনে ওসব পাড়ায় যেতে হয়। ধারা থেকে মাগু-গাণ্ডুদের তীর্থযাত্রা চলুক। আমাদের পথ ও গন্তব্য অন্য।

ভারতের মোক্ষপ্রাপ্তির ইতিহাসে লাল-বাল-পালের যে গৌরবোজ্জ্বল ও ইতিবাচক অনুঘটকের ভূমিকা তেমনই ভূমিকা হল কলকাতার ক্ষেত্রে নগরপালদের। অর্থাৎ পুলিশ

কমিশনাব সাহেবদের। আগে তাঁহারা পকেটমার প্যাঁদাইতেন, রহস্যময় বেলুনে আরাকান হইতে অহিফেন প্রেরণের চক্রান্ত ভণ্ডুল করিতেন, তালতলা ও অন্যান্য থানায় কমিউনিস্টদের ওপর হিংস্র কনস্টেবল-লেঠেল ছাড়িয়া মজা দেখিতেন (রণদিভে পর্বে), পরে নকশালপন্থীদের ওপরে টর্চার কবিবার জন্য ইজ্রায়েলী, দক্ষিণ আফ্রিকান ও সি. আই এ-র গোপন টর্চার ম্যানুয়াল অধ্যযন করিতেন এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগাইবার নির্দেশ দিতেন—আজকাল এসবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহারা নৃত্যনাট্য, হাফ-ন্যাংটো কেলো বা জীবনমুখো গান, কবি-সম্মেলন কিংবা যৌন-কর্মীদেব শুয়ে আঁকো প্রতিযোগিতা—এসবও করেন। কেউ কেউ আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। সেসব ঘেঁটে পেটিকেসে ফেঁসে না যাওয়াই ভালো। পাঠকরাও নগরপালদের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। মালদার কেউ নিজেকে স্ব-নিযুক্ত নগরপাল বলে ভাবতেও শুরু করতে পারে। ডাক-বিভাগের পাশে যেমন কুরিয়াব সার্ভিস। আগে টেররিস্টদের বা বে-আইনি বিপ্লবী রাজনীতিতে কুরিয়ার হইত, আজকাল ঘরে ঘরে কুরিয়ার। তাহাদের মধ্যে আবার যাহাবা হেকড়বাজ তাহারা ডাকবিভাগের ঘাড়ে হাগে।

আধপোড়া একটি মাঝারি ল্যাটামাছ। মাথা থেকে ল্যাজা সিঁদুব মাখানো। একটি আঁশবটি। ধুনুচি হতে বিদ্‌ঘুটে গন্ধওয়লা ধোঁয়ার অন্তিম কুণ্ডলী। সাতিশয় আগ্রহে অপেক্ষমান দণ্ডবাযস, ভদি, সবখেল ও নলেনের আটখানি (?) চোখ। ভদির বাবাই সেই নাবকীয নিস্তব্ধতাব মধ্যে অপার্থিব কণ্ঠস্বরে বলে উঠল,

—খাপে খাপ, কেদারের বাপ! নাও, কাটো।

ভদি চেঁচিয়ে উঠল,

—জয়! জয় চাকতির জয়!

সমস্বরে একই রব। দবজার ফুটোয় চোখ লাগানো বড়িলাল বাদে।

বেচামণি ঘ্যাচাং করে ল্যাটামাছটির ধড় হইতে মুণ্ডটি বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অ্যালিয়েনেটেড কবিযা ফেলিল। তখন রাত আধো আধো।

সেই আধো আধো রাতেই দোতলায়·প্রশস্ত ভেরান্দায় হুইস্কির গেলাস হাতে ক্যালকাটাব নগরপাল মি. জোয়ারদার ভাবছিলেন যে, ওয়েস্টবেঙ্গলে পিপ্‌লস ওযার ও এম সি সি-ব অনুপ্রবেশের সিক্রেট রিপোর্টটা তিনি সি. এম-কে কি এখনই দেখাবেন না কয়েকটা দিন ঘাপটি মেরে থাকবেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, লাইক আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু বা কঠিন করে বললে বিনিমেঘে বজ্রপাতের মতোই (বীর্যপাত নয়) একটি ফ্লাইং সসার (Z) অক্ষরের মতো অবাঙালি শব্দ করতে করতে তাঁর সাধের লনে ডাইভ মারল। লন সিকিউরিটির প্রয়োজনেই হ্যালোজেন আলোয় আলোকিত। সেই আলোয় মি. জোয়ারদার ওরফে নগরপাল দেখলেন লেটে ফোটা ডালিয়া, হলিহক, পিটুনিয়া—সব ওয়ান্ডার ফুলকেই চাকতিটি কচুকাটা করছে। পুলিশের অভিজ্ঞ ব্রেনে তখনই খেলে গেল নির্ঘাৎ এটি তাঁর একমাত্র ও স্প্যাস্টিক ছেলের জন্যে হংকং-এর মামার পাঠানো কোনো রিমোট নিয়ন্ত্রিত টয়। তাই কি? না কি ড্রোন-জাতীয় কোনো মাল! এই ধন্দ কাটার সময় হয়নি। হুস করে চাকতি লন এবং গার্ডেনের ভুষ্টিনাশ করে হেলায় দোতলার ভেরান্দায় উঠে এল এবং লেসার রশ্মি যেমন চুপিসাড়ে বড় বড় কর্ম ফতে করে তেমনই দক্ষতায় কুচ করে তাঁর মুণ্ডুটি কেটে অন্তরীক্ষে উধাও হয়ে গেল। ড. গিলোটিন (এটি সঠিক ফরাসি উচ্চারণ নয়) দেখিলে অবশ্যই কবুল করিতেন যে খুবই পাকা হাতের কাজ।

এরকম ঘটনা অর্থাৎ মুণ্ডচ্ছেদের অনুষ্ঠান যে নানাবিধ আববদেশে ঘটে থাকে সেখানে দেখা যায় যে মুণ্ডুটি হাবাগোবার মতো পড়ে আছে। বরং ধড়টিই ছটফট করছে। অবশ্য আলাদা

হবার পর মাথাটির মুখ এক আধবাব হাঁ কবে জিভ ভ্যাঙাতে পাবে। ইউ-ছাঁট সহ উত্তমকুমার ভোরের কুয়াশাময় ময়দানে যে মুণ্ডচ্ছেদ দেখেছিলেন তাব আগে অবশ্য ফায়ার করা হয়েছিল। সেই ঘটনাব বহু বৎসর পবে মনোহবদাস তড়াগ হইতে একটি মুণ্ডহীন স্কেলিটনও পাওয়া যায়। এফ. এম রেডিওতে তখন বাত দশটায় শুরু হচ্ছিল 'আজ বাতে'। আজকেব বিষয় 'সমকাম'। প্রথমেই একটি গান—'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি. '

স্তম্ভিত হয়ে নগরপাল দেখলেন যে মুণ্ডচ্ছেদের পবেও উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যা কিছু লেখা সেগুলো তাঁরই চিন্তা এবং তিনি নিজেব দুই কান অর্থাৎ দোকান দিযেই এফ. এম অনুষ্ঠান শুনছেন। হাতে হুইস্কিব গেলাসও ধবা আছে। চুমুক দেওযাব চেষ্টা কবলেন কিন্তু গেলাসটি অবলীলায় মুণ্ডুর ফাঁকা জায়গায় ব্যালেরিনার মতো গেল ও এল। তখন গেলাসটি রেখে মি. জোয়াবদাব নিজের মুণ্ডুটি কুড়িয়ে ধড়েব উপরে বসালেন এক হাতে মুণ্ডুটি ধরে রেখে বাকি হুইস্কিটুকু চোঁ কবে মেরে দিলেন। নামলও। কোনো ডিফিকালটি নেই। কিন্তু হাত ছাড়তেই মুণ্ডুটি ফের পড়ে গেল। এবং কী নিষ্ঠুর কাকতাল যে ঐ মোমেন্টেই মিসেস জোযারদার ভেবান্দায় প্রবেশ করেছিলেন। প্রথম মুণ্ডুপাততটি তিনি মিস কবেন। কিন্তু দ্বিতীযটি নয়। বলাই বাহুল্য, তিনি এই গ্রোটেস্ক ও ম্যাকাবর দৃশ্য দেখে কেলিয়ে পড়ে গেলেন।

--ললি! ললিতা। উফ্ ফেন্ট কবে গেল। ন্যাকামিব একটা লিমিট আছে। বিহেডেড হলুম আমি আব উনি হয়ে গেলেন সেন্সলেস্। লুক, হানি, আই অ্যাম পাবফেক্টলি নবম্যাল। শুধু হেডপিসটা মানে মাথাটা হোল্ড কবতে হচ্ছে। ললি! ল লি!

ভ্লাদিমিব নবোকভ-এব 'লোলিটা'-ব (১৯৫৫) প্রসঙ্গ কাবও মনে পড়তে পারে। বিশেষত মধ্যবযস্ক পুরুষ যাঁরা অজান্তেই হযতো 'লোলিটা সিনড্রোম'-এব শিকাব। হতেই পাবে বা হলেই হল। আটকাচ্ছে কে? হ্যায় কোই রুখনেওযালা?

যাই হোক, হচ্ছিল ললিতা জোযাবদাবেব কথা। পুলিশেব বউ। এবা হল অন্য মেকদারেব পযদা। ধড়, মুণ্ডু, ডাকাতি, চপার, রামপুরিয়া, বস্তায় খণ্ড খণ্ড যুবতী, কিডন্যাপ, গুম শুনে এবা নিজেবাই দুঁদে মাল হযে উঠেছে। অচিবেই ববফজলেব ছিটে ও একটি পাতিযালা পেগ ললিতাকে ধাতস্থ কবে তুলল। অতি অল্প সমযেই তিনি দু-পিস্ স্বামীব সম্বন্ধে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। সম্ভবত এই কাবণেই হযতো দাঁড়কাক বলেছিল—খাপে খাপ, কেদাবের বাপ।

ডিনার টাইম হয়ে গেছে। নীচে বাবুর্চি গং বাজাল। প্রথমে নামলেন মিসেস জোয়ারদার। তিনি পরে আছেন একটি ইংলিশ হাউসকোট। পায়ে জাপানি ঘাসের চটি। পেছনে সিল্কের ওপরে বুটিকের কাজ করা লুঙ্গি ও ফিনফিনে ফতুয়া পরা নগরপাল। কিন্তু ও কী?

নগরপাল সিঁড়ি দিয়ে নামছেন—দুহাত দিযে দুটি কান ধরা। মনে হচ্ছে ব্যাদড়া বাচ্চাকে কান ধরিযে হেডমিস্ট্রেস স্কুলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাবুর্চিরা এই দৃশ্যে খুবই ভয়চকিত হয়ে উঠল। হওয়ারই কথা। এর আগে বিবিধ কারণে অকারণে নগরপালকে তারা বউ-এর কাছে ঝাপড়া খেতে দেখেছে। কিন্তু এরকম কোনো দৃশ্য তারা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। এবং এর পবে যা ঘটল তা রোমহর্ষক। নগরপাল চামচ ধরে সুপের ঝোলের দিকে ঝুঁকতেই তাঁর মাথাটি নাক বরাবর সুপের ওপবে ঝাঁপ দিল। চেযাবে কবন্ধ। দুজন বাবুর্চি ও কুক, তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কারপেটের ট্রে, কাটলারি, বোস্ট চিকেন ও গ্রেভি।

মিসেস জোয়ারদার খেঁকিয়ে উঠলেন।

—হোয়াট স্টুপিডিটি। দুহাতে মাথা অ্যাডজাস্ট করেই তোমাকে চুমুক লাগাতে হবে। ফরগেট কবে স্পুন বা ফর্ক ব্যবহার কবেছ। কান থেকে হাত ছাড়া চলবে না। কাল দেখব টুপি, দড়ি

এইসব দিয়ে যদি ম্যানেজ করা যায়। নিজের ঝামেলা নিজে সামলাও। সুপটুপ ছিটকে, লোকজনকে ভয় দেখিয়ে—ডিজগাস্টিং।

—সরি ললি! মাথাটা টপল্ করে যাবে বুঝতে পারিনি। কী যে সব হচ্ছে। প্রোভোকেশন নেই, প্রায়ার কোনো রিপোর্ট নেই—বিহেডেড হয়ে গেলুম।'

—যা হয়েছে, হয়েছে। কালকেব আগে যখন কিছু করা যাবে না তখন ফালতু কনজেকচার করে লাভ নেই। দু হাতে কান ধরে স্ট্রেট বসে থাকো। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

—দেবে! সেই ভালো। সুপটা বড় ব্ল্যান্ড করেছে আজ। একটু সস্ মিশিয়ে দাও তো।

—দাঁড়াও আগে মুখটা মুছে দিই। একজনকে তো খাইযে নাইয়ে না দিলে হয় না। আরেকজন বাড়ল। এই মাদারিং করতে কবতেই লাইফটা গেল। কোথায় নিজের দিকে একটু নজব দেব।

সস্নেহেই কথাগুলো বলছিলেন মিসেস জোয়ারদার কিন্তু নগরপাল মনে মনে বলছিলেন।

—ওই তো বালেব চেহারা। তার দিকে আবার নজর। ভুরু প্লাক করে ডিমেব মতো মুখ। তাতে আবার কীসব মাখবে। তাইওয়ান থেকে ক্রিম আনছে! শিশিব ওপবে আবার প্রজাপতি আঁকা। কী বিদঘুটে গন্ধ। বিউটি মারাচ্ছে। সেদিনই তো তাজবেঙ্গলে টাবুকে দেখলুম। কী জিনিস। কী ঠোঁট? আর একে দ্যাখো। তাকিয়া। একজ্যাক্টলি তাকিয়া। আগে তাও বয়স কম ছিল। চলত। বান্টি, মিসেস সেন, তারপর গিয়ে হোম সেক্রেটারিব বউ হিমানী সোম—এখনও। এখনও। আরে বাবা যে এজে যেমন। আর ইনি, কিলো কিলো এজ-ডিফাইং ক্রিম মাখছেন। এই মাথা-কাটাই তোব জুটবে। বুঝলি, হুমদো মাগি কোথাকাব।

এবারে নগরপাল বললেন, মনে মনে নয়,

—আঃ ফিস কাবাবটা ছোট ছোট পিস করে দেবে তো। আস্ত মুখে ঢুকিযে দিচ্ছে। গলার কানেকশনটা আনস্টেডি, বুঝতে পারছ না? আবাব কী ফ্যাচাং লেগে যাবে!

—আই অ্যাম সরি ডার্লিং।

—এই আইটেমটাতে নো ফাইভ স্টার ক্যান বিট আবদুল। বোজ খাই। কিন্তু পুবনো হয় না।

—আমারই মতো। বলো?

—উঁ...ম্।

সেই ভয়াল রাতেই মদন স্বপ্নে দেখল বাজারে তাকে মাছেব মুড়ো আব ব্রয়লারের চোখ বন্ধ মুণ্ডুর ঝাঁক কামড়াবে বলে তাড়া করেছে। বোয়াল, আড, শোল ইত্যাদি বিকট মাছের হাঁ-মুখে সারি সারি দাঁত। চুনোপুঁটির মুণ্ডুও বাকি নেই। তারাও পায়ে ঠোকরাচ্ছে। ঘুম ভেঙে মদন উঠে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে বোতলটা খুঁজে নিট বাংলা খানিকটা ঘ্যাঁক করে মেরে দিতে অস্বস্তিটা যেন জুড়োল। ঘটনাচক্রে সেই ভয়ালু রাতে কবি পুরন্দর ভাটও মদনের ঘরে মালফাল খেয়ে গামছা পরে তাঁবু খাটিয়ে ঘুমোচ্ছিল। নিদ্রার ঘোরেও তার কাব্য রচনায় ক্ষান্তি নেই। মদন তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনতে পেল, শ্যামাসংগীতের ঢঙেই—

মুণ্ডুমালা পরলো শ্যামা
গাত্রে না হোক পরলি জামা
ভাট কবিতায় পূজব বলে
মুণ্ডু আনি ধামা ধামা।
শ্যামা মায়ের ঠোঁটে হাসি
মুণ্ডু পরতে ভালোবাসি

পুরন্দরের মন যে বলে
পঞ্চাশৎটি বর্ণ দোলে।
মুণ্ডু দেখে যায় না বোঝা
কোনটা ডাকাত, কোনটা ওঝা
কোনটা তাপী, কোনটা পাপী
কোনটা ভাগ্নে, কোনটা মামা

মুণ্ডু আনি ধামা ধামা...

মদন কয়েকবাব পুরন্দবকে থাবড়ে যখন দেখল থামবে না তখন বাধ্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ভয়াল রাতেই পাশে শোয়া মোটা বউ ও গাঁদা বাচ্চা থাকাতেই স্বপ্নে হেলেনের নাচ দেখে ডি এস-এব স্বপ্নদোষ হল।

বড়িলালের ঘরে রাস্তার আলো ঢোকে বলে সে চোখেব ওপর ল্যাঙট চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাব ওসব কিছু হযনি।

সেই অস্থিব তাড়সে কেঁপে কেঁপে ওঠা রাতেই চোখে চাঁদেব স্পট পডায ঘুম ভেঙে মিসেস ললিতা জোযারদার দেখলেন বালিশের ওপরে নগবপালেব মুণ্ডুর নাক ডাকছে কিন্তু ধড়টি আলাদা হয়ে উপুড হয়ে ঘুমোচ্ছে। ধড় একবাব, ঘুমন্ত অবস্থাতেই, বাতকর্মও কবল। চাঁদের সামনে মেঘেব মিড-কার্টেন পডতে মিসেস্ জোয়াবদাবও পুনরায ঘুমন্ত স্টেজে চলে গেলেন।

এবপব যা অবশ্যম্ভাবী তাই হবে। কোনো গেঁড়ে নির্ঘাৎ প্রশ্ন তুলবে যে 'পঞ্চাশৎ' বণ; বা মুণ্ডুব রহস্যটা কী? সবই কি বাংলা টেনে ঢপবাজি? এর প্রথম উত্তরটি হল মুচকি হেসে স্পিকটি নট। দ্বিতীয় উত্তরটি হল—বাবা মা যখন পযদা কবে কাঁচা ড্রেনে না ফেলে দিয়ে পযাকড়ি খবচ কবে পড়িযেচে তখন একবারটি বাপু ২ টাকা ৫০ পয়সাব মাধুকবীব বদলে ডক্টব মহানামব্রত ব্রহ্মচাবীর 'জগজ্জননী কালীমাতাব তত্ত্ব' বইটি বগলদাবা করে পড়ে ফ্যালো দিকিনি। দুইগোটা সম্ভাব্য উত্তবেব কোনটি ইস্তেমাল করা উচিত? কতিপয গেঁড়েকে মাইনাস কবিযা বাকি পাঠকরা কী বলে?

পরদিন সকালে এগারোটা বাইশে সি. এম তাঁর পি এ মারফৎ নগরপালকে ডেকে পাঠালেন। আই. এস. আই. কলকাতায় কী খেল খেলছে সে বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান। এইসব এজেন্টরা যেহেতু বনবাদাড়ে ঠেক বানায় ও বীবাপ্পনের স্টাইলে অপারেট করতে পাবে তাই বনমন্ত্রী বনবিহারী তা এবং গৃহমন্ত্রী ও আমাদের পূর্বপরিচিত কমরেড আচার্যকেও ডাকা হয়েছে। উর্দি চাপালেই চলবে না। মাথাটিও স্বস্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রীবুদ্ধিই নগরপালকে এ যাত্রা বাঁচাল। এক মৃদু ঝাড়েই মোটরসাইকেলওয়ালা ঢ্যাঙা সার্জেন্ট তাব 'স্টাড' লেখা হেলমেটটি দিয়ে কেটে পড়ল। এবং সেটি পরে দেখা গেল নগবপালেব মুণ্ডু যথাস্থানে থাকছে এবং তদুপরি দুটি হাতই তিনি অবলীলায় নাড়াচাড়া করতে পারছেন। অর্থাৎ মাথা-কাটা অবস্থাতেও তিনি প্রতিবন্ধী নন। বেরোবার মুখে, দরজার দোরগোড়ায়, ললিতা নগবপালকে একটি পিঙ্ক রঙের গোলাপ দিলেন। এবং ছোট সাইজের একটি খাম। সিল করা।

—পিংক রোজ ইজ অলরাইট। কিন্তু এই খামে কী আছে?

মিসেস জোয়ারদার মুখ টিপে হাসেন।

—সি. এম-এর সঙ্গে মিটিং সেরে বেরিয়ে লালবাজারে যাবে তখন দেখবে। আগে নয়।

—লে হালুয়া।

সি. এম তো নগরপালকে দেখে থ!

—এ কী? তুমি আবার মোটর বেসিং ফেসিং শুরু করলে নাকি?

—না, স্যার। ঘাড়ে ব্যথা। কলাব নেব। কিন্তু টাইম পাচ্ছি না। ডক্টরেব সঙ্গে দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল কবেছি। তাই এটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছি।

—কী জানি বাপু। ঐ স্পেসটেসে যাবা যায় তাদেব কী যেন বলে।

বনবিহারী তা বলে ফেলে,

—ঠিক বলেছেন সাব, পাইলটের মতো।

গৃহমন্ত্রী খিঁচিয়ে ওঠে,

—যা জানো না তা নিয়ে কমেন্ট করো কেন? উনি বলছেন মি. জোয়ারদাবকে কসমোনটদেব মতো লাগছে।

—ওই হল। পাইলটও ওড়ে, কসমোনটও ওড়ে।

—থামবে তোমরা? ডি. জি-র সঙ্গে পরে আমি মিট করব। তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। বনবাদাড়ে অনেক ঘুরেছ। হোয়াট ইজ ইযোর রিডিং?

—তাহলে সার, একটু ডিটেলেই বলি। কাঠমাণ্ডুর ঐ আই. এ. সি প্লেন হাইজ্যাকিং-এর পর থেকেই লক্ষ করছি যে,

ফোন বাজে, অফ-হোয়াইট ফোনটা তোলেন সি. এম।

—হুঁ? ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ওয়ান্টস টু স্পিক টু মি। আস্ক হিম টু বিং আফটার সামটাইম। আই অ্যাম বিজি। যত্ত সব। চলো।

নগরপাল গলা খাঁকাবি দিযে শুরু করতে যাবেন কিন্তু বেল বাজল এবং পি. এ টু সি. এম মি. ঘোষাল ঘরে ঢুকে পড়লেন।

—সার! সার! কাল তো মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট ছিল।

কমরেড আচার্য গজরে ওঠেন।

—মিস ক্যালকাটা নয়, মিস কলকাতা।

—আঃ বড় ইন্টেরাপ্ট করো। বলো।

—সার, সেই কম্পিটিশনের সব বিউটিরা একবার আপনার কাছে এসেছে।

—আমার কাছে? হোয়াই? কী চায় ওরা?

—কিছু না সার। আজ বলছে মানে আপনার হল গিয়ে ভ্যালেনটাইনস্ ডে। ফুল দিয়ে আপনাকে গ্রিট করতে চায়।

—আসতে বলো। আফটারঅল অ্যা গ্রুপ অফ ইয়ং বিউটিজ। বিউটি ইজ ট্রুথ।

চার্পিং পাখির দলের মতোই খিলখিলিয়ে নটি বিউটিরা ঘরে ঢোকে। এর মধ্যে গোলাপের তোড়া যার হাতে সেই হল মিস ক্যালকাটা—রোজা কাপাদিয়া। ওরা সকলকেই ফুল দেয় ও মন্ত্রীদের গম্ভীর মুখগুলিতে মৃদু হাসি কুঁড়ির মতো ফুটে ওঠে।

—জোয়ারদার, তোমার হেডগিয়ারটা খুললে না? মিনিমাম এটিকেট। ঘাড়ে ব্যথা বলে...

—ইয়েস সার।

জোযারদার পা ঠুকে দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে হেলমেটটি ওপরে তোলেন। ফলে মুণ্ডুসমেত হেলমেটটি ওপরে উঠে যায় ও ফুলের গোছা নেবার জন্যে কবন্ধ ডানহাতটি বাড়িয়ে দেয়। রোজা ও অন্য সুন্দরীরা গোলাপের মতোই ঝরে যায়। মানে সহসা ক্লোরোফর্ম করা হল এরকম ভাব দেখিযে চোখ উল্টে ধুপধাপ পড়তে থাকে। মি. ঘোষাল চিৎকার করে ওঠেন।

—মাথা নেই। সার, মাথা নেই। ভূত!

হেলমেটের ভেতর থেকে জোয়ারদারেব মুণ্ডু বেরিয়ে পড়তে যাওয়ার মুখে ডান হাত দিয়ে জোয়ারদার তাকে ধরে ফেলে এবং চুলেব মুঠি ধবে গলায় বসায়।

—ভূত-ফুত নয় সাব। মাইনব একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট হলেই ঠিক হযে যাবে।

সি এম চটে যান।

—এই অবস্থায ডিউটি করছেন আপনি? মাথা আলাদা অবস্থায়। এ জিনিস আমি কখনোই সহ্য কবব না।

জোয়ারদার হেলমেট ফেলে দেন। বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কান ধরে মাথাটি ধবে বাখেন। ডান হাত দিয়ে স্যালুট কবেন।

হেড অব নো হেড, জোযারদার কখনও ডিউটিতে ফল্টার কবে না।

–দ্যাটস্ লাকি আ ব্রেভ পুলিশম্যান, বাট

ঘোষাল ঘব থেকে বেবিয়ে মানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার তিনি ডি. জি-কে নিযে ঢোকেন।

কমবেড আচার্য বলেন,

—এসব কী হচ্ছে বলুন তো? আমি বিপোর্ট চাই।

বস্তুত ডি জি-ব দিকে না তাকিয়েই তিনি রিপোর্ট তলব করেছিলেন।

ডি জি-ও নগবপালেব মতোই হেলমেট পবা।

নগবপালেব বুক পকেটে মিসেস জোযাবদাবেব ভ্যালেন্টাইনস্ ডে-ব কার্ড খামবন্দী। তাতে আঁকা ছিল একটি লাল হৃদয এবং তলায দুটি নীল বঙেব ফিমেল ঠোট। তলায লেখা 'পাগলী'।

(চলবে)

১৩

'১৩', সেই অপয়া ও ঢপযা ১৩ নং অধ্যায় ঘোর অনিচ্ছা তুচ্ছ কবে এসেই যখন পড়ল তখন তাকে তাসা পার্টির খুলিফাটানো ঢিং চ্যাক কুড, ঢিং চ্যাক কুড সহযোগে আমন্ত্রণ জানানোই ভালো। ইতিহাসের সকল ঘনিষ্ঠ পাঠকই দেখিযাছেন যে কী ডাইনোসবদের যুগে, কী অ্যামিবার আমলে বা হোমো স্যাপিয়েনদের জামানায় যখনই কোনো সাধু প্রচেষ্টা হইযাছে অমনি এক দল ডাইনো, অ্যামিবা বা হোমো স্যাপিয়েন বিনা প্ররোচনায় বা খজড়াদের মদতে তাহাকে নস্যাৎ করিবার ঘৃণ্য চক্রান্তে মাতিযাছে। কাজেই একই জাতেব ও পাতেব নিন্দামূলক অপপ্রচাব যে চোক্তার ফ্যাতাড়ু-কমনম্যান কম্বাইনের বিরুদ্ধে লাগু হইবেক তাহাতে সন্দেহ কী? এর জবাবে অকুতোভয় বাঙালিরা একসময় এগিযে গিযে চেঁচিয়ে বলত,

'নিন্দে যখন রটেছে তখন শালা বিয়েই করব।'

সে যুগ আর নাই। এখন কবির ভাষায় বহাল হইয়াছে 'বিষাক্ত যুগ'। এই শিরোনামটি বসাইয়া পোয়েট বিশু দত্ত যদি অবসরগ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও চলিত। কিন্তু পোযেটবা সচরাচব তেমন কবেন না। তাই বিশু দত্ত লিখিয়াছিলেন,

> কারাপ্রাচীরের অন্তরালেতে এখন জাগিছে কারা?
> এ যুগকে শুধু মেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার
> বাহু দুটি মেলি করে ফেলে গ্রাস। হে কবি আত্মহারা,
> আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আর।

এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা সহজ নয়। কেবল্ ফন্টকে খুচরা লোডশেডিং ভাবিলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখিয়া শ্রী বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিযাছিলেন, 'তাঁহাব ছবি হইতে যদি কোনো অর্থ খুঁজিতে যাই তাহা হইলে নিরাশ হইব। আনন্দেব প্রেরণায ছবি আঁকা—এ ছাড়া তাঁহার তুলিকা ধাবনের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই।' পণ্ডিত কেন, মুর্খরাও এ কথা মানিবে না। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একাধিক ভূতুড়ে ছবি আঁকতে গেলেন কেন? যা দেখলে শিশুরা অট্টক্রন্দন জুড়িয়া দিবে। কেন? এর উত্তব ঘোর ঘোরপ্যাচেব আবর্তে লুক্কায়িত এক মুচকি রহস্য। লুপ্ত গোরস্থানের উপবে শ্মশানের ধূম। ঘাড় মটকানো ঠেকায় কে? যাই হোক, আর প্রসঙ্গান্তরে নানাবিধ চর্চা ছাড়িয়া আমরা বিষাক্ত যুগেব নিন্দাব কর্দমাক্ত খেলটি বরং পাকড়াই। এ যুগেরেই এক ঘটনা। বিশেষ পুরনোও নয়। কংগ্রেস নেত্রী আভা মাইতি মেদিনীপুরেব বুভুক্ষুদেব মধ্যে সাধু অভিপ্রায়ে চালিত হইয়া মাইলো বিতবণ কবিয়াছিলেন। অমনি কং-বিরোধী বাম দেবরা গান বাঁধিল, 'একটি বালিকা চাইলো'ব সুবে

আভাদিদির মাইলো
সবাই মিলি খাইলো
উদরাময় হইল
(ফের) আভাদিদির মাইলো...

সেই ট্রাডিশন চোক্তার-ফ্যাতাড়ু কেন, কাহাকেও ছাড়িবে না। তাই সদাপ্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানানও দিতে হইবে। ইতিপূর্বে সরখেল যেমন করিয়াছে। খাপে খাপ, কেদারেব বাপ।

দীর্ঘদিন হইল ক্যালকাটায় আব বসন্তকাল আসে না। মধ্য এশিযাতে সোভিয়েতেব কল্যাণে পুঁজিবাদকে বাইপাস করিয়া যেমন বিদ্যমান ও 'প্রকৃত' সমাজতন্ত্র চালু হইয়াছিল তেমনই গুটিকয স্টুপিড কোকিলের আর্তরব হিসাবে না ধরিলে ক্যালকাটায উইন্টাবের পরই সামার আসে। এবং এই সামারেই অর্থাৎ মার্চের গরমে একটি পোস্টারে শহর ছয়লাপ। দিল্লি-বোম্বাই সাবাড করিয়া এক হাফ-কাবলে সেক্স-ভকিল ক্যালকাটায় আসিয়াছে যাহাব অসাধ্য কিছুই নাই। পোস্টারটি এইরকম,

সেক্স-ভকিল! সেক্স-ভকিল!
ফরঘানার হেকিমি ঘরানার খলিফা
বাবরাক কামাল কাবুলী
কলকাতায়
সেক্স-ভকিল! সেক্স-ভকিল!
কাবুল, পেশোয়ার, দিল্লী, বোম্বাই টুর খতম
লাস্ট স্টপ! লাস্ট স্টপ!
এ যাত্রায় কলকাতা
ঘর-৩৭। হোটেল গোপাল, ৯৫-এ, লাকি লেন
কলকাতা-১৬
সকাল—আম দরবার সন্ধেবেলা—স্পেশাল

এই মর্মে বিভিন্ন বাংলা (আনন্দবাজাব নহে), ইংবেজি, হিন্দি ও উর্দু দৈনিক-এ বিজ্ঞাপনও লোকের নজর কেড়েছিল। আম দববারে বিপুল জনতা সামলাতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায়। সবটাই ঘাড়ে গিয়ে পডল পার্ক স্ট্রিট থানার। একেবারে হুলো কেস। আগেই আমরা যার কথা জেনেছি সেই শ্মশান পাড়ার থানাব টাকলা ও সি-কে ফোন কবে দুঃখেব কথা বলতে বলতেই ঘেমে গেল পার্কস্ট্রিটেব বড়বাবু।

—ছিলুম ভালো। মাগির দালাল, ভেড়ুযা, খদ্দেব—চাব পাঁচটা ধরো। দুখানা রদ্দা ঝাড়ো। তিন চারটে পেডলাব ধবো। ধুমা ক্যালাও। একটা দুটো চামডাচোব। গাঁড়ে লাথ্, লক্ আপ। কোত্থেকে বাঁড়া এই সেক্স-ভকিল এল। ব্যস্, হালুযা হযে গেল। বোজ সকালে রগড়ারগড়ি ভিড়। আর লোকেরও বাঁড়া খেযে দেয়ে কাজ নেই। বুড়ো হযে গেছে। ধুকপুক করচে। তবু খিটকেলের ধান্দা। লাইফে লঙ্কাবাটা দিয়ে দিলে মাইরি। কোতায দুজনে একদিন অলিপাবে গুছিয়ে বসব।

—তবে ভায়া লোকটা শুনচি ধন্বন্তবি। হালুযা মোবব্বা কী সব দিচ্চে। রেজাল্ট নাকি ফ্যানটাসটিক। এক বাতে সব ঝটাঝট বনমোবগ হযে যাচ্ছে। অল টাইম অন।

—বলো কী ভাযা!

—এই জানবে। ঘোড়াব মুখেব খবব। আমি তো ভাবচি বাত কবে একটা ভিজিট মেরে দেব কিনা।

—দেবে? তাহলে বলো তো একটা ব্যবস্থা কবে ফেলি। দুই ভাইতে মিলে না হয় আড়ালে-আবডালে .

—করে ফ্যালো। কদিন থাকবে মালটা?

—বুজতে পাবছি না। হোটেলের মালিকটাও গাছহাবামি। জানলেও ভাংচে না। বললেই বলচে, দেকুন স্যার এরা হচ্ছে বেদুইনের জাত, মরুভূমিতে সোর্ড হাঁকানো পার্টি। এই দেকচেন আতর চুলবুলিয়ে মাইফেল বসাচ্চে, গালচেতে শুযে গড়গড়া টানচে আবার খেয়াল চাপল কি তেরাত্তির না পোয়াতেই চিচিং ফাঁক করে ভোঁ ভাঁ।

—তবে আর বিলম্ব কবো না।

—তা কবব না। তবে হেভি রাশ। বড় কত্তারা সব আসা যাওযা কবচে। মানে সব মহলেরই আর কি। নামের লিস্ট দেখলে কেলিয়ে পড়ে যাবে। কে নেই?

—আরে তার মধ্যেও একটা ফাঁক ফোঁকব দেখে গলিযে দিতে হবে।

—সে ম্যানেজ হয়ে যাবেখন।

—ব্যস, তারপরই!

—কী তারপর?

—কী আবার! খাপে খাপ, কেদারেব বাপ।

এরপরই টেলিফোনের দু প্রান্তেই খলখলিয়ে হাসির হাসনুহানা ফুটল। এ হল সেই হাসিব ফুল যা অচিরেই ঝরে পড়ে। সামান্য টোকাতেই।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটরের আজ মহানন্দ। কারণ স্বয়ং ছিন্নমস্তিষ্ক নগরপাল তাঁহাকে ফোনে জানাইয়াছেন যে অদ্য, ১৩ মার্চ, রাত সাড়ে দশটায় কাবলে সেক্স-ভকিলের সঙ্গে তাঁর এক্সক্লুসিভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং তিনি কোনো মতেই তাঁর বাল্যবন্ধু মহামান্য কিউরেটব মহাশয়কে সঙ্গে না লইয়া যাইতে নারাজ। বাল্যকাল, পোড়া শিবমন্দিরের ধসা দেওয়ালে বসিয়া তাঁহারা এ-উহাকে নিজ নিজ সাধনদণ্ড দেখাইয়াছিলেন। তখন তাহারা সবেমাত্র উসখুস করিতে

শিখিয়াছে, সংসার সমরাঙ্গণে মল্লক্রীড়ায় মাতোয়ারা হইবার মতো পাকাপোক্ত হয় নাই। সেই শিহরণ, সেই রোঁয়া রোঁয়া স্মৃতি, সেই অপাপবিদ্ধ হোমোখেলা কি ভোলা যায়? গেল না। এইসব সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কিউরেটর মহোদয় তাঁহার এক প্রৌঢ়া অধ্যাপিকা বান্ধবীকে ফোন মারিলেন যাঁহার বিষয় ভূগোল হইলেও সাহিত্যপ্রীতি উভয়কেই অবুঝবন্ধনে বাঁধিয়াছে।

—বিরক্ত করলাম?

—একটা ক্লাস অফ্ পেয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। ভালোই হল।

—কী ভালো হল?

—সে তুমি বুঝবে না।

(টেলিফোনে নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ)

—বুঝেছি।

—ভালো।

—এই শোনো, যে কাবণে তোমাকে ফোন কবলাম। হঠাৎ একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এল। সাহিত্যের সমস্যাটা একটা মূল শ্রেণীতে, দুপাশে সাজালেই সব তর্ক মিটে যাবে। কেউ জানে না। তোমাকেই বলছি। কারণ তুমি বুঝবে।

—যদি বুঝতে না পাবি? যদি মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়?

—যাবে না। যেভাবে ভেবেছি সেটা পুরোটাই মাথাব তলাব ব্যাপার।

—কোনো দুষ্টুমি আছে বলে মনে হচ্ছে।

—না, না, নো দুষ্টুমি। একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে বুফে সিস্টেম। ওখানেই আইডিয়াটা মাথায় এল। সাহিত্যকে দুভাগে আমবা দেখতে পারি—ভেজ আর নন-ভেজ।

লাল ল্যাঙট পরে অল্প ভুঁড়িওয়ালা বড়িলাল তার ঘরে, হনুমানজীর ছবিব সামনে, দুটো থানকা ইট এক হাত ফাঁক করে বসিয়ে বুক-ডন মাবছিল। রোজ দু সেট কবে ডন মাবে বড়িলাল। কুড়িটা করে এক এক সেটে। এতই আপার বডি টাটিয়ে যায। এরপব বযেছে পঞ্চাশ করে দুসেট পাতিয়ালা বৈঠক। লাফিয়ে জোড়াপাযে এগিযে বৈঠক ফিনিশ কবে ফের লাফিযে পেছিযে যায়। পুরোনো আমলে এই বৈঠক মল্লবিদ ও বডিবিল্ডাবদের মধ্যে সবিশেষ জনপ্রিয ছিল। এখন চলে, একহাবা বৈঠক। উঠ, বয়েঠ। এক এক পক্কড় শেষ করে বড়িলাল চিনির সরবত ছোট ছোট চুমুকে মেরে দিতে দিতে বিড়বিড় করছিল।

—সেক্স-ভকিল! আরে বাবা সিনাব জোর, টেংরির জোর, আড়ার জোর নেই—এক কাট্ দিলেই পটকান্—সব সেক্স-ভকিলের ঠেঙে চলেচে। সব ধড়কান হয়ে মরবে। এখনও দ্যাকো যেয়ে তোমরা মনোহর আইচ। পড়্ পড়্ কবে পাঁজি চার টুকরো কবে দেবে। পারবি? একনও দুটো কাবলেকে ধরে মাতা ঠুকে বাজিযে দেবে। পারবি? ওসব হল গিযে তোমার হিড়িক। যেমন পাড়ায় পাড়ায় জিমখেলা বানাচ্চে। সব ফঙ্গবেনে কারবার।

বিশাল একটি টিকটিকি এই কথার ফাঁকে গোবর গুহর ফটোর পেছন থেকে বেবিয়ে স্যান্ডো-র ফটোর পেছনে চলে গেল। যদিও সেটা ব্যায়ামরত বড়িলালের চোখে পড়েনি। বড়িলাল হনুমানের সামনে যে নকুলদানা রাখে সেগুলো চাটতে আরশোলা আসে। তখন গামা, জিবিস্কো, গোবর গুহ, স্যান্ডো ও মহিলা কুস্তিগির হামিদা বানুব ফটোর পেছন থেকে টিকটিকির পাল বেরিয়ে আসে। আরশোলার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে টিকটিকিদের মধ্যেই ফ্রিস্টাইল বা গ্রিকো-রোমান কুস্তি লেগে যায়। এই দৃশ্যটিই বড় করে দেখলে বোঝা যাবে পুরাকালে

ডাইনোসররা কীভাবে এ ওর খবর নিত। সিনেমায় ফাইট কম্পোজারের দরকার হয়। সে না থাকলে সব ফাইটই অচল। কিন্তু এই টিকটিকিদের ফাইটের কম্পোজার স্বয়ং ঈশ্বর। এবং আরও কী তাজ্জব ব্যাপার, এই অর্থসর্বস্ব বিশ্বে, বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি এই কাজ করে চলেছেন। হাততালি ফাততালিরও তোয়াক্কা করেন না। স্রেফ টিকটিকি লড়িয়ে দিয়েই আপন খেয়ালে বুঁদ। এর জন্য যে তারিফ তাঁর প্রাপ্য তা তিনি বাঙালি চোদ্দখোরদের কাছে কোনোদিনও পাবেন বলেও মনে হয় না।

অপয়া '১৩' অধ্যায়েই ১৩ মার্চ বিকেলে, আচমকা হুড়মুড় করে ডি এস কে দুপাশ থেকে ধরে মদন ও পুরন্দর ভাট যেভাবে ঢুকেছিল তা একমাত্র বড় মাপের ট্র্যাজিক নাটকেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। নলেন তখন লণ্ঠন পরিষ্কার করছিল। বেচামণি সালোয়ার ও কামিজ পরে উঠোনে কত্থক প্র্যাকটিস করছিল এবং ভদির বাপ বৃদ্ধ বায়স তা ধেই, তা তা এবং লচকতো মচকতো ইত্যাদি বোল ও ধাঁচ বোঝাচ্ছিল এবং অনতি দূরেই বারান্দায় ভদি ও সরখেল এমনই নিচু গলায় কথাবার্তা বলছিল যা শোনে কার বাপের সাধ্যি। এবং এই স্বাভাবিক, দৈনন্দিন ও গতানুগতিক কর্মকাণ্ড ও জীবন প্রবাহের মধ্যেই এক একটি চাকতি সহসা টাল খেয়ে বা কেৎরে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল বা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্তরীক্ষে বোঁ বোঁ মিলিয়ে যাচ্ছিল। বড় চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করে। যেগুলো নয়া পয়সা বা সোডার বোতলের ছিপি বা ক্যারামের স্ট্রাইকার সাইজের সেগুলি সাইরেন বাজির মতো এক চিলতে খোনা শব্দ করে হয় ঘরে ঢোকে বা গৃহ ত্যাগ করে। চাকতির পেছনে ফুয়েল ছিল কি? থাকলেও তা কী জাতের? কোনোদিনই জানা যাবে না। যেমন জানা যাবে না শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাদে আর কেউ শ্রীশ্রী কালীর অষ্টোত্তর শতনাম সংকলন করে উঠতে পেরেছিলেন কিনা অথবা পারলেও তা বাজারে নেই কেন অথবা লাল বাঈয়ের প্রেমে পাগল রাজা রঘুনাথকে সত্যই তার রানী চন্দ্রপ্রভা খতম করেছিলেন কিনা বা মিশরের পিরামিড নির্মাতাদের সচিত্র পরিচয়পত্র ছিল কি? ভেজ ও নন ভেজরাও এসব গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে হয় জানে না বা জানিলেও অন্তত আমাদের ভাষায় তা বলিবে না। ভাবিয়া লাভ নাই।

ডি এস -এর আছড়িয়া পড়া ও সরব ক্রন্দন যেন সহসা বৃদ্ধ দাঁড়কাক, নলেন, বেচামণি, ভদি ও সরখেলকে নির্বাক ইতিহাসে পরিণত করিল। লেবেডেফ এর সেই প্রসিদ্ধ থিয়েটারেও এরকম কোনো মুহূর্ত ও মূর্ছনা তৈরি হইয়াছিল কি?

সকলেই হতবাক। ক্রন্দনময় নীরবতা ভেঙে ককিয়ে উঠল বেচামণি।

—আহা, অমন করে কে মারলে গা' স্বারা পিট ডুমো ডুমো হয়ে উঠেছে। নলেন, এট্টু বরফ নিয়ে আয় তো।

ভদি খচে যায়।

—বরফ দিয়ে ঘেঁচুটা হবে। লেট হয়ে গেছে। বাবা, আপনি একটু ডানার বাতাস দিন তো। যে ব্যাথার যা ওষুধ।

আত্মারাম সরকারের ভোজবাজিই যেন বা। ডানার ঝাপটা খেতেই ডি এস-এর ককানি থেমে গেল। তারপর ঝিরঝিরি ফুঁপোনোটিও ধরল। বিকট ট্যাকঘড়ির মতো মুখে চাপা হাসিও ফুটল। দাঁড়কাকের হায়দারি হাঁক,

—কে তোর এই দশা করেছিল? কোন বাঞ্চোৎ?

—পু পু লিশ ।

—কেন? চোর-ডাকাত-মাগচালানী সব থাকতে তোকে পুলিশ হঠাৎ প্যাঁদাতে গেল কেন?

—আঁজ্ঞে, কাবলে সেক্স-ভকিলের কাছে গিয়েছিলুম।

—কী বলল খানকির ছেলে?

—বলবে কী? আম দববার বলে কতা। সে একেবারে বারো ভূতের মেলার ভিড়। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। সামলাতে না পেরে ও. সি বলল—চালাও লাঠি। আমিও পড়ে গেচি সামনে। অমনি দমাদম, দমাদম। যত বলচি, আর মেরোনা, মরে যাব, তত মারচে। যত চিল্লাচ্চি তত মারচে।

মদন এরপর যা বলে তাতে পুবন্দর মাথা নেড়ে সাড়া দেয়।

—শুনেমেলে আমি আগেভাগেই বলেছিলুম, তোর কি রথের চাকা খসেচে যে তুই সেক্স-ভকিল, সেক্স-ভকিল করে মরচিস। ঘরে বলে ডাকাবুকো বউ, এই সেদিন ছেলে বিইয়েচে—তোর দরকার সেক্স-ভকিলের? আমি গেলেও তা একটা কতা ছিল। পুরন্দর বলে,

—সে তো আমিও যেতে পারতুম। বলো ভদিদা, গেলে দোষ হত?

—দোষের আবার কী? যার দরকার পড়বে সেই যাবে। লোকে যাতায়াত কবে বলেই তো এসেচে। বাবা, কী বলেন?

—আমার কতা হল ঘবের লোকের গাযে হাত দেবে কেন? তবে কাজটা ডি. এস ঠিক করনি। অবশ্য আমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ না করলে এবকম গাড্ডায় ফাঁসতেই হবে।

—গাড্ডা কেন বাবা? কত নামী লোক। কাবলে হেকিম বলে কতা।

—ভ্যাড় ভ্যাড় করিসনা তো। কাবুলে এখন সব তালিবান। এ ব্যাটা কাবলে হেকিম না বাল। জালি মাল। পিওর ইন্ডিয়ান।

—অ্যাঁ!

—সকাল সকাল বেগম জনসনের কাছে গিছলুম। দেখি সেক্স-ভকিলের কথা কোন একটা গোরাসাহেব পেড়েচে কি বেগম একেবারে হেসে কুটিকুটি। বেগম জনসন কী বলল শুনবি?

—বলুন, শুনব তো। ইন্টারেস্টিং।

—বলল মালটা পুরো ফ্রড। আসলে আর্মস ডিলার। রাজস্থানের লোক। বর্ডার দিয়ে মাল আনে। খবব পেয়েচে সামনেব বছব ভোট বলে ওয়েস্টবেঙ্গলে এখন হেভি আর্মস-এর খাঁই। ওষুধপত্তর, ঐ হালুয়া, মোরব্বা সব ঢপ। আসলি চেক্ রিভলভার, চিনে রাইফেল, বাশিয়ান রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড—সব কেবল অর্ডার নিচ্চে। আর অর্ডার বাবদ অ্যাডভান্স। মাল পরে লরিতে ঠেকে ঠেকে পৌঁছে যাবে। বুঝলি? ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো-টি নেই। নেপালে দুবছর জেলে ছিল। সেখান থেকে গেল বাংলাদেশ। সেখানে হুলিয়া অমনি কেটে গেল মিয়ানমার। সেখান থেকে কলম্বো।

—এই এতসব খুঁটিনাটি বেগম জনসন জানেন?

—মুখস্থ। আর ওষুধগুলো কী জানিস?

—সে যাই হোক বাবা, লোকের মুখে কিন্তু ওষুধের বদনাম শুনিনি।

—রাখ্। ভায়াগ্রার ইন্ডিয়ান বেরিয়েচে—এডেগরা তারপর আরো কী সব যেন নাম। তাই গুলে দিচ্ছে আটার সঙ্গে। সঙ্গে ওকাসা, থ্রি-নট-থ্রি, শিলাজিৎ সব পাঞ্চ। বলচে ইয়াকুতি হালুয়া। এ নাকি মোগলাই ফর্মুলা। আরে বাবা ইয়াকুতি হালুয়াতে আসল ইনগ্রেডিয়েন্ট হল চড়ুইপাখির ব্রেন। অত চড়ুই ধরা কি মুখের কতা নাকি? পাহাড়ের টঙে পাথরের গায় ঘামের মতো শিলাজিৎ। তাই খেতে যত হিটিয়াল বাঁদরেরা পাহাড়ে চড়ে। নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মুঠোয় ভরে যখন মুখে পুরতে যাবে তখন তলা থেকে গুলি করতে হয়। বাঁদর গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে

পড়ল। তখন তার থাবা থেকে শিলাজিৎ কেঁকে নিতে হয়। বুঝলি? এসব যোগাড করা যে সে কাণ্ড নয়। রেওয়াজি মোরব্বা, ইয়াকুতি হালুয়া—নাম শুনেই সব নাচতে শুরু করল। যাই হোক, ওর কারণেই যখন ডি এস ঝাড় খেযেচে তখন মালটাকে সাইজ করতে হবে। অ্যায়সা প্যাঁদাতে হবে যে কলকাতায় আব কখনও যেন পুরকিবাজি না কবতে আসে।

স্মিত হাসিমুখে ভদি বলল,

—আপনি আব মেজাজ গবম কববেন না বাবা। আপনি বউমাকে যেমন নাচ শেখাচ্ছেন শেখান। সেক্স-ভকিলকে আমি দেখচি। কী বল সবখেল?

সবখেল খিক্ খিক্ কবে হাসে।

—তাহলে আজ রাতেই ব্যবস্থা করে দিই?

সরখেল মাথা এক দিকে কাত কবে সায দেয।

—নলেন, ছেলেছোকবারা এসেচে। ভালো কবে চা কব দিকিনি। আর ঝপ করে যেয়ে মুড়ি-ফুলুরি নিযে আয।

বেচামণি বলে ওঠে,

-আমি আলুর চপ খাব।

দণ্ডবায়সেব পছন্দ অন্য।

—গরম দেখে গোটা চারেক বেগুনি আনবি নলেন। ঠাণ্ডা যেন না হয়।

—নলেনকে ওসব বলতে হবে না। তুমি নাচেব বোল বল দিকিনি। দাদাবাবু যেমন বলল।

নলেন তেলেভাজাব লিস্ট বিড বিড কবে মুখস্ত কবতে কবতে চলে গেল। ভদি আব সবখেল ফেব বাবান্দায ফিবে গিযে গুঁই গুঁই কবে নিজেদেব চক্রান্তমূলক আলোচনা শুরু কবল। বেচামণি ওডনায় কপালেব ঘাম মুছে নিল। এক হাত কোমবে দিযে ও এক হাত বাতাসে মেলে ধবে দাঁড়াল। দুপাযে ঘুঙুব। মদন, পুবন্দব ও ডি. এস উঠোনেব একপাশে থেবড়ে বসে নাচ দেখতে লাগল। ডি. এস বলল,

—এই নাচটা আমি হেভি লাইক করি।

—নাম জানো নাচটাব?

—হ্যাঁ। কুচিপুদি।

—বাল জানো। একে বলে কত্থক। টেংরিব জোব না থাকলে এ নাচ নাচলে ঠ্যাং খুলে যাবে।

দণ্ডবায়স ধমকায়,

—তোরা চুপ করবি?

তাহলে লচক্‌তো মচক্‌তো।

তা, তা তা ধেই, ধেই তা তা, ধেই...

১৩ মার্চ রাত দশ ঘটিকায় হোটেল গোপালে রুম নাম্বার ৩৭-এ পুলিশী আঙুলের গাঁট্টা পড়ল...টুক, টুক...নগবপাল ও কিউরেটব। দরজা খুলিয়া দিল একটি বিচ্ছিন্ন হাত। নগরপাল বিচলিত কিন্তু বিস্মিত নন কারণ তিনি হেলমেট পরা। কিন্তু কিউবেটর। সে কী করে এই রমণীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে? সোফার ওপবে বসে আছে ধড়। একটি হাত দরজা খুলে দেওয়ার পর সাবলীলভাবে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে আসছে। টেবিলে বসানো পাগড়ি পরা সেক্স-ভকিলের মুণ্ডুতে গালভরা হাসি,

—আইয়ে, আইয়ে তসরিফ রাখিয়ে..

ওদিকে অপর একটি হাত, একটি চামচ দিয়ে বয়ামের থেকে ইয়াকুতি হালুয়া বের করছে কারণ বয়ামের গায়ে লেবেলে সেরকমই লেখা। নাগরা পরা দুটি পা ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। নগরপাল হেঁকে ওঠেন,

—অ্যাঃ এখানেও চাকতি! সেই চাকতিরই চক্কর। দ্যাট ক্রুয়েল ফ্লাইং সসার। ওহ্ গড্।

কিউরেটর প্রথমে ভেবেছিলেন ঘরটি উল্টে গেছে এবং তিনি ভারহীন অবস্থায় উড়ছেন। তা নয়। ধীরে ধীরে তিনি জ্ঞান হারাচ্ছিলেন এমন সময় দরজা ঠেলে পার্ক স্ট্রিট ও শ্মশান পাড়ার ও.সিও ঢুকল। দুজনেই মাল চার্জ করে একটু ঢুলু ঢুলু। তাই তারা হেলমেট পরা নগরপালকে চিনতে পারেনি।

—স্কাউন্ড্রেল। স্যালুট করতে অবদি ভুলে মেরে দিয়েছ। ক-বোতল টেনেছ দুটোতে? টাকলা ও.সি গলার আওযাজটা চিনে স্যালুট করবে কি করবে না ভাবছিল। পার্ক স্ট্রিটের ও সি, একে মাথামোটা তায় চার্জড্। সে তড়পে উঠল,

—তুই ল্যাওড়া কে যে তোকে স্যালুট মারতে হবে?

—অ্যাঃ আমি ল্যাওড়া কে?

অলৌকিক ঘটনায় বহু সময়েই পুলিশ জড়িত থাকে। যেমন জলজ্যান্ত মানুষ হাওযা করে দেওয়া। পুলিশ কখনোই দাবি করে না যে তারা ম্যাজিক জানে। তবুও ম্যাজিক দেখানোতে পুলিশ যে পারঙ্গম তা সকলেই জানে। আবার পুলিশকেও কখনও সখনও ম্যাজিক দেখতে হয়। তেমনই ম্যাজিক বিষয়েই কবি হরিবর সরকার লিখিযাছেন,

লোচন গোস্বামী যবে জয়পুরে ছিল।
থানা হতে পরোয়ানা বাহির করিল॥
জলে বাহ্য প্রস্রাব কেহই করিবে না।
কৈলে জেল জরিমানা হবে সাক্ষী বিনা॥
গোস্বামী তরীতে উঠি হাতে লযে বৈঠে।
করিল পুরিষ ত্যাগ থানার নিকটে॥
দেখিয়া দারোগাবাবু ক্রোধে কম্পমান।
বলে ঐ বেটারে থানায় ধরে আন॥
শুনিযা কনস্টেবল বলিল তখন।
দুর্গন্ধে নিকটে যেতে নারিব কখন॥
নিজেই দারোগাবাবু করিল গমন।
চন্দনের গন্ধ পেয়ে প্রফুল্লিত মন॥

হে পাঠক বাবাজী, বলিতে পার ঐ লোচন গোস্বামী কে? পুলিশকে গু ও চন্দনের ম্যাজিক দেখাইবার শক্তি তিনি কোথা হইতে পাইলেন? তা তা থেই..থেই... (চলবে)

১৪

মার্কসবাদের বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলে বেশিরভাগ পাঠকই আজকাল নাস্তিক। ধর্মচর্চা দেশ থেকে লোপাট হওয়ার যোগাড়। তাই নাস্তিকদের নাস্তানাবুদ না করে বরং ঝেড়ে কাশাই ভালো যে মান্যবর লোচন গোস্বামী হলেন মতুয়া ধর্মের মহাপথিক। তাঁর যে কত লীলা তার লেখাজোখা নেই। সন্দেহের নিরসন এভাবেই ঘটে। শিষ্যরা গুরুদের বাজিয়ে নেয়। গুরুরাও বেজে ওঠেন। এরপর হল কবিদের ডকুমেন্টেশন্-এর কাজ। যেটি করে শ্রীহরিবর সরকার আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কেন যে করতে গেলেন সে প্রশ্ন অবশ্য ওঠে। এই অকৃতজ্ঞ ও গোলোকায়িত জাত অর্থাৎ বাঙালির জন্য কিছুই করা উচিৎ নয়। 'কাঙাল মালসাট' এর কথাই ধরা যাক। এটি যদি পুস্তু বা কপটিক ভাষায় লেখা হতো তাহলে এতক্ষণে ঢি ঢি পড়ে যেত। পালি বা মাগধী অপ্রাকৃতে লেখা হলেও অন্যরকম কিছু ঘটত বলে মনে হয় না। অবশ্য লেখক এক ভেবে লেখে। হয় আর এক। যেমন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এ প্রসঙ্গে উপযুক্ত সময়ে বরং ফেরা যাবে। ভদি ও সরখেলের মধ্যে টেলিফোনে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে সে দিকে মনোনিবেশ করা যাক—

—দুঁদুঁ বার ফোঁন কঁরলুঁম। ভাঁবলুম কী হঁল?

—হঁবে আঁবার কী। পাঁইখানায় গেঁছলুম।

—তাঁই বঁলো। কোঁনো খঁবর আঁচে?

—আঁচে। মঁরচে পঁড়া এঁকটা সোঁর্ড আঁর দুঁটো ভোঁজালি বেঁরিয়েচে।

—ভেঁবি গুঁড। বাঁট নোঁ আঁসলি মাঁল।

—নোঁ।

—নুঁনুকাঁমান, সোঁর্ড, ভোঁজালি। পোঁদ মেঁরে দেঁব।

—কাঁর?

—যেঁ লাঁগতে আঁসবে। কেঁরোসিনে ভিঁজিযেচ?

—কী?

—ওঁই সোঁর্ড। তাঁরপর গিঁযে ভোঁজালি?

—কেঁন?

—মঁরচে ছেঁড়ে যাঁবে।

—কেঁরোসিন নেঁই।

—আঁজ রাঁতে আঁমি নিঁয়ে যাঁব।

—ঠিঁক আঁচে।

—কোঁনো চিঁন্তা নেঁই। এঁকটা এঁকটা কঁরে ধঁরে পোঁদ মেঁরে দেঁব।

—রাঁখলুম।

—তাঁহলে রাঁতে।

—অঁ।

প্রায় এক সরখেল মাটি খোঁড়া হয়ে গেছে। অথচ কত সরখেল খুঁড়লে যে আসলি মাল পাওয়া যাবে তা কে বলতে পারে? আবার এমনও তো হতে পারে যে খোঁড়াকে খোঁড়াই সার হল, হতে রইল খন্তা। ভদির কপালে টেনশনের ঘাম ফুটতে না ফুটতে বেচামণি আঁচল দিয়ে মুছে দেয়।

—কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করচ গো?

—সে তুমি বুঝবে না।

—জানিনে বাপু। বললেই ওই অ্যাক কতা। তুমি বুজবে না। তুমি বুজবে না।

—আহাহা এ হল গে মদ্দাদের ব্যাপার। বলি আর তুমি সাতকাহন করে বেডাও।

—তোমার সব কাণ্ড বাণ্ড আমি বুঝি সাতকাহন করে বেড়াই।

—করনি। করতে কতক্ষণ? মেয়েজাত পেটে কতা রাখতে পারে না। এই জানবে।

—ওরে আমার ব্যাটাছেলেরে। তুমি যে শিশি বোতলে ভূত পোষো আমি কারুকে বলতে গেচি?

ভদি দেখল কেস বেগড়বাঁই হয়ে যেতে পারে। এক হল বেচামণি মাঁউ জুড়ে দিতে পাবে। এবং তখন না থাকলেও বাবা সব জেনে যাবে এবং উস্তমপুস্তম কবে ছাড়বে। বাপ হযে ছেলেব বৌ-এর দিকে অত টাঁক কেন? এরকম কথাও যে ভদি কখনও ভাবেনি তা নয়। ভদি কথা ঘুরিয়ে দিল।

—আমি কি তাই বলেচি? এই যে তোমার দিদির বাড়ি ঘুবে এলে দমদমায—মনে খিঁচ থাকলে কি তোমাকে যেতে দিতুম? বিশ্বাস আচে বলেই না ছেড়েচি।

বেচামণি টোপটা গিলে নিল।

—জামাইবাবু আমাকে কী বলেছিল জানো তো?

—কী?

—এই বেচু, তোর ওই গদি না ভদি রোজ রোজ সাযেবদেব কোম্পানীব মাল খায—কী করে বে? শুনেচি তো অকম্মে কুকম্মে ঘর ভাড়া দেয়।

—খানকির ছেলে। তা তুমি কী বললে?

—আমিও বললুম, দ্যাখো জামাইবাবু, আমবা হলাম ঘরকুনো বউ। পুরুষমানুষ কী মদ খাচ্চে, কী কারবার করচে ওসব নিয়ে ভাবি না। তবে অযত্ন করলে কি অবিশ্বাসেব কাজ করলে টেব পেতুম। দিদি বলল, দেখলে তো, শালীর মুখের পোঁচড়াটা খেতে হল। এমনিই কি লোকে গুয়ো হাড়কেল বলে।

—ভাল বলেচে তো।

—মায়ের পেটের বড় বোন। ও কি বোজে না দুবেলা ওকে ঠকাচ্চে? তোর গিয়ে বলে ছেলের বিয়ে হয়ে গেচে, নাতিপুতি হবার যোগাড়, আর তুই কিনা...

—আহাহা, ওসব কতা আর তুলো না। সব্বো দোষের ওপরে জানবে মাগির দোষ। ও ছোঁকছোঁকানি ধরেচে কি মরেচ। তবিল-তক্তপোষ সব নীলেম করিয়ে ছাড়বে। পেটটা ফাঁপচে। একটু তেলজল পুলটিস করে দেবে?

—ব্যতা নেইতো? অতগুলো পুঁই-চিংড়ি গবগব করে খেলে...তখনই জানি...

—ঘেঁচু জানো। বুজলে, এই সরখেল আর আমি একটা জবর বিসনেস খুলাতে চলেচি। সেই চিন্তাতেই পেট ফাঁপছে। একবার যদি লেগে যায়...

কী হবে গো লাগলে?

লাগলে? এই ধরো তো বালী বা পুরী যাওয়ার বাই উঠলো বা বিন্দাবন-মথুরা। হাওড়ায় গিয়ে আর ভিড়ভাট্টায় রেলগাড়ি চড়তে হবে না।

—তবে?

—বাড়ির ছাদ থেকে যাবে। সেজেগুজে ছাদে উঠবে। দেখবে বড় ফড়িং-এর মতো দাঁড়িয়ে।

হেলিকপটার। মন্ত্রী-ফন্ত্রী সব চড়ে। চড়ে ফড়ফড় কবে উডে বেড়ায়।

—অ্যাঃ

—এই জানবে। ভদি সরকার যকন খেলতে শুরু করবেনা তখন দেখবে সব শালা পোঁদ সামলাতে ব্যস্ত। সামনে পড়লেই মেবে দেব।

—ও আবার কী কতা।

—এই হল হকের কতা। গাঁড় মাবা যাওয়ার ভয তো লড়তে এসো না। তুমিও ভালো, আমিও ভালো, জয় জগতের জয়। ঘেঁটে দে মা। ভালো কবে একটিবাব ঘেঁটে দে।

এই বাক্যলাপেব কাছাকাছি সময়েই ক্যালকাটার বিখ্যাত জুয়েলাব ভি ডি দত্ত একটি নক্ষত্র-সন্ধ্যার আয়োজন করে। তাকলাগানো অনুষ্ঠানটি হয কলামন্দিবে। ওই কলামন্দিবেই বেসমেন্টে একটি ছোট কলামন্দিরও আছে। সেখানে তখন ববিঠাকুবেব ভাঙা গান হচ্ছিল। আর বড়টিতে তখন স্টেজজুড়ে ফুটবল, ইতিহাস, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, রান্না, ফ্যাশন ডিজাইনিং, পেডিকিওর, দর্শন, রাজনীতি, কুকুরপালন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালেরা বসে। চার-পাঁচটি কেবল্ চ্যানেলের ক্যামেরা চলছে। এমন সময পাট ভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি ও ফাইন ধুতি হাঁকিয়ে হাসিমুখে যে মঞ্চে প্রবেশ করেছিল তার নাম হল ডি এস। এসেই সে অনুষ্ঠানের অ্যাংকার বা নোঙর বহস্যময়ী মিস ম.-ব হাত থেকে কর্ডলেস মাইক্রোফোন নিয়ে বলল,

—এসে গেছি। মুম্বাই ফ্লাইট দেড ঘণ্টা লেট। প্লেনে বোমা ছিল। গন্ধ শুঁকে কুকুর বোমা বেব কবল। সে বহুৎ হরকৎ। কিন্তু স্টেজে চেযাব কই যে ঠেকাব? চেযার! চেয়াব লাও শালা। চেযা...ব।

চেযাব এসে গেল হুড়মুড কবে। সকলেই ঘাবড়ে গেছে। মিস ম বসা ডিস্টিলাবিব বাংলাব গন্ধ পেয়েছিল। ঘঁক করে আঁতে লাগে।

—এখেনে সব হেক্কড় টাইপেব মাল বসে আচে। অন্তত আপনাদেব তাই ধারনা। কিন্তু সবই আলফাল। গিদ্ধড়। ঐ যে ইতিহাস মারাতে যে মালটা এসেচে ও হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিযালের কিউরেটর। ওব মুখটা দেকুন। চোনাঢেকুর গিলচে। কেন বলুন তো? ভাবচে আমি ফাঁস করে দেব যে বাঞ্চোতের পোঁদে গু। কী রে? দেব? কাল দুপুবে কী করছিলি?

কিউরেটরকে নিজের সিটে এলিয়ে যেতে দেখে পাশেব বিশিষ্টরা ঘাবড়ে গেল। হলেও গুইগাঁই। পুলিশ এগোয়। পার্ক স্ট্রিটের ও.সি চেঁচায়,

—আপনি কে? আপনি কি ইনভাইটেড?

আমার নাম ডি. এস। কোক শাস্ত্রর ওপবে অথরিটি। ইনভিটেশনেব গাঁড় মারি। আর কিছু?

হলে তুমুল হট্টগোল। কেবল্ চ্যানেলবা ডি. এস-এর ছবি তুলছে। এইসময় হলে আলো নিভে গেল। হেভি গুমুঙ্গুলি। কোনো মহিলাব চিৎকার। মারপিট লেগে গেছে। টিপ্ ঢাপ্ টিক্ দেওয়ার সাউন্ড। চেয়াব ভাঙছে। পুলিশ ও হলেব সিট দেখানোব আশারদের টর্চ। সেই আলোয় দেখা যায় ডি. এস তিন চার মানুষ হাইটে উড়ে বেড়াচ্চে। হাতে কর্ডলেস। সব ছাপিয়ে ডি. এস এর স্টিরিও ভয়েস।

—এবারে বাঁড়া বুঝেচতো আমি কে? ম্যায় হুঁ ডি. এস। সবাই এক কপি করে 'কোক-শাস্ত্র' কিনে ফেলুন। জানতে পারবেন কাশ্মিরেব বাজাকে কোকা পণ্ডিত মেল-ফিমেল নিয়ে কী বলেছিল। জানলে আপনারাও বর্তে যাবেন। ফোর টাইপস অব্ কামিনী রয়েচে। সব মাগিই একটা না একটা টাইপে পড়বে। টাইপ বুঝে বন্দোবস্ত—এই চোদনা ও. সি চর্ট মেরে কী করবি—আমাকে ধরবি—

এইসময় ঝপ করে চার পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে আলো ফিরে এল। দেখা গেল কোকশাস্ত্রের ওপরে অথরিটিই শুধু নয়, ওপরে আরও দুটি মানুষ অর্থাৎ মদন ও পুরন্দর ভাটও উড়ছে। এবং বিশাল দাঁড়কাক। আলো নিভে গেল। এবং ওপর থেকে, অজানা অন্ধকারের অ্যামবিয়েন্সের মধ্যে জলীয় কিছু তরল তিনটি রেখায়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝিরঝিরি হতে পারে, ছন্ছন্ করেও হবে না কেন ফের লাইট অফ্...

...কলকাতার হাতবদল এইবার আর সল্টলেকের অদৃশ্য দৈনিকের পাতায় উড়োখবর হয়ে আটকে থাকল না। স্বয়ং সি. এম-কেও নড়েচড়ে বসতে হল। নগরপাল ও মহানির্দেশকের শিরচ্ছেদ ও খণ্ড খণ্ড সেক্স-ভকিলের করুণ ঘটনা তাঁর কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু এটা ঠিক যে এইসব ঘটনাকে যতটা আমল দেওয়া উচিত ছিল তা তিনি দেননি। তাঁর আমলের নানা বিশিষ্টতার মধ্যে এটাও হয়তো একটি বলে ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদেরা মন্তব্য করবেন। কেউ হয়তো বলবেন এই পর্বের নানা ঘটনাবলীকে মার্কসবাদের অমোঘ আওতায় এনে ফেলার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এনে ফেলতে পারলে বোধহয় ইতিহাস মই ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারত। মই নিয়ে পালানো হয়তো সম্ভব কিন্তু সিঁড়ি সরানো অত সহজ নয়। কেউ হয়তো বাঙালির কোনো জেনেটিক গোলমালই এর জন্য দায়ী বলে মনে করবেন। ঘটনা একটিই—কিন্তু ব্যাখ্যা অসংখ্য। বিশ্লেষণ ও ইঙ্গিতের এই বহুত্ব হতে বাঁচার একটি উপায় হল ক্লোনিং। সব ইতিহাসবিদকে কোতল করে যদি একটিকে ক্লোন করা যায় তাহলে ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্র কারো হতেই অত অঢেল ক্ষমতা নেই। এটা আত্মস্থ করেই গোয়েবেলস বলেছিলেন যে নিজের আইন ভাঙার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকা উচিত। সংস্কৃতি—এই শব্দটা শুনলেই নাকি ভদ্রলোকের হাত রিভলভারের দিকে যাওয়ার জন্যে নিশপিশ করত। লোকটা চুতিযা টাইপের ছিল। এবং এরকম মাল ফুরিয়ে গেছে বলে যেন কোনো নির্বোধ পাঠক বগলে পাউডার দিতে না শুরু করে। খেল এখনও বাকি হ্যায়। পহেলা ঝাঁকির পর আসবে কাশী মথুরা। আসবে ট্রেবলিংকা, বুখেনভাল্ড মৃত্যু শিবির। আসবে সাইবেরিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুলাগ। জামাই ষষ্ঠী আর আইবুড়ো ভাত, মোনামুনির খেলা, সাধ-এর ফাটা পায়েস—কী ভেবেছিলে পাঁচু? এভাবেই চলবে পানসি? ডেস্টিনেশন ইনু মিস্তিরের বেলঘরিয়া? সে গুড়ে মগরহাটের ফাইন স্যান্ড।

রাইটার্স-এর খুচরো ঘটনাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এবার আমরা স্থায়ী আমানতের দিকে ঠ্যাং বাড়াব। যে কোনো মেজর বা মেজর জেনারেল নভেলের নভেলটি হল তার বিভাগ-চলন। হালের উদাহরণ মানে যা হাতেনাতে ঘোরে তেমনই একটি হল মিলান কুন্দেরার 'জোক'। এখানেও মজা আছে। ভূমিকায় যাঁকে কুন্দেরা মহান ঔপন্যাসিক বলেছেন সেই প্রখ্যাত কবি লুই আরাগঁর উপন্যাস খুব কমসংখ্যক পাঁচুই পড়েছে। লে হুলিয়া।

মহাকরণ থেকে একটি বুলেট-প্রুফ সাদা অ্যাম্বি বেরোচ্ছিল। তাতে ছিলেন সি. এম, গৃহমন্ত্রী (এঁকে আমরা স্তালিনের খপ্পরে নাস্তানাবুদ হতে দেখেছি) এবং সি. এম-এর একান্ত সচিব রাখেকেষ্ট যার একমাত্র কাজ হল সি. এম-এর সর্বাবস্থার ভিডিও একটি হ্যান্ডিক্যামে সঞ্চয় করা। অ্যাম্বি দুলকি গড়ানে এগোচ্ছিল কিন্তু রে-ব্যান সানগ্লাস পরা স্লিম একটি সার্জেন্ট হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। সকলেই হতবাক। অতীব বিরক্ত হয়ে কাচ নামিয়ে কমরেড আচার্য গর্জে উঠলেন।

—ব্যাপারটা কী কমরেড সার্জেন্ট?

কমরেড সার্জেন্ট ঘুরে তাকাল। কচি সাহেবটি। মুখে তখনও ডার্বিশায়ারের কাঁচা গরুর

দুধের গন্ধ। গোঁফটিও দুধেল যেমন শিশুদের হয়। সাহেব যা বলল তা এই,

—নেটিভ, টুমি চোপ্ মারিয়া বসিযা ঠাকো। পহলে গোবা, উসকা বাদ গরু-ঘোড়া—বুঝিলে? নটি করিবে টো এক ব্যাটন খাইবে হাবামখোবের বাচ্চা।

উত্তেজক এই দৃশ্যে শব্দ উঠিল, ক্রমশই উপরে, ঝুনঝুনঝুন ঝন টগবগটগবগ সাঁই সপাশ্ সাঁই সপাশ্ ও ক্যাঁচকোঁচক্যাঁচকোঁচ ঘোড়াব টানা হাওদাই বা যেন। বেগম জনসন। মিস্ স্যান্ডারসন। মিস এমা র‍্যাংহাম। মিস্টাব স্লিম্যান। সেই পাঙ্খাবরদাবেব গাঁড়ে কিক। সেই মিসিবাবার কুকুরদেব মেটিং-সিজন। সেই হুমদো সাহেবদের মারাত্মক ডুয়েল ও গুলি মিস। মতিলাল শীলের বোতল ও কর্কেব ব্যবসা। ছোবদার, মশালচি, ঘেসুড়ে, খানসামা, খিদমৎগার, হুঁকাবরদার, মালি, ভিস্তি, ধোবি ও আযাদেব প্যাঁকপ্যাঁকানি। ভুটানি ও বোহিল্লা আফগানদেব হুমকি। কিন্তু অন্তে একটি সাদা অ্যাম্বাসাডর। বুলেট-প্রুফ।

বাষ্ট্রেব টনক যখন নড়ে তখন যা নড়ে না চডে না তেমনদেবও নডে বসতে হয। রাজ্যেব টনক নড়াও অন্যরকম নয়। কেন্দ্র যখন নাডবেই না তখন রাজ্য তো আব চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই গোলাপ মল্লিকেব কাছে তলব এল যে কিছুদিন ও বছবখানেক আগে যে দুটি ফাইল সে পাঠিয়েছিল এবং যে দুটি ফাইলেব ওপবে ‘বাল’ ও ‘পাগলাচোদা’ লিখে ফেরত পাঠানো হযেছিল সেই দুটি ফাইল যেন অবিলম্বে পুনরুদ্ধাব কবে, উপরেব মন্তব্যদুটি নির্ভুলভাবে মুছে বা কালি দিযে ধেবড়ে ঢাকাচাপা দিয়ে, ওপব মহলে পাঠানো হয এবং এই তলবটি অতিশয় আর্জেন্ট। তলবটি হাতে পেযে গোলাপ তৎক্ষণাৎ সাধুব কাছে চলে গেল ও উভযের মধ্যে এই বকম বাক্যালাপ হল,

—দেখচেন, স্যার, পুবো গাঁডক্যাচাল কেস। সেই দুটো ফাইল, তখন বানচোৎগুলো পাত্তা দিল না। এখন বলচে ফেব চাই।

তাবকনাথ তখন মন দিযে ‘বিষপ্রযোগে হত্যা—সেকাল আব একাল’ বলে একটি বই পডছিলেন। তিনি মুচকি হেসে গোলাপকে বললেন,

—পটাসিযাম সায়ানাইড নয়, ফাইটোটক্সিনও নয, স্রেফ ওভারডোজ অব্ জাফরান দিয়েই লোক সাবড়ে দেওয়া যায। কী বুঝলে?

—জাফরান তো বিরিযানিতে দেয়।

—কাবেক্ট! চান্স পেলেই তো প্যাঁদাও। ফিউচারে আব খেও না। হয়তো ভুল করেই বেশি পড়ে গেল। কোনো মার্ডাবের মোটিভই ছিল না। মধ্যে থেকে তুমি অক্কা পেয়ে গেলে।

—সে না হয় আব খেলাম না। কিন্তু ফাইলদুটোর ব্যাপারে কী করি বলুন তো।

—কোন ফাইল?

—ওই যে সেই রবিঠাকুবের বিজ্ঞাপন আব.

—সরকার নামে পাগলাটার সেই হিজিবিজি, তাই তো?

গোলাপ দেখল যে তারকনাথের মতো দুঁদে গোয়েন্দাও সবখেলকে ভুলে সরকার বলে দিয়েছে। এবং এই ভুলের ল্যাজ ধরেই তাব বুকেব মধ্যে গোলাপেবই একটি করুণ কাঁটা যেন ফুটে গেল—বেচারা সরখেল। বউ-মরা দাঁত-পড়া সবখেল। বাঘের মুণ্ডুর মতো গাঁদার চাষ করে। এখন পুলিশ ওকে বেঘোরে ক্যালাবে।

—হ্যাঁ, সার।

—এইটা বলতে যা টাইম নিলে তাতে করে ইনফার কবচি তুমি রিয়ালি ওরিড। ঘাবড়িও না। টাইম নিয়ে খোঁজো। চাঁইরা যখন চাইছে তখন তো দিতেই হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে

ফাইল হাতের মোয়া নয়। ধুলোপড়া অত দিস্তে দিস্তে ফাইল—খুঁজেপেতে বের করতেও তো টাইম লাগবে। বলেছে যখন লেগে পড়ো।

—সে না হয় লাগলাম। কিন্তু বলুন। তখন ওইভাবে ফেরৎ পাঠাল। গ্যারান্টি দিতে পারি ওরা খুলেও দেখেনি। বলুন, এটা অন্যায় নয়?

—যত পড়ছি বুঝলে তত ন্যায়-অন্যায় গুলিয়ে যাচ্ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বিরিয়ানিব জাফরান। তাকেও বিশ্বাস নেই। তোমার ক-বছর?

—কীসের স্যার?

—কীসের আবার। রিটায়ারমেন্টের।

—আরো বছর পাঁচেক আছে।

—ভুগবে। আমি তো নেক্সট ইয়ারেই ভাগলবা। যাইহোক লেগে পড়। টাইম লাগুক। আমি সামলাবো।

সাধু পুনরায় 'বিষপ্রয়োগে হত্যা—সেকাল আর একাল'-এ মন দিলেন। গোলাপ ঠিক করল যে ছাদে উঠে দণ্ডবায়সবাবাকে ডাকতে হবে। আচ্ছা, কালীঘাটে গিয়ে একবার সরখেলকে সাবধান করে দিলে কেমন হয়?

এর পরদিন গোলাপ দুটো ফাইলই পেয়েছিল। ওপরে লেখা মন্তব্যদুটির ওপরে কালো কালি বুলিয়ে দিয়েছিল। সাধু ফাইলদুটি ওপরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু খুলতেই ক্যাচাল।

একটিতে ছিল শ্রীঘৃত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব বাণী। বলাই বাহুল্য যে সেটি নেই। বরং একটি মুদ্রিত কবিতা বা কবিতার অংশ...

বাকি আছে আর
দোদুল কদম্ব বনে
লোলুপ, লোমশ মনে
নিতম্ব প্রহার

এবং দ্বিতীয় ফাইল, যাতে সরখেলের প্রবন্ধটি ছিল, সেখানে, জেরক্স কপি একটি—(৫ই মার্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন। বিশেষত শ্রীযুক্ত মির্জ্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমাদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিসয়ে কিঞ্চিতমাত্র ভয় নাই যদ্যপি গবর্নমেন্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখনও অপহ্নব করিবেন না।

সমূহ বিচলিত গোয়েন্দা কর্তারা শুধু যে নার্ভাস হয়ে পড়েন তাই নয়, তারকনাথ সাধুকে এমনও প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছিলেন যে তাঁদের সন্দেহের তীর যেহেতু গোলাপকেই বিদ্ধ করছে অতএব গোলাপ মল্লিককে তাঁরা সদলবলে 'গ্রিল' করতে চান। এর জবাবে তারকনাথ গেয়ে উঠেছিল, 'তবে কেন পায়না বিচার নিহত গোলাপ'...এবং বলেছিল,

—পোঁদে নেই ইন্দি, ভজোরে গোবিন্দি। কার ঝাঁটে কটা লোম দেখে নেব। গোলাপকে টাচ করে দেখুক না একবার। ঐ তো সব যোগাড় করেছিল—রবিঠাকুরের ঘি-এর কোম্পানি, তারপর গিয়ে সরকারের হুমকি। তখন ঢ্যামনাচোদার মতো ফাইলের ওপরে 'বাল' আর

'পাগলাচোদা' কে লিকেছিল? আপনারা। গ্রিল করচে। গ্রিল করবে। মার্ডার আব মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে পুরো জীবনটা গেল, এখন কোত্থেকে ঝাঁটুযা এসে বলছে রোজ-কে গ্রিল করবে। তুলকালাম লাগিয়ে দেব। লালবাজার, মিনিস্ট্রি, লর্ড সিনহা সব জায়গায় হুডকালাম লাগিয়ে দেব। দেখবেন? অ্যাসোসিয়েশনের কানে কথাটা তুলব?

—আহ্ মিঃ সাধু। অযথা আপনি এক্সাইটেড হযে পড়েছেন। অ্যাকচুযালি আমবা ঠিক ওটা মিন কবিনি।

—দেখুন। সাফসুৎবো বলে দিলুম। আই অ্যাম তাবকনাথ সাধু। আপনাবা যখন ল্যাক্টোজেন খাচছেন তখন থ্রি-নট-থ্রি দিযে বগল চুলকোচ্ছি—বি কেযাবফুল। গোলাপেব একগাছাতেও যদি কারো হাত লাগে তাহলে আগুন লেগে যাবে।

—সে না হয হল। গোলাপ যেমন আছে তেমনই থাকবে। কেউ ওকে ট্যাম্পার কববে না। কিন্তু ফাইলদুটোর মধ্যে থেকে মাল হাওযা নিউ মাল ইন—এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

—আমি বলব ম্যাজিক অ্যান্ড মিস্ট্রি। যতক্ষণ না অন্য প্রমাণ পাচ্ছি। ততক্ষণ আমি চুপ। তবে গোলাপ এব কিছুই জানে না। বেচারা। সব ফাইল আমার ঘরে। ধরলে আমাকে ধরুন। করুন, গ্রিল না কী করবেন।

—ঘাড়ে আমাদের কটা মাথা, মিঃ সাধু?

—একটা কবেই তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে এক্সট্রাও গজাচ্ছে।

তাবকনাথ দমাস কবে দবজা বন্ধ কবে বেরিযে এল এবং একতরফা ঝাপড়া খেলে যেমন হয তেমনই থুম্বোমাবা হুলোর মতো মুখ কবে গোযেন্দা দপ্তবেব চাঁইরা বসে থাকল। দমদম বুলেটেব সামনে পড়েও বেঁচে গেলে ফেসকাটিং ওইবকম হয়ে যায়।

ছাযা ঘনিযেছে। ঝোপে ঝোপে সড়সড় কবছে কলিকালেব বাতাস। হাফখাওযা বাতাসাব মতো মুন। এবং কালিপড়া, ঝুলে যাওয়া মুনলাইট। ট্রপিকাল অবণ্যের ইনসেক্টদের ঘুনঘুনে শব্দ। এবই মধ্যে, গোলাপ মল্লিক সরখেলের বাড়ির দোরগোড়ায হাজিব। কোথাও একটা, কেমন একটা 'খপ খপ' শব্দ হচ্ছে। অভিজ্ঞ কান বলে দিল শব্দটা লৌকিক। অলৌকিক নয়। গোলাপ চাপা গলায ডাকল,

—সবখেল? সরখে...ল।

অমনি 'খপ্, খপ্' স্টপ। গোলাপ দু পা এগোল। এবং ওখানেই নির্বিবোধী, সাকাব স্ট্যাচু। কারণ তাব পিঠে একটি খোঁচা। লেগেছে এবং ঠেকে আছে। এবং একটি হুঁশিয়ারি।

—নড়বি না। নড়লেই খতম। হাত ওঠা...ওঠা।

গোলাপ দুহাত তুলে দাঁড়াল। সামনে থেকে টর্চের আলো। আলোর পেছনে অস্পষ্ট একটি আদল।

—আবে! গোলাপভায়া! অ্যাই, সোর্ড সরিয়ে নাও। দেখচ নাম ধরে ডাকচে। ও আমার ফ্রেন্ড। খুঁচিয়ে ফুঁচিয়ে দাওনিতো?

ভদি বলল,

—এখনও দিইনি। আরেকটু লেট করলে, হাত পা কাঁপছিল, হয়তো খোঁচাই লেগে যেত।

গোলাপ এতক্ষণে কথা বলল,

—হাত কাঁপবে কেন? সোর্ড ফোর্ড ধরে অভ্যেস নেই বুঝি?

—অভ্যেস থাকবেনা কেন? সবই চলে। তবে মোগলাই আমলের মালতো। ওরা হত ছয়, সাড়ে ছয়, সাত—ওজনও নব্বই থেকে শুরু। আমাদের হাতে ঠিক খেলে না।

সবখেল গোলাপকে ঘরে নিয়ে গেল। সরখেল আন্ডারওয়্যার পরা। চিমড়ে। সারা গায়ে ঘাম আর মাটি। গোলাপ বলল,

—বাগান করছিলে?

—মনে রেখেচ তাহলে। বাগানও করছি, সেইসঙ্গে মিউটিনিরও ব্যবস্থা করচি। লেখাটা পড়েছিলে?

--পড়িনি? খুব ক্লিয়ারকাট। তাহলে বলচ যে যুদ্ধ একটা লাগবেই?

ভদি বলল,

—কী মনে হয়? এইসব সোর্ড ফোর্ড, তারপর গিয়ে নুনুকামান, গাদা বন্দুক—এমনি এমনি?

—আঁ্যাজ্ঞে, নুনুকামান মানে?

—ও হল আপনার পোর্তুগীজদের ক্যানন। ছোট সাইজের পোনাকামানও বলা যায়। বজরা টু বজরা হেভি এফেকটিভ।

—থামো তো। বলো গোলাপ ভায়া, কী মনে করে?

—এলাম। তবে উদ্দেশ্য ছিল। সাবধান করা। তোমার সেই লেখাটা বুঝলে..

—বুঝেছি। ওপরওয়ালাদের হাতে পড়ার জন্যেই তোমাকে দিয়েছিলুম। কী বলচে শালারা। পড়ে নিশ্চই পোঁদে ভয় ধরেচে।

—প্রথমে পড়েইনি। বুঝলে? এখন তলব করেছিল। ফাইল দিলুম। সে মাল নেই। কী সব রামমোহন রায় কোথায় মরেচে ফবেচে এইসব .

—থাকবে কী করে। এখন ঐ ফাইল খুললে দ্যাখা যাবে রামমোহনফোহনও নেই। ফের নতুন মাল। ফের বন্ধ করে ফের খুললে আবার নতুন লেখা। বানচোৎদের এমন গুলিয়ে দেব যে হেগে ছুঁচোতে ভুলে যাবে।

কণ্ঠস্বরটি দণ্ডবায়সের। তিনি ভাঙা জানলায় বসে একবার ডানা ঝাপটালেন।

—প্রভু? আপনি?

গোলাপ উঠে গিয়ে দুই ঠ্যাঙের নখে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

—কী রে? আমার সাধের গোলাপকে কেমন শুকনো লাগচে।

—এ কিছু নয় প্রভু। দপ্তরে সব ওপরওয়ালা হারামিপনা করছিল। এখন বসে গেচে।

—যাবেই। তুই আমার আশ্রিত। তোর পোঁদে যে লাগবে উল্টে তারটাই খোলতাই করে মেরে দেব। বল্।

—আঁজ্ঞে প্রভু, এসেছিলুম সরখেলকে সাবধান করতে। আর যদি আঁজ্ঞা করেন তো মনের বাসনাটা খুলে পেতে বলি।

—বল্। ভদি, ভালো করে শোন। তুই যা আনমনা।

—না, বাবা। মন দিয়ে শুনচি। কিছু মনে করোনিতো ভাই গোলাপ।

—না ভাই মিউটিনিতে এমনটা তো হবেই। মনে করাকরির কী আচে? আঁজ্ঞে বাবা, আমিও আপনাদের দলে ভিড়ব।

—ভিড়বি কিরে? তুই তো ভিড়েই আচিস। তুই আপনার লোক না হলে সরখেল তোকে চোতাটা দিত?

—আঁজ্ঞে লালবাজারে কী চুদুড়বুদুড় চলছে, কে কী ছক করচে সব এসে বলব। শালাদের ওপরে আমার হেভি খার।

—সে তো বলবিই। এই না হলে গোলাপ। ভদি, গোলাপ মিউটিনিতে নাম লেকাল। ওকে

একটু আপ্যায়ন কববি না?

—ছি ছি বাবা, তাও কি বলতে হয়? গোলাপ ভাই, কী খাবে বলো, বাংলু না বিলিতি?

সবখেল বলে ওঠে,

—কোনো নজ্জা নেই। সব খোলামেলা। আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি। সারাদিন ঐ বাগান কম হ্যাপা?

গোলাপ ঝাঁকে ভিড়ে পড়ে।

—বিলিতিই বলো তবে।

—সরখেল, ফোনে নলেনকে বলে দাও তো।

—দিচ্চি।

--একদিন দিনমানে এসে সবখেলেব ফুলবাগানেব ফুল দেখতে হবে।

দাঁড়কাক খুক্ খুক্ কবে হাসল। ভদি বিশেষ উচ্চবাচ্য কবল না। হাতমুখ ধুযে সবখেল এসে গেল। নলেন বামেব বোতল, গেলাস আব ছোলাভাজা দিযে গেল। বড়ই আন্তরিক এই পরিবেশ।

১৮৫৭-ব মহাবিদ্রোহেব আগে দেশের পবিবেশ কি এমনটিই ছিল? অর্থাৎ ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধেব আগে। হে মার্কসবাদ পাঠক, তুমি 'বিদ্রোহে বাঙালী' পড়িযাছ? বলো না গো!

(চলবে)

১৫

'বিদ্রোহে বাঙালী' পড়তে যাবে কেন? পডলে যে জেনে যাবে যে, মহাবিদ্রোহে বাঙালি কী যত্নসহযোগে সাহেবদেব চামচাগিবি কবত। তাব চেয়ে সে পডবে ফুকো যিনি, ভালো বাংলায়, শিঙে ফুঁকে আমাদের বাঁচিযেছেন। অর্থাৎ পাঠকদেব শৃঙ্খলা শেখানো ও শাস্তিপ্রদানের মহান দায়িত্বটি অতীব ক্ষমতাধারী 'কাঙাল মালসাট'-এর ঘাড়েই বর্তেছে। 'কাঙাল মালসাট' কোনো বিদ্রোহী মোষ নয় যে, রক্তচক্ষু করে জোযাল ফেলে দেবে ও বিপ্লবী গাড়োয়ানদের সঙ্গে প্রাক-পুঁজিবাদী অঘোর নৃত্যে মেতে উঠবে। তাই আমাদেব (মানে কাঙাল মালসাট, লেখক ও পাঠকদের) মমজমার রহস্য জানিলেই চলিবে, ৩১৮ পৃষ্ঠাব মালটি যেমন অজ্ঞাত বহিয়াছে তেমনই থাকুক। ব্রিটিশদের গুপ্তচরের কাজ। ১৮৫৭তে 'পাছে পথিমধ্যে যুবক গুপ্তচর বলিয়া ধৃত হয়, এই জন্য সেই পত্রখানি, দেহেব অভ্যন্তরে লুকাইযা বাখিয়াছে। দেহ উলঙ্গ করিযা, কাপড়-ঝাড়া হইলেও সে পত্র বাহির হইত না। পত্র অবশ্যই মুখের মধ্যে ছিল না। পত্রখানিকে মমজমায় মুড়িয়া, মলত্যাগেব দ্বাবের ভিতর সুরক্ষিত করা হইযাছিল। আবশ্যক হইলে, যুবক পত্রখানি খুলিয়া লইত এবং শৌচাদির পব পুনরায় তৎস্থানে বাখিয়া দিত। রস বীভৎস বটে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহেব সময়, বীর-বীভৎসবসেরই বিশেষ বাডাবাড়ি হইয়াছিল।' এক হিসেবে ভদির কারবারও বিদ্রোহ বিশেষ। অতএব রসতাত্ত্বিকরা রসমিল লক্ষ করিতেই পারেন। বাধা দেওয়ার কেহই নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায তাঁর মহাকাহিনীর শেষে লিখিয়াছেন, 'আবার বেরিলেতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্বভাবের উদয হইল। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে।' মহান উপলব্ধি ও তৎসহ কী অকপট স্বীকারোক্তি। কী কন্ট্রোল! আলফাল অনেক গাণ্ডুরই নিজের জীবনী বচনা

কবিবার একটি গুপ্ত বাসনা বহিয়াছে। কোনো কোনো পাঁচু তো লিখেই ফেলেছে। ছাপাও হচ্ছে খোলতাই করে। কিছু বলার নেই। মহাজনেরা যে পথে যেতে যেতে হায়দারি হাঁক ছাড়েন অ্যাং ব্যাং-ও সেই রাস্তায় হাওদায় বসে জাঁকাতে চায়। এদিকে হাতিব সাপ্লাই নেই বহুদিন। আজ যদি নেতাজী থাকত!

রাধাবাজারে ডি. এস যে ট্যাকঘড়িটা সারাতে নিয়ে গিয়েছিল সেটা দেখে দুঁদে দুঁদে ঘড়িযালবা অবধি চুপসে গেল। কারও কাছেই এই বিদ্‌ঘুটে ঘড়িব স্প্রিং তো দূবের কথা, কোনো পার্টসই নেই।

—তাহলে দাদু বলচেন হবে না।

—হওযা না হওয়া ভাই আমাব নয়, ওপবওযালাব ব্যাপাব। তবে চান্স কম। এসব মালেব আর পার্টস-ফার্টস হয় না।

—ঠাকুদ্দার একটা জিনিস। ফেলে দেব?

—না না, ফেলতে যাবেন কেন? বাক্সপ্যাঁটবায় তুলে বাখুন যত্ন করে। মান্ধাতাব মাল। এখন এ সবেব মর্ম কেউ বুঝবে?

—কিন্তু মাল তো অচল। কিছু একটা বাস্তা বাতলান?

—কোনো রাস্তা নেই ভাই। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় আধবুড়ো পাগলা সাহেববা এই সব অ্যান্টিক মাল কিনতে আসে। দেখবেন, কাগজে দেয়। পুবনো খেলনা, কলের গান, ঘড়ি তারপব গিয়ে কলম—এইসব।. ভালো হলে হেভি দাঁও মাবতে পাববেন।

—বাংলা কাগজে দেয়?

দোকান থেকে বেবিযে ডি. এস ঘড়িটা পকেটে ঢুকোল। পুবন্দব বলল,

—বেচবে না জানো, সারানো গেলেও সারাবে না। করতেও পারো ভ্যাড়রভ্যাডর।

—কটা বাজে?

—দোকানে তো আড়াইট দেখলুম।

—তো! গোলাপ আসবে সোয়া তিনটেতে। টাইম পাস করতে হবে তো! এখনও কডকডে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

—হেঁটে হেঁটে বেল্লিক বনে লাভ আছে? পায়ের নড়াদুটো টনটন করচে। চলো, একটা চায়ের দোকানে বসি।

—পালকি যার বউ তার। চায়ের খরচ তাহলে তোমার।

—বেশ, তাই হবে। যা ছ্যাঁচড়া হয়ে উঠচ দিন কে দিন।

—আরে, তা নয়। হেভি ক্যাশ সর্ট। বালবাচ্চা নিয়ে তো ঘর করলে না। কবিতা লিখেই লাইফটা কাটিয়ে দিলে।

—আমি আর কবিতা লিখি না। জানো?

—মানে?

—মানে, আবার কী? কবিতা লিখবো না। ছেড়ে দিয়েচি।

—বলো কী?

—দূর। কোনো বাঞ্চোৎ পড়ে না। কেউ ছাপেও না। ও ল্যাওড়া লিখলেই কী আর না লিখলেই কী।

—তবে কী কববে?

—গান লিখব। গান এখন হেভি পপুলার। কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাসেট দেকচ না। হেগো পেদো সব্বাই পুঁক পাঁক কবে ক্যাসেট ছাডচে বাজারে। তাই গান লিখব। বেডি মার্কেট আচে। একটা লিখেচি। শুনবে? চা খেতে খেতে।

—গাইবে?

—না, না। পড়ব। এর ওপর টিউনিং হবে। তারপব আগে পবেব বাজনা জুডবে। মাল রেডি হলে আর্টিস্ট গানটা তুলবে।

পুরন্দর আর ডি. এস যে চায়ের দোকানটায় বসল সেখানে বিবাট ছবি সন্তোষীমা'ব। এফ এম রেডিওতে তালাত মেহমুদের ঢেউখেলানো গলার সুব বাজছে। লোকেবা নোংরা গেলাসে গবম চা ও ঠাণ্ডা নিমকি খাচ্ছে। ড্রাইভারেবা বিড়ি ধবিযে মালিকদের মা বাপ তুলে খিস্তি করছে। চোখে ছানি কাটানোর পব কালো ঠুলি পবা একটা বুড়ো উবু হয়ে ফুটপাথে বসে চা খাচ্ছে। তার বুকপকেটে অনেক ময়লা কাগজ ভাঁজ কবা এবং সেই কাগজের ফাঁকে একটি ডটপেনেব ন্যাডা বিফিল। দুটো চা অর্ডাব দিযে ওবা বুড়োটাব থেকে একটু দুরে দাঁড়াল এবং পুবন্দব পকেট থেকে গান লেখা কাগজটা বেব কবল।

—কী টাইপেব গান এটা?

—ফোক। শোনো না। কথাতেই ভাবটা ধরতে পাববে। আচ্ছা না হয় একটু বলেই নিই-এটা হল মাছমাবানীদেব গান। বাতেব বেলায পাল বেঁধে মেছোমাগিবা মাছ ধরতে যাচ্ছে।

—হেভি তো।

—হ্যাঁ। এবাব পডচি,

> গজাল মাছেব ভুডভুড়িতে কাতলা মাবে ঘাই
> মাছ মাবিতে যাই গো মোবা মাছ মাবিতে যাই
> ঘোমটা ফেলে, আদুল বুকে
> গিবগিটি তেল মাখ্ লো মুখে
> আডেব ভুঁড়ি, শোলের মুড়ি, কুমীরপানা টাঁই
> মাছ মাবিতে যাই গো মোরা মাছ মারিতে যাই
> আবছাযাতে পেত্নি মোরা
> পায়ের পাতা পিছনমোড়া
> মাছের তেলে মাছটি ভেজে সোহাগ করে খাই
> মাছ মারিতে যাই গো মোরা মাছ মাবিতে যাই

—পুরো ঝাক্কাস কেস হয়েচে গুরু কিন্তু লাস্টের দিকটায় তো মনে হচ্ছে ওরা ভূত।

—ভূত নয়। ওটা হল মনের ভাব। আঁশটে ভাবনাটা যাতে বেরোয় তাই তো ওরা নিজেদের মেছোপেত্নি বলচে। বুঝলে?

—সে না হয় হল কিন্তু গাইবে কে? আশার গলায় মালটা যা খুলতো না! সঙ্গে খিলখিলে হাসি।

—ওসব ভেবে লাভ নেই। আমার গান তো, ফিউচাব ইজ ডার্ক। হেঁজি পেঁজি কোনো ছুঁড়িফুঁড়ি গাইবে। আবার কী হবে? এই বাজাবে সি. পি এম, তৃণমুল, নয়তো কোনো দরাজদিল. কেউ পেছনে লগা না ধরে উঁচু করলে নো চান্স।

—তবে কিছু হয়নি বলে আমি মানি না।

—যেমন?

—আরে বাবা, ফ্যাতাড়ু তো হয়েছ। চোক্তারদের সঙ্গে দোস্তি তো হয়েছে। তারপব গিযে কথা বলা দাঁড়কাক, চাকতির চক্কব, এবেলা বেঙ্গল ও বেলা ইংলিশ—এরকমই বা কজনের হয়?

—এদিকটা নিয়ে এত ভাবিনি।

—না চাইতেই তো পাচ্চ। তাই ভাবচ না। এইজন্যেই আমার বউ বলে মিনিমাগনাকে কেউ ইজ্জত দেয় না।

—ঠিকই বলে। ভালোই হল। এই কতা দিলুম এসব নিয়ে আর ভাবব না। ওফ চিঁডিক করে একটা সং মাথায় এল।

—এটাও কী জেলেমাগিদেব. ?

—না, না। এটা হল গিয়ে তোমার শহবের, কলেজে পডা মেযেদের গান। মুখডাটাই পেলুম। শুনবে?

—বলো!

—হব না ননদ, হব না জাযা
হব সবকারি হোমের আয়া ..

—হিটিয়াল দাঁডাবে গুরু। এবপর মিল দেওযাব জন্যে তোমাব হাতে সাযা, মায়া, ছাযা, পায়া—সব আচে।

—পায়া-টা কাজে লাগবে না। অবশ্য খাট বা তক্তপোষ যদি সিনে ঢুকে পডে তাহলে আলাদা ব্যাপাব।

ডি. এস বলল,

—সামনে দেখো,

—কী?

—ওই যে, রাস্তাপারের পানের দোকানে।

গোলাপ পান কিনে খেল। তারপর পানের বোঁটাব থেকে চুন দাঁতে কেটে বোঁটাটা যখন ছুঁড়ে ফেলল তখন হাতেব তেলোতে লুকোনো একটা কাগজেব দলাও সেইদিকে পড়ে গড়িয়ে গেল।

—গোলাপটা এখন লালবাজারে ব্যাক করবে। আমি পা চুলকোবাব ছকে মালটা ক্যাচ করব। তুমি গার্ড দেবে।

—আমিও পা চুলকোব?

—পাগলা নাকি? দুজনে পা চুলকোচ্চে দেখলেই সব স্পাই অ্যালার্ট হয়ে যাবে। চাবদিকে কিলবিল করচে। চলো! কোনো বাঞ্চোৎ হয়তো এক কিকে নর্দমায় নিয়ে গিযে ফেলবে। কাগজের দলা দেখলেই অনেকে ভাবে বল।

গুপ্তচবদের একটি জমজমাট জগৎ রয়েছে। সেখানে নানা দেশের গুপ্তচর সংস্থাই খেলায় মেতে রয়েছে। সি আই. এ, কে. জি. বি (বর্তমানে এস. আর. ভি), এম আই ফাইভ, মোসাদ, অধুনা বিলুপ্ত স্টাসি, আই. এস. আই—কত শিশুই যে নিকারবোকার পরে এই রহস্যাবৃত ক্রীড়াঙ্গনে আঁকুপাঁকু খেলা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই নিষ্পাপ খেলায় যে চোক্তার-ফ্যাতাড়ুরাও পেছিয়ে নেই তা আশা করা যায় পাঠকের মগজ এড়াবে না। ডদি দলা পাকানো কাগজটি খুলল। একটি হ্যান্ডবিলের উল্টোপিঠ। সেখানে লেখা,

ALL M AND CT UNDER I

—হুঁ হুঁ বাবা। আমার নাম হল ভদি। আমার সঙ্গে টিগড়মবাজি। নলেন কোতায়? নে লো.. '

নলেন দুদ্দাড় করে ছাদ থেকে নেমে এল।

—এই কাগজটাকে উনুনে দিয়ে দে। ভালো কবে পুরোটা জ্বলে যেতে দেখবি। তারপর বড় করে একটা বাংলা বাম পাতিযালা পাঞ্চ বানা। জানতা•, খেলা জমবে। জমে দই হয়ে যাবে।

সেদিন রাতেই ভদি, দাঁড়কাক ও সবখেল স্পেশাল কোব মিটিং-এ বসে গেল। লালবাজারেব গোয়েন্দারা কলকাতার মাগি ও চোলাই-এর ঠেকে হেভি নজর রাখা শুরু করেছে। সরখেল দেখা গেল ব্যাপারটাব গ্র্যাভিটি ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পাবেনি।

—আমবা মাগিবাডি যাই না, চোলাইও খাই না। ও উকুন আমাদেব কারো নেই। তবে কেন আমরা উত্যক্ত হতে যাব?

—গোডাতেই এমন চোদনার মতো কথা বলে বসো যে মটকা গবম হয়ে যায়। তোমার মতো মেজব জেনারেল নিয়ে লডতে হযেছিল বলেই হিটলাবেব খুপডি উড়ে গিযেছিল। ভাবা যায় না। বোকাচোদামির একটা লিমিট থাকে। —দাঁডকাক এই স্ট্র্যাটেজিক আলোচনায় এতক্ষণ এক পাযে দাঁড়িয়ে অন্য পা দিয়ে বাতাসে ইকডিমিকডি আঁকছিল। ভদির মেজাজ টং দেখে সবখেল কথা ঘুবিযে দাঁডকাককে বলে,

—আপনি কী লিখছেন প্রভু?

—ও কিছু নয। ডুড্‌ল্‌স্। যুদ্ধ লেগে যাব লেগে যাব হলেই আমি ডুড্‌ল্‌স্ আঁকি। স্ট্যালিনও আঁকত--শেযাল।

—আর আপনি?

—কোনো ধরাবাঁধা সাবজেক্ট নেই। কখনো ভূত, কখনো কচ্ছপ, কখনো ঝাড়াঝাড়ি। ভদিব সব ভালো কিন্তু বড় অল্পতে ক্রোধান্বিত হয়ে পডে। ওঁর ঠাকুর্দাও এরকম ছিল। থার্ড জেনারেশন বলে রিপিট করছে। গ্রেগব মেন্ডেলের নাম শুনেছিস?

—আজ্ঞে না।

—১৮৬৫ সালে কেসটা ধরেছিল। মিউটিনির আট বছর পর। একদিন বলবখন। এই মেন্ডেলকে আবার আংলি করতে গিযেছিল লাইসেনকো বলে একটা বোকাচোদা। স্ট্যালিনও পুড়কি খেয়ে নিকোলাই ভাভিলভকে ঝেড়ে দিল। ব্যাস—পুঁটকিজাম। কিছুই জানিস না। আর কী করেই বা জানবি। গাণ্ডুর দেশের যত উদগাণ্ডুবা হচ্ছে লিডার। তোর লিডার যেমন ভদি। মগরার বালি দিয়ে চারবেলা পোঁদ মারালে যদি বুদ্ধি খোলে।

—না, না, বাবা। অমন কঠোর দণ্ড দেবেন না।

—ঠিক আচে, দেব না। এবার যা বলবি বল্। তবে চোপা দেখলেই এবাব কিন্তু হেভি খচে যাব।

—নাক মলচি, কান মলচি, আব হবে না।

—বেশ, এবার বলে যা।

এই সময়েই দরজার বাইরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সকলে চমকে গেল।

—কে? হু ইজ দেয়ার?

—আমি। নলেন।

—হোয়াই? কী চাই?

—বৌদিমণি বলল কি যে সেনাপতিরা ফন্দি আঁটচে, যা রে নলেন, এক বোতল মাল দিয়ে আয়, তাই এলুম।

—কাম্। গুড্।

দরজা খুলে নলেন ঢুকল। থালার ওপরে এক বোতল বাংলা। তিনটে ছোট গেলাশ। এক মগ জল। কুচো চিংড়ির বড়া।

—বাখ্। বাইরে কী ফাটল? পাদলি?

—আঁজ্ঞে না। পায়ের তলায় পড়ে আরশোলা ফাটল।

—তাই বল। আমি ভাবলুম ক্যাপ ফাটল। যা, দরজাটা টেনে দিযে যেমন এসেচিস তেমনি পা টিপে টিপে চলে যা।

নলেন পা টিপে টিপে চলে গেল।

—বাবা, শুনুন। সরখেল, ধ্যানসে শুনো। মিউটিনির প্রথম দিকটায় আমরা পুবো ক্যান্টার কবে দিয়েছি। এমন দিয়েচি যে বাঞ্চোৎদের পোঁদে যমের ভয় ধরে মাথা গুগলি হয়ে গেচে।

—খোলসা করে বল।

—এক নম্বর হচ্ছে যে চাকতিফাকতি উড়ে ওদের তো পিলে চমকে গেচে। বুঝতেও পাবচে যে সরখেলের চরমপত্র ফ্যালনা নয়। এ কে. ফর্টিসেভেনের কারখানা, ভিক্টোরিয়ার চোদখোব কিউরেটর—সব মিলিযে কেস গুবলেটিং। কিছু একটা আসচে অথচ কী কববে জানে না। মোটা মাথা তো..হেডপিসে হবতাল .ভাবচে কমন ক্রিমিনালরা গ্যাং আপ কবেচে তো . তাই এম অ্যান্ড সি টি মানে মাগি আব চোলাই-এব ঠেকে খোঁচব বসানো এগুলো হচ্চে পাতি রেসপন্স. .এই দিয়ে যদি মিউটিনি ঠেকানো যেত তাহলে আর কতা ছিল না। একদম চোদু। পিওর চোদু। তবে হ্যাটস অফ টু গোলাপ। একে বলে স্পাই।

—ওফ্ এইবার বুঝলুম। না, প্রভু, আমরা ঠিক নেতাই বেছেছি। আপনি কী বলেন?

—বাপ হযে ছেলের প্রশংসা আমি কখনও ক্রবিনি। ওসব ঢ্যামনামি আমাদের বংশের ধাতে নেই। তবে আমি চাই যে ওরা যখন একটা স্টেপ নিয়েচে তখন আমাদের একটা কাউন্টার স্টেপ নিয়ে দেখিয়ে দেওযা দবকার যে আমরা বাল কেয়ার কবি। ভদিই সেটা ঠিক করবে। চুক্ করে একটা কড়া ডোজ মেরে আমাকে কাটতে হবে।

—কেন প্রভু?

—বলা বারণ কিন্তু তোবা হলি কোলের গ্যাঁদা। তোদেব বলা যায়। আজ ওল্ড পার্ক স্ট্রিট কবরখানায় মি. স্লিম্যান ও মি. শেরউডের মধ্যে ডুয়েল হবে। আমাকে রেফারি থাকতে হবে।

—আঁজ্ঞে, রাজার জাতের মধ্যে কী নিয়ে বিবাদ যে ডুয়েল লড়তে হবে?

—সেই, এজ ওল্ড ফ্যাড, মিস এমা র‍্যাংহামকে নিয়ে কামড়াকামড়ি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যার ছড়াছড়ি। রাস্তাতেও তাই। মাদি কুত্তা নিয়ে মদ্দাগুলোর ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক। বাই চান্স হয়তো কোনো ওল্ড কুত্তা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাস্ সেও সোলডা বের করে ভিড়ে পড়ল। ফিউচারেও এরকম চলবে। কিছু করার নেই।

—আচ্ছা প্রভু, ঐ আপনার গিয়ে স্লিম্যান, তারপর কী যেন, হ্যাঁ শেরউড—এরাতো কবে পটলিফায়েড হয়ে গেচে। এখনও এদের ভূত লড়ে যাচ্ছে?

—নো, নো, সাহেবদের ভূত বলা বারণ। গোস্ট বলতে হবে। কী বাবা, ঠিক বল্লিনি?

—ঠিকই তবে গোরাভূত বললে দেখেচি আজকাল ওরা মাইন্ড করে না। কতায় কতায় রাত গড়াচ্চে। ওদিকে পিস্তল-ফিস্তল রেডি। মিস এমা র‍্যাংহাম বার বার মূর্ছা যাচ্ছে। বেগম

জনসন একা কতদিক সামলাবে। চলি।

খোলা জানালা দিযে ভৌতিক অন্ধকারের মধ্যে ডানা মেলিযা দণ্ডবাযস ডুযেল-এ রেফাবিং করিতে উড়িয়া গেল। পাঠক, নিপাতনে সিদ্ধ গবাক্ষেব বাহিরে মোহিনী মন লইয়া তাকাও। তুমিও দেখিবে পিযানোব টুং টাং শব্দে সেই শিশিবই পডিতেছে যা তখনও পডিত। ঘাসে ঘাসফুল ফুটিযাছে। তখনও ফুটিত। এই দৃশ্যে মগ্ন থাকো। ঐ দ্যাখো মেম-বালিকারা খিলখিল করিয়া মাঠে নামিতেছে। স্লো-মোশানে স্কিপিং করিতেছে। কী সুন্দব সোনালি চুল। কী দুধেল গলা। কী ফুলেল বুক। আবো নামো। যেন লিফটে চড়িযা তুমি বালিকা মেমেব পেট বাহিয়া নামিতেছ। এ লিফট থামিবে না। স্বপ্নদোষ অবধি এই চটকা থাকিবেক। হায় নবোকভ, পৃথিবীব সবকটি বান্নাঘবেব ঝুল একত্র কবিলেও আপনাব ন্যায একটি ঝুল লেখক মিলিবে না।

—সবখেল, আমিও তাহলে উঠি।

—সে কি? প্রভু যে কাউন্টাব স্টেপেব কথা বলে গেলেন, তাব কিছু কববে না।

—সেই কাবণেই তো যাচ্ছি। কাল একটা ঘটনা ঘটবে জানো?

—কী?

—ওযেস্টবেঙ্গলের টপ্‌ সব ক্যাপিটালিস্টবা সি এম-কে মিট কববে।

—তাতে আমাদেব কী ছেঁড়া গেল?

—দেখবে। দেখবে মানে কাগজে পডবে। টিভিতে দেখালেও দেখাতে পাবে।

-একটা আঁচ দাও। এত সাসপেন্স।

—অনেকটা মাল আচে। একাকী চার্জ কবে যাও। আমি চাকতিব ঘবে ঢুকব। ঘণ্টা দুয়েক দরজা বন্ধ থাকবে। আর বলব না। চলি।

ভদি যখন উঠে দাঁড়াল তখন সবখেল দেখল হাবিকেনেব আলোয় ভদিব যে ছায়া পড়েছে তা ফসফোবাসের ঝিকিমিকিতে দ্যুতিময়। কেঁচোব তেল থেকেও এরকম অপার্থিব আলো বের হয। ভালটের বেঞ্জামিন ইহাকেই বলিয়াছিলেন 'অবা'। আমবা 'আভা' বলতে পারি। এই আভা-কে পাঠক যেন আভাদিদিব সঙ্গে গুলিযে না ফেলেন। ফেললেই কেলো।

সেই রাতেই মদনের বাড়িতে বসে পুবন্দব ভাট তাব লেখা দ্বিতীয় গানটি কমপ্লিট করল।

হব না ননদ, হব না জায়া
হব সবকারি হোমেব আয়া
সুপারের সনে
যাব কচুবনে
রচিতে নধব মিলনমাযা
না রবে পিত্তি, না রবে হাযা
হয় এসপাব
নয় ওসপার
দেখিবে জগৎ যুগলছায়া
হব না ননদ, হব না জায়া।

মদন গানের কথাগুলো শুনে বলল,

—তোমার দুটো গানেই দেখচি মেয়েদের হ্যাটা কবার একটা ধান্দা। আমার মতো তোমারও বউ পালিযেছে নাকি?

—বিয়েই করলুম না। বউ পালাচ্চে!

—ও তাহলে হাফসোল কেস। বুঝেছি। নাও, রাত হয়েছে। লেটে যাও।

—সেই ভালো। লেটে একবাব গেলে কোনো ঝুটঝামেলা নেই।

রাত ফুরোতে বেশ খানিকটা বাকি তখনও। কালী ও বড়িলাল পাশাপাশি কালীর ঘরে মাদুরের ওপব অন্ধকারে উদোম হয়ে শুয়েছিল। বড়িলাল কাশল।

—ঘুম আসচে না?

—এসে গিয়েছিল কিন্তু চালের ওপর সড় সড একটা শব্দ।

—ও কিছু না। বাস্তু সাপ।

—অ্যাঁঃ।

—আবে বাবু ক্যাঁওম্যাও করাব মতো কিচু ঘটেনি। ওকেনেই থাকেন। মাঝেমাঝে বাতে বেরোন। ব্যাঙ, ইঁদুর—যা খেলেন খেলেন, এসে আবার শুয়ে থাকেন। ভালো। এবারে ঘুমোও।

—যা শোনালি তাতে ঘুমেব বাপও আব ধাবেবাড়ে ভিড়বে না।

—এই নাকি তিনি কুস্তি নড়তেন। কুস্তিগির।

—কুস্তি তো মানুষে মানুষে হয়। সাপখোপ, পোকামাকড, পিমডে—এসব আমাব ধাতে সয় না।

—থামো তো। ওবা কেউ কিছু কববে না। যে করবে সে জানান দিযে গেচে।

—কে?

—পুলিশের লোক। ঘবে ঘবে বলে গেচে।

—কী?

—বলেচে, দ্যাখ মাগেরা, কার ঘরে কোন খদ্দের আসচে, কী বলচে, কী আনচে সব বিপোর্ট দিতে। বড়বাবুর অর্ডার। কিছু গোপন করবিনি। তাহলে মেয়ে-পুলিশ এনে, চাবকে পোঁদেব চামড়া গুইটে দেবে। বড়বাবুর হুকোম। যে সে লোক নয়।

—তুই আমার নাম বলবি?

—বলব।

—বলবি?

—থামো তো। রাত বলে ভোর হতে চলল আর ওনার বটকেরা থামে না। কেন বলব? বড়বাবু আমার ভাতার না কে? পুলিশ দেখাচ্ছে। বলি ফি মাসে গুনে গুনে টাকা নিয়ে যাস না? এমনিতেই আমাদের লজ্জাশরম কম। এমন কথা শুনিয়ে দেব যে ধন গুইটে পালাবে।

—ধর আমাকে দেখে ফেলল।

—তো কী হবে?

—বলবে, এই কালী, ডেমনী খানকি, তোর ঘরে খেলনার দোকানের বড়িলাল মৌজ মারতে আসে, শালী, বলিসনি কেন?

—আমিও চুপ করে থাকার লোক না। বলব, বড়িবাবু ঠেঙে আমি একবেলা নগদ ধার নিয়েছিলাম। সেই টাকা শোধ কোত্থেকে করব? তো গায়ে গায়ে শোধ করে দিচ্চি। তাতে তোব তবিলে জ্বালা ধরচে কেন রে বোকাচোদা। আসুক না।

—বেশ বলিচিস কিন্তু। গায়ে গায়ে শোধ! আয় কাচে চলে আয়।

—কেন, তোমার আসতে বারণ আচে?

—থাকলেই বা মানচে কে?

পাঠক, তুমি কালীঘাটের খানকি কালীব প্রেমে পড়িতে চাও? পাঠিকা যদি হও তো কালীর সম্মানে মাথা নত করো। বরং আইস, আমরা খানকি কালীব বন্দনাতে সমস্বরে গাই, চরাচর শুনুক, দেবতা, মানুষ সকলে জানুক,

'কসিযা কোমর বান্ধে অতি মনোহব ছন্দে
অস্ত্র বান্ধে বহু যত্ন করি।
জডিব পটুয়া আনি কাঁকলে বান্ধিল বাণী
পটি টাঙ্গি বান্ধে তাবোপরি॥
পীঠেতে বান্ধিল তূণ কৈল তায় বাণে পূর্ণ
শেলশূল মুষল মুদ্‌গব।
ঝাটি ঝকড়া আনি বান্ধিলা প্রমীলা বাণী
সাজ কবি হইল তৎপর॥'

শ্রী চন্দনদাস মণ্ডল বিবচিত 'মহাভাবত' হইতে সমস্বরে যখন কালীব বন্দনা ধ্বনিত হইতেছিল সেই সময়েই, রজনী তখনও আছে, ভদিব চাকতিব ঘরের দবজা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং পূর্বে যেমনটি আমবা দেখিয়াছিলাম তেমন নয়, অজস্র অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় স্বচ্ছ চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করিতে করিতে বাহিব হইয়া আকাশে উডিযা গেল। (চলবে)

১৬

কবিতার (কোনো ফিমেলেব নাম নয়) হাত ধরেই নাবালক বাংলা সাহিত্য, যে দিকেই হোক, এগিয়েছিল। এই পক্কডটির সূত্রপাতেও তাই কবিতার আবির্ভাব। কবি কোনো প্রখ্যাত মিহিদানা নয়, নয় কোনো অভিমানী আন্দামান। বরং আমাদেরই প্রিযজন পুরন্দব ভাট।

সবই আছে বাংলায়—বউ, ছুঁড়ি, আয়া,
তবে কেন বিমর্ষ মুখে বসে ভায়া?
নিশিনাথ, আব্দুল—কাঁদো কেন ভাই?
চলো মোরা রামপাখি ধরে ধরে খাই।

বিশিষ্ট কেউ যদি বলেও না দেন যে এই কবিতায 'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিমডিম রবে'-র মতো সাসপেন্স পাওয়া যায়নি তাহলেও আমাদের খুব একটা মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। না হয় সেসব ফাইনার পয়েন্ট আমাদের না জানাই থেকে গেল। কিন্তু সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতির পরিবেশে যেটুকু পাওয়া গেল তা কি কাফি নয়? সেলুকাস! তলা দিয়ে মারচ ফোকাস? যেমন নাটকীয়, তেমনই সাবলাইম। এভাবেই এগোতে হবে। দুদশ পা পিছিয়ে পড়লে ক্ষতি কী? সামনে অগাধ খাদ। বরং উল্টো দিকে দৌড় দিলে কেমন হয়? সবাক থেকে নির্বাক চলচ্চিত্রে?

—স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট!

কে চেঁচাল? ফুয়েরার না ইয়াহিয়া খাঁ? নাকি মার্শাল জুকভ? কেউই নয়। মিলিটারি টিউনিক পরে এই চিৎকার দিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িযে বইল ভদি। চেঁচানোর পবেই চোখ বন্ধ। সামনে হাজির ভক্তের দল বাকরুদ্ধ। লণ্ঠনের আলো দপদপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো খুক্ খুক্ কাশি বা অন্যবিধ ট্যাঁ ফুঁ নেই। এই মুগ্ধ নীরবতা ভাঙল কে? মেজর বল্লভ বক্সি। তাঁর বাংলা মান্য নয়।

—ঠিক ঠিক সমঝ তো হইল না। স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট! একটু যদি খুলেন...

—খুলব? খুলছি। ...গভরমেন্ট হাই অ্যালার্ট। মোড়ে মোড়ে স্পাই। এখানেই হয়তো বসে

আচে বাগড়া মারার ধান্দায়! একটাও খোঁচড় নেই এমন কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবে ক্যাপ্টেন?

বল্লভ বক্সি মেজর ছিল কিন্তু ভদি তাকে সবসময় ক্যাপ্টেনই বলে। বল্লভ গোঁফ নাচিয়ে কিছু ভাট বকার আগেই ভক্তবৃন্দ সরব হইয়া উঠিল।

—না প্রভু। না। আমরা নিজেরা নিজেদের ওপর নজর রাখছি।

—থাকলে ঠিক আইডেন্টিফায়েড হয়ে যেত।

—আপনি নাম বলুন। কাঁচা মুণ্ডু নামিয়ে দিচ্ছি।

ভর্দি গর্জে উঠল।

—চোপ। চোপবাও। একটা কিছু বললাম তো অমনি চেল্লাতে শুরু করল। ওরে পাগলা আমার ভক্ত সেজে কোনো খানকির ছেলে টিকে থাকতে পারত? ফেস কাটিং দেখেই ধবে ফেলতুম। দত্তবাবুর লাটে অঘোব সাধনায় তাহলে শিখলুমটা কী? আর্মির হেডকে এসব বলতে হয়। একে বলে হাওযা গরমানো। বুঝলি! হাওযা গরমানো। এব টেকনিক যে ধবে ফেলবে তার মার নেই।

টিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল বড়িলাল। বড়িলালকে কেউ যেন আবাব আগ বাড়িযে নধর স্পাই বা কিম ফিলবি গোছের কিছু ভেবে না বসে। আগেই বলা হয়েছে যে বডিলাল হল সাক্ষী। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটুক না কেন তার একজন না একজন সাক্ষী থাকবেই। অবশ্য তাকে যে মানুষ হতেই হবে এমন কোনো সরকারি নিযম নেই। সে একটা হাঁড়ি পাতিল বা বগিথালা বা পেদো গন্ধপাতার গাছ বা এক চোখকানা হুলো—যা কিছু হতে পাবে। দুনিযাদাব নানাকৌশলে কার সঙ্গে কার যে ঘেঁষপোট করে রেখেছে তা বোঝার সাধ্যি কাবও নেই। এনিয়ে অধিক উচ্চবাচ্য না করাই ভালো। কীভাবে বা কোনদিকে কেস টার্ন নেবে তা নিয়ে অনেকেই ফতোয়া দেয় এবং হেভি বেইজ্জৎ হয়ে শেষে হয় ঘাপটি মেরে দিন কাটায় বা পাড়ার লোকের কাছে গুপিবাজ বলে নাম কেনে। গুপি দেওয়া অবশ্য অন্য মেকদারের ব্যাপার। হাওড়া জেলার আমতা বলে একটা থানা আছে। এবং এই থানার আন্ডারে খিলা বরুইপুর নামে একটি ভিলেজ এখন আছে কিনা বলা যাচ্ছে না। যাইহোক, সেই গ্রামেই গোপীমোহন ও বিরাজমযীব একটি ছেলে হয়। তখন গাম্বাট টাইপের নাম বাখার একটা কেতা চালু হয়েছিল—ছেলের নাম বাখা হল সুরেন্দ্রমোহন। এবং শিশু সুরেন্দ্রমোহন দু বছর বয়সেই মিস্টিরিয়াস কোনো অসুখে সকলকে কাঁদিয়ে টেঁসে গেল। তখন সেই শিশু মড়াটিকে নিয়ে গিয়ে প্রচলিত রিচুয়াল অনুযায়ী পুঁতে ফেলার জন্যে মাটি খোঁড়া হচ্ছে—এমন সময় শিশু মড়াটি চোখের পাতা নাড়তে থাকল এবং অচিরেই বেঁচে উঠল। গোপীমোহনের মা তখন বলেছিলেন যে এলা ছেলেকে ওষুধ না দিয়ে চরণামৃত দিতে—বাঁচলে এতেই বাঁচবে। এলা ছেলেকে এই যে 'এলা' (উচ্চারণ হবে অ্যালা), 'এলা' বলা হতে লাগল তার থেকেই শেষে সুরেন্দ্রমোহন ভায়া অ্যালামোহন লাস্টে আলামোহন হয়ে উঠলেন। ইনিই তিনি। বেঙ্গলেব প্রাইড আলামোহন দাশ। এই রিয়াল লাইফ স্টোরিটি জানার পরেও ড্যামনা ঘুঘুর দল যদি সবজান্তার মাজাকি ত্যাগ না করে তাহলে স্পিকটি নট। প্রসিদ্ধ দাশ ব্যাঙ্কের মতো তারাও ফেল মারবে এবং বিস্তর লোককে ডোবাবে। দাশ কোম্পানি, ঘুঘু কোম্পানি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি—কোনো কোম্পানিই থাকবে না। অন্তত পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে দুটি এখনই নেই। তৃতীয়টি অর্থাৎ রক্তচক্ষু ঘুঘু কোম্পানি এখন কবে লাটে ওঠে সেটারই ওয়াস্তা।

ভদির লেকচার একটু এখন শোনা খুবই আরামদায়ক হতে পারে।

—গওরমেন্ট নড়ে চড়ে বসচে। বন্দুকের নলে ফুঁ দিচ্ছে। গোলাগুলি যাতে সেঁতিয়ে না যায় তার জন্য রোদ্দুরে দিচ্ছে। পাবলিককে তাতাচ্ছে। শালাদের বন্দোবস্ত আমরা ধরে ফেলেচি।

অত সহজে আমাদের সাইজ করা কারও বাপের সাধ্যে কুলোবে না। তাই আমাদের এখন মতলব হয়েচে স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিটের, গুটোতে থাকব। এইসা গুটোন গুটোব যে বারো হাত কাঁকুড় প্রায় দেখা দেয় আর কী। তারপরই শুরু হবে খোলা। পুরোদস্তুর খোলতাই। লে ধড়াদ্ধড়, লে ধড়াদ্ধড়। মাথায় ঢুকেচে?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তাই সকলকেই আগড় বেঁধে থাকতে হবে। একদিকে আড়চোখে তক্কে তক্কে থাকা, অন্যদিকে গাঁড়ভোলা গোঁসাই, কদমা কাকে বলে চেনেন না। এই হল যুক্তি। বাবা পটল।

—কর্তা!

—গঙ্গায় যা ছাড়ার কথা ছিল ছেড়েছিস।

—ও বোববারেই সেরে দিয়েচি। ছাড়া পেয়ে কী আনন্দ। দাঁড়া নাচাচ্ছে আর এ ওকে ধাওয়া করচে।

—বাঃ বাঃ এই তো। অর্ডার দিলুম। কাজ ফতে। নলেন, পটলকে ভালো করে এক গেলাস টনিক বানিয়ে দে। টনিক খাওয়ার জন্যে পটল উঠে গেল। ভদি এমনিতে তার মিলিটারি প্ল্যানের খুঁটিনাটি বলে না কিন্তু আজ তার অন্যথা ঘটল।

—ভেবে দেখলুম ডুবোজাহাজের খরচা অনেক। খোল বানাও। ইঞ্জিন বসাও। পেরিস্কোপ লাগাও। সব করে যে নিশ্চিত হবে সে উপায় নেই। ভাঁটায় হয়তো ছাই গাদায় সেঁটে গেল। কী করবে তুমি? কিচ্ছু করার নেই। তখনই আইডিয়াটা মাথায় খেলে গেল। অমনি বুঝলাম এ বাবা স্বয়ং বাঞ্চারাম সবকারের মাথা ছাড়া আর কোথাও আসবে না। রেডিওর মতো। তিনি বলচেন, আমি ধরচি, তোরা শুনচিস গান কি হেঁয়ালি হচ্ছে। তা যে কথা সেই কাজ। পটলের তিন পুরুষের মাছের ব্যবসা। দেখলাম ঐ পারবে। বললুম, যা রে পটল—নেনো ভেড়িতে যে ধুমো কঁ্যাকড়া হয় তার বাচ্চা এই মণটাক এনে মা গঙ্গায় মুক্ত করে দে। এই জল তো হাই প্রোটিন—রোজ অন্তত শতখানেক মরা কুকুর বেড়াল পড়চে। বস্তা করে মানুষও ফেলে। খেয়ে দেয়ে কদিনেই ডাগর হয়ে উঠবে। ব্যাস্ সাবমেরিনের বাবা। যেই পুলিশ জলে পা ফেলবে অমনি কঁ্যাক্!

—আজ্ঞে প্রভু, জলে নামলে তো আমাদেরও কামড়াবে।

—ওইখানেই তো বুদ্ধির দৌড়। ফন্দিফিকির করে ওদের জলে এনে ফেলব। কিন্তু নিজেরা বড়জোর পাড় অবদি। তারপর সামলাও। হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে জল থেকে হয়তো উঠল কিন্তু বাঁচবে কী করে? বেজায়গায় হয়তো কামড়ে ঝুলচে। ধুমো কঁ্যাকোড়, অনেকটা গিয়ে কচ্ছপের টাইপের। কামড়ালো তো কামড়েই রইল। এই রকম ভাবগতিক ছিল সায়েবদের বুলডগ কুকুরের। আজকাল দেখতেই পাই না। তাছাড়া হেগো বাঙালি বুলডগ খাওয়াবার মুরোদ কোথায় পাবে। ডেলি দেড় কেজি, দুকেজি গরুর মাংস খাবে। থ্যাবড়া মুখ। দেখলেই পিলে উড়ে যাবে। বুলডগ পুষবে। তাই দেখি ভাতার, মাগ সব আজকাল শাদা শাদা শেয়ালের বাচ্চার মতো কী একটা নিয়ে ঘুরছে, হাগাচ্চে। সবকটা দেখতে একরকম। বাজারের মুরগির মতো।

বড়িলাল আড়চোখে দেখেছিল গলির থেকে ছায়াটা এগোচ্ছে। এই মোড় ঘুরল বলে। ঘুরে তো গেলই। তখনই বড়িলাল মোতা শেষ করার অ্যাক্টো করে প্যান্টের জিপ টেনে রওনা দিল। গোলাপ ও বড়িলাল ত্যারচা মুখোমুখি হল। কার কেমন ব্যাটারির জোর তা টুক করে মাপামাপিও হয়ে গেল। ছায়ায় ছায়ায় টক্করে এরকমই হয়। গোলাপ বুঝে গেল মালটা নাটা কিন্তু সাঁটিশ। বড়িলালও টের পেল যে একটু পেটের দিকে বেড়ে গেলেও খোকন একসময় ডনফন টেনেছে।

গোলাপের ট্রেইনড চোখ। দরজার কাছে পেচ্ছাবের নদ বা হ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। টিনের গায়ে ধাক্কাতে নলেন দরজা খুলে দিল। ভক্ত সমাবেশে তখন অধিবেশন শেষের দোলাদুলি শুরু হয়েছে।

—কী করচ নলেন ভায়া, দোরগোড়ায় এনিমি ওয়াটার মাইনাস করে পালাচ্ছে, কিছু করতে পারচ না?

নলেন দৌড়ে বাইরে দেখতে গেল। অথচ দেখার মতো কিছুই নেই। একটা বেড়াল রাস্তা পেরোচ্ছে। সে নলেনকে চোখ মারল। এবং গোঁফ নাচিয়ে সেই হাসি হাসল যাকে বিশ্বকবি বলেছিলেন 'মুচুকি'।

—গোলাপ! আমার গোলাপবাগ, আয়রে বুকে আয়।

ভদির সঙ্গে জড়াজড়ি কবে দেখা গেল গোলাপ কানে কানে কী যেন বলছে। ভদি চেঁচিযে উঠল,

—সরখেল, গোলাপ বলচে খেল জমে গেচে। জমে ক্ষীর হয়ে গেচে।

সরখেল তড়বড় করে এগোয়।

—বলো কী!

এরপরই সরখেল, গোলাপ ও ভদি যারপরনাই আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে একটা ঘরে (চাকতিব ঘর নয়) ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল এবং দরজার সামনে ক্রেমলিন গার্ডদেব মতো নলেন দাঁড়িয়ে গেল। শিষ্যবর্গকে সাময়িকভাবে বিচলিত করে ঝটপটিয়ে দণ্ডবায়স এসে পড়তে নলেন দরজা একটু ফাঁক করল এবং বৃদ্ধ কাকটি ভেতরে গ্যারেজ হয়ে গেল।

শিষ্যবর্গ তখন হাউসকোট পরা বেচামণির হাত থেকে একটি একটি করে নকুলদানা নিয়ে বিদায় নিচ্ছে। মেজর বল্লভ বক্সি নকুলদানা নেওয়ার সময়ে বেচামণিকে আগে স্যালুট করে নিল। ফাঁকা উঠোন। বেচামণির হাত থেকে নকুলদানার থালাটি পাক খেয়ে উড়ে গেল। বাতাস এসে টগরগাছে এমন বেহালার ছড় টানল যে মুহূর্তে উঠোনটি ভিয়েনার নৃত্যাঙ্গনে পাল্টাল ভোল। বেজে উঠল ব্লু দানিয়ুব। আহা কী তালে তালে ফেলে পা বেচামণি আগুপেছু করে। নলেনের চোখদুটি কাচেরই বলে ভুল হয়ে যেতে পারে। দু পা ফাঁক। হাত কোমরে সামরিক তো বটেই, তদুপরি জালি গামছা পরা।

গোলাপ যে টপ সিক্রেট সফল অপারেশন লোবোটোমির কথা ভদি, সরখেল ও দাঁড়কাককে বলছিল তা আমরা তার মুখেও শুনতে পারি। কিন্তু রহস্যময় কোনো তৃতীয় পক্ষের বয়ানই হয়তো বা ঘটনাটির সমকক্ষ হওয়ার মতো পালোয়ান।

সকালেই সেদিন সি. এম-এর ঘরে বঙ্গীয় বণিক সভার প্রতিনিধিবর্গের আসার কথা ছিল। বিষয় বরাবরের মতোই, হলদিয়া পেট্রোকেম এবং বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান তিতিবিরক্ত ও বেপরোয়া মনোভাব, হোসিয়ারি শিল্পে নিউ গিনি ও পাপুয়ার সঙ্গে যৌথ গবেষণা গড়ে তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঁউরুটি ও চানাচুর শিল্পে আশ্চর্য অগ্রগতি সম্বন্ধেও আলোচনা হতে পারত কিন্তু পারল কই? আলোচনা বানচাল হয়ে গেলে কেমন এক ট্র্যাজিক সুর যেন বেজে ওঠে। আলোচনা যে কেন ভেস্তে যায় এ নিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন লাগাতার সেমিনার কেন যে হয় না তা নিয়ে বিলাপ করার অধিকার আছে কি?

বঙ্গীয় বণিকসভার নেতৃবৃন্দ যে পরিকল্পনাটি করেছিলেন তা বড়ই রমণীয় বললে কমই বলা হয়। পিয়ারলেস ইন থেকে প্রাতরাশ সেরে কিছুক্ষণ আড্ডা মস্করা ও বটকেরার পর ঠিক হয় যে বিশিষ্ট শিল্পপতিরা ব্যাটারিচালিত বাসে করে রাইটার্সে যাবেন। ব্যাটারিচালিত বাস এই বার্তাই

চারদিকে রটনা কববে যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণমুক্ত শিল্পায়নের পথে আগুয়ান—চিমনি দিয়ে বিকট কালো ধোঁয়া ছেড়ে আবহমান বাংলার শকুন, চিল ও বকবার্ডদের বাবোটা বাজানো হবে না, নির্মল জলে বাসায়নিক ছলিয়া জারি কবে খলসে, তেচোখা ও পুঁটিমাছদের ঝাড়েগুষ্টিতে লোপাট বন্ধ থাকবে এবং আশা করা যায় যে বিকট গন্ধময় গ্যাস ছাড়ার যে অভ্যাস বাঙালি বপ্ত কবেছে তাতেও কিছুটা ভাঁটা পড়বে। ভাগ্যে ব্যাপারটা মি. বিলিমোবিযাব মাথায় খেলেছিল এবং তিনি তা মি. সেন বরাটকে কানে কানে বলেন। মি. সেন ববাট তখন মি. ন্যাওটাকে বললেন ব্যাপাবটা। ব্যাটাবি-বাস বাস্তায় যে কোনো সময় কেলিয়ে পডতে পাবে। তাই নিজ নিজ মোটরযানগুলিও যেন রেডি থাকে। ধন্য মি. বিলিমোরিয়ার সন্দেহ! শিল্পপতিদের দূরদৃষ্টি যে কত জোরালো তা পুনরায প্রমাণিত। গ্রেট ইস্টার্নেব সামনে হঠাৎ ঘঁক ঘঁক শব্দ কবে ব্যাটারি-বাস কেলিয়ে পড়ল। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। পুলিশরাই দলবেঁধে বাইটার্সেব দিকে মিছিল করে কাউকে ক্যালাতে চলেছে বলে কেউ ভুলও কবতে পারত। অতএব মি. ন্যাওটা গিযে নিজস্ব কোয়ালিস, মি বিলিমোবিয়া নিজস্ব মার্সিডিজ ও মি সেন ববাট নিজস্ব সিযেলোতে উঠতে বাধ্য হলেন এবং এঁদেব দেখাদেখি অন্যান্য শিল্পপতিবাও নিজের নিজেব টাটা সুমো, ওপেল করসা, ভলভো, মাকতি সুপ্রিম, অ্যাম্বাসাডর ইত্যাদিতে উঠে পডলেন। গাড়ি ও পুলিশেব শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল এবং দূষণমুক্ত ব্যাটাবি-বাস পডে থাকল। দু পাশেই উৎসাহী লোকেরা এসব দেখছিল ও মুখ খাবাপ কবছিল।

—কী বে, চড়বি ব্যাটাবি-বাসে?

—বাল চড়বে। শালা চলেই না। ধ্বজামাল।

—দাদা, কটা ব্যাটারি লাগে?

—আপনাব মতোই দুটো।

—দিল তো, ট্রাফিকের গাঁড়টা মেবে। এমনিতেই বলে জাম্প লেগে আছে।

—পুবো বোক্চোদ কেস। পোঁদে নেই ইন্দি, ব্যাটাবি মারাচ্ছে।

—ফাকিং শিট! হোয়াট ফাকিং মেস ইযার!

পাবলিক এসব বলবেই। বলুক। চলৎশক্তিহীন ব্যাটাবি-বাসেব কাছে ক্যালানের মতো দাঁড়িয়ে এইসব অসাধু মন্তব্য শুনে গেলে আমাদেব চলবে না। মড়া যাদেব ঘাড়ে তারা এগিয়ে যাবেই। যেমন আমরা।

সি. এমএর আগেই কমরেড আচার্যকে বলেছিলেন যে আলোচনায তিনিও যেন থাকেন। কিন্তু কমরেড আচার্য গাঁইগুঁই করছিলেন।

—ও স্যাব, ক্লাস এনিমিদের সঙ্গে কেন আমায় ডাকেন আপনি। ঐ সব ন্যাওটা ফ্যাওটা ..জানেনই তো। আমার অলমোস্ট অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন হয়।

—থামবে। ন্যাওটা কি গলদা চিংড়ি না ডিম যে তোমার অ্যালার্জি হবে। সব ব্যাপারে তোমার ঐ অর্থোডক্সি। এই করেই গেলে। কাল তুমি আলোচনায় থাকবে। আমার তোমাকে দরকাব।

—ওবেলা তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তখনই ফাইনাল করা যাবে।

—ওবেলা তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব মানে? সে আবার কী?

—আহা, ওবেলা তো আপনি নাট্যোৎসব ইন'গুরেট করছেন।

—হোয়াট!

—নাট্যোৎসব। ড্রামা ফেস্টিভাল।

—ও হ্যাঁ, কিছুই মনে থাকে না আজকাল। নাটক-ফাটক কেন যে এসব ননসেন্স ব্যাপারে

আমাকে জড়াও।

—তা বললে কী করে হয়।

—দ্যাখ। তোমাদেব ঐ এখনকার ওসব দেখলে গা জ্বলে যায়। যে সব পারফরমেন্স দেখেছি..ওফ্। গিলগুডেব হ্যামলেট। বুঝলে? তারপব গিয়ে অলিভিয়াব। এবপর ঐ স্টুপিডিটি—ইনটলাবেবল। আমি যাব। ফিতে কাটব। ব্যস্.

—আজ্ঞে ফিতে কাটা নয়, প্রদীপ জ্বালাবেন।

—ওই হল, অল দা সেম। তারপরেই আমি আর নেই। নট পসিবল্।

দমাস করে রিসিভারটা রেখে দিলেন সি. এম। কমবেড আচার্যও বুঝলেন যে কোনোভাবেই আগামীকালেব মিটিংটায গরহাজিব থাকা চলবে না। কোথায পবিত্রাণ? কমবেড আচার্য দেওয়ালে কমরেড লেনিনের দিকে তাকালেন। লেনিনেব ছবিব পেছন থেকে ছোট সাইজেব একটি টিকটিকি দেযাল বেয়ে দৌড়োতে থাকল এবং জয়েন্ট টিকিটিকি তাকে তাড়া কবতে লাগল। কমরেড আচার্য স্বগতোক্তি কবলেন,

—ডিসকভারি চ্যানেল। একেবারে ডিসকভাবি চ্যানেল? মার্ভেলাস।

রাইটার্সের তলায় যে কনস্টেবলবা থাকে তাব মধ্যে একমাত্র নক্ষত্রনাথ হাওলাদারই লক্ষ কবেছিল যে, ফুলেব তোড়া হাতে যে শিল্পপতিরা বিচক্ষণ ও ভাবালো পদক্ষেপে এগিযে আসছে তাদেব চোখ স্বাভাবিক নয। প্রত্যেকেরই দুটি করে চোখ যা দেখছে তা দেখছে না, যা দেখা যায় না বা যাবে না সেদিকেই নিবদ্ধ। হাওলাদাব তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে পৌছে গেল যে দিনেব আলো ফুটল কি না ফুটল অমনি শুরু হল চুক্ চুক্ বিজনেস। হাওলাদারেব সঙ্গে অধিকাংশ ঐতিহাসিকরাই একমত নন। তাঁদেব মতে সেইদিন সকালে বাংলার শীর্ষস্থানীয শিল্পপতিবা যে যে লিকুইড খেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল ত্রিফলা ডোবানো জল, চা, কফি, হবলিক্স, নিম্বু-পানি ও অ্যাপল জুস। ঐতিহাসিকরা হয়তো ঠিক কিন্তু আমাদেব বিকৃত সহানুভূতি বারবার হাওলাদাবের দিকেই হেলে পড়ছে। বাঙালিব সত্যানুসন্ধান এইভাবে ইতিহাসেও বারবার কার্ণিক খেয়ে গোঁত্তা মেবেছে। সবকিছু আমাদেব হাতে নয়।

সি. এম-এর ঘরে সি. এম তো থাকবেনই, এছাড়া ছিলেন তাঁব ব্যক্তিগত সচিব, কমরেড আচার্য, অর্থমন্ত্রী, শ্রমিক দপ্তরেব মন্ত্রী এবং মৎস ও মুরগিব মন্ত্রী যাঁর সঙ্গে কমবেড আচার্যেব সম্পর্ক মোটেই সাবলীল নয়। আই. জি. আউট অফ স্টেশন। অ্যান্টি টেররিস্ট ব্যবস্থা স্টাডি করার জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। অতএব সি. এম আই. জি-র পরের অফিসারদের বাইপাস করে নগরপাল জোয়াবদারকে ডাকা করিয়ে নিয়েছেন। জোযাবদাবেব মাথায় হেলমেট কারণ তা না হলে বিচ্ছিন্ন মাথাটি বৃন্তচ্যুত বাতাবি লেবুর মতো ধপ করে পড়ে ভীতিজনক বাতাবরণের সৃষ্টি করতেই পারে।

মি. বিলিমোরিয়া লাল গোলাপের তোড়া আলতো করে সি. এম-কে এগিয়ে দিলেন কারণ তলায় মোড়া রাংতা ফুঁড়ে কাঁটা বেরোচ্ছিল। জীবনে বহু গোলাপের তোড়া নিয়েছেন সি. এম। নিতে হবে ভাবলেই গা জ্বলে যায়, কিন্তু উপায় নেই। সেই হাসি তাঁর মুখে যা অতীতে কখনও হাসা আরম্ভ হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে ফিরে আসে। এবারে তোড়াদান সারলেন মি. ন্যাওটা। তারপর সেন বরাট। পবপর সবাই তোড়া ধরবেন বলেই প্ল্যান ছিল কিন্তু পেছন থেকে জুট ব্যারন মি. ঢোলোকিয়ার বাজখাঁই কণ্ঠ ফেটে পড়ল,

—ওসব ফুল খেলা করিবার দিন আজ নয়, কবুল করুন যে মিলিট্যান্ট ওয়ার্কাবদের উপর

দমদম বুলেট ফায়ারিং হোবে—দনাদ্দন, দনাদ্দন একটা লাশ পডল—ধপ—আউর ভি এক ধড়াস—লাশ—ফায়ারিং—দনাদ্দন—দনাদ্দন...

সি. এম বিস্মিত এবং হতবাক। জোযাবদাবেব মুখ ফ্যাকাশে। কমরেড আচার্য গজরে উঠলেন,

—নো পাসাবান, শান্তিপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলনেব ওপবে ফায়ারিং, এবং সেটাও দমদম বুলেট দিয়ে, আপনি কোথায় কাদের সঙ্গে কথা বলছেন জানেন মি. ঢোলোকিয়া?

মি ঢোলোকিযার মুখে স্বর্গীয় হাসি। ব-সিল্কের সাফাবি সুটটিও যেন হাসিব রঙে মাতোয়ারা।

—প্রপার্টি কি সমঝেন? প্রপার্টি হইল থেফট্। লেবব পাওয়াব হইল একটি পণ্য। ইহা মজুরীভোগী শ্রমিক ক্যাপিটালকে বিক্রয় কবে। কেন কবে? বাঁচিবার জন্য। তাহাকে আপনারা কতদিন বঞ্চিত করিবেন, কতদিন দাবাইবেন? জালিমশাহী নেহি চলেগা..

সমস্বরে অন্য পুঁজিপতিরাও হুঙ্কার ছাড়িলেন,

—নেহি চলেগা। নেহি চলেগা।

—তানাশাহী নেহি চলেগা।

—নেহি চলেগা। নেহি চলেগা।

অর্থমন্ত্রী উচ্চশিক্ষিত। মান্য ভাষা বাদে কিছুই তাঁব মুখে আসে না। সেই তিনিই বলিয়া ফেলিলেন,

—লে হালুযা।

সি এম বলেছিলেন,

—এসব জিনিস কী হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পাবছি না।

কমবেড আচার্য উসকোখুসকো চুল ঠিকঠাক কবতে কবতে বললেন,

—ভেবি স্ট্রেঞ্জ। উইযার্ড। বিজাব।

মি বিলিমোবিযা সোবার কণ্ঠে বলিলেন,

—অহ্, মি ঢোলোকিযা, যা বলতে চান লজিক্যালি বলুন, শান্তভাবে বলুন, ভুলবেন না যে উই হ্যাভ গ্রেভ সোশাল বেসপনসিবিলিটি।

মি. ঢোলোকিয়া আডচোখে মি বিলিমোরিযাকে দেখতে দেখতে হিস্ হিস্ কবে উঠলেন।

—ব্লাডি ক্যাপিটালিস্ট পিগ।

সি. এম প্রায় বাধ্য হযে বলে উঠেছিলেন

—আহ্ মি. বিলিমোবিয়া, আলোচনা এগোক।

বিলিমোরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল মহলে টি-ম্যাগনেট বলে সর্বজনবিদিত।

—দার্জিলিং অ্যান্ড সাবাউন্ডিং থেকে যে রিপোর্ট আমি ডেলি পাচ্ছি স্যার তা খুবই অ্যালারমিং। ওয়ার্কারবরা ইমপোর্টেড সব মেশিন, যেমন ধরুন ড্রাইং মেশিন সব ড্যামেজ করছে। ম্যানেজাবদের কোনো ভয়েস নেই। প্রোডাকশন লেভেলে এত বেশি ডিসবাপশন নিয়ে কোন সাহসে আমরা বিগ এক্সপোর্ট অর্ডারগুলো অ্যাকসেপ্ট করব বলতে পাবেন? মৎস্য ও মুরগিব দপ্তরেব মন্ত্রীটিব বয়স কম। ফড় ফড় কবে বলে ওঠেন—

—বাশিয়ানরা এখনও আপনাদের চা কিনছে? কাউন্টার রেভলিউশনেব পর?

—কিনছে কিছু কিছু তবে আগের মতো নয়।

সি. এম ছোকরা-মন্ত্রীটির ওস্তাদি মোটেই রেলিশ করেননি।

—রাশিয়ানরা চা খেল কি না খেল উই কেয়ার আ ফিগ। ইরেলেভেনট কথা কেন যে বলো? মি. বিলিমোরিয়া, আপনি বলে যান...

—বলছি স্যার, কিন্তু তার আগে আপনার ফিশ অ্যান চিকেন মিনিস্টারকে একটু এডুকেট করা দরকার। খুব তো রাশিয়ায় কাউন্টাব রেভলিউশন মারাচ্ছ। রাশিয়ান রেভলিউশনারি স্ট্রাগলের হিস্ট্রি জানো?

—জানি বলেই তো শুনতে পাই।

—একটি থাবড়া মারব টি-ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যাবে। ক্যাপিটালিজমের ডেঞ্জাব ইন বাশিয়া কে প্রথম বুঝেছিল বলতে পারবে?

—লেনিন।

—১৮৭৪ সালে লেনিন? চার বছরের বাচ্চা ছেলে। এই ডেঞ্জারটাকে হেরজেন বা বাকুনিন তেমন আমল দেয়নি। প্রথম এটা বুঝেছিল ৎকাচেভ—নাম জানো? জানো না। তাঁব চটজলদি বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে এঙ্গেলস-এর সঙ্গে ডিবেট পড়েছ? ঐ ৎকাচেভ-এর সঙ্গে প্লেখানভকেও তর্কযুদ্ধে নামাতে হয়েছিল। কিন্তু যার যা ডিউ তাকে তো সেটা দিতে হবেই। দ্যাখ ছোকরা, ইতিহাস কিন্তু একটাই এবং সেটাই সত্যি। পড়, পড়, সব পড়। হাবভাব দেখে তো চ্যাংড়া ফক্কড় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যাইহোক, স্যাব ফরোয়ার্ড মার্কেটস কমিশন যে ফিউচার্স ট্রেডিং করবে ভাবছে সে বিষয়ে...কয়েকজন শিল্পপতি চেঁচিয়ে উঠলেন,

—কমবেড ট্রটস্কি লাল সেলাম। লং লিভ দা রেড আর্মি।

—মাং বহা হায় হিন্দুস্তান

—লাল কিল্লা পর লাল নিশান।

মি. ন্যাওটা হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে গান ধরলেন,

—কালি কালি আঁখে
গোরে গোরে গাল...

সি. এম চেঁচিয়ে উঠলেন,

—রোগস্! স্টপ ইট। স্টপ। ফোর্স বুলাও।

জোয়ারদার, স্টুপিডের মতো দাঁড়িয়ে কী দেখছ? ফোর্স ডাকো। নিয়ে যাক এগুলোকে। তখন সেন-বরাট ভরাট গলায় চেঁচাচ্ছেন,

—দুনিয়ার পুঁজিপতি এক হও!

—এক হও! এক হও!

—শিল্পে সরকারি খবরদারি চলবে না!

—চলবে না! চলবে না!

—পুঁজিপতিদের কালো হাত!

—ভেঙে দাও! গুঁড়িয়ে দাও! (চলবে)

১৭

পাঠকপ্রবর, আজ অবধি কখনো শুনিয়াছ যে নভেল বলিয়া বাজারে যাহা চলে তাহা লঘু ত্রিপদী ছন্দে গান গাহিতেছে। ধবা যাউক যে 'কাঙাল মালসাট' একটি বালবিধবা হিন্দু যুবতী। আরো ধরা যাউক যে সারাদিন ধরিয়াই টপটপ আঁখিজলে বক্ষদেশ ভাসাইয়া সে বিকাল সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নের সেই যাদুমণ্ডিত জিন, হুরি, গবলিন ইত্যাদির জাগরকালে গান ধরিয়াছে,

জানি না লো দিদি, কোন দোষে বিধি,
এই কুলাঙ্গার কূলে।
মোরে পাঠাইযা, বাখিল গাঁথিযা,
বিরহ বিশাল শূলে।

এইমতো ট্রাজিক অবস্থায় আসিয়া পড়িল 'কাঙাল মালসাট'। তাহাকে সাহারা দিবার কেহই নাই। থাকিলে সে এই গান না গাহিয়া হয়তো গাহিযা উঠিত, 'মেরা নাম চিন চিনচু' বা 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে'...কিন্তু উপায় কই? তাই সে কোনো ধর্মান্ধ বাম-খচড়া রচিত 'বিধবা-গঞ্জনা' নামক 'বিষাদ-ভাণ্ডার' হইতে ওই গানটাই কাঁদিয়া উঠিল। সরলা ও তরঙ্গিনী নামধারী দুই বিধবার বিলাপ ওই দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডারের পত্রে ছত্রে কান্না হইয়া ঝরিতেছে। 'তপস্বী ও তবঙ্গিনী'-র সহিত এর কোনো যোগবিয়োগ নাই। যেমন নাই আনন্দবাজাব পত্রিকাব সহিত ওই পত্রিকাতেই প্রকাশিত যাদুকর আনন্দ-র বিজ্ঞাপনেব যাব মাধ্যমে তিনি 'বেঁটে মানুষ' চাহিয়াছিলেন। তবে আমাদের বিচারবুদ্ধিব আর কতটুকু গা? এই জগতের ধন্দময়তায দিশেহারা আমরা ভাবিতেছি যে বাজার সরকার, রাজ্য সবকার, কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানির সরকাব—ইহারাই সর্বেসর্বা। ইহারাই গোদা। কিন্তু ইহাদেরও ওপরে অপারেট কবিতেছে অন্য কোনো সরকার। তাহার কেচ্ছা শুরু করা হয়তো যায় কিন্তু শেষ করা যায় না। জাহাজেব খবর। সে জাহাজই বা কেমন? জলজাহাজও নয় আবার উড়োজাহাজও নয়। তবে?

সি.এম-এর নির্দেশমতো ফোর্স এসেই বিশিষ্ট শিল্পপতিদেব নিয়ে যায়। বলাই বাহুল্য যে এঁদের মতো মান্য ব্যক্তিদের লালবাজারের লক-আপে নিয়ে গিয়ে আড়ং ধোলাই দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সি.এম-এর বিচক্ষণ নেতৃত্বেই যা কবার তা করা হয়। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়চকের হোটেল র‍্যাডিসন ফোর্টে। সেখানে এঁদের প্রথমে টপ টু বটম পরীক্ষা কবেন স্বনামধন্য ডঃ ক্ষেত্রী। তিনি বললেন যে প্রত্যেকেই নরম্যাল। নরম্যাল পালস, নরম্যাল প্রেসার, নরম্যাল স্টুল, নরম্যাল ইউরিন। হতে পারে পাগলছাগল। কিন্তু সেটা ধরা ডঃ ক্ষেত্রীর আওতায় নয়। এরপর এলেন বঙ্গুর ইনস্টিটিউটের একটি বিশেষজ্ঞ দল। সঙ্গে চারজন বিশিষ্ট সাইক্রিয়াটিস্ট তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ জটিল যন্ত্র। এলেন লাই ডিটেক্টর নিয়ে একজন মারাকু। এঁদের বাঁধভাঙা পরিশ্রমই এনে দিল সেই সাফল্য যার ফলে রহস্যের চাবিকাঠি ঘুরল বটে কিন্তু যা জানা গেল তা অতীব ভীতিজনক। সেই বিশাল রিপোর্ট পড়ে কারও পক্ষেই শেষ করা সম্ভব নয়। তাই ছোট করেই মালটা সাইজ করতে হবে। সি.এম-ও এই মর্মেই খিঁচিয়ে উঠেছিলেন,

—নো বিটিং অ্যাবাউট দা বুশ, নো ঝোপঝাড়, মোদ্দা ব্যাপারটা কী?

রিপোর্টের সারাৎসার হল, কোনো অজানা পদ্ধতিতে এক রাতের মধ্যেই এঁদের প্রত্যেকের মাথায় লোবোটমি করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়—এঁদের মাথায় যা থাকার কথা নয় সেইসব নানাধরনের র‍্যাডিকাল চিন্তা ও তথ্য, সাজেশন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এঁরা প্রত্যেককে দেখতে এক পিস করে হলেও এঁদের মধ্যে দুটি করে শিবির

সক্রিয়। একটি ক্যাপিটালিস্ট, অন্যটি বিপ্লবী বা ওই গোছেরই কিছু একটা—মার্কসবাদী, স্তালিনপন্থী, নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কো সিন্ডিকালিস্ট, ট্রটস্কিপন্থী বা বার্নস্টাইন মার্কা, দুবচেক-ঘেঁষা, টিটোপন্থী, মাওবাদী—নানা ধারাই রয়েছে।

কিন্তু লোবোটমি ব্যাপারটা কী?

মস্তিষ্কের মধ্যে অস্ত্রোপচার করে দুভাগে ভাগ করা দেওয়াই হল লোবোটমি বা লিউকেটমি। এঁদের করা হয়েছে প্রি-ফ্রন্টাল লোবোটমি। মস্তিষ্কের সামনের অংশগুলির নিজেদের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে থ্যালামাসের যোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। চার-এর দশক ও পাঁচ-এর দশকের গোড়ায় ক্রিমিনালদের ঠাণ্ডা করার জন্য এই জাতীয় বিস্তর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল মার্কিন দেশে। এখন প্রায় হয় না বললেই চলে কারণ অনেক জবরদস্ত ওষুধ বেরিয়েছে। এ বিষয়ে ডব্লিউ. এল. জোন্সের 'মিনিস্টারিং টু মাইন্ডস ডিজিজ্‌ড' (১৯৮৩) বইটিতে সব তথ্য দেওয়া আছে। এই বইটিতে যদি না মেটে সাধ তাহলে 'স্প্লিট্ ব্রেন বিসার্চ' সম্বন্ধে স্পেরি ও অর্নস্টেইন-এর কর্মকৃতিত্ব ঘাঁটা যেতে পারে। এঁরাই দেখেছিলেন যে এই অস্ত্রোপচার হয়েছে এমন এক স্বামীর আজব কারবার। ডানহাত দিয়ে তিনি বউকে কাছে টানছেন এবং বাঁ হাত দিয়ে দূর করে দেবার চেষ্টা করছেন। এটা অবশ্য মানতেই হবে যে লোবোটমি করা হয়নি এরকম বহু বাঙালিই অনুরূপ দ্বান্দ্বিক আচরণ করে থাকে। মিনসেদের এ জাতীয় খেলকুঁদ আজকাল আবার দার্শনিক তাৎপর্যও পায়। সবই নাকি গূঢ়তম কারণে ঘটে। সবই নাকি গভীর অসুখ। টোপাকুলের ডাল দিয়ে বেধড়ক চাবকালেই কিন্তু সবটা না হলেও অনেকটা ঢ্যামনাগিরি হাওয়া হয়ে যাবে।

যাহাই হউক, পাঠকের কি স্মরণে আছে যে পনেরো না ষোলো অধ্যায়ের অন্তে কী ঘটিয়াছিল? কোট করা যাউক—'..ভদির চাকতির ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং পূর্বে যেমনটি আমরা দেখিয়াছিলাম তেমন নয়, অজস্র অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় স্বচ্ছ চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।' এবার কি আঁচ করা যাচ্ছে যে অতীব চুলচেরা লোবোটমি কাদের কাজ? এবারে কি বোঝা যায় যে গত পক্কড়ে গোলাপ 'সফল অপারেশন লোবোটমি' বলে কী বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। এর আগে আমরা বড় সাইজের চাকতিকে অক্লেশে ও বিনা রক্তপাতে মুণ্ডু, হাত, পা সবই আলাদা করতে দেখেছি। এবারে দেখা গেল ব্রেন অপারেশনের মতো ঝকমারি কাজও অধিকতর ফাইন চাকতি দিয়ে করা যায়। আরও ফাইন চাকতি হয় যা অদৃশ্য ও শব্দহীন। এরা স্বপ্নজগতের নানাবিধ কাটাছেঁড়া করে এমন কোলাজ বানাতে পারে যার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই হতে পারে না। সর্ববিধ ছেদন ও বিভাজনে চাকতিদের অনায়াস দক্ষতা বিস্ময়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আধুনিক জীবনধারার একটি গুরুতর বৈশিষ্ট্য হল চড়া আলোয় বসে কৃত্রিম উত্তাপের ওম প্রথম ও শেষ, আয়ত্ত বলে মনে করা। কফিনের মড়া যেমন ওই বাক্সটিকেই তার বিশ্রাম কক্ষ ও শেষ বাস্তবতা জেনে আরামে শয়নে থাকে। নিজের পচনও তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু কাঠ পচে মাটিতে মিশছে, মাটি ছড়িয়ে রয়েছে জলে ও পাথরে, তার ওপরে নিরন্তর আছড়ে পড়ছে মহাজাগতিক রশ্মি ও এইসব নিয়ে এক আনন্দপৃক্ত সার্কাস, তার এই ধরা এই ছেড়ে দেওয়া ট্রাপিজ, এরই মধ্যে কোথাও কোথাও ক্লাউনের পোশাক পরে প্রতীক্ষায় থাকা লেখকদের আত্মা, ডিক্টেটারদের লৌহ-ভূত, নর্তকীদের সলাস্য ঘুরপাক ও নিবিষ্ট পোকাদের স্তম্ভিত গম্ভীর প্রেতজীবনে প্রবেশ ও প্রস্থান—এ কী এক আশ্চর্য প্রদত্ত নয়? এরই মধ্যে কি সেই সম্ভাবনা নেই যাকে আমরা এখনো শব্দে প্রকাশ করতে অপারগ? পণ্ডিত বা বিদগ্ধ বলে কিছুই নেই। আছে বিভিন্ন মাপের বোকা ও তারও বেশি বেশি কিছু।

এরই মধ্যে ভদির ভব হল। একদিকে বাজ্য সবকারেব যুদ্ধ প্রস্তুতি, গুমটিতে গুমটিতে সাজো সাজো বব, জি. ও. সি-ইন সি. ইস্টার্ন কম্যান্ডেব সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব ও অপরপক্ষে সরখেলেব কালান্তক গর্ত খোঁড়া, ফ্যাতাড়ুদের টুকটাক খুচবো হারামিপনা, বেগম জনসনের সঙ্গে বৃদ্ধ দাঁড়কাকেব বুড়ো বযসেব বোমাঙ্গজাতীয় কিছু আলগা হুঁ হুঁ, ভদি-ভক্তদেব ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনা, গোলাপেব কাউন্টাব ইন্টেলিজেন্স, কলকাতার সি. আই এ, এম, আই ফাইভ, আই. এস. আই ও এস. আর. ভি দপ্তরে ধোঁয়া ধোঁযা আকাঙ্ক্ষা—এই দুই বিপরীত ও আনুষঙ্গিক থার্ড পার্টি নড়নচড়নেব মধ্যেই ভদির ভব হল।

ন্যাংটো ভদি তার একতলাব ছাদে, আলসেব ধাবে দাঁড়িযে ভুঁড়ি চাপড়াতে চাপড়াতে নানারকম ভালগাবিটিব বন্যা বইয়ে দিতে লাগল যাব মধ্যে অবশ্য কিছু অন্য কথাও ছিল। আমরা তাব অসংলগ্ন ও অকথ্য সংলাপেব মধ্যে যেটুকুমাত্র মান্য ও শালীন বলে ছাড়পত্র পেতে পাবে সেগুলোই বরং জেনে নেব কাবণ আধুনিক নভেলের একটি নভেলটি হল নানা তথ্যের একটি ঘাপলা তৈরি করা যাব মধ্যে অধিকাংশই হল ফালতু গ্যাঁজা। অনেক সময় আবার তথ্যেব বদলে এমনই একটি দার্শনিক দার্শনিকভাব কবে নন-স্টপ গ্যাঁজানো চলতে থাকে যে এই ভাটানোকে মহামূল্যবান মনে করে অনেকেই বোমকে যায। 'কাঙাল মালসাট' দু নৌকোতেই ঠ্যাং নাচাবে। ভাগ্যে যাব সলিল-সমাধি সে অন্যরকমই বা করতে যাবে কেন?

ভদি ভবের বেশে বলেছিল,

(১) ওই কর. দিন নেই. বাত নেই টিভিব বাক্স খুলে মানষিব পালেব গাঁড়দুলুনি নাচ দ্যাখ্ .হবিষ্যিও হবে না, মালসাও কেউ জলচুবুনি কববে না. গাঁড় দুলচে . আহারে আমার বাঙালিব ঠাকুর্দাব ঝাড় দুলচে গেল্, বোল-মুবগি গেল্ আব ওই দ্যাখ্. .থেকে থেকে হাওয়া খেলিয়ে নে, ফ্যান ছেড়ে হাওযা খেলা, পেন্ডুল দুলচে . ওবে আমাব রাসবাড়িব ঝুলন রে ওমা, গোপালের মুখ আমার গবম দুধে পুড়ে লাল, হোল্ বেস, হোল রেস, হোল! হোল!...

(২) খলখলে করে দেবে গো, গরিবগুলোর গাঁড় মেবে একেবারে খলখলে করে দেবে, হাওদা কবে দেবে...গবিবদের ওই ঠাটবাট সহ্য হচ্ছে না, গবিব যে আমার বেড়ালমামারে...এদিক ওদিক দুদিক চেযে চুমুক মাবো দুধের বাটি. .গওবমেন্ট দেখেচে গবিবের গাঁড়ে মধুর চাক ..একেবাবে ভূতোমোল্লার খাল করে ছেড়ে দেবে .সব আস্তানা দেদূর করে দেবে চোলাই-এর ভাঁড়, পাতিল সব লেথিয়ে ঝেঁটাবে, বেকটোলিকার. .বেকটোলিকাব...রাতবিরেতে ভিডিও-ভাড়া...রেকটো কিলাব...রেকটোকিলার...

(৩) অ ঠুঁটো ঠুঁটো। ঘর খালি করে ঠুঁটো গেলি কোতায়?

ঠুঁটো হেঁকে বলে—গুণ্ডিচা বাড়ি গো, আমি এখন গুণ্ডিচা বাড়ি।

হালুয়াভোগ। হালুয়াভোগ! গবগবিয়ে ঘবঘবিয়ে হালুয়াভোগ। হালুয়াভোগ!

চার আনা পউয়া। চার আনা পউয়া। হালুযাভোগ ; হালুয়াভোগ!

(৪) অ বাঁজা বউ। বাঁজা ব .উ! তোর কোল ভরবে কে? ফট্‌কেরাজা। ফট্‌কেরাজা কে? ফট্‌কেরাজা হল ভুক্কাড়। ফট্‌কেরাজা কী খায়? খই-মুড়কি আর লাইনকলের জল। লাইনকলের জলে কেমন ভাত হয়? সাদা, সাদা, ডাগরডোগর। ফট্‌কেরাজাকে মোহর দেবে কে? ভদি দেবে। ভদির বাঁজা বউ কী দেবে গো ফট্‌কেরাজাকে? ভদির বাঁজা বউ মাই দেবে। ফট্‌কে রাজার নুনুর ওপরে কালো কার দিয়ে ভুঁড়ি জড়িযে ওটা কী বাঁধা? ফুটোপয়সা। কী বাঁধা? আরে, এ যে দেকি কানফুটো মোহর? অ্যাঁ, ফট্‌কেরাজা মোহরধারী? হ্যাঁ। আর কী? ভদির বাঁজা বউয়ের বুকে ও দুটো কী গা? মাদার ডেয়ারির টোনাদুধের প্যাকেট। ধর শালা নলেনব্যাটাকে ধর্।

ধর্...ধর...নলেনগুয়োকে ধর্। কী হে বাবা হাঁড়িকচ্ছপ! ঘপৎ ঘপৎ কবতেছো ক্যানো গো! বাবা হাঁডিকচ্ছপ! যাঃ শালা! ফট্‌কেরাজা মুতে দিল!

ভদির বাবা বুড়ো দাঁড়কাক বেশ কিছুক্ষণ ভদির এই দাপাদাপি দেখে কলতলায় বসে লাইনকলের জলে ভালো করে ডানা ধুয়ে ঝটবপটর করে চান কবল, করে বলল—বউমা, ব্রহ্মতালুতে একটু তেল দিয়ে দাও তো আমার। বেগম জনসন সোহাগ করে এমন ঘেঁটে দিল যে রোঁয়া সব খাড়া খাড়া হয়ে গেচে। সিঁথেটা কোথায় ঠাওর হচ্ছে না। তেল দিয়ে আলতো করে আঁচড়ে দাও। তোমার হাতে যা জোব।

নলেন উবু হয়ে বসে টগরগাছতলায় খুঁজে খুঁজে, টিপে টিপে একটা একটা কবে পিঁপড়ে মারছিল আর ন্যাংটো ভদি বার বাব ছাদেব সিঁডি বেয়ে উঠছে আর নামছে যেন দম দেওয়া জাম্বুবান। বেচামণি দণ্ডবায়সের মাথায় রোঁয়া আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল।

—খুব আরাম হচ্ছে। কতদিন তেলজল পড়েনি।

—বাবা, একটা কতা বলি?

—বলো বউমা।

—এই, ভদির মাতায় ওটা কী ভূত চেপেছে?

—ও কিছু নয়, নেশু। কাল ছেড়ে যাবে।

—নেশু। এ ভূতের নাম তো এ বাড়িতে পা দেওয়া থেকে শুনিনি।

—কতা ওঠেনি। ও একটা বুড়ো ছিল। খুব খচ্চর। কালো ঠুলি পরত। সকাল থেকে নেশাভাঙ করত। সেই থেকে নাম হয়েছিল নেশু। তবে হ্যাঁ, ঘোডার খোঁজপত্তরেব জন্যে লোকে আসত বলে ওর কাচে। বলত নেশু হচ্ছে রেসের ধন্বন্তবি। যে ঘোড়ার নাম বলবে টিপ লেগে যাবে। জ্যাকপট্ কুইনালা, ট্রিপল টোট, প্লেসিং—কত লোককে জিতিয়ে কাপ্তেন কবে দিল। আর কিসের বদলে? দুটো পুরিয়া বা একটা বড় বোতল। নেশুর নামডাক যেমন ছিল তেমন আবার বদনাম, ওর ছেলেবয়েসের কেচ্চার জন্যে। ঝি বিয়ে করেছিল। বুকের পাটাও ছিল—আজ কতাটা লোকের মুকে মুকে ফেরে কিন্তু প্রথম বলেছিল নেশু—নিন্দে যখন বটেইচে তখন বিয়েই করব। এই সময়টা ওর একটু ভরের বাসনা হয়। তবে আধার কোতায় যে ভরবে? ভদিকে দিয়ে যা বোল বলাচ্চে তার মধ্যে কিন্তু এমন কতাও থাকবে জানবে তা তেরাত্তিবে না হলেও ফলবে ঠিক।

—কী হবে না হবে আপনি তো বাবা সবই জানেন।

—তা জানি। কিন্তু বলার উপায় যে নেই বউমা।

নলেন খচড়ার ডিম। দাঁড়কাককে খচানোর জন্যে আপন মনে বলে উঠল,

—ওফ্ জ্ঞানীগুণী সব হেগেমুতে দিল আর দাঁড়কাক হল ব্রহ্মজ্ঞানী!

—তোর মতো চোদনাবুলি না কপচালে ঘোর কলিটা জমবে কেমন করে। বুঝবি, টাইমে সব বুঝবি। তকন মামা বলে চ্যাচালেও কেউ আসবে না।

নলেন কম ঘোড়েল নয়।

—তুমি থাকতে মামাকে ডাকতে যাব। তোমাকে ডাকব। পারবে না এসে থাকতে?

উত্তরে দাঁড়কাকের মুখে সেই হাসির স্মিতরূপই ফুটে উঠল যা আমাদের বরাভয় সাপ্লাই দিয়ে চলেছে। প্রায়শই ফটো থেকে যদিও। দুনিয়া জুড়ে দুমদাড়াক্কা চলেছে। কিন্তু বাঙালি জীবন নির্বিকার। কারণ সে জানে যে তার বাড়িতে সর্ববিপদ রক্ষার জন্যে ফটো রয়েছে। এবং আগামীকাল সকালে আনন্দবাজার বেরোবেই। এই কেলো যে কতদিন চলবে তা বলার ক্ষমতা

কোনো সুপার কমপিউটারেরও নেই।

বড়িলাল বডবাজারে গিয়ে পাঁচটা পাপি-হাউস (কুকুরছানা থাবা দিয়ে টেনে নেয়), তিনটে ডিম পাড়তে পাডতে চলা হাঁস পুতুলের ফ্যামিলি এবং একটি হেলিকপ্টাব কিনে নিল যা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে ঘোরানো যায়, পাখা চলে আলো জ্বলে নেভে। এসব খেলনা সাপ্লাই হচ্ছে চীনেম্যান ল্যান্ড থেকে। খেলনা রপ্তানি বা পাচাবের পেছনে ভারতীয় শিশুদের 'ক্যাচ দেম ইয়ং' পদ্ধতিতে কব্জা করার কোনো দুরভিসন্ধি আছে কিনা তা কেউ জানে না। কিন্তু বাঙালি যতই চীনেম্যান চ্যাংচুং মালাই কা ভ্যাট বলে আনন্দ পাক না কেন এটা কিন্তু প্রায় মান্যই হযে দাঁড়িয়েছে যে চীনেম্যানরা হাসিমুখে কী ভাবছে তা বোঝা সহজ নয়। কাঠি দিয়ে তারা যে শুধু ভাতই খায না তা সকলেই মুখে না বললেও টেব পায।

'কাঙাল মালসাট' যখন তার প্রাথমিক পাখসাট মাবা শুরু করেছিল তখন প্রকাশ হযে পড়ে যে বড়িলালের নানাবিধ পোকা-পিঁপড়ে সম্বন্ধে এক জাতীয় ফোবিয়া রয়েছে। সেইমতোই সে মেঝেতে চারদিকে লক্ষ্মণরেখা দিয়ে দাগ কেটে মাঝখানে বিছানা কবে ঘুমোচ্ছিল। চেতলা সাইড থেকে মৃদুমন্দ সেই বাতাস আসছিল যা বাঙালি দ্যাওরদের ঘুম কেড়ে নেয় ও ডোন্ট কেয়াব ভাব এনে দেয়। এতে বড়িলালেব কিছু হবাব কথা নয়। হয়ওনি। সে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল এবং স্বপ্নলোকেব ভাবচুয়াল বিয্যালিটিতে দেখছিল কালী ও তার সংসাব-জীবন এতই গা-সওয়া হয়ে গেছে যে দুজনে কালীব ঘবেব সামনেব চাতালে উবু হয়ে বসে চাল বাচছে এবং রোদের তাড়া খেয়ে শুঁড-ওলা পোকাগুলো তিড়তিড কবে পালাচ্ছে। বড়িলাল যখন বাজারে গিযেছিল কালী তখন সেই ফাঁকে স্নানটান সেরে রেখেছে। এই কালী কখনোই খানকি ছিল না। চাতালেই বাঁশ পুঁতে, তাতে তাব বেঁধে শুকোতে দেওযা হয়েছে সদ্য ধোয়া বড়িলালের লাল ল্যাঙট। লাল ল্যাঙট, দে চাবি, চাবি না দিলে মার খাবি। এটি একটি দুরূহ ধাঁধা। পালোয়ানরা কেন যে নিজেদের মধ্যে অশালীন ইঙ্গিতবাহী এই ছড়া বলে অনাবিল আনন্দ পায তা অজানাই থেকে গেল। দুজনেই চাল বাছা ছেড়ে গগনাভিমুখে তাকায়। দিনের ফটফটে আলোতেই ঘুড়ি-লন্টন উড়িযেছে কারা। ওমা, ফানুসই বা ছাড়ল কে? তার মধ্যেই আবাব উড়ন তুবড়ি টেস্টিং চলছে বলে ফিকে ধোঁয়াব দড়ি একটু একটু কবে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশ জোড়া এক আনন্দ। ওই দ্যাখ মোমবাতি ঘুড়িতে কী লম্বা ল্যাজ। ঘুড়ি সুতো পেযে লাট মেরে এগোয় তো ল্যাজও মায়াবী রিবনের মতো খেলা দেখায। এরমধ্যেই আবাব পাশ কাটিয়ে উড়ছে কালো বক। এখান থেকে চিড়িয়াখানা আর কতটুকু আকাশ। কী সামান্যই এই ফুরসৎ। আকাশ দেখার।

কিন্তু সেই ফুরসতেই যা ঘটার ঘটল। ল্যাজের কাছে দপদপ করে লাল আলো জ্বলে উঠল। সাঁই সাঁই করে ঘুরতে লাগল ব্লেড। টয় হেলিকপ্টার ঘরে দুটো পাক মারল। তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে উড়ে গেল। সেই রাতেই জোড়া মার্ডার সাইট থেকে ফিরে টাকলা ও. সি দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে প্রোমোটারের দেওয়া ওল্ড স্মাগলার রাম পাঁইয়া হোটেলের টিকিয়া দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। ও. সি-র ঘরে নোংবা তার থেকে ঝুলছে আধখানা বাল্ব। টিউবটা অকেজো। সেই ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকল হেলিকপ্টার। ঢুকেই বাল্বের পাশে ঘন হয়ে পাক মারতে শুরু করল বলে দেওয়ালে বিদ্‌ঘুটে চলন্ত ছায়া দেখা গেল। ও. সি খচে গেল।

—মালটা একটু রিল্যাক্স করে খাব তা না বাঁড়া চামচিকের উৎপাত শুরু হল। ঝাড়তো ওই ব্যাটনটা দিয়ে ঝাড়।

এর উত্তরে হেলিকপ্টার নেমে টেবিলের ওপরে ল্যান্ড করল। আলো জ্বলছে নিভছে। পাখা ঘুরছে। একজন কনস্টেবল হাত বাড়াচ্ছিল কিন্তু ও. সি চিল্লে উঠল,

—হাত সবা। রিমোটে চালাচ্ছে। যে কোনো মোমেন্টে ফাটতে পারে। আমি যেমন করব তোরাও করবি। সাট করে মেঝেতে শুয়ে পড়। ঘরবার উড়ে গেলেও লাইফটা বেঁচে যাবে। জয় বাবা..

ধাড়াম করে চেযার উল্টোয়। কনস্টেবলরা উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে মাথা ঢাকে। লাঠিচার্জের সময় ভুক্কাড়বা এরকমই করে। হেলিকপ্টার টেবিলেব ওপবে গড়াচ্ছে। ঠাশ কবে বোতল পড়ল। উড়ছে। ব্লেডে লেগে বাল্বটা ফাটল। সারা ঘবে অন্ধকার। বোঁ বোঁ শব্দ। শব্দ নেই। সারাঘরে রামের গন্ধ। এক মিনিট কাটল। শব্দ নেই।

—মালটা বোধহয় উড়ে গেছে স্যার।

—সে তো আমাবও মনে হচ্চে। কিন্তু ঘাপটি কেস নয় কে বলবে? আলোটাও নেই।

—আপনাব ড্রয়ারে তো টর্চ আছে। বের করুন না স্যার।

—তাই করি। শালা, কী হ্যাপা মাইবি। ঘামিয়ে ছেড়ে দিল।

টর্চের আলোয় যা দেখা গেল তা এইরকম। হেলিকপ্টারেব ধাক্কায় ওল্ড স্মাগলাবেব বোতল মায়ের ভোগে।

গেলাস উল্টে সব মাল ফাইলের কাগজফাগজ ভিজিযে জাব করে দিয়েছে। ছোট সাইজেব একটা তছনছ কবে হেলিকপ্টার ধাঁ।

—মালের পুঁটকিটা মেরে দিল। তবে ভাগ্য ভালো ফাটেনি। পিওব টেববিস্ট অ্যাটাক। একজন কনস্টেবল তড়িঘড়ি জানলা বন্ধ কবে দেয।

—ভালো করেচিস। কাল রিপোর্ট দিতে হবে লালবাজারে। আমবা কেন, গোটা থানাটাই বেঁচে গেল।

আরেকজন কনস্টেবল মোমবাতি জ্বালল।

--স্যার একটা কতা বলব?

—বল্। ঢ্যামনামি করচিস কেন?

—বলছিলাম যে ভালো মালটা তো ভণ্ডুল কবে গেল। আমার স্টকে দুবোতল বাংলা আচে। আনব?

—অ্যাঃ বলিস কি? যা, যা, ঝটপট নিয়ে আয। প্রাণটা বেঁচে গেল। এবাব একটু আবামও পাবে। বাঁচালি মাইরি।

—আচ্ছা স্যার, ওইটুকু হেলিকপ্টার—ফাটলে কী হবে! বড়জোব চকলেট টাইপেব...

—ওরে মুখ্যু, বাঞ্চৎরা আজকাল ওসব পেটো ফেটো ঝাড়ছে না। এইটুকু জেলি জেলি মাল। আর. ডি. এক্স.। সেমটেক্স। পুরো বাড়িটা ধসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। দেখিস না, কাগজে দিচ্চে। দেখলি বাঁড়া ট্রানজিস্টার রেডিও। দিব্যি গান বাজচে। তুলেচো কি ফিনিশ। এই জানবি। আজ যা বাঁচা বেঁচে গেলুম তা আমিই জানি। বউদির মুখটা আর দেখতে হতো না।

এমন সময় ফোন বাজল।

—হ্যালো, হ্যাঁ, ও. সি বলচি। অ্যাঃ সন্ধেবেলা দুটো লাশ পড়ল। তাতে মেটেনি? কী? এপার ওপার বোমচার্জ করচে। করুক না। এতে যদি কয়েকটা মরে। কি হবে? যাব, দু রাউন্ড ফায়ার করব, থেমে যাবে। তার থেকে চলুক না। না মরলেও তো চোটফোট লাগবে। না। না। এখন ফেব গিয়ে গাঁড় মারামারি আর ভালো লাগে না। ও কাল দেখবখন। এদিকে যা কেস হয়ে গেল শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবে। একদিকে টেররিস্ট অ্যাটাক অন্যদিকে গ্যাংফাইট—একলা আমাকে দিয়ে অত বাঁড়া হবে না। না, না, বডি এখানে রাখতে যাব কেন?

পাঠিযে দিয়েচি। তোমার পাশে ওটা কে গ্যাঁও গ্যাঁও করচে। তাই বলো। এই হয়েচে এক বালেব এফ এম। দিন নেই, বাত নেই, ঢ্যামনামি চলচে। হ্যাঁ, ছাড়ো। অনেক ভাটিয়েচো। কী কবচি? একটা মালের মিটিং বানচাল হয়ে গেল। আরেকটা অ্যাবেঞ্জ কবচি। ছাড়লুম।

বড়িলাল তখন কোনো স্বপ্নই দেখছিল না। অসাড়ে কাদা হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পুতুল হাঁসগুলো হঠাৎ দল বেঁধে প্যাঁক প্যাঁক কবে ডেকে উঠল। দরজা খুলে বেবিযে কুকুরছানা একবার জোড়া থাবা দেখিয়ে ঢুকে গেল। জানলা দিয়ে ঘবে ঢুকল হেলিকপ্টার। ঘরে একপাক উড়ে যেখানে বাখা ছিল অবিকল সেখানে গিয়ে ল্যান্ড করল। (চলবে)

১৮

এই ঘুঘুচক্করটি যে যুদ্ধের দিকে আগুয়ান বা নিন্দুকের মতো হাগুয়ান তা পাঠকরা বাদে সকলেই জানে। অর্থাৎ নানাবিধ পাখি, অমার্জিত মার্জাব ও চাপাপড়া সাবমেয়জগৎ—এখানেই শেষ নেই, শেষ কথা কার বাবা বলবে এখনো জানা যায়নি অতএব মাকড়দুনিয়া, মাইক্রোবমহল্লা ইত্যাদি নস্যপ্রায় অথচ নস্যাৎপ্রিয় নয—তাবাও বযে গেল। প্রবল বৃষ্টিব আগে দেখা যায় কীটকলোনিতে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। মানুষ তখন কিছুই বোঝে না। কিন্তু পরে এমনভাবে সাজে যে তার মতো বুঝদাব কেউ নেই। এমতই হল হালেব পাঠক। যে লেখা এখনো বাংলায় লেখা হয় (লেখক ইংবেজি জানে না বলেই) তা যদি ছোটবেলায় খেলে যাওয়া নুনু নুনু খেলাব মতো সখসাধ্য না হয় তবে চেপে যাও। ওরে গাণ্ডু, সব লেখক বাঁধা মাসমাইনে, গায়ে গতবে শোধ হয়ে যাওযা খুচরো হ্যান্ডবল, দুগ্‌গো পুজোয মোটা ন্যাকড়ার পট্টি পয়দা বা লেখো বা না লেখো ফ্রি প্যাকেট (চব্বিশ পঁচিশ তারিখে তাবিয়ে তাবিয়ে একেবারে খোদ অ্যাকাউন্টেন্টের ঘর থেকে) না পেলেও বেকগনিশনেব মাকে ট্রাম লাইনে ফেলে আটপয়সা সুদের তোয়াক্কা না করেও লেখে বা লেখার ভ্যানতাড়া করে। পাঠক চাঁদু, এগুলো বুঝবি কবে? সাহিত্য মড়া হলে তোদের হালকা করাব জন্যে কামানো যেত। যেহেতু তোদের ওজন নেই, সিনা নেই, গ্র্যাভিটি নেই, আওকাৎ নেই তাই তোদের কামিযে পেডিগ্রিওলা রিয্যাল অ্যাললেখকরা ব্লেড ভোঁতা কবে না। ভারত ব্লেড/ইন্ডিযা ব্লেড চকচক করবে। চুকলি চলবে। চাঁচাচাঁচি চলবে। আপাতত ওয়াব। ক্রস বর্ডার টেরো খিল্লি শেলিং শিলিং পাউন্ড ডলার—আঃ হোঃ, ওয়াহঃ, ভঁক্, পুঁই, পঁক—পোঁ—লিঃ লিঃ

( )

নিমকি, নিমকিছেনালি, ছকবাহাদুর ছবিলাল, ওয়ে ওয়ে, ওয়ে ওয়ে আঃ

(>)

খুল্লামখুল্লা, ওফ্ ডার্লিং, বাসনওয়ালী

(<)

উঃ কী দিলি

(Δ)

পিরামিডের এক পিঠ বা একমাত্রিক

অধ্যাস

(=)

ভাংড়াপন + সালসা + লম্ফঝম্প
বা
KM
কিলোমিটার বা কোঁকড়া মালাই নয়
তাহলে কী?
লে বুড্ডুয়া, ইয়ে হ্যায়
কাঙাল মালসাট

ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর। এই বলেই ডি.এস-কে চমকাবে বলেই প্ল্যান করেছিল মদন বা পুরন্দর। তারপর কাজের কথা। কিন্তু উল্টে যে সিন তারা দেখল তা দেখলে পাবলিক সব চ্যানেলেরই পুড়কি উড়ে যাবে। ঘরের মধ্যে ডি এস-এর বউ বাচ্চা খিলখিল হাসি সহযোগে উড়ছে এবং নেংটি পরা ডি. এস হাতের দশ আঙুলে দশটা হলদে কলকে ফুল পবে তাদেব ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তাড়া কবছে। ডি. এস মুখেও দুটো কলকে ফুল ঢুকিয়েছে যাতে তাকে হলদে গজের দাঁতওয়ালা ড্র্যাকুলা বলেই মনে হচ্ছে। ডি. এস-এর ন্যাংটো ফ্যাতাড়ু বাচ্চা স্পেসে সাবলীল কসমোনটের মতো ভল্ট মারছে এবং এমন এমন অ্যাঙ্গেলে বাঁক নিচ্ছে যা দেখলে কোমানেচি জিমনাস্টিক ছেড়ে দিত। ডি. এস-এব মোটা, কালো কোলাব্যাঙ বউ নাইটি পরা এবং তার ওড়ার ধাঁচ অত সাহসী নয় কিন্তু যথেষ্ট খেলুড়ে—জলের গভীরে জব্বব কাতলাবা যেমন হামেশাই করে থাকে। এবং এই দৃশ্যেব সঙ্গেই চলেছে ডি. এস-এব ভৌতিক টিভি যাতে সবকিছুই চারটে করে দেখা যায়। তাতে তখন দেখা যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় চাবজন সি.এম চারটি মাইক্রোফোনে একই কণ্ঠস্বরে চলচ্চিত্র উৎসবেব সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। তার পাশে চার পিস করে একই বুড়ো ফিল্ম ডিরেক্টব, সেই হিরো কিন্তু এখন বুড়ো ভাম এবং প্রাক্তন এক ভ্যাম্প, যার সবই গেছে অবশ্য ট্যারা চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল দেওয়ার কামশাস্ত্রীয় হ্যাবিটটি বাদে। কিছুক্ষণ ধরে এই খেলা স্টাডি করার পর মদন ঘ্যাক্ করে উঠল,

—থামবে? তুমি থামবে।

ডি. এস অমনি সুর করে বলল,

—নারে নারে না।

—না এইভাবে কেউ যদি ডিসিপ্লিন ভাঙতেই থাকে তাহলে আমি অন্তত ডিউটি করতে পারব না। আজই ভদিদাকে বলে দেব—যে পারে পারুক, আমাকে দিয়ে হবে না।

ডি. এস যা করে না বলেই সবাই জানে সেটাই করে দেখিয়ে দিল। চাপানের জবাবে উতোর।

—ওসব ভদিদা ফদিদা জানবে ডি. এস কেয়ার করে না। ভরদুপুরে পাঁঠার মাথার ঘুগনি ভাত মেরে ফ্যামিলি নিয়ে খেলা করচি তাতে ভদিদার কী? এখন খেলা জমে গেছে। থামানো যাবে না।

এতক্ষণ পুরন্দর ভাট কিছু না বলে মুচকি হাসি দিচ্ছিল। এবার চোখ বুজে ইনস্ট্যান্ট পোয়েমটি ছাড়ল।

ঘরের বাহিরে শত্রু খাড়া
ঘরের ভিতরে গরিব বাঁড়া
করিয়া হেলা মারিছে খেলা
সহসা ঘাড়েতে নামিবে খাঁড়া
মেঘের আড়ালে উড়িছে বোমারু

যুদ্ধজাহাজ—নাম পোঙামারু
তবুও ডাকিয়া মেলে না সাড়া
ঘরে বাহিরে শত্রু খাড়া

—সাবাশ! ভাট, সাবাশ। এরকম জ্বালাময়ী কিছু পোয়েম শুনলে যদি এদের টনক নড়ে। ঘেন্না ধবিয়ে দিল।

—ঢের হযেচে বাবা, ঘাট হয়েচে। খেলা বন্ধ করচি। ড্যাং ড্যাং করে তো এক্ষুনি ভদিদাকে নালিশ করতে যাবে। তোমার আবাব যা নিন্দেকুটে স্বভাব। ডি এস হাতেব আঙুল থেকে কলকে ফুল খুলতে খুলতে এই কথাগুলো বলল।

—নেহাত বউ-বাচ্চা সামনে তাই বেঁচে গেলে। যা হোক গুলি মার। মালমুল কিছু আচে স্টকে?

—বলব কেন?

—ফের ভ্যানতাড়া!

—আবে বাবা আচে। বেব কবচি। প্যাঁটরা থেকে হবিণেব ছবি আঁকা গেলাসগুলো বের করতো। গেস্ট বলে কথা।

—ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বাংলুফাংলু নয়।

—ওসব গবিবগুর্বো খায়। এটা পিওব কানট্রি মেড ফরেন। অফিসারস্ চয়েস্।

—ট্যাক্ বেশ গবম বলে মনে হচ্ছে।

—না, না। ট্যাক কোল্ড। এটা গিফট। আমার শালাকে তো চেনো। পুরন্দব বোধহয় চেনে না।

—জনাকে চিনব না কেন? এই ঘরেই কত পোগ্রাম হল।

—ও সরি। জনা ব্যাটা কবেছে কী এই বাজাবে একটা বাগানবাড়ির দালালি লড়িয়ে দিয়েচে।

—হয়েচে! বিক্রি?

—হবে। আগাম কথা সব পাকা। সেই থেকে বলচে, জামাইবাবু, ওসব বাংলুমাংলু আর নয়। লিভার ড্যামেজ অনেক হয়েচে। এবার আমি ইংলিশ, তুমিও ইংলিশ, হাজাব হলেও একটাই জামাই বাড়ির।

—দিল দরিয়া শালা পেয়েচ তো। লাকি চ্যাপ।

ডি. এস-এর বউ একঝাঁক সাদা দাঁত বের করে বলে উঠল,

—কার ভাই দেখতে হবে। সেটা তো কেউ বলচে না।

—বুঝেচি। খুব গেরমানি হয়েচে। ঘুগনি একটু বেঁচেছে না? দাও না। ভালো চাট হবে। এবার বলো, কাজটা কী?

—বলচি। ছোট করে বললে ইংরিজিতে বলে এরিয়াল সার্ভে। কিন্তু দিনের আলোয় হবে না। সন্ধে অবদি মৌজ, তারপর, তারপর উড়িতে থাকিবে ফৌজ। কেমন মিলিয়ে দিলাম ভাট?

—হেভি। আসলে সকলেই কবি। এটাই আমি স্টাডি করে দেখলাম। যদিও উল্টোটাই বলা হয়। জে. দাস বলে একটা ছিটিয়াল পোয়েট ছিল। ওই বলেছিল। সেই থেকে চলচে।

—বাঙলি মানেই জানবে তোতা ঢ্যামনা। একবার যা শিখবে কপচেই চলবে, কপচেই চলবে। ভদিদা যে এত বড় একটার পর একটা রদ্দা ঝাড়চে কোনো ভাবগতিক দেখে টের পাচ্ছ?

—বরাবরই হারামি জাত। তায় এখন হাড়হারামি হয়ে উঠেচে। যাকগে, ও ব্যাঙের কেচ্ছা ছেড়ে মোটা করে ঢালো তো।

মাল ঢালা হয়। তাতে জল ঢালাব বগ্‌বগ্‌ শব্দও হয়। ভাট আবার জোলোমাল খেতে ভয় পায়। বেশি হিসু হবে।

—আব না। আর না।

—অত কড়া খেও না। লিভারে জং ধরে যাবে।

—ভালো হবে। পোয়েটদের বেশিদিন বাঁচলেই বদনাম। ইয়াং থাকতে থাকতে টেঁসে গেলে সবাই বলে, আহা, মালটা যদি বাঁচত।

—আর বুড়ো হলে?

—হরিবল! ইস্কুলে পড়ানো হবে। বেজাল্ট হল ছোটবেলা থেকেই পাবলিক মালটার ওপবে খচতে থাকবে। বড় হলে আর টাচ করবে না।

—ওসব জ্ঞানমারানী ছেড়ে একটা ভালো পদ্য বলো তো। ওই গরিব বড়লোক—প্যাঁদাপেঁদি নয়।

—বলচি। একদিন দুপুরবেলা লেকের পুকুরপাড়ে বুঝলে, সে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুব, অনেকক্ষণ ধরে একটা একলা মেয়েকে সাইজ করার ধান্দা করলাম। হল না। ঢেমনি মাগি। যেই বড়লোক এল মোটরগাড়ি বাগিযে অমনি দেখি ভেতবে ঢুকে গেল। আমিও বললাম শালী, দেখবি, তেতে মেতে লিখেই ফেললাম।

খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাঁট
ফুটিতেছে ছাতি, ফাটিছে কাঠ
সহসা দেখিনু স্নানেব ঘাট

জলকে চলিছে বধূর দল
দোলায়ে কলসী, নামায়ে ঢল
দেহবল্লবী কী উচ্ছল

দিল না, দিল না তৃষিতে বাবি
চাতক চিনিল ঘাতক নারী
ধুতুরার বিষ মিশানো তাড়ি

রৌদ্রে ভাজিছে পুকুরঘাট
তপ্ত কাঁচিতে ছাঁটিছে ঝাঁট
খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাঁট

কাব্যপাঠ শেষ। মদনকে বড়ই আনমনা দেখায়। বিকেল ঘনাচ্ছে। ভাট্‌ ছোট একটা চুমুক মেরে গলা ঝাড়ল। মদন ডি. এস-কে বলল,

—হাই থট্‌ রয়েচে। বুঝলে।

—আমি খালি ওই হারামি মাগিটার কথা ভাবচি। গলা টিপে দিতে হয়।

—আহাহা তা কেন? নো গলা টেপাটেপি। ভাট মনটা কেমন যেন ভিজে নেতিয়ে গেল। হেভি ধরেচ মুখটা। ব্যাঁকা বাঁটওয়ালা ছাতা খুলচে। লিখতে না পারলে কী হবে, ধরতাই, মেজাজ সব ফিল করি। বুঝলে। তবে যারা হার্টে হাফসোল খায়নি তারা ঠিক এ কবিতা বুঝবে না।

—না বুঝল তো বয়েই গেল। আমার কাজ নামানো। নামিয়ে দিলাম। দুনিয়া যদি ছোল হয় আমার কিছু করার নেই।

ওদিকে ভদি ও সবখেলের মধ্যে তখন যা বাকবিনিময় হচ্ছিল তার ভাববেটিম প্রতিবেদন পেশ করা হল।

—দেদারে খালি জল উঠচে। বালতি বালতি তুলে বাইবে ঢালচি। কিন্তু জল।

—সে তো উঠবেই। পাশেই ওল্ড গ্যাঞ্জেস রিভাব। জলের কালারটা দেখেচ?

—কালচে। আব ভেবি ব্যাড স্মেল।

—হবেই। কযেকশো বছরেব পচা মড়া, গু, কুকুব বেড়াল—তুমি কী ভেবেছিলে! প্যারিসের সেন্ট বেরোবে? না বাগদাদের আতব।

—দ্যাকো, তুমি হলে লিডাব। তবুও বলচি কথাটা। বাগদাদ নিয়ে ঠাট্টা করো না। অত বোমফোম ঝাড়ল। তারপবেও ঠিক অ্যামেরিকার সঙ্গে তাল ঠুকচে।

—কতায় কতায তোমাবও সরখেল অত ইন্টাবন্যাশনাল পলিটিক্স্ টেনে আনলে চলে না।

—এইটাই তোমার বড় ভুল। নিজে যা কবচ সেটা চাউর হয়ে গেলে দেখবে তুমিই তখন ইন্টারন্যাশনাল ফিগাব। দুবেলা টিভিব ক্যামেবা পোঁদে পোঁদে দৌড়োবে।

—বলচ? এমনটা হবে?

—না হযে যায়? যা প্ল্যান কযেচ দশটা প্ল্যানিং কমিশনের ঘটে কুলোত না।

দুজনেব এই কথোপকথনেব মধ্যেই বিকেল গড়ায়। আকাশে সেই প্রসিদ্ধ সোনালি রঙ পবতে পরতে অন্ধকাবের দিকে ধাবমান। এই টাইমে ঝাঁক বেঁধে ক্রো, গুয়ে শালিখ, বকপাঁতি, হাঁড়িচাঁচা, স্নাইপ, পানকৌড়ি ইত্যাদি এশিয়ান বার্ডবা বাড়ি ফেরে। কবে থেকে যে এইভাবে অফিসের কাজ সেরে তাবা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিবছে তা কেউই বলতে পারে না। কেউ আকাশে ইংরেজি ডব্লিউ-এর মতো দল সাজায। কেউ সাজায 'ভি'। আবার লোনলি একটি বার্ড বা ক্লান্ত দম্পতিও চোখে পড়ে। ভেবে সকলেই অবাক ও বোধহয় উদাস হতে পাবে যে ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে, সেই পাল আমলেও এমনটি হতো। এ সম্বন্ধে হান্টার বা মজুমদার কোনো উল্লেখই করেননি। সিভিলিয়ানদের অনবদ্য স্মৃতিচারণে পাখি শিকার রয়েছে। কিন্তু পাখিদের এই নিত্য যাতায়াত সম্বন্ধে কোনো স্নিগ্ধ অবজারভেশন নেই। যাই হোক, পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে তখন নানা সাইজের চাকতিও তাদেব ঘরে ব্যাক্ করেছিল।

—টাইম হয়ে গেল:

—কীসের?

—আর ঠিক মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফ্যাতাড়ুরা টেক অফ করবে।

—কেন?

—এরিয়াল সার্ভে করতে। গোলাপ যে রিপোর্টগুলো দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমার মনে কোনো আপত্তি সন্দেহ নেই কিন্তু তবু একবাব দেখে নিতে চাই। এনিমি এখনো জানে না যে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কম্যান্ড আচে। যখন জানতে পারবে তখন পাখি বহুদূরে উড়ে ভাগলবা।

—এক এক সময় ভাবনা হয় যে হঠাৎ তুমি এতবড় কাণ্ডটা ঘটাতে গেলে কেন? থই পাই না।

—পাবে কী করে। আমি কি নিজেও বুঝি। দ্যাখ, কোনোকিছুই আমাদের তাঁবে নেই। এই যে রহস্যময় বিজ্ঞাপন বেরোল আনন্দবাজারে—আমরা তো দিইনি। বাবা হয়তো জানেন। বেগম

জনসনও জানতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। কেবল হেঁয়ালি করবে। দেড়শো বছর পর পর চাকতিবাজি হয়। কেন হয় কেউই জানে না। আমাদের সেই আদিপুরুষ, মানে আত্মারাম সরকারই বা এই ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়ে কী চান? আমার ওপর যেমন যেমন আদেশ আসচে, আর্জি পাচ্ছি তেমন তেমন করে যাচ্ছি।

—খুবই হুড়ুমতাল কাণ্ড।

—হুড়ুমতাল বলে হুড়ুমতাল। জয় বাবা চাকতির জয়! জয় মা চাকতির জয়! শুধু কী চাই জানো? বরাভয়। আর কিছু নয়। ওইটুকু পেলেই এই লাইফটা কেটে যাবে।

—ওফ্ মাথায় যেন ঘোর লাগচে। এত বড় একটা কাণ্ড। তাতে সরখেলও খেলে যাচ্ছে।

—ভেবো না। যত ভাববে তত ঘোর বাড়বে। নলেন সেদিন একটা ছড়া কাটছিল। বেশ মনে ধরেচে।

—কেমন ছড়া শুনি!

—'যা ইচ্ছে তাই হোক, এবার পুজোয় চাই কোক।' বলো! আমরা স্রেফ কোকের জায়গা চাইচি বরাভয়।

—ঠিক! একেবারে ঠিক!

—এই হল কতা। অনেক সিরিয়াস আলোচনা হল আজ। মাল খাবে একটু?

—একটুই। এখনো ধন্দ লেগে আচে।

আকাশ থেকে লালবাজার বড়ই নরম্যাল চোখে মনে হয়। তা নয়। মদন বলে

—কী দেখচ ডি. এস?

—কী আবার নীল সাদা কাপড় শুকোচ্চে।

—বাল। ভালো করে দ্যাখ। র‍্যাফ টার্গেট শুটিং করচে।

—তাই তো।

—আরো ভালো করে দেখে রাখ। ওই মালটাকে চেনো?

—হাফ্ পাঞ্জাবি পরা?

—হ্যাঁ।

—ও কে?

—খান্‌কির ছেলে। নকশালদের উকুনবাছা করে মারত।

—ওরকম খোঁড়াচ্ছে কেন?

—স্ট্রোক্। চুৎমারানীর পক্ষাঘাত হয়ে ডানদিকটা পড়ে গেছে। জানলে?

—ঝাড়ব?

—কী?

—আমার পকেচে একটা দুশো-র বাটখারা আচে।

—এখনই নয়। বম্ব্ করার কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই।

আরও ওপরে আকাশ থেকে খ্যাংরা কথা ভেসে আসে মেঘের বাষ্প ধরে ধরে,

—গুড! গুড!

মদন, ডি. এস্ ও পুরন্দর ভাট ওপরে তাকিয়ে দেখেছিল কালপুরুষকে আড়াল করে বিশাল ডানা ছড়িয়ে উড়ছে সেই প্রাকৃত দাঁড়কাক।

—ওঃ গড্ আপনি।

—হ্যাঁ রে বাঁড়া আমি। নীচে তাকা।

চলচে!

—কী?

—লালবাজারে কুচকাওয়াজ!

—বুঝলে কী হচ্ছে!

—কুচকাওয়াজ।

—ল্যাওড়া। গভবমেন্ট ধন দাঁড়াচ্ছে কি না দেখচে। কেন করচে জানিস?

—কেন?

—গরিবেব গাঁড মাববে বলে।

পুরন্দর একেই ও.সি খেয়ে টং। সে বলল,

—আপনার রিডিং ভুল। এটা লেফটিস্ট গভরমেন্ট।

—ওসব ঢপ্ নিজে খেতে হলে খেও। দুনিয়া চালাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আব ও লেফট্ মারাচ্চে।

—মানে? এই পুলিশ তো লেফট!

—ল্যাওড়া। যে মাইনে দেবে তার।

—চেপে যাও। আরশু কোরো না।

এই সাবধানবাণী ভাটেব। কিন্তু ডি. এস অকুতোভয়।

—ওই বাডিটাতে কী হচ্ছে? ওই যে আলো জ্বলচে?

—আনন্দবাজার ছাপা হচ্চে। আর কী জানবে, বাঁডা? কাল সাত লাখ বাঙালি এটা পড়েই সাবাদিন বিচি চুলকোবে।

—সে না হয় হল। ওগুলো তবে কী?

—একই কেস। মিডিয়ার আলো। ইংলিশ, হিন্দি, বাংলা...

কিন্তু তারও তলায় ওই যে রোশনাই, ওগুলো কোন ঘটে ঢুকচে?

—চেল্লামেল্লি শুনতে পাচ্চি।

—উৎখাৎ চলচে। হটাবাহার। কলকাতা ছেড়ে ভাগো। যত বাঁড়া খালপাড়, ফুটপাথ দিওযানা সব ফোটো। ঝিংচ্যাক বাদে কিছু থাকবে না। ফোট্ শালা : চল, ও হকার ফকার রেন্ডিগেন্ডি কোই লাফড়াবাজি নেহি চলেগা—চল্—বুট্‌কা ঠোক্করসে চল্—বুলডগবাজাবকা খিল্লিসে চল্—চলো হে—পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন—হে অপু। পথের কি কোনো শেষ আছে? চলো এগিযে যাই। চরৈবেতি। চরৈবেতি!

—হে বাপ! হে দাঁড়কাক।

—বলে যা!

—বর্ডার দিয়েও তো ঢুকচে।

—ঢুকচে তো। বাংলাদেশ থেকে ঢুকচে। তাড়া খাচ্চে আর ঢুকচে।

—কারা?

—আপাতত হিন্দু বাঙালি। পবে কী হবে আমি জানি কিন্তু বলব না। জমি কাড়ো। তাড়াও। ওদের নাম্বার কম। যদি উল্টো হয়ে যেত কেসটা তাহলে মোল্লারা তাড়া খেত।

—আর ওই যে হেভি আলোর ছর্‌রা। গানবাজনা।

—কবে আর হালচাল জানবি? ওখানে চলচে সাহিত্য উৎসব। সবসময় একটা না একটা বাওয়াল লেগে রয়েচে।

—সাহিত্য উৎসব! তাহলে অত পুলিশ!

পুরন্দরের এই বিস্ময় মদনের রাগেব উদ্রেক ঘটায়।

—আরে বাবা, কোনো উৎসব, মায় বিয়েবাড়ি অবদি আজ আর মন্ত্রী ছাড়া হয়? মন্ত্রী মানেই পুলিশ।

দাঁড়কাক বলল,

—হেভি প্রিপাবেশন। কলকাতায় যে হিস্টোরিক গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়েছিল তখনো ব্রিটিশ পুলিশ এত গা ঘামায়নি?

—গাড়োয়ান ধর্মঘট? কই, শুনিনি তো।

—শুনবি কী করে? এখনকাব ফুটো আঁতেলগুলো কিছু জানে? বলবখন একদিন সময় করে। হেভি গল্প। সব পুরনো আমলেব কমিউনিস্টদের ব্যাপার। এখনকার এসব উটকোদের সঙ্গে মিলবে না।

প্রোমোটারদের সঙ্গে লোকাল লেভেলের লিডারদের সম্পর্ক ঠিক তেমন হওযা উচিত তাই নিয়ে গোপন মিটিং-এ ভাষণের পযেন্ট নোট করছিলেন কমরেড আচার্য। তাঁব টেবিলে বসেই। আঙুলের ফাঁদে জ্বলন্ত সিগাবেটটি স্টাডি কবতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল যে, ক্যাপিটালিস্টবা কিন্তু কমোডিটিটা মোক্ষম বানায়। একবার তিনি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে বানানো সিগারেট খেয়েছিলেন। যেমন বিদ্‌ঘুটে ধ্যাবড়া প্যাকেট তেমনই অখাদ্য মাল। জ্বালতেই মনে হয় ভিজে কাঠের গাদায় আগুন লেগেছে। হায় ব্রেজনেভ যাঁকে বাঁচাতে ওঝা অবদি ডাকা হয়েছিল। হায় গোরবাচেভ। রাজনীতিব অ্যালকেমি বুঝতে গিয়ে নিজেই বহস্যপূর্ণ লিকুইডে হাওয়া হয়ে গেল। চটকা ভাঙার মতোই কাণ্ড। টেবিলের সামনে মিলিটারি টিউনিক পবা লোকটিকে কমরেড আচার্য ভালো করে চেনবাব আগেই পাইপ থেকে জর্জিয়ান তামাকেব ধোঁয়ায় সবকিছু আচ্ছন্ন।

—ক্যাপিটালটা পড়েছিস মন দিয়ে?

হ্যামলেটের বাপ বা ম্যাকবেথের ব্যাঙ্কোর মতোই স্তালিনের ভূতও সহসা ধাঁ!

বেগম জনসন তাঁর স্লেভ গার্লদের সঙ্গে বাগানে আন্ডারহ্যান্ড ক্রিকেট খেলছিলেন। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে ঝোপের পাশে গিয়ে থেমে গেল। বেগম জনসন ঝটপট শব্দ পেয়ে মান্ধাতার আমলের বটগাছটির দিকে তাকালেন।

ভূত নয়। বাদুড়। সারাদিন তারা উল্টো হয়ে ঝুলে হেগেলিয়ান বিশ্ব দর্শন করছিল। ঘনায়মান সন্ধ্যায় তারাই উড়ন্ত হয়ে মার্কসীয় পৃথিবীতে ফল পাকুড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে।

বেগম জনসন স্লেভ গার্লদের নিয়ে মকানের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে ঘরে ঘরে মোমের আলো জ্বলছে। (চলবে)

১৯

বেচামনি যেভাবে ককিয়ে উঠল তাতে মনে হতে পাবে বাংলা সিরিয়াল জমে উঠেছে কিন্তু তা নয়, ঘটনাটা 'কাঙাল মালসাট'-এব হাঁপ ওঠার টাইমের একটি আন্তরিক আর্তনাদ,

—এ কী করলে ঠাকুর! এই তোমার মনে ছিল. .এত নিদয়া তুমি.. ঠাকুর।

রিটায়ার্ড ফৌজি বল্লভ বক্সি তো হাঁকড়ে উঠেছিল,

—মার্শাল ভদি। হুকুম কবেন তো কম্যাণ্ডো পাঠাই। ট্যাট্ ফর টিট! নেহি তো এনিমি আমাদের বলবে চুহা।

ভদিব উঠোনময় কলবোল জাগ্রত হল,

—ডি. এস-এর রক্ত, হবে না তো ব্যর্থ।

—ডি. এস অমর রহে।

—অমর শহিদ ডি. এস যুগ যুগ জিও।

টিনেব দরজায় ফুটোয় চোখ সাঁটা বড়িলাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ডি. এস নেই। কুস্তিগির হলেও বুকের ভেতরটায় কেমন যেন এক নিংড়ে ওঠা ভাব...উঠোনে উদ্বেল শোকক্রন্দন...এবং মারাত্মক এই অবস্থায় ভদিও বুঝে উঠতে পারছিল না যে ঠিক কী করা উচিত তাই থেকে থেকে সে কুঁচকি চুলকোচ্ছিল আব আড়চোখে নজব বাখছিল বেচামণির দিকে —এই ক্যাচালের মধ্যে মাগি না আবার ফিটটিট হয়ে যায়. .

এবং এই গোটা মাযের ভোগের পালার জন্যে যে দায়ী সে অর্থাৎ পুরন্দর ভাট দু একবার চিল্লামিল্লি থামাবার সাধু প্রচেষ্টা চালাবাব চেষ্টা কবেও মাথাটি বোম্ হয়ে যায় কারণ চারদিকে রোলাকলি চিৎকার, হেভি চ্যাঁও ভ্যাঁও...উপবন্তু নিজেবও ধুম নেশা. .

ভদি তার শিষ্যবর্গের কাছে আশু ও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের ব্যাপারে লেকচার দিচ্ছে তার মধ্যেই পুরন্দর, হেভি বাংলা চার্জ করা অবস্থায় ঢুকে হাঁউ মাঁউ করে ডুকরে উঠেছিল।

—বদিদা! ডি. এস খতম, হাজরা পার্কে পুলিশ অ্যাকশান!

—অ্যাঁঃ ফিনিশ্!

—পুরো। ঘিবে ফেলল!

—তারপর?

—ফিনিশ। আমি এসকেপ। দেখলাম দুটো ঠ্যাং, দুটো হ্যান্ড ধরে চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলচে। বডি ভারি তো। তুলতে পারচে না। শেষ অবদি তুলল।

—মদন? মদন ছিল না?

—না। আমি আর ডি. এস।

ফের বেচামণির আর্ত আকুতি,

—ঠাকুর। এত নিঠুর তুমি! এত!

নলেনের নাদ,

—বউদি! বউদি।

এই করুণ দৃশ্যে আবদ্ধ না থেকে আমরা যদি রিমোটে চ্যানেল পাল্টে এই মোমেন্টে মদনকে ধরি তাহলে দেখব সে তার ঘরে গামছা পরে, উবু হয়ে বসে স্টোভের থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাবে ফ্যান গালার জন্যে, কিন্তু কী দিয়ে হাঁড়ির কানা ধরবে, অতএব গিঁট খুলে সে গামছাটাই খুলে নিল, 'কাঙাল মালসাট'-এ রিমোটেব বোতাম টিপে দিল, এটা কিন্তু জি-টিভি বা

আকাশ-বাংলা বা সনি-টিভি নয়, বি. বি. সি বা সি. এন. এন তো নয়ই, বরং, ধবা যাক কে এম. টিভি—তাতেই দেখা যায় একটি বড়ই বড় লালবাড়ি। রাত্তির বেলা। উরিঃ সাঁটি চারদিকে বাড়ি। লালবাড়ি। কিন্তু কত বড উঠোন রে বাবা! লে! সার দিয়ে গ্যাঁদাফুলের টব্। পেতলের ফলকে ফলকে নাম লেখা। পাঠক ভায়া, আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালে, বাঁ দিকের মানে 'ইন' লেখা যে গেট দিয়ে ঢুকেছি সেটা দিয়ে লালবাজারে ঢোকে। বুঝলে? ঢুকে বাঁয়া সেকেন্ড বাড়িটাই হল ডিটেকটিভদের। তলায় তলায় ফুলপরী—বম্ব স্কোয়াড, হোমিসাইড...চলো. ডি. এস যাচ্ছে...আমরাও যাচ্ছি। এরপরে ডানদিক দিয়ে 'আউট' লেখা গেটটা দিয়ে বেরোনো যাবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। চলো...'কাঙাল মালসাট' খাবি যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এখনও সাইজ হয়নি। ইভনিং আব একটু গড়াবে।

তার আগে একটা ছোট্ট ব্রেক্। ফেমাস সমালোচক পিশাচদমন পালের নাম কে না জানে? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এঁকে কেউ যেন কবি পি. ডি. পাল-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে না ভেবে ফেলেন। পি. ডি. পাল সম্প্রতি একটি কবিতা সাইক্লো করে বিলি কবেছেন যদিও সঙ্গত কারণেই কবিতাটি সাইক্লোন সৃষ্টি করতে পারেনি।

পি. ডি. পাল-এর সাইক্লো কবা কবিতা—

নিউক্লিয়ার যুদ্ধে
বিশ্ব যেবার ধ্বংস হয়ে যায়
গোটা মানব সংসারই যখন
ছাই-এর গাদা
সব দেশ যখন শেষ
তারও পরে বেরিয়েছিল
শারদীয়া 'দেশ'
অপ্রকাশিত, এক আঁটি
রাণুকে ভানুদাদা

কবি পি ডি পালকে ধিক্কার কে না দেবে? পিশাচদমন পাল কবি পি. ডি পাল হতে পারেন না। তিনি 'কাঙাল মালসাট'-এর শেষ অর্থাৎ অষ্টাদশতম পাঁয়তাড়াটি পড়ে টি.ভি-তে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'ফাক্! আমি যদি জার্মান হতাম এবং 'কাঙাল মালসাট' ১৯৩০-৩১-৩২, কখনও জার্মানিতে প্রকাশিত হতো তাহলে আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি, পিশাচদমন পাল, সবাব আগে গিয়ে নাজি পার্টির মেম্বার হতাম, এবং ১৯৩৩-এর ১০ মে ২০,০০০ বই পুড়িয়ে যে মেগা-ধামাকা হয়েছিল তাতে, উইদাউট ফেইল, 'কাঙাল মালসাট'-ও পোড়াতাম।' বলাই বাহুল্য যে পিশাচদমনের এই চমকপ্রদ উক্তির ভেতরে যে উস্কানির পুর দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমরা বেকার মাথা ঘামাবো না। এ বিষয়ে আমরা দলাই লামার উপদেশই মেনে চলব—যে যা বলে বলুক, ধরে নিতে হবে এসবই নাথু সংকটে তিব্বতী হাওয়ায় ফুসুরফুসুর। যাই হোক, ওই টিভি সাক্ষাৎকাবের দিন পাঁচেক পবে, তাঁর এগারতলাস্থ ফ্ল্যাটের স্টাডিরুমে বসে পিশাচদমন পাল রিডিং ল্যাম্পের মোহিনী আলোয় মন দিয়ে পড়ছিলেন 'ডিকনস্ট্রাকশন ইন আ নাটশেল: আ কনভারসেসন উইথ জাক্ দেরিদা'—হঠাৎ শুনলেন জানলায় খচরমচর শব্দ। বিশাল এক দণ্ডবায়স এবং তার ঠোঁটে ধরা একটি জ্বলন্ত চুরুট। দাঁড়কাক ভুস করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল। পিশাচদমন হতবাক। দাঁড়কাক পায়ের নখে চুরুটটি ধরে রাখে। অল্প কাশে।

তারপব বলল,

—এরকমই হয়।

—মানে?

—মানে সব হারামিরই এরকম হয়। স্পেশালি তোর টাইপেব।

—হোয়াট?

—ছোটবেলার ডাক নাম যাবা ভুলে যায় তাদের তোর দশা হয়।

—তুইতোকারি?

—ভুলটা কোথায়? তোর বাপ্‌ মানে কালীয়দমন আমাকে দাদা ডাকত। সেই ব্যাটাই তো তোর ডাকনামটা দিয়েছিল। মনে আছে?

—স্ট্রেঞ্জ! বিজার।

—ওসব ঢপের কেওন ছাড়? তোর ডাকনাম ছিল পেদো। সেটা ভুলে মেরে আল্‌বাল্‌ পড়ে ভাবচিস পার পেয়ে যাবি। এন্টার পাঁচপাবলিককে বলে দেব যে তোব নাম পেদো পাল। তখন বুঝবি। বোকাচোদা কোথাকার।

দাঁড়কাক ফ্লাই করিয়া চলিয়া গেল। চুরুটের গন্ধ। জানলার আলসেতে ন্যাডেব মতো দেখতে চুরুটের ছাই। পিশাচদমন চাকরকে নীচে পাঠিয়েছিলেন সোডা আনতে। ওপরে ওঠাব আগে সে লেটার বক্স থেকে চিঠি এনেছে। প্রতিটি খামের ওপরেই লেখা—পেদো পাল। পিশাচদমন ফিল কবলেন তাঁব পা দুটো ক্রমেই আইস কোল্ড হয়ে যাচ্ছে। কোনো ভুল নেই। প্রত্যেকটা খামের ওপরেই সেই ডাকনাম উইথ পদবি—পেদো পাল, পেদো পাল!

'কাঙাল মালসাট'-এর ভাগ্যে সামান্য যে নন্‌-কমার্শিয়াল ব্রেকটুকু জুটেছিল তা শেষ হয়েছে। সেই সঙ্গে শেষেরও শুরু হয়েছে বলে দাবিও উঠেছে যদিও তা চটজলদি না মানলেও চলবে।

কমিশনারসাহেব জোয়ারদার। ছিন্ন মুণ্ড বসানোর হেলমেটটি নেই। মুন্ডু কাটা যাওয়ার পরে অনেক টাইম পেরিয়েছে। এন আব এস-এর ডোমদের সঙ্গে স্পেশাল কনসালটেন্সির মাধ্যমে চাঁদনি-তে অর্ডার দিয়ে একটি অ্যালুমিনিয়ামের হালকা কাঠামো বানানো হয়েছে যা মোটের ওপর হেডপিসটিকে ধড়ের সঙ্গে ধরে রাখতে পারে। স্লাইটলি খাঁচা খাঁচের। তবে সুপ খাওয়াব সময়ে মাথা আর ঝুপ কবে সুপেব বোলেব মধ্যে ডাইভ দেয না। টাকা পয়সার টানাটানি থাকলেও এই কনট্র্যাপশনটির খরচ বহন করেছে রাইটার্স। প্রথমে শোনা গিয়েছিল সরকাব খবচ দেবে না। জোয়ারদাব খচে গিয়ে বলেছিল,

—অন-ডিউটি বিহেডেড হলাম। সেটা যদি কনসিডার না করে তাহলে ওই হেলমেট দিয়েই চালিয়ে নেব। আর তো দুটো বছরের মামলা। এরপব শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যখন দোলনায বসে বসে সুইং করবো তখন তো ফ্রি অ্যাজ আ বার্ড। মাথাটা না হয় পাশে মোড়ার ওপরে রেখে দেব।

ললিতা জোয়াবদার বলেছিলেন,

—পরের কথা পরে। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমার দোলনা চড়াব যেমন প্ল্যান আমারও একটা আছে।

—কী? বাগান?

—বাগান তো চাকররাই করতে পারে। ভাবছি একটা এন জি. ও খুলব। সাঁওতালদেব মধ্যে কাজ করব। ব্ল্যাকস্‌! পুওর নিগারস্‌।

—এক একটা কথা বলো না শুনলে গা জ্বলে যায়। কোথায় শেষ কটা দিন টেগোবিয়ান অ্যামবিয়েন্স্‌ এনজয় করব। তা না, উনি চললেন সাঁওতাল ধরতে। সাঁওতাল কী তা জানো?

অসম্ভব ভায়োলেন্ট। যখন তখন ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে ওঠে। ...বরাবরই এরা এরকম। বিড়. .বিড়...সানতাল রেবেলিয়ন...মিষ্টিরিয়াস ড্রাম বিট্স্, পয়জনড্ অ্যারো.. ব্রিটিশদের অবদি হালুয়া টাইট হয়ে গিয়েছিল আর উনি কি না...

ডি. এস-এর কী হল সেটা এবার জানা যাক। অবশ্য তার আগে জেনে নিতে হবে কেন এমনটি হল। ক্যাপচার তো পরের মামলা।

পুরন্দর সেই বিকেলে যখন ডি. এস-এর সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের সামনে দেখা করে তখন থেকেই দেখেছিল ডি. এস-এর মেজাজ বেশ খাট্টা। ফুটপাথের ফলের দোকানের সামনে হোঁচট খেয়ে ফলওয়ালির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। পানের দোকানে লোকটা অর্ডারি পান সাজছিল বলে পাঁচটা ছোট চারমিনার দিতে দেরি হওয়ায় ঝামেলা পাকাল।

—বড়লোকের অর্ডার বলে গাঁড়ে রস হয়েচে, না? পানের দোকানের লোকটা চালু মাল। না শোনার ভান্ করে চেপে গেল। ওখানে ডি. এস-কে ধরে প্যাঁদানো তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু পাকা ব্যবসাদাররা খুচরো ঝুটক্যাচালে কখনও যায় না। সেখান থেকে ওরা গেল গাঁজা পার্কের বাংলুর ঠেকে। ভেতরে হেভি ভিড়। সবসময়েই থাকে। আর বেশিরভাগ খদ্দেরই পাঞ্জাবি। ইয়া ইয়া আড়া। ঠেলেঠুলে কাউন্টারে যাও, পয়সা জমা করে গেলাস নাও, বসার জায়গা না পেলে যে কোনো ঘাপচি ঘুপচি দেখে উবু হয়ে বসে যাও—এক কথায় বিস্তর হাল্লাক।

—মদনদার কেসটা কী বলো তো! আসচে না দুদিন হয়ে গেল।

—কি জানি! ভদিদা হয়তো কোনো ডিউটি দিয়েচে। বলা বোধহয় বারণ।

—তা হবে। তবে গত বছরও এই টাইমটা দেখেছিলাম মদনদা কেমন মন মরা মন মরা ভাব। মনে হয় এমন টাইমে ওর বউ পালিয়েছিল।

পুরন্দর কোনো জবাব দেয় না। বাংলার গ্লাসে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সাবজেক্টটা নিয়ে পুরন্দর ঘাঁটাতে ইচ্ছুক নয়। তাই সে অন্য কথা পাড়ে,

—অনেকদিন তোমার বাচ্চাকে দেখিনি। কত বড় হল মালটা?

—সাইজে বাড়চে কম। তবে খুব হারামি।

—কার পয়দা দেখতে হবে তো। পাঁইটটা জমলোনা। কি বলো?

—একটা পাঁইট, দুজনে জমে? শুনলে লোক হাসবে। যাই, আর একটা নিয়ে আসি।

ডি. এস পাঁইট আনতে গেল। পুরন্দর ভাবছিল মাল যখন ধরেছিল তখন একটা ফাইলেই কেমন মজে যেত। একটা কবিতার প্রথম লাইনটা ঝিলিকও দিয়েছিল—'খুললে বন্ধ হবে, এ ফাইল সে ফাইল নয়'। কিন্তু আর এগোনো গেল না। ভেতরে মানে কাউন্টারের দিকে বাওয়াল। বাওয়ালের মধ্যে ডি. এস-এর গর্জন! পুরন্দর তড়িঘড়ি উঠে সেই দিকে গেল। পুরো কেলো। ঘিয়ে রঙের ঝোলা ফুল সার্ট আর ধুতি পরার সঙ্গে ডি. এস-এর লেগে গেছে। কাউন্টার থেকে মাল নিয়ে ব্যাক করার সময় ধাক্কা লেগে গেছে। লোকটাকে দেখেই পুরন্দর ধরতে পেরেছে—প্লেন ড্রেসে কনস্টেবল। বিহারী মাল। যেমন আড়া তেমনই বহর। অন্যরা ছাড়াচ্ছে, সে বলছে,

—দেখলেন তো, পহেলা হাত চালিয়ে দিল! শুনেন ফির ভি খিস্তি বানাচ্চে।

—স্রেফ তো হাত চলেচে। এরপর আর হাতফাত নয়, মেশিন চলবে—দনাদ্দন্, দনাদ্দন্!

—শালা পুলিশকা উপ্লব মেশিন। ছাড়িয়ে দিন, মালটাকে থানায় লিয়া যাই। আচ্ছাসে বানাই।

—উঃ পুলিশ দেখাচ্চে। পুলিশের আমরা ঘাড়ে হাগি। বানাচ্চে। উল্টে বানিয়ে দেব। হালুয়া

জান্‌তা? হালুয়া!

ক্রমেই ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠা এই ঝামেলার থেকে ডি. এস-কে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে পুরন্দর। ডি. এস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, ঘামছে।

—ফালতু বাওয়ালে জড়িয়ে ফাযদা আচে কিছু? কোতায মাল টানবো, ধুনকি ধরে কেটে পড়বো—ছাড়োতো।

—হাত চালাতাম না। বাঞ্চোৎটা ঘপ করে কলারটা ধরল বলেই তো

গাঁজা পার্কে রেলিং, মানে মোতাগলির দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ওরা পরে কেনা পাঁইটটা ভাগাভাগি করে খেয়েছিল। সঙ্গে চিংড়ির বড়া। এইসা ঝাল যে দুজনেরই হেঁচকি উঠতে থাকে। এরপর ওরা হাঁটতে শুরু করেছিল বড রাস্তা ধরে, বাঁদিকে।

এদিকে পুলিশের ওপরে তো কড়া ইনস্ট্রাকশন ছিল যে চাকতি কোম্পানির মাল দেখলেই সাইজ করার। ঘিয়ে ফুল শার্টের ঘোর সন্দেহ হল যে দনাদ্দন্ দনাদ্দন্ মেশিন চালাবার থ্রেট যে দিতে পারে সে এলিতেলি নয়। বলা যায় না। নাট্‌কা মালটাকে ক্যাপচার করার জন্যেই হয়তো অ্যাওয়ার্ড ফ্যাওয়ার্ড জুটে যেতে পারে। অতএব ঘিয়ে ফুল শার্ট উলটো ফুট দিয়ে ডি এস আর পুরন্দর ভাটকে ফলো করতে শুরু করে। ওদিকে ডি. এস-ও তখন যে কোনো সময়ে ফলো অন্ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় যা ইন্ডিয়ার ক্রিকেট দল প্রায়শই এড়াতে পারে না। এর মধ্যে, যেটা ঘটেছিল সেটা হল সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা। একদিকে যেমন লড়াই-এর প্রস্তুতি (গেরিলা অথবা পোজিশনাল কাযদায) অন্যদিকে দেদারে ইনটেলিজেন্ট গ্যাদারিং। এ বিষয়ে স্পেশাল কিছু কোডও চালু করা হয। ডি এস আর পুরন্দর চক্রবেড়ের ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার মোড় পেরোল। দুজনেই তখন জিগজ্যাগ ধাঁচে চলছে ফলে বাংলা সিনেমা দেখে বেরনো মেয়েরা সভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অতীতেও এরকম হতো। এই ফুটপাথ ধরেই সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হেঁটেছিল সাইগল, রবীন মজুমদার—আর সেই ফুটেই চলেছে ডি. এস আর পুরন্দর ভাট। এরই ফাঁকে ঘিয়ে ফুল শার্ট পকেট থেকে পাস বের করে দেখিয়ে একটা ভ্যাঁটকামুখো লোকের মোটোরোলা মোবাইল থেকে ফোন করেছিল ভবানীপুর থানায়, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ জানা গেল এবার,

—হুঁ...অঁ...হ্যালো।

—মুকন্দর?

—সিকান্দর।

—ছপ্পর পর কৌয়া নাচে...

—নাচে বগুলা...

মেসেজ দিয়ে ঘিয়ে ফুল শার্ট ভ্যাঁটকামুখো লোকটাকে বলল,

—কিছু শুনেন নাই তো।

—না। ওই কি ছপ্পড় টপ্পড়।

—ভুলিয়ে যান। চুপচাপ চালিয়ে যান। দিনকাল বহোৎ খারাব আছে।

ভ্যাঁটকা আর ট্যাঁ ফুঁ না করে ফেটে গেল।

ওরা পূর্ণ সিনেমার মোড় পেরোল।

পুরন্দর ভাট বলল,

—চপ খাবে? একটু বাঁ দিকে হেভি সব ভাজে, কাটলেট...

—কঁক্।

—আর একদিন বরং খাওয়া যাবে।

—অঁক্!

—বমি পাচ্চে?

ডি. এস হেসে মাথা ঘুরিয়ে জানাল—না। তারপব জড়িয়ে জড়িয়ে বলল

—ধু . . ন ... কি। ধু . . ন . কি!

এরপর ডি এস কয়েক পা করে এগোয় আব দাঁড়িয়ে যায়।

—ব মালটা কেন যে মারতে গেলে...

ডি. এস টলে, সামলায, ফের টলে,

—ওসব র ফ-তে ডি. এস-এব ... জা .. ন ... বে কিচু হয় না।

—সে তো জানি। ডি. এস বলে কথা।

ওরা ক্যানসার হাসপাতালেব ফুটে। শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেব খাবারের গন্ধ পেছনে। ঠিক এই সময়ে ক. পু. লেখা ভ্যানটা ফুট ঘেঁষে থামাল, হুইস্‌ল্ এব শব্দ, দুদ্দাড় দৌড। কোত্থেকে পায় জোর পেয়ে গেল পুরন্দর, ডাইনে বাঁয় টলমলে দুটো আলতো ভাঁজ রোনাল্ডোব স্টাইলে তারপরে উইথ বল খিঁচে দৌড়। পাবলিকও ধুড়। তাবাও হুটপাট, আনতাবড়ি দৌড়াদৌড়ি শুরু কবে দেয়। ডি. এস ধরা পড়েও ঝটকাঝটকি কবে। এর পরেব ঘটনা আমাদের জানা।

ভদির উঠোনে চিৎকার চেঁচামেচি এমন তুঙ্গে উঠতে থাকে যে ভদি দেখল উত্তেজনা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। পুরন্দর উড়ে গিয়ে মদনকে খবব দিয়েছে। মদন উত্তেজিত অবস্থায় দাঁত না পরেই চলে এসেছে। বেচামণি মাঝেমধ্যে, গুমবানোব ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিডবিড় করে কি বলছে। রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি 'চার্জ! চার্জ!' বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। নলেন একটি টিনের লগবগে খাঁড়া নিয়ে লাফাচ্ছে। পাঠকের নিশ্চয় স্মবণে আছে যে এই খাঁডা দিয়েই একদা ফ্যাতাড়ু তিনজনকে বলি দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল। এরকম অবস্থাতেই নেতৃত্বেব হাত বদল হয়ে থাকে। অন্তত ইতিহাস তাই বলে। এক্ষেত্রেও সেটা ঘটল। কিন্তু সাময়িকভাবে। হঠাৎ শোনা গেল গুমরানো নয়, বিড় বিড়ও নয়, বেচামণি খিলখিলিয়ে হাসছে। ভদি বেগে মেগে বলে উঠেছিল,

—একেনে কি রগড় হচ্ছে না বটকেরা? নলেন তোর বউদির মাতাটা কি একেবারে গেচে?

বেচামণি সলজ্জ হাসিয়া ঘোমটা টানিল। সেইসহ মাজায় ছোট্ট একটু ঝাঁকুনি।

—আর চিন্তা নেই। বাবা আসচে।

সত্যি, সেই সময় দাঁড়কাক না এলে 'কাঙাল মালসাট' হয়তো বিয়োগান্ত এক সিবিয়াল গাথা হিসেবেই অমর হয়ে থেকে যেত।

—বাবা! বাবা! সব্বোনাশ হয়ে গেছে! ডি. এস নেই।

সকলেই চুপচাপ। দাঁড়কাক খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হেসে উঠল।

—সে কি বাবা। ডি. এস মবে গেল আব আপনি...?

—কেন, না হাসার হয়েচেটা কী? কি হয়েচে ডি এস-এর?

—পুরন্দর সঙ্গে ছিল। হাজরা পার্কে পুলিশ অ্যাটাক্। ডি. এস কিলড্ ইন অ্যাকশন।

—বাল!

—মানে?

—বাল মানে বাল। পিউবিক হেয়ার। কোঁকড়া।

—মুখ খারাপ করচেন করুন তাবলে ইংরিজিতে...

—চোপ্। কিস্যু হয়নি ডি এস-এব। আগে হাফ পাঁইট উইথ পানি তাবপব এগেন টু থার্ডস পাঁইট উইদাউট পানি আব সোডা, কোক, পেপসি বগেবা বগেবা—এবপবে খোঁচোবেব পেটে টিক—প্রায আউট হযে গিযে বাস্তায—কি বে ব্যাটা পুবন্দব।

—বাবা।

—ভেবেছিলিস তোবাই আচিস, তোবাই খাচ্চিস, আব কেউ নেই?

—আপনি ছিলেন? কই দেখলুম না তো।

– ছিলাম শুধু তাই নয, একা ছিলাম না। বেগম জনসনও ছিলেন। তবে সূক্ষ্ম দেহে। দেখবি কি কবে?

—বলুন বাবা, বলুন। ধড়ে যেন লাইফ ফিবে এল।

—বলচি। নলেন, একটু জল আন তো। নো মাল পাঞ্চিং—পিওব পানি।

গেলাসে জল এল। দণ্ডবাযস চঞ্চুতে জল নিযে মাথা ওপবে ঝাড়ল তাবপব এক পা এক পা কবে ডুবিযে পা ধুল।

—ডি এস কে ওবা আউট অবস্থায নিযে গেল প্রথমে ভবানীপুব থানা। সেখানকাব ও সি ব্যাটা খবব দিল লালবাজাবে যে ভেবি ইমপবট্যান্ট মাল ক্যাপচার্ড। এখন তাকে নিযে গেছে লালবাজাবে। কাটামুণ্ডু জোযাবদাব নাকি তাকে ইন্টাবোগেট কববে।

এতক্ষণে ভদি একটু ধাতস্থ হযেছে,

—লালবাজাবে জেবা! কী কবে কী হবে তাহলে?

—ওসব আমাব ফিট কবা হযে গেচে। আমি এক লাইনে ভাবছিলাম। কিন্তু বেগম জনসনেব বাতলানো বাস্তাটাই দেখলাম ভালো। সব মিটে যাবে। ডি এস ইজ সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তবে এখনও ধুনকিতে বয়েছে। থাকুক না।

ডি এস-কে গাড়িতে তোলাব পবে ভ্যানেব তলাতেই শুইযে দেওযা হযেছিল। বিকট নাক ডাকাব শব্দ। ভবানীপুবেব ও সি হটলাইনে জোযাবদাবকে বলেছিল,

—ওযান মাল কাট্ সাব। বলছিল পুলিশেব ওপব মেশিন চালাবে। দনাদ্দন্ দনাদ্দন্। আব একটা ছিল। এসকেপ্‌ড্।

—পকেটে কি ছিল? মেশিন মানে বামাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সাব। দেখেচি। নো বামাল। ওনলি চিরুনি।

—গুড। এখন কি কবছে? তড়পাচ্ছে? না গাঁইগুঁই কবছে?

—কিছুই না সাব। মাল খেযে আউট।

—বলো কি? তাহলে তেমন ইমপবট্যান্ট এলিমেন্ট বলে মনে হয না।

—না, না, সাব। হেভি ইমপবট্যান্ট। দাম্ কবে একটা ব্লো দিযেছে আমাদেব লোককে। পেটে।

—আ ব্লো ইন দা বেলি?

—ইযেস সাব।

—বুঝেছি।

—কি সাব?

—তোমাব আব জেনে কাজ নেই। স্ট্রেট পাঠিযে দাও। বাকিটা আমি দেখছি।

ডি এস যখন ভবানীপুব থেকে লালবাজাবে চালান হয তখন সেই ফাঁকে জোযাবদাব কমবেড আচার্যকে জানিযে দিলেন যে মিউটিনিব একজন সাসপেক্ট পাকড়াও। কমবেড আচার্য

বললেন,

—বাঁচলাম। এই তাহলে শুরু হল।

—কী শুরু হল।

—মানে ধরা পড়া আর কি। আমি তো ভাবছিলাম আপনাদেব যা হ্যাবিট সেই নাকে তেল দিযে ঘুমোচ্চন।

—কি যে বলেন সার।

—যাই হোক, কনগ্র্যাচুলেশন। এবার খাপাখাপ বাকিগুলোকেও ধবে ফেলুন। ল্যাটা চুকে যায়। তবে হ্যাঁ, সাবধান। কথা বেব করতে গিয়ে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে হিউম্যান বাইটস্ কমিশন আবার হাঁ হাঁ করে ওঠে।

—ওই এক ফ্যাকড়া হয়েছে সার। ধরব অথচ বানাতে পারব না। বলুন, এ কবে পুলিশের কাজ চলে?

—যাই হোক, শুরু করে দিন তাহলে পেয়েই যখন গেছেন। কাল ডিটেলে শুনব। গুড নাইট।

—গুড নাইট!

এরপবে রাত যে কোন্‌দিকে মোড় নেবে সে সম্বন্ধে তিলমাত্র ধারণা থাকলেও কেউ এমন বাতকে গুড নাইট বলতে পাবে না। যাইহোক, সে তো পরেব ব্যাপাব। এখন এইটুকু গাওনা গেযে রাখলেই চলবে যে '১৬' নং পক্কড়ে আমবা ক্ষণিকের জন্যে হলেও লালবাজাবেব এক অকিঞ্চিৎকর কনস্টেবলেব সন্ধান পেয়েছিলাম যাব নাম হল নক্ষত্র নাথ হাওলাদাব। এতক্ষণ সে সাতটা হাতি মিলে খেতে পারবে না এরকম উঁচু খড়ের গাদায় একটি সামান্য ছুঁচ হয়ে অবহেলা অপমান বহন করে পড়েছিল। নক্ষত্রনাথ হল স্লিপার, পায়ে পরার নয়, ঘুমন্ত অর্থে। এবার তার ঘুম ভাঙবে এবং চোক্তারি মায়ার স্পর্শে সে পরিণত হবে ফালে। তাহলে একটু খুলে বলতে হয় যে গোলাপের ফেরে পড়ে প্রথমে 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠেন তারকনাথ সাধু এবং তারপর তারকনাথ সাধুই নক্ষত্র নাথ হাওলাদারকে 'বিদ্রোহী' করে তোলেন। তারকনাথেব খচে যাওযার কারণ ছিল কারণ তাঁকেই বলা হয়েছিল 'বোজ'-কে গ্রিল করতে। তিনি দেখেছিলেন যে এত বছরের বিশ্বস্ত যে গোলাম সেই হয়ে উঠেছে সন্দেহের টার্গেট। বলা যায় না তাঁকেও হয়তো ওরা টার্গেট করে ফেলবে যারা ফাইল ফেরৎ পাঠিয়েছিল 'বাল' ও 'পাগলাচোদা' জাতীয় অশ্রাব্য কথা মলাটে লিখে। হাওলাদারের ছিল সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা। 'সাধু' পদবীটিই তাকে ম্যাগনেটের মতো টেনেছিল। সেই সাধুবাবাই যখন লালবাজারের কাছেই একটি রেস্টুরেন্টে বসে হাওলাদারকে মামলেট আর টোস্ট খাওয়াতে খাওয়াতে ও খেতে খেতে বললেন,

—হাওলা, এই যে পুলিশের ঘর করে বাল পাকিয়ে ফেললে, কালই যদি টেররিস্ট বা ড্যাকইটের দানা খেয়ে ফুটে যাও ভেবেছ কোনো মামা চোখের জল ফেলবে? কাঁড়ারের কেসটা দেখলে? মালাফালা দিল, পুড়ে গেল, তারপর? ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে ঘুরছে। বউটার হাল দেখেছ?

হাওলাদারের জিগরি দোস্ত ছিল কাঁড়ার। তার চোখ জলে ভরে ওঠে এবং কপালেব ভাঁজগুলো কাঁপতে থাকে।

—বশীরের বেলায় কি হল বলুন?

—ওফ্ বশীর। অমন একটা মানুষ। অমন তরতাজা। কেঁদো না। হাওলা। কান্নাকাটি ওই খানকির ছেলেরা অনেক দেখেছে। কাঁদলে হবে না। এদের দাওয়াই অন্য।

—আছে? দাওযাই?

চ্যাংদোলা কবে ডি এস কে লালবাজাবে ঢোকানো হল।

ভদিব উঠোন। সবাই চলে গেছে। দাঁডকাক, ভদি, নলেন, বেচামণি, মদন, সবখেল, পুবন্দব ও মেজব বল্লভ বক্সি। দাঁডকাক একটি কালো পাথবেব বাটিতে ভবা জল একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিযে দেখছিল ও বলে যাচ্ছিল,

—এই। এই। লালবাজাবে ঢোকাচ্চে। বাসস্, ওই লাশ।

বাবা। লাশ কেন বললেন? তবে কি?

—চাপ্। বাটি দেখাব সমযে ওসব নির্মকিছেনালি? হ্যাঁ, লাশ। জিন্দা লাশ। এবাব নিযে যাচ্চে। যাবে বাবা কোথায? সেই তো জোযাবদাবেব ঘবে।

যদিও এখানে ইন্টাবকাটি পদ্ধতি লাগু তবু এটি কিন্তু সিনে বোমা নয। জোযাবদাবেব ঘব। কার্পেটেব ওপবে ডি এস-কে শুইযে দেওযা হল। জোযাবদাব এক্সাইটেড।

—তুমি কে?

—আঁজ্ঞে, আমি হাওলাদাব।

—গুড। গুড। বাইবে থাক।

—স্যাব?

– অঁ?

–মাল টেনে আউট কিন্তুক ডেঞ্জেবাস। আপনি একা দেখবেন?

-ওযেল, মিঃ হাবিলদাব, আই অ্যাম জোযাবদাব।

ইযেস সাব।

নক্ষত্র নাথ হাওলাদাব দবজাব বাইবে দাঁডায ও বিডি ধবায।

দাঁডকাক, পাথবেব বাটিব ভেতবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেখে,

—নডচে। নডচে।

কী নডিতেছে পেভু?

প্রশ্নটি বিটাযার্ড মেজব বক্সিব।

—তোমাব ওইটি। বক্‌বিচোদ্।

এই খিস্তিটি মেজব বক্সিব মনে দাগ কাটায তিনি মৌন হযে যান। মিলিটাবিব এই হল ধাঁচ। ন্যায্য খিস্তি তাবা সংযতভাবে ভক্ষণ কবে। আবাব উল্টোটা হলে নল যে ঘুবিযে ধবে না এমনটাও বলা যাবে না।

ডি এস প্রথমে ভেবেছিল সে হাজবা পার্কে ঘাসেব ওপবে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হাজবা পার্ক তো ন্যাডা। সেখানে আবাব এত ঘাস কবে গজাল? এই ভাবনাব মধ্যে জোযাবদাবেব ইযা বড চেম্বাবেব কার্পেট তাব কাছে বাডিব বিছানা হযে গেল। আবাব চোখে ঘোলা ঘোলা আলো, তাব মধ্যে অ্যালুমিনিযামেব খাঁচা পবা জোযাবদাবেব মুখ, রুম ফ্রেশেনাবেব গন্ধ, এ সি চলাব শব্দ, এব মধ্যে আবাব ফোন বাজল।

—হ্যালো ফালতু কেন যে জ্বালাও আই অ্যাম অন ক্রুশিযাল অ্যাসাইনমেন্ট নিকুচি কবেছে তোমাব মাশরুম সুপেব হ্যাঁ, হ্যাঁ, একা একাই গেল অ্যান্ড ফব গড্‌স সেক্ এখন ডিসটার্ব কবো না হ্যাঁ বে বাবা, গুড নাইট ঘুম পেযে গেছে তা ঘুমোও গুড নাইট উফ্—পেস্ট্। ধিঙ্গি মাগি .ন্যাকামি হান্টাব দিযে চাবকাতে হয

ডি এস হঠাৎ ধডমড কবে উঠে বসেছিল, দেখল, জোযাবদাব, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমেব মধ্যে

মুণ্ডু, হাসছে,

—কাটল? নেশা! গন্ধটা বোধহয় কানট্রি লিকারের। তাই না?

ডি. এস এরপর টোটাল তিনটে ডায়ালগ দিয়েছিল। সেটা হতেই পারে কিন্তু তিনটি ডায়লগই কেন হিন্দিতে তা কখনও জানা যাবে না।

—কেয়া?

এর জবাবে জোয়ারদার কঠোর বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টার্ন' মেজাজে বলেছিল,

—কেয়া এক্ষুনি বুঝবে। মাল খেয়ে আউট, তার ওপর রোয়াব? এবাবে ঝেড়ে কাশো তো—আমাদের কাছে যে ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট এসেছে তাতে রেবেলরা দুই পার্টির। চোক্তার অ্যান্ড ফ্যাতাড়ু। তুমি কোন্‌টা?

—পহলে মাল বুলাও!

—মানে? লালবাজারে বসে মাল খাবে? ইয়ার্কি দেওয়ার একটা লিমিট আছে। আব ইউ চোক্তাব অর ফ্যাতাড়ু?

এইবাব ডি. এস. তার নোংবা টেরিকটনেব প্যান্টের জিপটা ধরে টানতে থাকে,

—মুতেগা কাঁহা?

ওদিকে দাঁড়কাক আনন্দে ডানা ঝাপটায। বাকি সকলেই সোৎসাহে তাব দিকে তাকিয়ে।

—সলিড্ জবাব। লে, কী বলবি বল্। বেশি তেড়িবেড়ি করলে কার্পেটেই দেবে ছন্‌ছন্ করে. .চলবে.. ডি. এস. ব্রাভো. .

জোয়ারদার চেঁচায,

—হাবিলদার! হাবিলদার!

হাওলাদার ঢোকে।

—সার!

—যাও! আসামীকে মুতিয়ে আনো। ধরে রাখবে। মালটা এসকেপ না করে।

—এখান থেকে পলায়ন। কী যে বলেন। চলেন...আপনাকে মুতিয়ে আনি, সাহেবের অর্ডার।

হাওলাদারের সঙ্গে টলমল করে বেরোতে ডি. এস দেখেছিল জোয়ারদারের হাতে ব্যাটন। বাঁ হাতে ধরে ডানহাতের তালুর ওপর আস্তে আস্তে, মোলায়েম করে বাজাচ্ছে। দরজা খুলে বিশাল বারান্দায় বেরোয় হাওলাদার ও ডি. এস। আরও কয়েকজন কনস্টেবল ছিল। হাওলাদার ডি. এস.-এর কলার ধরে ছিল। অজানা ভৌতিক নির্দেশে আলগা করে দিয়েছিল। দেখলে মনে হবে ধরে আছে কিন্তু আসলে ফস্কা গেরো। আচমকা, গুনগুন করতে থাকে ডি. এস, ফ্যাতাড়ুদের ওড়ার মোক্ষম মন্তর,

—ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁই সাঁই!

এবং টলমল করতে করতে টেক্ অফ্ করে। সাট্ করে দেড় মানুষ ওপরে উঠে যায়। তারপর দুহাতে ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু একটা হবে এটা হাওলাদার জানতো। কিন্তু সেটা যে এত সাবলীল সেটা ভাবতে পারেনি। সে এবং বাকি কনস্টেবলরা দৌড়ে বারান্দার শেষ অবদি এসেছিল। আকাশে চাঁদনি প্লাস ডিজেল পোড়া ধোঁয়ার কুহকী ককটেল। তারমধ্যে উড়ে গিয়ে ডি. এস. ক্রমশ উঠতে থাকে, আরও আরও ওপরে। অনেকটা ড্র্যাকুলার স্টাইলে।

জোয়ারদার তখন ভাবছিল যে ম্যারাথন মোতা চলছে। কিন্তু এত টাইম ধরে? জোয়ারদার বেল বাজালেন ও সেই সঙ্গেই চেঁচাতে লাগলেন,

—হাবিলদার! হাবিলদার।

হাওলাদার ও অন্যান্য সব কনস্টেবলই হাঁউ মাঁউ কবতে কবতে দৌড়ে এসেছিল। তাদেব দেখতে ভীত ও উৎকণ্ঠিত কৌয়া ও বগুলাব মতো। এব ঘন্টাখানেক পবেই জোযারদাব তখন কফিতে মাত্র দুটো চুমুক মেবেছেন, ভবানীপুব থানা থেকে ফোন।

—ও সি ভট্‌চায্‌ বলচি স্যাব। থানাব ওপব বম্বার্ডমেন্ট হচ্চে সাব।

—মানে? বম্ব না শেল্?

—না সাব থানকা ইট, নোংবা কাদা ভবা ভাঁড়, হাঁড়ি, গু, ভাঙা বালতি এই সব পডচে। একেবাবে কার্পেট বম্বিং।

—এব জন্যে আমাকে ফোন কেন? যাবা এসব ফেলছে তাদেব ধবে লক্-আপ কবে দাও।

—কাকে ধবব সাব? ওপব থেকে পডচে। কিছু উডন্ত ফিগাব দেখা যাচ্চে কিন্তু ভিজিবিলিটি এত পুওব, তাছাডা যে দেখবে তাবও তো ডেঞ্জাব দমাদম ফেলচে

—মানে বলচো অ্যান অ্যাটাক ফ্রম আউটাব স্পেস?

গদাম্ কবে একটি শব্দ।

—শুনলেন সাব. সাউন্ড?

—কি পডলো ওটা?

ও সি-ব চিৎকাব শোনা যায,

—কী পডল? ও সাব, একটা টব গাছ সমেত।

—দেখছি কী কবা যায।

জোযাবদাবেব কিছুই কবাব ছিল না ফোনটি বেখে দিয়ে চোঁ চোঁ কবে বাকি কফিটুকু মেবে দেওযা ছাডা। খোদ লালবাজাব থেকে আসামী উধাও। এবং তাও স্রেফ উডে। কাল বাইটার্সে কী বলবেন জোয়াবদাব? সি এম এমনিতেই মেজাজী লোক তাব ওপবে.

আবাব ফোন। দুরু দুরু বক্ষে ফোন ধবলেন নগবপাল। উল্টোদিকেব কণ্ঠস্ববটি বেশ জাঁদবেল।

—আপনি নগবপাল সাহেব আচেন?

—ইযেস, মানে, আপনি কে?

—আমি রিটাযার্ড মেজব বল্লভ বক্সি। লাইন ধবিযা বাখেন। মার্শাল ভদি বাত কববেন।

—অ্যাঁঃ মার্শাল ভদি তিনি কে?

ততক্ষণে ভদি রিসিভার নিয়ে নিয়েছে।

—আমি কে? আমি আমি। মার্শাল ভদি। কাবেন্ট বংশধর অফ আত্মাবাম সবকার। চাকতি মনে আছে। মুণ্ডু কুচ্। মনে আছে?

—মনে আর থাকবে না? অন-ডিউটি বিহেডিং। ভালো মনে আচে।

—ওই চাকতি কোম্পানি আমার। আমি মার্শাল ভদি।

—নমস্কার ভদিবাবু!

—নমস্কার। আজ আমার লোককে আপনাবা ক্যাপচার কবেছিলেন।

—পারলাম না। রাখতে। উড়ে পালাল।

—যাই হোক, আমি ওয়ার ডিক্লেয়াব করচি।

—ভবানীপুর থানা তে তো...

—ওতো সবে কনসার্ট! এরপরে আসল লডাই। কালই ধুড়ধুড়ি নড়ে যাবে।

—মার্শাল! মার্শাল ভদি? মার্শাল!

ফোন চুপ। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জোয়ারদার। রাত বারটা দশ। লালবাজারের ওপরে আকাশ থেকে দুম্‌দাম পেটো পড়া শুরু হল। বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ। দরজা জানলা সব কাঁপছে। টেবিলের ওপরে কফির পেয়ালা ও প্লেট নাচছে। বম্ব স্কোয়াডের লোক এসে বলল একটা পেটোতে সচরাচর যা যা থাকে সেই পেরেক, বল-বিয়ারিঙের গুলি বা লোহালক্কড়ের টুকরো ওসব নেই।

—স্ট্রেঞ্জ!

—তবে হেভি সাউন্ড স্যার!

—অবাক হয়ে যাচ্ছি! বুঝলে। সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জাপানীরা ক্যালকাটা বম্ব করেছিল, তার পর এই।

২০

র‍্যাফ সহ পুলিশের একটি বাহিনী কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর দিক থেকে গোটা রাস্তা মানে দুপাশের আপ ও ডাউন রাস্তা ও ট্রামলাইন সংলগ্ন জমি ধরে এগোচ্ছিল। অন্তত দশটি ক. পু লেখা ভ্যান ছিল। এই বাহিনী মার্চ শুরু করে সকাল দশটা নাগাদ। এগোচ্ছে.. এগোচ্ছে.. ।

রাসবিহারী মোড়ের কাছে একটি সেলফোনের কোম্পানির বিশাল হোর্ডিং লাগানো বাড়ির ছাদে রং-ওঠা মিলিটারির জ্যাকেট, টুপি ও প্যান্ট পরে অপেরা-গ্লাসে লক্ষ রাখছিলেন মেজর বল্লভ বক্সি। ছাদের দুটি থামের বুরুজের মধ্যে অপেক্ষারত লিসবনে নির্মিত পোর্তুগিজ নুনু কামান। বারুদ ঠেসে গোলা ভরে রাখা।

লক্ষণ-রেখা ছিল শাহরুক্ খানের পোস্টারে ঢাকা একটি দেওয়াল যার গায়ে ক্লান্ত পথচারীরা মুতে থাকে। এটা পুলিশের জানা ছিল না। আগুয়ান পুলিশ-বাহিনীর একটি ভ্যানে বসে ছিল টালিগঞ্জ থানার টাক্‌লা ও. সি।

মেজর বল্লভ বক্সি মনে মনে গুনেছিলেন ১০... ৯... ৮... ৭... ৬... ৫... ৪... ৩. . ২ .. ১..

মেজর বল্লভ বক্সি হুঙ্কার ছাড়লেন,

—ফায়ার!

গর্জে উঠলো নুনুকামান! গুড়ুম!

কলকাতায় আম্রবন নেই ভাগ্যিস। তবে মেন গঙ্গা নদী না ডিসটার্বড হলেও আদিগঙ্গা যে কেঁপে উঠেছিল তা তো তার ঘোলা ওয়াটারই জানে। পাঠকেরা সেই জলেই আলোড়ন দেখে থাকবেন হয়তো। সেই বেলায় নভেলিস্ট একটি পোস্টকার্ড-এ ভাঁজ করে বানানো পেপার বোট ওই জলেই ভাসিয়েছিল। সেটি কেতরে পড়ে ও তার গলুইতে নোংরা জল ঢোকে। এবং এর কিছু পরেই কাঁকড়ারা নৌকাটিকে দাঁড়ায় ধরে জলডোবা করে ফেলে। লেখকদের ভাগ্যে এরকমই সচরাচর ঘটে। 'কাঙাল মালসাট'-এর বেলাতেও এই নিয়মের অন্যথা না হওয়ারই কথা। যুদ্ধের আস্ফালনে এসব মাইনর ডিটেল কারও চোখে পড়ার নয়। পড়েওনি। অতএব ইহা আপাতত ইগনোর করাই যায়।

প্রাচীন এইসব কামান এখনকার বোফর্সটাইপের নয় সে গোলা ভরো আর চালাও, ভরো আর চালাও। আবার মাল ঠাসতে হয়, নলচে ঠাণ্ডা করতে হয়, তবে না পুনরায় অগ্নিসংযোগ

ও উদ্দীবণ। প্রথম গোলাটি গিযে টাকলা ও সি-ব ভ্যানেব ছাদে পডে এবং তাবপব পিং পং বলেব মতো এ ভ্যান ও ভ্যানেব ছাদে ঘুবে ফিবে লাফাতে থাকে। এব ফলে ড়ুম, ড়ুম, শব্দ হয যা পুলিশেব কানে দুন্দুভি বলেই মনে হয।

মেজব বল্লভ বক্সিব হাঁকাড চলে।

—পানি ডালো!

হাড জিবজিবে গজা নামে এক সৈনিক ছাদেব পাযখানাব মগ থেকে জল ঢালে।

—পোঁদমে কাঁহে ডালতা? সিভিলিযান কুত্তা কাঁহাকা। বডিমে ডালো।

গজা কাঁপতে কাঁপতে নুনুকামানেব বডিতে জল ঢালে। বেদাব বাযেব আমলে ি যেমনটি হতো তেমনই আনন্দে কামানটি গাযে জল পডতে ভ্যাঁসভেঁসিযে ওঠে।

—ফিব ঠাসো। শেল লাগাও। ফাযাব

এবাবে আবও জমকালো। এই শেলটি কক্ষপথেই বিস্ফোবিত হযে অসংখ্য ছোট মার্বেল গোলায পবিণত হয এবং তাবাও আগেব বড গোলাটিব অনুসাবী হযে ক প্-ব ভ্যানগুলিব ছাদে ও বনেটে নাচানাচি শুরু কবে।

নুনুকামানেব গর্জন, সিটি মাবাব শব্দ কবে গোলাব আগমন ও ভ্যানেব ওপবে নন-স্টপ নাচানাচি পুলিশ বাহিনীব মধ্যে প্যানিক এব সৃষ্টি কবে। তাবা এ ওব সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি কবে হামাগুডি দিযে ভ্যানেব তলায ঢুকতে চেষ্টা করে।

—এনিমি স্ক্যাটার্ড। ফিবসে ঝাডো। ফাযাব

এবাবে গোলাটি নতুন কেবামতি দেখায —কামানেব মুখ থেকে বেবিযে সেটি আকাশ পথে খুবই ধীবগতিতে ভাসতে ভাসতে কিছুদূব এগোয তাবপব পুলিশ বাহিনীব মাথাব ওপবে গিযে দোতলাব হাইটে থেমে দাঁড়িযে যায়। এব ফলে অভূতপূর্ব সাসপেন্সেব সৃষ্টি হয। যে পুলিশবা তখনও হামাগুডি দেযনি তাবাও এবাব পালাতে শুরু কবে। মাথা থেকে টুপি খুলে টাকলা ও সি টাক চুলকোয এবং ওয্যাবলেসে লালবাজাবে জানায।

—হেভি শেলিং হচ্ছে স্যাব! কেস গুবলেটিং!

—বলো কি ভাযা! শেলিং হচ্ছে!

গুড়ুম! এবাবে ব্যাপক কর্ণবিদাবী শব্দ হয।

—শুনলেন সাব! আবাব ঝাডল।

—শুনব না? মাথা ঝন্‌ঝন কবছে। ক্যাজুযালটি ফিগাব কত?

—নো ক্যাজুয়ালটি সাব। তবে ফোর্স ঘাবডে গেছে।

—এক কাজ কব। কামানফামানেব সঙ্গে গাঁড মাবিযে দবকাব নেই। বিট্রিট কব। ইমিডিযেটলি।

—থ্যাঙ্ক ইউ সাব!

টাকলা ও সি ভ্যানেব জানলা দিযে টেকো মুণ্ডু বেব কবে চেঁচায,

—ফোর্স ব্যাক্ কববে। সব ভ্যানে উঠে পড। কামানেব সঙ্গে নো গাঁড মাবামাবি।

ভ্যানেব তলায, আশপাশেব দোকানে, বাডিতে যে সব পুলিশবা শেল্টাব নিযেছিল তাবা দুডদাড কবে ভ্যানে উঠতে থাকে। ভ্যানেব ছাদে বড গোলা ও ছোট গোলাব দল মহানন্দে তাসা বাজাচ্ছে। পুলিশ বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

মেজব বক্সি আনন্দে গজাব দাবনায আলতো কবে একটা চাপড লাগিয়ে অপেবা গ্লাসটি এগিযে দিয়ে বললেন,

—দেখো ইয়ার, এনিমি পলায়ন করিতেছে। যাও, ফির পানি লাও। টু সেলিব্রেট ভিক্টরি এক রাউন্ড করে রাম হয়ে যাক।

গজা ফের ছুটল পায়খানার মগে করে জল আনতে।

যুদ্ধের এই সাময়িক বিরতি, পাঠক, একটু ঝালিয়ে নেবার জন্যে কাজে লাগালে মন্দ হয় না। ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে কিন্তু ঝালাই করার কোনো যোগ নেই। অবশ্য ঝালাই-এর ব্যাপারটাও একটু পরে আসবে। আসবেই। গরচায় কাঠের গুদামের মালিক কারফর্মা গত রাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দেখেছিল যে সে একটি ওভাল টেবিলের একধারে বসে আছে। বেশ খানদানি মহলের একটি বিশাল ঘর। সেই ঘরে একদিকে সাহেবী ফায়ার প্লেস। তাতে কাঠ পুড়ছে। আবার ঘরে টানা পাখাও চলছে। এবং পাখার হাওয়া হাপরের মতোই বারে বারে ওই কাঠের আগুন উস্কে দিচ্ছে। টেবিলে বিশাল একটি মোমবাতি। ভূতুড়ে। পরিবেশ। বাঁদিকের দেওয়ালে ন্যাংটো দেবশিশুদের ছবি। নাদুসনুদুস, ডানা লাগানো। ছবির তলায় আবার আড়াআড়ি করে রাখা দুটি বিরাট সোর্ড। কারফর্মা ঘাবড়ে গিয়ে মনে মনে বলেছিল,

—সাতে নেই পাঁচে নেই, এ বাঁড়া কোথায় এসে পড়লুম। যেই না বলা অমনি ঝটপট করে একটা বিরাট দাঁড়কাক এসে টেবিলের ওপরে ল্যান্ড করল। কারফর্মা ঘাবড়ে গেল।

—ঘাবড়ে গেলি? অথচ তোর তো ঘাবড়াবার কথা নয়।

—আঁজ্ঞে!

চার জন্মো আগের কথা অবশ্য তোর মনে না থাকতেই পারে। এই এইঘরে বড়াখানা হয়েছিল, মাইফেল বসেছিল। ভুলে মেরে দিয়েছিস। সব সাহেবরা নেচেছিল। মালের ফোয়ারা ছুটেছিল। হেভি খানাপিনা। মনে পড়ছে? ল্যাম্ব রোস্ট!

—একটু একটু! একটা ঘোড়ার গাড়ি, ছমছমা শব্দ, ঘুঙুর!

—এই তো। তোর ডিউটি পড়েছিল মিঃ স্লিম্যানের জন্যে একটা খানদানি নেটিভ খানকি আনার।

—মনে পড়ছে এবার।

—না পড়ে পারে? এই মেয়েটিই তোকে মার্ডার করেছিল পরে।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ, মানে বিষ দিয়ে। যা হোক জায়গাটা চিনলি?

—না তো।

—এটা হল বেগম জনসনের কুঠি।

ম্যাজিক গতিতে মুখোমুখি চেয়ারে, ওভাল টেবিলের ওপারে, গজিয়ে উঠলেন বিশালবপু জনসন। কারফর্মা যাতে ভালো করে দেখতে পায় তাই দাঁড়কাক এক লাফে পাশে সরে গেল। বেগম জনসন ধানাই-পানাই করার পার্টি নয়,

—কাল সকালে, কারফর্মা তোমার দুটি ডিউটি। হামি কোনো হ্যাংকি প্যাংকি শুনবো না। না করিলে কী হইবে সেও বলিয়া দিব।

—না, না, অবশ্যই করবো। আপনার অর্ডার।

—গুড। এই কাগজটিতে মার্শাল ভদির অ্যাড্রেস লিখা আছে।

কাল ঘুম হইতে জাগিয়াই তোমার ড্রাইভার বলাইকে এই ঠিকানায় পাঠাইবে, সে মার্শাল ভদি, বেচামণি, নলেন ও সরখেলকে উঠাইবে। তুমি উয়াদের আন্ডারগ্রাউন্ডে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

—আঁজ্ঞে আর একটা ডিউটির কথা বললেন।

—দ্যাটস, লাইক-আ-গুড বয়, তোমাব নেক্সট ডিউটি হইবে লালবাজারে ফোন করিয়া কমিশনার জোয়ারদাকে মার্শাল ভদির ঠিকানাটি বলিযা দিবে। মিউটিনি লাগিয়াছে জানো, নিশ্চয়।

—আঁজ্ঞে না। গদি সামলাতেই নকড়াছকড়া হয়ে যাচ্ছি, কোথায় মিউটিনি-ফিউটিনি..

—চোপ নটিবয। একটি মাগিও তো রাখিতেছ। বাখেল। লাস্ট মান্থে তাহার তরে একটি কালাব টিভিও খরিদ করিয়াছ. আমার হুকুম যদি অমান্য কব তো ওই রাঁডই তোমাকে পযজন করিয়া মাবিবে। সেবার যেমন হইয়াছিল।

—না, না, অবশ্যই করব। দুটোই কবব!

কারফর্মা ঘুম থেকে ঘেমেচুমে উঠল। পাশে বউ। নাক ডাকাচ্ছে। কাবফর্মার হাতে ধবা এক টুকরো কাগজ।

ওদিকে দাঁড়কাক বেগম জনসনকে বলছিল,

—তোমাব এই কনট্রাডিকটরি স্টেপটা ঠিক ক্লিয়ার হল না।

—খোলসা করিতেছি। ভদিতো ওয়ার ডিক্লিয়াব কবিয়াছে। এখন ফেয়ার প্লেইং ফিল্ডে এসপার ওসপার হওযা ভালো। আমি টিপুকেও লড়তে দেখিয়াছি। খোলা লড়াই। আব সত্যি যদি বল হাজাব হলেও ওই লালবাজাব আমরাই বানাইযাছিলাম। একে বলতে পাব ইভেন হ্যান্ডেড জাস্টিস। তবে ভদিব বাড়িতে উহারা কিছুই পাইবে না। উপবন্তু নাজেহাল হইবে। লালবাজাবে ঠিকানা না জানাইলে তামাশাটি হইবে না। তুমি তো জানই যে আই ক্যান নট লিভ উইদাউট ফান অ্যান্ড মার্থ।

এইবাব কি ড্রাইভাব বলাইকে মনে পড়ে? সেই যে গাল তোপডান, খোঁচা দাড়ি বলাই। টালিগঞ্জ ফাঁড়িব বাংলার টেকে ফেযাবওয়েল ডায়লগে ফ্যাতাড়ুদেব বলেছিল,

—ঠিক আচে ভাই দেখা হবে। নামটা মনে বাখবেন। বলাই। আমি কখনো মুখ ভুলি না।

'৪' নং ঘাপলাটিতে বলাইয়ের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটেছিল। আবার সে এসেছে ফিবিয়া। হে মহান পাঠক, তুমি কখনো চিড়িয়াখানায় ভোঁদড়দেব সিঙি মাছ ছুঁড়েছুঁড়ে খাইযেছ? যদি এমনটি কবে থাক তাহলে মনে রেখ, ওই একই টেকনিতে 'কাঙাল মালসাট' তোমাকে ভুলে যাওয়া শিঙি মাছ নয, এক একটি ভ্যানিস হয়ে যাওযা চবিত্রকে ফেব উপহার দিচ্ছে—যেমন নক্ষত্রনাথ হাওলাদাব। যেমন বলাই... এটসেট্রা এটসেট্রা।

কাকভোরে টিনের দরজায় ডুমডুম করে ধাক্কা। ভদি ভেবেছিল পুলিশ এসেছে। বেঢপ মিলিটাবি টিউনিক পরে ভদি মোগলাই আমলের পেল্লাই মবচে পড়া সোর্ড ভুঁড়ির ওপরে রেখে ঘুমোচ্ছিল। নলেন দরজা খুলেছিল। পুলিশ নয়! বলাই এবং একটি বডি তোবড়ানো কালো রঙের, মান্ধাতার আমলের ল্যান্ডমাস্টার এবং একটু পরেই সরখেলের বাড়িতে ফোনেব দড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল।

—বঁলো।

—ঝঁটপঁট চঁলেঁ এসোঁ।

—কেঁনঁ?

—গাঁ টাঁকা দিঁতে হঁবে।

—পাঁইখাঁনা হঁয়নি।

—ওঁ হঁবে। আঁমিও হাগিঁনি।

ল্যান্ডমাস্টারটা যখন পোঁটলায় বাঁধা সোর্ড, ভোজালি, খুরপি, ইত্যাদির অস্ত্রাগার ও চারজন

অ্যাবস্কন্ডারকে নিয়ে রওনা হয়ে যায় তখন কয়েকটা বাড়ির দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বড়িলাল। সে এবারে গঙ্গার দিকে পা চালাল। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিবে তাকে কাশীর চিনি দিয়ে ভেজানো ছোলা খেয়ে ডন বৈঠক মারতে হবে। যাব যা কাজ। যেমন শশধবের কাজ শশক ধবা ও মহীতোষের কাজ মশক মারা। ল্যান্ডমাস্টারে সদলবলে ভদির কেটে পড়ার ঘণ্টা দুয়েক পরে আই.পি.এস অফিসার ডি. সি পীতাম্বর সিং-এর নেতৃত্বে রাইফেলধারী একদল পুলিশ ভদির বাড়ি ঘিরে ফেলে। পোর্টেবল মাইক থেকে ঘোষণা করা হয় ভেতরে যে যে আছে যেন সারেন্ডার করে। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে কোনো ফায়দা নেই। লে হালুয়া। সারাবাড়িই ফাঁকা। ন্যাড়া ছাদে শুধু একটা দাঁড়কাক বসে আছে। দাঁড়কাকেব পাশেই পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন বেগম জনসন। অবশ্য সূক্ষ্মদেহে থাকার হেতু পুলিশরা তাঁর অস্তিত্ব টের পায়নি। চাকতির ঘব খোলা পড়ে ছিল। কযেকটা শেকলটানা ঘরে ঢুকে দেখা গেল শুকনো ফুল, চাটাই-এর আসন, মালসা, মবা আবশোলা, খড়ের আধপোড়া আঁটি ইত্যাদি। পীতাম্ববের বাড়ি দারভাঙ্গায় হলেও সে কলকাতাবই ছেলে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছে।

—মনে হচ্ছে এখানে উইচক্রাফট প্র্যাকটিস কবা হয়। ইন্টারেস্টিং। বাট নো রেবেলস্। এরপরই তার চোখ পড়ে ভদি-সরখেল টেলিফোন লাইনের উপর।

—মিস্টিরিয়াস! সিমস টু বি আ প্রিমিটিভ কমিউনিকেটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। দেখতে হচ্ছে।

তার-এর লাইন ফলো করে পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায় সরখেলেব বাড়ি। এবং সেখানে আবিষ্কৃত হয় আড়ে বহরে প্রায় এক মানুষ ছড়ানো সেই বিশাল গর্ত যার গভীব থেকে উঠে এসেছিল লিসবনে বানানো পোর্তুগিজ নুনুকামান ও কতিপয় মরচে পড়া মোগলাই সোর্ড। গর্তের ভেতরে টর্চ মেরেছিল পীতাম্বর। অনেক তলায কালো, দুর্গন্ধ জল জমে আছে। ভন ভন করছে মশা। এরমধ্যেই কেলোটা হয়েছিল। একজন কনস্টেবল ভদির একতলার একটা ছোট্ট ভাঁড়ার টাইপের ঘরে চারপাঁচটা বোতল দেখেছিল। মুখ বন্ধ। ভেতবে লিকুইড। মাল হতে পারে ভেবে একটা বোতলের ছিপি খুলেছিল। বোতলে ভূত পোষা হয় কি হয় না, যায় কি যায় না, এসব নিয়ে সুচিন্তিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা আমাদের লক্ষ নয়, এক্ষত্রে যা ঘটেছিল সেটিই আমরা জানতে পারি—কনস্টেবলটি সহসা দেখল শক্ত হাতে চুলের মুঠি ধরে অদৃশ্য কেউ তাকে টেনে উঠোনে এনে ফেলল। ঠাস করে এক থাবড়া বসালো। গালে হাত বোলাতে না বোলাতে পোঁদে এক লাথি। বেগম জনসন ও দাঁড়কাক গিটকিরি দিয়ে হাসতে থাকে। নামজাদা কোনো মাইম আর্টিস্টও এত ভালো করতে পারবে না। অন্য পুলিশরা যেটা দেখেছিল সেটা হল ভদির টিনের দরজা দিয়ে সে হাঁউ মাঁউ করতে করতে বেরোচ্ছে এবং একটি উড়ন্ত বালতি তাকে ধাওয়া করছে। দৃশ্যটি স্বচক্ষে না দেখলেও পীতাম্বর এর মিনিট খানেক পরে সরখেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশদের মধ্যে যে বিপর্যস্ত ভাব দেখল তা যেমনই করুণ তেমনই চিন্তার উদ্রেক করে। উড়ন্ত বালতি ততক্ষণে ঢুকে গেছে বাড়ির ভেতরে। দরজাও বন্ধ হয়েছে সপাটে। যদিও বাড়ির ভেতরে কেউ নেই। কেতরে পড়া সাইনবোর্ডটিতে লেখা 'বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘরভাড়া দেওয়া হয়।' ন্যাড়াছাদে জায়েন্ট দাঁড়কাকটি বসে। জিপে বসে আচমকা এক লহমা পীতাম্বরের মনে হল পাশেই বিশাল স্থূলকায়া এক হাস্যমুখ গাউন পরা মেম। থোবড়াটা গামলার মতো। পরক্ষণেই নো মেমসাহেব। ওনলি দ্য ম্যাসিভ দাঁড়কাক। পীতাম্বর বিড়বিড় করতে লাগল,

—মিস্টিরিয়াস! ভূতিয়া চক্কর!

কমরেড আচার্য ফায়ার হয়ে গেলেন।

—ক্যানন্-ফ্যানন্ নিয়ে অ্যাটাক করছে, ক্যানন্ বলস্ পুলিশ ভ্যানের ছাদে নাচানাচি করছে,

নো ক্যাজুয়ালটি অথচ পুলিশেব মধ্যে ওয়াইডস্প্রেড প্যানিক, এসব শুনলে সি. এম. কী বলবেন আপনি ভেবে দেখেছেন?

জোয়াবদার দেখলেন মিনমিন করে হজম কবাব কোনো মানেই হয় না।

—দেখুন, স্ট্রেট-কাট্ বলে দিচ্ছি এবা যে সে এনিমি নয। এতো আব এস. ইউ সি-র মিছিল পাননি যে বেধড়ক লাঠি দিযে পেঁদিযে দিলাম। ব্যাপারটা সি এম কে বোঝান। আমাকে অন ডিউটি বিহেড করে দিল। কিছু করতে পেবেছেন আপনাবা? এখন ক্যানন চালাচ্ছে। এরপব ধরুন গাম্ করে একটা ওয়েপন অফ মাস্ ডেসট্রাকশন ঝেড়ে দিল। তখন কী করবেন?

—রাগ করবেন না কমবেড জোযারদার। রাগ করবেন না।

—সে না হয় না কবলাম। তবে ওই কমবেড ফমবেড না বলে মিস্টাবই বলুন। আই হেট কমিউনিজম্ অ্যান্ড দা বেডস্।

—কিছু একটা করুন। ফেস সেভিং কিছু একটা। মার্শাল ভদি যদি এইভাবে আমাদের হ্যাটা কবতে থাকে..

—দেখছি। এখন লাইন ছাড়ুন। ভাবতে দিন।

পীতাম্বরেব বিপোর্ট পেযে আবও দমে গেলেন জোয়ারদাব। ফ্লাইং বালতি এসে পুলিশ প্যাঁদাচ্ছে। সবখেলের উঠোনে মিস্টিবিযাস হোল। গত বাত্তিবের এরিয়াল বম্বার্ডমেন্ট। প্লাস ভবানীপুব থানায দুমদাডাক্কা।

নতুন একটা প্ল্যান কবলেন জোযাবদাব। এবাবে কালীঘাট-হাজবা সাইড থেকে নয়। এবাবে দেশপ্রিয় পার্কেব দিক থেকে ম্যাসিভ একটা কোর্স এগোবে। তার আগে শুধু ঠিক কবতে হবে ক্যানন কোন্ রুফ-টপে আছে।

ক্যানন যে রুফ-টপে ছিল সেখানে মেজব বল্লভ বক্সি তখন তড়কা-রুটি দিযে ওয়ার্কিং লাঞ্চ সেরে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে হাবকিউলিস রাম। গজা গত পুজোর ভাসানে সিদ্ধি খেয়েছিল। মিলিটারি রাম তাব বড়ই উপাদেয় লাগে। শেষে বলেই ফেলল,

—ছোট করে আর একটু ঢালুন না। মৌজটা ভালো করে জমতো।

—সে না হয় জমাইলাম কিন্তু এনিমি না সাবপ্রাইজ অ্যাটাক করিয়া বসে। মাল ঠাসা হইয়াছে তো?

—পুরো বেডি। বলবেন আর প্যাঁকাটি ধরিয়ে আগুন দেব।

—গুড! ভেবি গুড! যাও, পানি লইয়া আস।

গজা পায়খানার মগে করে জল আনতে গেল।

মেজর বক্সি ভাবলেন দুমিনিটের একটি শর্ট ন্যাপ্ মেরে দেবেন এই তালে। কিন্তু ব্যোমপথে বোঁ বোঁ শব্দের ক্রমবর্ধমান গুঞ্জরণ তাঁর সিযেস্তার প্ল্যানটি ভেস্তে দিল। সেই সঙ্গে দেশপ্রিয় পার্কের সাইড থেকে এগোবার পরিকল্পনাটিও ভোগে গেল। ওই প্রচণ্ড ঘূর্ণির শব্দ হল অসংখ্য নানা সাইজের চাকতির। ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে। এবং দিনের আলো থাকতে থাকতেই, চাকতির পালের ওপরে উড়ছে ফ্যাতাড়ুর দল। এবার শুধু মদন, ডি. এস, পুরন্দর ভাট নয়। ডি.এস-এর বউ, বাচ্চা, শালা জনা কেন আরও অনেক ফ্যাতাড়ু রয়েছে যাদের কথা কেউই জানত না। তারা মেজর বল্লভ বক্সিকে হাত নাডতে থাকেন। বল্লভ বক্সি আনন্দে 'ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই'-এর বিখ্যাত সিটি-সংগীতটি বাজাতে বাজাতে নাচতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে চাকতিব দুর্ভেদ্য বর্মের পাহারায় ফ্যাতাড়ুরা উড়ছে। এভাবেই ফাইটাররা বোমারুদের আগলে রাখে। দিনমানে এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য কলকাতার মানুষ দেখেছিল শুধু তাই নয়, সোৎসাহে দেখেছিল।

আকাশে যাই হোক যেমন টোটাল সোলার একলিপ্স্ বা রাতকাবার করে উল্কা বৃষ্টি—কলকাতার লোক দেখবেই। আর এ দৃশ্য তো স্বর্গীয়—উড়ন্ত চাকতি, তদুপরি উড়ন্ত মানুষ। ফ্যাতাড়ুদের নানাবিধ রণধ্বনি গগন মথিত করে তোলে যেন দৈববাণী হচ্ছে।

—ওয়ে ওযে, ওয়ে ওয়ে আঃ

—লায়লা, ও লায়লা।

—লিঃ লিঃ

—ছাঁইয়া, ছাঁইয়া ..

কানফাটানো শব্দ। বুদুম। টিগুম! বিভিন্ন রাস্তায় চলমান বা দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যানগুলো টার্গেট। পেটো বম্বিং শুরু হয়ে যায়। এবং দুর্গন্ধ এঁদো কাদা জলে ভবতি পলিব্যাগের বেলুন। এই সরব পরিস্থিতিতে নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে কলকাতার নানা মহল্লা ও পাড়াব ক্যাওড়ারা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ব্রেজিল বা ইন্ডিয়া-ব কাবণে যে বিপুল পরিমাণে চকোলেট বোম সব সময়েই মজুত থাকে সেগুলোও মওকা বুঝে ফাটানো শুরু হয়। টাকলা ও. সি দুহাতে কান চেপে ভ্যানের মধ্যে বসেছিল। ভ্যানের ছাদে তখনও নুনুকামানের গোলা ধডাক ধডাক করে লাফাচ্ছে।

বিস্ফোরণমুখর সেই কলকাতায় সন্ধ্যা ঘনাইতে শুরু করিল যদিও তাতে থেকে থেকে জ্বলে ওঠা ঝলক ছড়ানো ছিল। মেজব বল্লভ বক্সি বলিলেন,

—মার্শাল ভদির মাস্টার স্ট্রোক এখনও কমপ্লিট হয় নাই। এযার অ্যাটাক চলিতেছে। এবাবে অন্য খেলা। ফ্লেয়ার ছাডা করো। নুনুকামানের মুখ উঁচু করে তাতে একটি বড় হাউই বসিয়ে জ্বালানো হল। হাউইটি আকাশে উঠে গিযে ফেটে একটি আলোর গোল চাকতি হযে গেল।

কারফর্মাব বাড়ির ছাদ থেকে হাউইটিব ফেটে যাওয়া দেখে ভদি সরখেলেব ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে বলল,

—আকাশে থেকে প্যাঁদাব, ডাঙাতেও ছাড়ব না। সামলাও এবার।

ওই হাউই উড়ে গিয়ে গোল চাকতি হওয়াটা ছিল মোক্ষম সিগনাল। এবপরেই দেখা গেল ছোট কি বড়, রোড, লেন, বাইলেনের সব রাস্তাতেই ম্যানহোল খুলে যাচ্ছে। এবং তার গর্ত থেকে যাবা বেরিয়ে আসছে তারা চোখ ফুটো ফুটো শিরস্ত্রাণ পরা, গায়ে চকচকে বর্ম, হাতে নানা টাইপের খতরনাক মাল কিন্তু আবছা আলোয় ভালো বোঝা যায় না। রোমের হিংস্র সৈন্য বা আইভ্যান হো-র নাইট টাইপের। এই বাহিনীর আত্মপ্রকাশ পুলিশদের যারপরনাই আতঙ্কিত করে তোলে কারণ পেটো ও অন্যান্য পতনশীল জলীয় ও জলীয় নয় পদার্থের বৃষ্টিতে তারা নাজেহাল হয়েই ছিল। কাছে গেলেই বোঝা যেত যে এগুলো স্রেফ আলকাতরা মারা টিন—কোনোটা তেলের, কোনোটা বিস্কুটের। ভীতিপ্রদ এই নাইটদের ম্যানহোল থেকে বের করার পরিকল্পনাটি মেজর বল্লভ বক্সির। তাঁর আর একটি উদ্ভাবন হল মেথরদের নোংরা ফেলার বাতিল লজঝড়ে গাড়িতে ঝালাই করে পাইপ বসিয়ে সেগুলিকে সাঁজোয়া কামানের রূপ দেওয়া। একেই বলে সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ার। সকাল থেকেই নুনুকামানের দাপট পুলিশের মনোবল অনেকটা ভেঙে দেয়। খ-লোক থেকে নিরন্তর হামলা বাকিটা শেষ করে দিয়েছিল। সব খুইয়ে ফেলার পরেও ছিটেফোঁটা যদি কিছু থাকে সেটাও শেষ করে দিল নাইটবাহিনী ও সাঁজোয়া কামানের গুরু-গম্ভীর আবির্ভাব।

লাগাতার বম্বিং। তৎসহ চাকতির বোঁ বোঁ। কমরেড আচার্য জোয়ারদারকে ফোন করলেন, এই গোলযোগের মধ্যেই,

—কী বুজছেন মিস্টার জোয়ারদার?

—নো হোপ। খলখলে করে ছেড়ে দিচ্ছে।

—তাহলে বলছেন মিউটিনি থামানো যাবে না।

—রাতটুকু কাটলে হয়। ফোন রাখুন তো। আপনাদের ওই প্যাঁ পোঁ আর টলারেট করা যায় না।

কমরেড আচার্য ফোন নামিয়ে রাখলেন।

যে রাতটিকে ঘিরে অত ভয় ছিল জোয়ারদারের সেই রাতেই এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল যা পরিস্থিতির সামালের কারণ হয়ে ওঠে। এ কথা কে না জানে যে কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা কালবিলম্ব না করেই সদলবলে একটি ঘোষণাপত্র বা আবেদন বা ফাঁকা থ্রেট প্রকাশ করে থাকেন যাতে বড় থেকে ছোট, বুড়ো থেকে কেঁচকি, লেখক, শিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্র শিল্পী থেকে শুরু করে সকলেই সই দিয়ে নিজেরাও বাঁচেন অন্যদের বারটা বাজাবার রসদ যোগান। শুধু এই ধরনের আবেদনে বা প্রতিবাদপত্রে সই করেই অনেকে লেখক বলে নিজেদের পরিচিত করতে পেরেছেন। কেউই এই ধরনের ব্যাপারে সই দেওয়া থেকে বাদ পড়তে চান না। বাদ পড়ে গেলে খচে লাল হয়ে যান। অনেক সময় ফোনেই জেনে নেওয়া হয় যে নামটা দেব তো। এবং কিছু মাল আছে যাদের কিছু বলারই দরকার হয় না। আজ অবধি এরকম যত আবেদন বা প্রতিবাদপত্র বাজারে ছাড়া হয়েছে তা এক করে ছাপানোর প্রস্তাব কি উঠেছে? কেউ কি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন বা করার ইচ্ছে আছে?

যাইহোক, যে রাত্তিরের ভয় জোয়ারদারের ছিল সেই রাত ঘোর দড়াম্ দড়াম্ করে ফেটে যাওয়ার পর, পরদিন সকালে দেখা গেল প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই একটি আবেদনপত্র বেরিয়েছে,

'সরকার-বাহাদুর ও চোক্তার-ফ্যাতাড়ু যুগ্মশক্তির মধ্যে যে অ-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে তা আমাদের ঘুমে বড়ই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আমরা বহুদিন আগেই জেগে থাকা বৃথা, এই সিদ্ধান্তে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। এবং চারদিকে যা হালচাল তা স্বপনচক্ষে দেখে আমরা মনে করি যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ঠিকই করেছিলাম। তাই আমাদের সর্বসম্মত আবেদন এই যে দু পক্ষই একটি শান্তি আলোচনায় বসুক। এবং একটি এমন রফায় আসুক যাতে সাপও না মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। সংগ্রাম যেমন দরকার তেমন বিশ্রামেরও দরকার। শেষোক্ত প্রয়োজনটি আমাদের খুবই বেশি। আশীর্বাদ সহ,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি. কে. দাস, মিঃ প্যান্টো, মিঃ পি. বি, জি. এস. রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কুমার দাস, অমৃতলাল বসু, বিমলাচরণ দেব, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, গোপীনাথ কবিরাজ, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ্বর ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুরবালা ঘোষ, গিরীন্দ্রশেখর বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুখলতা রাও, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমেন্দ্রচন্দ্র কর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আত্মারাম সরকার, গঙ্গাগোবিন্দ রায়, আলী সরদার জাফরি, কৃষণচন্দর, রাধানাথ-শিকদার, হরিহর শেঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জন স্টুয়ার্ট মিল, ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, জোসেফ টাউনসেন্ড, কাহ্নুপাদ, ভুসুকপাদ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, মিখাইল

বাখতিন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ওয়েনার্র হাইজেনবার্গ, বিশু দত্ত, হরিহর সরকার, মিসেল ফুকো, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনদাস মণ্ডল, আলামোহন দাস, ভ্লাদিমির নবোকভ, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, নিগমানন্দ...'

উপরোক্ত আবেদনটি নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদেব মধ্যে পরে মতভেদ হবে। একদল বলবেন যে ওরকম কোনো আবেদনপত্র আদৌ প্রকাশিত হয়নি। অপবপক্ষেব দাবি হবে যে অবশ্যই হয়েছিল। কোনো পক্ষই জয়লাভ কববে না কারণ ওই দিনেব কোনো সংবাদপত্রই খুঁজে পাওযা যাবে না।

কিন্তু এই আবেদনটিই অবস্থার ভোল পাল্টে দিল। পরদিন সকালে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। রাত চারটের পর বম্বিং-ও কমে গিয়েছিল। সকালে দেখা গেল যে ম্যানহোল যেখানে ছিল সেখানেই গেঁড়ে বসে আছে। নাইট, ফলস্ সাঁজোয়া গাড়ি—সব হাওযা। আকাশও ফুবফুবে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষেপে এরকম। উভযপক্ষেব মধ্যে 'হেকটিক পার্লি' যাকে বলা হয তাই চলে। গোলাপ, তারকনাথ সাধু, নক্ষত্রনাথ হাওলাদার এবং বড়িলালও এই প্রচেষ্টায় জড়িযে পড়ে। আসলে উপরোক্ত আবেদনটি সকলেরই মনে প্রথমে নাড়া ও পরে দাগা দেয।

বেগম জনসন বাইবেল স্মরণ কবে বললেন,

—টাইম অফওযার যেমন হয় তেমন টাইম অফ পিস্-ও হইবে। লাইক দা ডে ফলোইং দা নাইট।

দাঁড়কাক বলেছিল,

—সবই আত্মারামের খেলা। দেড়শো বছর পবপব চাকতি নাচবে। এবাব তো ভালই নাচনকোঁদন হল। এবার গুটিয়ে নে।

ভদি গাঁইগুঁই করেছিল,

—বলচেন গুটোতে, গুটিয়ে নেব। তবে এটাও তো দেখতে হবে যে গুটোতে গুটোতে পিচি না বেরিয়ে পড়ে।

দণ্ডবায়স হাসিয়া উঠিল,

—বংশের আর কিছু না পেলেও মুখটা পেয়েচে। কার ছেলে দেখতে হবে তো!

একই কেস ঘটেছিল কমরেড আচার্যের বেলায়। তাঁকে ঝাড়লেন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সি এম,

—ব্রেসৎ-লিতোভস্ক্ ট্রিটির হিসট্রিটা পড়। বুখারিন তো চেয়েছিল জার্মানদের সঙ্গে গেরিলা ওয়ার চালাবে। লেনিন বুঝেছিলেন যে এ কাজ করলে তা হবে ডুবে মরার সামিল। ট্রটস্কিকে সেদিন লেনিনকে মানতে হয়েছিল বুঝলে? দরকার হলে সায়া পরে যাবে। স্টুপিডই থেকে গেলে।

কলকাতার মাঝবরাবর সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের লাগোয়া প্যারিস হলে এই ঐতিহাসিক আলোচনা বসে। পেপসি ও কোক—উভয়েরই ঢালাও সাপ্লাই ছিল। শান্তি আলোচনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না, এই মর্মেই শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তবে শেষ পাদে, মানে আলোচনার অন্তিম লগ্নে ইন্টারভেন করেছিলেন নগরপাল জোয়ারদার।

—সবই বুঝলাম মার্শাল ভদি। কিন্তু পীতাম্বরের রিপোর্টে সরখেলের উঠোনে যে ব্ল্যাক হোল্ তার রহস্যটা থেকেই গেল। ক্যালক্যাটায় এটা সেকেন্ড।

—সরখেল, তুমি বলবে? বলবে না। ঠিক আচে। আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিচ্ছি। সরখেলই আমাকে আইডিয়াটা দেয়। ষাট সাল না কবে যেন সোভিয়েট অ্যাকাডেমিসিয়ান কালিনিন না কে যেন বলেছিল যে কলকাতা তেলের ওপরে ভাসছে। পুরো কলকাতাটাই ইরাক। তাই সরখেল

আব আমি তেলেব জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম। এখানে কিন্তু একটা শর্ত থাকবে। নো খাবলাখাবলি কমবেড আচার্য ভদিব বক্তব্য নোট কবতে কবতে বললেন,

—বলুন, শর্ত বলতে আপনি, মার্শাল ভদি, কী বোঝাতে চাইছেন?

—এই যে তেল, যা বিক্রি কববে, তুলবে একটা কর্পোবেশন, একটা কোম্পানি, তাব চেযাবম্যান হব আমি, মার্শাল ভদি সবকাব।

কযেক লহমাব সাসপেন্স। সে সব স্টাব টিভি ও অন্যান্য টিভি কোম্পানিব ক্যামেবাতে তোলা আছে।

কমবেড আচার্য বললেন,

—তাই হবে মার্শাল ভদি।

—তাতে সব ফ্যাতাড়ু, সব চোক্তাব, প্লাস বলাই প্লাস সাক্ষী বড়িলাল সকলেবই চাকবি পাকা হবে।

—ইযেস, আই গিভ ইউ মাই ওযার্ড মার্শাল ভদি।

এই সমযে সি এন এন এব টিভি বিপোর্টাব প্রশ্নটি ছুঁড়েছিল,

—মার্শাল ভদি, এমনকি গ্যাবান্টি আছে যে আপনি সাদ্দাম হুসেন হযে যাবেন না?

(চলবে)

২১

খেল খতম। পযসা এখনো হজম হযনি।

বড়িলাল ও কালীব সম্পর্ক অব্যাহত বযেছে। জয হনুমান! জোযাবদাবেব মুণ্ডু জুড়ে গেছে। ওটা নগবপাল নিজেই খেযাল কবেননি। ললিতা জোযাবদাব নগবপালকে একদিন সকালে চমকে দিলেন, কিস্ খেযে,

—তোমাব ওই কামব্রাস্ ফ্রেমটা কাবাড়িওলাকে বেচে দিলাম।

—মানে?

—মানে, সিম্পল্। বেচে দিলাম। কাবণ তোমাব মুণ্ডু, বিহেডেড অন ডিউটি, জুড়ে গেছে।

—জুড়ে গেছে?

—ইয়েস মাই লাভ!

মেজব বল্লভ বক্সি আত্মগোপন কবেছেন। কোথায কেউ জানে না। শোনা গেছে যে আল্ জাজিবা টিভিতে তিনি একটি সাক্ষাৎকাব দিতে পাবেন।

ভদিব বাড়িব উঠোনে নিযমিত গালাপার্টি বসছে। মালমোহানা! নলেন থেকে থেকে পাদছে ও ফুট ফবমাস খাটছে। বেচামণি নাকি আবও খোলতাই, আবও ডবকা হযে উঠেছে। সবখেল মাটি তুলছে বালতি বালতি। ফ্যাতাড়ুবা বাংলাব ঠেকে বেগুলাব ভিজিট দিচ্ছে। এবং এব ওব পোঁদে লাগছে। প্রকাশ থাক,

খুলি নেচেছিল।

আনন্দবাজাবে যাদুকব আনন্দ-ব বিজ্ঞাপনও বেবিযেছিল।

তাহলে কী হযনি?

ওঁযা ওঁযা।

যদি না আদি বা মধ্যভাগে বুদ্ধিমান পাঠক বা পাঠিকা, পাঁঠক বা পাঁঠিকা, নানা টাইপের আধাখ্যাঁচড়া ঝটরপটর-সম্বলিত এই বোম্বাচাকটি বিরক্তি সহযোগে বাতিল না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার বা তাঁহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদন খতম হইল। নিংড়ে নিল। কোনো রাতজাগা পাখি বলছেনা না যেও না।

তবু সব ছাপিয়ে কেমন একটা মন কেমন করা, মন কেমন করা ভাব। এই ভাবটাই বজায় থাকে। কেন গা?

মনুমেন্টের ওপরে বুড়ো দাঁড়কাক বসেছিল। কলকাতাব পশ্চিমে সানসেটেব ঘনঘটা। তারই সোনালি ফোকাস বিশাল ডানার খড়খড়ে পালকে। দাঁড়কাক আপনমনে বলে উঠল,

—যাক্! 'কাঙাল মালসাট' বই হযে বেবিয়ে গেচে। যাই, বেগম জনসনকে খপবটা দিযে আসি।

বৃদ্ধ দণ্ডবায়স উড়িয়া গেল।

(চলবে না)

লুব্ধক

সাত ঘণ্টা, মাত্র সাতটা ঘণ্টা আব বাকি আছে। সাত ঘণ্টা মানে চাবশো কুড়িটা মিনিট। খুব একটা অভাবনীয় মাপেব কিছু নয়। মাত্র পঁচিশ হাজার দুশোটা সেকেন্ড। সময়-এর এই খণ্ড দৌড়ে পেরিয়ে যেতে একটা ঘুমই যথেষ্ট। তবে পুবোটাকে ঘুম বলা যাবে না। খুব সামান্য সময়ের জন্যে হলেও দু-একটা স্বপ্ন দেখতে হবেই। মোটেব ওপর সাত ঘণ্টার অপেক্ষা। আর ঘুমোতে যে হবেই বা ঘুম যে আসবেই এমন কোনো কথা নেই।

বিখ্টাব স্কেলে মাপা যায়নি যে ভূমিকম্পটা কত জোবালো ছিল। এব থেকে হাস্যকব কথা কী হতে পারে? আসলে এরকম কথা বলার কোনো মানেই হয় না। ঘেউ! ঘেউ! চার্লস এফ বিখ্টার তাঁব স্কেলটি বানিয়েছিলেন এই সেদিন। ১৯৩৫ সালে। আব ভূমিকম্পটা হয়েছিল ১৭৩৭-এ, মানে তাব প্রায় দুশো বছর আগে। লোক মারা গিয়েছিল ৩,০০,০০০। দিনটা ছিল ১১ অক্টোবব। ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরে ১৯৯৫ অবধি যে দুনিয়া কাঁপানো চুয়াল্লিশটি ভূমিকম্পের তালিকা করা হয়েছে তাতে কী অদ্ভুত, তাবিখের সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্যেই যেন ১১ নম্ববে এই ভূমিকম্পটিব কথা আছে। এই তালিকায় শেষ ভূমিকম্পটি হল ১৯৯৫-এর ১৭ জানুয়ারি, জাপানেব কোবে-তে, যাতে ৫,২৫০ জন মাবা যায়। সে যাই হোক, ১১ নম্বর ভূমিকম্প, যাতে তিন লক্ষ মানুষ মারা গিযেছিল সেটা হয়েছিল কলকাতায়।

তখন নিশ্চযই কলকাতায় এত লোক থাকত না। এত বাড়ি, সেতু, স্তম্ভ, মিনার, মেট্রো—এসব তো কিছুই ছিল না। তাহলেও অত লোক থাকত যে মরেই গেল তিন লক্ষ। আর একটা তো শহরে নিশ্চয়ই শুধু মানুষই থাকে না। যেমন এখনকাব কলকাতায চিড়িয়াখানার প্রাণীদের বাদ দিলেও যে অসংখ্য না-মানুষ প্রাণীদের আমরা দেখতে পাই তারাও নিশ্চয়ই ছিল। যেমন কুকুব, গরু, ছাগল, বেড়াল, কাক, চড়াই, চামচিকে ও আরও কত প্রাণী। ভূমিকম্পই হোক, বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনাই হোক বা মহামারী অথবা শান্ত সময়েও কোনো পারমাণবিক অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজের দুর্ঘটনাই হোক—মানুষের বেলায় ঠিক হোক, ভুল হোক, মোটের ওপর একটা হিসেব থাকে। প্রাণহানি বললে কী বোঝায়? নিশ্চযই মানুষ। অনেক সময় বাসের ভেতরে লেখা দেখা যায়—সময়ের চেয়ে জীবনের দাম বেশি। কার জীবনেব দাম বেশি সেটা এর চেয়ে খুলে বলার দরকার হয় না। কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা জানাই থাকে। জানা ব্যাপারটাই জানানো হল। সকলেই জানে কিন্তু বড় বড় করে লেখাও থাকে। কেন এরকম করা হয়? যে সাত ঘণ্টা বাকি আছে সে-সময়টা না ঘুমিয়ে এরকম কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যায়। এর মধ্যে সকলেই একটা কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়া নিস্তব্ধতা সম্বন্ধে এখনও বোধহয় সচেতন হয়নি। অথচ একটু খেয়াল করলেই জানা যাবে যে শহর শব্দময় হলেও তার মধ্যে কুকুরের ডাক নেই। চাকার শব্দ, পিস্টনের শব্দ, ইঞ্জিনের শব্দ, ফোনের শব্দ, টায়াব বা গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটার শব্দ, টেলিভিশনের চেনা চেনা কণ্ঠস্বর, চলন্ত গাড়িতে স্টিরিও বাজার শব্দ, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ, শরীরে শরীর ঘষা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার রবার-ববার শব্দ, দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ, চুল্লিব দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, বঁটি ধোওয়ার শব্দ, খাওয়ার শব্দ, নিঃশব্দ ছাপা শব্দ, শবদেহ নিয়ে যাওয়া জানানোর শব্দ, ট্রামেদের গুমটিতে ফেরার শব্দ, টিউব আলোর তোতলাতে তোতলাতে জেগে ওঠার শব্দ, এক হাতওয়ালা টিউবওয়েলের জল ডাকার শব্দ—সব

যেমন থাকে তেমন রয়েছে। কিন্তু কোনো কুকুরের ডাক নেই, কোনো গাড়িতে ধাক্কা খাওয়ার পবে তার রেশ রেখে যাওয়া আর্তনাদ নেই, ককিযে কান্না নেই। কুকুরেব কোনো শব্দ নেই। কুকুর নেই। নাকি আছে অথচ ডাকছে না। সাত ঘণ্টা সময হাতে। এটা নিয়েও খোঁজ খবব করা যায়। কুকুরগুলো সব কোথায় গেল? ফুলরা কোথায় যায, ফুলকুড়ানি বালিকারা কোথায় যায়, তারা যে তরুণদের দেখে মুগ্ধ হয় তারা কোথায় যায় এবং তারা যে কবরে যায, সে-কবর আবার ফুলদল হয়ে যায় এসব নিয়ে যে গান বেঁধেছিল সেই বুড়োটা বলতে পাববে? কোথায গেল কুকুরেরা?

এমনকি হ‘ পরে যে কুকুবদেব ল্যাজে তাবাবাজি বেঁধে দেওযা হয়েছিল। তাতে মজা পেয়ে তাবা আকাশে ছুটে গেছে লাফাতে লাফাতে আব রাতের শূন্যে তাকিয়ে আমরা সেইসব তারাবাজিব গমনাগমন বা পুড়ে নিঃশেষ হযে ল্যাজ থেকে খসে পডা বা অনেকক্ষণ, অনেক যুগ, অনেক আলোকবর্ষ ধরে জ্বলতে থাকা দেখছি তো দেখছিই। আরও সাত ঘণ্টা ধবেও দেখে যাওয়া যায়।

অচেতন করে বেশ ধারালো অস্ত্র বা করাত দিয়ে যদি কুকুব চেবাই করা হয তাহলে খুব একটা শব্দ হবে কি? করাতকলে দাঁডিযে যাবা গাছের গুঁড়ি চেবাই দেখেছে, দেখেছে ঝুরঝুব করে কাঠের গুঁড়োয় মাটি ঢেকে যেতে, তাবা কি এত সূক্ষ্ম, এত সম্মোহিত শব্দ শুনতে পাবে? অচৈতন্য কুকুরদেব চেরাব শব্দ? ফাঁডার শব্দ! তারপব আবও সূক্ষ্মতব বিশ্লেষণেব শব্দ। এব আগেই তো আকাশগঙ্গাব কথা হচ্ছিল যেখানে মহাকাশযানে লাইকা-কে পাঠানো হযেছিল। সেখান থেকে আমরা ইথাব ও বক্তের গন্ধমব কুকুব ব্যবচ্ছেদেব টেবিলে কীভাবে এলাম? কীভাবে এলাম, লাইকা? কীভাবে এলাম স্ত্রেলকা, বেল্‌কা? কীভাবে?

আমরা বরং এই রক্ত ও ইথাবে মাখামাখি টেবিল ছেড়ে আকাশের ফুটো ফুটো তেবপলের নিচেই একটা বিকট দুর্গন্ধময় জায়গায় যেতে পারি, যার নাম, পিঁজরাপোল। অভিধানে বলা আছে যে পিঁজরাপোল হল—‘অকর্মণ্য গরু, ঘোড়া প্রভৃতির জন্য বৃহৎ পিঞ্জরাকারে ঘেবা স্থান।’ সেখানে রাতে যায় রাত্রিচর রাক্ষস, চোর, প্যাঁচা বা বেড়াল। বৃষ্টি এখানে মৃত কুকুরদেব পচাতে ও ফুলিয়ে ওঠাতে সক্রিয় হয়েছে, যেমন হয়েছে রোদ, ভ্যাপসা বাতাস, মাছি, মূষিক ও জীবাণু। এখানেই জন্মানো ও এখানেই মরে যাওয়া ওই কুকুর-শাবকটিকে দেখ যার চোখও ফোটেনি। এখন সে কিছুটা তুলোটে অবয়ব-এর। দেখ যে, পিঁপড়েরা তার চোখের বন্ধ, না ফোটা আস্তবনটি খেয়ে নেওয়াব ফলে তার চোখ খুলেছে। বড়ই অকিঞ্চিৎকর ওই ক্ষুদ্র একটি মৃত চোখ, যা ঘোলাটে। এইবার দেখ যে, সেই চোখে যার ছায়া পড়েছে, তার নাম মহাকাশ। ওই একটি মৃত চোখ বা দর্পণের বিন্দু ধরে রেখেছে ছায়াপথ, দূরে অপসৃয়মান গ্যালাক্সি, ক্রতু, পুলহ, শিশুমার তারামণ্ডল ও কত না ধূমকেতু ও বেকার, নিষ্প্রাণ কৃত্রিম উপগ্রহ। আরও আছে। কালপুরুষের দক্ষিণ-পূর্বে তাকাও। ক্যানিস মেজর বা বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের দেখা পাবে। এরই মধ্যে দেখ কী সুন্দর ওই আকাশের উজ্জ্বলতম তাবাটি। ওরই নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস। যারা নক্ষত্র-চর্চা করে তারা জানে যে ১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টায় ও ১ নভেম্বর ভোর ৪টে নাগাদ লুব্ধক মধ্যগমন করে। তার কী ইচ্ছা তা আরও সাত ঘণ্টা পরে জানা যাবে। তার নির্দেশ জারি করা হয়ে গেছে। যা আর ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তবে এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে।

পিঁজরাপোল একটা নয়। এবং একটির ভেতরেই কম করে একশো সতেরোটা কুকুরের শবদেহ গুনে ফেলা যায় যার মধ্যে ওই চক্ষুষ্মান শাবকটিকে না ধরলেও চলবে। বিভিন্ন বিচিত্র

ভঙ্গিতে তারা পড়ে আছে। কারও গলায় ছেঁড়া দড়ি পরানো। কেউ বুড়ো। কেউ জওয়ান। কেউ প্রথমবার মা হতে যাচ্ছিল। এখন কৃমির খাদ্য। আরও সাত ঘণ্টা তাই থাকবে। চূড়ান্ত মুহূর্তে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে কেউ কামড়াতে গিয়েছিল। কেউ শেষবাব থাবা তুলেছিল। কেউ থাবা গুটিযে নিয়েছিল। কেউ মরে যাওয়ার পরে শান্ত, ঘুমন্ত চেহাবা নিয়েছিল। পিঁজিরাপোল আপাতত ধৃত কুকুরদের মৃত্যুভূমি হয়ে অন্যান্য পিঁজিবাপোলের মতোই শবস্তব্ধ হয়ে থাকুক। মহাকাশ থেকে দেখলে এই কলকাতাকে একটি অতিনগণ্য তারাপুঞ্জ বলেই মনে হবে। অন্তত সাত ঘণ্টা দূর থেকে দেখলে তো বটেই। অন্ধকাবের ধাওযা খেযে কিছু দুর্বল জোনাকি এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। এই অবশ আলোর ঘেঁষে থাকা দেখতে থাকলে একসময় ঘুম নেমে আসে। এবং সেই ঘুম সাত ঘণ্টা ধবেও চলতে পারে।

তবে একটা কথা স্বীকাব না করে উপায় নেই। একাধিক পিঁজিরাপোল ঘুবে ঘুবে সব কটি কুকুরের শবদেহ লক্ষ করলে দেখা যাবে আগে যে বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে তা মোটেও সাধাবণ চিত্র নয়। অনেক কেন, বেশিরভাগ কুকুরই অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে কুকুবদের অসহাযতা শেখানো যায়। আমবা শাটলবক্স পরীক্ষার কথা জানতে পাবি। শাটলবক্স হল একটি দু-ভাগে ভাগ কবা বাক্স যার মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটি অস্বচ্ছ বাধা বা বিভাজিকা থাকে, যার উচ্চতা, ধরা যাক, এক কুকুর। শাটলবক্সের মেঝেটি ধাতব। সেখানে তীব্র ইলেকট্রিক শক্ দিলে কুকুরটা লাফায় এবং বাধা টপকে বাক্সেব অন্য অংশে চলে আসতে পারে, যেখানে মেঝেতে বিদ্যুৎ থাকে না। কিন্তু কুকুরটি যে নিরাপদ অংশে এল সেখানেও বিদ্যুৎ শক্ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এরকম হলে কুকুরটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। এবার অস্বচ্ছ বাধাটি সরিয়ে যদি উঁচু একটা কাচ লাগানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে কুকুরটা লাফিয়ে কাচের গাযে আছড়ে পড়ছে। অজান্তে বিষ্ঠা বা মূত্রত্যাগ করা, চেঁচিয়ে বা ককিয়ে ডাকা, কম্পন, বাক্সের গাযে কামড়ানোর চেষ্টা—এরকম অনেক কিছুই তখন দেখা যাবে। কিন্তু দেখা গেছে যে এক নাগাড়ে দশ-বারো দিন এই পরীক্ষা চালিয়ে গেলে কুকুরটি আব লাফাবার বা পালাবার চেষ্টা করে না। এইভাবে তাকে অসহায়তায় শেখানো যায়। কুকুরেরা এই ভাবেই অসহায়তা শিখে নেয়। পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে কুকুরেরা হাল ছেড়ে দেয় এবং চুপটি করে শক্ মেনে নেয়। এইভাবে কুকুরেরা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, অসহায়তা মেনে নেওয়া শিখে ফেলা যায় ও শেখানো যায়। কুকুর-উপকথায় যেহেতু কুকুবদেরই আনাগোনা বেশি, তাই বলে রাখা দরকার, যে অসহায়তা শেখানোর পরীক্ষায় শুধুমাত্র কুকুরদের ওপরেই পরীক্ষা চালানো হয়নি, অন্যান্য প্রাণীরাও ছিল—যেমন ইঁদুর ও গোল্ডফিশ।

শাটলবক্স একটা জোটাতে পারলে হাতেনাতেই পরীক্ষা কবে জেনে নেওয়া যেতে পারে যে সত্যিই অসহায়তা শেখানো যায় কি না।

হাতে তো এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে। ঘেউ! ঘেউ!

২

ধারালো চাঁদ ঝলসায় রাতের গলায়
প্ল্যানেটেরিয়ামের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে
তখন দারুণ জ্বর
অন্ধকার ফাঁকা ময়দানে
একটা ট্রাম টাল খায়
আচমকা চলে গেল পুলিশভ্যান
ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে চমকে দিয়ে
রোজ চমকে দেয়।

প্রথমেই উঠবে একেবারেই যা অলৌকিক নয় সেই কান গজিয়ে ওঠার ঘটনাটি। কলকাতা যতই মৃত চাকর-বাকর সমতে হৃষ্টপুষ্ট ও সেলফোনবাহী নিত্য যোগাযোগের মমি ও বেলুনদের শহর হয়ে উঠছে ততই এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনাও বাড়ছে। চারটি চাকার শূন্যের অর্থাৎ ০০০০-র ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ঝকঝকে মোটরগাড়ি যার ভেতবে মৃত মুখে প্রসাধন ও কলপ গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ছেঁড়া ও তাপ্পি-লাগানো ঘুড়ি যেমন বাতিল হয়ে গেলেও তারে আটকে কঙ্কালের মতো মরা-হাত নাড়ে তেমনই বেঘর বেপাত্তা হয়ে রয়ে গেছে যেই রোগা-প্যাঁটকা বা অপুষ্টিতে ফুলে যাওয়া পার্ট-নাম্বার, সিরিয়াল-নাম্বার, রেশন কার্ড, হাসপাতাল থেকে দেওয়া নোংরা চিরকুট, বেফয়দা দস্তাবেজ ও দমকা ঝড়ের লাঠিচার্জে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকা পলিব্যাগ ও মুড়ির ঠোঙারা, কাদা-মাখা পালক ও হ্যান্ডবিল। এসব অগুনতির কোনো হিসেব নেই।

এই কুকুরটার রঙ কালো, যদিও তার সামনের বাঁ-দিকের থাবাতে কিছুটা জায়গা সাদা লোমে ঢাকা ছিল। ওর নাম দেওয়া যাক কান-গজানো। কেন এই নাম সেটা একটু পরেই জানা যাবে। কান-গজানো কোনো সাহসী কুকুর ছিল না। নেহাতই ভীতু স্বভাবের একটি মেয়ে-কুকুর যার একবার পাঁচটা জ্যান্ত আর একটা মরা বাচ্চা হয়েছিল। দুটো বাচ্চা চুরি হয়েছিল। সে দুটো তো মরেনি! দুটো গাড়ি চাপা পড়ে। একটাকে ছোট থাকতেই শকুন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর বাকি দুটো চুরি হয়ে যায়। এর ফলে একটা আস্ত শীতকাল কান-গজানোর কান্না থামেনি। গোড়ার দিকে কান্নাটা বিঁধতে না পারলেও ভেসে বেড়াত। পরে সয়ে যাওয়ার ফলে আলাদা করে আর চেনা যেত না। আক্ষরিক অর্থে 'সন অফ আ বিচ্' বলে একটাও থাকল না। অন্তত সে-বার। এদিকে প্রত্যেকটা স্তন দুধে ফেটে পড়ছে। কিন্তু সবই সয়ে যায়।

কুকুররা কতদিন তাদের মৃতদেহ স্মরণে রাখে বা রাখতে পারে এ নিয়ে হয়তো-বা কোনো গবেষণা হয়েছে। না-হওয়াটাই বরং অসম্ভব। যাই হোক, সেই কালো, কাফ্রি কুকুর-মা একটা একতলার ফ্ল্যাটের গ্রিলের বাইরে একদিন খাবারের গন্ধ পেয়ে অথচ খাবার খুঁজে না পেয়ে ঘাস সরিয়ে সরিয়ে সন্ধান করছিল। ঘাসে যে ছোট্ট ছাই ছাই রঙের প্রজাপতিরা থাকে তারা পালাল। উড়ে গেল পিঠের ওপরে দুই ডানা জোড়া রোগা পরীর মতো কাঠি-ফড়িং। উড়ে গেল গঙ্গা-ফড়িঙের বাচ্চারা যারা জন্মেই হাইজাম্প প্র্যাকটিস শুরু করে। গন্ধটা রয়েছে কিন্তু খাবারটা নেই কেন—এই ব্যাপারটা নিয়ে কুকুর-মা যখন তন্ময়, তখন গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তার মাথার ওপরে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। সহসা ঝাঁকুনি দিয়ে পিছু হটেছিল বলে

অ্যাসিডটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস্ করে রাগী ধোঁয়া বের করে, লোমের ওপর পিছল খেয়ে একটা কানের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল। এবং কানটা গোড়ার দিক থেকে গলে যেতে থাকে।

চিল-চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকা অ্যাসিড-আক্রান্ত কুকুরীটি তখন একদিকে মাথা হেলিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দৈবক্রমে একটি জল-জমা কাদা-জায়গা দেখতে পায় এবং সেখানে গলে যেতে থাকা কানটি কাত হয়ে শুয়ে ডুবিয়ে দেয়। সেই পচা কাদাজলের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণশক্তি ছিল। সিক্ত, শীতল আরাম ছিল। অবশ করে দেওয়াব কুহক-মন্ত্র ছিল। ঘাস ও নানাবিধ উদ্ভিদের ওষুধ ছিল। সর্বোপবি আশ্রয় দেওয়ার একটি কোল ছিল। বস্তুত এমন জায়গাতেই কাদাজল জমে যেখানে ভূপৃষ্ঠ কিযদংশে অবতল। ঘেউ! ঘেউ!

এরপর লোম-ওঠা, কান-গলা, খোবলানো জায়গাটা দেখতে এমনই হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতি যে-পুরুষ-কুকুরদের টান, তাবাও তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু নানা মাত্রার প্রাণের অন্তর্বিষ্টি ক্ষমতা এক জাদু-বাস্তব। লোম ক্রমে ঢেকে ফেলল জায়গাটা। তারপর যেমন গাছের ফেকড়ি বেরোয়, তেমনই উঁচু হয়ে উঠল। এবং বর্ষার জলে কেমন করুণা রয়েছে যে ধীরে ধীরে অন্যটার চেয়ে একটু ছোট মাপের হলেও, মানানসই গোছের একটা কানও গজাল। এই জন্যেই তার নাম কান-গজানো। ওব সঙ্গে পরে আবার দেখা হবে।

কুকুরদের বিরুদ্ধে পর পব যে-ঘটনাগুলো কয়েক দিনেব ফারাকে ঘটেছিল সেগুলো স্বল্পপরিসরে জানবাব আগে এটাও মনে বাখা দবকার যে, সব ঘটনার পরিণতি কান-গজানোর মতো আনন্দেব নয়। ঘটনাব ওপরে কুকুর উপকথাব মতো আলটু-ফালটু জিনিস যারা লেখে তাদেব কোনো হাত থাকে না। যাবা এসব ছাই-পাঁশ পড়ে তাদের বরং থাকলেও থাকতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা নির্দিষ্ট একটি জাযগায ঘটেছিল। যাদবপুর থানা থেকে আনওয়ার শাহ্ রোড ধবে কেউ যদি লেক গার্ডেন্স বা নবীনা সিনেমাব দিকে যায তাহলে ঠিক একটা স্টপের মাথায় ডানদিকে একফালি মাঠ পডে যার পেছনে হল ই.ই.ডি.এফ। এই মাঠে বেশ বড় একটা পুজো হয়। খেলাও হয়, ভালো ম্যাচ-ট্যাচ থাকলে বাস্তায বেশ ভিড়ও জমে যায়। এই মাঠের উল্টোদিকের ফুটে যে চায়ের দোকান আছে সেখানে সাদাটে থাকত। সাদা হযতো আগে ছিল কিন্তু তখন চোখে পড়েনি। চোখে যখন পডল তখন অনেক কিছু ঘটে গেছে।

দুপুরবেলা। চড়া রোদ্দুরে পিচ নরম। এতে থাবা না-আটকে গেলেও নখের ছাপ পড়বে। সিমেন্ট জমে যাওয়াব পরে এরকম ছাপও অনেক সময় থেকে যায়। খেযাল রাখলে চোখে পড়বেই। সেই রোদ্দুরের তাতে ঝলসাতে ঝলসাতে সাদা একটা অ্যাম্বাসাডার, ডব্লিউ বি ওয়াই নম্বরের, কম করে ষাট কিলোমিটার জোরে আসছিল এবং সাদাটে তখন রাস্তা পেরোচ্ছিল। সাদাটে ছিল রোগা, হাড়-জিরজিবে, নিরীহ ও রাম ভীতু। গরমে মাথা গুলিয়ে যায়। সাদাটেরও বোধহয় সে-রকম কিছু হয়ে থাকবে। তা না হলে সে প্রায-শব্দহীন ও আগুয়ান গাড়িটাকে লক্ষ করেনি কেন, যার মধ্যে বাজনা বাজছিল কিন্তু চালক বাদে কেউ ছিল না।

স্টিয়ারিংটা বাঁদিকে সামান্য একটু কাটালে এটা হত না। এমনও নয় যে বাঁ-দিকে কোনো গর্ত বা গাড়ি বা সাইকেল কিছু ছিল। একটা ছোট্ট মোচড় যদি স্টিয়ারিং-এ পড়ত তাহলে গাড়িটার সামনের ডানদিকের বাম্পার থেকে সাদাটের মাথার দূরত্বটা ফুট দেড়েক বেড়ে যেত। এবং সামনে দিয়ে দুধ-সাদা চকচকে হলকাটা চলে যাওয়ার পরে সাদাটে হয়তো বুঝতে পারত যে কী হতে যেয়েও হল না। কিন্তু সাদাটে যে ডানদিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে আসছে সেটা তো অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। সাদাটে যে-গতিতে আসছিল সেটা মোটেই দ্রুত নয়, অতএব বেশ কিছুটা সময় ধরেই তাকে দেখতে পাওয়ার কথা।

গাড়িটার ওজন ও গতি গুণ করলে যা হয়, তার সঙ্গে সাদাটের ভীতু ও সর্বদাই নিচু মাথাটিব ধাক্কা খাওয়ার শব্দটি, দুষ্টু বুটের চাপে ফাঁকা ফ্রুটির বাক্স ফাটার মতোই। গাড়িটা এত জোরে চলে যায় যে, অত সুন্দর মোমপালিশ করা গায়ে ঘিলু বা রক্ত ছিটকে লাগল কি লাগল না বুঝেই ওঠা গেল না। উঁচু, বাঁধানো রোড-ডিভাইডারের ওপারে ছিটকে গিয়েছিল সাদাটের দেহ। মাথাটা ছত্রখান। পেছনের পা দুটো কয়েকবার টান টান হল, গুটিয়ে গেল, আবাব টান হয়ে কয়েকবাব থেমে থেমে কাঁপতে কাঁপতে চুপচাপ হয়ে যাওয়ার, নিঃসাড হযে যাওযার দিকে এগোয়। গাড়িটা দয়া করে একটু যদি বাঁদিকে কাটানো যেত, স্টিয়ারিংটা বাঁ-হাত দিয়ে একটু আলতো, প্রায় না-ঘোরার মতো বাঁ-দিকে যদি সামান্যতম ঘুবত—কিন্তু এটাও তো হতে পারে যে, সাদাটেকে লক্ষ্য কবা হয়েছিল এবং সেইমতোই গাড়িটা চালানো হয়েছিল যে, ঠিক সময়ে ঠিক ব্যাপাবটা ঘটে। এখানে কাকতালীয় কিছুই হয়নি, সবটাই স্পষ্ট, কাকজ্যোৎস্নার মতো ম্লান বোধহয় নয়। গাড়িটা হয়তো তার ওপরে যে লঘুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই বাধ্য যন্ত্রেব মতো পালন করেছে। ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক যেমন তার কাজ করে বা বিমান থেকে বোতাম টিপলে বোমা।

তিন নম্বর ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তর কলকাতায়। পাঁচমাথার মোড়ের কাছেই। ওখানে পাটকিলে একটা মায়ের চারটে বাচ্চা বেশ ভালোভাবেই বড় হচ্ছিল। দশদিনেব পর যথারীতি চোখও ফুটেছিল। কলকাতায় তখন কলকাতার আন্দাজে বেশ শীত। কুকুরছানাগুলোব তখন তিন সপ্তাহ হয়েছে, অর্থাৎ তারা টলমল করে হাঁটতে পারে। একটু ডাকতেও পারে। খুব ভোব। একজনেব ওপরে একজন চড়ে একটা জীবন্ত গরম পিরামিড বানিয়ে ওরা ঘুমোচ্ছিল। পাটকিলে তখন সেখানে ছিল না, যদিও একটু পরেই সে ফিরে আসে। ওদের গায়ে এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হয়। ভিজে চুপসোনো বাচ্চাগুলো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে। কাঁউ কাঁউ কবে সরু কান্না জানায়। কিন্তু পরে, রোদ ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে হিমঠাণ্ডা জলেব সেই ধাক্কা তারা খুব একটা গায়ে মাখেনি। বরং এ-ওকে যথারীতি কামড়াচ্ছে, জড়াজড়ি করে খেলা করছে এবং মা এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুধ খাওয়ার জন্য। বালতির ঠাণ্ডা জলে কাজ হল না দেখে বেশ কিছুটা দূর থেকেই বাচ্চাগুলোকে লক্ষ্য করে একটা আধলা, কোণা-ভাঙা ইট ছোঁড়া হয়। ইটটা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাটকিলে অনেক ইট-ছোঁড়া দেখলেও তার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এবারের এই এত বড় ইটটার উড়ে আসা এবং ফুট খানেক দূরে ফুটপাথে চিড় ধবিয়ে আছড়ে পড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট একটা সংকেত, একটা ইঙ্গিত রয়েছে। যে-দিক থেকে আধলা ইটটা এসেছিল, সে-দিকে লক্ষ্য করে পাটকিলে কয়েকবার রাগী গলায় ডাকল। তারপরই কুঁই কুঁই শব্দ কবতে করতে বাচ্চাগুলোকে শুঁকতে লাগল। কিন্তু পাটকিলে এখানে আব থাকেনি। চারটে বাচ্চা নিয়ে সে ওখান থেকে চলে যায়। বরাবরের জন্যে। কোথায় সেটা পরে জানা যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে কোনো মিল কি ধরা পড়ে? নিশ্চয় পড়ে। এবং যোগসূত্রটা যে অশুভ সেটাও ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এরপরই শুরু হয়ে গেল কলকাতাকে কুকুর-শূন্য করার সর্বাত্মক অভিযান, কারণ নতুন সহস্রাব্দে নতুন সাজে যে মহানগরী মায়ারাক্ষসীর মতো সাজছে, সেখানে কুকুরদের কোনো জায়গা থাকতে পারে না। এটা যখন ঘোষিত নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন, সম্মতি ও শিলমোহর অর্জন করতে থাকে তখন এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি শিবির সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেছিল যদিও কোনো লাভ হয়নি। এক হচ্ছে, জীবদের প্রতি নির্মমতার বিরুদ্ধে যে-সংগঠনগুলি সক্রিয় এবং দু-নম্বর হল, নানা দামের জলাতঙ্ক-প্রতিরোধক ওষুধ যে সব কোম্পানিগুলি বানায়। পৃথিবীতে

এমন কোনো পরিকল্পনা হতে পারে না, তার মেয়াদ যাই হোক না কেন, যাতে সব পক্ষকে খুশি করে কাজে নামা যায়। এবং এই পরিকল্পনা কোনো ব্যক্তি বা দল বা দলের জোট যেই নিক না কেন কিছু এসে যায় না। প্রথমত, সবপক্ষের কথা শুনলে চলে না বা শোনা হয় না। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাটি চালু হবার পরে তাব নিজস্ব ভরবেগে চলতে থাকে। এবং তৃতীয়ত, এ-রকমও হতে দেখা গেছে যে পবিকল্পনাটি লাগামছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটছে, সামনে যা কিছু পড়ছে তা হ্রেষায় ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে উড়িযে দিচ্ছে এবং পরিকল্পনা যাবা করেছিল তারাই সেই ঘোড়ার ছুটন্ত পায়ের লাথিতে ছিট্‌কে পড়ছে, নাল-বাঁধানো ক্ষুরে তাদের চশমা ও ক্যালকুলেটার চৌচিব হয়ে যাচ্ছে এবং ধুলোর ঝড় উঠে দশদিক আড়াল করছে, যাকে আসন্ন সন্ধ্যা বলে ভুল কবে পাখিবা বাসায় ফিরে আসছে। দিনকে বাত ও রাতকে দিন বানাবার এই ম্যাজিক, পরিকল্পনার আওতাতে পড়ে। নিছকই যা ম্যাজিক, ভেলকি বা ভোজবাজি, তার পেছনেও কিন্তু বজ্রকঠোর পবিকল্পনা থাকে। অপরিকল্পিত আলৌকিক বলে কিছুই সম্ভব নয়। এই নিয়ম মেনেই কুকুর-খেদা অভিযানে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

'আমরা কি এই সত্যটি মানুষেব ক্ষেত্রেও প্রযোগ কবতে পারি? কেন পারা যাবে না? মানুষ আর কুকুবের মধ্যে স্নায়বিক ব্যবস্থাব প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে আমার মনে হয় না যে, মানুষের পক্ষে এটা অপমানজনক বলে মনে হবে। আজ জীববিদ্যায় আমবা যে শিক্ষালাভ করেছি তার পবিপ্রেক্ষিতে কেউই এই তুলনা টানার বিরুদ্ধবাদী হতে পারে না।'

ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ।

৩

'বারবাব থেমে, খুবই জঘন্য একটি গেরিলা পবিক্রমার পর, কাকভোরে আমরা একটা জঙ্গল পেলাম যার ধারেকাছেই কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল।'

চে গুয়েভারা'র দিনলিপি
৫ অক্টোবর, ১৯৬৭

কুকুর খতম করাব একাধিক পরিকল্পনা করার মধ্যে মধ্যে ছুটির দিন বা রবিবারের ফাঁক ছিল, যার মানে গাড়িঘোড়া কম। সে সময় কয়েকটি কুকুরকে খুবই ব্যস্তভাবে শহরের বিভিন্ন দিকে ধাবমান হতে দেখা যায়, যদিও সে গতি ঠিক স্বল্পপাল্লার দৌড়ের মতো ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং দূরপাল্লার দৌড়বীরদের পদ্ধতিতে, কখনও গতি বাড়িয়ে, কখনও কমিয়ে, আবার বাড়িয়ে...এবং সে সময় সেই কুকুরদেব মুখমণ্ডলের কোনো উৎফুল্লতা, চড়া মেজাজ বা বিষাদের লেশমাত্র দেখা যায়নি। তারা মোটের ওপর রাজপথ, থানা, স্কুল, রাজনৈতিক দলের দপ্তব, ক্লাব ইত্যাদি এড়িয়ে গলিপথ, ফাঁকা উঠোন, বস্তির মধ্যের অপ্রশস্ত রাস্তা, গাড়ির তৈলাক্ত স্বেদে ভেজা কালো মাটির চত্বর, জবাই করা মুরগির পালক ও পেঁয়াজের খোসা ছড়ানো-ছেটানো বাজারখোলা, হাসপাতালের পেছন দিকের নোংরা রাস্তা যেখানে কাটা প্লাস্টার, রক্তমাখা তুলোও বিবর্ণ ব্যান্ডেজের মধ্যে শিশুদের খেলার শব্দ ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের অপেক্ষা মিশে থাকে—এইসব এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রত্যেকটা জায়গাতেই সেখানকার কুকুরেরা নিজস্ব অধিকার কায়েম করে বাস করে। তাদের সঙ্গে এই গতিয়ান কুকুর-দূতদের চোখাচোখি বা কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা

বিনিময় হয় অথচ কোনো কলহ হয়নি। কুকুরদের ক্ষেত্রে এ রকম সচরাচর হয় না। কোনো কুকুর-দলই তাদের এলাকা বা অঘোষিত সীমানার মধ্যে চেনা বা অচেনা কুকুরদের আগমন মেনে নেয় না। কুকুরেরা জেনে গিয়েছিল যে কলকাতা আর তাদের চায় না।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-১

কালক্ষেপ করা ঠিক হবে না। কুকুরদের গুলি করে মেরে ফেলা হোক।

বিরুদ্ধে মত

সম্ভব নয়। বুলেটের দাম আছে। দ্বিতীয়ত, বন্দুকের শব্দ পবিবেশেব পক্ষে ক্ষতিকর। তৃতীয়ত, এ ধরনের অভিযান রাতেই চালানো সম্ভব, কিন্তু বন্দুকধাবীরা তখন মদ্যপ অবস্থায় থাকে, ফলে গুলি অন্য কোথাও লাগতে পারে। চতুর্থত, আমাদের কুসংস্কারময় দেশে এ কাজ করতে অনেক বন্দুকধারী রাজি নাও হতে পারে।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-২

রাতের প্রথম প্রহরে বিষ মেশানো মাংস ছড়িযে দেওয়া হোক। পবে, ভোববাতে মনুষ্যেতব প্রাণীদেব মৃতদেহ বহনকারী গাড়ি পাঠিযে, লোকজন জেগে ওঠার আগেই, লাশগুলো তুলে নিয়ে গেলেই হবে। বিষ যারা বানায়, তাবা বিনা দামেই বিষ সববরাহ কবে পবিকল্পনাটিব পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে এবং একইভাবে বিভিন্ন হোটেল, বেস্তোরাঁ ও কসাইখানা থেকে বাসি টোকো মাংস যোগাড় করা যায়। পচা মাছ হলেও চলবে।

বিরুদ্ধে মত

প্রস্তাবটি ভালো কিন্তু এর প্রধান বিপদ হল, এই বিষাক্ত মাংস যে শুধু কুকুররাই খাবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে বিশ্বেব সামনে কলকাতাকে হেয় হতে হবে এবং নিন্দুকেবা অনেক কিছু মুখোমুখি বা সোজাসাপটা বা কথায় কথায় বলার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর একটি সম্ভাবনাও উড়িযে দেওযা যায় না। বিনা পয়সায় পাওয়া বিষ যদি ভেজাল হয়, তাহলে উদ্দেশ্য তো চবিতার্থ হবেই না, উপরন্তু কুকুরেরা বাড়তি শক্তি পেয়ে যাবে।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৩

কুকুর মারার ব্যাপারে আমরা যদি কোনো দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করি তাহলে আমাদের সম্মানহানির প্রশ্ন বোধহয় ওঠে না। যে-দেশটাকে সবাই বিশ্ব-ফুটবলের একনম্বর দেশ বলে জানে সেই ব্রেজিলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্ব 'ব্রেজিলিয়ান মির‍্যাকল্' (১৯৬৭-১৯৭৩) বলে পরিচিত। ওই সময় ব্রেজিলের বড় বড় গয়নার দোকানের মালিকেরা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের দিয়ে একটি দল বানিয়েছিল, যাদের কাজ ছিল রাতের রাস্তায় ঘুমন্ত ভিখারি শিশু ও বালক-বালিকাদের গুলি করে মারা। এর পেছনে একটা গভীর ও সারবান যুক্তি ছিল। আজকে যারা ছোট লুম্পেন তারাই কিন্তু কাল দামড়া হয়ে ডাকাবুকো গুন্ডায় পরিণত হবে এবং গয়নার দোকানে ডাকাতি করবে। 'ব্রেজিলিয়ান মির‍্যাকল্'-এর বহু আগে, রাশিয়াতে

বিপ্লবের পরেই, উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে, দুনিয়াভর বলশেভিক মুরগির বাচ্চাগুলোকে তাড়া করে বেড়ানোর চেয়ে বলশেভিক ডিমগুলোকে থেঁতলে দেওয়াই ভাল। মহজন-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে আমরাও ব্যাপাবটা ভেবে দেখতে পারি। কুকুরের বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলতে গুলি বা বিষ, কোনো কিছুরই দবকার নেই। ঘাড় মুচড়ে বা আছড়ে বা পিটিয়ে বা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা খুবই সহজ। আবও সহজ হল বড় সাইজের পলিব্যাগেব মধ্যে দলা পাকিয়ে অনেকগুলোকে ঢুকিয়ে মুখটা জবরদস্ত কবে বেঁধে দেওয়া। ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা ও চিলি থেকে এ বিষয়ে প্রেরণা পাওয়া যায়। বড়গুলোকে মারলে লাশগুলোর হিল্লে করা ঝামেলা। কিন্তু কিছুদিন পরপব বাচ্চাগুলোকে মারলে এরা আর সংখ্যায় বাড়বে না। আমবা এক্ষেত্রে বড়গুলোকে প্রাপ্তবযস্ক মশা ও বাচ্চাগুলোকে লার্ভার সঙ্গে তুলনা করতে পাবি। সুচারুরূপে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করলে জানাজানি বা কেচ্ছার সুযোগও কম।

বিরুদ্ধে মত

প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে ভাবনাব খোবাক যোগায়। শুধু তাই নয়, বিংশ শতকেব ইতিহাস থেকে যেভাবে এখানে সদর্থক শিক্ষা নেওয়া হয়েছে, তা চমকে দেওয়ার মতোই। এব থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমরা শুধু দিতেই জানি না, নিতেও জানি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বাচ্চাদেব ওই ভাবে মাবার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হবে তাবা দয়াপরবশ হয়ে কিছু বাচ্চাকে মাববে না। এব প্রমাণ আমাদেব বিগত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসের মধ্যেই বযেছে। বিদেশে যাওযাব দবকাব নেই। তা ছাড়া বেড়ালের মতো গুপ্তচবসুলভ মেজাজের না হলেও কুকুররাও বাচ্চাদের লুকোতে জানে। আব একটা কথা সম্ভবত ভাবাই হয়নি। বাচ্চাদের চোখেব সামনে যে ভাবেই হোক মারতে দেখলে তাদেব মা-বাবারা চুপচাপ শুধু দেখে যাবে বলে মনে করার কোনো কাবণ নেই। ওরা বিকট চিৎকার কবতে পারে, অন্য কুকুরদের ডেকে জড়ো করতে পারে এবং এমনকী মবিয়া হয়ে আক্রমণও করতে পাবে। এর ফলে শহরে শব্দ ও অন্যবিধ দূষণ বাড়বে এবং কুকুববা মাবমুখী হয়ে উঠবে। সেই অবস্থা আমরা কীভাবে সামাল দেব? কুকুবের সঙ্গে লড়াই চালাতে শেষে কী প্যাবামিলিটারি ফোর্স নামাতে হবে? ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের দবকার সুখী গৃহকোণ, অসুখী গৃহযুদ্ধ নয়। তাই গোড়াতে সাধুবাদ জানালেও শেষ-বিশ্লেষণে প্রস্তাবটি আমরা নাকচই করলাম। নাকচ করার আর একটি কাবণ হল শিশু-কুকুর হত্যার ওপবে জোর দেওয়া। ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগেই। কেমন কি না?

'নৈষ্কর্মা সিদ্ধি'-তে আচার্য শ্রীসুবেশ্বব বলেছিলেন,

> 'বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
> শুনাং তত্ত্বদৃশাং চৈব কো ভেদোহশুচিভক্ষণে।

(নৈঃ সিঃ, ৪/৬২)

—অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকারী পুরুষেরও যদি যথেষ্টাচরণ হয়, তবে অপবিত্র পদার্থভক্ষণ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানী ও কুকুরে কী প্রভেদ?

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৪

আমরা ঠিক ভোজসভা বা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অথবা সুন্দরীরদের ফ্যাশন প্যারেডের আয়োজন নিয়ে বোধহয় আলোচনা করছি না। এখানে স্পষ্ট দুটি পক্ষ আছে। একটিতে রয়েছি আমরা। অন্যটিতে কলকাতার রাস্তার কুকুর বা নেড়িকুত্তা যাদের বলা হয়। এখানে ধানাই-পানাই,

দীর্ঘসূত্রতা বা দয়া প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সহজ কথাটা হল কুকুর ধরতে হবে। এবং ধরে আদরে রাখা নয়, মেরে ফেলতে হবে। এতেই কিন্তু হাত ধুয়ে ফেলা যাবে না। যেভাবে আমরা হাজারে হাজারে কুকুর মারার পরিকল্পনা করেছি তাতে মৃতদেহ একটি পাহাড়ে পরিণত হবে এবং সেই পাহাড় পচতে থাকবে। ভূমিকম্প হলে আমরা দেখেছি ইঁদুরদের গায়ে যে মাছি থাকে তারা ইঁদুর মরার ফলে মানুষকে কামড়াতে শুরু করে, যার পরিণতি হল প্লেগ। পচা কুকুর থেকে কী অসুখ ছড়াবে আমরা জানি না। এখনও মানুষ জানে না এমন কোনো মহামারীও শুরু হয়ে যেতে পারে। এইসব নানাদিক চিন্তাভাবনা করে আমাদের প্রস্তাব হল—

(ক) যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নামতে হবে। কে কী বলল, কার চোখে কী লাগল, দুনিয়া কী ভাববে এসব ছেঁদো ব্যাপার নিয়ে, ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। দয়ামায়া দেখাবার অনেক জায়গা আছে—অনাথআশ্রম আছে, প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় আছে, যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সমস্যা আছে—সেখানে গিয়ে ওসব দেখান। কুকুরদের ক্ষেত্রে ওসব ছিঁচকাঁদুনে মনোভাব দেখানোর কোনো অর্থই হয় না।

(খ) আমরা দেখেছি যে সাঁড়াশি দিয়ে কুকুর ধরার একটা চলনসই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। নির্দিষ্ট এক একটি এলাকা অতর্কিতে ঘেরাও করে চিরুনি অভিযান চালাতে হবে।

(গ) কুকুরগুলোকে ধরে আনা ও মেরে ফেলা মধ্যে ব্যবধান বেশি হলে চলবে না। এর জন্যে আমরা গ্যাস-ভ্যান ব্যবহার কবতে পারি, যেখানে সরাসরি ইঞ্জিন থেকে, কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস ওই ভ্যানে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি যে কার্বন-মনোক্সাইডে মানুষ হলে মবতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে। অথচ গত শতাব্দীব ইতিহাসই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে খুবই উদ্বায়ী হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস এই সময়টাকে পনেরো মিনিটে নামিযে আনতে পারে। এটাও অবশ্য মানুষেরই হিসেবে।

(ঘ) এবার আমাদের শেষ কাজ। মৃতদেহের গতি। এর জন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি বিদ্যুৎ-চুল্লি তৈরি করতে পারি যেগুলো পরে অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় ধাপটি শেষ হওয়ার পরে সেবারের মতো আমাদেরও কাজ শেষ। এবং শেষ কুকুরদের দলটি এই তিন ধাপ পদ্ধতি অতিক্রম করলেই আমাদের কাজ একেবারেই সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হবে।

বিরুদ্ধে মত

এটা আমরা করতে পারি না। কারণ পুরো মডেলটাই হচ্ছে নাৎসি মৃত্যু-শিবিরের যা আমাদের দুর্নাম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। পরিকল্পনাটি ভেবেচিন্তেই করা এবং কার্যকর নয় এমনও বলা যায় না। বোঝাই যায় যে নাৎসি-পর্বে মৃত্যু-শিবিরের খুঁটিনাটি ভালোভাবেই বিচার করা হয়েছে এবং ত্রেবলিনকা, সবিবর, বেলজেক, অসউইৎজ-১ বা সেন্ট্রাল এবং অসউইৎজ-২ অর্থাৎ বিরকেনাউ-এর ঢঙে কুকুর মারা ও পুড়িয়ে ফেলার ছকটি করা হয়েছে। প্রস্তাবটি লোভনীয় হলেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবকারীদের আমরা জানাচ্ছি যে নাৎসিদের মতো পরিকল্পনামনস্করাও কিন্তু আগেভাগে সবটা বুঝতে পারেনি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। অসউইৎজ (বিরকেনাউ)-এ চারটে মড়া পোড়াবার চুল্লি ছিল যেগুলো বানিয়েছিল এরফুর্তে-র জে.এ.টফ্ অ্যান্ড সন্স্। এর মধ্যে বড় দুটি চুল্লি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৬৫০০ মড়া পোড়াতে পারত। ওই দুটি চুল্লি ১৮ মাস একনাগাড়ে চলেছিল অর্থাৎ ১৮,০০,০০০ মড়া পুড়েছিল। এটা পুরো হিসেব নয়। পুরো হিসেব হল ৪ মিলিয়ান বা ৪০,০০,০০০। যাইহোক এত বড় ব্যবস্থার মধ্যেও

অ্যাডলফ্ আইসম্যান যখন ৪,০০,০০০ হাঙ্গেরিয়ান ইহুদিকে হত্যা কবে তখন চুল্লিগুলো সামাল দিতে পারেনি। চুল্লির ইটে ফাটল ধবতে শুরু কবে। তখন বিশেষ দহন-খাদ খোঁড়া হয় যেখানে কংক্রিটের নর্দমা দিয়ে মানুষের চর্বি বয়ে যেত এবং সেই চর্বি জ্বলন্ত মৃতদেহের ওপরে বেলচা দিয়ে তুলে ঢেলে দেওয়া হত। এ কাজ করত বন্দীরাই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সব পরিকল্পনার মধ্যেই অভাবনীয় নানা গলদ থেকে যায়। প্রস্তাবটি আমরা খারিজ করলেও এটি সংবক্ষণযোগ্য।

বিরুদ্ধে মত (সংযোজনের জন্য)

প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে তরুণদের চিন্তা ভাবনা আমাদের ফেলনা মনে করা উচিত হবে না। উপরোক্ত প্রস্তাব-বিবোধী বক্তব্যের সঙ্গে মোটের ওপর একমত হয়েও জানাচ্ছি যে, মাত্র ২৯ বছব বয়সী এস এস অফিসাব অটো মল অশউইৎজ-এ দহন খাদেব নক্সা করেছিল। নর্দমা দিয়ে যখন মানুষেব ফুটন্ত চর্বি বয়ে যেত তখন অটো মল তার মধ্যে বাচ্চাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত। প্রস্তাবটি অবশ্যই সংবক্ষণযোগ্য এবং গোপন রাখলেই ভাল হয়।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৫

অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছে। কোথাও বিজ্ঞানেব ও কৃৎকৌশলের জয়জয়কার। কোথাও একপেশে সামরিক মনোভাব। কোথাও ভ্রষ্ট শতাব্দীব ইতিহাসেব যান্ত্রিক প্রভাব। আমাদের বক্তব্য হল নিজেদেব ক্ষমতা বিচাব কবে ব্যবস্থা নিতে হবে। উদ্ভট খরচ যাতে না হয় সেদিকে নজব বাখতে হবে। সাপও (অর্থাৎ কুকুবও) মবে, লাঠিও না ভাঙে সেটা দেখতে হবে।

(ক) সাঁড়াশি দিয়েই কুকুব ধবা হোক। কারণ এব কিছু ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞ কর্মী অন্তত আমাদেব হাতে আছে।

(খ) কুকুর মাবার জন্যে এক নয়া পয়সাও খরচ হবে না। ব্রিটিশ শাসকরা যে পিঁজবাপোলগুলো বানিয়েছিল সেগুলোব মধ্যে কুকুরদের ছেড়ে দিলেই চলবে। খাবার বা জল কিছু দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শুকিয়ে কয়েকদিনেই মরে যাবে। এবং এভাবে মরলে মৃতদেহে স্নেহপদার্থ ও জলের ভাগ যথেষ্ট হ্রাস পাবে। পচে গেলেও ভয়ানক কিছু হবে না। শকুন, চিল, কাক এরা আছে। অতএব কঙ্কালে পবিণত হতে বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয না। এর চেয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থাব কথা বর্তমানে আমরা কী ভাবতে পারি?

প্রস্তাবের পক্ষে মত

এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থার কথা এই মুহূর্তে আমবা ভাবতে পারি না। পয়সা গাছে ফলে না। দেশের হালও বেহাল। এখন যদি কলকাতা অলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করতে চায়, সেটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয় কুকুর মারার জন্যে এমন একটি পবিকল্পনা গ্রহণ করা যা আমাদের সাধ্যাতীত। তাই সবকিছু বিচার কবে আমরা 'পরিকল্পনা প্রস্তাব-৫' সুপারিশ করছি। এরপর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি ওপর-মহলে পাঠানো হবে। ওপর-মহল আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা চূড়ান্ত সম্মতির জন্য পাঠাবেন...

আগেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে শহব পাড়ি দেওয়া কুকুরদের কথা বলা হয়েছে। রাস্তার শানের ওপরে, বাঁধানো জায়গার ওপরে তাদের চারটে থাবা যখন ছন্দ মিলিয়ে পড়ে তখন নখের সামান্য শব্দ হয়। মধ্যে থেমে থেমে একটু জিরিয়ে নিতে হয়। জল খেতে হয়। ফের ছুটতে হয় খবর নিয়ে। নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। মাঝপথে যে কুকুররা খবর পায় তারাও সবাই

চুপ করে বসে থাকে না।

কুকুর কীভাবে তাব অভীষ্ট খুঁজে বের করে তা নিয়ে অনেক সত্যি ঘটনা আছে যার মধ্যে জাদুর ছোঁয়া রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের ফার্স্ট নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার রেজিমেন্টের সৈন্য জেমস ব্রাউন যুদ্ধ করতে ফ্রান্সে গিয়েছিল। ১৯১৪ সালেব আগস্টে। ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রাউনের স্ত্রী তাঁকে চিঠিতে এই দুঃসংবাদ দেয় যে, তার প্রিয় আইরিশ টেরিয়ার 'প্রিন্স'-কে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রাউন তাঁর স্ত্রীকে জবাবে লেখে, 'দুঃখের ব্যাপার যে তুমি প্রিন্স-কে খুঁজে পাওনি। পাওয়ার কথাও নয়। কারণ সে আমার কাছেই রয়েছে।' এর মানে প্রিন্স ইংল্যান্ডেব দক্ষিণেই ২০০ মাইল পথ পেরোয়। ইংলিশ চ্যানেল কোনোভাবে অতিক্রম কবে। এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের ৬০ মাইল পেরিয়ে আর্মেন্তিয়েরে-এর একটি ট্রেঞ্চে তাব প্রভুকে খুঁজে বেব করে।

৪

অলৌকিক ভিক্ষাপাত্রের মতো চাঁদ
দাঁতে কামড়ে ছুটে যাচ্ছে রাতের কুকুর

কান গজিয়ে ওঠার পরে কান-গজানো পুরনো থাকার জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বড় রাস্তায় নোংবা ফেলার বড় ভ্যাট-এর আশপাশটা বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিনের নোংরা জমে ওঠাব পরে এখানে বড় বড় লরি আসে। তাতে করে নোংরা ধাপায় চলে যায়। জায়গাটা নোংরা বলে বেড়াল, কুকুর ও কাক বাদে খুব একটা কেউ আসে না। তবে ডানদিকে হাত বিশেক দূরে একটা ভাঙাচোরা বাতিল পেচ্ছাপখানা আছে যাকে ঘিরে এমন লতা আর কাঁটাগাছেব জঙ্গল যে কেউ যেতে পারে না। ওই ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাতে অনেকদিন আগে একটা পাগল সাইকেল রিক্সার পর্দার ছেঁড়া পলিথিনে জড়ানো বালিশ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু আর নিতে আসেনি। কোনো কিছুই ফেলা যায় না, কোনো না কোনো কাজে লেগে যায়। বাতাসে পলিথিনটা উড়ে গেছে। বালিশটা বৃষ্টিতে ভেজে, আবার রোদে শুকিয়েও যায়। শুকনো থাকলে ওই বালিশের ওপরে নিরীহ একটা একা বেড়াল ঘুমোয়। কান-গজানোর সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব না থাকলেও ঝগড়া অন্তত নেই। এক ধরনের মায়াবী শেষ-দুপুর আছে যখন নিরীহ বেড়ালেবা ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠে বেড়ালটা দুই থাবা ঝুলিয়ে নীচে কী হচ্ছে তা নির্লিপ্তভাবে দেখে। সে দেখতে পায় কান-গজানো হয় নোংরা ঘাঁটছে বা কিছু একটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। এখানে অন্য কুকুররাও আসে, তবে সবই ধারে-কাছের। তারা আসে, আবার চলেও যায়। শুধু কান-গজানো এখানে থেকে যায়, কারণ সে অ্যাসিডে কান গলে যাওয়ার ব্যাপারটা ভোলেনি। বরং কোথাও আয়নার মতো জল-টল জমলে বা ঝকঝকে গাড়ির গায়ে সে পরে-গজানো কানটা মাঝে মাঝে দেখে নেয়। একদিন বিকেলে কাছাকাছি টহলদারি করে ফিরে কান-গজানো দেখতে পেল যে ফেলে যাওয়া একটা থার্মোকলের বাক্সের ওপরে তারই মতো কালো কিন্তু থাবায় নয়, বুকের ওপরে সাদা নদী, একটা কান-ঝোলা বিলিতি কুকুর বসে আছে। ওকে দেখেই কান-গজানো একবার দাঁত অল্প খিঁচিয়েছিল, কিন্তু ও বিশেষ পাত্তা দিল না। এই কুকুরটা একে তো নেড়ি নয়, তার ওপরে আশেপাশের কোনো বাড়িরও নয়। হলে কান-গজানো ঠিক জানতে পারত। কান-গজানো তাকে বলল,

—তুই কে?

—যেই হই তোব মতো নেডি নই। আর কথা নেই বার্তা নেই, শুরুতেই তুই-তোকাবি। জংলি কি আর এমনি বলে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আমার জায়গা। এখানে আস্তানা গাড়া আমি বরদাস্ত করব না।

—কী করবি? কামডাবি? ভয় দেখাবি?

—না।

—তাহলে কী কববি?

—আমাকে কিছুই কবতে হবে না। তুই যাদেব পোষা তারা ঠিক তোকে ধবে নিযে যাবে। ঘেঁটি ধরে।

—তারাই বলে গাডি কবে ঘুরে ঘুরে আমাকে দিক ভুলিয়ে ছেড়ে দিযে গেল, খুঁজে নিযে যেতে তাদের ভারি বযেই গেছে।

—মানে?

—মানেটা বোঝাব বুদ্ধি তোব আছে? বুডো হয়ে গেছি। আগের মতো টবটরে নেই। কাবণে-অকাবণে ঘুম পায। তাই আর বাখবে না। ইচ্ছে হলে আমি নিজেই তো ফিবে যেতে পাবতাম।

—বুঝলাম, কিন্তু এত বড় কলকাতাটা থাকতে তুই মবতে আমাব এই জাযগাটায এলি কেন?

—কেন এলাম সেটা তুই তো বুঝবি। এ তল্লাটটা এখনও একটু ফাঁকা ফাঁকা। এখনই ওদের নজব এদিকে পডবে না। অবশ্য বলা যায না—

—কাদের?

—কলকাতায় কুকুর ধবা চলছে। জানিস না?

ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাদ থেকে বেড়ালটা বলল,

—বেড়ালদেরও ধরছে নাকি?

—এখনও ধরছে না। তবে কুকুরদের পরে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ালদের দিকে নজর পড়বে। কথাতেই বলে কুকুর-বেড়াল।

—আমার নাম কান-গজানো।

—কান-গজানো? ঠিক আছে।

—তোর নাম।

—আমার নাম জিপসি।

—কী করছে ওরা কুকুরদের ধরে?

—পিঁজরাপোলে নিয়ে যাচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? না-খাইয়ে শুকিয়ে মারছে। উত্তরের দিকে অনেক কুকুর ধরা পড়েছে। আমি তো সেখান থেকেই আসছি। তবে কাকেরা যে উড়ো খবব ছড়াচ্ছে তা মোটেই ভালো নয়।

—যেমন?

—বলছে পুরনো, জং-ধরা কুকুর-ধরবার গাড়িগুলোকে আবার নাকি রংচং করে, ঝালাই মেরে ফের রেডি করছে। গণ্ডায় গণ্ডায় কুকুর ধরার সাঁড়াশি অকেজো অবস্থায় ডাঁই করে রাখা

ছিল। সেগুলোকে ঝেড়েমুছে ফের তেল-টেল দিয়ে নতুনের মতো করে ফেলা হচ্ছে।

—কিন্তু উত্তর থেকে তুমি পালিয়ে কোথায় গেলে?

—আড়াআড়ি এলে চৌরঙ্গি পড়বে। আমি শেয়ালদা দিয়ে রেললাইন ধরে ফেলি। রেললাইনের পাথরে পা কেটে গেছে। একটু পর পর বড় বড় বেলগাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু থামিনি। আর এই আমায় দেখছিস তো। এরপর দেখবি আরও আসছে।

—এটাও কি কাকরা জানিয়েছে?

না। এটা নিজের চোখে দেখা। কানে শোনা। এখান থেকে মিনিট কুড়ি দৌড়লে একটা বাজার আছে না?

—হ্যাঁ। ওখানে মাছের কাঁটা আছে।

—তা থাকতে পারে। ওখানে বাজারের বাইরে তিন-চারটে বড় বড চা-বিস্কুটের দোকান আছে?

—আছে।

—ওখানে তিনটে কুকুব বলাবলি কবছিল যে, এবাবে এ-দিকটায় সবে আসবে। তবে দল বেঁধে নয়। একজন একজন করে। তাহলে নজরে পড়বে না।

—এরকম কি আগে কখনও হযেছে?

—হয়েছে কিন্তু এই মাপে নয়। গরমকালে কুকুববা একটু তিবিক্ষে হয়ে থাকে। খ্যাঁকখ্যাঁকে। তখন দু-চারটেকে ধরত। এবার কোনো বাছাবাছির বালাই নেই। কুকুর হলেই হল। পেলেই ক্যাঁক্।

—উঃ, সাঁড়াশি? ঘাড় আর গলাটা কেমন শিরশির করে উঠল।

—শুধু কি তাই? সাঁড়াশি দিয়ে ধবে হিঁচড়ে হিঁচড়ে খাঁচার গাড়ির কাছে নিয়ে যাবে। তাবপর ছুঁড়ে গাড়ির ভেতরে। এরকম করে কবে গাড়িতে যখন আর কুকুব তোলা যাবে না তখন পিঁজরাপোল।

ওদের এই কথাবার্তার মধ্যে একটা দমকা হাওয়া এল যাকে আর-একটু রাগিযে দিলে ছোটখাটো একটা ঝড বলা যেতে পারে। ওরা ওপবদিকে তাকাল।

বেড়ালটা বলল,

—কী হচ্ছে। কিছু বুঝলে?

—ঝোড়ো বাতাস বইছে।

—ঘেঁচু বইছে। বিশতলা, তিরিশতলা ওপর দিয়ে ছায়া-কুকুরেরা দৌড়চ্ছে। কেন দৌড়চ্ছে বলতে পারব না। তবে জন্ম থেকে শুনে আসছি এরকম হওয়া ভালো নয়।

—আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—পাবে। চেষ্টা করো, পাবে। দেখতে ভুলে গেছ তাই। ফের মনে পড়ে যাবে।

ছায়া-কুকুরেরা কবে মরে গেছে কেউ বলতে পারে না। কালান্তক সময় এলে তারা মেঘের আড়াল ছুঁড়ে ফেলে দেয। সরাইল হাউন্ডের মতো ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়ে ছুটতে থাকে। তাদের থাবার আঘাতে থরথর করে কাঁপে ছায়া-শহর, ছায়া-অট্টালিকা ও ছায়া-রাজপথ। সামনের দুটো পা একসঙ্গে ছোঁ মেরে নেমে আসে মারাত্মক ঢেউ-এর মতো, জ্বলন্ত ফেনায় বুদবুদ ও তরল আগুন ঝলকে ওঠে, তখন পেছনের দুটি পা ছায়া-মরুতে ধাক্কা দিয়ে বালি ওড়ায়। তাদের ডাক বড়ই গম্ভীর। ক্বচিৎ কখনও যুদ্ধবিমানের চালকেরা দেখেছে যে তাদের ম্যাক-২ বা অধিকতর শক্তিধর বিমানকে হেলায় পেছনে ফেলে আকাশ বেড় দিয়ে ছুটে চলেছে ছায়া-কুকুরের দল। কেউ কেউ বলে মারণ-জ্যোৎস্নায় ছায়া-কুকুরেরা চান্দ্র শশক শিকার করতে বেরোয়। তবে এ

নিয়ে মতভেদ আছে। যদিও কেউই ছায়া-কুকুরদের অন্তরীক্ষ অতিক্রমণকে তুচ্ছ বলে মনে করেন না। ছায়া-কুকুরদেব দলপতি হল একটি শুভ্র পবিত্র কুকুর। তার নাম হল লাইকা। কুকুর-উপকথা 'লুব্ধক' চারপাযে নতজানু হয়ে লাইকা-কে প্রণাম জানাচ্ছে।

হাওয়ার ঝাপটাটা কেটে যেতে কান-গজানো বলল,

—তাহলে একটা কিছু হবেই, বলছ?

—সে তো বটেই। হবে না, হচ্ছে।

—রাতে কি ধরতে আসতে পাবে?

—এখনও অতটা বুদ্ধি ওদের হয়নি। তাব ওপরে ভযও আছে। সব কুকুর তো আব সাঁড়াশির হাঁ-তে গলা এগিয়ে দেবে না। লড়ে যাবে।

—তা তো বটেই। যাইহোক, তুমি এলে বলে খোঁজখবর সব পাওযা গেল। একটেরে হয়ে থাকি। কাবও সঙ্গে মিশি না। ওই বেড়ালটাই যা দু-একটা খবর-টবব এনে দেয়। দিন পাঁচেক আগে এসে বলল ও নাকি একটা মরা বাদুড় দেখেছে।

—তো?

—বাদুড়ের মুখটা নাকি অনেকটা কুকুবের মতো। এ বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা আছে?

—না। আমি বাদুড়দেব উডতে দেখেছি। বাদুড়বাগান বলে একটা জায়গা আছে, জান?

—সেখানে কি শুধু বাদুডবাই থাকে?

—দূর! আদ্যিকালে হয়তো থাকত। এখন চামচিকেও থাকে কিনা সন্দেহ। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

—ঘুমোবে। কিন্তু তাব আগে একটা কথা বলতে পারো?

—কী?

—দিনেব বেলায় যদি আমাদেব ধরতে আসে তাহলে আমবা কী করব?

জিপসি কিছু বলাব আগেই বেডালটা বলল,

—আমি বলব?

—বলো।

এই ভাঙা পেচ্ছাপখানাটার দেওযালের পেছনে একটা ফাঁক আছে। বেশ বড়। ঝোপঝাড় হযে গেছে বলে বোঝা যায় না। ওখানে ঢুকতে পারো। কেউ খুঁজে পাবে না।

কান-গজানো বলল,

—সে হয়তো যাওয়া যায়। কিন্তু ওখানে বোলতাব চাক আছে।

—আছে না, ছিল। বোলতারা কবে চলে গেছে। এখন শুধু চাকটাই আছে।

—তাহলে তো চুকেই গেল হ্যাপা।

এই বলে কান-গজানো জিপসির দিকে তাকিয়ে দেখল জিপসি ঘুমিয়ে পড়েছে। আর শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখছে। কারণ শবীবটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। সামনের থাবাদুটোও কখনও কখনও নড়ছে। জিপসির ঘুমোনো দেখে কান-গজানো ভাবল একটু গডিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

নাহি মার কুক্কুরেরে, শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য-বিনা স্বর্গে বাস নহে মতিমান্॥

৩ নম্বর পিঁজরাপোলে তখন একটা তাণ্ডব চলছিল। কুকুরদের কাঁই-কাঁই বা ঘ্যাঁকাও করে চিৎকার, প্রতিবাদী শুকনো ঘেউ-ঘেউ, চাপা রাগে গর্ গর্ করা—সব মিলেমিশে এক মহা-ঐকতান। এরই মধ্যে কামড়া-কামড়ি, জায়গা নিয়ে দখলে রাখার চেষ্টা, দেহ শুকিয়ে আসায় প্রাণপণ তেষ্টা ও পায়ের তলায় বালি মেশানো কাঁকর-মাটি যা তখনও ঠাণ্ডা হয়নি এবং এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে পাঁজর, করোটি, শুকনো ক্ষুর বা শিং। গতকালই যাদের আনা হয়েছিল তারা সারাদিন রোদে তেতে নিভে এসেছে, কেউ তলিয়ে গেছে আচ্ছন্নতায় যা অবধারিত প্রক্রিয়াতে অন্তিম প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ কববে বা কেউ নির্বাক, শান্ত, কানও নড়ছে না যার অর্থ হল সে অসহায়তার শিক্ষা নিতে পেরেছে। মুখে-নাকে বালি ঢুকে গেছে কারও। এদের মধ্যে একটি কুকুর ট্যাক্সি চাপা পড়ে বহুদিন ধরে পঙ্গু। পেছনের পা দুটো অকেজো। সামনের দুই থাবায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে। রয়েছে বৃদ্ধ কুকুরেরা যারা বহু যুদ্ধ ও সন্ধির সাক্ষী। সারা গায়ে প্রাচীন ক্ষতচিহ্ন। যেভাবে থেবড়ে মাটিতে পড়ে আছে তারা, দেখলে মনে হবে মৃতপ্রায় কুমীর বা নিথর ডাইনোসব যুগের মথ। সাবাদিন ধরে কুঁই-কুঁই করে ধুঁকতে ধুঁকতে শিশুরা মরেছে। মা তাদের শুষ্ক জিভ দিয়ে চেটে চেটে আর্দ্রতা দিতে চেষ্টা করেছে। অসহায়তায় এলোমেলো ছোটাছুটি করেছে। মৃত্যুর পরেও মৃত শিশুরা দেয়ালা করছে ভেবে মায়াতাড়িত হয়েছে। কিন্তু এই মায়াই হল মৃত্যুর প্রথম সোপান। ওই তো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওই তো ওঠানামা করছে ছোট্ট বুক। এই তো শোনা যাচ্ছে সেই হৃদস্পন্দন যা জরায়ুর মধ্যে প্রথম ক্ষীণ কম্পন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এই মৃত, মৃতপ্রায় ও অর্ধমৃতদের চেয়ে আজ যারা এসেছে তারা স্বাভাবিক কারণেই অধিকতব সজীব ও সরব। কিন্তু মৃতের সঙ্গে থাকলে মৃত্যুর চৌম্বকক্ষেত্রের চোরা ঠাণ্ডা টান না চাইলেও অনুভব করতে হয় ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে ধীর লয়ে অবশ সঙ্গীতের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে আত্মসমর্পণ।

ছায়া-কুকুরদের দৌড়ের সময় এখানেও বালি ও কাঁকুরে-মাটির ওপরে এক ধুলোর আঁধি উঠেছিল, কিন্তু তা থিতিয়ে গেছে মৃত কুকুর-শিশুদের নরম লোমে ঢাকা শবীরের ওপর। এই ধুলোর চাদর হল ঢাকা পড়ে যাওয়ার, গভীরে চলে যাওয়ার এক আয়োজন। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে এভাবেই ডাইনোসরদের ওপরে ধুলো জমতে শুরু করেছিল যাব মধ্যে ছিল ইরিডিয়াম। এই ইরিডিয়াম এসেছিল মহাকাশ থেকে প্রেরিত উল্কাপিণ্ডের শরীরে মিশে। কে পাঠিয়েছিল এই মহাসংহারের অস্ত্র? এর আগেও বারবার পৃথিবী থেকে প্রাণ মুছে গেছে প্রলয়ের স্পর্শে। ৪৫০, ৩৫০, ২২৫ ও ১৯০ মিলিয়ন বছর আগেও এই অভিশাপ এসেছিল। কেন? কী হেতু এই মরণোৎসবের? সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রশ্নচিহ্নে সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সার্কাসের এরিনার মতো গোল পিঁজরাপোলের জমিতে দাঁড়িয়ে দেখা কলকাতার আকাশ।

মস্ত বড় টাটা সুমোটা এসে দাঁড়াতে প্রায় একই সঙ্গে কান-গজানো আর জিপসিব ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার পেচ্ছাপ করতে নামল। গাড়ির মধ্যে এফ-এম রেডিয়োতে খবর হচ্ছে—

'আজ চারশো আটচল্লিশটা কুকুর ধরা পড়েছে। এই নিয়ে মোট প্রায় সাড়ে সাতশো কুকুর ধরা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান যে আক্রা ফটকের কাছে কিছু দুষ্কৃতি কুকুর ধরার কাজে বাধা দেয় ও যথেচ্ছ ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য এলাকায় পুলিশ নামানো হয় ও বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, আগামীকাল থেকে সশস্ত্র পুলিশ ও র‍্যাফ কুকুর ধরার সময়ে হাজির থেকে

শান্তি রক্ষা করবে। আরও স্থির করা হয়েছে যে, শিশুরা যে-সময়টা স্কুলে থাকে সেই সময়ে কুকুর ধরার অভিযান জোরদার কবা হবে। এ ব্যাপারে শিশু-মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্য সরকার মেনে নিয়েছেন, যে, চোখের সামনে সাঁড়াশি দিয়ে কুকুর ধবা দেখলে শিশুদের কোমল মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি হতে পাবে। আপনারা কলকাতা বেতাবকেন্দ্রেব এফ-এম চ্যানেলে সংবাদ শুনছেন।'

'প্রতিবক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে একটি অজানা বিদেশি বিমান আজ ভাবতেব সীমানা লঙঘন কবলে ভাবতীয় জঙ্গিবিমান ওই বিদেশি বিমানটিকে ধাওয়া কবে.. '

টাটা সুমোটা চলে যাওয়ার পবে কান-গজানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—আমাদের কি কিছুই করার নেই? এইভাবে মরতে হবে?

—ভাগ্যে থাকলে মবতে হবে। কী করা যাবে। সাড়ে সাতশোর দলটা তো আরও বাড়বে। অনেক বাড়বে। ভাগ্যে যদি পিঁজবাপোলে গিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মবাই লেখা থাকে তো তাই হবে। আমরা পারব ঠেকাতে? নিযতি কেউ ঠেকাতে পাবে না। কুকুব না, মানুষ না, কেউ না।

—তুমি ভাগ্য মানো?

—না মেনে উপায়? ছোটবেলা তিন সপ্তাহ বযসে কালো-ভাই আব আমি বিক্রি হয়েছিলাম হাতিবাগানে। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে বউবাজারে এলাম। আমাব জন্যে ডাক্তার আসত। একবাব পড়ে গিয়েছিলাম। নড়তে পাবতাম না। তখন বেলগাছিযাব জন্তুদের হাসপাতালে নিয়ে গিযেছিল। বোজ দুধ খেতাম, মাংসের ছাঁট খেতাম। চকোলেট, আইসক্রিম—কী না খেয়েছি? আব আজ! নোংরাব গাদায় বসে বেড়ালের লেকচাব শুনতে হচ্ছে। এর পরেও বলতে হবে ভাগ্য মানি না?

বলাই বাহুল্য, বেড়ালটা রেগে গিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ চকমকি পাথবেব মতো জ্বেলে সে বলল,

—ভালো ভেবে লুকোবার জায়গাটা বলে দিলাম। শুনি কুকুরবা কৃতজ্ঞতা জানে আর বেড়ালবা অকৃতজ্ঞের হদ্দ। এখন বোঝাই যাচ্ছে কোনটা কী।

—আরে বাবা, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। নিছকই কথার কথা। আমি অন্য বেড়ালদের কথা বলছিলাম। তুমিই কি একলা বেড়াল নাকি? কত বলে বেড়াল রয়েছে।

—সে থাকুগগে। এখানে বেড়াল বলতে আমিই। কাজেই বেড়ালেব নামে কিছু বললে আমার গায়েই লাগার কথা।

—আরে বাবা, মাপ চাইছি। হয়েছে? চালচুলো কিছু নেই। কী বলতে কী বলে ফেলি। অত ধরলে চলে?

এই মৃদু ঝগড়াটা দুম্ করে থেমে গেল, কারণ প্রচণ্ড জোরে কিছুটা দূরে একটা বোমা ফাটল আর ঝলকে অন্ধকারটা এক লহমার জন্যে চমকে উঠল, যেন কারও ফোটো তোলা হল। বোমার আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে না যেতে কয়েকটা হালকা শব্দ। গুলিব। বেড়ালটা বলল,

—লেগে গেল।

—কার সঙ্গে কার?

—অত জানলে আর বেড়াল হয়ে জন্মাতে হত না।

কান-গজানো হঠাৎ বলে উঠল,

—না। একটা খবর আসবে।

—কী খবর?

—একটা খবর। আমাদের খবর। কুকুবদের খবর। আমাব মন বলছে একটা খবর আসবেই।

—ভালো না খারাপ?

—সেটা বলতে পারব না। কিন্তু একটা খবর আসছে। আসতে তাকে হবেই!

৫

প্রথম বিমানহানা করে গেছে শীত
বসন্তের কথা বা ভাবনা এখন দূর
রাস্তায় মানচিত্র হয়ে ঘুমায়
কয়েকটি ক্লান্ত কুকুর

কান-গজানো ভুল বলেনি। আগে আমবা শহরের এ-মাথা ও-মাথা ছুটে যাওযা ব্যস্ত কুকুরদেব কথা বর্ণনা করেছি। প্রথম (আসলে দ্বিতীয়) হাওড়া ব্রিজের এপার থেকে সে এসেছিল। তাব নাম বাদামী। কান-গজানো আর জিপসি দেখেছিল দূব পেবিয়ে একটা হন্যে কুকুর আসছে। তার লোমে ডিজেলের ধোঁয়াব গন্ধ। চোখ একটু ভিজে। ওটা কান্না নয়। ধোঁযাব আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থা। নামের সঙ্গে রঙেব মিল থাকলেও চোখ দুটো একটু লালচে বলে অনেকেই ভেবে নিতে পারে যে, বাদামী বেশ রাগী ধাঁচেব, কিন্তু এব চেয়ে ভুল আব কিছুই হতে পাবে না। বাদামী এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

—আমার আগে আর কেউ এসেছিল?

—না তো।

—আসার কথা ছিল। তাহলে হয়তো মাঝরাস্তায় ধরা পড়ে গেছে। অবশ্য চাপাটাপাও পড়তে পারে। একটু জল খাওয়ার দরকার।

—উল্টোদিকে যে বাড়িটা দেখছ ওর বাগানে গাছে জল দেওয়ার পাইপটা খোলা আছে। জলটা গেট দিয়ে বেরোচ্ছে। খেয়ে এসো।

বাদামী রাস্তার ডানদিক-বাঁদিক দেখে রাস্তা পেরিয়ে জল খেতে গেল।

—আচ্ছা, হঠাৎ ওরা আমাদের নিয়ে পড়ল কেন বলতে পারো? আমরা কি খুব ঝামেলা করছিলাম?

—বুঝতে পারছি না। আমার তো এক-একসময় মনে হয় যে অজান্তেই কোনো ভুল বোধহয় আমরা করে ফেলেছি। যে কারণে ওরা এত ক্ষমাহীন হয়ে উঠেছে।

—আসলে কলকাতাটাকে যেভাবে ওরা সাজাতে চাইছে সেই ছবিটার মধ্যে আমরা খুবই বেমানান।

—সে না হয় হল, কিন্তু আগেই প্রশ্ন উঠবে যে কলকাতাটা কি কেবল ওদের? হঠাৎ ওরা বাদে অন্যরা ফেলনা হয়ে গেল?

—আবার অন্য একটা কথাও থেকে থেকে ভাবছি। মানে, বলা যায় যে, কথাটাই আমাকে ভাবাচ্ছে।

—কী সেটা শুনি?

—আসলে হয়তো ব্যাপারটা তত কিছু নয়। এমনও তো হতে পারে যে আমরা যাতে

নিজেদের মতো করে আরও গুছিয়ে আরও ভালোভাবে থাকতে পারি তারই জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। হয়তো.. হয়তো. .আমাদের নিয়েই একটা চিড়িয়াখানা বানাতে চায় ওরা। যেখানে আমাদের ভালো খেতে দেবে। অসুখ হলে ডাক্তার দেখবে। কত কীই তো হতে পারে.

বাদামী জল খেয়ে ফিরে এসেছে। তার গোঁফে ও কালো নাকের ওপরে বিন্দু বিন্দু জল লেগে আছে।

—তোমাদের এই কথাবার্তা শুনে আমার গল্পটা মনে পড়ে গেল। ছাগলছানা হাততালি দিচ্ছে আর নাচছে—কী মজা, সামনে সরস্বতী পুজো, কী মজা। তার মা তখন তাকে বকুনি দিয়ে বলছে যে আগে কালীপুজোটা যেতে দে, তারপর সরস্বতী পুজোর কথা ভাববি। তোমাদের হাল ওই ছাগলছানার মতো। কী কারণে কী হচ্ছে আমরা ভেবেচিন্তে কুলোতে পারব না। কাজেই সাত-পাঁচ ভেবে সময় নষ্ট করো না। যা বলছি শোন। আমাকে এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—বলো।

—একটা ব্যাপার মাথায় রাখবে। ওরা ওদের মতো করে ফন্দি আঁটছে। সে-ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই আমাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

—বলো না। পিঁজরাপালে শুখা-ভুখা হয়ে মরার চেয়ে সবকিছু করতে রাজি আছি।

—তুই কে?

—আমি জিপসি।

—আর আমি কান-গজানো।

—এখন আমাদের একমাত্র কাজ হল যেখানে ওরা হুট করে হানা দেবে না সেই সব জায়গায় দল বেঁধে লুকোনো। তারপর হল রওনা।

—কোথায়?

—অত কথা বলা যাবে না। তোদের এই রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বাস-গুমটি আছে। চিনিস?

—চিনব না কেন? তবে ওখান থেকে আর বাস ছাড়ে না। আগে ছাড়ত।

—ঠিক। ওই গুমটিটার উল্টোদিকে একটা দরজা আধখোলা সি ই এস সি-র ট্রান্সফরমারের ঘর আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার আগুন লেগেছিল। দুটো দমকল এসেছিল।

—বিকেলের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরে ঢুকে যাবি। মেশিন-টেশিন ছুঁবি না। পেছনটায় চলে যাবি। দেখবি অন্তত চল্লিশটা কুকুর ওখানে লুকোতে আসবে। আপাতত এই। পরের কথা পরে। একটাই কাজ, পারলে খাবার-দাবার কিছু নিয়ে যাস। কেউ কোনো শব্দ করবি না। বাচ্চাগুলোকেই নিয়ে ঝামেলা। যতটা পারা যায় ওদের চুপ করিয়ে রাখতে হবে।

—সে না হয় হল, কিন্তু তারপর?

—বললাম না, পরের কথা পরে। এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে রওনার আগে নির্দেশ আসবে। আর এখানে ন্যাড়া রাস্তার ধারে কচ্ছপের মতো বসে থাকিস না। গাড়ি থেকে দেখলেই নেমে তেড়ে আসবে।

—এখন তুমি কোথায় যাবে?

—নানা জায়গায় হাল্লাক হয়ে খবর দিয়ে দিয়ে বেড়াব। আজ রাতের মধ্যেই বেশিরভাগ কুকুরের লুকোনোর ব্যবস্থা করতে হবে।

—যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাবে?

—কী?

—ছায়া-কুকুররা কি সত্যি?

—তোদের কি মনে হয়?

—আমরা ব্যাপারটা বুঝিনি। ওই বেড়ালটা বলল. তাই...ওবা বাদামীকে বেড়ালটাকে দেখাবে ভেবেছিল, কিন্তু বেড়ালটা ওখানে তখন ছিল না।

—সত্যি তো বটেই। এরপর নিজেদের চোখেই সব দেখতে পাবি। পরের মুখে আর ঝাল খেতে হবে না।

যা খবর দেওয়ার ছিল দিয়ে বাদামী চলে গেল। জিপসি আর কান-গজানো দেখল বাদামী দূরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আব তার কানদুটো না-হাঁটা না-দৌড়ের তালে তালে লাফাচ্ছে।

কুকুর ধরার অভিযান যে এভাবে ঝিমিয়ে পড়তে পারে সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এমন নয় যে সাঁড়াশি-বাহিনীর সঙ্গে শহরের ঝড়তি-পড়তি মানুষদের সংঘর্ষ বাড়তে বাড়তে আয়ত্তেব বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং তার ফলে বৃহত্তর বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল। এমনও নয় যে সাঁড়াশি-বাহিনীর কর্মীরা বিশেষ কোনো দাবি-দাওয়াব ভিত্তিতে কাজে ঢিলে দিচ্ছিল বা অন্য কিছু। তবে আগের কথাটার খেই ধরে এটা বলাই যায় যে কুকুর-ধরাদের মজুরি নিয়ে দীর্ঘদিনই কোনো চিন্তাভাবনা হয়নি। কারণ কুকুর ধরাই হত না। পিঁজরাপোলগুলোব অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আসল ব্যাপারটা হল যখন, যেদিকে বেশি নজর দেওয়া হয়. তখন অন্যদিক থেকে নজর সরে যায়। পোলিও নির্মূল কবার অভিযান চলছে। ওদিকে সঙ্গত কাবণেই প্লেগ-এব দপ্তর খোলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একজন বিকৃতমস্তিষ্ক লোক যদি কার্জন পার্কের ইঁদুরদের বিষ খাওয়ায় তাহলে ওদের গায়ে যে মাছিরা থাকে তারা বাধ্য হয়ে বেরিয়ে মানুষকে কামড়াবে। প্লেগ দেখা দেবে। তখন আবার দেখা যাবে পোলিও নিয়ে কেউ ভাবছে না। এসব আকাশ-পাতাল না ভেবে আমরা যখন কুকুর নিয়ে পড়েছি তখন সেই আসল কথাতেই ফিবে যাওয়া যাক।

কুকুরদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। উপবন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। বিভিন্ন পাড়ায়, গুরুত্বপূর্ণ সব মোড় ও দরকারি রাস্তার মাঝখানে ধরা দেবার জন্যে জ্ঞানবৃদ্ধ কিছু কুকুর হয় বসে বসে ঝিমোচ্ছে, গায়ে মাছি বসলেও তাড়াচ্ছে না বা সামনের দুই থাবার মধ্যে মাথাটা রেখে দু-চোখ মেলে নির্লিপ্তভাবে বিশ্ব-সংসারে কী ঘটে চলেছে দেখছে এবং অজানা কোনো শব্দতরঙ্গের সংকেত ধরার জন্যেই যেন তাদের কানগুলো রাডারের মতো দিক পাল্টাচ্ছে। কুকুর ধরার একটা বিশাল অভিযান চলছে। সেটা সকলেরই জানা। তার মধ্যে এই প্রবীণ কুকুরদেব আগ বাড়িয়ে ধরা দিতে আসা কারো কারো চোখে তাজ্জব ঠেকলেও ঠেকতে পারে। এবং সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল কুকুর-ধরা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই এরা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল।

—'এটা খুবই স্বাভাবিক। এরা কুকুরদের কোনো বৃদ্ধাশ্রম থাকলে সেখানে চলে' যেত। অথচ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এদের শিখিয়েছে যে প্রতিবাদ বা কামড়াকামড়ি করে কোনো লাভ নেই। এমনিতেও মরবে অমনিতেও মরবে। এই বয়সে আর হুজ্জুতি পাকাতে চায় না। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা বাতুলতা।'

—'কোনোমতেই এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের বেলায় দেখা গেছে যে, সে যত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয়ে ওঠে, ততই ধীর স্থির হয়ে ওঠা মনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার বিচারধারাও তদনুরূপ হয়ে যায়। কাজেই টালাপার্ক থেকে টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা থেকে

বাঘাযতীন—নানা জায়গায় আমরা যখন প্রবীণ কুকুরদের একইরকমের রহস্যময় ব্যবহার দেখছি তখন পুরো ঘটনাটাকে স্রেফ কাকতালীয় বা অপারগ হয়ে আত্মসমর্পণ বলে না ভাবলেই বোধহয় ভালো। সব ঘটনার অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যদিও মানুষের প্রবণতাই হল তাই।'

—'আমাদের মনে হয় বিষয়টি নিয়ে অযথা বিতর্ক চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে এবং কলকাতাকে কুকুর-শূন্য করার আমাদের যে সাধু-পরিকল্পনা তার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে। মাথা যদি ঘামাতেই হয় তাহলে অনেক ব্যাপার রয়েছে। কতগুলো বুড়ো কুকুরের হাবভাগ নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা বা বিতর্ককে আর যেন আমল না দেওয়া হয়।'

—'আমরা সম্পূর্ণ অন্য প্রস্তাব দিচ্ছি এবং কোনো বিতর্কের অবতারণা ঘটানো আমাদের লক্ষ্য নয়। পিঁজরাপোল-৩ মৃত ও অর্ধমৃত কুকুরে ভর্তি। বস্তুতই সেখানে আর কুকুর ছাড়া যায় না। পিঁজরাপোল-১-এ মেরামতি চলছে। পিঁজরাপোল-২-তেও যথেষ্ট সংখ্যক কুকুর রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হল এই আত্মসমর্পণকারী বৃদ্ধ কুকুরদের পিঁজরাপোল-১-এ রেখেও মেরামতির কাজ চলতে পারে। বিজ্ঞানের স্বার্থে কয়েকটা দিন ওদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করছি।'

সন্ধ্যের মুখে ফিরে এসে বেড়ালটা দেখল জিপসিও নেই, কান-গজানোও নেই। সারাটা দিনই আজকে ওকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এদিকটায় কী ঘটেছে কিছুই জানা নেই। তবে কি কান-গজানো আর জিপসিকে ধরে নিয়ে গেল কুকুর-ধরা গাড়ি?

অসম্ভব মনখারাপ করে ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাদে শুয়ে শুয়ে বেড়ালটা আকাশ দেখতে লাগল। কান-গজানো বা জিপসি—কোনোটারই লড়াই করার মুরোদ নেই। দুটোই ক্যাবলা, ভালোমানুষ। ওদের কি সত্যিই ধরে নিয়ে গেল? রাত বাড়ল। আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের নীলচে আলোর রকমফের দেখতে দেখতে বেড়ালটা একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়লে সকলেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারে। বেড়াল দেখল সে তখন বেড়ালছানা। বেশি লাফালাফি করার সেই সুন্দর ছোটবেলা। তখন সে প্রজাপতিদেরও লাফ দিয়ে দিয়ে ধরার চেষ্টা করত। একদিন হয়েছিল কী, হঠাৎ অ্যালামোন্ডা ফুলের ওপরে কালো ডানায় সাদা, হলদে ও নীল ছিট ছিট একটা মস্ত প্রজাপতি বসে ছিল সকালবেলায়। আলতো শীতের পশ্চিমি বাতাসে হলদে ফুলটা একটু একটু দুলছে আর প্রজাপতিটার ডানা দুটো লুকোনো একটা আমেজের ছন্দে একবার করে পুরো মেলে যাচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে। রোদ ঝলমলে শীতের সকাল। এর মধ্যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। স্বপ্নে যা ইচ্ছে তাই হয়, যা ইচ্ছে হয় না তাও। ঘুম ভেঙে বেড়ালটা দেখল সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের সব তারা লালচে একটা গুমোট মেঘ আড়াল করেছে। রাস্তাটা ডানদিকে বাঁদিকে জলে ভিজে চকচকে হতে শুরু করেছে। এবারে নেমে একটা আড়াল খুঁজতে হবে। কিন্তু নামার জন্যে টানটান হয়েও সে লাফ দিল না। তলায় কিছুটা বুক সাদা জ্যান্ত অন্ধকার বসে।

—কে?

—আমি জিপসি।

—বলবি তো। আমি ভাবলাম কী রে বোবা। ভূত-টুৎ নাকি?

—শোন্, আমি আর কান-গজানো একটা জায়গায় চলে গেছি। বাদামী বলে একটা কুকুর এসে আমাদের ওখানে যেতে বলছে তাই। তা ভাবলাম তুই নির্ঘাৎ ভাববি যে আমাদের ধরে নিয়ে গেছে।

—ভাববো কী, আমি তো তাই ধরেই নিয়েছিলাম।

—আমরা ওখানে প্রায় একচল্লিশটা কুকুর আছি। দুটো বেড়ালও এসেছে।

—সে কি?

—ওদের পাড়ার কুকুরবা এসেছে, সঙ্গে ওরাও চলে এসেছে। তোকে বলতে এলাম যে তুইও আমাদের সঙ্গে চল্।

—তারপর?

—দিনদুয়েকের মধ্যে আমাদের শহর ছাড়তে হবে। মারাত্মক একটা কিছু হবে। কী তা জানি না। আমরা নির্দেশ পেলেই দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালাব। তুই এখন চলে আয়। কান-গজানোও খুব করে বলেছে।

—তাহলে বলছিস যে গেলেই ভালো।

—এখন অবদি যা শুনেছি তাতে আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। নেমে আয। চল্।

—সে না হয় যাচ্ছি কিন্তু মারাত্মক ঘটনাটা কী?

—সবই কানাঘুষো। কেউ বলছে যুদ্ধ লেগে যাবে। কেউ বলছে ভূমিকম্প হবে। কুকুবদেব বাঁচাবার জন্যে পাতাল থেকে নাকি কিছু উঠে আসতেও পারে। ঠিক কবে কিছু বলা যায না। চল্, যেতে যেতে বাকিটা বলছি।

টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে জিপসি আর বেড়াল চলে গেল। নোংরাব গাদাব মধ্যে একটা গলায দড়ি বাঁধা পুতুলও পড়েছিল। বিদ্যুৎ চমকালে এক লহমায মনে হতে পারে যে পুতুলটা এই ভিজে নোংরার মধ্যে বেশ আরাম করে বসে আছে। হাসছে কি?

পিঁজরাপোল-১-এ প্রবীণ কুকুরদের ঢুকিয়ে দিতে দেখা গেল তারা কোনো শব্দ না কবে চক্রাকার জায়গাটায় মধ্যে গোল হয়ে বাসে নিজেদের মধ্যে একবার নাক শোঁকাশুঁকি কবে নিল। তারপর নিজের নিজের জায়গাতেই আধশোযা হয়ে বসে থাকল। ওদের যখন ওখানে ছাড়া হয় তখন বেশ একরোখা রোদ্দুর। পিঁজরাপোলের বধ্যভূমির একাংশে একটি বাজে-পোড়া মরা গাছ তার কয়লার ডালপালা মেলে কিছুটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে। বৃদ্ধ কুকুরেবা যদি ওই ছায়ার জায়গাটায় সরে যেত তাহলে প্রখর উত্তাপ থেকে কিছুটা অন্তত রেহাই পেতে পারত। কিন্তু সেরকম কোনো চেষ্টাই ওরা করেনি। রোদ্দুরে মধ্যে অন্ধ সূর্য-উপাসক বা জেদি পাথরের মতো বসেছিল ওরা। চড়া রোদ্দুরে সব কুকুরই জিভ বার কবে হ্যা হ্যা করে। সেরকমও তারা করেনি। রোদ, গরম, জলাভাব, ক্লান্তি, খিদে, অবধারিত অমোঘ মৃত্যু, কঙ্কালসার হতে হতে ঢলে পড়া, অবলুপ্তি—কোনোকিছুকেই তারা তিলমাত্র আমল দেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এদের ওপরে নজর রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা যখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ল তখন সন্ধানী-আলো ফেলে দেখা গেল যে তারা একইভাবে বসে আছে এবং একফোঁটা বৃষ্টির জলও তাদের শুকনো জিভ দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে না।

এরপরে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হল তখন দেখা গেল যে সেই একই জায়গাতে উঠে বসে সেই প্রবীণ কুকুরেরা তাদের ঘোলাটে ছানিপড়া চোখগুলো অন্তরীক্ষের দিকে মেলে তাকিয়ে রয়েছে। একযোগে। বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের আলো ওই। ওই তাব মধ্যে লুব্ধক। ঘেউ! ঘেউ!

৬

...একটা কুকুর যখন বাস চাপা পড়ার পরে রাস্তায়,
চাঁদের আলোয় রক্তে ভিজে শুয়ে থাকে আর
তার শেষ চিৎকার টেপরেকর্ড করে
ইস্কুলের বাচ্চাদের শোনানো হয়...

'আমরা মোটের ওপরে বুড়ো কুকুরগুলোর ওপর নজর রেখে এবং মোটের ওপর ওদেব লক্ষ্যবস্তুব একটা আন্দাজ করে অনুমান কবছি যে ওরা বৃহৎ কুকুবমণ্ডলের দিকেই তাকিয়ে আছে। এর কারণ আমরা জানি না। সন্ধানী-আলোয় দেখা গেছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টা ওদের মুখটা একটু হাঁ করে থাকছে এবং জিভগুলো থরথর করে কাঁপছে। ওরা কি কোনো প্রার্থনা জানাচ্ছে? কুকুররা কি প্রার্থনা জানাতে পারে? বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের কী আছে যে ওরা কিছু চাইতে পারে? এখন ওই বুড়ো কুকুরগুলো যদি মরে যায় তাহলে আমরা এই অনুমানভিত্তিক পরীক্ষা আর চালাতে পারব না। তাই আমরা অনুরোধ করছি পিঁজরাপোল-১-এ অন্তত কিছু খাবারদাবার ও জল দেওয়াব ব্যবস্থা করা হোক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই উপলব্ধি কবতে পারবেন যে বুড়ো কুকুরদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে এই প্রস্তাব আমরা করছি না। আমরা যা কিছু বলছি সবই অমিত শক্তিধর বিজ্ঞানের স্বার্থে।'

ঘেউ! ঘেউ!

লুব্ধক ওরফে কুকুর-তারা ওরফে সিরিয়াস ওরফে আলফা ক্যানিস মেজরিস হল একটি যুগ্ম তারা। জার্মান জ্যোতির্বিদ ফ্রিডরিশ ভিলহেলম বেসেল ১৮৪৪ সালে এই তাবকাটির কথা প্রথম বলেন এবং যুগ্ম তারকাটিকে চাক্ষুষ দেখা যায় ১৮৬২-তে। দেখেছিলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ অ্যালভান ক্লার্ক। প্রাচীন মিশরীয়রা লুব্ধককে বলত 'সোথিস'। রোমে, সবচেয়ে গরমের সময় এই তারা দেখা দিত। ইংরেজি 'ডগ ডেজ' কথাটির মধ্যে সেই রোমক অভিজ্ঞতার রেশ রয়ে গেছে। লব্ধকের যুগ্ম তারা হল সিরিয়াস-বি। তারাদেব দুনিয়ায় এ হল একটি সাদা বামন অর্থাৎ এর পরমাণুরা ঘন সন্নিবিষ্ট হতে হতে আশ্চর্য ঘনত্ব অর্জন করেছে। আফ্রিকার ডোগন উপজাতির লোকেরা লুব্ধক ও সিরিয়াস-বি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর জানে। কিভাবে 'জংলি'রা এসব জানল (যেমন সিরিয়াস-বি হল সবচেয়ে ছোট আর ভারি তারা) তা হদিশ করা যায়নি। নীলচে-সাদা লুব্ধক সৌর পরিবার থেকে ৮০৬ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। লুব্ধক সূর্যের চেয়ে বড় এবং ২৩ গুণ বেশি উজ্জ্বল। সাদা বামন সিরিয়াস-বি-র ভরও প্রায় সূর্যের সমান কিন্তু ঘনত্ব অনেক বেশি। ঘেউ! ঘেউ!

কান-গজানো, জিপসি, বেড়াল এরা সবাই যে-ট্রান্সফরমার ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল সেখানকার নেতার নাম বাহান্ন। হলদেটে মাদি কুকুর বাহান্ন-র এরকম নাম হওয়ার কারণ, মোটের ওপরে তখন অবদি সে বাহান্নজনকে কামড়িয়েছে। অবশ্য এর জন্যে ওকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। প্রতি বছরই বাচ্চা হওয়ার সময়টাতে লোকেরা ও কম বয়সের মানুষেরা কারণে-অকারণে মা ও বাচ্চাদের বিরক্ত করে বলে মায়েরা কামড়াতে বাধ্য হয়। সেখানে একটা কুকুর ছিল যার নাম তিনপেয়ে। ছোটবেলাতেই মোটর সাইকেল একটা পা উড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতায় এরকম অসংখ্য জায়গার মধ্যে কুকুরেরা লুকিয়ে ছিল।

প্রত্যেকটা ট্রামডিপো ও পাম্পিং স্টেশনে, দুধের বুথের পেছনে ও ভাঙাচোরা গ্যারেজে,

থানার মধ্যে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টে চুরমাব গাড়িদের রাখা হয সেখানে, কবরখানা, বাসগুমটি, রোলের দোকানের তলায়, বেড়ার পেছনে, খোলা ম্যানহোলের মধ্যে, আধ-বানানো বাড়ির সিঁড়ির তলায়, বিরাট জায়গা জুড়ে দোতলা বাসের ভাগাড়ে, সুলভ শৌচালয়েব পেছনে, পার্কের মধ্যে, গাড়ি ঢুকতে পারবে না এরকম অপ্রশস্ত গলিতে, দুর্গাপুজোর জন্য বানানো পাকা বেদির পেছনে, শ্মশানে, আদিগঙ্গার ধারে বুনোকচুর জঙ্গলে, সেতুর তলায় নানা ফাঁকফোকরে—কুকুবরা লুকোয়নি এমন কোনো জায়গা ছিল না। সকলেই জানে যে বড় বড় পাইপ-এর ভেতরে মানুষ ঘরসংসার কবে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এমন মাপের পাইপ পড়ে থাকে যার মধ্যে মানুষের পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। কলকাতাব কুকুবেবা সেগুলোকেও কাজে লাগিয়েছিল। যেমন কাজে লাগিয়েছিল রাতেব বাসের তলা, ইটের পাঁজা, স্টেডিয়ামেব আশেপাশেব পবিত্যক্ত এলাকা ও বাতিল মালগাড়িব ওয়াগন। এইসব জায়গায় কুকুর-ধবা গাডি কখনও পৌছতে পাববে না। কোনো সাহসী কুকুর-ধরা যদি একা একা সাঁড়াশি হাতে যায় তাহলে তাকে বিপদের মুখে পড়তে হবে। বাঁধা মাইনের চাকবিতে অত ঝুঁকি নেওয়া চলে না। সবাই তো আর মিলিটাবি নয়।

কুকুর-উপকথার মধ্যে গল্পেব সঙ্গে সঙ্গে সত্যি বা চিরন্তন ঘটনার মিশেল থেকেই যাচ্ছে। শুধু সিমেন্ট দিয়ে কোনো কাঠামো বানানো যায না। বালি, জল, লোহার রড—অনেক কিছু লাগে।

প্রচণ্ড গবমের মধ্যে (৯৫,১১৩ ও ১২২ ডিগ্রি ফাবেনহাইট) কুকুরদের ট্রেডমিল ব্যায়াম কবিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হযেছে। আরও যে বিভিন্ন ধবনের পবীক্ষা কুকুবদেব ওপবে চালানো হয়েছে তা বিভিন্ন ফাইলেব শিরোনাম দেখলেই বোঝা যাবে—

Accleration, Aggression, Asphyxiation, Blinding, Burning, Centrifuge, Compression, Concussion, Crowding, Crushing, Decompression, Drug Tests, Experimental Neurosis, Freezing, Heating, Hemorrhage, Hindleg Beating, Immobilization, Isolation, Multiple Injuries, Prey Killing, Protein Deprivation, Punishment, Radiation, Starvation,' Shock, Spinal Chord Injuries, Stress, Thirst.
এই তালিকায় কোনো শব্দ নেই। আর আছে–চিমটে দিয়ে শরীরের কোনো অংশ ছিঁড়ে নেওয়া, থ্যাৎলানো, হাতুড়ির বাড়ি মারা, ঘুরন্ত ড্রামের মধ্যে গড়ানো, গুলি করা, ফাঁস দিয়ে শ্বাসবোধ করা ইত্যাদি। সবই বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান কবাব জন্যে।

'পাঁচমিনিট পরে কাঁপুনি দমকে দমকে শুরু হল। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম মিনিটের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। ১১শ থেকে ১৩শ মিনিটের মধ্যে শ্বাসের সংখ্যা কমে মিনিটে তিনটিতে নেমে এল এবং এই পর্বটির শেষেই শ্বাসক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এর আধঘণ্টা পরে ব্যবচ্ছেদ শুরু হল'—এই পরীক্ষা কিন্তু কুকুরের ওপর হয়নি। হয়েছিল কোনো ইহুদি, রুশ বা পোল যুদ্ধবন্দীর ওপরে। বাতাসের চাপ কমাতে থাকলে কী হয় তা জানার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি করেছিল নাৎসি ডাক্তারেরা। অতএব মানুষ যে শুধু কুকুব ও অন্যান্য প্রাণীদের ওপরেই পরীক্ষা চালিয়েছে এমন নয়। বিজ্ঞানের জয় হোক। ঘেউ! ঘেউ!

দেওয়ালের ওপরের দিকে একটা গর্ত ছিল। কিন্তু সেটা মানুষ ঢোকার। ওই গর্তটা করেছিল পাতাখোর চোরেরা। ওরা ওখান দিয়ে লোহালক্কড়, তার, টুকটাক যন্ত্রপাতি—এইসব টুকরো মাল ঝাড়বে ভেবেছিল। খুব একটা লাভ হয়নি। সে-সব যা টানার মতো ছিল সে তো কবে

উধাও হয়ে গিয়েছিল। জগু আব ভজুয়া গিযে দেখল গর্তটা নীচেব দিকে বাড়াতে না পারলে দুবলা বা বুড়ো, বাচ্চা বা কমজোরি মায়েরা ঢুকতে পারবে না। পুবো একটা রাত্তির ওদের লেগেছিল গর্তটা বাড়াতে। মেট্রোরেলের সীমানাটা টালিগঞ্জের দিকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রেললাইন ফুবিযে যাওযাব পবেও অনেক, অনেক জায়গা রয়েছে। সেখানে কেউ যায় না। অনেক বছর ধরে গাছ ও আগাছা, ইট, রেলেব স্লিপাব, জমাট বেঁধে যাওযা সিমেন্টেব বস্তা—এইসব মিলেমিশে সেখানে একটা দুর্ভেদ্য পরিবেশ তৈবি হয়েছে। তেলাকুচো ও অন্যান্য লতানো গাছ জায়গাটাকে এমনভাবে জড়িযে জডিয়ে ঢেকেছে যে কোথাও কোথাও রোদ্দুর বা আলো, কিছুই ঢোকে না। বরং সবুজ অন্ধকার থাকে যার সঙ্গে পচা পাতা, গাছের কষ ও ভিজে মাটিব গন্ধ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হাওযা ঢোকে কম। এই আর্দ্র ছাযায অসংখ্য পাতালকোঁড হয় এবং গোল গোল গেঁড়ি অবাধে ঘুরে বেড়ায। পবের বাতে ওই গর্ত দিয়ে প্রায় দেডশো কুকুর মেট্রোবেলের এলাকায ঢুকে আশ্রয় নেয়। এদেবই মধ্যে ছিল পাটকিলে আব তার চাবটে বাচ্চা। কলকাতাব কুকুরদেব বাঁধা এলাকা থাকে। জায়গাব দখলদারি রাখতে ঝগড়া থেকে সংঘর্ষ, গব্‌গব্‌ করে বাগ দেখানো থেকে শুরু করে রক্তক্ষয়ী কামড়াকামডি সবই হয়। কিন্তু কুকুব ধরার অভিযানের সময় এসব আর মাথায় রাখা সম্ভব হয়নি। তাডা খেয়ে কুকুরদেব দঙ্গল বেঁধে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পালাতে হযেছে। সবাই পালাতে পাবেনি। কোনো কোনো অন্ধ বা চোখে কম দেখতে পাওয়া কুকুব ফ্লাইওভার বানাবাব জন্যে খোঁড়া, গভীব জলজমা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। হয জলে ডুবে মারা গেছে বা কাদার ঢালের ওপব দিয়ে বারবাব ওঠাব চেষ্টা কবে পিছলে নেমে গেছে। সারা রাত ধরে কলকাতাব বাজারে যে লবিব কনভয় আসে তার হেডলাইটের রাক্ষুসে আলোয় চোখ ধাঁধিযে অনেক কুকুর রাস্তায় দাঁড়িযে পডছে। লবির পর লবি, চাকাব পবে চাকা তাকে পিষে পিষে, গুঁডিযে, রাস্তাব পিচেব সঙ্গে লেই-এর মতো মিশিয়ে দিয়েছে। ঠাঁইনাড়া বা হটাবাহার হলে সকলেই কেমন যেন দিশেহাবা হয়ে পড়ে। কলকাতার কুকুরদের বেলাতেও এর অন্যথা ঘটেনি।

ট্রান্সফবমারের ঘবে সব কুকুরই, এমনকী বাচ্চাগুলোও চুপচাপ বসেছিল। শুধু একটা পাঁজবভাঙা বোগা কুকুর ঘুমের ঘোরেই গোঙাচ্ছিল। জিপসি আর কান-গজানো ফিসফিস করে গল্প করছিল আব তাদেব দুজনের মধ্যে, দুজনেবই গায়ের গরম থেকে আরাম পেয়ে গুটিসুটি মেবে ঘুমোচ্ছিল বেড়াল। দরজাব দিকটায় শুয়ে শুয়ে বাহান্ন বাইরের দিকটায় নজর বাখছিল আর বাতাস শুঁকে শুঁকে বা কান পেতে প্রায অস্ফুট সব কম্পন থেকে কোনো খবর বা অন্যকিছুর জন্য সজাগ সন্ধান চালাচ্ছিল। কান-গজানো জিপসিকে বলল,

—তোকে তো ভদ্দরলোকেরা অনেকদিন পুষেছিল।

—পুষেছিলই তো।

—তাহলে নির্ঘাৎ টিভি-ও অনেক দেখে থাকবি।

—দেখব না কেন?

—তাহালে একটা বেশ ভালো গল্প বল্‌ না। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব।

—টিভির গল্পগুলো একেবারেই ফালতু। একটা ভালো গল্প শুনবি তো বলতে পারি।

—বল্‌।

বাইরে কারা যেন টহলদারি করছে। তাদের বুটেব শব্দ কাছে আসে। ট্রান্সফরমারের ঘবে টর্চের আলো পড়ে। টহলদাররা চলে যায়। পাঁজর-ভাঙা কুকুরের গোঙানির আওয়াজটা ওদের কানে যায়নি। ওদের বুটের আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরে বাহান্ন বলল—

—জিপসি!

—কী?

—তুই বরং গল্পটা জোরেই বল। যারা জেগে আছে তারা সকলেই শুনবে। আমারও শুনতে ইচ্ছে করছে।

—দাঁড়া। তাহলে উঠে বসে বলি। আমাদের এই গল্পটার নাম হচ্ছে 'ক্ষুধার্ত কুকুব'। এক মস্ত বড়ো রাজা ছিল।

—উফ্, ফের সেই রাজা-গজা।

—শোনই না, কী হয় তারপর। সেই রাজা ছিল অসম্ভব অত্যাচারী। বিনা কারণে অত্যাচার করাতেই সে আনন্দ পেত। তা একবার হল কী, বুদ্ধদেব সেই অত্যাচাবী রাজার বাজ্যে এলেন। সেই রাজা তখন বুদ্ধকে বলল, হে তথাগত, তুমি কি আমাকে এমন শিক্ষা দিতে পারো যাতে করে আমার মনটা অন্যভাবে ভাবতে পারে? বুদ্ধদেব তখন বললেন, আমি তোমাকে 'ক্ষুধার্ত কুকুরের' গল্পটা বলছি। মন দিয়ে শোন—

'এক ছিল অত্যাচারী সম্রাট। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য ইন্দ্র শিকারি সেজে তার বাজ্যে এলেন। সঙ্গে ছিল ভীষণ এক বিশাল কুকুরের রূপে মাতালি রাক্ষস। শিকারি আর কুকুব সম্রাটের প্রাসাদে ঢুকল। কুকুরটা এমন জোরে ডাকতে লাগল যে গোটা প্রাসাদটা ভিত্ অবধি থবথর কবে কেঁপে উঠল। সম্রাট তখন সেই শিকারিকে ডেকে ওই ভয়াবহ ডাকের কী কারণ তা জানতে চাইল। শিকারি বলল, ওর ক্ষিদে পেয়েছে তাই ডাকছে। ভীত সম্রাট তখন কুকুরকে খেতে দিতে বলল। পুরো রাজবাড়ির সব খাবার শেষ হয়ে গেল। কুকুরেব ডাক থামে না। সম্রাটের খাদ্য-ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কী? সম্রাট তখন বলল, এই ভয়াবহ জানোয়ারটার খিদে কি কিছুতেই মেটানো সম্ভব নয়? শিকারি বলল, না যতক্ষণ না ও ওর শত্রুদেব মাংস, হাড় সব চিবিয়ে না খাবে ওর খিদে মিটবে না। সম্রাট তখন বলল, কারা ওই বিশাল কুকুরেব শত্রু? শিকারি বলল, এই রাজ্যে যতদিন মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে ততদিন ওর ডাক বন্ধ হবে না এবং গরিবদের ওপরে যারা অত্যাচার করে, অন্যায় করে তারাই হল ওর শত্রু। ভীত সম্রাট তখন নিজের কুকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হল এবং প্রজাদের ওপরে জুলুম কবা বন্ধ করল।

গল্পটা শেষ করে বুদ্ধদেব ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া সেই রাজাকে বললেন, যখনই শুনবে যে ওই কুকুরাটা ডাকছে তখনই বুদ্ধের শিক্ষার কথা মনে কবো। এতে করে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

গল্পটা শেষ হওয়ার পরে সকলেই চুপ করে ছিল। বাহান্ন বলে উঠল,

—গল্পটা খুবই ভালো। কিন্তু আমার কথা একটাই। আমাদের ওপরে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তা বন্ধ করার কি কোনো উপায়ই নেই? বুদ্ধদেব, ইন্দ্র, মাতালি অথবা অন্য কেউ কি আমাদের হয়ে একটাও কথা বলবে না?

কান-গজানো হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠল। সবাই চমকে গেছে।

—আমি শুনতে পাচ্ছি।

—কী!

—অনেক কিছু হচ্ছে, একই সঙ্গে।

—কী? কী হবে?

—বলো!

—চুপ করে থাকিস্ না।

—ম্যাঁও।

—বলছি। ছায়া-কুকুরেরা এবার দৃশমান হবে। ওরা যাকে পাঠিয়েছিল সে বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশ চিরে বাজ পড়ার শব্দ হল। বৃষ্টি নামল। ঘেউ। ঘেউ!

—কে বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে?

কান-গজানোর ওপরে কিছু একটা ভব কবেছে। তা না করলে সে এসব কথা জানবে কী করে? কিন্তু সর্বশক্তিমান বিজ্ঞান কি ভর মানে? না। বিজ্ঞান ভর না মানলেও আবেশ মানে। না মানলেই বা কি এসে গেল?

—বার্তা নিযে ফিবে এসেছে অনুবিস।

—অনুবিস?

—হ্যাঁ, অনুবিস। পোড়ামাটির বঙ তার গায়। তার প্রতীক হল পাথবের শবাধার বা কাঠের কফিন। অনুবিস হল সেই মিশরীয় শিকাবী হাউন্ড যে এ-পৃথিবী থেকে পরবর্তী বিশ্বে যাতায়াত কবতে পাবে। অবশ করে দেওযার জাদু সে জানে। সে হাবানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। আত্মা বা 'বা'-কে সে বক্ষা কবে। রহস্য উন্মোচনকাবী নপথিস বা বিচারক ওসাইরিসের কাছে সে প্রার্থীকে নিযে যায। অনুবিস বার্তা নিয়ে ফিবে এসেছে। বাইরে যে ঝড় উঠছে দেখছ তা হল বার্তা পেয়ে ছায়া-কুকুবদেব উল্লাস।

—কিন্তু কী আছে সেই বার্তায?

—জানি না। তবে আমাদের জন্যে নির্দেশ আসছে।

—কে আনছে?

—বাদামী। আমি তার পাযের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাদামী আসছে। ছায়া-কুকুররা দৌড়োচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকালে তাদের ছায়া গোটা শহরেব ওপবে চমকে উঠছে। ওই তো সবার আগে দৌড়চ্ছে লাইকা। তার পেছনে ভেলু। পাশে দৌড়চ্ছে কারা? ওরা হল শ্মশানের কুকুর। কালু, ভুলু, জামভোলা, বড়শ্বেতফুল, মড়িমা, সাবলিদিদি, বুড়োবাবা, বুড়িমা, ছোটশ্বেতফুল, দুর্গা, পদি, হরিব মা, থরথবি, ফুলটুসি, হবহরি, বাঘা, রাঙ্গুবাবু—সবাই দৌড়োচ্ছে।

কান-গজানো ভুল বলেনি। সাবা গা চুপচুপে ভিজে। সমস্ত লোম লেপটে রয়েছে সারা গায়। বাদামী এল।

—সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

—সবাই আছি। ঠিকই আছি।

—আজ মাঝবাতে, সবাই মন দিযে শোনো, হঠাৎ তোমরা দেখতে পাবে যে কুকুরদের একটা বিশাল দল কাছে আসছে। তোমারা শযে শযে পায়ের শব্দ পাবে। পেলেই তোমরা বেরিয়ে আসবে।

—কোথায়?

—বাস্তায়। তারপর সেই দল যেদিকে যাবে তোমরাও চলতে থাকবে। মোদ্দা কথা আমাদেব কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে যেতে হবে।

—কোথায় যাব আমরা?

—দূরে। অনেক দূরে। আর শোন, সবাইকে ছুটতে হবে। দরকার হলে পালা করে বাচ্চাদের মুখে নিয়ে ছুটতে হবে। যারা দুর্বল, অসুস্থ বা চোট পেয়েছে তাদেরও সঙ্গে কাঁধ লাগাতে হবে।

—অনুবিস কী বার্তা এনেছে তুমি জানো?

—তুমি অনুবিসের কথা জানলে কী করে?

—কী করে তো বলতে পারি না। কেমন একটা ভরেব মতো হয়েছিল।

—কী বার্তা সেটা আমিও জানি না। আমাকে যতটা জানাতে বলা হয়েছে ততটাই আমি বললাম।

—এখন তুমি কোথায় যাবে?

—আমি? আমাকে এখন অনেকগুলো জায়গায় খবর দিতে হবে। আমি বরং আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাই।

বাদামী তুমুল ঝড়বৃষ্টিব মধ্যেই যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

বাহান্ন একবার ফাঁকায বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার ফুঁড়ে লক্ষ লক্ষ তীর হয়ে বৃষ্টি নামছে। বাহান্ন ঘরে ফিবে এল। জিপসি বলল,

—আমরা সবাই যাব কিন্তু পাঁজব-ভাঙা আমাদেব সঙ্গে যেতে পারবে না।

—কেন?

—গোঙাচ্ছিল। কোন ফাঁকে মরে গেছে আমরা বুঝতে পারিনি।

৭

জ্বেলেছ কি জ্বালাব আগুন
খুনের বদলা জেনো খুন
নাচালেই বেয়াদব ঝুঁটি
ঝুলব কামড়ে ধরে টুঁটি

—হ্যালো। হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন। ১ নম্বর পিঁজরাপোল থেকে বলছি।

—শোনা যাচ্ছে তবে লাইনে ঝড়ের মতো শব্দ হচ্ছে।

—এখানে একের পর এক আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটছে।

—সারা কলকাতা জুড়েই আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে কুকুরেরা। ওখানকার কী অবস্থা।

—এমনিতে খারাপ কিছু নয়, কিন্তু ঝোড়ো বাতাসে আমরা কুকুরের কান্না শুনতে পাচ্ছি। ওদিকে বুড়ো কুকুরেরা সবাই একসঙ্গে সামনের থাবাগুলো ওপরে তুলে আকাশে কী যেন সব বলছে যদিও কোনো বোধগম্য শব্দ আমাদের কানে আসেনি।

—ওখানে যা হচ্ছে সব ভিডিওতে তোলা থাকছে তো? এদিকে বি. বি. সি. আর সি. এন. এন ওদের খবরে কুকুরদের মিছিলে ছবি দেখিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমাদেরও দেখাতে হচ্ছে।

—এবারে শুনুন। ওই বুড়ো কুকুরদের মধ্যে আমরা হঠাৎ দেখলাম একটি বিশাল কুকুর যার চোখ দুটো আগুনের আলো নিয়ে জ্বলছে। একজন এখানে বলছে যে ইজিপশিয়ান মিথলজির বইতে অনুবিস-এর যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে পুরো মিলে যাচ্ছে। সেই টেরাকোটা রং, লম্বাটে শিকারি হাউন্ডের গড়ন। পিঁজরাপোল-১ নম্বর তিনদিন ধরে তালাবন্ধ। কোথা দিয়ে অতবড় কুকুরটা ঢুকল আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

—অন্যান্য অনেক জায়গাতেই নাকি ওই কুকুরটিকে, যাকে আপনারা অনুবিস বলছেন, দেখা যাচ্ছে।

—এদিকে সহসা অনুবিসকে আব দেখা যাচ্ছে না। গোটা পিঁজরাপোল জুড়ে ওরা গোল হয়ে নাচছে। ধুলোতে ওদেব থাবা এত জোবে ঘষছে যে ফুলকি ঠিকরে বেবোচ্ছে. .

—অসম্ভব শব্দ হচ্ছে. অসংখ্য শেকল আছড়ালে যেমন..

—আমবা ১ নম্বব পিঁজবাপোল খুলে দিচ্ছি।

—এখানে কিছু শোনা যাচ্ছে না...

—আমবা ২ ও ৩ নম্বর পিঁজরাপোলও খুলে দেবাব নির্দেশ পাঠাচ্ছি...

—কিছু শোনা যাচ্ছে না

—হ্যালো! হ্যালো!

কুকুবদেব মিছিল কেন, এই কুকুবেব সচল নদী, কুকুবের এই লাভাস্রোত যাই বলা হোক না কেন এ দৃশ্যকে প্রকাশ কবার ভাষা আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর কোথাও, কখনও এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের কেউ বলেনি। জীবজন্তুদেব মধ্যে এবকম ব্যাপক মাইগ্রেশন হতেই পাবে বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে কবছেন। কিন্তু আমেরিকাতে লেমিংদের গণ-আত্মহত্যাব সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ হাজার হাজাব কুকুর প্রায় নীরবে, গম্ভীব মুখে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই যে বিশাল আলোকিত সেতুটি আপানারা দেখছেন এটি হল গঙ্গাব উপবে নির্মিত দ্বিতীয় সেতু। কুকুবদের মহামিছিল এই সেতু দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আত্মহত্যাব কোনো অভিপ্রায় থাকলে ওরা ওপর থেকে লাফ দিতেই পারত। নীচেই গভীর জল। বোঝা যাচ্ছে যে ওবা শহব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখুন—পুলিশের একটি পাইলট-ভ্যান এবং কোনো মাননীয় মন্ত্রীর গাড়ি কুকুব-সমুদ্রেব মধ্যে অসহায় হযে দাঁড়িয়ে বযেছে। পাইলট-ভ্যানটির মাথায় নীল আলো জ্বলছে নিভছে। মন্ত্রীব গাড়িব ওপবে জ্বলছে লাল আলো। কলকাতার এই সচল কুকুর-সমুদ্র আপনাদেব দেখাচ্ছে সি. এন. এন । একটি ছোট্ট ব্রেকেব পব আমবা আবাব এই আশ্চর্য দৃশ্যে ফিবে আসব. .

গড়িয়াহাট রোডের দুটি লেনই একমুখী কুকুরের স্রোতে বন্ধ। কুকুর-নদী বয়ে চলেছে বাইপাসেব দিকে। চারপাশের যত গলি ও ছোটখাটো রাস্তা—সবদিক দিয়েই কুকুররা আসছে। কেউ ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আসছে। কেউ মাঝে মধ্যে থেমে গিয়ে ল্যাজে বসা মাছিকে ধাওয়া করছে। আসছে ছোট ছোট কুকুর-ছানারা যাবা এখনও চিন্তাই করে উঠতে পারছে না যে কত দীর্ঘ পথ তাদেব যেতে হবে। বড় বড় বাড়ি, বুটজুতো-পরা পা, গাড়ির বাক্ষুসে চাকা, কোনোদিনও ওপাবে পৌছোন যাবে না এমন রাস্তা, ট্রাক, বড বড আলোওয়ালা দোকান যার সামনে হাতে জিনিস-ভর্তি লোকেরা খালি মাড়িয়ে দেয়, সাইকেল, হিংস্র মোটরবাইক, মিনিবাস—এই সবকিছু, যাব মধ্যে পরতে পরতে ভয় মিশে আছে, যা সবসময বুঝিয়ে দেয় যে তোরা ফালতু, দুবলা, ভীতু, তোদের চোখে ভয়ের পিচুটি—সেই ভয় দেখানো সবকিছু কেমন চুপ, কোণঠাসা ও অচল হয়ে পড়েছে। কাঁউ! কাঁউ। এই তো আমরা ছোট ছোট গলাতেই ডাকছি। হ্যাঁ, সবকিছু আজ আমাদের দখলে। ফুটপাতের কোনো প্রায়ান্ধকার কোণে, মায়ের পেট ঘেঁষে শুয়ে ড্যাবডেবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা তোমাদেব কেরামতি অনেক দিন, অনেক যুগ, অনেক জন্মাজন্মান্তর ধরে দেখেছি। এবারে বারান্দায় ভিড় করে বা পর্দা সামান্য সরিয়ে বা গাড়ির ভেতরে বসে জানালার কাছ অসহায়ভাবে তুলে দিয়ে বা টিভির পর্দায তোমরা আমাদের দেখ।

আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। বড়োরা যেতে বলেচে, যাচ্ছি। হ্যাঁ, তোমাদের শহর, তোমাদের দোকানপাট, তোমাদের বাজার, হোটেল, মুরগি কাটার বঁটি, মাংস ঝলসাবার লৌহশলাকা, টিভি টাওয়ার, কসাইখানা, থানা, বন্দুক, লাঠি, পতাকা, সি ডি প্লেয়ার, তোমাদের সার্জন, অ্যানাসথেসিস্ট, নেতা—সব তোমাদেরই থাকছে। আমরাই চলে যাচ্ছি। তবে মাথা নিচু করে নয়। সসম্মানে। তোমরা বসে বসে আমাদের প্রত্যাখ্যানে অভিশপ্ত শহরে অন্ধ যখের মতো এবার তোমাদের ধন-সম্পদ আগলাও। চলে যাচ্ছি ট্রামলাইন, চলে যাচ্ছি ফোয়ারা, চলে যাচ্ছি জেব্রা ক্রসিং, বিকল হয়ে যাওয়া ট্রাফিকের আলো, বর্শা দিয়ে বানানো রেলিং, চলে যাচ্ছি আকাশে কাটাকুটি খেলা কেবলের তার, রোলের দোকানে তাওয়ার এরিনাতে খণ্ড খণ্ড ক্লাউন মাংসের ওলট-পালট খাওয়া, চলে যাচ্ছি হতভম্ব জলের কল, ঝাঁঝরি, পিঁপড়েতে খেয়ে নেওযা গাছের গুঁড়ি, দাঁত উপড়ে নেবার চেয়ার, চলে যাচ্ছি, চলে চলে যাচ্ছি দলে দলে, বড়দের সঙ্গে, আমরা ছানা-কুকুররা। তোমরা তোমাদের পিঁজরাপোল নিয়ে আনন্দে থাকো, বিকেলে ভেতরে বেড়াতেও পাবো বা নিজেরা নিজেদের আটকে রেখে, না খেতে দিয়ে, না জল দিযে মজা করতে পারো। আমাদের ছোট ছোট পা খুব একটা জোরে ছুটতে পাবে না। কিন্তু চেষ্টা করছি আমরা বড়দের সঙ্গে সমানতালে থাকার। তোমাদের নিষ্ঠুরতা, তোমাদের অবজ্ঞা, তোমাদের নির্মমতা, তোমাদের লোভ, তোমাদের অজ্ঞতা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না? হ্যাঁ, যাওয়ার সময়ে সগর্বে, মাথা উঁচু কবে বলে যাচ্ছি কথাগুলো, কিন্তু কোনো কিছুই বোঝার ক্ষমতা তোমাদেব নেই। মরুভূমির চোরাবালিতে বা মেরুব তুষাবঝড়ে তলিযে যাওয়ার সময়, চাপা পড়ার সময়, অন্তিমলগ্নে বিশ্বাসঘাতকদের এরকমই হয়। আমাদের ছোট ছোট কানগুলো লাফাতে লাফাতে তোমাদের ওপরে যা নেমে আসছে তাকে সম্মতি জানাচ্ছে। এত সংখ্যায় আমরা, ছোট কুকুরছানারা, কখনও এক জায়গায় হইনি। হলামই বা যদি খেলা করার বা এর ওর সঙ্গে চেনাশোনা করার কোনো ফুরসৎ নেই। এর জন্যে দায়ি কারা? তোমরা। এই যে আমাদের খিদে পাচ্ছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে, শক্ত রাস্তায় নবম থাবা আর নখ ব্যথা ভুলে অবশ একাগ্রতায় এগিয়ে চলেছে, এই কুকুর-সমুদ্রের ঢেউ, এই কুকুর-রাত্রি এর জন্য দায়ি কারা? তোমরা। হ্যাঁ, হাতে ওয়াকিটকি, কোমরের হোলস্টারে রিভলভার, চোখে কালো চশমা, পা ফাঁকা করে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সার্জেন্ট, তুমি খিলান বা দরজার মতোই দাঁড়িয়ে থাকো। নড়লেই আমাদের গায় পা লাগবে। এবং ঘটনাটা যদি একবার ঘটে তাহলে আজ কেন, আর তোমার কখনই বাড়ি ফেরা হবে না। মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ফল, কোল্ড ড্রিংকস্ বোঝাই যত লরি আটকে গেছে তারা চালকেরা সাবধান। একটা চাকাও যদি একটুও গড়ায় তাহলে এই বিশাল শান্ত সমুদ্র কিন্তু একটা বিরাট হাঙর হয়ে হাঁ করবে যার মধ্যে প্রবেশ করলে আর বেরোবার রাস্তা নেই। হেডলাইটগুলো নিভিয়ে দাও। আমাদের চোখে লাগছে। কাঁউ! কাঁউ!

হেডলাইটগুলো পর পর নিভে যায়। যেন দৈত্যরা একে একে অন্ধ হয়ে গেল। সার্জেন্টও তিলমাত্র নড়ে না। তার কালো চশমায় কুকুর-মিছিলের প্রতিফলন। হোলস্টারের ভেতরে রিভলভার ঘামছে। স্ট্যাচু! অবশ্য এমনই অভব্য যে সহসা 'হাইল হিটলার' বলে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। এবং কে বলতে পারে যে আরও বহু গলনালি ও মুখের কোটর থেকে এই চিৎকারকে অনুরূপ হুংকার দিয়ে সমর্থন জানানো হবে না? কলকাতা এখন মাফিয়ার শহর। এই শহরে কুকুরদের পক্ষে থাকা অসম্মানজনক। তাই এই শহরকে চারপায়ে লাথি মারতে মারতে তারা চলে যাচ্ছে। ঘেউ। ঘেউ।

কান-গজানো বলল,

—জিপসি, এরকম দৃশ্য কলকাতা কখনও বাপের জন্মে দেখেনি।

—দেখেনি, আর দেখবেও না।

—মুখগুলো দেখেছিস ; কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। আমতা আমতা করেও একটা কথা মুখে সরছে না।

—আসলে ভেবেই পাচ্ছে না যে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। বেশি বুদ্ধি যারা ধরে তাদের শেষে এরকম বোবা মেরে যেতে হয়।

—আমার কিন্তু ওদের জন্যে একটু খারাপও লাগছে। কেমন নিয়তির হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছে।

—বৃহন্নলার। দেখতে মানুষের মতো। আসলে বৃহন্নলার। আমার কিন্তু ওদের জন্যে এতটুকু খারাপও লাগছে না।

—ওরা কিন্তু এখনও জানে না যে কী হতে চলেছে।

—ঠিক এরকমই হয়। অনেক কিছুই জানা থাকে না। হঠাৎ আকাশ ভাঙার মতো নেমে আসে।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করেনি যে বাদামী আর বেড়ালও এই ম্যারাথন যাত্রায় ওদের পাশে এসে পড়েছে।

—এই! তোরা বেকার কথা বলে দম নষ্ট করছিস কেন? আমাদের আরও জোরে চলতে হবে। জোরসে

—কোথায় যাচ্ছি আমরা? সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না। জায়গাটা জানা থাকলে সুবিধে হত না?

কোনো জায়গা নেই। যতটা পারা যায় দূরে চলে যেতে হবে। যতটা পারা যায়।

দুনিয়ার খবর জানাচ্ছে বি.বি.সি। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে। সে যেখানেই হোক। আমাদের ভ্রাম্যমান সংবাদদাতারা প্রতি ঘণ্টায় খবর পৌঁছে দিচ্ছে আপনাদের ঘরে ..আমরা কলকাতাকে জানি 'সিটি অফ দা ড্রেডফুল নাইট' হিসেবে বা 'দা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সুবাদে। কিন্তু ভবিষ্যতের পৃথিবী কুকুরদের এই মহা এক্সোডাস-এর জন্যেই ক্যালকাটাকে জানবে। কলকাতা থেকে বাইরের দিকে যত রাস্তা বেরিয়েছে, সব রাস্তা, সব জাতীয় সড়ক বা এক্সপ্রেসওয়ে চলমান কুকুরের দঙ্গল দখল করে নিয়েছে। অসমর্থিত খবরে প্রকাশ যে 'নাসা'-র জনৈক বিজ্ঞানী নাকি লাতিন আমেরিকার একটি টিভি চ্যানেলে বলেছেন যে কলকাতার ওপরে মহাবিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। এর বেশি তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। জেনিভাতে জনৈক দেশত্যাগী রুশ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বলেছেন যে এই বিপর্যয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য 'নাসা'-র কাছে রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কোনো খবর জানাচ্ছে না।

আমাদের ক্যামেরা এখন রাস্তার পাশে। কুকুরদের উচ্চতাতেই রাখা। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে পাপি-দের কাঁই! কাঁই! কাঁউ! কাঁউ! এছাড়া একমাত্র যে-শব্দ তা কুকুরদের হাঁপানোর। জানা গেছে যে মুষ্টিমেয় বেড়ালও এই শহরত্যাগী কুকুরদের দলে রয়েছে। পিঁজরাপোল-১, ২, ও ৩ খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ২ ও ৩-এ অসংখ্য কুকুরের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নেই। কলকাতাবাসী যে বিজ্ঞানীর আবেদনে শেষ অবধি পিঁজরাপোল খুলে দেওয়া হয় আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে একটু আগেই বলেছেন...(ঝিরিঝিরি

পর্দা ও যান্ত্রিক কোলাহল)...

বি. বি. সি : আপনি তো এই গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে গোড়া থেকেই জড়িত। কী মনে হচ্ছে আপনার?

বিজ্ঞানী · আমার মনে হচ্ছে কুকুরদের ওপরে নিপীড়নমূলক অভিযান চালানো খুবই অন্যায় হয়েছে। এতটা স্পষ্টভাবে না বললেও আগেই আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম...এখন সত্যি বলতে আমি আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

বি.বি.সি : কিসেব ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না?

বিজ্ঞানী : এই কুকুরটির ফোটোগ্রাফ দেখুন। টেরাকোটা রঙ। বিশাল চেহারা। সাধারণ বড কুকুবের অন্তত তিনগুণ। এবার দেখুন, মিশরীয় মিথলজিব বইতে অলৌকিক কুকুব-দেবতা অনুবিসের ছবি। কী করে এরকম ঘটা সম্ভব?

বি.বি.সি এই ফোটোটি যে জাল নয় তার প্রমাণ কী?

বিজ্ঞানী · তাব মানে? আমি নিজে ছবিটা তুলেছি।

বি.বি.সি . আপনার কী মনে হয়? কী হতে চলেছে?

বিজ্ঞানী · আমি জানি না। বিশ্বাস করুন আমার কোনো আন্দাজই নেই এ ব্যাপাবে। তবে আমার মন বারবার বলছে যে ভালো কিছু হবে না, হতে পারে না..

আমাদের প্রতিনিধি বলেছেন যে এই অসংলগ্ন কথার থেকে কোনো স্পষ্ট হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়।

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড কিংডম ও জার্মান দূতাবাস থেকে কলকাতা দূতাবাসেব কর্মীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কুকুরদেব এক্সোডাস সম্বন্ধে নতুন খবর পাওয়া মাত্র আমবা আপনার জানাব. স্টে টিউনড্

কুকুর-সমুদ্রের ওপরে উড়ছিল ছায়াপথ ধরে ছায়া-কুকুরেরা। সেখানে মেঘে মেঘে পা বেখে এগোতে হয়।

লাইকা বলল,

—ওদের গতি আরও বাড়ানো উচিত। এখনও ওরা বিপদসীমা পেবোযনি।

অনুবিস জবাব দিল,

—তবে পেরিয়ে যাবে। এখনও সাত ঘণ্টা বাকি আছে।

৮

উজ্জ্বল সূর্য গিয়েছিল নিভে, আর তারারা
অনন্ত মহাশূন্যে অন্ধ হাতড়ে বেড়ায়,
রশ্মিহীন ও পথবিহীন এবং বরফ পৃথিবী
দৃষ্টিহীন, কৃষ্ণতর, চন্দ্রবিহীন আকাশে ;
সকাল আসে ও যায়, ফের আসে,
কিন্তু আনে না কোনো দিন...

জর্জ গর্ডন বায়রন

সাত ঘণ্টা, মাত্র সাতটা ঘণ্টা আব বাকি আছে। সাত ঘণ্টা মানে চারশো কুড়িটা মিনিট। খুব একটা অভাবনীয় মাপের কিছু নয়। মাত্র পঁচিশ হাজার দুশোটা সেকেন্ড। সময়-এর এই খণ্ড দৌড়ে পেরিয়ে যেতে একটা ঘুমই যথেষ্ট। তবে পুরোটাকে ঘুম বলা যাবে না। খুব সামান্য সময়েব জন্যে হলেও দু-একটা স্বপ্ন দেখতে হবেই। মোটের ওপব সাত ঘণ্টার অপেক্ষা। আব ঘুমোতে যে হবেই বা ঘুম যে আসবেই এমন কোনো কথা নেই। ঘেউ! ঘেউ!

আগেই জানানো হয়েছে যে তিনটি পিঁজবাপোলই খুলে দেওযা হযেছিল। এর মধ্যে ২ ও ৩ নম্বব পিঁজরাপোলে বলতে গেলে সব কুকুবই মবে গিয়েছিল। পিঁজবাপোল-১-এ যে প্রার্থনাব ও বুড়ো কুকুবেবা ছিল তাবা কিন্তু সশব্দে দবজা খুলে দেওযার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি। চড়া আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে ও বন্দুকেব ফাঁকা আওযাজ কবে তাদেব সচকিত কবাব সব চেষ্টা ব্যর্থ হয। শেষ সময়টাতে কী ঘটেছিল তা জানা যাবে না কিন্তু আন্দাজ কবা যায় যে অন্তিম সাত ঘণ্টা তাবা তাদের জাযগা ছেড়ে নড়েনি। শেষ মুহূর্তে তাবা একসঙ্গে হেসে উঠেছিল কি না হদিশ কবার আর কোনো উপায় নেই।

কুকুরেবা কলকাতা থেকে সবে যাচ্ছে। কাবণ সেবকমই নির্দেশ এসেছে তাদের ওপর। কলকাতা বাঁচবে না। কলকাতা ধ্বংস হয়ে যাবে। ডোগোনবা জানে যে কুকুব-তাবা লুব্ধক তার অমোঘ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিযেছে। কিন্তু অসভ্য ডোগোনদের সঙ্গে সভ্য কলকাতার কোনো যোগাযোগ নেই। সেই নির্মম সিদ্ধান্ত সম্মতি পেযেছে তাব যুগ্ম অংশ সাদা বামন সিবিয়াস-বি-ব লুব্ধকেব ব্যাস ৪৮ লক্ষ কিলোমিটাব। সূর্যেব ব্যাস ১৪ লক্ষ কিলোমিটাব। লুব্ধকেব বঙ নীলচে সাদা। তাব প্রভা সবার চেয়ে বেশি -১ ৪৫। ছোট কুকুবমণ্ডল বা ক্যানিস মাইনব। এই তাবামণ্ডলে বযেছে প্রশ্বন। পৃথিবী থেকে প্রশ্বনেব দূবত্ব ১১ ৩ আলোকবর্ষ। সে-ও জানিয়ে দিয়েছে যে লুব্ধকেব সিদ্ধান্ত সঠিক। বৃহৎ কুকুবমণ্ডলেব সবকটি তাবাকে নিযে যে-কুকুর সে হল কালপুরুষের সঙ্গী। কালপুরুষও সম্মত হযেছে। এবং লুব্ধক হিংস্র কুকুবকে লেলিযে দেবাব সেই শব্দটিই উচ্চারণ কবেছে—লুঃ

এবং সেই শব্দে উত্তেজিত হযেছে একটি গ্রহাণু, নেমে আসছে কলকাতাব ওপব। কোনো ওজব, কোনো প্রার্থনা, কোনো আপিল তাকে ফিবিযে দিতে পাবে না। ঘেউ! ঘেউ!

৬৫ মিলিযন বছব আগে ১০ কিলোমিটাব মাপেব একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্টেবয়েড পৃথিবীব ওপবে আছড়ে পড়েছিল এবং সেই মহাবিস্ফোরণে ডাইনোসববা নিশ্চিহ্ন হযে যায়। গোটা পৃথিবী থেকে। আগেই বলা হয়েছে এবকম মহাধ্বংস, মহাসংহাব ৪৫০, ৩৫০, ২২৫, ১৯০ মিলিয়ন বছর আগেও হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে পৃথিবীর কক্ষপথে ১০০০ মিটারেব একটি গ্রহাণু এসেছিল। মাত্র ৬ ঘণ্টা আগে পৃথিবী সেখানে ছিল। ১৯৯৬-এর মে মাসে ওই একই মাপের একটি গ্রহাণু মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারেনি।

কলকাতার ওপরে যে হিংস্র কুকুরটিকে লেলিযে দেওয়া হয়েছে সে ঘণ্টায় ১ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। তার মাপ ও ওজন এখনই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। উন্মত্ত কুকুরটি কলকাতার ওপবে আছড়ে পড়ে ভস্ম হযে উবে যাবে, কিন্তু যে মহা-গহ্বরটির সৃষ্টি হবে তা কুকুরটির ব্যাসেব দশগুণ এবং গভীবতা দুগুণ। কুকুবটির যা ওজন তার থেকে একশো গুণেবও বেশি পাথব যে আকাশে উড়িয়ে দেবে। প্রথম আঘাত ও বিস্ফোবণেব পর কয়েক লহমা কোনো বাতাস থাকবে না। চাপা আগুন হয়ে ধক্ ধক্ করে জ্বলবে কলকাতা। তার পরই আসবে লক্ষ ঝড়ের শেষ নিশ্বাস। দাউ দাউ কবে জ্বলে, গলে, পুড়ে, ছাই হয়ে খাক্ হয়ে যাবে কলকাতা। এর পবে ধুলোর মেঘ বর্মেব মতো সূর্যকে আড়াল করবে। কতদিন

সেই হিমরাত্রি থাকবে তা বলা যাবে না। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ২০° সেন্টিগ্রেডে নেমে যাবে। এবং অনেক মাস ধরে হিমাঙ্কের নীচেই থাকবে। প্রলয়ান্ধকারে কলকাতাকে ঢেকে রাখবে প্রলয়মেঘ। এই নির্মম ভবিষ্যদ্বাণী মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে করতে কুকুর উপকথা 'লুব্ধক' তার অন্তিম পর্বে পৌঁছিয়েছে। কলকাতা এখন এক অসাড়, অপেক্ষমান পিঁজবাপোল। তার শাস্তি মৃত্যু।

তবে হাতে তো এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে। ঘেউ! ঘেউ!

অটো

ধোঁযা, নাক জ্বলে যাওযা ডিজেল ইঞ্জিনেব নিঃশ্বাস, মানুযেব শবীব ও তাদেব চকমকি পাথবেব মতো ব্যবহাব, বান্নার ভাপ, কিছুটা বোখ কবেও না-ধবে বাখতে পাবা দম, ফেটে যাওয়া ফুস্‌ফুস্‌ ও বেলুনের হাওয়া, পরতে পরতে কালিমাখা ভূতেব মতো মেঘ—এই সব নিয়েই সেজেছে সন্ধ্যার আকাশ। বন্ধ হয়ে যাওয়া, লোহার গেটে মবচে ধবে যাওয়া বঙকলেব টানা দেওয়াল ঘেঁষে যে বটগাছটি বেড়েই চলেছে তার ওপরেই আকাশতলা যাতে খুব সন্ধানী নজব ফেললে পাঁচটা তাবা দেখা যাবে। কেউ ঠাট্টা কবে আকাশটাব নামও রাখতে পাবে ফাইভ স্টার হোটেল। হোটেলেব অন্য অগুনতি বাসিন্দাব দেখা না মিললেও আঁচ কবা যায যে অনুপস্থিত কেউ নেই। সবাই নিজেব কক্ষপথে আলো মুখে, কখনও চিড়বিড়ে, কখনও ম্লান, কখনও হাতছানিব, কখনও হাত নাড়াব, কত ভঙ্গিতে, কত অছিলায় ঘুরেই চলেছে বদ্ধপবিকব। এছাড়াও বযেছে জীবন্ত ও মৃত কৃত্রিম উপগ্রহ, ধ্বংসে নিহত মহাকাশচারীব শিবস্ত্রাণ এবং বেসামবিক ও যুদ্ধেব বিমান। এরই মধ্যে খুব বিশ্বাসী যাবা তাবা পূর্বপুরুষদের স্মৃতিতে জ্বেলে দেওয়া আকাশপ্রদীপেবও কল্পনা কবে নেয। ফানুস বা মনগড়া উড়ন্ত লণ্ঠনেব কথা না হয বাদই পড়ে গেল।

বাস্তাব ধাবে যে নতুন হলদে চড়া আলোগুলো লাগানো হযেছে, সেগুলো সবে জ্বলে উঠেছে। তেতে না উঠলে পুরো আলো হয না। ওই আলোগুলোব বযেছে স্বচ্ছ খোলস। তাব মধ্যে জমে কালো হযে বযেছে পতঙ্গদেব শুষ্ক শবীব। আলোব স্বাদ নিতে খুবই কসবত কবে ওবা কখনও সামান্য ফাঁক খুঁজে ভেতবে ঢুকেছিল। আব বেবোতে পাবেনি। আলোব খুব কাছেই তাদেব বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। একজনেব ওপরে আবেকজন। প্রত্যেকটি বাতিস্তম্ভ একটি কবে মৃত্যুশিবির। যদিও এর সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্বন্ধ নেই। বঙকলেব ওই কালো নিস্পন্দ চিমনিটাব সঙ্গেও যুদ্ধেব কোনো সম্বন্ধ নেই। গলাব কাছে গুমবে উঠে আসা দলাটাব সঙ্গেই শুধু থেকে যায।

এখান থেকেই শহবের ওপাবে যাওযাব দুটো রুটেব বাস ছাড়ে। বাসের আলো দূর থেকে চেনা যায়। অনেক সময় ছাড়তে অনেক দেবি থাকলেও ওবা আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন এক স্টপ আগে দাঁড়িযে বাববাব ভুল হযে যায়। মনে হয বাসটা চলছে। এগিযে আসছে আলোগুলো। এছাড়া গাড়ি, ট্যাক্সি, পুলিসেব জিপ—এদেব সকলেবই নিজস্ব নিজস্ব কিসিমেব আলো রযেছে। আব হালে যে একেব পর এক নতুন নতুন মডেলের গাড়িগুলো বাজারে আসছে, তাদেব আলোব বাহার বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। চম্‌কে চম্‌কে শুধু দেখতেই হয। এছাড়াও বড়লোকেরা তাদের দামি গাড়িগুলোতে কতরকম আলো লাগায যার জ্বলা-নেভা দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। আবার একটু ভয়ভয়ও করে। গম্‌গম্‌ করে সাউন্ড সিস্টেম বাজছে। কাচ তোলা। এ সি চলছে। এরই মধ্যে এত আলোর বাহাবেই আবার চোখে পড়বেই যে অনেক নীচে, গাড়ির অনেক তলায, বরং স্কুটার বা মোটব সাইকেলের মতো উচ্চতাতেই একটা বড় আব পাশে দুটো ছোট আলো। অটো।

বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায়, তার একটু আগে হল অটো স্ট্যান্ড। অটোগুলো এখান থেকে বেকারির মোড় অবধি যায়। ফস্‌ কবে দেশলাই জ্বলল। প্যাসেঞ্জারের জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বিড়ি ধরাল চন্দন। বাজে মাচিস। জ্বলন্ত বারুদ ঠিকবে বেরোয়। কাঠিটা নর্দমায় ফেলল। রঙকলের ভেতরে কেউ থাকে না। কিন্তু একটা খোলা কলে টাইম ধরে জল পড়ে যায়।

নর্দমা মরা হলেও একটা স্রোত তাই। কাঠিটা ভাসতে ভাসতে এগোয়। ঘামে ভেজা শার্টটার বুকেব বোতাম খুলে দেয় চন্দন। কয়েকদিন আগেই বৃষ্টিতে ভিজে অটো চালাবাব সময়ে খুব হাওয়া লেগেছিল বুকে। সকালে দেখেছিল বুকের বাঁদিকে খানিক ওপর ঘেঁষে ব্যথা। আপনা থেকেই কমে গেছে। হ্যান্ডেলের তলায় ঝোলানো ব্যাগটা একবার নাড়ল। হালকাই। লোক না উঠলে ভারিই বা হবে কী করে? সিটেব তলা থেকে বিসলেরির বোতলটা নিয়ে চন্দন একটু জল খেল। তারপর লাল ন্যাকড়াটা ওই জলেই ভিজিয়ে নিয়ে সামনের কাচটা মুছতে লাগল। ধুলো বাদেও একটা চট্‌চটে নোংরা কাচে মেখে যায়। উঠতে চায় না। বোতল কয়েলটা ঝামেলা কবছে। প্রায়ই করে। একটা লোক এসেছে। হাতে ব্রিফকেস। প্যাসেঞ্জার আর জনাদুয়েক হলেই ছেড়ে দেবে চন্দন। এ-মাথা থেকে এখন লোক পাওয়া কঠিন। বেকারির মোড়ে এখন বেশিক্ষণ, প্রায় দাঁড়াতেই হবে না। ও মাথা থেকে এখন লোক ফেরার টাইম। অফিসেব লোক আছে। ব্যবসা, সেল্‌স বা উট্‌কো লোক ঠিক থাকবে। আর রাত বাড়লে সেই ক্লান্ত মেয়েগুলো ফিরবে যারা আয়ার কাজ কবে বা অন্যরকম। আবার অনেক বাতে এদিক থেকেও কয়েকটা মেয়ে শহরে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে বওনা দেয়। তারা নেমে যাওয়ার পরেও সস্তার সেন্টের বা পাউডারের গন্ধ পাওয়া যায়। চন্দন এই গন্ধটাকেই ভয় পায়। কারণ এই গন্ধটা পেলেই অটো নিয়ে সেই একচিলতে মাঠটাতে যেতে হয় যার মধ্যে ছেঁড়া ফুটবলেব জার্সিতে আড়াল একটা আলোর তলায় ঘুগনি বিক্রি হয়। অন্ধকাবের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকার হয়ে অনেক লোক সেখানে বসে মদ খায়। তাবা নিচু গলায় কথা বলে। কম শব্দ করে হাসে। এরই মধ্যে আবার মাঠটাব যেদিকে রাস্তার আলো পড়ে, সেখানে বস্তিব বুড়োরা বসে কাশে আর গল্প কবে। এখানে এলে কখনও কখনও মিউচুয়াল ম্যান-এব সঙ্গে চন্দনেব দেখা হয়ে যায়। এই মাঠটা ছাড়াও এ তল্লাটে যতগুলো চোলাইয়ের ঠেক আছে, সবগুলোব হয়ে পুলিসের কেস খায় মিউচুয়াল ম্যান। পার কেস আগে সত্তর ছিল, শেষে বেড়ে নব্বই হয়েছিল। আর সব ঠেকেই মিউচুয়াল ম্যান যা মাল খাবে সব ফ্রি। ও সকালে একবার যায়। দুপুববেলা ফেরে। আবার বিকেলে যায়। রাত হয় ফিরতে। ওর চলতে অনেক সময় লাগে। একেই নেশা থাকে খুব। তাব ওপরে ট্রাম ধাক্কা দিয়ে ওর ডান পা-টা ভেঙে দিয়েছিল। সেই পা-টার কারণে ও ব্যাঁকা ডান পা-টা ত্যারচা করে করে ফেলে অদ্ভুত এক ত্যাড়াব্যাঁকা ঢঙে হাঁটে। এরকম চোট যাদেব থাকে তারা আর কোনওদিনও দৌড়তে পারে না। তাড়া করলেও না। ধাওয়া দিলেও না। ওর চলনটা পুরোপুরি না হলেও কাঁকড়ার ধাঁচের। মনে হতেই পারে যে, ও পাশের দিকেই চলছে। আসলে ও কিন্তু এগোত। টলতে টলতে হলেও। চন্দনের অটোতে কখনও-সখনও মিউচুয়াল ম্যান ফিরেছিল। যেমন ফিরেছিল রঙকলের ছাঁটাই মিস্ত্রি নন্দ। নন্দ ছিল ভিতু। আব কতটা ভয় ও পেয়েছে, সেটা যাচাই করার জন্যে এটা সেটা কথার পরে বলত,

—তাহলে বলচো আমার কোনো কিছু ভয়ের নেই তো। বলো।

—পার্টি-ফার্টির ক্যাচালে থাকো না, কারো ক্ষতি করো না, তোমার আবার ভয়ের কী আছে?

—না, মানে, আন্‌কা লোক তো, কে কী কথায় কিছু মাইন্ড করে ফেলল, সেই ভয় করে। দিনকাল তো ভাল নয়।

—ফালতু মাথা ঘামাও কেন। বেকার ও সব ভাবো।

—না, না, তুমি জানো না। কিছু বলা যায় না। আলতু ফালতু কারণে আজকাল জান চলে যায়।

মিউচুয়াল ম্যান কিন্তু কথাই প্রায় বলত না। বললেও কম। এরকমও হয়। এক একটা লোক বেঁচে থাকলেও তাদের কথা ফুরিয়ে যায়। বা এমনও যুক্তি দেওয়া যায় যে, তারা আর কথা বলতে চায় না। কথা থাকলেও বলবে না। সত্যি বলতে এখন চাইলে মিউচুয়াল ম্যানের মুখে যে কোনও

কথা বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া যায়। ওই তোবড়ানো মুখেই যার দিকে তাকালেই মনে হতো যে টুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চোখগুলোকে কেউ ঘুরপাক খাইয়ে দিয়েছে এমন যে কোন্‌টা সোজা, কোন্‌টা উল্টো ও ঠাহর করতে পারছে না। আর মরে যে ভূত হয়ে গেছে, তার মুখে কথা বসানোতে কোনো মানা নেই। কিন্তু যে টাইমটার কথা হচ্ছে, তখনও মিউচুয়াল ম্যান বেঁচে ছিল। আরও অনেকে।

চন্দনের অটোর মালিক খুব একটা অটোর লাভ-লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন প্রথম নতুন গাড়ি বের করেছিল, তখন অনেক এন্‌থু ছিল। কত সময় নিজেই ড্রাইভারের পাশে বসে থাকত। হালকা গাড়ি বলে গাড্ডা বাঁচিয়ে চালাতে বলত। বলত বড় গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বাঁদিক চেপে চলতে। কিন্তু এখন ইট, সিমেন্ট, স্টোন চিপস্ সাপ্লায়ার হয়ে গিয়ে গাড়িটার কথা বলতে গেলে ভুলে গেছে। আগে অটো মালিকের বাড়ির ঘেরা উঠোনেই থাকত। ওপরে প্লাস্টিকের চাদর চাপা দেওয়া হতো। কিন্তু এখন অটো চন্দনের ঘরের সামনেই থাকে। খোলা আকাশের তলায় সারারাত চুপ করে ঘুমোয়। শিশিরে ভেজে। শীতকালে হিমস্নান করে। তা না হলে বৃষ্টিতে। অবশ্য শুখা মরসুম চলতে থাকলে চন্দন অটোকে গা ঘষে ঘষে স্নান করিয়ে দেয়। সিট মোছে যেমন বাচ্চাদের ধরে মোছানো হয়। লোকনাথ বাবার ফটোটা মোছে। আয়না মোছে। অকেজো মিটারগুলোর কাচ মোছে। আর ৩/৪ দিন পরে পরে মালিকের বাড়িতে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসে। মালিকের বউ খুব ভাল মেয়ে। চন্দনকে বলে চা, মুড়ি খেয়ে যেতে। ওই সময় যদি বাচ্চা দুটোর স্কুল যাওয়া পড়ে যায় বা বউদির কোনও দোকানপাট, তাহলে চন্দনই অটোতে নিয়ে যায়। চন্দন এটা দেখেছে যে মালা চলে যাওয়ার পর বউদি তাকে বড় মায়ার চোখে দেখে। বছরে একবার জামাও দেয় বা প্যান্ট পিস। শেষ যে গাঢ় নীল প্যান্ট পিসটা দিয়েছিল, সেটা করানোই হয়নি। মায় টিনের সুটকেসে মালার ফেলে যাওয়া কয়েকটা প্রায় বাতিল ঘরে-পরার শাড়ির সঙ্গে প্যান্ট পিসটা পড়েই আছে।

ব্রিফকেস হাতে লোকটা বাস ছাড়ছে দেখে উঠে গেল। বয়ে গেছে তাতে চন্দনের। আট আনা ভাড়া কম বলে লোকে সব সময় অটো চড়ে না। অটো অনেক খোলা। দু'পাশে দরাজ ফাঁকা যদিও ডানদিকে, পেছনে, আড়াআড়ি রড লাগানো আছে। হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। ডান দিকে বাঁদিকে দরিয়া অবধি দেখা যায়। অনেক লোক আছে যারা অটো পেলে অন্য গাড়িতে ওঠে না। গাড়ি চড়াটাও লোকের নেশা। যেমন জুয়া খেলার, যেমন মদ বা গাঁজা খাওয়ার। নেশাতেই লোকে সাংঘাতিক খতরনাক্ ব্যাপারগুলো ভুলে থাকে। ভয় ভুলে থাকে। পকেটমার হয়ে যাওয়া ভুলে থাকে। বিশ্বাসঘাতকতা, আচমকা পথরোধ করে দাঁড়ানো মৃত্যু, রক্ত আর ফিকে আয়োডোফর্মের গন্ধ মেশা এমারজেন্সি ওয়ার্ড, কোর্টের চত্বর, থানায় এফ আই আর লেখানো, পেটে লাথি খাওয়ার অপমান, অঘটন, টেলিগ্রাম, ভয়ে ভয়ে বুথ থেকে ফোন করা, মৃত্যুর সার্টিফিকেট জেরক্স করানো, ডাক্তারের ঘষঘষ করে প্রেসক্রিপশন লেখা—সব কিছু ভুলে থাকতে চাইলে, অন্তত একটা একটা দিন করে ঠেকিয়ে রাখার জন্যেও নেশার দরকার। একা থাকার, একা হয়ে যাওয়ার, কালকেও একাই থাকতে হবে, এটা মেনে নেওয়ার—এর জন্যেও দরকার নেশা। চন্দনও এই লেখা কথাগুলো জেনে গিয়েছিল। যখন সে তার একা দোহারা খাটটাতে, ঘরে পাখা নেই, ইলেকট্রিকও নেই, উপুড় হয়ে ঘুমোত, তখন দূরের মাদার বাগানের আশপাশের তল্লাট থেকে বোম চার্জের আওয়াজ নতুন বহুতলের কঙ্কাল বা আকাশের কাচের চাদরে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেত। নেশাই তাকে এই শব্দ শুনতে দিত না। বোমার টেস্টিং হয়। নতুন এসেছে সকেট বোমা। এর আওয়াজে ধাতব খোলের চিড় খাওয়ার শব্দ মিশে থাকে এবং হাড় অবধি পৌঁছে যায়। নতুন আসার কোনও বিরাম নেই। নতুন গাড়ি, নতুন টাকা, নতুন কোল্ড ড্রিঙ্কস, নতুন টিভি, নতুন মানুষ, নতুন জামাকাপড়।

নতুন নেশাও আসছে নিজের নিজের জায়গা বুঝে। মার্ডারারদের কাছ থেকে পাবলিক শুনে থ যে, জেলে আজকাল নতুন একটা নেশা চালু হয়েছে। টিকটিকির ল্যাজ পুড়িয়ে কালো গুঁড়ো করে খাওয়া। পুরনো কিছুই থাকবে না একা হয়ে যাওয়া ছাড়া। একা হয়ে যেতে ভয় কার করে না? তাই চন্দন ঘুমের মধ্যেই অটো চালায়।

ঘুমের মধ্যে দেখা গাড়ির আলোগুলো অন্যরকম। তারা আলোর নিযম মানে না বা এমনও হতে পারে যে, স্বপ্নের বাক্সের ভেতরে গতিব যে নিয়ম তাতে আলোরা দিশাহারা হয়ে যায। এমন একটা চলন্ত অথচ স্থির, অচৈতন্য অথচ নির্দেশবাহী হযে ওঠে গোটাটা যে পাশ দিয়ে, রঙ সাইড, বাঁদিক দিয়েই যে টয়োটা কোযালিসটা ঝড উঠিযে বেরিয়ে গেল, তাব নাম্বার প্লেটের বেআইনি নীল আলোটা গাড়ি থেকে খুলে রাস্তায় আটকে গেল যেরকম গলে যাওযা পিচে আটকা পড়ে যায ফুটপাথ থেকে কেনা সস্তার হাওযাই চটি। বাস বা ট্রাকেব সন্ধানী হেডলাইটের আলোর কলাম আর ওজন রাখতে না পেরে নুযে পড়ে বা অন্য আলোর ধাক্কায় ভেঙে টুকরো টুকবো হয়ে জ্বলন্ত কাচ বা বরফের মতো রাস্তায় ছিটিযে যায। আলোব দল কখনও ঘূর্ণি হয়ে পাক খায় বা নাগরদোলা হয়ে উঠে যায়, আবাব ঘুবে নেমে আসে। হযতো কোনও কবি এই আলোর অপেরা কখনও দেখে থাকবে। এরই মধ্যে আলোর ঢেউ ফাঁকা পর্দায ধাক্কা খেয়ে হয়তো সিনেমার আসব বসিযেছে যা সকলের দেখার অধিকাব আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ট্রামলাইনে সাইকেলের চাকা পড়ে গেছে একটি রোগা মানুষেব। সে হাত তুলে মারাত্মক সেই মুহূর্তে বলছে ট্রামকে থামতে। এই সাইকেল আরোহীই হল মিউচুয়াল ম্যান। সিনেমাব হোর্ডিং আঁকতে গেলে ভারা বেঁধে ওপবে উঠতে হয়। সেখান থেকে নেমে সাইকেলে বাড়ি ফিবছিল সে-ই যার নাম পরে হযে গেছে বা গিয়েছিল মিউচুয়াল ম্যান। ট্রামেব সামনের আলোটা সহসা খুলে যাওযা বিদ্যুৎ চুল্লির আলোব মতই। ধাক্কা লাগতে, সাইকেলটা চুবমাব হয়ে যেতে, ধাতব ঘর্ষণেব তীব্র শব্দ তুঙ্গে উঠতে, মিউচুয়াল ম্যানেব ডান পা-টা ভেঙে, বেঁকে, সাইডে উদ্ভটভাবে ছেতরে যেতে, একটা আস্ত স্বাভাবিক মানুষের অকেজো কাঁকড়া হয়ে যেতে আবও সময় লাগবে। আর এই সমযেই যে দুর্ঘটনাটা ঘটবে, এমন কোনও কথা নেই। আলোর চাকতি, আলোব ধস, আলোব বিকাবে ছিটকে যাওয়াব এই স্বপ্নদৃশ্যে চন্দনেব অটোর আলো কি চেনা সম্ভব? নক্ষত্রলোকে যখন মহাজাগতিক মাপেব বিস্ফোরণ হয, তখন কেউ পাববে সেই মহাকাণ্ডের মধ্যে দলছুট একটা জোনাকির আলোকে সনাক্ত কবতে?

সারাদিন হল্‌কা তোলা গরমের পর ঠাণ্ডা হাওযা আসছিল বাতের। অটো নিথর, শীতল, বাধ্য, নিরীহ চন্দনের ঘরের সামনে, ফাঁকায়, একা দাঁড়িয়েছিল।

—দাদা, আপনাদের মধ্যে একজন হাতটা পেছন দিকে ছড়ান। তা না হলে চালাতে পারব না।

—সামনে দুজন নেওয়া তো বারণ। নিচ্ছ কেন?

—ফাঁকা রুট। লোক কম। তাই কিছু বলে না।

—বলে না। বলবে কী করে। যে হাতে ছোঁচাচ্চে, সেই হাতে ভাত খাচ্চে। মুখ আচে?

—ভালো বলেচেন। সব মাইরি বারোটা বাজিয়ে দিল।

চন্দন কিছু একটা হয়তো বা বলতে গিয়েছিল। বলেওছিল বোধহয়। ঘুমেব ঘোরেই তার কথা বলার চেষ্টাটা মাইম হয়ে থাকে।

বাইবে, ফাঁকায়, সকাল অবধি দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকে অটো।

লোকে বলে রঙকলে আগুন লেগে যে দুজন লেবার পুড়ে মরেছিল তারা নাকি রাতে বন্ধ, উঠে যাওয়া, তালা মাবা রঙকলের মধ্যে চিৎকার করে। কেউ কেউ নাকি অনেক রাতে ডিউটি সেরে

ফেরার রাস্তায় সাইকেল থেকে দেখেছে যে দোতলার লোহার বিম বেরিয়ে আসা বারান্দায় জ্বলন্ত লণ্ঠন দুলছে। সেই আলোয় নাকি সেই দুজনকেও দেখা যায়। হাত থেকে লণ্ঠন ছিটকে পড়েই সেই আগুনটা লেগেছিল। এ দুজনেই দোতলা থেকে আর নামতে পারেনি। রাত করে চন্দনও ওখান দিয়ে কম যাতায়াত করেনি। কিন্তু সেই দুজন হতভাগ্য তাকে কখনও লণ্ঠনের আলো দেখায়নি। রঙ বানাতে অনেক কেমিক্যাল লাগে, স্পিরিট লাগে। দপ্ করে জ্বলে ওঠাটা তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য এর থেকে কেউ যেন এরকম ভেবে না বসে যে আগুন লাগার কেসটাই রঙকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী। রঙকল বন্ধ হয় অনেক পরে। বন্ধ হওয়ার পরেও শ্রমিকরা সামনে তেরপল দিয়ে তাঁবু বানিয়ে কিছুদিন অবস্থান করেছিল। মিটিং-ফিটিং-ও হয়েছিল কয়েকটা। মাইকের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। সে সবও পরে উঠে গেল। মালিক ছিল মাড়োয়ারি। তারও কোনও খোঁজপত্তর নেই। মাঝেমধ্যে বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে লোকজন নেমে রঙকলের বাউন্ডারি বরাবর হেঁটে হেঁটে জায়গাটা দেখে। খবর রটে যায় যে ওখানে বিরাট একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠবে। এলাকাটা ভাল বলে সুনাম নেই। কোনও প্রোমোটারই শেষ অব্দি ঝুঁকি নিয়ে এগোতে চায় না। কে চায় লাফড়া? অটোর সামনের কাচে উড়ন্ত ধুলো মাথা ঠুকে ঠুকে জমতে থাকে। আর মোছার সময় একেবারে সাইডের দিকটা বাদ পড়তে থাকে। ফলে সেখানে ঠুলির মতো ময়লা জমে। এই নোংরা, ছায়াঢাকা কাচের মধ্যে দিয়েই চলন্ত অটো থেকে চন্দন কত কতবার দেখেছে রঙকল এগিয়ে আসছে, পাশে চলছে, পেছনে চলে যাচ্ছে। তবে বার বার দেখতে দেখতে এমন হয়ে যায় যে জায়গাটার নামও মনে থাকে না। হয়তো কিছুই মনে পড়ে না বা হয় না। কিন্তু থেকে তো যায়। সেও তো বাতিল, বরবাদ হয়ে গেলেও দেখে যে বার বার ওই চেনা অটোটা যাতাযাত করছে আর সেটা চালাচ্ছে চন্দন।

আপনজনের মৃত্যু সকলের মতোই চন্দনের জীবনও পাল্টে দিয়েছিল। বাবার মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, কিছুদিনের মধ্যেই চন্দন ফুটবল ছেড়ে দিল। কারণ এটা সকলেই জানে যে ভাল খাওয়ার সঙ্গে ফুটবলের একটা যোগ রয়েছে। ফুটবল খেলতে গায়ের জোর লাগে, সিনায় দম থাকতে হয়। খেপ খেলে টাকা রোজগারের চেষ্টা একবার করেছিল কিন্তু সেমিফাইনালে মুখ দিয়ে চটচটে রক্ত ওঠার পর চেষ্টাটা ছেড়ে দিতে হয়। খেলাটা ছিল বাঘা যতীনে। কাছাকাছি খেলা পড়লে বাবা যেত চন্দনের খেলা দেখতে। বাবা একসময় হাওড়া ইউনিয়নে ডাক পেয়েছিল। ফুটবলের গল্প সব বাবার কাছেই শোনা। সেই বাবা যখন গলায় ক্যানসারে মরে গেল তখন কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল যে গ্যারেজে গাড়ি রঙের কাজটা হয়তো চন্দনকেই বাধ্য হয়ে শিখে নিতে হবে। সেটা হয়নি। মালিকের তখন কাজ জানা লোকের দরকার। আর অনেকদিন ধরে যে ছেলেরা রক্-প্লাস এগিয়ে দেওয়া বা দৌড়ে দোকান থেকে লোহা ঘষার কাগজ নিয়ে একছুটে ফিরে আসা দিয়ে জীবন শুরু করেছে তারা তো লাইনে আছেই। চন্দনেরও ইচ্ছে ছিল না। রঙ আর কালিতে মাখামাখি বাবার কাজের খাকি প্যান্টটা অনেকদিন ঘরের চালের ওপরে পড়েও ছিল। তারপর কীভাবে যে উধাও হয়ে গেল কেউ খেয়াল করেনি। ওই প্যান্টটা অন্তত কোন চোরের, সে যত ফালতুই হোক না কেন, নেওয়ার কথা নয়। মরার পরে বাবার মুখটা কেমন তুবড়ে, বেঁকে, চোখ ফোলা অবস্থায়, উদ্ভট হয়ে গিয়েছিল। হাতগুলো দেখলে কেউ বলত না যে এই দুটো হাতই হাতুড়ি দিয়ে দমাস্ দমাস্ করে পিটিয়ে বডির চাদরের টোল ওঠাতে পারত। বাবার মৃত্যু অনেকটা বিনা দোষে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। গ্যারেজের কাজ না করলেও চন্দন বসে থাকেনি। কারণ রাত বা দিনের আয়ার কাজ করে মা কতটা চালাবে? মাকে তো দিদিমাকেও তখন টাকা পাঠাতে হতো। তাই চন্দন রিকশা চালিয়েছে, নতুন কোয়ার্টারের মাঠে

বর্ষার ঘাস লম্বা টিনের ছুরি দিয়ে দিযে কেটে একা জড়ো করেছে, পাডার কোনও দাদার সুপারিশে অন্য কোনও দাদার জন্যে রাতের ট্রাকে ইটভাটা টু সাইট পাবাপার করেছে, ভোটের সময় অনেক আশায় দরকারেব চেয়ে বেশিই নিজেকে লড়িয়ে দিয়েছে। তারপর না কত কাঠখড় পুড়িযে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের কবে এই অটো। বাবা মবে যেতে এই অব্দি ঘটনা যখন গড়াল তখন ঘরের হাল একটু ফেরার দিকে মোড নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মা-র শরীরটা, সে রোগামানুষ হলেও, যখন চোখের ওপরে, দিনে দিনে ফুলে যেতে লাগল তখন চন্দন বোঝেনি যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন, আবার একটা ঘটনা, একটা মৃত্যু খুব কাছে এসেও প্রায় করুণা করেই যেন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

—এক এক টাইমে মনে হয় কী জানো?

চন্দনকে গিয়ার নামিযে অটোব গতি কমাতে হয় কাবণ সামনের গাডিটা ইচ্ছে করে বাস্তা ছাডবে না বলে ডাঁযা বাঁয়া করছে। বেকার, একেবারেই বেকাব। চন্দন জানে বাকিটা শুনবে বলে মিউচুযাল ম্যান মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েছে। চোখদুটো আধবোজা হলেও।

—মা যদি এমনি এমনি মরে না যেত আমার লাইফটাও এবকম বেলাইন হয়ে যেত না। শালা, ধুনকিতে পড়ে বিয়েশাদিব চক্করে পডে গেলাম। একসিডেন্ট হল। সব বরবাদ হযে গেল। ফাল্‌তু হুকিং করে কারেন্ট আনলাম।

মিউচুয়াল ম্যানের মুখটা আলতো কবে হাসতে থাকে। চন্দন যা বলছে সব সে বুঝতে পাবছে। সব সে জানে। চন্দন একসিডেন্ট বলতে যা বোঝাতে চাইছে সেই ঘটনাটাও তাব অজানা নয। এত নেশা, এত হাওযা-বেহাওযাব মধ্যেও সবটা বোঝা যায। একটা হুক। একটাই হুক।

আজ মিউচুয়াল ম্যান শেষ কথাটা বলেছিল মিনিট কুড়ি আগে। চন্দনের সঙ্গে ঠেক থেকে বেরিয়ে আসাব সময।

—পড়ে যাচ্ছি! পডে যাচ্ছি!

—এই তো ধরে রেখেছি তোমাকে। পডবে না।

—না। পডবে না। ধরবি না। আমাব পা শালা আমি ফেলব।

—আবে, ফেল না তোমাব পা তুমি।

—ফেলব। সব শালা হুক।

—কে করছে হুক?

—সব হুক! সব শালা চুদুরবুদুব হুক। হুকবাজ।

—কে হুকবাজ? বল না নামটা।

—কে বলব না। আছে।

—আছে তো তাকে তার মতো থাকতে দাও। অটোতে বসে থাকতে পাববে তো?

—ত, তুই পাববি?

—কী?

—চালাতে।

—না পারলে কি অটো রেখে চলে যাব নাকি?

—তবে, আমিও পারব। বসে থাকতে পারব।

অটো আর বাস ছাড়ার টার্মিনাসের মাঝামাঝি জায়গায বোজ বসে কালীভক্ত এবফানের আশমানতারা হোটেল যার সাইনবোর্ডে মা কালীর তিনটে চোখ দেখে অনেকেই খটকায় পড়ে গিয়েছিল। এরা বাসযাত্রী হলেও সম্পন্ন মানুষ। নতুন কোয়ার্টারের ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। বেশি সকালের যাত্রীরা নিজেরা পছন্দসই চার্টার্ড বাসে চড়ে। এমনি, পাবলিক বাসে চড়ে কোয়ার্টার

বাদেও, দূবের কাছের নানা মানুষ।

আশমানতাবা হোটেল আগে অনেক ডাকাবুকো ও পাকাপোক্ত ছিল। সিমেন্টে ইট গেঁথে বানানো পাকা উনুন ছিল। বাঁশ, বাতা, প্লাস্টিকেব চাদরে ছাওয়া ছাউনি ছিল। বাঁশেব খুঁটির গা থেকে একটা বোর্ডও ঝুলত যাতে মাছ-ভাত, ডিমের ঝোল-ভাত, আব মাঝে মাঝে মাংস-ভাতেরও রেট পড়ে নেওয়া যেত। তারপব একদিন দুটো বাস একসঙ্গে ছেড়ে একটা লোককে, নিজেদেব মধ্যে রেস করতে করতে, পিষে মেরেছিল। তাই নিয়ে হাঙ্গামা হয়, লোক তেতে যায়, বিস্তব হুটপাট, গুমটিতে আগুন, অনেক ঝামেলা হয়। তখন র‍্যাফ্ এসেছিল। বুলডোজার এসে ভেঙে, খুবলে তুলে নিযে চুরমার কবেছিল আশমানতাবা হোটেল। হোটেল উঠে গেল। দেওয়ালের গায় থেকে গিযেছিল এবফানেব নিজেব হাতে পেবেক পুঁতে বসানো মা কালীব ফটো। ফটোটা এখনও আছে। এবফান রিকশ ভ্যান চালিযে নিযে আসে তাব আশমানতারা হোটেল। রিকশ ভ্যানেব ওপবে চড়েই আসে স্টোভ, প্লাস্টিকের কালো ট্যাঙ্কে জল, কড়াই, মশলা, তেল, আনাজ, আমিষ, থালা, গেলাস সবকিছু। পবে এসে পড়ে একটা ছুঁড়ি আব একটা বুড়ি যে কাপড আলগা হযে স্তন বেরিযে পডাব তোযাক্কা কবে না। ইট সাজিয়ে তাব ওপরে সিমেন্টের স্ল্যাব বসিয়ে টেবিল। বসাব ব্যবস্থাও অনুরূপ। এবই পাশে চা-বিস্কুটেব দোকান এসে যায়। এসে যায় বাক্স-ভ্যানে পান-সিগাবেট। আশমানতারা হোটেলেই চন্দন দিনেব খাওযাটা খেযে নেয। তবে মালা চলে যাওয়াব আগে ও ঘবেই খেত। আব বাতেব খাওযা? আগেব কথা আগে। পবে চন্দন বাতে কখনও কখনও খেত। বেশি নেশা হলে খেত কই?

—মা যদি বেমক্কা মবে না যেত তাহলে এত কষ্ট থাকত না। বুঝলে? ভাগ্য হযতো তুমি মানো না কিন্তু ভাগ্য তোমাকে ঠিক চিনে রেখেছে। এ শালা বড়ো বঙ নিচ্ছে। এ শালা পরোযা লাগায না। অমনি বলবে লাগায কি না লাগায আমি ঠিক বুঝে নেব। বল, বলে না?

মিউচুযাল ম্যানেব হাসি হাসি মুখটা আবও কাত হয। এসব তো জানা কেস। তাব বলতে বযেই গেছে। এসব যা কিছু কথা হচ্ছে সব মবে যাওযা, চলে যাওয়াব লাইনে। আব এ লাইনটা মিউচুযাল ম্যানেব চেযে ভাল কেউ জানে না। তাই না তাব হাসি পাচ্ছিল। তাব মুখেব ওপরে হলদে সোডিয়াম ভেপাবেব আলো পড়ে ও সবে যায। উপচ্ছাযা ও প্রচ্ছাযাব মধ্যেই কত না মানুষের অস্তিত্ব। এবা সাবাজীবন গ্রহণেব মধ্যেই আসবে যাবে ও হাত পা ছুঁড়বে।

—তখন মলিনা মাসিব কত ধরাধবি। চন্দন, আমি তোকে বলছি মেয়েটা ভাল। চন্দন, তুই ওব একটা গতি কব। বউটা এলে তোর বাড়িটা খালি খালি লাগবে না। ওবকম হত্যে দিযে না পড়লে আমিও বিয়েটা কবতাম না, এসব ক্যাচালেও জডাতে হতো না। বিন্দাস ড্রাইভাবি কবতাম, দিব্যি চলে যেত।

পবপব কয়েকটা গাড়ি অটোকে টেক্কা দিযে বেরিয়ে যায।

—যাও না বাবা। অত তাড়া থাকলে যাও। আমি কি বাস্তা আটকে বেখেছি। এই ছোট গাড়িগুলোকে জানবে ভয় নেই। ওবা জানে বডি পলকা। হুজ্জুতে যায় না। হারামি হচ্ছে আবমাডা-ফাবমাডা। ছোট কবে একটা রগড়া দিলে অটোব কিছু থাকবে? তার ওপরে মালফাল খেয়ে গাড়ি হাঁকাবে। উল্টো সাইড থেকে এমন হেডলাইট মাববে চোখে যে তুমি কিছু ঠাওর করতে পারবে না। কেবল খজডামি করবে। শুনছ, না লেটে গেলে গুরু?

মিউচুয়াল ম্যান জবাব দেয় না। ওর হাতের রোগা আঙুলগুলো চন্দনের কাঁধে একবার মাকড়সার মতো খড়্‌বড়্ করে ওঠে।

—আব যাই কোরো ঘুমিয়ে যেও না। হড়কে হযতো গাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেলে। তখন পুলিস

আমার হালুয়া টাইট করে ছেড়ে দেবে।

ফের রোগা আঙুলগুলো চন্দনের ঘাড়ে টুক্ টুক্ কবে জানান দেয়।

—লাইফ ভাল টেনে দিলে বস্। কোন্‌দিন শালা অটোফটোর পাট চুকিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে ভিড়ে যাব। তোমার টিমে আমাকে নেবে? নাও না?

এবার আঙুলগুলো ঘাড়ে বুলিয়ে যেতে থাকে। এর থেকে চন্দন কিছু বোঝে বইকি। মিউচুয়াল ম্যান তাকে শান্ত হতে বলছে। বলছে এসব কথা এত অমঙ্গলেব যে না বলাই ভাল। বলছে যে আর কেউ যেন মিউচুয়াল ম্যান না হয। চন্দন জোরে হেসে ওঠে। এটা হল নেশার হাসি। গিয়াব চড়ায়। অটো আরও তোড়ে চলে। হাওয়ার আওয়াজ কানে শোনা যায। এই হাওয়ার মধ্যেই থাকে অনেক মানুষের শেষ নিঃশ্বাস।

—পারবে ঘর অব্দি হাঁটতে? না এগিয়ে দেব!

জবাব দেয় না মিউচুয়াল ম্যান। চন্দনের অটোর ডানদিকে রড লাগানো। বাঁদিক দিয়ে অনেক সময় নিয়ে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ভাঙা, ছরকুটে ডান পা-টা নামায়। ডান পায়ের পাতা আলো-অন্ধকারের এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো জমি থাব্‌ড়ে-থাব্‌ড়ে জবিপ কবে। তাবও কিছুক্ষণ পবে বাকি শরীরটা অটো থেকে আস্তে আস্তে বেবোয। কাছেপিঠে কুকুব ডাকছে। টিভিব শব্দ। একটা লোক পাশ দিযে সেলফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেল,

—সকালেই তো লরি ইন কবে যাচ্ছে। ধব সাড়ে ন'টা। আমিও ওইরকম টাইমে পৌঁছে যাব। স্কুটাবে যাব। তুমি খালি হালদারকে বলবে গুনতি করতে   সে তো লাগবেই   না, না, লেবাব পেমেন্ট নিযে যা কথা সে হয়ে গেছে. আরে বাবা, পাকা কথা হয়ে গেছে বলেই তো বলছি..

লোকটার নাম হয়তো চন্দন জানে না তবে মুখ-চেনা হতেই হবে। যদিও মুখটা দেখা যায়নি। চন্দন হ্যাঁচকা দিয়ে অটো স্টার্ট করে। অটো ঘোরাব সময় তাব আলোতে দেখা যায একটা আলোব শেড রাস্তার ধারে ঝুলছে। এর তলায ক্যাবম বোর্ড বসে। অন্ধকাব হযে বসে আছে কয়েকটা ছেলে। দেওয়ালে ধ্যাবড়া করে লেখা—শাহরুখ ফ্যানস্ ক্লাব। চন্দন ওদেব কথাগুলো শুনতে পায না।

—মালুয়াকে নামিযে দিযে গেল। চিনলি?

—কাকে?

—অটোব ড্রাইভারটাকে।

—কে আবার হবে। নির্ঘাত ধ্বজো।

—ও শালাও মালুয়ার লাইন ধরে নিয়েছে।

—তা কী কববে? ঘরে বোঝাবার কেউ আছে? চোট খেলে শালা তোরও ওই কেস হতো! যে খায় সে জানে।

চন্দনের মাবও বেশ কয়েক মাস ঘুসঘুসে জ্বর হয়েছিল। তাতে কাজ ছাড়ার দবকাব হয়নি। বেশি অসুবিধে হলে কখনও একটা ক্যালপল, কখনও ক্রোসিন খেযে চালিযে দিযেছে। কিন্তু পেটে যখন ব্যথাটা শুরু হল, ব্যথাটা বেড়ে যখন শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করল তখন চন্দন না বুঝলেও শেষ মাস চারেকের খেলাটা শুরু হয়ে গেছে। গোড়ায় পাড়াব ডাক্তার, তারপর অটোর দাদাব শ্বশুব বাড়ির ডাক্তার ভাল করে দেখেছিল। লায়ন্স ক্লাবের পলিক্লিনিকে কম খরচে করা যাবে জানিয়ে বেশ কযেকটা পরীক্ষাও কবাতে বলেছিল। চন্দনের মা-ই করাতে দেয়নি। বলেছিল এরকম অনেক রোগী সে নিজেই দেখেছে আয়া থাকার সুবাদে। একটু বিশ্রাম, একটু নিয়ম করে খাওয়াদাওয়া—এতেই সামলে যাবে। এরপর এল পেচ্ছাপে রক্ত। আর ওই উদয়াস্ত পরিশ্রম করা রোগাটে, পোড়খাওয়া চেহারাটা ফুলে যেতে শুরু কবল। প্রথমে ফুলেছিল পা। কদিন পরে ফোলাটা

কমে গেল। এবাবে হাত। চুড়ি এমন কেটে বসে যেতে শুরু করল যে কেটে খুলতে হয়েছিল। তাবপব পেট, মুখ, গোটা শবীরটা। মুখটা ফুলে চোখটা ছোট হযে যেতে লাগল। তখন বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি কবা হয়। পাড়ার লোকেরাই সব ব্যবস্থা কবেছিল। ক্লাবের ছেলেরা তখন রাত জেগেছিল হাসপাতালে। শেষ রাতে ইঞ্জেকশন কিনতে চন্দনকে অটো নিয়ে ধন্বন্তরী-তে যেতে হযেছিল। ফেরাব বাস্তায় পুলিস ধবেছিল। ইঞ্জেকশন, ডাক্তাবেব প্রেসক্রিপশন দেখে ছেড়ে দেয়। শেষ অব্দি যদিও ইঞ্জেকশন দেওযাব আর দবকার হয়নি।

সেই শেষ রাতে বৃষ্টি এসেছিল আকাশ ভেঙে। টেম্পো করে বডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রথমে কেওড়াতলায। পুডে শেষ হযে যাওযার জন্যে সেখানে দারুণ ভিড। একটা ছোট ছেলের জন্যে অর্ধেক টাইম ধবলেও সব মিলিযে ছ-সাত ঘণ্টার মামলা। তখন ফেব বৃষ্টি ভেঙে যাওয়া হল শিরিটিতে। আকাশে অন্ধকার। একটানা, কখনও জোবে, কখনও ধবা ধবা, বৃষ্টির অবধি নেই। শ্মশানেব সব আলো জ্বলছে। সেখানে, বন্ধ দবজা চুল্লিব থেকে কিছুটা দূবে বসে চন্দন দেখেছিল শ্মশানেব বাল্‌বেব সামনে বাম্পেব উচ্ছ্বাস। মা-কে ফুলিয়ে-ফাঁপিযে তুলেছিল যে জল, সেই জল আবাব দাহব সময় বাষ্প হযে প্রাণমণ্ডলে ফিবে যাচ্ছে। বাইবেও জল। মন্দিবেব লাগোযা পুকুরটা জলে ভবে গেছে। মন্দিবেব ভেতবে ক্যাসেটে বাজছে গলায় দডি দেওয়া পান্নালালেব শ্যামাসঙ্গীত। শ্মশানে মা-র আযা বন্ধুবাও এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল মলিনা মাসি আব তাব সঙ্গে বোগা, উস্কোখুস্কো চুল, সালোযার-কামিজ, হলদে ওডনা গলায জডানো একটা মেযে, যাকে চন্দন ভাল কবে তখন দেখেইনি। খেযালও কবেনি বললেই চলে। পবে, মানে অনেক পবেও চন্দন যখন মালার কথা ভাবে তখন তাব বাববাব ওই অসম্ভব কথাটাই মনে হয যেটা কখনও সত্যি নয। বাতেব কোনও একটা নীল আলোয় ধুযে যাওযা পেট্রল পাম্প থেকে তেল নিয়ে বেবোবাব সময সে প্রথম আচমকা বাঁদিকে মাথা ঘুবিযে মালাকে প্রথম দেখেছিল। দেখাটা এত সত্যি যে এটা কখনও মিথ্যে হযে যায না। পেট্রল পাম্পেব সামনে গাডি বেরোবার বাস্তার জন্যে ফুটপাথ শেষ ও আবাব শুরু। সেখানেই মালা দাঁডিয়ে গেছে কেন না অটো বেবোচ্ছে। কথাটা সে মালাকে বলেনি এমনও নয। মালা গুছিয়ে কিছু বলতে পাবেনি। ও শুধু বলেছিল,

--আমাব সঙ্গে কেউ ছিল?

চন্দন বলতে পাবেনি। যে এলাকাটায ওব অটো চলে তাব ধারেকাছে যে গোটা তিনেক পেট্রল পাম্প আছে তারই একটা না একটাতে চন্দন তেল নেয়। মালা এদিককাব মেয়েও নয়। মলিনা মাসি এখনও ভবানীপুরের দিকে পূর্ণ সিনেমাব পেছন দিকে, যেখানে মুক্তদল-এর পুজো হয়, তাবই কাছে থাকে। তাই বাত করে মালা এদিকে আসতে যাবে কেন? চন্দনও জানে কোনও কারণ নেই। অথচ এটাও সে দেখতে পায় যে মেয়েটা হঠাৎ ফুটপাথেব কিনাবে এসে থমকে দাঁডিয়ে গেছে। এবং এই থমকে যাওয়া মেয়েটা মালা বাদে আর কেউ হতেই পারে না। অথচ সেটা সম্ভবও নয। চন্দনের ধন্দ এবারের মতো কাটল না। এই যুক্তিটাও তাব মাথায খেলেনি যে আনমনা বাঁদিকে তাকিযে সে অন্য কোনও মেয়েকে দেখেছিল। পরে, মালাকে কাছ থেকে চেনাব পর সে ওই মেয়েটাকে সবিয়ে দিযে থতমত অবস্থায় মালাকেই ওখানে দাঁড় কবিয়ে দিয়েছে। আর একবাব যে দাঁডিয়ে গেছে ঠায় সে দাঁডিয়েই আছে। চোখ দিযে, মনে করা দিয়ে, অনুভবের টানাপোড়েনে মানুষ এরকম অনেক কিছু করে, ভাবে, এক একটা ছবিকে আঁকড়ে ধরে। এরকম হয়। কেন হয় কেউ জানে না। আর জানলেও বা কী আসে যায? মানুষ কি এইভাবে বেঁচে থাকা পাল্টে ফেলবে? যদি সত্যিই পাল্টে ফেলে তাহলে আব কী সে বেঁচে থাকতে পাববে? এই ধন্দের কথাটা চন্দন কখনও মিউচুয়াল ম্যানকে বলেনি। নন্দকেও বলেনি। সব কথা কাছের লোকদেরও বলা যায় না।

কালীঘাটে ঘাটের কাজের দিন বরং চন্দন মালাকে ভাল কবে দেখতে পেয়েছিল। মন্দিরের চত্বরেই, বাঁদিকে উঁচু বাঁধানো চাতালে মা-র কাজ হয়েছিল। সেদিনও মলিনা মাসি সারাদিন ছিল। সঙ্গে মালা। ওইদিন কালীঘাটে একটা ক্যাচাল হয়েছিল। কোনও একটা ছেলে একটা মেয়েব সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল। মেয়েটার চেহাবা চন্দন মনে করতে চায় না কারণ কবলেই খারাপ লাগে। মেয়ের দাদা, কাকা তারপর পাড়ার দলবল এসে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যায়। ছেলেটার সঙ্গে তাব জনাদুয়েক বন্ধু ছিল। তারাও ঝামেলা বুঝে সরে পড়ে। ছেলেটা মেয়ের বাড়ির অচেনা নয়। বাইরের রাস্তায় হাত ধবে হিড হিড করে টেনে মেয়েটাকে কিছু লোক ট্যাক্সিতে ওঠাচ্ছে আর নতুন কেনা পাঞ্জাবির গলাটা মুঠো করে ধবে মেয়েব দাদা ছেলেটাকে বলছে,

—আর একটা দিন যদি রাসবেহাবীব এপাবে দেখি গুলি কবে দেব। একেবাবে গুলি কবে দেব। সব রস ঘুচে যাবে। মনে থাকবে?

ছেলেটা কিছু বলে না। ভিড থেকে কেউ বলে,

—জামাটা ছেড়ে কথা বলুন না। নতুন জামাটা ছিঁডে কোনও লাভ আছে?

—জামা? শালা, মনে রাখবি। স্ট্রেট্ বুকে দু-দুটো দানা।

ছেলেটা জামা ছাড়াবার চেষ্টা করে। ছাডিযে নেয।

—আমি পুলিসে কেস লেখাব। দেখে নেবেন।

—মারব শালা এক ঝাপ্পড়। পুলিস মারাচ্চে। আন্ডাবএজ মেয়ে ফুঁসলে পুলিস মাবানো? পুলিসই উল্টে তোকে চাবকাবে।

—ওর বয়স আঠেরো হযে গেচে। আমাব প্রুফ আচে। আমিও ছাড়ব না।

ঝামেলা, হুজ্জৎ, কথা কাটাকাটির মধ্যে অকিঞ্চন চন্দন বাস্তায় রোদে নেমে আসে। মিষ্টিব গন্ধ। ফুলের গন্ধ। ধূপেব গন্ধ। সঙ্গে পাড়াব দুটি ছেলে, জনাকয়েক মহিলা যার মধ্যে তিনজন মা-ব সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে আযার কাজ করত, আব রোগা একটা দোহাবা গড়নেব ভিতু ভিতু মুখের মেয়ে। মালা। ওরা দল বেঁধে ট্রামলাইনেব দিকে এগোয়। বড় বাস্তায় পড়ে মলিনা মাসি মালাকে নিযে বাঁদিকে চলে গিয়েছিল। চন্দনবা রাস্তা পাব হয়েছিল বাস ধববে বলে। চন্দন গোড়ায ভেবেছিল যে মালা মলিনা মাসিবই মেয়ে। পবে জানতে পেবেছিল তা নয়। লক্ষ্মীকান্তপুবে, মলিনা মাসিব পাড়ারই এক বাড়ির মেয়ে। মা মরা। বাবা আবাব বিয়ে কবেছে। নতুন মা মেয়েটাকে দুচোখে দেখতে পারে না। ওর বাবাব কথাতেই মলিনা মাসি মেযেটাকে কাছে এনে রেখেছে। মালা-র মা মলিনা মাসির বোনেব মতো ছিল।

নন্দ চন্দনের হাত দেখে বলেছিল বিয়ের বছর-দুয়েকের মধ্যে চন্দন অটো ছেড়ে আবও ওপরে উঠে যাবে।

—এ বাবা, বাঁ হাত দেখছ কেন? বাঁ হাত তো মেয়েদের দেখে।

—জানি রে বাবা জানি। মিলিযে দেখতে হয়। ছেলেদের ডান হাতটাই আসল কিন্তু বাঁ হাতটাও দেখে নিতে হয়। খেলাটা তোমার ধাতে ছিল বুঝলে? সবার থাকে না। লেগে থাকলে হতো।

—ও খেলার কথা ছাড। ছেড়ে দিয়েছি ব্যাস্, যো বরবাদ সো বরবাদ। এখন বল পয়সাকড়ি হবে কখনও? বেশি না। ভাল চলে যাবে। শালা ভাড়া জুটল কি না-জুটল মালিককে গুনে দাও। তারপর দিন খারাপ গেলে আঙুল চোষ।

—একটা কথা বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিও, অটো তোমাকে আর বছর দেড়েক-দুয়েকের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

—ছেড়ে কী করব? পকেট মারব?

—চার চাকায় চলে যেতে হবে।

—ট্যাক্সি?

—ট্যাক্সি হতে পারে, প্রাইভেট হতে পারে, অত বলা যায় না। ভালর জন্যে বলছি, লাইসেন্সটা করিয়ে রাখ।

—ভাবিনি তা নয়। কিন্তু অতগুলো টাকা।

—লে! চার চাকা চালিয়ে দিব্যি কামাবে। তার জন্যে বেস্ত কিছু যাবে না?

—অটোর লাইনটা ছেড়ে দেব? দিতে হলে দেব কিন্তু সত্যি বলতে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

শাম তনহাই কি হ্যায়
আয়েগি মঞ্জিল ক্যায়সে
জো মুঝে রাহ্ দিখায়ে
ওহি তারা না রহা
কোই হমদম না রহা, কোই সহারা না রহা
হম কিসিসে ন রহে, কোই হামারা না রহা

একদিন দুপুরে অটো নিয়ে বাড়িতে ভাত খেতে এসে চন্দন দেখেছিল রেডিওতে কিশোরের এই গানটা বাজছে আর বিস্কুটের দুটো টিনের ওপরে দাঁড় করানো আয়নাতে দেখে দেখে চুল আঁচড়াচ্ছে মালা।

-সিনেমাটা দেখেছিলে? হালের নয় যদিও।

—কোন সিনেমা?

—ঝুমরু। সুরও কিশোরের নিজের।

—নামই জানি না।

— দেখাব তোমাকে।

—চলছে বুঝি কোথাও?

—না, না। টিভি-তে দেখাবে। তখন দেখব।

—কিনবে?

—দেখি। খোকার সঙ্গে কথা বলেছি। বলল কপালে থাকলে ভাল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আটশো-নশোতেও পাওয়া যায়। পিকচার টিউবফিউব খোকাই চেক করে দেবে।

—আমি বলি কি অতগুলো টাকা এখনই খরচ কোরো না। মা র অসুখের সব ধার মিটিয়েছ?

—মেটাচ্ছি। এ মাসেই নন্দদাকে দুশো দিয়ে দেব। দাদার টাকাটা এখন না দিলেও চলবে বলেছে।

—দাদা?

—আরে আমার গাড়ির মালিক। দাদা না থাকলে চন্দনকে আর খুঁজে পেতে না। দেখতে রাস্তায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঁদের বাড়িতেই নিয়ে যাবে বলেছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, রোববার দেখে বিকেল করে একদিন যাব। ওইদিন আর প্যাসেঞ্জার নেব না। বউদিকে দেখবে। বড়লোকের ঘরের মেয়ে। কত লেখাপড়া জানা। কিন্তু একফোঁটাও গুমোর দেখবে না।

বড় কালার টিভি। ফ্রিজ। দাদাও যেমন বউদিও তেমন।

—তোমায় খুব ভালোবাসে, না?

—তোমাকেও বাসে। গেলেই দেখবে। কত না বিশ্বাস করে বলে অটোটা আমাকেই রাখতে দিল। নিজের থেকেই বউদি একদিন বলল, চন্দন, দাদা বলেচে রোজ আর রাত করে তোমাকে গাড়ি দিয়ে যাওয়ার ফৈজৎ করতে হবে না। তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তুমি গাড়ি বাড়িতেই রাখ।

—ধর, রাতে যদি চুরি হয়ে যায়।

—দুর্। এই মহল্লায় ঢুকে অটো নিয়ে যাবে। খেপেছ?

—এখানে কিন্তু চুরি হয়। উল্টোদিকের ওই বউটা বলছিল, বলে নতুন বউ তুমি, এটা-ওটা শখের জিনিস সামলে রেখ। চোরচামার আছে। কিছু বলা যায়? এই বলল।

—ও সব ছিঁচকে। আজকাল সব পাতা খায় জান তো? চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে দু-দশ টাকা জোটাল আর অমনি পাতা খেতে ছুটবে। এমন নেশা যে চুরি ওকে করতেই হবে।

—সেদিন রাতে যাকে গাড়িতে ওঠালে সে কি তোমার ওই পাতাখোর?

—ওই যে তোমাকে পেছন থেকে উঠে আমার পাশে বসতে বললাম। রোগা করে। ল্যাংড়া।

—হ্যাঁ। আমার কিন্তু খুব ভয় হয়েছিল।

—আরে না, না। ও পাতাখোর হতে যাবে কেন? ও তো মিউচুয়াল ম্যান।

—কী?

—ও তুমি বুঝবে না। বুঝিয়ে দেব একদিন। ও স্রেফ চোলাই খায়। ফ্রি। পয়সা লাগে না। খুব ভাল। সিনেমার ছবি আঁকা বড় বড় হোর্ডিং দেখেছ তো, ও ওইগুলো আঁকতো। ভারায় চড়ে আঁকতে হয়। বউ ছিল, বাচ্চা ছিল। তারপর সব গেল। ট্রামে ধাক্কা খেল। পা গেল।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বরবাদ কেস। পা সেট হল না। ল্যাংড়া পা নিয়ে ভারায় উঠতে পারবে না। কয়েক ইঞ্চি তো পা রাখার জায়গা। সেই জায়গাটুকু সাইজ করে তোমাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে। সোজা কথা?

সকালবেলা মানে আলো ফোটা নীল ভোরে একদিন চন্দন অটোতে করে মালাকে স্টুডিওপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিল। এই যে বড় বড় গেটগুলো—এর ওপারেই আছে সেই আশ্চর্য সিনেমার জগৎ—

—এই গেটগুলো দিয়ে গাড়ি করে সব আসে। প্রসেনজিৎ, শতাব্দী—যত নাম বলবে সব। বম্বের থেকেও আসে। আগে আসতো উত্তম, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া। রেলের মতো লাইন পাতা থাকে। তার ওপরে চাকায় ক্যামেরা চলে।

—তুমি ভেতরে গেছ?

—দু'বার গেছি। এমন ঘর, বাড়ি বানাবে না যে তুমি হাঁ হয়ে যাবে। একটা ল্যাম্পপোস্ট দেখে আমিকে আমিই বোকা বনে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যিকারের। সন্ধে হলে বাতি জ্বলে। পরে জানলাম জালি। দেখলে কারও বাপ নেই যে বলবে সত্যি নয়।

স্টুডিওপাড়া থেকে ফেরার সময় ডানদিকে পড়ে কবরখানা।

—সায়েবরা যখন ছিল মরলে এখানে কবর দিত।

—ভেতরে গেছ?

—কতবার। তোমাকেও নিয়ে যাব। তবে একটা কথা বলে রাখি, যদি দেখতে পাও যে হাফপ্যান্ট

আব খালি গলায টাই বাঁধা একটা বুডো সাযেব কববেব ওপবে বসে ইংবেজি খববেব কাগজ পডছে অমনি চোখ সবিযে নেবে। খববদাব আব ওদিকে তাকাবে না।

— কেন?

—ও হল পাগলা সাযেবেব ভূত। গলায বাঁধা টাই দিযে ফাঁস দিযেছিল। তাবপব থেকে এখানেই ঘুবে বেডায।

— কেন?

—অপঘাত তো। সাযেববা আবাব অপঘাত-টপোঘাত মানে না। না মানবে মেনো না। ভূত না হযে তখন উপায কি? তুমি ভূত মানো?

—মানি।

—আমিও মানি। অনেকে বলে ওসব ফালতু। মবে গেলে সব ভোঁ ভোঁ। আমাব মন বলে যে কক্ষনো হয? দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু তা বলেই কি কেউ নেই? তবে হ্যাঁ, ও উটকো ভযডব আমাব নেই। কাবও খাই না পবি না, তুমভি মিলিটাবি, হামভি মিলিটাবি।

- এই?

—কী?

—চল না, গাডিটা নিযেই বাজাব কবে আসি।

—সে যাওযা যায কিন্তু এত সকাল, বাজাব বসেছে কি বসেনি ঠিক নেই। পবে যাব। আগে ঘবে গিযে চা ফা খাই। কাল যে আনাজ অত আনলাম, নেই?

- সে চলে যাবে। ববং দুটো ডিম কিনে নিই।

-সেই ভাল। জিলিপি খাবে, জিলিপি? সকালেই তো ভাজে। একেবাবে গবম গবম।

—আমি সিঙাডাও খাব।

—নেব। তবে তোমাব মলিনা মাসিব পাডাব মতো টেস্ট হবে না। ভবানীপুব বলে কথা।

—তা সে না হোকগে যাক্। আমাদেব দোকান আমাদেব মতো।

ইযে নজাবোঁ না হঁসো
মিল ন সকুঙ্গা তুমসে
তুম মেবে হো ন সকে
ম্যায তুমহাবা না বহা
কোই হমদম না বহা, কোই সহাবা না বহা
হম কিসিসে ন বহে, কোই হামাবা না বহা

এইসব গান যখন দূব থেকে হাওযায হাওযায কখনও এসে আবাব চলে যায আব সেই সমযটা যদি একলা অটো বাস্তাব ধাবে দাঁড কবিযে পডে-আসা বিকেলকে গাছেব মাথায় সন্ধেব মধ্যে তলিযে যেতে দেখা যায তখন মনকে আব কেমন কবতে বলতে হয না, তখন মায়াবী সব কিছুই, ওই যে বাসটা ফিবছে নিজেকে টেনে টেনে, সে যখন ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁডাবে তখন বাসেব উল্টোদিকে দাঁডিযে থাকলেও এই বিকেল-সাঁঝেব কম আলোতেও হযতো দেখা যাবে যে আয়াব কাজ কবতে যাওযা মা দুটো ক্লান্ত আব ব্যথায টনটনে পা দিযে নামছে, ফিবে আসছে ঘরে, ফিবে আসছে ঘবে মাব গিঁট বাঁধা রুমাল যাতে বাঁধা আছে মযলা, ভাঁজে ভাঁজে দুর্বল হয়ে যাওযা, কমজোরি সেই সব দু টাকাব নোট যাবা বাতিল হয়ে যাওয়াব আগেও, শেষবাবের রুখে দাঁডাবাব মতো চেষ্টায় নিজেদের বিকিযে দিলেও বিনিমযে পেযেছিল ঠোঙাব মধ্যে কিছু চালভাজা, নয়তো

হালকা খোসায় ঢাকা বালিতে ভাজা বাদাম বা কখনও একটা পেয়ারা এবং এইসব মমতা মাখা সামান্য সামগ্রীর মধ্যেই বেঁচে থাকে রোগা ফুটবলাররা যারা বাঁ বা ডানদিক দিয়ে কাটিয়ে কাটিয়ে চলে যায় কর্নারের কাছে এবং সেখান থেকে মাইনাস করা বলটা পাক খেতে খেতে, ডিফেন্সেব লাফিয়ে ওঠা মাথা টপকে, নিজের অক্ষের ওপরে ঘুরতে ঘুরতে তার মহাদেশ, মহানদী, মহাসমুদ্র ও মহাজনপদ নিয়ে নেমে আসতে থাকে স্ট্রাইকারের মাথা লক্ষ্য করে বা এমনও হতে পারে যে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদয় ঘিরে হাড়ের পিঞ্জরে গড়ে ওঠা যে বুক সেখানেই বলটা এসে পড়ে এবং দক্ষ স্ট্রাইকার দু হাত পাশে ছড়িয়ে, বুকটা একটু ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় অতএব বলটিও শরীরেব মধ্যে গড়ে ওঠা উপত্যকার ঢাল বেয়ে নেমে আসে পায়ের কাছে অর্থাৎ বলটিকে চেস্ট-ট্র্যাপিং করে পায়ে নামানো হল এবং এবাব বলটি একবার মাটিতে পড়ে আবার মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ওপরে ওঠাব চেষ্টা করার মুখেই স্ট্রাইকারের পা একটু পেছনে গুটিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে সামনে ছিটকে গিয়ে বলে লাগে এবং হাততালি ও চিৎকারে সব দিক ঢেকে যায়, এবারে চোখ খুললে বোঝা যাবে বিকেল বিকেলের মতোই ফুরিয়ে গেছে, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে এবং পাশ দিয়ে জোরে বাস বা লরি চলে গেলে এই আবছায়ায় পাতা বা ফাঁকা, বেঘর পলিব্যাগদের উড়তে দেখা গেলেও তার সঙ্গে অবধারিত যে ধুলোও উড়েছিল তাদের আর দেখা যায় না . স্টার্টেব ধাক্কায় জেগে ওঠে অটো...

—বিয়ে অনেকেরই হয়। আমাদেরও হয়েছিল। কিন্তু তোমার মতো ডুমুবের ফুল দেখিনি।

—আরে সে নয় নন্দদা। আমি কি কখনও ভেবেছিলাম যে বউ এসে এ বাড়িতে উঠবে। চানেব জায়গাটা টিন দিয়ে ঘিরতে হল. এটা করতে যাই তো দেখি ওটা নেই, টেবিল ফ্যানটা সারালাম—একা মানুষ। আর এত ছাতার ঝামেলা যে ঘাড়ে এসে পডবে ভাবিনি। এসব ছাড়। কী হল তোমার চার চাকার?

—হবে। হবে। হুট করে কি কিছু হয় নাকি! বিশ্বাস রাখ, ঠিক হবে। লাইসেন্সেব হিল্লে কিছু হল?

—কথা বলেছি। হয়ে যাবে। তাহলে যাই গো, এ বেলা ছটা ট্রিপ মাত্তর মেরেছি। খেতে হবে তো।

—খবরপত্তর কিছু শুনেছ?

—কীসের?

নন্দ একটু কাছে ঘেঁষে আসে। খাকি মোটা কাপড়ের হাফ শার্টেব বুকপকেটে অনেক ভাঁজ করা কাগজ। গুঁড়ি গুঁড়ি হাতের লেখায় একটা পোস্ট কার্ড। একটা ডটকলম যার মাথাটা নেই। ঘামে কপালটা চকচক করছে রাস্তার আলো পড়ে।

—কানাঘুষোয় খবর রটছে। বলছে খুব হাঙ্গামা হবে। তুমি শোননি?

—না।

—মাঠে তো বোর্ড বসে। জান তো?

—জানি।

—মাছওলা-ফাছওলা, তারপর গিয়ে বাজারের আরও কিছু মাল, এদের ঠেঙেই শোনা। বোর্ডের শেয়ার নিয়ে নাকি লেগে গেছে। নেতারা ডেকেছিল মিটমাটের জন্যে। হয়নি।

—নেপালি কী বলছে?

—ওর তো পাত্তা নেই। গা ঢাকা কেস।

—তবে তো ঝামেলা।

—ঝামেলা বলে ঝামেলা। বলছে মার্ডার-ফার্ডাব একটা হয়ে যাবে। বল কোনও মানে হয়? এই ভয়ে ভয়ে থাকা।

—তোমাব কী? যা হবে হতে দাও। থামাতে তো আব পাববে না।

—শুনে থেকে ভয় ধরে গেছে মনে। চালাচালির মধ্যে না পড়ে যাই।

—ধুস্। ফাল্‌তু ভেব না। মরুক না শালারা ক্যালাকেলি কবে। চলি। অটো স্টার্ট নেয় চন্দনের বাঁ হাতের হ্যাঁচকায়। অটো গজবায়।

—মাঝেমধ্যে রাস্তায় দেখলে, প্যাসেঞ্জাব না থাকলে দাঁডিয়ে যেও।

—আচ্ছা।

—তাহলে বলছ, আমাব কোনো ভয় নেই তো?

অটো চলে যায়। গিয়ার চডে। নন্দ কিছুক্ষণ দাঁডিয়ে থাকে। তাবপব শার্টের সাইড পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে। কানের কাছে ধবে বিডিটাকে দু'আঙুলে বগডায়। উল্টো কবে ফুঁ দেয়। ধরায়। তারপর হাঁটতে থাকে। নন্দ যেদিকে যায় তার উল্টো দিকেই একটু আগে চলে গেছে অটো। সাইকেলের রডে একটা বোগা ফরসা মেয়েকে বসিযে নিয়ে যাচ্ছিল একটা ছেলে। নন্দর ছাড়া বিড়ির ধোঁয়া ভেদ করে তারা চলে যায। সেদিকেই একটু আগে চলে গেছে। অটো।

চন্দন প্যাকেটটা এনে মালাব হাতে দিযেছিল। মালা জানত এটা কী।

—বাচ্চা না হওযার বডি। তোমাব নামেই নাম। ছাপা আছে গায।

মালা মুখ টিপে হেসে বলেছিল,

—জানি। মাসির কাছে নাম শুনেছি।

চন্দনেব ঘবেব সামনে এখন যেমন আগাছা, লতা, নিমেব চাবা, বাবলাব কাঁটা ঝোপ হযে আছে, আগে, মালা থাকার সময়টা এমন বুনো আব জংলা হযে ছিল না। এইসব জানা-অজানা আগাছার ভিড়েব মধ্যেই বয়েছে মালাব নিজের হাতে লাগানো নয়নতারা। আর বাতে সন্ধ্যামণি। শুধু অনেক ভিডের মধ্যে কখনও আড়াল হয় বা কখনও নুযে পডে বলে সব সময দেখা যায় না। তুলসী গাছ ছিল একটাই। পবে তাব মঞ্জবী ছডিয়ে অনেক চাবা হযে হয়ে তুলসীও চলে গেছে আগাছাব দলে। শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচ টাকা দিয়ে স্টেশন রোড থেকে কিনে আনা চন্দনের হাসনুহানা। গাছওয়ালা বুড়ো যখন প্রথম গাছটাব কথা বলেছিল, তখন গাছটাকে দেখে চন্দনের বলতে গেলে কিছুই মনে হয়নি।

—একে কী বলে জানেন? রাত কী রানি। বুডো মানুষেব কথা শুনে গাছটা নিযে যান। কী গাছ দিয়েছি পরে এসে বলবেন। গন্ধ এমন হবে না একেবাবে মাতাল করে দেবে।

—হাসনুহানা থাকলে বলে সাপ আসে।

—ওসব মা কথার কথা। আমি তোমাকে মিথ্যে বলব না। বলছি, গিয়ে লাগিয়ে দাও, পরে বলতে হবে হ্যাঁ, গন্ধ ফুলের গাছ একটা লাগিয়েছিলাম বটে বুড়োর কথায়।

—টবেই থাকবে?

—মাটি থাকলে মাটিতেই দেবেন। ঝাড় হয়ে ছড়াবে। বর্ষায় ডাল লাগালে আরও হবে। একেবারে পাড়া জুড়ে ভুরভুর করবে বাস।

—সার লাগবে?

—ওই একটু গোবর মাটি, খোল। তবে দেখবেন গোড়ায় যেন জল না জমে। খুব অভিমানী গাছ। মোটে জল জমা সইতে পারে না। গোড়াতে মাটি দিয়ে দেবেন থুপো করে।

ফুটবল খেলার দম নষ্ট হয়ে যাবে, চন্দন বিডি সিগারেট কম খেত। ব্রাজিলের সক্রেটিস নাকি

অনেক সিগারেট খেত। এসব কথা ওর খেলার বন্ধুরাই বলেছিল। খেপ খেলতে যারা চন্দনের সঙ্গে যেত তারা অনেকে নেশা করত। ধুনকি যদি রক্তে না মিশে থাকে তাহলে আধ ঘণ্টা বাদে বাদে লড়ে যাওয়া যায় না। এবড়ো-খেবড়ো পা খুব্‌লে নেওয়া মাটিতে খেলা যায় না। ফ্লাড লাইটে ঝলমলে নির্মম রাস্তা, ফুটপাথ জুড়ে খেলার লড়াইতে টিকে থাকা, টিমকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কেউ কেউ ট্যাবলেট খেয়ে নিত চা বা কোকাকোলা দিয়ে। চন্দন কখনও নেশার কাছে সুসময় ধার করতে যায়নি। কিন্তু মালা চলে যাওযার পরে চন্দন মদ ধরেছিল। ধরিয়েছিল মিউচুয়াল ম্যান। সেই সঙ্গেই বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। ছোট চারমিনার। এসবই হল ধরতাই। ধরতাই পেয়ে গেলে, হাওযা কপালে থাকলে, মরা বা বেহাওয়ার বেইমানি না থাকলে ঘুড়ি ঠিক উড়ে যাবে। ঘুড়ি উঠে যাবে লাটাই খালি করে। শেষে শেষ গিঁটটাও ছিঁড়ে চলে যাবে মেঘলোকের মশারির আড়ালে। সেখানেও কী আকাশ মাতাল করে হাসনুহানা ফুটে থাকে? নাকি সেখানে শুধুই রাতের হাসপাতাল বা মেঘলা দিনের জেলখানা যার গরাদের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর তার ডোবা ডোবা দাগ আঁকতে পারে না। ভরদুপুরে একদিন ধুম নেশা করে জোরে চালাবার সময় বাঁদিকে সার দিয়ে দাঁড় করানো ট্যাক্সি আর ম্যাটাডরের ফাঁক থেকে একটা বল ড্রপ খেতে খেতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তার আধ মুহূর্তের মধ্যে বলের পেছনে ধাবমান একটি ন্যাড়ামাথা বাচ্চা। ব্রেকের চাপে হিঁচড়ে হিঁচড়ে রাস্তা কামড়ে ধরেছিল অটো। চন্দন চিৎকার করে উঠেছিল,

—এই শুয়ারের বাচ্চা।

বলেই বুকটা কাতরে উঠেছিল। বাচ্চাটা, ন্যাড়ামাথা, পেটটা একটু ফোলা, কালো হাফ প্যান্ট পরা, দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভ্যাবাচাকা খেয়ে। বলটা উল্টোদিকের নর্দমাতে গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেছে।

—যা, বলটা নিয়ে আয়। আর কখনও এরকম করে রাস্তায় ছুটবি না। যা।

বাচ্চাটা বল নিয়ে ফেরার সময় অবাক হয়ে দেখেছিল অটোর ড্রাইভার হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অটোতে স্টার্ট দিচ্ছে। লোকটার তো লাগেনি। লাগলে তো তারই লাগত। হয়তো ন্যাড়া মাথাটাই ফেটে যেত। ফেট্টি বাঁধতে হতো। ড্রাইভার কাঁদতে কাঁদতেই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। চলে যাচ্ছে। অটো। বিকেল তখন নয়। কিন্তু আসবে। সেই বিকেলটাও দেখতে না দেখতে পালাতে শুরু করে। সেই দিকেই চলে গিয়েছিল। অটো।

অনেক আগাছার অন্ধকারে ওই তো দাঁড়িয়ে হাসনুহানার গাছ। তার মধ্যের অন্ধকারে, যেখানে অনেক ডালের ঝুপ্‌সি, সেখানে বাসা বেঁধেছে বোল্‌তা। ফুল ফুটেছে ছোট্ট, ছোট্ট। ন্যাড়ামাথা হতভম্ব ছোট্ট ছোট্ট ফুল। তাদের সবার গন্ধ এক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অফুরান। তলার ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটা বেজি যেতে যেতে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসনুহানা। এই জায়গাটা, এই যে বড় বড় ঘাস হয়ে যাওয়া জায়গাটায়, সেখানেও কেউ নেই। সামনেই তালা বন্ধ চন্দনের ঘর। ঘাস বড় হতে থাকা ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে থাকত। অটো।

অনেক রাত। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। নন্দদা যে গণ্ডগোলের কথাটা বলেছিল সেটা হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। এমনি বোমার শব্দ যা দেওয়ালে, কবরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেরার হয়ে যায়। লোহার পাইপ ফাটার তীব্র ধারালো শব্দ করে ফেটে পড়ে সকেট বোমা যার আওয়াজ বুকের পাঁজরার এক একটা হাড়কেই বেছে নেয়। বাঁশের গাঁট ফাটার মতো শব্দ ফায়ারিং-এর। হতে পারে যে পুলিস এসে গেছে। দুটো গ্যাংকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে গুলি চালাচ্ছে। অথবা হয়তো পুলিশ আসেইনি। নির্লিপ্ত মুখ করে থানায় নাইট ডিউটি দিতে দিতে তারাও হয়তো চন্দন আর মালার মতোই বোমা আর ফায়ারিং-এর শব্দ শুনছে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ কমতে থাকে। যুদ্ধ, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, একই নিয়ম মেনে তাকে থেমে যাওয়ার দিকে এগোতে হবে।

—আর হচ্ছে না। ফাটছেও দূরে।

— যারা পাবল না তাবা পালাচ্ছে। পালাবার সময়ে একটা-দুটো চার্জ করছে।

—কেউ মরে যেতে পাবে?

—পাবে। চোটও হবে কেউ কেউ। তবে এমনিতে কিছু হয় না। কত ফাইট দেখলাম। স্রেফ আওযাজ। আসলে কেউ কারও কাছে ভেড়ে না। তাছাড়া দুজনেবই লোক আছে খবব দেওয়াব। ধারেকাছে এলেই সিগন্যাল দিয়ে দেয।

—তুমি এদেব চেন?

—চিনব না কেন? আমারই বযসি তো সব। একসঙ্গে কত বলে খেলা কবেছি।

—তুমি কিন্তু ওদেব সঙ্গে কথা বলতে যেও না যেন। কীসেব থেকে কী হযে যায়।

—তা কি হয় নাকি? চেনা, বন্ধু—কথা বললে বলতেই হয। তবে ওবা কিন্তু গুণ্ডাগার্দি কবলেও লোক খাবাপ না। ওদের লাইনে যারা নেই তাদেব সঙ্গে ওদেব কখনও ঝামেলা হয় না। জল দাও তো। জল খাই। খেযে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল সকাল সকাল বেরোব।

—তবে যে বল সকালে প্যাসেঞ্জাব পাওযা যায না।

—সে জন্যে না। বাস স্ট্যান্ডেব চাযেব দোকানটাতে একবাব যাব। জানা যাবে কেউ চোট-ফোট খেল কিনা। অনেক মাল পড়ল তো, বলা যায না।

কেযা বতাউঁ ম্যায কহাঁ
ইউঁ হী চলা যাতা হুঁ
যো মুঝে ফিবসে বুলালে
ও ইশাবা না বহা
কোই হমদম না বহা, কোই সহাবা না বহা
হম কিসিসে না বহে, কোই হমাবা না বহা

—অ্যাক্সিডেন্ট যখন হবার থাকবে তখন তোমাকে ঠিক টেনে নিযে যাবে। নিশিব ডাক যেমন টানে। আমি কী জানতাম। আমার তো সেদিন বেবোবাবই কথা ছিল না। আব অ্যাক্সিডেন্ট তো এমনিতেই—গোটা জীবনটাই বববাদ হযে গেল। ফিনিশ। সান্নাটা। মিউচুয়াল ম্যানকে টেনেছিল। পা-টা ভেঙেছিল। তাবপব লোক খুঁজছিল। আমাকে পেযে গেল। কী করবে তুমি? কিচ্ছু করার নেই।

অটোব ভেতর বসেই, বেশ ধূম নেশাব ঘোবে, এই কথাগুলো এরফানকে বলেছিল চন্দন। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে দেখার মতো। মিউচুযাল ম্যানেব সাইকেল লাইনেব গাড্ডায় পড়ে গিযেছিল। ট্রাম ব্রেক কষেছিল। না কষলে সেই বাতের পব মিউচুয়াল ম্যানেব কোনও হদিস থাকত না। সেই ধাক্কাটাকে যে অর্থে অ্যাক্সিডেন্ট বলে ঠিক সেই হিসেবটা বোধহয চন্দনের বেলায খাটে না। অবশ্য বড় একটা মানে করলে হয়তো সেরকমই কিছু একটা দাঁড়াবে। অতবড় মানের এন্তার চিন্তায় না মাথা ঘামিয়ে বরং অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আচমকা চোট, ঘাযেল, ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার, সেলাই, স্যালাইন, বক্ত, তুলো, মুর্দাঘর—এই সবের মধ্যেই যদি থাকা সাব্যস্ত হয় তাহলে চন্দনের ঘটনাটা ছিল অন্যরকম। নিজে তার যা ইচ্ছে সে বলতে পারে, কিন্তু সেটা শুনে গেলেই হল। শোনা মানে তো আব মেনে নেওয়া নয়। আরও একটা যুক্তি আছে। লাইফে চোট খাওয়া মাতাল হাতে গুনে শেষ করা যায না। একেকটা পাড়া যদি ধরা যায় পাঁচটা দশটা এরকম মাল থাকবেই। এদের ভ্যাডব ভ্যাড়র প্রস্তাব শুনতে হলে লোককে আর কাজ কারবাব করে খেতে হতো না।

তারিখটারিখ কারও মনে থাকেনি। বরং এলাকাটায় ওটা ডাকাত পড়ার দিন বলে কথা তুললেই সবাই বুঝে নেবে।

সেদিন সকালে গাড়ি বের করবে না বলে চন্দন ঠিক করেছিল। আগের দিন কুলপি মালাই খেয়েছিল ঘরের সামনে গাড়ি ডেকে। গাড়ির গায়ে লেখা 'রাজস্থানের মটকা মালাই।' সকাল থেকে সেই বুকে ভোঁতা একটা ব্যথা, গলা ভাঙা, কাশি।

—জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। সেই খেলার টাইম থেকেই বুকটা আমার একটু কমজোরি। ঝট্ করে ঠাণ্ডা বসে যায়।

—তাহলে আজকে আর গাড়ি বের কোরো না। আমি না হয় বেরিয়ে দাদার বাড়ি ফোন করে দেব।

—না, না, দাদাকে বলতে হবে না। পরে আমি বলে দেব। বাজার লাগবে না?

—তুমি শুয়ে থাক তো। একদিন ভাতে কুমড়ো আলু সেদ্ধ দিয়ে খেয়ে দিব্যি চলে যায়। রাতে না হয় চারটে রুটি করে দেব। আলুভাজা দিয়ে। টেস্ট লাগবে।

—তাই দিও। কেন যে লোভে পড়ে ওই মালাই না কী যে খেতে গেলাম।

—আসলে তোমার কিচ্ছুই সয় না। বুঝলে? এই শরীর নিয়ে কী করে বল খেলা করতে তাই ভাবি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু গুছিয়ে নিই। অটোর কয়েকটা কাজ করাব। দাদার কাছে চাইব না। নিজেই করব। তারপর দেখছি শালা শরীরের বাচ্চার বংবাজি!

—তোমাদের না, ওই ড্রাইভার লাইনের হল এই দোষ। ভাল কথা মুখে আসে না।

এরকম কথা কয়েই সকাল গড়াচ্ছিল। কিন্তু স্নান করে বেরিয়ে মালা দেখল ড্রাইভারির গেঞ্জি আর রঙ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ট্র্যাক সুটের প্যান্টটা পরে চন্দন অটোর কাচ মুছছে।

—এই হল তোমার শুয়ে বিশ্রাম করা?

—দূর। অত খারাপ লাগছে না। যাই। গেলেই প্যাসেঞ্জার পেয়ে যাব। হকের রোজগারটা ছাড়তে যাই কেন?

—আমি কিন্তু পৈ পৈ করে বলে রাখলুম, এরপরে অসুখ একটা বাধালে আমাকে দোষ দেবে না। লোকে শুনলে তো আমাকেই দুষবে। বলবে কেমন মেয়ে তুমি গা? শরীর খারাপ, কাশি, তাকে যেতে দিলে, আটকে রাখতে পারলে না?

—আরে বাবা, আপ-ডাউন অফিস টাইমের কয়েকটা ট্রিপ সেরেই চলে আসব। দিব্যি খেয়ে বলছি। বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। তুমি ধীরেসুস্থে রান্নাটা বসাও। আমি যাব আর আসব।

বেশ হাওয়া ছিল বলে রোদ্দুরের তাপ থাকলেও অটোটা চালাতে সেই বেলা হয়ে যাওয়া সকালে যেন একটু বেশি ভালই লেগেছিল চন্দনের। গতির সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিতে পারলে আশপাশ, পথচলতি লোক, সাইকেল, সাবধানে রাস্তা পার হতে থাকা কুকুর, কবে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা রোড রোলার, ময়লা ফেলার ভ্যাট, দোকান, জটলা, ক্রেট করে পেপ্‌সি নামাবার কাচে কাচে ধাক্কার শব্দ, রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকা খোলা ক্যাসেটের ফিতে, হঠাৎ রঙের গমক জাগিয়ে তোলা কোনও কোনও মেয়ে—সব কিছুর ওপরে টেক্কা দেওয়া যায়। এ হল একটা রেস যাতে যে যত জোরে চলবে, যত প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্করার নেবে, যত ছাড়িয়ে, যত ছাপিয়ে চলে যেতে পারে ততই সুখ, ততই টাকা, এই যে উত্তাল জোরে রাস্তা চাপা দিয়ে গিয়ার থেকে গিয়ারে উঠে যাওয়া, এই যে একমাত্রিক ট্র্যাপিজ, এই যে গতি-জাড্যের পিঠের ওপরে বসে থেকে সফল সওয়ার হতে পারা—সবটা মিলিয়ে খেয়াল কখনও ত্যারচা তাকানোতে কিছু খোঁজে না, একবার লেপটে

দেখে নেয় নিজেব হাত যা হ্যান্ডেলের লাগাম ধরে আছে, গোটা গাড়িটা কাঁপছে যদিও ইঞ্জিনের শব্দে কোনও গজবানি নেই, টানা একটা স্রোতের শব্দ, টায়ারে পিচের চাদর ছোঁয়া, না ছোঁয়ার শব্দ, মাঝেমধ্যে শব্দের স্রোতে একটা আধটা খিঁচ যা চাকার তলায় কোনও ছোট্ট ইটেব বা পাথবেব টুকরো পড়ে যাওয়ার .

গাড়ির আওয়াজে এতটা বুঁদ হযে গিযেছিল যে শুনতে পায়নি, যদিও দেখতে পেয়েছিল, অনেক মানুষ ছুটে তার দিকেই আসছে। আসছে আব চেঁচাচ্ছে তাবা, ছুঁডছে যা কিছু কুড়িযে নেওয়া যায়, বাস্তাব পাশ থেকেও লোকে ছুটে এগিযে আসছে—ওবা তাড়া করছিল একটা ট্যাক্সি যাব থেকে হাত বেরিয়ে বলছে সবে যেতে, রাস্তা ছেড়ে দিতে, কী ঘটছে সেটা দেখতে আব বুঝতে যে কয়েক লহমা সময ছিট্‌কে যায় তাব মধ্যেই মুখোমুখি, পবস্পবেব দিকে ধাবমান ট্যাক্সি ও অটো মুখোমুখি .

দিশেহারা চন্দন এমনভাবেই ওই চৌম্বক সময়েব মধ্যে ট্যাক্সির দিকেই এগিযে যায় যে ট্যাক্সিব থেকে বোমা ছোঁড়ার হল্‌কা ও ধোঁযাও সে টেব পেয়েছিল পরে.. ট্যাক্সিটাও আসলে পালাতে চাযনি মানে সাইড থেকে বুকে নল ঠেকানো অবস্থাতে ড্রাইভার বুঝতে পেরেছিল যে তাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। অটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কেউ না কেউ মরবেই, তাই মুখোমুখি তুমুল সংঘর্ষেব মুখেই সে বাঁ কনুই দিয়ে বাঁ দিকে বসে থাকা লোকটার গলায় মেবেছিল, সেও তখন খুব ভাল অবস্থায় ছিল না, কারণ মানুষের ঢেউ-এব তেড়ে আসা বাদেও তার সামনে ছিল হেড-অন হয়ে এগিয়ে আসা অটো। আব সেই সঙ্গেই ডান দিকে ড্রাইভাব এত জোরে স্টিয়ারিং ঘোরায যে গাড়িটা টাল খেযে ফুটপাথে উঠে যায়, একটা বাড়িব সামনেব পাঁচিল ভেঙে। চন্দন ততক্ষণে ব্রেক কবেছে, কিন্তু অটো ছেঁচড়ে এসে ট্যাক্সিব পেছনেব বাঁদিকের দবজাটা আটকে, কমজোবি একটা ধাক্কা মেরে দাঁড়িযে যায়। এক-দু সেকেন্ডেব জন্যে চন্দনেব জ্ঞান ছিল না ঠিকই কিন্তু পবে সে মনে করতে পেবেছিল যে ট্যাক্সিব ভেতব থেকে গুলি চালাবাব দুটো শব্দই সে শুনেছিল। এগুলো ছিল বিমূঢ় অবস্থায় উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাব শেষ চেষ্টা যা কোনও কাজে লাগেনি।

ড্রাইভাবের বুকে যে চেম্বাব ঠেকিয়েছিল সে বাঁদিকেব দবজা কোনওমতে খুলে আগে নেমে দৌড় লাগিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারই নেমে পুবো গাড়িটা ঘুবে তাকে তাড়া কবে। তাব হাতে চেম্বাবটা ছিল কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যাওযা বা অন্য কোনও কাবণে চালাযনি। কিছুটা গিযে ইটে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে যায়। অটোতে বসেই চন্দন দেখছিল। ড্রাইভাব একটা ইট তুলে তাব মাথায বাব বার ঠুকছিল। তাবপব সেখানে এত লোক জমে গেল যে তখনকার মতো চন্দন আব দেখতে পাযনি। এব পবা ছিল একটা কালো প্যান্ট আব গাযে ছিল শার্ট। নোংবা নীল। অনেকটা চন্দনেব ট্র্যাক সুটের মতোই। মাথাব পেছনে কয়েকটা ইটেব আঘাত খাওয়াব পরেও সে ভেবেছিল দৌড়তে না পাবলেও হামাগুড়ি দিয়েও অন্তত কিছু একটা করা যায়। ততক্ষণে বাঁশ, বাড়ির কাজেব পেরেক লাগানো লম্বাটে তক্তা, রড, শাবল—সব আসতে শুরু কবেছে। বাঁদিকে, কিছুটা দূরে ঘটনাটা ঘটছিল। এব মধ্যে ট্যাক্সির পেছনের সিট থেকে ছিনিয়ে বাকি দু'জনকেও নামানো হয়ে গেছে। আরও মানুষ আসছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিযে—বেঁকে যাওয়া শিক, ডাণ্ডা, কোদালের হাতল যা পাওয়া গেছে তাই।

—মার! মার! মাইরা হাড্ডিগুড্ডি এক্কেরে খতম কইরা দে।

—একটা মালও জ্যান্ত পুলিসের হাতে যেন না যায। গেলেই বাঞ্চোতগুলা বেঁচে যাবে। দে...গলায় মার না। বাঁশটা চেপে ধরে থাক। পা দিয়ে গেড়ে ধব।

—অটো ড্রাইভারের চোট লাগেনাই তো।

—আরে কী কন্‌। এ তো আমাগো চন্দন।

—ওফ্ খুব সাহসের কাম কবছস্।

—চন্দনদা না ব্লক কবে দিলে শালারা ঠিক ভেগে যেত।

—মাব্। এহ্ হে, আবাব হাতজোড করে। মাব হালাব হাতে মার। হালায ডাকাতি কইর‍্যা বেডাও আর ধরা পডলে হাতজোড!

—এই শালাই পেটো চার্জ করছিল। আমি দেখেছি।

—আবে সর্‌তো। মাবতে জানিস না মারতে আসিস কেন? সব্। কী বে, খান্‌কির ছেলে। আব ডাকাতি করবি?

চন্দন হতভম্বের মতো সামাজিক মানুষের অসামাজিক ডাকাতদের তাদের পাওনা সাজা দেওযার দৃশ্যে দর্শক হয়ে যায়। সে না থাকলে যে ট্যাক্সিটা থামানো যেত না, সেটা লোকেবা বলছিল বটে কিন্তু তার মাথায় ঢোকেনি।

—এই, এই শালা, এটা বোমাব ব্যাগ। সাবধানে সবিয়ে বাখ। পুলিসকে দিতে হবে।

—ওসব নকডাবাজি না করে হাওয়া কবে দে। পুলিসকে দিচ্ছে।

—চেম্বারটা কোথায় গেল বল্ তো। এই তো এক্ষুনি পডেছিল।

—পল্লব না দুই দুইটা ভোজালি পাইছে। খাপ নাই।

চন্দন দেখেছিল ট্যাক্সি থেকে তখন দুজনকে টেনে নামানো হচ্ছে। তাদেব মধ্যে নন্দদাও ছিল।

উৎসাহেব একটা বোল ওঠে। জমে যাওযা পিচেব ড্রাম কতগুলো ছেলে, এরাও চন্দনেব চেনা, গড়িয়ে আনছে। যে দু'জন শুয়ে আছে, একজন পাশ ফিবে কুঁকডে, অন্যজন উপুড, ওদের ওপব দিয়ে গডিযে দেবে। এই সময়েই চন্দনেব পাশে দাঁডিযে একটা ছেলে বলেছিল,

—এভাবে মেবে ফেলার কোনও মানে হয? জান নেওযাব বাইট পালবিককে কেউ দিযেছে?

চন্দন অবসন্ন অবস্থায ছেলেটাব দিকে তাকিযেছিল।

লম্বা চুল। মাথায় হেড ব্যান্ড পরা। বেশ চেহারা।

—আপনাকে চিনি। আমি এদিকে কাজে আসি। ব্যাটারির দোকানে। এই .. কী কবছে দেখুন। ছিঃ চন্দনের পা দুটো কাঁপতে শুরু কবে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। চন্দন ছেলেটার কাঁধটা ধবে ফেলে। দাঁডিয়ে তাকে থাকতেই হবে। হাঁটাব কথা কি ভুলে গিযেছিল চন্দন?

যে কুঁকডে পাশ ফিবে শুয়েছিল তাকে পা দিযে লাথিযে চিত কবা হয। যে উপুড হযে শুযেছিল তাকেও। বাসের ক্লিনার একটি ছেলে লম্বা একটা ভাবি লোহাব রড একজনের তলপেটের নীচে ও দু'পায়ের ফাঁকে সোজ নামিযে আনে।

—হালার ডাকাতের চোঙা-তবিল সব ফাটাইয়া দে।

যে ছেলেটা এই কাজ করছে সে একটা নোংরা তেলকালি মাখা পাজামা ও ভুসো রঙেব গেঞ্জি পরা। বোধহয় সে বাসের তলায় শুয়ে এতক্ষণ কাজ কবছিল। এখনও সে কাজ করছে। তার মুখে কোনও ভাবলেশ নেই। খুব মন দিয়েই সে কাজটা করতে চায়। সে পরের লোকটার দিকে এগোয়। এতক্ষণ উপুড় হয়ে ছিল বলে দেখা যায়নি। লোকটার একটা চোখ খুবলে কালো অন্ধকার হয়ে রয়েছে আর রক্ত, দাঁত, ছাল-চামডা...

ছেলেটা আবার বডটা তোলে.. চন্দনের দুটো হাঁটু ভেঙে যায়। চন্দন মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে রাস্তার ওপবে নেমে আসতে থাকে। এবার চন্দন দেখতে পায়নি। শব্দটা শুনেছিল। উল্লাসধ্বনি। এবপরই একটা চিৎকারে ভিডটা হঠাৎ ছড়িয়ে যায়। খুব ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখলে হয়তো মনে হতো অনেকগুলো পিঁপড়ে কয়েকটা মিষ্টি বা টুকরো মাংসের ওপরে জড়ো হয়েছিল এবং আচমকা কোনও সঙ্কেত পেযে সহসা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

—পুলিস! পুলিস।

—জিপ, ভ্যান সব নিয়ে এতক্ষণে এল।

—সবে যান।

পুলিস যে এসেছিল চন্দন জানেনি। চন্দন আর কিছুই জানতে পারেনি।

—ব্রেভ বয়! বোধহয় লিনচিং দেখে ফেন্ট করে গেছে। এই এদিকে শোন। তোমরা ওর বাড়ি চেন না।

—চিনি সাব।

—গুড। ওকে বাড়িতে দিয়ে এস তো ভাই।

—সাব! অটোতে করেই নিয়ে যাব? চাবি ওর হাতেই ছিল। আমাকে জড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে যায়।

—যাও। ফাল্‌তু ওকে জড়াব না। ব্রেভারির জন্যে ওকে আমি রেকমেন্ড করব। ইস্.. এভাবে মারে? মল্লিক, একটাকেও আইডেন্টিফাই করতে পারলে?

—মুখফুখ যা হাল করে দিয়েছে সাব

—আরেকটা কোথায়? তিনটে ছিল শুনলাম।

—সামনে ওই যে নোংরার ভ্যাট আছে, ওই তো, ওখানে গারবেজের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে

—ওয়েপন্‌স?

নন্দ তদারকি করে। চন্দনকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। হাতের বাজার ব্যাগ দেখিয়ে সে বলেছিল,

—বাড়িতে আজ আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির থেকে লোক আসবে। বাজারফাজার কিচ্ছু হয়নি। এই তুই চিনিস তো চন্দনের বাড়ি।

—খুব ভাল চিনি। গত বছর গরমের ছুটিতে আমাদের কোচিং করেছিল। চিনি না?

—সেই ভাল হল তাহলে। এই আরেকজন তো লাগবে। কে যাবে? তুই যাবি?

আর একটি কিশোর এগিয়ে আসে।

—ভাল করে ধরবি।

চন্দন গোঙানির মতো একটা শব্দ করে।

—হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসবে।

চন্দন ফের গোঙায়।

—আমি যাব। বিকেল করে খোঁজ নিয়ে আসব।

চন্দন কিছু একটা বলে। বোঝা যায় না। হয়তো অস্পষ্ট, জড়ানো জড়ানো না হলেও বোঝা যেত না। মাথায় হেডব্যান্ড, লম্বা চুল ছেলে অটো স্টার্ট দেয়।

—তোমার নামটা কী ভাই?

—ভিকি।

—কী?

—ভিকি। বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে যে মোড়টা পড়ে, তার বাঁহাতি ব্যাটারির দোকানে কাজ করি।

অটো গড়ায়। নন্দ হাতের বাজার ব্যাগটা ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নেয়। তারপর হনহনিয়ে হাঁটা লাগায়। কিছুটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে যে ভিড়ভাট্টা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। কয়েকজন পুলিসের কথায় ট্যাক্সিটা ঠেলে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাচ্ছে।

—নাম বটে একখানা। ভিকি! আবার বাবরিকাটা চুল। তায় আবার ফিতে বাঁধা। ভিকি! শুনলে

মনে হয় কুত্তার নাম।

অটোতে চন্দন নিঃসাড়ে পেচ্ছাপ কবে ফেলে। গোঙায়। ওর মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। সরু হয়ে ঝুলতে থাকে।

—এই রে, মুতে দিয়েছে। ধব্। ধবে বাখ্। ভিকি অটো আস্তে করে দেয়। থামায়। ইঞ্জিন চালু রেখেই। পেছন ফিরে একবার দেখে নেয় নীচে।

—ও কিছু না। শক্ লেগে গেলে ওরকম হয়। ঠিক হয়ে যাবে।

হেডব্যান্ড না থাকলে চুলগুলো মুখের ওপরেই এসে পড়ত। ভিকির চোখ দুটো ছিল একটু কটা। চুলগুলোও ঠিক কালো বলা যায় না।

—ওই টিপকলটা পেরিয়ে বাঁদিকের গলিতে। চন্দন একবাব ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ খোলে। আবার নেতিয়ে পড়ে।

মালার কান্না শুনে আশপাশেব বাড়ির বউ, মাসিমা ও অন্যান্য অনেকে এসে জড়ো হয়। ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা কবা হয়। চন্দনের কপাল তখন জ্ববে পুড়ে যাচ্ছে।

যাওয়াব সময় একটু এগিযে ফিরে আসে ভিকি।

—বউদি, রাখ। ভুলে অটোর চাবিটা পকেটেই থেকে যাচ্ছিল। মালা হাত বাড়িয়ে চাবি নেয।

—দাদা না থাকলে ডাকাতগুলো আজ ধবা পডত না। আমি দেখেছি, স্ট্রেট চলে এল। হিম্মত দরকার।

—আমি জানতাম আজ অমঙ্গলেব কিছু একটা ঘটবে।

—আবে না না। শক্ খেয়ে গেছে তো। ওইভাবে পিটিয়ে পিটিযে মারা। আমাবই গা গোলাচ্ছে ভাবলে। পরে, এক ফাঁকে এসে দেখে যাব। রক্তফক্ত সবাই দেখতে পারে না।

চন্দনের জ্বর আরও বেড়েছিল। সেইসঙ্গে ছিল ভুল বকা। ইঞ্জেকশন পডাব পর ভুল বকাটা কমে গেলেও থেকে থেকে চন্দন চমকে চমকে উঠছিল।

ঠিক একটানা না হলেও চন্দন একটা স্বপ্ন দেখেছিল জ্বব ও চমকে ওঠার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টেব পরেব কয়েকদিন। একটাই স্বপ্ন। যার কিছুটা দেখা হয়ে গেলে কিছু একটা বলে উঠতে হয। তখন স্বপ্নটা বন্ধ থাকে। আবাব তলিয়ে যেতে শুরু করলে ডুবে যাওয়ার ওজনহীনতাব মধ্যে কোনও একটা খেই ধরে ফেব স্বপ্নটা শুরু হয়।

ঘরেব সামনে জায়গাটায় হাসনুহানার ঝাড়, সেই জায়গাটা ফাঁকা করে বেশ পরিপাটি কবে বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানায় বালিশে মাথা দিয়ে মা শুয়ে আছে। মা-র কপালে চওড়া করে সিঁদুর দেওয়া। ফুল দিয়ে সাজানো। মা কিন্তু মরে যায়নি। ঘুমোচ্ছে। আর এই বিছানাটা ঢেকে টাঙানো আছে মশারি। যার ভেতরে সবটা স্পষ্ট দেখা যায় না। সময়টা বাত। খুব চাঁদের আলো। হাসনুহানাব গাছ না থাকলেও তাব গন্ধে চারদিক ম-ম কবছে। চন্দন মশারির কাছে যেতে চায়। কিন্তু যেদিক দিয়েই সে এগোয় না কেন ঝড়ের মতো ওঠে আর মশারিতে ঢেউ খেলে খেলে চন্দনকে সরিয়ে দেয়। ভাল করে দেখতেই দেয় না মা-র চোখটা খোলা না বন্ধ। মা কিন্তু মরে যায়নি। কারণ তার বুকটা ওঠানামা করছে। যে নিঃশ্বাস নেয় সে মরে যেতে পারে না। কিন্তু মশারিটা উঠিয়ে চন্দন যে কাছে যাবে সে উপায় নেই। সোঁ সোঁ ঝড়ের শব্দ আর মশারিতে ঢেউ। সময়টা রাত। আর খুব চাঁদের আলো।

পরে চন্দনের এই স্বপ্নটার কথা কখনও মনে পড়েনি।

ডাকাতদের নাম-ধাম সব পরে জানা গিয়েছিল। ওরা এসেছিল ডায়মন্ডহারবার অঞ্চল থেকে। ট্যাক্সিটা হাইজ্যাক করেছিল প্রথমে। সেইমতো ড্রাইভারকে চালাবার জন্যে পাশে বসেছিল একজন।

একেই পরে ভ্যাটের ময়লাব তলা থেকে বের করা হয়। ওদের প্ল্যান ছিল পাল্লার বাজারের বাইরে যে বড় গয়নার দোকানটা সদ্য খুলেছে সেখানে ডাকাতি করবে। দুজন ঢুকেছিল। কিন্তু ড্রাইভার চেঁচিয়েছিল বলে লোকজন ছুটে আসে। পেছন থেকে একজন ড্রাইভাবের মাথায় ভোজালিব বাঁট দিয়ে মেরে গাড়ি ছুটোতে বলে। ভাগ্য ভাল থাকলে ওরা বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বাচ্চাদের ইস্কুল-ভ্যান সামনে পডায় সেটা সম্ভব হয়নি। ড্রাইভাবও চেষ্টা করছিল যাতে গাড়িটা লোকজন থেকে ফাঁকায় না বেরিয়ে যেতে পাবে। এ সময়েই উল্টোদিক থেকে চন্দনেব অটো এসে পড়ে। ট্যাক্সিটা যদি জনতাব তাড়া এডিয়ে ফাঁকায় চলে যেত তাহলে ওবা ড্রাইভারকে মেবেও দিতে পারত। যাই হোক, পবিকল্পনামাফিক কিছুই হয়নি। হলে চন্দনকে নেশা কবে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জনে জনে বলে বেডাতে হতো না। তবে চন্দন নিশিব ডাকেব সঙ্গে যে তুলনাটা পবে দিয়েছিল, সেটা উডিয়ে দেওযা হযতো যায় কিন্তু তাতে ব্যাপাবটাব অবাক কবা দিকটা নস্যাৎ হয় না। অ্যাক্সিডেন্ট, মার্ডাব, গুম, কিডন্যাপ, চোবাগোপ্তা স্ট্যাবিং, আচমকা ব্রেক কষা ট্রাম, ওভারব্রিজের রেলিং ভেঙে নীচে লাফিয়ে পডা মিনিবাস, খালের জলে মুখ গুঁজে উল্টে যাওয়া বাস—এরকম অনেক কিছু ঘটে। এবং কিছু মানুষ এই বন্দোবস্তেব হাতে মুবগি হয়ে যায। সেই কথাটাই চন্দন বলেছিল। যেমন সে বুঝেছিল তেমন। কখন কীভাবে যে একজন মুবগি হয়ে যাবে কেউ বলতে পাবে না। হাত দেখতে যে জানত সেই নন্দও না।

ডাকাত মাবাব পরে দিনদশেক অন্তত চন্দন প্রথমে বেহুঁশ, পবে ঘোব-বেঘোবেব মধ্যে পডেছিল। ওষুধ পডল অনেক। অটোব মালিক দাদাও একদিন দেখতে এসেছিল। মালাব হাতে তখন পযসা ফুরিয়ে গেছে। মলিনা মাসি তাব নিজেব টানাটানিব মধ্যেও কুডিয়ে-বাডিযে দেডশো টাকা দিযে গিযেছিল। তার ফলে চারদিনেব ওষুধ হয়ে গিযেছিল। দাদা মালাকে সাতশো টাকা দিয়ে বলেছিল যে এই টাকাটাব কথা চন্দনকে ববং বলাবই দবকার নেই। ও যেবকম ইমানদার ছেলে তাতে এই টাকাটা ফেবত দেওযাব জন্যেই হযতো বেসামাল শরীরে অটো নিযে বেরিয়ে পডবে। দাদা মালাকে বাডির ফোন নম্বব দিয়ে বলেছিল দিনকয়েক দেখতে। চন্দন যদি তাতেও সামলে না ওঠে তাহলে ফোন কবতে। দাদা না থাকলেও বৌদি সব সময়েই বলতে গেলে বাডিতেই থাকে। বৌদিকে বললেই হবে।

মালাকে অবশ্য ফোন কবতে হযনি। চন্দন আস্তে আস্তে সেবে উঠল। দুর্বলতা ছিল কিন্তু খুব। বলেছিল একটু সময় দাঁড়িযে থাকলেই হাঁটু দুটো থবথব করে কাঁপতে থাকে। দুটো-চাবটে কথা বলার পরই হাই তুলত। বলত ঘুম পাচ্ছে।

—সেই নকশালদের সময়ে অনেক খুনখাবাপি হযেছিল। কিন্তু সে তো আর আমাদের দেখতে হয়নি। শুনেছি কেবল। এ একেবাবে চোখের ওপবে

—ওসব অশৈল ঘটনা ভেব না... ফের শবীব খাবাপ বাডবে।

—আবে বাবা ডাকাত হলেও মানুষ তো। তোবই মতো তার ব্যথা-বেদনা। কসাই .. সবকটা কসাই। মা .. গো

ওই দৃশ্যটাই চন্দনের বাব বাব মনে পড়ে। চিত করে ফেলার পব বাসের ক্লিনার ওই ছেলেটা লম্বা, ভারি রডটা তুলে তলপেটেব নীচে, দুপায়েব ফাঁকে, নির্লিপ্ত মুখে নামিয়ে আনছে. চন্দন জানে যে ফ্রি-কিক থেকে বাঁচাব জন্যে দেওয়াল যারা বানায় তারা ওই জায়গাটা আর বুকটা চোট থেকে আড়াল করার জন্যে হাত দিয়ে আডাল করে. কখনও লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে দেহটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিতে হয় কারণ বল লাগলে ওখানে আর কিক-এ যদি সেরকম ফোর্স থাকে... চন্দন নিজেব অজ্ঞান্তেই দু হাত দিয়ে জাযগাটা আডাল কবে। তাকে কেউ ওখানে রড দিয়ে ওভাবে

মাবছে কেন। মাবলেও সে কি হাত দিয়ে থামাতে পাবত কিছুটা নিজেব ভাবে, কিছুটা আঘাতকাবীব হাতেব জোবে, বাকিটা পৃথিবীব অভিকর্ষেব টানে নেমে আসা সেই লোহাব ভাবি বড?

এই সময় ঘবেব মেঝেতে বাইবেব বোদ্দুব থেকে যে ঢুকছিল তাব ছাযা পড়েছিল প্রথমে। অবশ চোখে চন্দন দেখেছিল। ভিকি। লম্বা চুল। হেডব্যান্ড। টাইট নাইলনেব গেঞ্জি আব সস্তাব জিন্‌স পবা। পায়ে কমদামি সাদা স্নিকাব। ভিকিব হাতে একটা পলিব্যাগ ছিল। তাতে দুটো মুসাম্বি।

—ধব বৌদি। দাদাব জন্যে। কেমন আছে, বস্?

ভিকি টুলটা টেনে নিযে বসে পড়ে। কাবও বলাবলিব তোযাক্কা না কবেই। চন্দনকে দেখতে দেখতেই স্নিকাবেব ফিতে খুলতে থাকে।

—ভাল। এখনও দুর্বল লাগছে। কিন্তু ভাল।

—আবে শুনেছি তুমি ভাল প্লেযাব ছিলে। তোমাদেব কাছে এগুলো কোনও ব্যাপাব? কযেকটা দিন বেস্ট নিলেই ফিট হযে যাবে।

—মালা, একে চেন? ও সেদিন না থাকলে

—ছাড তো। বৌদিব সঙ্গে সেদিনই পহেচান হযে গেছে। আবে, জানোই তো না। তোমাব না, অটোব চাবি পকেটে কবে চলে যাচ্ছিলাম। অত হট্টগোল তো। ধামাকাতে সব গুলিযে গিযেছিল।

—মালা, টেবিল ফ্যানটা ওব দিকে একটু ঘুবিযে দাও না। বেচাবা বোদ মাথায কবে এসেছে।

—আবে, ঠিক আছে। ও হাওযা-ফাওযা আমাব লাগে না। পবে শুনলাম—তিনটে মালই ফিনিশ। পুলিস দুটো ভোজালি ছাড়া আব কিছু পাযনি।

—ওদেব কাছে তো শুনেছিলাম চেম্বাবও ছিল।

—হাওযা কবে দিযেছে। ওই টানা মাল দেখবে আবাব কোনও কিচাযেন-ফিচাযেনে লডিযে দেবে। সব বংবাজ এখন।

—পুলিসও তেমন গা কবে না।

—পুলিস? বাত গযী তো বাত গযী। এল। লাশ তুলল। ভোঁ ভাঁ। এদিকে চেম্বাব, বোমা কি যে গাযেব হযে গেল কে জানে?

—কী বলব? কিছু বলাব নেই।

—ওই জন্যে জানবে, বৌদি কি চা বানাচ্ছ নাকি, বানাও, ভিকি কোনও ঝুটমুট ক্যাচালে থাকে না। কোনও লাভ আছে? এ এমন দিনকাল জানবে যে যাব কাবও সঙ্গে কোনও খিঁচ নেই সেও শালা টুক কবে ফেঁসে যাবে। সব শালা বববাদ কবে দিল।

—বিস্কুট দেব দুটো?

—এ আবাব জিজ্ঞেস কবে নাকি? বাড়িতে এসেছে

—দাও না, অন্যদিন সকালে দোকানে চা-রুটি খেযে নিই। আজ আব হযনি। ভাবলাম দাদাকে দেখে আসি। ওখানেই চা হযে যাবে। একে বলে কপাল। বিস্কুটও এসে গেল।

মালা বিস্কুট দিতে গিযে আবছা মদেব গন্ধ পেযেছিল। বাবাকে চা দিতে গিযেও মালা এই গন্ধটা পেত। গত বাতে যাবা বেশি মদ খায তাদেব নিঃশ্বাসে গন্ধটা থেকে যায। চেনা বলেই বোধহয মালা ভেবেছিল যে গন্ধটা তাব খাবাপ লাগেনি। অথচ সেদিন এই গন্ধটা যদি মালা চন্দনেব মুখ থেকে পেত তবে সেটা ভাল লাগত না। গন্ধ এবকম কত জায়গায কত মানুষকে যে বিপদে ফেলে দেয় বা হাত ধবে টেনে তোলে অথবা হা-হুতাশেব মধ্যে ঠেলে দেয় তা অগুনতি গল্প হতে পাবে। কয়েকটা যে হযওনি এমন নয। এমন কিছু মেযে আছে যাবা বিছানা থেকে উঠে চলে যাওয়াব পবেও অনেকদিন তাব ব্যবহৃত সুগন্ধী বা পাউডাব বা হয়তো সাবানেব গন্ধই বিছানাব চাদবে

বালিশে আঁকড়ে থাকে। সব জাযগায় হযতো নয। ঘুমেব মধ্যে উপুড হলে কখনও নাকে সেই গন্ধটা এসে মাথাব মধ্যে ঝিমঝিম কবে। কিন্তু এটা কখন ঘটবে সেটা কেউ জানে না। আবাব এটাও ঠিক যে অনেক দিনেব পবেও যখন অনেকদিন কেটে যায় তখন আব সেই গন্ধটা হাজাব মাথা কুটলেও আব পাওযা যায় না। ট্রেন ছেড়ে যাওয়াব পবেও এরকম হতে পাবে। আসলে এটা একটা নিযম। চলে যাওযাব একটা নিযম। এব সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। কিন্তু মানুয এতই অবুঝ যে সেটা মানতে চায় না। আব এখানেই সেই বাব বাব পডা গল্পগুলো ফের নতুন করে শুরু হয। তাই না?

ভিকি যেদিন এসেছিল সেদিন বাতেই মালাকে জড়াতে গিযে অসম্পূর্ণতাব হদিস পেযেছিল চন্দন। তাব বুক জুডে মন কিছু একটা চাইছে কিন্তু নিজেব শবীরটাই সাডা দিচ্ছে না তাতে। অথচ এমন কথাটা মন থেকে, মাথা থেকে কিছুতেই সায পাচ্ছে না যে পাবে না। চন্দন মালাকে জড়িয়ে বেখেই মালার সেই ভঙ্গি বা অবস্থাগুলো মনে কবতে চেষ্টা কবে যাব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে তাব পাবার ব্যাপাবটা। মালাব ঘেমে ওঠা দুটো স্তনেব মাঝখানে এত জোবে চেপে ধবে মাথাটা যে মালাবই বুকেব হাডে চন্দনেব কপাল থেকে ব্যথা লাগে।

—লাগছে! লাগছে! ছাড না। উঃ

চন্দন উঠে খাটের ধাবে বসে। টেবিল ফ্যানের হাওযাটায যেন বেশি শীত শীত করে যদিও যথেষ্ট গুমোট গবম ছিল তখন। কপালটায ঘাম জমছিল। হাসনুহানাব গন্ধ তোডে ঘবে ঢোকে আব চন্দনেব মুখে এসে ধাক্কা মেবে দম আটকে দেয থেকে থেকে। চন্দন হাঁপায। মালা ঘষটে ঘষটে খাট থেকে নেমে এসে চন্দনেব কাছে দাঁডায। মালা শুধু সাযা পবে আছে। চন্দনেব চুলে হাত বুলিযে দেয। ঝুঁকে পডে চন্দনেব মাথাব ওপব।

—আমাকে জল দাও না। বড পিপাসা লাগছে।

মালা যখন কুঁজোব থেকে জল গডায তখন চন্দন অনুভব কবে শুধু দুটো হাঁটু নয, তাব দুটো পা-ই কাঁপছে। যেন সে একেব পব এক ম্যাচ খেলে খেলে পা দুটোব আব কিছু ধকল বাকি রাখেনি। পা দুটোতে তাও কাঁপুনি আব ভাবি, টনটনে, নীচেব দিকে টেনে নেওয়া ব্যথা। হতে পাবে। কিন্তু ওই জাযগাটা অসাড। নিঃস্পন্দ। ওখানে কোনও রগ, কোনও স্নাযু, কোনও পেশি নেই। নিজেবই শবীবেব মধ্যে একটা জায়গা চলে গেছে শবীবেব নিযন্ত্রণ বা স্বেচ্ছা-উল্লাসের বাইবে। হাসনুহানাব গন্ধটাই যেন উগ্র। বিবক্ত হয চন্দন। জল খায। খেযে গেলাস দিতে দিতে বলে,

—বেকাব একটা ফুল গাছের গন্ধ। শালাকে কাল কেটে ফেলব।

হাসনুহানা গাছ শিউবে উঠেছিল কিনা কেউ জানে না কিন্তু মালা বুঝতে পেবেছিল যে চন্দন ভুল বকছে।

—গাছ কী দোষ কবল? কী বলছ তুমি?

—অ্যাঁ।

—কী বলছ? গাছকে দোষ দিতে নেই। ও ওব মতো ফুটছে ফুটুক না।

—হ্যাঁ। কিন্তু কী যে হযে গেল। এতটা পডে গেছি আমি?

—ওইসব দেখেছ তো। তাই শবীবটাও কমজোরি। ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলছ?

—বলছি ভেব না। দেখবে, সব ঠিক হযে যাবে। এস, শোও। শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিযে দিই।

চন্দন ব্যথার পা দুটো টেনে খাটে উঠে বসে। আবাব নামতে থাকে।

—কোথায় চললে আবার?

—আসছি।

পেচ্ছাপ করতেই বেরিয়েছিল চন্দন। কিন্তু দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল আগে থেকেই পেচ্ছাপটা শুরু হয়ে লুঙ্গিটা ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে সপসপে লুঙ্গিটা ডান পায়ে ঠাণ্ডা লেপটে যায়। এবার কেঁদে ফেলে চন্দন। ভয় পেয়ে কাঁদছে সে। এরকম অসহায়, ভরসাহীন, পলকা তাব নিজেকে কখনও লাগেনি। তার শরীরের মধ্যে একটা বেদখল হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না। চাঁদেব আলোয় যখন চন্দন দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, তখন তার থেকেই হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়েছিল অটো। এর আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। খুব জোবে না হলেও অনেক জল নেমে মাটিতে মিশেছিল। সেই জলে অটোর গায়ের থেকে হত্যাকাণ্ডের সব ধুলো ধুয়ে গিযেছিল। চন্দন তাকিযে দেখেছিল অটো কী আনন্দে জ্যোৎস্না মাখছে চুপ করে দাঁড়িযে। তার গা চক্চক্ করছে আনন্দে। আলো পিছলে গড়িয়ে যাচ্ছে বডির ঢাল বেয়ে। চন্দন তার অটোকে বলেছিল বড় আর্তি নিয়ে,

—তুই পারিস না আমাকে সারিয়ে দিতে?

অটো জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন লজ্জায় তার মুখ দিযে কথা সরছে না।

—দেখলি তো, কোনও ঝামেলাতে থাকি না, কিন্তু কীসেব থেকে কী হয়ে গেল। ওরকম কবে লোককে মারে? মবেই হয়তো গেছে কিন্তু থ্যাতলাচ্ছে। খুঁচোচ্ছে। কী যে করছে না কবছে

অটো লজ্জায় যেন মাথা নিচু করে আছে।

—আমাকে শেষ কবে দিল দেখলি তো। মুখে বলছে দারুণ কবেছ তুমি। তুই না অটো দিযে, তোকে দিয়ে রাস্তা না আটকালে ..

চন্দনেব কথা মুখের আঠায় জড়ায়,

—...ওদের ধরা যেত না। কী হল ধরে? এমন করে মারলি যে ইঁদুবকেও কেউ মারে না। বল্? মারে?

চন্দনের থেকে হাতকয়েক পেছনে দাঁড়িয়ে মালা কথাগুলো শুনছিল। গুঁড়ি মেরে মেবে বাত গড়ায়।

না পারার ব্যাপারটা আরও তিন-চারদিন পরপর হওযাব পরে ব্যাপারটা চন্দন নন্দকে বলেছিল যদিও শোনার সময় নন্দকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আনমনা না দেখাবাব কথাও ছিল না কারণ নন্দ এমনিতেই ভয়কাতুরে মানুষ, রঙকল বন্ধ হয়ে যেতে যারা আওয়াজ উঠিয়েছিল সেই দলেও ভেড়েনি, আর ঝামেলা যেটা হওয়ার সেটা ডাকাত পড়ার দিনই ঘটে গিয়েছিল। নন্দ এমন ঢংয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল যে তাব যেন অনেক কাজ, এক্ষুনি ছুটতে হবে।

—আমি বরং তোমার ঘরে গিয়েই কথাগুলো ভাল কবে শুনব। একটু ঝামেলায় আছি। কী যে করি ভেবে হদিস করতে পারছি না।

—কিন্তু ঘরে এইসব কথা... ঠিক আছে। এস। তাড়া আছে যখন আটকাব না। আব কথাটা কাউকে বল না।

—ক্ষেপলে নাকি? মরদে মরদে কথা। আর এ কথা কেউ কাউকে বলে নাকি? লোকের যা স্বভাব। বললেই সাতকান করে বেড়াবে।

—তুমি কিন্তু এস নন্দদা। সব লোককে তো আব বিশ্বাস করা যায় না। পুলিস কিছু খুঁজে পায়নি। না?

—কী?

—ওই যে, ডাকাতদের সঙ্গে ছিল।

—ভোজালি?

—না, না, ভোজালি নয়। শুনলাম চেম্বার-টেম্বারও ছিল। বেপাত্তা হয়ে গেছে।

—কে বলল তোমায়? থানায় শুনলে বুঝি?

—আমার আবার থানায় কে চেনা। এমনি পাঁচ পাবলিক বলাবলি করছে। কানে এল।

—আমি ভাই ওসবের খবরে যাই না। গিয়ে লাভ? হয়তো সাদা মনে জিজ্ঞেস করলাম। তা অন্য লোকের মন তো তত সাদা নয়। কী শুনতে কী বুঝল, মধ্যে থেকে হয়তো র‍্যাঁদাচাঁচানি চলে গেল আমার ঘাড়ে।

—কেউ বলছে ওয়ান শটার ছিল। কেউ বলছে বিলিতি চেম্বার। ঝামেলার মধ্যে হাপিস হয়ে গেছে।

—যাক গে বাবা। যে নিয়েছে সে বুঝুক গে। আমি তাহলে এগোই চন্দন। আর দেরি করলে গাড়ি ফেল করে যাব।

—তা চলছ কোথায়?

—ওই একটু ঘুটিয়ারিশরিফে যাব। দিন বুঝে ওখানে হাত দেখতে বসি। ধান্দা। ধান্দা না করলে চলবে?

—তাহলে যাও। কিন্তু এস। আমি বিশেষ ঘর থেকে বেরচ্ছি না। আজই পায়ে পায়ে এতটা চলে এলাম।

—আসব। বউ ভাল?

—হ্যাঁ গো নন্দদা।

আর কয়েকটা দিন পরে চন্দন ফের অটো নিয়ে বেরোল। কাজের মধ্যে থাকলে তাও নিজের অস্বস্তির কথাটা কিছু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু সেই জায়গাগুলো, একেবারে টাটকা ঘটনার সেই জায়গাগুলো তো রয়েছেই। দেখার ইচ্ছে না করলেও দেখতে হয়। সেই ভ্যাট যেখানে ময়লার ডাঁই-এর তলা থেকে দুটো পা বেরিয়েছিল। ওই তো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল যেখানে ট্যাক্সিটা গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। ওরই তো সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চন্দনের অটো। তারপর? তারপর সেই চিৎকার, গর্জন, উল্লাস। মাথার মধ্যে বোতাম টিপে কেউ যেন ভিডিও চালিয়ে দেয়,

..বাসের ক্লিনার একটি ছেলে লম্বা একটা ভারি লোহার রড একজনের তলপেটের নীচে ও দু'পায়ের ফাঁকে সোজা নামিয়ে আনে।

—হালার ডাকাতের চোঙা-তবিল সব ফাটাইয়া দে।

যে ছেলেটা এই কাজ করছে সে একটা নোংরা তেলকালিমাখা পাজামা ও ভুসো রঙের গেঞ্জি পরা। বোধহয় সে বাসের তলায় শুয়ে এতক্ষণ কাজ করছিল। এখনও সে কাজ করছে। তার মুখে কোনও ভাবলেশ নেই। খুব মন দিয়েই সে কাজটা করতে চায়। সে পরের লোকটার দিকে এগোয়। এতক্ষণ উপুড় হয়ে ছিল বলে দেখা যায়নি। লোকটার একটা চোখ খুবলে কালো অন্ধকার হয়ে রয়েছে আর রক্ত, দাঁত, ছাল-চামড়া... ছেলেটা আবার রডটা তোলে...

চন্দন রাস্তার ধারে অটো দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘামছে। দরদর করে ঘামছে। দেহ থেকে যতটা ঘাম বেরিয়ে গেঞ্জি, জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে ততটা ঠাণ্ডা ওর ভেতরে ঢুকে জায়গা দখল করছে। মালার কাছে যাওয়ার ভয়। বুঝতে পারার কথা নয় বলেই প্যাসেঞ্জাররা বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল এরকম অটোতে হয়েই থাকে। তেল ফুরিয়ে যায়। ড্রাইভার পেছনের সিটের তলায় নবটা ঘুরিয়ে রিজার্ভ থেকে তেল নিয়ে নেয়। চন্দন জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মোছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয় যখন সে ফুটবল ম্যাচের সময় নিত।

—পাইলটের মনে হচ্ছে তবিয়তটা ঠিক নেই।

—না, না, ও কিছু না। জ্বর থেকে উঠেছি তো। একটা চক্কর লেগে গিয়েছিল। দেখি, দাদা, একটু নামুন তো। বাঁদিকের প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে চন্দন হ্যাঁচকা দিয়ে স্টার্ট দেয়। অটো চলতে শুরু করে। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ভাইরাল জ্বরের অবধারিত সংক্রমণ ও কার বাড়িতে কে কতদিন জ্বরে পড়েছিল এবং এই জ্বরের ওষুধ নেই, অ্যান্টিবায়োটিকও ফেল মেরে যাচ্ছে তৎসহ ডাক্তারবাবুদের পোয়াবারো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বেকারির মোড়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে চন্দন পান-বিড়ির দোকানে গিয়ে একটা ছোটো চারমিনার কেনে। ধরায়। কাশতে থাকে কিন্তু সিগারেটটা ফেলে দেয় না। তার আগে দুটো গাড়ি আছে। এখন ফেরার প্যাসেঞ্জার কম। আগে ও দুটো গেলে সে যাবে। সিগারেটটা আরও জোরে টানে। হু-হু করে কাগজ, তামাক পোড়ে। পেছনের সিটে পা তুলে বসে।

একদিন রাতে ঘরে ফিরে চন্দন শুনেছিল যে মলিনা মাসি এসেছিল।

—আমি না মলিনা মাসিকে বলেছি।

—কী?

—তোমার অসুখের কথা।

—সে কী? এই কথাটা তুমি বললে কী করে?

—মাসি আমার মায়ের মতোন। কী হয়েছে তাতে? মাসি কত ডাক্তারবদ্যি চেনে। তোমার ভালর জন্যেই বলেছি।

—কী বলল মাসি?

—বলল যে মেয়েদের যেমন গণ্ডগোল হয় তেমন মরদদেরও হয়। কালীঘাটে কী যেন বিশ্বাস না কি ডাক্তার আছে। এইসব হলে লোকে তার কাছে সারতে যায়। খুব ভিড় হয়। মাসি যাবে।

—কবে?

—মাসি বলল এখন খুব কাজের চাপ। লেক পাড়াতে একটা বুড়োকে তো মাসি বরাবর দেখে। তার নাকি এখন-তখন অবস্থা। দিনের আয়ার সঙ্গে ডিউটি পাল্টাপাল্টি করে এরই মধ্যে একদিন যাবে। তোমাকে ভাবতে বারণ করেছে। বলেছে এইসব ব্যামো নাকি চিন্তায় আরও বেড়ে যায়।

—সে না হয় হল কিন্তু হুট্ করে তুমি মাসিকে না বললেই বোধহয় ভাল করতে। কোথাকার কথা কোথায় গড়ায় কেউ বলতে পারে না। ছিল তোমার-আমার ভেতরের ব্যাপার।

কথাটা বললেও চন্দনের মনে একটা আপশোস খচ্ খচ্ করছিল। কথাটা সে নিজেই ওপর-পড়া হয়ে নন্দদাকে বলে ফেলেছে। নন্দদা অবশ্য বিশ্বাসী লোক। সেই কবে থেকে চেনা। নানা মনগড়া ভয়তে নিজে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে। নন্দদা নিশ্চয়ই কথা জনে জনে বলে বেড়াবে না। কিন্তু একদিন যদি মুখ ফসকে কথাটা কখনও বলে ফেলে তাহলে? তাই বা হবে কী করে? নেশা করলে লোকের মুখের আগল খুলে যায়। যা নয় তাই কবুল করে ফেলে। নন্দদা তো আর নেশা করে না। বিড়ি খায়। ওটাকে আবার নেশার মধ্যে ধরে নাকি? নেশা যে কী চন্দন জানে। টুর্নামেন্ট জেতার পর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিয়ার খাইয়েছিল। এক গেলাস খেয়েছিল চন্দন। গোড়ায় তেতো আর ঝাঁঝাল ঠেকলেও পরে, হাওয়া লাগাবার সময় বেশ ফুরফুরে লেগেছিল। চন্দনের মনে ছিল সেই প্রথম নেশার আমেজ। অনেক কিছুই ভোলা যায় না।

এরকম টানামানির দিনগুলোর মধ্যেই এক বিকেলে মালা মলিনা মাসির কাছে গিয়েছিল। অটোতে মালাকে বেকারির মোড়ে এগিয়ে দিয়েছিল চন্দন। ওখান থেকে বাস ধরে নেবে ভবানীপুরের। স্ট্যান্ডে অটোটা ভিড়িয়েছে কি ভেড়ায়নি, এগিয়ে এসেছিল নন্দ।

—ঘরে চল। কথা আছে।

নন্দর হাতে বাজার ব্যাগ। কান থেকে চুল বেরিয়েছে অনেক।

—কোনও খোঁজপত্তর আছে? ওষুধ পেয়েছ?

—আগে ঘরে চল তো।

-একটাও ট্রিপ মারিনি। এই তো সবে এলাম। মালা গেল ভবানীপুর।

চল। ট্রিপ পরে মারবে। কাজের কথা আছে। বড় জরুরি। দেরি সইবে না।

চন্দন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি যে সে কী শুনতে চলেছে। অটোয় নন্দদাকে চড়িয়ে চন্দন বাড়ি ফিরেছিল।

—জানি কথাটা শুনলে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে। কিন্তু কর্তব্য বলে একটা ব্যাপার আছে। তবে তোমাকে আগেভাগেই বলে নিচ্ছি, ভালখারাপ কিছু একটা করে বসলে আমার কিন্তু বড় অনুতাপ হবে।

—বল। কখনও দেখেছ তুমি আমাকে মাথা গরম করতে? শরীরেও দেয় না।

– কথাটা শুনলে কিন্তু মাথার ঠিক থাকা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা তোমার বউকে নিয়ে।

- অ্যাঁ?

- হ্যাঁ, তোমার বউ আর ভিকিকে নিয়ে।

–ভিকি?

- হ্যাঁ, ছেলেটাকে দেখে থেকে আমার বরাবরই কেমন কেমন ঠেকেছে।

- তুমি দেখেছ? বল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চন্দন কয়েক মিনিটের জন্যে নন্দকে ঘরে বসিয়ে রেখে অটো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে যে ব্যাটারির দোকান, সেখানে। সেখানে ওরা বলল ভিকি দিনতিনেক হল কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে তারা জানে না। ঘরে ফিরে এসেছিল চন্দন।

আর চন্দন যে সময়টা ঘরে ছিল না তখন নন্দ দেওয়ালে ঠেকানো আয়নাটা সরিয়ে বিস্কুটের টিনগুলো নামিয়ে নীচের টিনের ডালা খুলে একটা সস্তার, রঙ ওঠা-ওঠা চেন টানা ব্যাগ নিজের বাজারের থলি থেকে বের করে টিনে ঢুকিয়েছিল। তারপর টিনগুলো যেমন পরপর ছিল তেমন সাজিয়েছিল। আয়নাটা যেমন ছিল দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

ঘরে ফিরে চন্দন দেখেছিল নন্দ তিন চারটে বিড়ি খেয়েছে। আরেকটা ধরাচ্ছে।

—বলল মলিনা মাসির কয়েকটা কাপড় ফেরত দেবে আর আমারও ব্যাপারে একটা খোঁজ নেবে।

—তোমার ব্যাপারে? কী?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল চন্দন। মিথ্যে কথার জোগান সবসময় অত সহজে আসে না।

—ওই যে, তুমি বলেছিলে না যে তিন চাকা ছেড়ে চার চাকা ধরতে হবে। মলিনা মাসি তো অনেক লোককে দেখাশুনা করেছে। একজনের না, তোমার গিয়ে ওই মোটর ভেহিকেলস্-এ জানাশুনো খুব। সেই ব্যাপারেই

এরপর আর কথা খুঁজে পায়নি চন্দন।

—নন্দদা, তুমি একবার আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—ভবানীপুরে। মলিনা মাসিব বাড়ি।

মালা সেখানেও যায়নি। ফেরার রাস্তায় অটো থেকে নেমে গিয়েছিল নন্দ। বলেছিল পরদিন আবাব সকাল কবেই আসবে। থানা-পুলিসও কবতে হতে পারে। তবে সবই দেখেশুনে। বেচাল কিছু না হয়ে যায়। এসব সময় আসল হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। চন্দন ঘরে ফিরে এসে মলিনা মাসির দেওয়া সুটকেসটা খুলেছিল। ওর মধ্যে মালাব ভাল শাড়িগুলো রাখা থাকত। ছিল না। পুরনো, বাবাব বিয়ের সময়ে পাওয়া একটা মোটা চাদরের টিনের তোরঙ্গে থাকত মালার সামান্য কিছু গয়না। সেগুলো থাকত একটা টফির কৌটোয়। সেটাও ছিল না। গয়না আর ভাল শাড়িগুলো বাদে মালা আর কিছুই নেয়নি যাওয়ার সময়। কী কী নিতে হবে, না হবে সব ভিকি দেখে দেখে মালাকে বলে দিয়েছিল।

আগেব সন্ধেবেলাই ভিকি আব মালা দেখেছিল যে নন্দ তাদের দেখেছে। তখনই তারা ঠিক করে যে আর দেরি করা যায় না। কবেই বা লাভ কী? এর আগে অনেকবাবই যখন ভিকি এসেছে তখন পাড়ার লোকেরা দেখেছে। কিন্তু বাইবে? তাও নন্দর চোখে।

চন্দন সেই রাতে ঘুমোযনি। একটার পর একটা সিগারেট খেযেছিল আব ফুরিয়ে এলে হাসনুহানার গোড়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ভাত, মাছেব ঝোল, তবকারি ছিল। উপুড় কবে কুকুরকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই রাতে এমন আব কিছু ঘটেনি যা বলার মতো।

সেই রাতেও, অন্য সব বাতেব মতোই, চুপ কবে জেগে ছিল। অটো।

নন্দ বলেছিল। কাউকে বলবে না বললেও বলেছিল। না বলে পাবেনি। তবে হয়তো এমন হতে পাবে যে একেবারে প্রথম যাকে বলেছিল তাব সঙ্গে হযতো কড়াব করে নিযেছিল যে সে যেন আবার অন্য কাউকে না বলে বসে। সেও তখন ভালমানুষের মতো সায় দিযেছিল নন্দব সঙ্গে। এসব কথা কী বলা যায়, না বলতে আছে? কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কানে কথাটা তুলতে সে দেরি কবেনি। এরকম করেই কথা চালাচালি হয়, চালান হয়, কথার হাট বসে যায়। আর এই যে হাতবদল হযে যাওয়া কথা, এর গায়ে চড়তে থকে রঙ, চুমকি, সূক্ষ্ম মজাদার জরি আর রগড়ের প্রলাপ। একটা মানুষ পুরুষত্বহীন এবং সেই কারণেই তার ডবকাবউ মাথায় হেডব্যান্ড লাগানো লম্বা চুল এক হিরো হিরো নাগরের সঙ্গে কেটে পড়েছে এবং মানুষটি এর ফলে বেঘোবে পস্তাচ্ছে, নেশা করে ভুলে থাকতে চাইছে, আলফাল বকছে অথচ মরদ হলে যা করা উচিত বা করা যায় কিছুই তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না—এর চেয়ে জমাটি খবর আব কী হতে পারে? ঘরের লোক, বাইরের লোক সকলকে কথাটা জানানোর দরকার। অন্য কারণেও দরকার। দিনকাল যে বেহেড বেহাল হয়ে পড়ছে, কোনও কিছুই ঠিকঠাক নেই, ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকাটাই ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে—এইসব কারণেও তো চন্দনের কেসটা গোপন রাখা যায় না। সত্যি বলতে, এই অঞ্চলে ডাকাতের কেসটার পর এত বড় একটা ঘটনা কেউ আর মনে করতেই পারে না। আর সব খবরই জোলো, আর কোনও খবরে কোনও চার্জ নেই, ফালতু। আর তাছাড়া ডাকাতির ব্যাপারটার সঙ্গে এই কেসটাও লটকে রয়েছে কারণ পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলা ওই মানুষটিই সেদিন স্রেফ একটা পাতলা-দুবলা অটো দিয়ে ট্যাক্সিটাকে জব্বর রুখে না দিলে ডাকাতগুলো ধরা পড়ত না।

—শুনেছিস?

—কী গুরু?

—চন্দনের ব্যাপারটা।

—শুনলাম। একেবারে চুলবুলিয়া কেস।

—আমি হলে মাইরি দুটোকেই ফিনিশ করে দিতাম।

—আমিও তো তাই বলি। চোখের ওপর দিয়ে তোর বউটাকে ফুঁসলে নিয়ে গেল আর তুই

বসে বসে ছিঁড়লি? লড়ে যা, তা না বাঞ্চোৎ কুঁই কুঁই করছে।

—কী করবে, ধ্বজো তো। দেখছিস্ জন মন-গণ গাইলেও দাঁড়াবে না। বউ পালাবে না তো কী করবে! ঘেন্না ধরে গেল।

—তোকে কে বলল?

—কাল, বাসস্ট্যান্ডে রতন বলল। দেখি গুমটিতে ব্যাপারটা নিয়ে উদোম খিল্লি হচ্ছে।

—ভাবছি বলব মালটাকে।

—কাকে?

—চন্দনকে। বলব যা হয়েছে হয়েছে এবার মাথা ঠাণ্ডা করে থানা-উকিল কিছু একটা কর। আবার যদি বলে বসে যে আমারটা আমি বুঝে নেব, আমার কিছু বলার নেই।

—সে দিনকাল আর নেই। তুই শালা কাউকে ভাল বুদ্ধি দিতে গেলি, সে বাঞ্চোৎ বুঝল উল্টো। মধ্যে থেকে তুই গাণ্ডু বনে গেলি।

—সেই তো! মরুক শালা। আমার কী?

—ওকে এখন কে সাইজ করেছে জানিস তো।

—কে?

—মিউচুয়াল ম্যান। ওই এখন চন্দনের জিগরি দোস্ত। একটু সন্ধে বাড়লে আর চন্দনকে দেখবি না। ঠেকের মাঠে অটো ভিড়িয়ে মাল খাবে। তারপর মিউচুয়াল ম্যানের সঙ্গে রাত করে ফিরবে।

—কোনওদিন দেখবি সুমো টুমোর সঙ্গে অটো ভিড়িয়ে দেবে।

—ওর এখন মরে গেলেই ভাল। কী করবে বেঁচে?

রাতের রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। অটো। অটোতে চন্দন একা। এরকমই ছিল অবস্থাটা কিন্তু চন্দন ধরেই নেয় যে পেছনের সিটে মিউচুয়াল ম্যান বসে আছে তার হাড়জিরজিরে খাঁচার ওপরে কারও দেওয়া একটা পকেট ছেঁড়া বিশাল বেঢপ শার্ট পরে যার একটা খোলা লট্‌পটে আস্তিন আর অন্য হাতটা গোটানো। মিউচুয়াল ম্যানের হয়েই জবাবগুলো দিচ্ছিল।

—মালা না আমাকে এতটুকু টের পেতে দেয়নি। এতটুকুও না। বড় একটা পলিব্যাগে কাপড়গুলো নিয়েছে। বলল যে এগুলো মলিনা মাসি ওকে পরতে দিয়েছিল। সেগুলো নাকি ফেরত দিতে হবে। মলিনা মাসি একটা নতুন কাজ পেয়েছে। খুব ফিটফাট বাড়ি। রোজ সেখানে কাচা, পাটভাঙা কাপড়ে যেতে হয়। তাই অত কাপড় পাবে কোথায়? বলল, আর আমিও তেমন। বিশ্বাস করে গেলাম। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। আর পারবই বা কী করে? বল!

মিউচুয়াল ম্যান জবাব না দিলেও তার হাপরের মতো করে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দটা শোনা যায়। মিউচুয়াল ম্যান চুপ করে শুনছে। আর একজনও ঠাণ্ডা হতে হতে চুপটি করে শুনে যাচ্ছে চন্দনের কথা। অটো।

—আমি বরং বললাম যে এখানে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কখন বাস পাও কি না-পাও তার ঠিক নেই। চল, আমি তোমাকে আরামে নিয়ে যাই বেকাবির মোড় অব্দি। সেখানে তো মেলা বাস। একটু দাঁড়াবে কি দেখবে পর পর বাস আসছে। ভালভাবে চলে যেতে পারবে।

—বেকারির মোড়ে গিয়েও তোমার কিছু মনে হয়নি? মানে, কোনও অস্বস্তি, কোনও কিন্তু?

—তা আবার হয় নাকি? তুমি যদি আমার জায়গায় হতে না, তোমারও হতো না। এরকমই হয়। আগের থেকে কিছু বোঝা যায় না।

—তাই হয়। পিঠে চাকু বসে যাচ্ছে কিন্তু তুমি কোনও টের পাচ্ছ না। ঠিক এরকম হয়। অসাড়ে।

—আর জানই তো, এই যে অসুখটা আচমকা ধবে নিল, নিজেকে আর বুঝতে পারি না, মানাতে পারি না—সেটা নিয়েই তো চিন্তায় চিন্তায় ছিলাম। নন্দদা বলল এক হাকিমেব কাছে নিয়ে যাবে। গেল কই? তাবপর বিশ্বাস বলে সেই ডাক্তাব? সব বাজে কথা। কেউ ডাক্তার চেনে না, ডাক্তার থাকলেও চেনে না কিন্তু খালি মিথ্যে বলে। জানলেও নিয়ে যাবে না। আসলে কেউ চায় না যে আমি সেরে যাই। কেউ না। এরপরে আব কাবও কথায় বিশ্বাস কবা যায? বল?

—সেই জন্যেই তো আমি কাউকে বিশ্বাস কবি না।

—ঠেকে ঠেকে শিখেছ। আমিও শিখেছি। অথচ মা যদি থাকত আমাব এই দশা হতো না। কেন যে ওরকম ফুলে গেল, মরে গেল—কেন? না মবলে চলছিল না। পারতে তো বেঁচে থেকে ছেলেটাকে আগলে আগলে রাখতে। জান তো, ওব বাপ মরাব চোট আছে, ফুটবলের চোট আছে, হাঁকডাক শুনলে ঘাবড়ে যায়—এবকম ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে আছে?

—যে মরে গেছে তাকে এসব কথা বলে লাভ? তাব কানে কথাগুলো যাচ্ছে?

—কেন শুনতে পাবে না? মরে গেলে কী সব ফুবিয়ে যায নাকি? তখন তো মনের কথাই চাইলে বুঝে নিতে পারে। কী করছে কে জানে? হয়তো এদিকে মনই নেই। আমি তো মানি মা আছে। ঠাকুরও তো দেখতে পাই না। কিন্তু মানি। ঠাকুব নেই কেউ বলবে? ঠাকুব যদি থাকে তাহলে মাও আছে। কী?

—জানি না।

—জান। সব জান। বলবে না সেটা বল। সব জান তুমি।

—আমাকে দেখলে তাই মনে হয?

—হয তো! হয়। সব কথায় তুমি কটা আব কথা বল, চুপ কবে থাক। তোমার এই চুপ কবে থাকাটাব থেকেই আমি বুঝতে পারি যে তুমি অনেক জান। যে জানে সে চুপ কবে থাকে। আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না।

জবাবে মিউচুয়াল ম্যান কোনও উত্তব দেয না। চুপ করে থাকে। গাছেব কয়েকটা পাতা অটোব ওপবে পড়ে। তারই শব্দ হয়। হযতো এই শব্দগুলোবও কোনও মানে আছে। কিন্তু চন্দনের কাছে তাবা পৌঁছয়নি।

—রাস্তাঘাটে বুঝতে পারি লোকে আমাকে নিয়ে কথা বলছে। একটু দূরে থাকলেও বলছে কিন্তু কাছে গেলেই হয় চুপ মেরে যাচ্ছে বা কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমি ছাড়া এখন ওদের বলাব কোনও কথা নেই। এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন কখনও আমাকে দেখেনি।

—এইরকমই হয়।

—বলেই যাবে? একটা লোককে নিয়ে?

—প্রথম দিকটায় তাই হয়। পরে আর বলবে না। বলবে না শুধু তাই নয়, হিসেবেই আর ধরবে না।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমারও ঠিক এরকম হতো। আমাকে নিয়ে কথা বলত। আমার যে নামটা চালু হয়ে গেছে, সেটা বলে খেপাত। এখন আব কিচ্ছু হয় না।

—তোমার তার জন্যে ভয় হয়?

—ভয় হতে যাবে কেন? আমি ভয়ের বাইরে চলে গেছি। অনেকদিন।

—আমি যেতে পারব না? ভয়ের বাইরে। ভয়কে ড্রিবল করে ধোঁকা খাইয়ে দিতে পারব না?

—দেখা যাক।

কথাটা বড বেশি ছডায। এত ছডায যে সকালে একদিন শেষ বাতেব ঘুম ঝেডে তাকাকেই চোখে পডে দবজায দাঁডিযে অটোব দাদা।

—কি বে চন্দন। এত কিছু ঘটে গেল আব আমাকে একটা খবব অব্দি দিতে পাবলি না?

চন্দন টুল একটা এগিযে দেয।

—বসুন। ঘবদোবেব যা অবস্থা।

—না। বসাব টাইম নেই। আমি তো কাজে এত ব্যস্ত। এখনই দ্যাখ না, বাস্তায পার্টিব গাডি দাঁডিযে। তা আমি কিছুই জানি না। কালকে তোব বৌদি বলল। তাকে আবাব বলেছে আব কেউ।

—এমা, বৌদি কী বলল?

—কী আবাব বলবে। বলল ছেলেটাব এত বড বিপদ একটা ঘটে গেল, একবাব দেখে তো আসতে হয। বিযে তো কবেছিলিস। সইসাবুদ ছিল?

—না।

—কী বলব? ফাংশনটাংশনওতো হযনি। সাক্ষী আছে, সাক্ষী?

—ওই মেযেব এক পাতানো মাসি আছে। উনি সব জানে।

—ঝামেলা পাকিযেছিস ভালই। যাই হোক, একবাব সময কবে আসিস। কথা বলে দেখব কিছু কবা যায কিনা।

– যাব।

—যাস। আব একটা কথা। খবব পেলাম খুব নাকি নেশাভাং কবছিস।

চন্দন জবাব দেয না। মাথা নিচু কবে।

--নেশা কবে গাডি চালাবি। কিছু একটা ভালমন্দ হযে গেলে কিন্তু আমি ফেঁসে যাব। চলি। আসিস।

অটোব দাদা চলে যাওযাব পব চন্দন অনেকক্ষণ শুযে থাকল। বাতে এত মদ খেযেছিল যে কিছু খেতে পাবেনি। পেটেব মধ্যে ভাবি একটা ব্যথা হচ্ছে থেকে থেকে, মুখটা বিচ্ছিবি লাগছে আব শবীবে কেমন ঝিম ঝিম ভাব। মদ তখনও শিবায শিবায বাসি হযে থিতিযে বযেছে। মাথাব ভেতবে বযেছে একটা দম আটকে থাকা পাথব। যেদিকে বাখবে সেদিকেই নেমে যেতে চাইবে। নামতে নামতে ঘুমেব মধ্যে আবাব ভেসে উঠবে। আব সেখানে ছেঁডা ছেঁডা সব স্বপ্নেব তুলকালাম খেলা— ডাকাত ধবাব চিৎকাব, অন্য কোনও অটোতে বসে উডন্ত চুলে মালা আব অদৃশ্য একটা অবযব কিন্তু তাব হেডব্যান্ড দিযেই তাকে চেনা যায। একবাব এব মধ্যে আবাব দেখল পান্নাব বাজাবেব কাছে নতুন যে মেযেদেব বিউটি পার্লাব খুলেছে তাতে কাজ কবা চীনে মেযে দুটো অটোতে উঠেছে। ওব বাঁদিকে আব ডানদিকে। চন্দন বলছে পেছনে সিট খালি। সেখানে চলে যেতে। কিন্তু খালি কোথায? সেখানেও তিনজন প্যাসেঞ্জাব যাব মধ্যে একজন নন্দ। এবপবই দেখল মিউচুযাল ম্যান তাকে হাত নাডছে, আব অটোটা দূবে চলে যাচ্ছে। ঘাড ঘুবিযে মিউচুযাল ম্যানকে দেখাব চেষ্টা কবে চন্দন। পাবে না। তখন সাইড মিববে খোঁজে। সেখানে একটা গাডি দেখা যাচ্ছে। অথচ সামনে তাকালেও সেই গাডিটাকেই দেখা যাচ্ছে। যে গাডিটা সামনে বযেছে সেই গাডিটাই আবাব সাইড মিববে দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে এগিযে আসছে। ওভাবটেক কবাব চেষ্টা কবছে। কবে গেলও।

বেকাবিব মোডে বুডো নিখিল, তাবই রুটে অটো চালায, বেকাব নিজেব গাডিটা ঠেলে পেছোবার সময়ে চন্দনেব অটোব ধাক্কা লাগিযে দিল। চন্দনেব গাডিটা এক নম্বব। কাবণ নিখিল এখন যাবে না, চা খাবে।

—ফালতু ধাক্কাটা লাগালে। দেখে ঠেলবে তো। গাডিতে প্যাসেঞ্জাব একজন বসে।

—তা একটু ঠেকেচে তো কী হয়েছে। ওরকম হয়েই থাকে।

—থাকে? নিজে ঠেললে আর বলছ থাকে। যাই হোক, প্যাসেঞ্জার উঠলে তো যাব। গাড়িটা এগিয়ে নাও।

—আগে উঠতে দে তারপর সরবো।

—না, আগেই সরাও। ঝুটমুট মাথা গরম করে দিও না।

দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। অন্য অটোর দুজন ড্রাইভার এগিয়ে আসে। তারা কিন্তু নিখিলকে সাপোর্ট করে না।

—তুমি শালা শুড়ঢা, ওকে চাপতে গেছ কেন?

—বুড়ো হলে, হারামিপনা গেল না।

এবার নিখিল নিজেই গাডিটা ঠেলে সামনে এগোয়। এগোবার সময়ে বলে,

—এগোও বাবা। ধ্বজোব গাড়িতে কেন ঘেঁষতে গেলে গো। ধ্বজোব এখন মাথা গবম।

বলতে বলতে হেসে অন্য দুজনকে চোখ মারে। ওরাও হাসতে থাকে। তারপরই চন্দনের মুখেব দিকে তাকিয়ে ওবা চুপ করে যায়। নিখিল কিন্তু থামে না। কয়েক পা এগিয়ে চায়েব দোকানে বসে।

—ছোট করে একটা লেবু-চা দে তো। আবে, এই ধ্বজো, চা খাবি?

চন্দন জবাব দেয় না। চারজন প্যাসেঞ্জাব এসে গিয়েছিল। স্টার্ট করে অটো। নিখিল চেঁচিয়ে বলে,

—ধ্বজো! তোর লাক আচে মাইবি। ডাউনে প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলি। এই শালা ধ্বজো।

—এটা কিন্তু ঠিক করছ না নিখিলদা। কখন লোড হয়ে থাকবে। তখন ঝামেলা হ্যে যাবে।

—চাপ তো। আমি কি কিছু মনে করে বলেচি? ধ্বজোকে ধ্বজো বলব না তো কী বলব?

'ধ্বজো' ছাড়া অন্য নামও দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত 'সাড়ে ছটা'। কেউ বলত 'ব্যাটারি ডাউন'। যারা কিছু বলত না, তারা হাসত। এর সঙ্গে রটতে থাকছিল নানারকম বানানো কিস্‌সা। সবই নাকি কোনও না কোনও সময়ে চন্দন কাউকে বলেছে। রগরগে সব গল্প যার মধ্যে যৌন অপারগতা নানা চেহারা নিয়ে হাজির। এমন সব কথা যে শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না। মুখে আনতে হয়। চন্দন একদিন তাড়াতাড়ি ট্রিপ চুকিয়ে বাড়ি ফিরে কী দেখেছিল? হেডব্যান্ড আর মালা তখন কী পরেছিল? চন্দন অর্থাৎ ধ্বজো তখন কী করল? চন্দনের এরকম হল কেন? বিয়ের আগে চন্দন কোথায় যেত? চন্দনের মা-র স্বভাবচরিত্র কী ভাল ছিল? বলত তো আয়াব কাজ করে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাই করত কী? একেক গল্পের এক এক ধারা। ফুটবলের চোট থেকে চন্দনের কী ওরকম হতে পারে? চন্দন মালটাকে কোথা থেকে জুটিয়েছিল? ওদের কী ঠিক ঠিক বিয়ে হয়েছিল? এরপর রটতে থাকল ওই মেয়েটাকেই কতজন কী কী জায়গায় কোন কোন অবস্থায় দেখেছে? তারাই বা কী কারণে ওই সব আজেবাজে জায়গায় গিয়েছিল? ওই কারণে নয়, কেউ গিয়েছিল কাজে, কেউ গিয়েছিল ব্যবসায়, কেউ বা আত্মীয়বাড়ি আবার কেউ কেউ নিষিদ্ধ সেই জায়গায় গিয়েছিল বেপাড়ার বন্ধুদের নিছক সঙ্গ দিতে ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েটাকে ট্রেনে অনেকে দেখেছে। দমদম, আকরা ফটক, মুকুন্দপুর, তিন নম্বর গেট, শেয়ালদা, কালীঘাট, খিদিরপুর, জানবাজার, বেহালা—কোথায় মেয়েটাকে দেখা যায়নি? আর হেডব্যান্ড? হেডব্যান্ড বড়লোকের ছেলে। বাড়ি পালিয়ে সিনেমায় নামতে বম্বে চলে গিয়েছিল। হয়নি। ফিরে এদিক-ওদিক ফিকির করে শেষে পুরোদস্তুর দিওয়ানা। হেডব্যান্ড ছুকরি সাপ্লায়ারদের গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত। হেডব্যান্ড জেলে ছিল। হেডব্যান্ড নাকি আগে থেকেই মেয়েটাকে চিনত। ওই নাকি মেয়েটাকে টোপ বানিয়ে চন্দনকে গিলিয়েছিল। হেডব্যান্ড পুলিসের ইনফরমার। হেডব্যান্ডকে বাইক চালাতে দেখা গেছে।

হেডব্যান্ড হেরোইনের কারবার করে। কোনও কোনও টুর্নামেন্টে চন্দন নাকি টাকা খেয়ে গোল করেনি। চন্দনের খেলাটা হতো কিন্তু হল না ওর ট্যাবলেট খাওয়ার জন্যে। চন্দন কোরেক্স খায়। চন্দন কোকাকোলায় বড়ি গুলে খায়। চন্দন অনেকদিন ধরেই পাতাখোর। চন্দনের সঙ্গে অটোর দাদার বউয়ের নটঘট ছিল। কেস এমন গড়ায় যে অটোর দাদাই শেষে ধরে বেঁধে মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দেয়। এই করে সংসারটা রক্ষা পেয়ে গেল, কিন্তু অটোটা চন্দনের হয়ে গেল। না দিয়েও উপায় ছিল না। তা না হলে চন্দন অটোর দাদাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারত। অটোর দাদাও লোক সুবিধের না। অটোর দাদা নাকি অটো চন্দনের নামে লিখে দিয়েছিল। এই এত এত কথা ও কথার সুতো ধরে কথার ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যে কোথাও কিন্তু মিউচুয়াল ম্যানের সঙ্গে চন্দনের সম্পর্কের উল্লেখ ধরে কোনও কাহিনি গড়ে ওঠেনি। কারণ সব হিসেবের বাইরে যে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে, এতটা সাহস বা হিম্মত যার হয়, তার সম্বন্ধে লোক বলতে সবাই যাদের বোঝে, তাদের কোনও উৎসাহ থাকে না।

বাসের আড্ডার ওখানে সবাই চন্দনকে দেখলেই আওয়াজ দিত। অটোর লাইনেও দিত। একেবারে সামনে পড়ে গেলে হয়তো বলত না, কিন্তু কয়েক পা এগোলেই আওয়াজ উঠত। এ ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থাও নিয়েছিল তারা। বাসের গুমটিতে একটা জড়বুদ্ধি কিশোরও রোজ এসে জোটে। কেউ বিস্কুট-চা দেয়। কেউ কিছুই না। ওকেও চন্দনকে দেখে 'ধ্বজো' বলতে শিখিয়েছিল ওরা। আর ও শব্দটা উচ্চারণ করত, একটু জড়ানো জিভে হলেও, একেবারে চন্দনের সামনে এসে। বেপরোয়াভাবে কাছে এসে। ও বলত, আর অন্যরা মজা পেত, হাসত।

খেপানোর এই দলে নাম লেখায়নি এরফান। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, দুপুর বিকেলের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার সময়ে নেশায় চুরমার চন্দন খেতে এসেছে টলতে টলতে। ঠাণ্ডা কাঁটা কাঁটা কিছু ভাত পড়ে আছে ফেন গালার ঝুড়িতে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছুটা তরকারির তলানি। এরফানই ওকে বলেছে,

—এমন করে শরীরটা শেষ করে কোনও লাভ আছে?

—কী হবে রেখে?

—হবে। হবে। লাইফের খেল তুমি ভাবছ খতম। কিন্তু কখন যে কী হবে, কেউ জানে না। এভাবেই পড়ে পড়ে মার খেলে চলবে?

—কী করব তাহলে?

—দাঁড়াও। বলছি। তার আগে ভাবছি তোমাকে কী খেতে দেওয়া যায়। তুমি অল্প ভাত দিয়ে তরকারিটা খাও, আমি একটা ডিমের মামলেট বানিয়ে দিই।

—তুমি না এরফান খুব যত্নআত্তি কর। কেউ বলে না। শুধু খেপায়। ধ্বজো! ধ্বজো!

—ও কুকুর কুকুর ডাক ডাকবে। কানে না তুললেই হল। মা কালীকে ডাকো। আল্লা তো মানো না। যাকে মানো, তাকেই ডাকো। দেখবে চাকা ঘুরবে। এখন যেমন দাঁড়িয়ে গেছে দেখছ, তেমন থেমে থাকবে না।

—ঘুরবে? এরফান।

—ওর বাবা ঘুরবে। এই আমার কথাই ধর না। কত খরচ করে হোটেলটা দাঁড় করিয়েছিলাম। ওই শালা বুলডগবাজার দিয়ে সব গুঁড়িয়ে একেবারে ভুঁইতে মিশিয়ে দিল। কিচ্ছু রাখল না।

—জানি তো!

—তা পারল আমার আশমানতারা হোটেলকে মারতে? পারল? এখন এমন কৌশল করেছি যে, কিচ্ছুটি নকড়া করার জো নেই। ভ্যানে সব চড়িয়ে নিয়ে আসি। আবার নিয়ে যাই। কর, কী

কববে?

—হোটেল খুব ভাল চলছে।

—তোমাদেব দযায। থানার মেজবাবু সেদিন জিপ থামিযে বলে গেল, জবর ফন্দি কবেছিস এরফান, তোব হবে।

—তা তুমি কী বললে?

—বললাম, আপনাবা একটু ক্ষমাঘেন্না করলে গরিবের জীবনটা বেঁচে যায়। বলল, চালা, এরকমই চালা।

—বলল?

—বলল।

—ওবাও তো বোঝে। কেউ খেটে খেতে চাইছে।

—আব বলা তো যায় না, কালই হযতো এসে বলবে এবফান, নে। পাততাড়ি গোটা। এখানে আব হোটেল বসবে না।

—তখন কী করবে এরফান? যদি বলে?

—আরেক চুলোয় গিয়ে হোটেল ভিড়িয়ে দেব। আবে বাবা যারা কাজের লোক, তাদেব তো পেটে দুটো দিতে হবে। এ বাবা আল্লার নিয়ম। ওই নিয়ম যদ্দিন থাকবে এবফান বেঁচে থাকলে আশমানতারা হোটেলও থাকবে।

চন্দন উঠে কযেক পা এগিযে জগ থেকে জল ঢেলে হাত মুখ ধোয। টলছে। বুক পকেট থেকে ঘামে ভেজা টাকাগুলো এক টানে বেব কবে। কযেকটা নোট পডে যায়। এবফান কুডিযে তুলে দেয। একটা বাস ব্যাক কবছে। তার কন্ডাক্টব বাসেব বডিব পেছনে থাবডাতে থাবডাতে চেঁচায, 'ধ্বজো। এই অটো ধ্বজো!' চন্দন দাম মেটায। এবফানেব মুখের দিকে তাকায। এবফান হাসে,

—বললাম তোমাকে, কুকুর তো। ডাকুক গে। ডেকে ডেকে মুখ ব্যথা হয়ে মরুক। একেবাবে শুনবে না।

—এবফান, আশমানতাবা হোটেল যুগ যুগ জিও। চন্দন আব অটো যুগ যুগ জিও। বল।

—ভাল বলেছ। এখন কি ট্রিপ মারবে?

—একটু রেস্ট করে নিয়ে বেরোব। ট্রিপ না মারলে চলবে?

বিস্কুটের টিনের ওপরে বিস্কুটের টিন। তার ওপরে ধুলো পড়া আয়না, দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড করানো। আয়নায় লেগে আছে প্লাস্টিকেব দুটো টিপ। চিরুনি। তাতেও চুল জড়িয়ে আছে কয়েকটা। চন্দন এসে দিন থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পডেছে অকাতরে। প্লাস্টিকের ছোট্ট পাশ তোলা খাটের মধ্যে শুয়ে রয়েছে মাত্র অল্প কয়েকদিন ব্যবহার কবা সাবান। শুকিযে গেছে কিন্তু খুব কাছে নাক নিয়ে গেলে গন্ধটা না পেয়ে উপায় নেই। পাউডারের কৌটো। ওপরটায় এত ধুলো পড়েছে যে, বোঝার উপায় নেই যে রঙটা ওই জায়গায় আসলে সাদা। আলতার একটা শিশি। তার পাশে জড়ানো কালো চুলের ফিতে আব কাঁটা। একটা আধখোলা সস্তার লিপস্টিক শোয়ানো রয়েছে। দিনের আলো গুটিয়ে গুটিয়ে দরজা দিয়ে নীরবে বেরিয়ে যায়। বাইরে বিকেল ছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঝুপসি জমতে শুরু করেছে। ঝুপসি হল কম আলো কিন্তু ঠিক অন্ধকাব নয়। চন্দনের মুখটা একটু ফাঁক। ঘরের কোণে কুঁজো। পুরনো জল তাতে। পাতালের ঠাণ্ডায় সেজে চুপ করে আছে। এরকম কবে বেশ কয়েকটা মাস কেটে যেতে পারে। সন্ধে ছড়াতে শুরু কবলেও এই অবেলায় চন্দনকে ঘুম থেকে ডেকে দেওয়ার কেউ নেই। দিন বা মাসের হিসেব কেউ রাখেই না এই ঘরে। চন্দন ঘুমের মধ্যেই কিছু দেখে। এই অবেলায়। তার ঠোঁট, চোখের নীচের দিকটা একটু একটু কাঁপে।

সামান্য নড়ে ওঠে, আবার থেমে যায় তার হাতের আঙুল। চন্দনের মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কোণা থেকে। বাইরে চুপ করে জেগে আছে। অটো।

এরকমই একটা বিকেলে নন্দ এসে চন্দনকে ঘুম থেকে উঠিয়েছিল। নাড়া খেলে হতভম্বেরা যেমন সাড় ফিরে পায় তেমনই চন্দন ফিরে এসেছিল তার ঘরে। নন্দ দাঁড়িয়ে আছে। চন্দন উঠে বসেছিল।

—তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলে সেই মেয়েটার, মানে তোমার বউয়ের বাচ্চা হবে। নিজের চোখে দেখলাম। মাথায় ফিতে বাঁধা ছেলেটার সঙ্গে এসেছিল। মাতৃসদনে দেখাতে। দেখে তো মনে হল খুব আর দেরি নেই।

কয়লার মতো রাত থেকে,
দিনের সূর্যের আলোয়,
বেরিয়ে আসে অটো।
তাই কী তার মধ্যে আছে
কিছুটা কালো ও বাকিটা হলুদ?
এখানে কী পাওয়া গেল
বাঘের সঙ্গে একটা মিল?
ছোট হলেও গজরায়,
গুঁড়ি মেরে চলে,
হোক না তিনটে থাবা,
বাঘেরই সামিল।

আগের মতোই নন্দ চন্দনকে আসল খবরটা ছাড়াও আরও কিছু কিছু তথ্য দিয়েছিল।

—জানই তো পাড়া-বেপাড়ায় ঘোরাঘুরি তো আমার লেগে থাকেই। ওরা এখন গিয়ে উঠেছে তোমার ওই ছায়াঘর সিনেমার কাছে। চেন? চিনবে তো বটেই।

চন্দন মাথা নেড়ে বোঝায় যে সে চেনে।

—তা ওই ছায়াঘরের লাগোয়া যে পেট্রল পাম্পটা আছে, তার গায়ে গায়ে দেখবে তিন-চারটে গ্যারেজ। আর তার পাশেই একটা ব্যাটারির দোকান। বেশ বড়। ওখানেই ছোঁড়াটা কাজে লেগেছে এখন।

চন্দন শুনে যায়। জবাব দেয় না।

—আমি এগোই। বউবাজারে যাব। দ্যাখো না কী হ্যাপা। সে একজনকে বলেছিলাম পলা ধারণ করতে। ভাল হবে। সে এখন ধরে বসেছে। বলছে কী কিনতে কী কিনব, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাতে ঠকে মরতে হবে। তা কাকা, তুমিই যখন এতটা বললে তখন পাথরটাও তুমি কিনে দাও, আমি গাড়ি ভাড়া দেব। সেই সন্ধানে এখন যাব। পরের টাকা পকেটে। কখন কী হয়ে যায়। দিনকাল তো ভাল নয়।

চন্দন চুপ করে থাকে। নন্দ বিস্কুটের টিনগুলো দেখে। আয়না দেখে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেয়।

—তা কী ভাবতে বসলে।

—কিছু না।

—হ্যাঁ, সেই না কথা। ভেবে তুমি কী করবে? পাগলের খেলা চলেছে, বুঝলে। ঘোর কলি। আমিও কি বুঝি না? ভয় হয়, কেবল ভয় হয়। খালি মনে হয় তলা থেকে মাটি সরছে। তবে ওই

তারকব্রহ্ম নাম কবি। ভরসা দেওয়ার আর কিছু আছে। চলি গো। পরে কথা হবে।

—আচ্ছা।

নন্দ চলে যায়। চন্দন উঠে বাইরে এসে দাঁড়ায়। হাসনুহানা গাছের গোড়ায় তিন-চারটে কালো বোতল পড়ে আছে। লেবেল উঠে গেছে। গাছটা চারদিকে ছড়িয়ে ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই। দাঁড়িয়ে আছে। অটো। অটোর কাচে ধুলোর পরত। সেই দিকে এগিয়ে যায় চন্দন। দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। ধুলোর মধ্যে দিয়েই নিজের ছায়া দেখে চন্দন। পাশের বাড়ির উঠোনের বড় নিম গাছে সুর করে হলুদ পাখি ডাকছে।

চন্দন অটোর কাচের গায়ে ধুলো কেটে কেটে দাগ দেয়। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা—এই ক'টা মাস সে আন্দাজ করতে পারে। তবে ভুল বোধহয় থেকে গেল। তার আগে তো ডাকাত পড়েছিল। লম্বা একটা টানা দাগ দেয়। মালার যে বাচ্চাটা হবে সেটা তার। ভিকির নয়। নন্দ তো বলে গেল যে খুব বেশি দেরি নেই। অবশ্য নন্দ কী সব কথা ঠিক বলে? আর নন্দই সব জানতে পারে। জানতে পারে আর এসে বলে যায়। হঠাৎ ঘামতে শুরু করে চন্দন। খবরটা চন্দনকে দেওয়ার আগে নন্দ কাউকে বলেনি এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। অথচ নন্দকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক বলত যে, এসব কথা চন্দন আর তার মধ্যে একান্তই গোপন। বলবে, এ সব কথা কী বলা যায়? চন্দন হাত দিয়েই সবগুলো দাগ মুছে দেয়। হাত কালো হয়ে যায়। হাতটা দেখে চন্দন। এই হাতটা আর বাঁ হাত—দুটোই দেখেছিল নন্দ। তার জীবনটা যে তছনছ হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্টে, কিছুই বলতে পারেনি। তিন চাকা থেকে চার চাকাতেও ওঠার কোনও কারণ নেই। আর সেটা হলেই কি ভাল হতো? খুব আনন্দ পেত চন্দন? তখন কী করত, কীভাবে কার হাতে থাকত? অটো?

—এই হয়। দুর্দিনে পড়লেই লোকে সুদিনের কথা ভুলে যায়। কিন্তু বাচ্চাটা আমার। ডাকাত পড়ার আগে থেকে ধরে বাচ্চাটা আমার। আমার।

অটোর গায়ে নোংরা। পানের পিক ফেলেছিল কেউ। ইচ্ছে করেই। সেটা শুকিয়ে আছে। রাতে, মিউচুয়াল ম্যানকে নিয়ে ফেরার রাস্তায় ওভারটেক করে চলে গিয়েছিল বিশাল সি টি সি-র বাস। বাসের ড্রাইভার মাথা বের করে চেঁচিয়েছিল, .

—এই শালা মুড়ির টিন।

আর সেই সঙ্গে রাস্তার খোঁদলে বাসের পেছনের চাকা পড়ায় কাদাজল এসে ভরে দিয়েছিল অটো, মিউচুয়াল ম্যান, চন্দনকে। সেই জল শুকিয়ে আছে। চন্দন গিয়ে যদি দাঁড়ায় একবার। একেবারে কোনও মদটদ না খেয়ে। সোজাসুজি। ডাকাতের ট্যাক্সির সামনাসামনি চলে গিয়েছিল না হয় না বুঝেই। কিন্তু হিসেবের জোরে, অটোর কাচের ধুলো কেটে কেটে দেওয়া দাগগুলোর জোরে, চন্দন যদি গিয়ে হেডব্যান্ডকে বলে যে বাচ্চাটা তার ; তার, তার, তারই বাচ্চা হতে যাচ্ছে মালার, তাহলে ভিকি মানে ওই হেডব্যান্ড আর লম্বা চুল কী বলবে? বেইজ্জত হয়ে যেতে হবে না তাকে? একটা বাচ্চা পয়দা করা কি চালাকি নাকি? এটা-ওটা পড়িয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে যাওয়া আর দায়দায়িত্ব নিয়ে একটা বাচ্চা বানানো—দুটোর মধ্যে একটা বিরোধ দাঁড় করিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটিকে নাকচ করার চেষ্টায় ধন্দে পড়ে যেতে হয়। যাই হোক, বাচ্চাটা তার। আর অটোর দাদা যে বলেছিল, বসে, ভেবেচিন্তে কথা বলে দেখবে। সেটাও তো যাওয়া হয়নি। এত ঝামেলা যার মাথায়, সে যদি কেবল মদ খায় আর মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটাকে ড্যামেজ করে, তাহলে কী করে কী হবে? সিগারেটের ধোঁয়ায় পেট ভরবে? খিদে মরতে পারে বড়জোর কিন্তু সেই সঙ্গে তো দমটাও চলে যাবে। স্ট্রাইকারদের যদি দম মরে যায়, তখন কি তাদের খেলাটা বাঁচে?

চন্দন বালতির জলে হাত ধোয়। মুখ ধোয়। হাতের নোংরাগুলো ধুয়ে গিয়ে রেখাগুলো স্পষ্ট

হয়। এদেরই দেখেছিল নন্দ। বলে কিনা তোকে ছেড়ে দিতে হবে। চন্দন আড়চোখে দেখে নেয়। অটো।

আর স্ট্রাইকারে যে খেলবে সে কি শুধু অফ-সাইড লাইনের কাছেই এলোমেলো হেঁটে বেড়াবে কখন ওপর দিয়ে বল আসবে সেই আশায়? এটা কি বুদ্ধির কাজ। কত নাম করা করা স্ট্রাইকার তো এই ভুল করে খেলায় এলেবেলে হয়ে গেল। তাকেও কি নেমে গিয়ে ডিফেন্সকে সাহায্য করতে হবে না? বা একেবারে নেমে গিয়ে ওয়ান টু করে বল নিয়ে উঠে আসতে হবে না? ছেড়ে দেব?

অটোর দিকে তাকায় চন্দন। নোংরা, ভূত হয়ে বসে আছে। এই গাড়ি দেখলে প্যাসেঞ্জার চড়বে? চড়তে চাইবে? ভাল ভাল সব জামাকাপড় পরে লোকে কত জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে আবার দশটা লোক আসছে, কেউ চাইবে নোংরা গাড়িতে চড়ে কাপড়জামায় দাগ লাগাতে? এরকম হয় নাকি? ভিকিকেই আগে বলে দেওয়া যাক তবে। যা করেছ করেছ, এখনও টাইম দিচ্ছি, সরে যাও। কিন্তু সেই মালাকে নিয়েই আবার এই ঘরে ফিরে আসা? সেই চেনা পাড়া, সবাই জানে সব কিছু, এটাও অবশ্য জানে এরকম হতে পারে, হয়েই তো থাকে। কিন্তু মালা কি পারবে ফের এখানে এসে থাকতে? চন্দন তাকায় প্রশ্নটা মনে নিয়ে। চুপ করে থাকে। অটো।

আর নন্দদা! সে তো কথাটা নির্ঘাত আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে। হয়তো বলতে বলতেই এসেছে। এরপর কী হবে সেটাও তো জানে চন্দন। বুড়ো নিখিল, লোকটার অবশ্য মনে কোনও খারাপ নেই, বলবেই যে ধ্বজো এখন আর ধ্বজো নয়, সওতেলা বাপ? কয়েকদিন আগে চন্দন অটোর যে কাচটার গায়ে দাগ কেটে কেটে মাসের হিসেব করছিল সেখানেই না ধুলো আঁচড়ে কেউ লিখেছিল--'ধ্বজো'। এইরকম যেখানে বারবার সেখানেও বাচ্চার ব্যাপারটা শুনলে কি ওরা চুপ করে থাকবে? এরফান হয়তো কিছু বলবে না বা বলার জন্যে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে, মিউচুয়াল ম্যান তো কিছুই বলতে গেলে বলে না কিন্তু অন্যরা? তারা চুপ করে থাকবে কেন? চায়ের দোকান, মাঠের মালের ঠেক, বাসের গুমটি, পান-বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে ছাপিয়ে কথা উড়ে চলে যাবে পান্নার বাজার, চলে যাবে সেই গয়নার দোকান যেখানে ডাকাতি করতে এসেছিল ওরা। ওফ্ ওরকম করে কী মানুষকে মারতে আছে? কেউ থেমে থাকবে না। বাস থেকে কন্ডাক্টররা রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করবে। অটোর ড্রাইভাররা চেঁচাবে। তালে তালে হর্ন বাজাবে। 'ধ্বজো, ধ্বজো'। এবার নতুন আর কী কী বলতে শুরু করবে ওরা? সওতেলা বাপ তো বলবেই। আর কী বলবে? কে বলতে পারে। পারবে? অটো?

চন্দন বাইরে রাখা ড্রাম থেকে বালতি ডুবিয়ে জল তোলে। নিয়ে গিয়ে অটোর ওপরে ঢালে। অনেকদিন পরে অটোকে স্নান করায়। অটোর গা-টা রগড়াবে বলে ভেতরে কাপড় খোঁজে। লাল একটা জালি জালি কাপড় ছিল। সেটা খুঁজে পায় না। পেছনের সিটের পেছনের খোঁদলের ভেতরেও নেই। সেখানে ফাঁকা একটা টিন, তিনটে কালো বোতল, পান পরাগের ফাঁকা প্যাকেট। সিটের তলাতেও নেই। চন্দন ঘরে যায়। মা-র আমল থেকেই ছেঁড়া চাদর, কার্যত সব বিস্কুটের টিনের মধ্যে ভরা থাকত। আয়নাটা নামায় চন্দন। আয়নার পেছনে একটা মাকড়সা ছিল। লাফ মেরে দেওয়ালে চলে গেল। আয়নাটা খাটের ওপরে নামায়। ওপরে যে টিনটা ছিল তার ডালা খুলে ভেতরে হাত ঢোকায়। বেশিরভাগটাই ফাঁকা। ভাল থাকবে বলে সুতলি দিয়ে বাঁধা ঠোঙার মুড়ি বোধহয় মালাই রেখে থাকবে কখনও। ঠোঙাটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। ফেটে মুড়ি বেরিয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ইলাস্টিক ছেঁড়া একটা নিচের জামা। কয়েকটা ব্লাউজ। সেগুলোও ছেঁড়া। রঙ জ্বলে যাওয়া। খালি টিনটা পা দিয়ে ঠেলে দেয় চন্দন।

পরের টিনটার ডালা বড় শক্ত চেপে বসানো। চামচের গোড়া দিয়ে চাড় মেরে খুলতে হয়।

এটার মধ্যে মা-র রাখা পুরনো কাপড় থাকার কথা। পুরনো পুবনো গন্ধ। হাত ঢুকিয়ে চন্দন একটা কাপড় টেনে বের কবে। মা-ব একটা শাড়ি। বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। মধ্যে অনেকটা জায়গায় আড়াআড়ি ফেঁসে যাওয়া। আবার হাত ঢুকোয়। হাতে কিছু ভারি লাগে। বেব করতে যায়। লম্বালম্বি থাকায় বেরোয না। আড় করে বেব করতে হয়। সস্তার একটা রঙ ওঠা চেন টানা ব্যাগ। বেশ ভারি। ব্যাগটা চন্দন কখনও দেখেনি। বাজে সিন্থেটিক ছাঁট দিযে তৈরি। খাটে বসে চেনটা টেনে খুলেছিল চন্দন। একটা পিস্তল আর চারটে বুলেট ছিল। জিনিসটা লম্বাটে। এবড়ো-খেবড়ো নল। হাতলটা পালিশ না করা কাঠের। কানট্রি মেড। ওয়ান শটাব। ট্যাক্সির পেছনেব সিট থেকে ডাকাত দু'জনকে যখন নামানো হয় তখন নন্দ দেখেছিল ব্যাগটা পাযের কাছে পড়ে আছে। নন্দ ভেবেছিল ওব মধ্যে টাকা বা গয়না আছে। পরে খুলে দেখেছিল অন্য জিনিস।

ভবদুপুর। ছায়াঘর সিনেমার লাগোয়া পেট্রল পাম্পেব গাযেই দু-চাবটে দোকানেব মধ্যে ব্যাটারির দোকানের উল্টো ফুটে দাঁড় কবিযেছিল চন্দন। নিজে অটো থেকে নামেনি। অটোই হর্ন দিযে ডেকেছিল। তিনবার। দোকানেব লোকেবা তাকিযেছিল। হেডব্যান্ডও তাকিয়েছিল। তাকে হাত নেড়ে ডেকেছিল চন্দন। মোটের ওপব ফাঁকাই বাস্তা। কিন্তু একটা লবি গেল। তাবপব হেডব্যান্ড রাস্তা পেরিযেছিল। একবার ঝাঁকানি দিয়ে চুল ঠিকও কবেছিল। বেশি কথা হযনি। হেডব্যান্ডই প্রথমে বলেছিল,

—কী চাই এখানে?

—মালাব বাচ্চা হবে।

—তো?

—বাচ্চাটা আমার।

হেডব্যান্ড মুচকি হাসে,

—ধ্বজোর বাচ্চা হয?

—হয।

চন্দন উত্তর দিতে দিতেই অটোর হ্যান্ডেলে লাগানো পয়সা বাখাব ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বেব করেছিল। হেডব্যান্ডের বুকে গুলি করেছিল। গুলিটা খেযে দু-এক লহমা হেডব্যান্ড দাঁড়িযেছিল। তাবপব প্রায় অটো ছুঁযে মুখথুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

দোকানের লোকজন বেরিযে এসেছিল। কিন্তু চন্দনেব হাতে পিস্তল দেখে চুপ কবে যায। চন্দন পিস্তল ডানহাতে ধবেই বাঁহাতে হ্যাঁচকা মেরে অটো স্টার্ট করেছিল। উপুড হযে পড়ে থাকল হেডব্যান্ড।

কিছুক্ষণ পবেই থানায় ঢুকেছিল। অটো। চন্দন নেমে পিস্তলেব নলটা ধবে ঝুলিযে ঘবে ঢুকেছিল। এফ আই আর লেখাচ্ছিল কাবা। একজন অফিসার চন্দনেব হাতের দিকে খেয়াল না করেই বলেছিল,

—কী ব্যাপাব তোমাব?

চন্দন পিস্তলটা টেবিলে শুইয়ে রেখেছিল।

—মার্ডার করে দিয়েছি স্যাব। এই পিস্তল দিযে। আরও তিনটে গুলি আছে।

পকেট থেকে গুলিগুলো বের করে এক এক করে টেবিলে রেখেছিল।

এরপব, থানাব পেছনে, দেওয়াল ঘেঁষে, অনেকদিন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অটো।

মসোলিয়ম

এক

রাত এগারোটা। আকাশে রোঁয়া রোঁয়া মেঘ। বেহদ্দ ভ্যাপসা গরম। বাস বা অন্যান্য গাড়ি কম। এরকম ভয়-ভয় টাইমে হাতে সেলফোন নিয়ে একটা পাব্লিক দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে বোতাম টিপে টিপে বৌ-কে এস.এম এস. পাঠাচ্ছিলো। এতই মনোযোগ সহকারে যে তার পেছনে বেঁটে, মোটা, বগলে ব্রিফকেস লোকটা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সে খেয়ালই করেনি। নীরবে বোতাম টেপাটিপি চলছিলো কিন্তু হঠাৎ আনাড়ি হাতের তেরে কেটে তাক্ শুনে লোকটা পেছন ফিরে দেখল বেঁটে, কালো, মোটা লোকটা ব্যাঁকাত্যাড়া ব্রিফকেস বাজাচ্ছে। সেলফোন ঘাবড়ে গেল। বেঁটে লোকটা ফ্যাতাড়ু এবং ফ্যাতাড়ুদের সঙ্গে যারা ঘর করেছে বা করবে-করবে করছে তারা সকলেই জানে ওর নাম ডি. এস। ডি. এস. হাসলো।

—কিরকম বুঝচেন? সিন-সিনারি!

—অ্যাঁঃ

—এনি টাইম এসে পড়বে।

ডি. এস. আকাশের দিকে তাকালো। মেঘের রোঁয়ার মধ্যে আবছা মুন, তলায় জল থাকলে বলা যেত মুনমুন।

—কী?

—ভ্যামপায়ার!

ভাগ্যে এই সময় একটা আধ-ফাঁকা বাস এসে পড়লো আর সেলফোন তাতে লাফ মেরে উঠে গেল। ঘামছে। বাসের নম্বরটা অব্দি দেখেনি। এটা তার বাস নয়। দু স্টপ পরে সেলফোন নেমে গেল। ফের ফাঁকা। ফের সেই রাত। কই ফাঁকা? যাত্রা-পার্টির মতো ঘাড় পর্যন্ত চুল, রোগা, চোয়াড়ে, ঢ্যাঙা একটা লোক। নোংরা পাঞ্জাবি, তলায় প্যান্ট, হাতে পলিব্যাগে মিষ্টির বাক্স। চারহাত দূর থেকে বাংলা-র মন মাতানো সেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। ঢ্যাঙা পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুপাটি নকল দাঁত বের করে ঘপাঘপ পরে নিলো আর এটাও পাঠকরা বুঝে ফেলল যে ওর নাম মদন। সেলফোন আড়চোখে মদনকে মাপছিলো। কিন্তু সে ভাবেনি যে মদন বলবে,

—খুলবো?

বলে মদন পলিব্যাগে মিষ্টির বাক্সটা দেখালো। সেলফোন জানে যে বিস্কুট, মিষ্টি, চা এইসবে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানোটা আজকাল প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

—জানিনা, শুনিনা—হঠাৎ আপনার বাক্স থেকে আমি মিষ্টি খেতে যাব কেন?

বলেই লোকটা সেলফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

—বাক্সটায় মিষ্টি নেই।

—তবে কী আছে?

—ট্যারান্টুলা!

সকলেই জানে যে কিছুদিন আগেই মিডিয়া-মারফৎ ট্যারান্টুলাফোবিয়া সৃষ্টি করার একটি

চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছিল। এবং বাঙালিরা, নিজেরা পোকামাকড়ের সমগোত্রীয় হলেও, এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রভূত কীটনাশক খরিদ করে ফেলে এবং গৃহপালিত নিরীহ মাকড়সাদের যত্রতত্র হত্যা করিতে প্রাগ্রসর হয়। কীটপ্রেমী সংস্থা 'মাকড়বান্ধব'-এব প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে এই মাকড়সামেধ মোস্টলি ঘটেছে পায়খানাতে। বলা যায় না, মিডিয়া হয়তো কালই ছাপিবে ও দেখাইবে যে ভ্যামপায়ারের পাল হয়তো রাত্রে উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া আসিয়া বাঙালিদের ঘামাচি-আক্রান্ত গলদেশে বা গলকম্বলে বসিয়া রক্তপান করিতেছে এবং ভিক্টিম যাহাতে সহসা কাঁচাঘুম হইতে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিয়া আর্তনাদ না করে তাই রোমশ ডানার মনোমোহিনী হাওয়ার বশে তাহাকে অবশ রাখিতেছে। এ তো আমরা জানিই যে 'পাগলের হাতে সংসার, দেখ কি হয়'! তবে উড়ুক্কু ভ্যামপায়ারদের ফতে করা সহজ নয়। ইহাই ভরসা। অতএব সাধু নহে, খচ্চর সাবধান! সর্বশক্তিমান মিডিয়ার মাথায় কি কিছু ঢুকিল? 'মাকড়বান্ধব' জানাইতেছে যে মাকড়সার পপুলেশন বাড়িয়াছে। তাহারা ইহাও জানিয়েছে যে নানাবিধ পোকা ও পতঙ্গরা ইহা ভালোভাবে নেয় নাই। মিডিয়া কি ভ্যামাপায়ারদেরও বংশবৃদ্ধি ঘটাইয়া ছাড়িবে? কবে তারা আমাদের/তাহাদের দিবে ছাড়িয়া? মিডিয়া?

চোক্তারদের লিডার মার্শাল ভদির আদেশক্রমে বিশিষ্ট কবি পুরন্দর ভাট গত তিনমাস ধরে 'ভদি-অভিধান' রচনায় মশগুল। ভাটের থিওরি হচ্ছে যখন যে শব্দটি পাওয়া যাবে সেটি লিখে ফেলা—পরে সাজানো হবে। ভদি-পর্দন, ভদি-পাদ ইত্যাদি পেরিয়ে পুরন্দর ভদি-প্রশ্রয়, ভদি-প্রাক্কাল বা ভদি-প্রাদুর্ভাব বা ভদি-প্রাধান্যও ছাপিয়ে উঠেছিল, 'ফ', 'ব'-ও উৎরেছিল। এসেছে 'ভ'। বলাই বাহুল্য যে এর আগে চলে গেছে ভদি-ফক্কা বা ভদি-ফলার, ভদি-বশংবদ বা ভদিবশীভূত। ভদিবসন্তও যেমন এসেছিল তেমনই শীতের হাগতে আসায় গেছে চলে। এল ভদি + ভ। এবারে র‍্যান্ডাম—

যেমন ভদি-ভাব, ভদি-ভাবনা, ভদি-ভোট, ভদি-ভুবন, ভদি-ভাট, ভদি-ভবন, ভদি-ভাণ, ভদি-ভূষণ ইত্যাদি আগেই সে লিখে ফেলেছে। ভ্যামপায়ার ও ট্যারান্টুলার আবির্ভাবের আশঙ্কায় সেলফোন যখন নাস্তানাবুদ, তখনই, লণ্ঠনের ভুতুড়ে আলোয়, মাদুরের ওপরে লুঙ্গি পবে উপুড় হয়ে শুয়ে পুরন্দর লিখে ফেলল,

ভদি-ভয়

দুই

বোঝাই যাচ্ছে যে 'মসোলিয়ম' শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সিংহ ও সিংহীভাগ পাঠকই ঘাবড়ে গেছে বা হোঁচট খাচ্ছে। পুরোটাই সহজ ও সুপাচ্য হয়ে যাবে 'কাঙাল মালসাট' এবং 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য' একটু উল্টে নিলে। 'ফ্যাতাড়ু' নাটকটা দেখা থাকলেও চলবে। অবশ্য কোনোটা না করলেও চলবে। সেইভাবেই চলছে বা সাধারণত চলে। এই ভ্যানভ্যানানি অবশ্যই ট্র্যাজিক। কিন্তু তা কি ভদির ট্র্যাজেডির চেয়েও বেশি?

সেই বিয়োগান্ত পর্বে প্রবেশের পূর্বে, একটি অরণ্য পর্বে না ঢুকে যখন উপায় নেই তখন তাই হোক। কান না পাতলেও শোনা যাচ্ছে সেই রাক্ষুসে ঝিঁঝি পোকাদের ডাক যা একমাত্র

নর্থ বেঙ্গলের ফরেস্ট ও ঝোপঝাড়েই শোনা যায়। সেই সঙ্গে ছিল লাখখানেক জোনাকির যুগপৎ জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া। পেত্নিরা মুচকি হেসে উঠলেও ওরকমই লাগে। যাই হোক, ঝিঁঝি ও জোনাকির এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড যখন চলেছে চারদিকে তখন চাপড়ামারি ফরেস্টের মধ্যে একটি কাঠের ঘরে বসে কলকাতার গরচার কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী কারফর্মা ও ফরেস্ট রেঞ্জার মাল খেতে খেতে কাঠের চোরাচালানের একটি মনোরম ফন্দি আঁটছিল। রেঞ্জার, বয়স বেশি নয় কিন্তু সবিশেষ খচ্চর, পেচ্ছাপ করতে বাইরে গেল। ঝিঁঝিরা হঠাৎ চুপ। কেবল পেচ্ছাপের ছড় ছড় শব্দ। কারফর্মার ঝিম ধরেছিল। হঠাৎ একটু বুনো বাঘ-বাঘ গন্ধে সচকিত হয়ে কারফর্মা দেখল বাঘ নয়, তবে বাঘডাঁসা টাইপের একটা জাঁদরেল মাল রেঞ্জারের গেলাস থেকে রাম খাচ্ছে। ছাই-ছাই রঙ, চোখের কোলগুলো কালো, জাঁদরেল গোঁফ। কারফর্মা বলল,

—হ্যাট! হ্যাট! রেঞ্জার সাহেব! রেঞ্জার..!

বিশাল বেড়ালটি মালে ভেজা গোঁফ নিয়ে কারফর্মার দিকে তাকালো। দুটি চোখই জ্বলন্ত হলুদ।

—আসবে না। তুই হাজার চেঁচালেও রেঞ্জার আসবে না।

—আজ্ঞে, আপনি তো বেড়াল তা কি করে..

—একটা থাবড়া খেলেই বুঝবি আমি কি। তোদের ঐ কলকাতার ঘেয়ো মাল নই। মোতাগলিতে চোখে ক্যাঁতোর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বনবেড়াল। ছাদ থেকে রেঞ্জারটার ঘাড়ে পড়লাম, মুতের মধ্যেই ফেন্ট করে গেল। মালটা খেতে দিবি?

—সে আর বলতে, চাট নেবেন?

—কি চাট?

—খরগোশের পিস্, ঝাল করে ভাজা।

—দে, প্লেটটা এগিয়ে দে। খরগোশ তো প্রায় রোজই খাই। তবে কাঁচা। তোদের মতো ভাজাভুজি চলে না। তবে এখন চলবে। ঢাল্?

কারফর্মা সিকিমের রাম ঢালে। ভয়েতে হাত কাঁপে বলে বোতলের মুখ ও গেলাসে ঠুন ঠুন পেয়ালা বাজে।

—ভয়ের কিছু নেই। তুই ভদির চ্যালা মানে আমার আশ্রিত।

—আপনি ভদিদা-কে চেনেন?

—সব বানচোতকে চিনি। ভদির বাবা দাঁড়কাক আমার ওল্ড ফ্রেন্ড। যা বললাম, তুই আমার লোক। কেউ যদি তোকে বাগড়া মারে বলবি। একবার পিঠে একটু থাবা বুলিয়ে দেব, তিনমাস উপুড় হয়ে শুয়ে সারাতে হবে। নখের ধার দেখেছিস?

—উরিঃ শালা!

—এই জানবি। ক্ষুরের কাটা যেমন হয়, স্টিচ হবে না, ডিপ অ্যান্ড নিট।

—আচ্ছা ওই রেঞ্জার ব্যাটা মরেফরে যাবে না তো?

—ধুস্! ওর মরতে ঢের দেরি আছে। ছাড়, আমি চলে গেলেই ওর সেন্স্ এসে যাবে। এবার যা বলছি মন দিয়ে শোন্—পরশু তোর কাঠের ট্রাকটা রওনা দেবে, আমিও ওটাতে উঠে পড়বো। গুঁড়িগুলোর ফাঁকে দড়ি দিয়ে ঠ্যাং বাঁধা গোটা চারেক মোরগা ঢুকিয়ে দিবি। একটা একটা করে রাস্তায় খাব।

—সে না হয় রাখলাম কিন্তু কলকাতায় আপনাকে আমার বাড়িতে উঠতে হবে। আমার বউ গেস্টদের হেভি দেখভাল্ করে। আমি কিন্তু 'না' শুনব না।

—পাগলামি করিস না। কলকাতায় আমার অনেক কাজ, বুঝলি। ভদি একটা বড়ো হুজ্জুৎ লাগাবে। একা দাঁড়কাক কত দিক দেখবে? তবে কোনো এক ফাঁকে তোর বাড়িতে যাবো। কি খাওয়াবি বল?

—সে আপনার যা হুকুম হবে।

—রেওয়াজি খাসি, বুড়ো পাঁঠার বিচি ফ্রায়েড আর বয়্যাল চ্যালেঞ্জ।

—এ এমন একটা কথা হলো!

—ঠিক আছে, আমি দরজা দিয়ে ঢুকেছি এবার ওই জানলাটা দিয়ে বেরোব। দে, তোর ওই বালের ক্লাসিক সিগারেটই একটা খাই।

—আজ্ঞে, বালের কেন? পঁয়ষট্টি টাকা প্যাকেট!

—আমার চলে না। আমার ব্র্যান্ড হলো পাঁচমোহর। খুব কড়া মাল। কুলি ধাওড়ায় সব খায়। চলি!

মুখে ক্লাসিক সিগারেট নিয়ে বনবেড়াল লাফ মেরে জানলা দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। কারফর্মা ফের শুনতে পেল ঝিঁঝি পোকার ডাক। জানলায় গিয়ে বাইরে তাকালো। শুন্‌শান্‌। জোনাকি। রেঞ্জারের সেন্স্‌ ফেরার গোঁ গোঁ শব্দ। এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে 'জনৈক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর স্মৃতিকথা' শীর্ষক আত্মজীবনীতে কারফর্মা লিখবে, "কে কাকে চাপড়া মারিয়াছিল যে ফরেস্টটির নাম হইল 'চাপড়ামারি'? মানুষ না বাঘ, কে গরু মারিয়াছিল যে ফবেস্টের নামকরণ হইল 'গরুমারা'? আমিই বা কেন কাঠের ব্যবসায় নামিলাম? কেনই বা বউ থাকিতে রাঁড়ও পুষিলাম? জীবন কাটিয়া গেল। এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না।"

তিন

সকলেই জানে বা জানা উচিত যে চোক্তার ফ্যাতাড়ু বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি, কুস্তিগির বড়িলাল, পুলিশের আই. বি. ডিপার্টমেন্টের গোলাপ মল্লিক প্রমুখের নানাবিধ বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা সম্বন্ধে কে না অবহিত? যাই হোক, মোদ্দা মালটা হলো মার্শাল ভদি বা ছোটো করে ভদি সরকার একটি ব্যবসার ধান্দা করেছিল। এবং সেইমতো বন্ধু ও শিষ্য এবং ভদির বাড়ির প্রায় সংলগ্ন কে. জি. সরখেলের (অবসরপ্রাপ্ত করণিক, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) উঠোনে বিকট একটি গর্তও খোঁড়া হয়। উদ্দেশ্য ভূগর্ভস্থ তেল বের করে রাতারাতি লাল হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে 'কাঙাল মালসাট' পড়তে হবেই। না পড়লেও চোবলে চোবলে। যাই হোক, তেল পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল মরচে পড়া কয়েকটা সোর্ড এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের একটি ছোটো কামান যার ডাকনাম 'নুনুকামান'। সেই গর্তে জল জমলো। মশার ফ্যাক্টরি চালু হলো। মশা ধরার জন্যে কোলা ব্যাঙদের ডাইভ! গর্ত বোজাইও করা হলো।

এরপর ভদি ঠিক করেছিল তার একতলা বিদ্‌ঘুটে বাড়িটিতে নার্সিং হোম খুলবে। নাম হবে 'মৃত্যুদূত নার্সিং হোম'। ভদি চেয়েছিল এমন একটি নার্সিং হোম বানাতে সেখানে যে রোগীই ভর্তি হবে বেঁচে বেরোবে না। ভদির বউ বেচামনি হবে হেড নার্স। মুখে বালিশ চেপে ধরবে। ম্যানেজার হবে ভদির চাকর নলেন যার কাজ হবে খাটিয়া-ফাটিয়া রেডি রাখা এবং কীর্তনের

ব্যবস্থা করা। গুদোমঘর ঘেঁটেঘুঁটে ভদি একটি সুপ্রাচীন ও বিকল বক্স ক্যামেরাও বের করেছিল যা সারিয়ে মড়ার ফটো তোলা হবে। দুজন ডাক্তারও জোগাড় করেছিল যাদের হাতে কোনো রোগী বাঁচে না। সবই হতে পারত কিন্তু হলো না। হতাশায় ভরা এই দুঃসময়ের এক সন্ধ্যায় ভদির বারান্দায় সকলে হাজির। ভদি, সরখেল ও মেজর বল্লভ বক্সি ফোর্ট উইলিয়ামের ক্যান্টিনের ঘোড়াখেকো রাম ও ফ্যাতাড়ুসমেত অন্যান্যরা বাংলা খেতে খেতে গালগল্প করছিল। মদন বলল,

—আচ্ছা ভদিদা, তোমার ওই ঘরগুলো দেখি তালাবন্ধই পড়ে থাকে। আগে তো তুক্-তাক্, ঝাঁড়ফুঁকের জন্যে ভাড়া দিতে। ভালো পয়সা আসত। এখন আর দাও না?

—সে উপায় আচে! হুঁ হুঁ বাবা এর নাম সি পি. এম.। যার পোঁদে লাগবে তাকে ছ্যাঁচাপোড়া করে মারবে। সারাক্ষণ লোক লাগিয়ে রেখেচে। কেউ হয়তো অন্যের বউ ফুঁসলোবে বলে তান্ত্রিক ধবে এনেচে। ঘর ভাড়া নেবে। মোড়ের মাথায় ধরে এমন সব উল্টোপাল্টা গাওনা দেবে, বগড়া দেওয়াব ভয় দেকাবে, মাল আর আসে? পুলিশে ধরবে, হাজতে নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে ক্যালাবে—এসব থ্রেট শুনে ওরাও ভাবলো যে কাজ নেই বাবা। কোতায় শান্তি করে এটা-ওটা করবো, তা না, যতো উটকো হ্যাপা। শুকিয়ে মারবে। সি পি এম বলে কতা। কি বলো, ক্যাপ্টেন!

মেজর বক্সিকে ভদি ক্যাপ্টেনই বলে। সে গোঁফ নাচিয়ে বলল,

—আমাব আর্মি বেশন থাকিতে কে আপনাকে ড্রাই করিয়ে মারিবে। রামেব সাপ্লাই থামিবে না।

—সে তো জানি। ক্যাপ্টেন থাকতে বাবা পুরন্দর. পুরন্দব ভাট ঝটপট ভাঁড় উল্টে বাংলাব তলানিটা ফিনিশ করে উঠে দাঁড়ালো।

—প্রভু!

—পভু, পভু করিস না তো। বেশ তো ভদিদা বলতিস।

—আজ্ঞে, তাই তো বলি।

—নতুন কিছু লিখলি? বেশ চনমনে। শুনলে মন ভালো হয়ে যায়?

পুরন্দর চুপ। ডি. এস. বলে ওঠে,

—ভদিদা, পুরন্দর এখন ইংরিজিতে কবিতা লিখচে!

—বলিস কি রে, এবারে কি সাযেবদের গুয়ে বসিয়ে ছাড়বি?

—না ভদিদা, ইংরিজি-ফিংরিজি নয়। একটা কবিতার টাইটেলটা শুধু ইংরিজি।

—তা হোক না। বোঝা গেলেই হলো। বল্।

—তার আগে যদি দুটো কথা বলি!

—বল্, দুটো কেন, চারটে বল্!

—আজ্ঞে, বাংলা কবিতায় যারা আজ অব্দি নাম-ডাক কিনেছে সকলে একটা করে সিরিজ লিখেচে।

সরখেল বলে ওঠে,

—যেমন 'বালেশ্বর সিরিজ'। হেভি।

—হ্যাঁ, তারপর ওর দেখাদেখি অনেক সিরিজ লেখা হয়েছে। 'মহাবালেশ্বর সিরিজ', 'বালটিকুরি সিরিজ', 'একবালপুর সিরিজ'। তা আমি যেটা লিখছি, মানে, একটাই লেখা হয়েছে যদিও, সেটা হলো 'বাল সিরিজ'।

—বাঃ বাঃ বেড়ে নাম, বল্ এবার পদ্যটা।

—কবিতার নাম 'সেক্স অন স্যান্ড'!

মেজর বম্বভ বক্সির অবদমিত হুঙ্কার—'চার্জ! চার্জ!' এই কবিতা-সন্ধ্যায়, যাকে বলে, মানে প্রায়ই লেখা হয়, 'নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে'।

—তপ্ত বালির ওপর
দাঁড়িয়ে ছিল তপ্ত বালিকা
এগিয়ে এল তপ্ত বালক
উঁচিয়ে নালিকা

দিকচক্রবাল
দিকচক্র ঢেকে দিল নৌকোর পাল
বাকি রইল বাল

ভদির 'পারি না'! 'পারি না'! রব, ঘোমটা টেনে বেচামনির হাসি, গামছা পরা নলেনের নিজের উরুদেশে চাপড়, মেজর বক্সির 'ব্রাভো! ব্রাভো' করতালি, নানা কণ্ঠে শেষ লাইনটির মুহর্মুহু পুনরুচ্চারণ অচিরেই বিষাদাচ্ছন্ন সেই পরিবেশকে 'ছাঁইয়া ছাঁইয়া'-র মতোই আনন্দযজ্ঞে পরিণত করিল। এই আনন্দধ্বনি আরও বহুক্ষণ শোনা যাইত যদি না ভদি বলিয়া উঠিত,

—এই রে! বাবা এসে পড়েচে। থামা। খচে যাবে। থামা!

সমূহ নীরবতা। অন্ধকার, ধোঁয়াটে আকাশ থেকে দাঁড়কাক এসে ভদির উঠোনে ল্যান্ড করলো। পা তুলে ঠোঁট চুলকোলো। ডানা ঝাড়ল, তারপর বলল,

—খুব তো বটকেরা চলচে! নলেন, দুটো বাটিতে রাম ঢাল্। জল দিবি না। তুই যা হারামি হয়েচিস।

নলেন আদেশ পালনে তৎপর হয়।

—দুটো বাটি কেন বাবা? আর কেউ আসবেন?

—চোপ্! এসে পড়েচে আর উনি কিনা...'

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ল সেই বনবেড়াল। জায়েন্ট সাইজ দেখে সকলেই কাঁচুমাচু, কারফর্মা ছুটে গেল,

—প্রভু! প্রভু!

বনবেড়ালের সামনের ডান থাবাতে কারফর্মা মাথা ঠোকে, বনবেড়াল বাঁ থাবা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে কারফর্মাকে আশীর্বাদ করে। কারফর্মা-র দেখাদেখি অন্যদের মধ্যে প্রণাম করবার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বনবেড়ালের মুখে সেই হাসি যার বর্ণনা লুইস ক্যারলের মতো কোনো মনসবদারই দিতে পারেনি। অনেকেই গড়াগড়ি খায়। ধুলো তুলে চাটে। মাথায়, বুকে মাখে। দাঁড়কাকের চোখদুটো, ছানির ওপরেও, ছলছলিয়ে ওঠে। ভদি প্রণাম করে। বেচামনি, নলেন।

দুটি টুল এনে রাখা হয় বারান্দায়। একটিতে দাঁড়কাক ও অন্যটিতে বনবেড়াল বসে রাম খেতে খেতে গুজুর গুজুর করে। টুলদুটির পাশেই মাটিতে ভদি ও বেচামনি। অন্যরা হাত তিনেক দূরে। বলতে গেলে দাঁড়কাক বাদে সকলকেই মশা কামড়াচ্ছে। কেঁদো একটা মশা বনবেড়ালের নাকে বসার ধান্দা করছিল। বনবেড়াল তাপে কপ্ করে খেয়ে নিল। মশা খাবার পরে চুক করে একটু নিট রাম মেরে দিল। দিয়ে দাঁড়কাককে বলল,

—নে, এবার ধর্।

দাঁড়কাক বিশাল ডানাদুটিকে দুপাশে ছড়ায়। ভদির উঠোনে ঐশ্বরিক এক নীরবতা। নর্দমার পাশের টগর গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত একটি টগরফুল মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে যায় যেন এই সঙ্কেতই দিতে যে নিউটনের নিয়ম এই পরিবেশে অচল।

—আজকের মুখড়াটা ভেন্ন জাতের। কারণ 'সিচুযেশন ইন ক্যালকাটা ইজ ভেবি গ্রেভ'। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কলকাতায় বেশ কয়েকটা হাইড্রোসিল বুড়ো ছিল। তারা বলতো ওই ইংরিজিতে আমি যা বললাম। ওরা নাকি বার্লিন রেডিওতে শুনেচে। কথাটা তখন অতটা না খাটলেও আজ সত্যি হতে চলেচে। কিন্তু তোরা এমনই বোকাচোদা যে কোনো হুঁশই নেই, কেবল হারামিপনা, কেবল ঢ্যামনাগিরি। সব ভেদ বমি হযে মরবি নয়তো কালাজ্বরে। আমি চললাম। মর্‌গে যা! খাট ধরেও কেউ বসাব থাকবে না—বলে দিলাম।

সামনে একটি কলরব শুরু হয তৎসহ ফুঁপিয়ে ও ডুকবে ক্রন্দন। ভদিব মুখেই শুধু স্মিত একটি স্মাইল। বেচামনির খোমাটা কেমন দেখাচ্ছিল তা গাপ্ হয়ে রইল কারণ বিশাল ঘোমটায় সবই ঢাকা। এই কান্নাকাটিব ফাঁকেই ডি. এস বড়িলালকে হাত বাড়িয়ে চাঁটি মেরেছে। বড়িলাল মাথা ঘুবিয়ে কাউকে দেখতে না পেযে হাতের কাছে ছিল নলেন, তার গামছা খুলে নিয়েছে। গোলাপ এবং বল্লভ বক্সি ন্যাংটো নলেনকে দেখে খ্যাঁকখেঁকিয়ে হাসছে—এসবও হচ্ছিল। দাঁড়কাক বনবেড়ালকে বলল,

—বানচোতগুলোকে ঘাবড়ে দিযেচি। এবাব তুই টেক্ ওভার কর।

বনবেড়াল ল্যাজ ফুলিয়ে গর্জে উঠল,

—ঘ্যাঁও! থামবি? নাকি আমাকে টুল থেকে নামতে হবে? নামব? অনতিবিলম্বেই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বনবেডাল গলা ঝাড়ে, ফাঁকায় হাত বুলিযে একটা জ্বলন্ত সিগারেট বাগিয়ে একচোখ বন্ধ করে টানে, টুস্‌কি দিয়ে ছাই ঝাড়ে,

—চোক্তার প্লাস ফ্যাতাড়ু, তা বাদ দিয়ে যারা আচিস, তোদের সকলেরই আজ মহাবিপদ। ভদির হাল খুব বিলা। গভরমেন্ট, পুলিশ, ক্যাডার— সব এককাট্টা —চোক্তারের হেড যদি ভোগে চলে যায় তাহলে ওরা জানে বাকিগুলোও পাব পাবে না— আজ নয় কাল, সবকটাকে এরা ভিত্তর্ করে দেবে। ঘাপ্‌লাটা এমনই ডেঞ্জারাস যে দাঁড়কাক আমাকে এমারজেন্সি মেসেজ পাঠালো। তা আমার হোল স্ট্রেট কাট কথা। চাপড়ামাবি থেকে তোদের এই বালের শহরে আমি গাঁড় মারাতে আসিনি। এসেচি যখন তখন বনবেড়ালেব খেলা দেখিয়ে দিয়ে যাব। যা, অভয় দিলাম ভদিকে হয়তো পস্তাতে হবে, দু একটা বাল নিয়ে টানাপোড়েনও চলতে পাবে, তবে ঐ তক্, ছেঁড়া যাবে না। নলেন, বাটি ভরে দে। আর হ্যাঁ, পুরন্দরের 'বাল সিরিজ' এর ফার্স্ট কবিতাটা শুনে বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) হেভি খুশি। ভাট, চালিয়ে যা। এবাব দাঁড়কাক প্ল্যানটা বলবে। তবে সব কথা পেটে রাখতে হবে। বউ বা রাঁড়, কারো কাছে মুখ খোলা নেই। খুললেই...ঘ্যাঁও, গর্...র্-র্... বল্লভ, স্রেফ গুলি করে দিবি... আমার অর্ডার।

আতঙ্কিত আশ্বাস ধ্বনিত হয়—না, না, কেউ মুখ খুলব না! এই কুলুপ দিলাম! এবং সকলেই সভয়ে মেজর বল্লভ বক্সির দিকে তাকায়। তার গোঁফগুলো সরু হয়ে দুদিকে উঠে গেছে। দাঁড়কাক বলল,

—গতরাতে, সেন্ট জনস্ চার্চের টঙে আমি, বেগম জনসন আর বনবেড়াল মিটিং-এ বসেছিলাম। বসব বললেই কি বসা যায়? তলায় হেভি বাওয়াল! চারনক আর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, মানে ওদের স্পিরিট, মাল পায়নি, রেকটিফায়েড স্পিরিট খেয়ে মাগি ধরতে বেরিয়েছিল, ক্যাঁও ম্যাঁও, সে হেভি কিচায়েন। তিনটে নাগাদ শালারা কবরে ঢুকে গেল, ঠাণ্ডা

হাওয়া ছাড়লো, তখন প্ল্যানটা ছকা হলো। এখন, ভদি, শোন্, তোকে একটা ম্যাগাজিন বের করতে হবে, নামটাও ঠিক হয়ে গেচে, বেগম জনসনই ঠিক করে দিল—'উইকলি ভ্যামপায়ার'!

ভদি ঘাবড়ে গেল।

—অ্যাঁঃ ইংরিজিতে কাগজ। যদিও সরখেল আচে, তবুও...

—না রে বাবা, তোর এলেম আমরা জানি, বাংলায়...

ভদির মুখে হাসি ফুটল।

—হপ্তায় হপ্তায় ভ্যামপায়ার উড়বে। একেবারে ক্যান্টার করে দেব। সরখেল, কি বুজচ?

সরখেল চিন্তাশীল মানুষ এবং বর্তমানে 'ডাইনোসরদের তন্ত্রসাধনা' নামক একটি গবেষণা-গ্রন্থ রচনায় মগ্ন,

—কাগজটার টাইপটা কি হবে? 'উনিশ-কুড়ি' ধাঁচের?

দাঁড়কাক খচে গেল,

—তোকে তো লেখাপড়া জানা বলে জানতুম। এমন একটা কথা বললি যে কেটলি গরম হয়ে যায়। ওসব নতুন রোঁয়ার চুলবুলুনি কেস নয়। 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এ থাকবে ফর্টি পারসেন্ট ভূতুড়ে খবর আর সিক্সটি পারসেন্ট অদ্ভুৎ খবর —যার কোনোটাই কোনো শালা ছাপে না। একটা পৃষ্ঠা —একদিকে খবর, ও হ্যাঁ, পুরন্দরের বাল সিরিজের একটা কবিতাও থাকবে। উল্টো পিঠে বিজ্ঞাপন ঠাসা।

—কিন্তু বাবা, বাজারে এত কাগজ, আমরা পারব?

—পারা না পারা আমাদের হাতে নয়। এবার সব শুনে বুঝে নেমে যা। আমরা তো আচি?

এর অনতিবিলম্বেই সভা ভঙ্গ হয়। আকাশে ধোঁয়াই বেশি, মেঘ কম, ঘোলাটে অল্প আলোর আভায় বোঝা যায় ওরই পেছনে কোয়ার্টার প্লেট চাঁদ রয়েছে। তারই মধ্যে উড়তে উড়তে ফ্যাতাড়ুরা মিশে গেল। ভদির উঠোন ফাঁকা। ঝুলমাখা ডুমটি নেভানো। ফাঁকার মধ্যে যে টগরফুলটা এতক্ষণ স্ট্যাচু হয়েছিল সেটা এবার নিচে পড়ে গেল। এই ঘটনা প্রমাণ করল যে ফের নিউটনের নিয়ম চালু হল। কিন্তু সত্যিই হল কি?

চার

...

মদন, ডি. এস. ও পুরন্দর উড়তে উড়তে তলায় লোডশেডিং দেখে গাঁজা পার্কে ল্যান্ড করল। ওই পাড়াটায় বস্তিতে যারা পয়দা হয় তারা বড়ো হতে না হতে মোটর গ্যারেজে ঢুকে পড়ে। কলকাতায় রোজ গাড়িতে গাড়িতে রগড়ারগড়ি হয় যে কারণে বেশির ভাগ গাড়িই তোবড়ানো। তাই ওই তল্লাটে দিনরাত ধাঁই ধাঁই শব্দ করে বডির কাজ চলে। কিন্তু কিছু বাচ্চা হয় যাদের মায়ের পেটেই ভগবান মেরে রেখেছে—মালটা হয়তো বাঁচলো কিন্তু হয় ঠ্যাং নয় হাত, কোনো একটা পলকা, ব্যাঁকা ও সরু, নয়তো মুণ্ডুটা বেদম থ্যাবড়া। এরা গাঁজা পার্কে উটকো খদ্দেরদের ফ্যাগ খাটে। দোকান বন্ধ তো ব্ল্যাকে মাল আনবে, বাংলা, বিলিতি যার যা পছন্দ আর তার সঙ্গে চর্বির বড়ার চাট। এরা চলে যাবার পরে, এগারোটা বেজে গেলে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা মগারা আসে—বড়ো বড়ো চুল, ঢ্যামনার মতো গলার আওয়াজ ও হাঁটার স্টাইলে পোঁদ দোলানো ও ভাঁজ মারা, অনেকটা ক্যাটওয়াকে মডেলিয়াদের মতো। তা সে যার যা ধান্দা করুক্‌গে

যাক— একটা সরু লিকলিকে পা লাঠিতে জড়ানো, অন্য পা-টা ভালো, একটা ছেলেকে দিয়ে মদন এক বোতল বাংলা আর ছোলার চাট আনালো।

—ভদিদা কাগজ বের করবে, আমাদেব বেচতে হবে, বুজলে? গায়ে হাওয়া দিয়ে বেডাবে আর অ্যাঁড় চুলকোবে—ও আব চলবে না।

কথাটা ডি. এস -কে বলা। মদনের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আচে। নিজে যেন চুলকোও না। আমি কিন্তু ভাবচি, পুরন্দরেব ছপ্পড়টা কেমন খুলে গেল দেখলে? ছাপ্পা মাল—দুনিযা পডবে— 'বাকি রইল বাল'। হেভি।

পুবন্দর বলল,

—আচ্ছা মদনদা, দণ্ডবায়সবাবা যে বলল চার্নক আর ওয়াটসন মাগি ধরতে বেরিয়েছিল— শালারা তো কবে সেঁটে গেচে— এখনও এত হিট্?

—আরে বাবা ননস্টপ গরু প্যাঁদালে ওরকম হবেই। সঙ্গে ব্র্যান্ডি। এ কি বাঁড়া বাঙালি? বাতাসা দিযে জল খেল তারপর আধমরা শিঙিব ঝোল দিয়ে ভাত!

ডি এস. ছোলা চিবোতে চিবোতে বলল,

—কেন যে শালা সায়েব হয়ে জন্মালাম না তাই ভাবি।

তিনজন ফ্যাতাড়ুই চমকে উঠল কারণ হাত ছয়েক দূরে বিরাট ভুঁড়িওয়ালা যে দশাসই লোকটা নোংরা টেবিকটনের ঘিয়ে-ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর হাঁটু অব্দি ধুতি পরে মোটা ব্যাগ মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে বলে উঠল,

—সব সায়েবই হিটিয়াল হয না। কিছু জানবে না, পডবে না, বাতেলা মারবে।

তিনজনেই ঘাবড়ে থ। মালটা উঠে বসেছে। বুকপকেট থেকে দাঁতভাঙা পকেট চিরুনি বেব করে আঁচড়াতে লাগল। মুখে হাসি।

—কি গো, তিন ফ্যাতাড়ুই দেখছি চুপ। খুব তো লপচপানি হচ্ছিল।

—আপনি কি করে জানলেন আমরা ফ্যাতাড়ু?

—কি করে? তোদের নানা কাণ্ড-কারখানা নিয়ে যে গপ্পের বইটা, যদিও কাটতি নেই, সেটা পড়া ছিল। দেখলুম তোরা উডেউডে এলি। মাল, ছোলা আনালি। মিলিয়ে নিলাম। হিম্মত থাকে তো বল্ তোরা ফ্যাতাড়ু না!

—সে না হয় ঠিকই বলেচেন কিন্তু কি করে জানলেন যে সব সায়েব হিটিয়াল নয়?

—জানতে হয়। এ তো আব পুরন্দরের মতো পোযেটের কম্ম নয় যে পুড়ুক করে দুটো লাইন মিলিয়ে ছেড়ে দিলাম, দিয়েই গামছা মাথায় দৌড়। আমরা হলুম নভেলিস্ট, বুঝলি, এক একটা নভেলের জন্যে ফ্যাক্ট যোগাড করতেই হয়তো দশটা খাতা ভরে গেল।

—আজ্ঞে আপনি কে?

—বলচি। এই বইটা দ্যাখ। আঁচ পাবি।

ব্যাগ থেকে একটা রঙীন মলাট দেওয়া বই বেরোল। ওপরে হাফ-ন্যাংটো মেমের ছবি। নাম 'মেমবাতির আলো'। তলায় লেখকের নাম— বজরা ঘোষ। পুরন্দর বলল,

—নামেই ভুল। হবে 'মোমবাতির আলো'।

—না, ভুল নয়, এই জন্যেই তুই ঝাঁটের পুরন্দর ভাট আর আমি সাহিত্য-সম্রাট বজরা ঘোষ। মেম যদি ন্যাংটো হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে তখন একটা আভা বেরোয়। বইটা পড়্। পড়লে বুঝবি লন্ডনে কেন হেকিমি মেডিসিনের এত কদর।

—তা আপনাকে সাহিত্য-সম্রাট উপাধিটা কারা দিল?

—নালিকুল পাঠক-সমাজ। আরও অনেক উপাধি পেয়েছি। একদিন দেখাব। বাড়ি যাস রোববার করে, দেখাব। না দেখলে বিশ্বাস যাবি কি করে? তোরা যা সেয়ানা!

ডি. এস. এতক্ষণ কোনো ট্যা ফুঁ করেনি। এবারে রা কাড়ল,

—আমার আবার অত আপনিফাপনি চলে না। তা বজরাদা, এখন কি নামাচ্ছ, মানে নভেল?

—এখন?

গালভরা হাসি নিয়ে বজরা ব্যাগটা থেকে বিরাট একটা লাল খেরোর খাতা বের করলো। গাবদা।

—এটা হল পার্ট ওয়ান। তিন ভলুম দাঁড়াবে। বেশিও হতে পারে। এটা বেরোলে আর দেখতে হবে না। অথচ ভেরি সিম্পল প্লট। নামও রেডি।

—কি নাম?

—বলব? তোরা যেন আবার দশ কান করিস না, কেউ হয়তো ঝেড়ে দিল।

—না, না, বজরাদা এ শুধু নিজেদের মধ্যে।

—নাম হল 'খানদানি খানকি'। কেমন নামটা?

—চাম্পি! বাকি দুটো কবে নামাবে?

—নামবে, ভাই নামবে। আচ্ছা, এবার চলি ভাই। বউ চিন্তা করবে।

—যাবে? কিন্তু বইটা?

—ও থাক। দিয়ে দিলাম। তোরা পড। যত ছড়াবে ততই মঙ্গল।

'খানদানি খানকি'টা বেরোলে নামী-দামি পুরস্কার একটা মেরে দেব। বউকে প্রমিস করেছি। চলি।'

এই শেষ কথাগুলো বলার সময় বজরা ঘোষের চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। ফ্যাতাড়ুবা বুঝতে পারেনি। অনেক আলোর মধ্যে চোখে জল এলে ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু। মার্কারি, নিয়ন, বাল্‌ব—সব আলোর ঝাড়, আলোর তারার ফুলঝুরি হয়ে যায়। গলে যেয়ে টলমল করে।

'মসোলিয়ম'-এর এই অধ্যায়টিও অন্তিমে ঝাপসা থেকে গেল।

পাঁচ

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এর প্রথম সংখ্যাটিতে (দাম ১ টাকা) তথ্যাদি ছিল, সম্পাদক : মার্শাল ভদি। প্রধান উপদেষ্টা : দণ্ডবায়স ও অরণ্য-মার্জার। সহ-সম্পাদক : কে. জি. সরখেল। প্রো: বেচামনি সরকার।

ঘ্যাঁও!

প্রথম সংখ্যাতে যা যা ছিল তা এইরকম, ফ্রন্ট পেজে,

বাসনের ঝনঝনানি : ভূত না চোর?

গত সপ্তাহের শুক্রবার রাত্রে খিদিরপুরের প্রখ্যাত মিত্তির বাড়িতে ছাদের রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে বাসন পড়িতে থাকে এবং ছাদে ধুপধাপ শব্দ হয়। বাড়ির লোকজন ভয়ে ঘরের দরজা আঁটিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে। পরদিন প্রত্যুষে দেখা যায় রান্নাঘর শিকল

তোলা ও তালাবন্ধ। ছাদে প্রচুর বিষ্ঠা। এলাকায় এই ঘটনা লইয়া ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং বিতর্ক শুরু হয়, ভূত না চোর, কে এই ঘটনার জন্য দায়ী? কে ভয় দেখাইল এবং হাগিয়া পলায়ন করিল? স্থানীয় সেকুলার ব্রিগেড ক্লাব ঘোষণা করিয়াছে তাহারা একটি বিতর্কসভা বসাইবে · ভূত আছে কি নাই?

বাদুড়ের রহস্যজনক মৃত্যু

ঝড় নাই, বাজও পড়ে নাই, টালিগঞ্জেব গলফ্ ক্লাবের নিকটস্থ গলিপথে বিশাল একটি বাদুড়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদটি দপ্তরে আনিয়াছেন রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি। তাঁর মতে বাদুড়টি ভ্যামপায়ার জাতেব। মেজর বক্সি তড়িঘড়ি নিজস্ব ক্যামেরা আনিয়া বাদুডটির ফটোও তুলিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফটোটি ওঠে নাই। আমরা বাদুড়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা কবি।

পেত্নির কুপ্রস্তাব

উত্তব কলিকাতাব প্রসিদ্ধ আগ্নেযাস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীগজেন্দ্রনাথ পোড়েল স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেন যে গত এক মাস ধরিয়া একটি পেত্নী তাঁহাকে নানাবিধ কুপ্রস্তাব দিতেছে। থানা এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি না হওয়ায শ্রী পোড়েল ভদি-ভবনে যোগাযোগ কবেন। আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীনলেন সরেজমিন তদন্ত কবিয়া জানাইয়াছেন যে তিন বৎসর পূর্বে শ্রী পোড়েলের গৃহে এক পরিচারিকার বহস্যময় মৃত্যু ঘটিযাছিল। সে যদি এখন পেত্নি হইয়া শ্রী পোড়েলকে কুপ্রস্তাব দেয়, আমরা কি করতে পারি? উপরন্তু শ্রী পোডেলের স্বভাব-চবিত্র লইযা নানা কথা আমাদের কানে আসিযাছে। আমাদেব বক্তব্য, উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পেত্নি কুপ্রস্তাব দিয়াছে।

বাল সিরিজ-১/সেক্স অন স্যান্ড/শ্রী পুরন্দর ভাট

রহস্যময় জলজন্তু

বিরাটির একটি বাড়ির ভাঙা সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে মহা আলোড়ন শুনিয়া চারদিকে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে। এমনও গুজব রটিয়াছিল যে ঘড়িয়াল ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পরে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা পুরাপুরি ভাঙিয়া ফেলিয়া মেথররা যে জলজন্তুটিকে ধরে সেটি একটি অতিকায় মাগুর। সন্দেহ হয় যে কেহ তামাশা করিয়া একটি হাইব্রিড মাগুর সেপটিক ট্যাঙ্কটিতে ছাড়িয়াছিল। নিয়মিত গু খাইয়া ও গুয়ের জলে জীবনধারণ করিয়া মাগুরটি অতিকায় হইয়া উঠে। খবরে প্রকাশ যে মৎস্য দপ্তর ঘটনাটি শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া সেপটিক ট্যাঙ্কে মাগুর চাষ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মৎস্যপ্রাণ বাঙালি গুখেকো মাগুরের কেমন কদর করিবে সে সম্বন্ধে এখনই কোনো টিপ্পনি দেওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কাজ হইবে।

রাতের রণক্ষেত্র : ছুঁচা বনাম বেড়াল

কালীঘাটে হালদার পাড়ায় একটি ভাঙা পাঁচিলেব পার্শ্ববর্তী রাস্তায় প্রতি রাতেই ছুঁচা বনাম বিড়ালের যুদ্ধ লাগিয়া যায়। ওই রাস্তার নিকটেই ময়লা ফেলার জায়গা আছে। তথায় বিড়ালেরা জড়ো হয় এবং ভাঙা পাঁচিলের তলা হইতে ছুঁচার পাল তাহাদিগকে ধাওয়া দেয়। বিড়ালের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে ছুঁচার দল ময়লা ফেলাব জায়গাটি দখল করে। অনেক বিড়াল থাকিলে তাহারা ছুঁচাদের তাড়া করিয়া গর্তে ফিরিতে বাধ্য করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে এই যুদ্ধ প্রায় তৃতীয় প্রহর অবধি চলে। আরও জানা গিয়াছে যে কুকুররা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এইসব ও আরও কিছু খবর বাদেও ছিল সংক্ষিপ্ত একটি সম্পাদকীয় যার শিরোনাম

'কেন এই পত্রিকা'

—'আজিকার সংবাদপত্রগুলি যে সব খবর ছাপে তাহা পড়িয়া পাঠকেব কোনো লাভই হয় না। উপরন্তু ছাগলামি বাড়ে। তাই, প্রকৃত, সরেস সংবাদ সারবান পাঠককে পৌঁছাইবাব নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সমাজের যাঁহারা মাথা তাঁহারা আমাদের লক্ষ্য নয়। মাথা বাদ দিয়াও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের লক্ষ্য তারাই।'

উল্টো পিঠে মার্শাল ভদি ও তাব সাঙ্গোপাঙ্গোদের নানাবিধ অ্যাড।

মার্শাল ভদি রচিত ঐতিহাসিক নাটক

সিকন্দর কা ভগন্দর

(স্ত্রী চরিত্র বর্জিত)

পুরুরাজ : মহামান্য সিকন্দর,
এত সিংহাসন কেন, আপনার কি ডেকরেটরের ব্যবসা?

সিকন্দর : হাঃ হাঃ যে সব রাজাকে কেলিয়ে দিয়েচি এগুলো তাদের সিংহাসন। কিন্তু ভগন্দরের জ্বালায় একটিতেও বসিতে পারি না। হাঃ হাঃ হাঃ।'

ভদি বুক হাউস
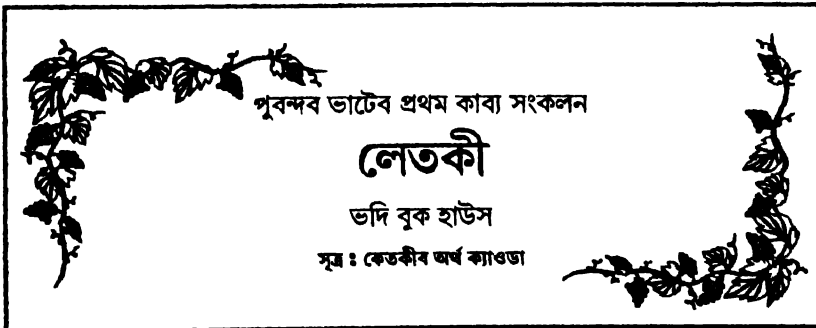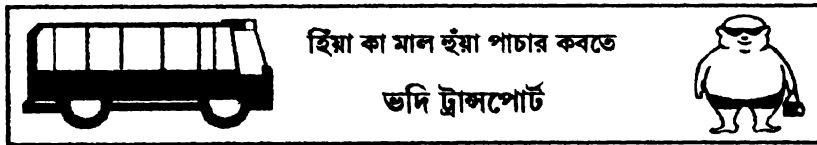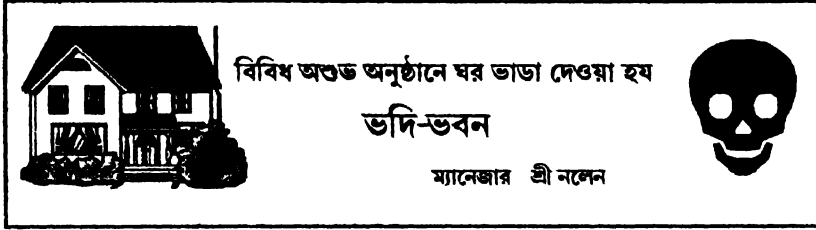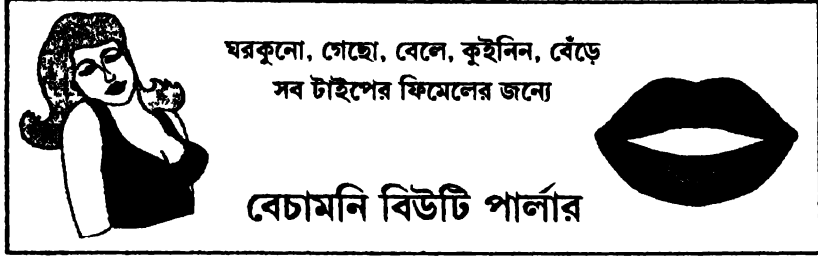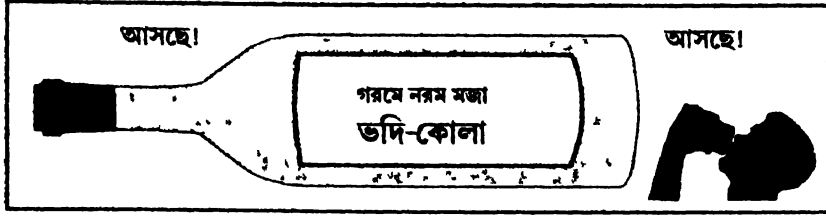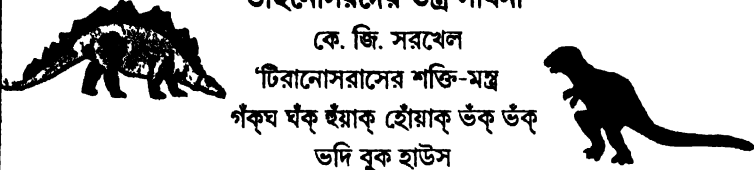
স্বল্প খরচে, বাড়ি গিয়া
কাকাতুয়া, ময়না, টিয়াকে খিস্তি শেখাই

— কে. জি. সরখেল

ঘরকুনো, গেছো, বেলে, কুইনিন, বেঁড়ে
সব টাইপের ফিমেলের জন্যে

বেচামনি বিউটি পার্লার

বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয

ভদি-ভবন

ম্যানেজার শ্রী নলেন

হিঁয়া কা মাল হুঁয়া পাচার কবতে

ভদি ট্রান্সপোর্ট

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' ১০০০ কপি ছাপা হয়। কিন্তু তিন দিনের চেষ্টায় মাত্র ৩ কপি বিক্রি হয়। ভদির শিষ্যরাই এরপর গোছা করে নিয়ে গিয়ে বিনে পয়সায় বিলি করে। কলকাতার পাঠকদের ফতে করা যে সে কাজ নয়।

একটি কপি গোলাপ মল্লিক থেকে দুঁদে গোয়েন্দা তারকনাথ সাধুর কাছে যায়।

—বেড়ে হয়েচে পেপারটা। ভদি মালটার দেখচি এলেম আচে। এতগুলো ব্যবসা খুলেচে। চালাতে পারবে তো! রোজের মনে হচ্চে মুড ভালো নেই।

—মুড হেভি ডাউন। রোজ ইজ ঝরিফাইং। পেপারটা আর টানা যাবে বলে মনে হয় না।

—তা তুমি আর মন খারাপ করে কি করবে? আজকাল কি আর ভালো জিনিসের কদর আচে? মাগিবাড়ির গপ্পো ছাড়ো—দেখবে পিলপিল করে কিনতে ছুটবে। তবে তোমার ভদিদাকে বলবে মন খারাপ না করতে। আলামোহন দাশ—এত বড়ো একটা লোক—তারই দাশ ব্যাংক—সেও ফেল হয়ে গেল। তারপর, তারপর ধরো গে সোভিয়েট রাশিয়া—ফেল। এই ফেল-পাশের খেলাটা বুজলে—হাইলি মিস্টিরিয়াস। প্রায় ভূতুড়েই বলতে পার! ভাবচি এই নিয়ে একটা বই-ই লিকে ফেলব।

বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিত্যি স্ট্র্যাটেজিক মিটিং করতে কমরেড আচার্য জেরবার হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নজরে কেউ আনেনি যে 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' বেরিয়েই উঠে গেছে। একটি কপি পেলে তিনি অন্তত 'হাতে নাতে দুমদাম' সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারি করতে বলতেন। বিস্ময় প্রকাশ করে হয়তো বলতেন যে ঘরে ঘরে কমপিউটারের এই যুগে ভূত, তারপর গিয়ে মরা বাদুড়, ছুঁচো-বেড়ালের নৈশ ধাওয়া, পেত্নির মুচকিতে লুক্কায়িত ইশারা—এসব নিয়ে পত্রিকা? তাও আবার কলকাতা থেকে? হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' নিয়ে হাসাহাসি বা গট্‌রা হতো, হয়তো কেবলই স্ন্যাকস্ ও কফি ব্রেকের সময়টুকু ধরেই একটু আয়েস! কিছুই হয়নি। কিন্তু ভদির পাড়ার লোকাল কমিটির বেলায় ওকথা খাটে না। তারা সব সময়েই ধান্দায় ছিল ভদিকে নাস্তানাবুদ করার। তবে কমরেড আচার্য যে মার্শাল

ভদি সম্বন্ধে কিছু জানতেন না তা নয়। পুরনো যুদ্ধের ব্যাপারটা অন্তত ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কমরেড আচার্য-র মস্তিষ্ক মানে বলা যায় অসংখ্য দেরাজ-সম্বলিত একটি ক্যাবিনেট যার একটি দেরাজ মার্শাল ভদির জন্য বরাদ্দ ছিল। এটাও ঠিক যে দেবাজটা অনেকদিন খোলা হয়নি। হাতে 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' এলে হয়তো হতো। ভদির পাড়ার লোকাল কমিটির হাতেও পত্রিকাটি আসেনি। কারণ রাসবিহারী মোড, তারাতলা, পাঁচমাথার মোড়, তিলজলা, আক্‌রা ফটক – যেখানে যেখানে পত্রিকাটি বেচার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলেছিল সেখানে তাঁদের কেউ ছিলেন না। থাকলেও পাত্তা দেননি। না দিয়ে মনে হয় ভালোই হয়েছে। হলে বেকার জল ঘোলা হতো আর সেই তাফালে হয়তো 'মসোলিয়ম' লেখাই হতো না। প্রসঙ্গত মনে রাখার দরকার যে অধিকাংশ ভালো লেখাই শেষ পর্যন্ত আব লেখা হয় না, কখনোই।

ফেমাস সমালোচক পিশাচদমন পাল অর্থাৎ পি. ডি. পালের ছোটোবেলার ডাকনাম ছিল 'পেদো'। 'হেগো' ও 'মুতো' বলে তাঁব আরও দুই ভাই ছিল কিন্তু তারা দাদার মতো ফেমাস হতে পারেনি। পিশাচদমন তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখতেন না। কোনো সেলিব্রেটির পক্ষেই রাখা সম্ভব নয়। তা হযেছে কি, আজই সকালে 'হেগো' আর 'মুতো' এসেছিল। 'মুতো'-র মেয়ের বিয়ে। পাযরাডাঙায়। মনে মনে পিশাচদমন বলছিলেন 'রিডিকিউলাস'! এবং থেকে থেকে সুইডেনে বানানো 'অ্যবসলুট ভদকা' উইথ লাইম কর্ডিয়াল সিপ করছিলেন। বর্ধমান, বিশ্বভারতী, যাদবপুর–তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামনে তিন-তিনটে সেমিনার। পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচ টু পলিটিক্স অ্যান্ড রিলিজিযন ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে, এর জন্যে কত বইঘাঁটার দরকার, ইন্টারনেট সার্চ করতে হবে, আর তার মধ্যে পায়রাডাঙায় 'মুতো'-র মেয়ের বিয়ে! 'বিডিকিউলাস' বলে পিশাচদমন চোখ বুজলেন, বুজেই থাকতেন মশগুল হয়ে যদি না আলতো একটা চড় তাঁর গালে এসে পডত। চমকে চোখ খুলেই পিশাচদমন দেখলেন তাঁর সামনের টেবিলে একটি বিশাল বেডাল তাঁরই গেলাস থেকে ভদকা খাচ্ছে এবং পাশে বসে সেই দাঁড়কাক, মুখে চুরুট, যে তাঁকে একদা খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছিল। বেড়াল বলল,

–কিছুই করিনি। আলতো একটা থাবড়া দিয়েচি, তাও নখ না বের করে। মালটা তো ভালোই। কোত্থেকে বাগালি?

–বাগাইনি। এক ছাত্রী..

–থাক্ আর ক্যাঁও ক্যাঁও করতে হবে না। আমরা সবই জানি। যেমন তুই তেমন তোর ছাত্রী। লো সেকেন্ড ক্লাস। তাকে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকাবার জন্যে কলকাঠি নাড়িসনি?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, নেড়েছি।

দাঁড়কাক শুরু করে,

–তোকে কি বলে গাল দিয়েছিলুম মনে আছে?

–হ্যাঁ, বোকাচোদা।

–গুড্ গুড্, যাই হোক এখন আমরা তোকে খিস্তি মারতে বা ক্যালাতে আসিনি। দুটো কাজের কথা আচে। বলেই চলে যাব। উল্টোপাল্টা হলে কিন্তু বিচিফিচি...

–আমি তো কোনো কথাই বলছি না!

–গুড্, এক নম্বর হলো শিগ্‌গিরি একটা কেলো হবে। মেলা গ্যাঞ্জাম। তাতে তুই মার্শাল ভদিকে সাপোর্ট করে কাগজে চিঠি দিবি।

–দুটো কাজের কথা বললেন, পরেরটা।

–বিয়ের দিন 'মুতো'-র বাড়িতে বডি ফেলে দিবি বেলাবেলি। ভালো একটা গয়না দিবি।

'রিডিকিউলাস'। তোর বাপ মানে কালীয়দমনের সঙ্গে তোর মা-র 'রিডিকিউলাস' ঘটনাটা না হলে পারতিস এখন পোস্টমডার্ন মারাতে? সাধে কি আর তোকে বোকাচোদা বলেছিলুম। চলি।

পলকের মধ্যে দণ্ডবায়স ও অরণ্য-মার্জার উধাও। টেবিলে একটি বড়ো কালো পালক ও কিছু বেড়ালের লোম পড়ে আছে। পিশাচদমন ডায়েরিতে নোট করলেন · মার্শাল ভদি, মুতোর মেয়ে। তারপর তলায় ডবল দাগ দিলেন।

বনবেড়াল ও দাঁড়কাক ঠিক যে টাইমে পেদোকে চমকাচ্ছিল সেই একই টাইমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মহা মাগিবাজ কিউরেটর ও অন্যান্য বিস্তর খ্যাতিমান ঢ্যামনার সঙ্গে ওই একই দাঁড়কাক ও বনবেড়ালের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সব শালাই নিজ নিজ ডায়রিতে নোট করে নিয়েছিলেন যে মার্শাল ভদিকে সাপোর্ট দিতে হবে।

বজরা ঘোষকে এর মধ্যেই ফ্যাতাড়ুরা ভদির কাছে নিয়ে যায় এবং 'খানদানি খানকি'-র ভলুম ওয়ানের প্রথম চ্যাপটারটি শুনে ভদি, সরখেল, বেচামনি, নলেন ও বল্লভ বক্সি একবাক্যে মেনে নেয় যে এ লেখা বই হয়ে বেরোলে অনেক মালেরই গাঁড়ে হুলো হয়ে যাবে।

'সেই প্রথম দর্শনের স্বপ্নালু ঘোর দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ও হাওড়া নিবাসী বিবাহিত ট্যাক্সি ড্রাইভার শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাটে নাই, এবং দেহে প্রাণ ও মনে পুলক থাকিতে কাটিতেও পারে না। তখন কলিকাতায় বড়ো ট্যাক্সি চলিত। বেবি ট্যাক্সির আবির্ভাব ঘটে নাই। বড়োলোকেরা চড়িত বুইক, পন্টিয়াক, জাগুয়ার, ওল্ডস্‌মোবাইল, অস্টিন, ক্রাইসলার, ফোর্ড ইত্যাদি। পায়ে পরিত কাথবার্টসন হারপারের বুট, চোখে লরেন্স অ্যান্ড মেয়ো-র চশমা, আকবর আলীর স্যুট। তাহারা ফারপো-র প্রসিদ্ধ প্রন্ ককটেল খাইয়া, গুরুগম্ভীর পাদে পথচারীদেব সচকিত কবিয়া, নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে রোমান্টিক মুভি দেখিতে যাইত।

'দর্জিপাড়া পার্কের উল্টা ফুটে শিবনাথ সেই সন্ধ্যায় তাহার বিশাল ডজ্ ট্যাক্সিটি দাঁড কবাইযা কাঁচি সিগারেট টানিতেছিল। তাহার মন ছিল বিমর্ষ, সমগ্র দেহই যেন ম্রিয়মান। সহসা নিকটবর্তী গলির আলো-আঁধারির মধ্য হইতে অতিকায় ও ঝলমলে নারীর এক আদল ভাসিয়া উঠিল। যেন জাহাজ আসিতেছে। এবং তারই ট্যাক্সির' দিকে। যেমন আড়া, তেমনই বহর...'

সরখেল শুধু প্রশ্ন উঠাইয়াছিল,

—অত বড়ো জায়েন্ট খানকি! শিবনাথ হেগো বাঙালি। তাংড়াতে পারবে?

ভদি খেঁকিয়ে উঠেছিল,

—থামবে? সাইজ ফাইজে কিছু যায় আসে না। ভগবান সব ফিট করে রেখেচে।

এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ওই তিনদিনের মধ্যে যে তিন দিন 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়াব' বিক্রির ব্যর্থ চেষ্টা চলে। সেই দিনই গভীরতর রাতে গোলাপ মল্লিকের ছুঁচো কিচকিচে ছাদে মদন, ডি. এস. ও পুরন্দরকে বনবেড়াল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

—পুরন্দর, 'বাল-সিরিজ' আর এগোল?

—এগোব, এগোব করচে। সেই ফাঁকে একটা দুঃখের কবিতা লিখে ফেলেচি।

—দুঃখই তো সব। বলে ফ্যাল্।

পুরন্দর গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে,

চরাচরে
শুধু ঘুঘু চরে
একেলা বসিয়া আছি

ঘরে
কাব, কাব তবে
কার, কাব তবে
কাব্য থরে থবে
কেঁদে মবে

হবে ও দবে
চরাচরে
শুধু দেখি ঘুঘুপাল চরে
কেবলই ঘুণুর দল চবে

দাঁড়কাক বলে উঠল,

—ফেটে গেচে। ওফ্ অক্ষয় বডাল থাকলে তোকে বুকে জডাত। তোর এই যে বিরহ-বেদনা, যা বলে দিলুম, শিগগিরি তোর একটা মাগ জুটবে। মালটা খানকি, খানদানি নয়, তবে মনটা ভালো। সুখে থাকবি। এবাবে বনবেড়াল কি বলে, মন দিয়ে শোন্।

—মিঁয়াও। তোরা যে বজবাকে নিয়ে গেলি ভদির কাচে, বজরা যে 'খানদানি খানকি'-র মুখডাটা শুনিয়ে আসব মাৎ কবে দিল, জানিস্, তোবা কী করেচিস?

—না, আপনি বলুন, আমরা তো ভালো ভেবেই.

—বজরা তোদেব গাঁজা পার্কে, এগাবোটা নাগাদ, বলেনি যে ওকে বাডি ফিরতে হবে, নইলে বউ চিন্তা করবে?

—হ্যাঁ, বলেছিল।

—বলেনি যে 'খানদানি খানকি' বেরোলে একটা বড়ো পুরস্কার ও বউকে প্রমিস করেচে?

—বলেছিল।

—তাহলে শুনে রাখ্। তিন বছব আগে বজবার বউ পেটে ক্যানসার হয়ে মরে গেচে। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। ও এখনও প্রত্যেকটা বাত হাসপাতালের সেকেন্ড গেটের সিঁড়িটাতে জেগে বসে থাকে। ওর ব্যাগে এখনও একটা যশোবের চিরুনি আর লক্ষ্মীবিলাস তেলের শিশি থাকে। মাথার কাঁটা থাকে। ক্লিপ থাকে। একটুখানি খালি একটা হরলিক্স-এর বোতল থাকে।

বনবেড়াল ম্যাঁওম্যাঁও করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে টলমল করে হেঁটে এগোয়। চেনা পা ভেবে মাথা ঘষতে চেষ্টা করে।

দাঁড়কাক শুরু করে,

—বজরা কোনো পুরস্কার পায়নি। কেউ ওর কোনো লেখা পড়েনি। কেউ ওর নাম জানে না। ওর বাড়িতে গেলে দেকবি সবগুলো ফালতু, মেকি। নিজেই অর্ডার দিয়ে দিয়ে বৈঠকখানা থেকে বানিয়েচে। কিন্তু এর একটা কথাও ওকে বলবি না। যে মুহূর্তে বলবি দেকবি ও মরে যাবে। বজরা...ম..রে...যাবে।

দাঁডকাকও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে। গোলাপ মল্লিক কাঁদতে থাকে। তিনজন ফ্যাতাড়ুও কাঁদতে থাকে।

এত কান্নায় লেখকও বেসামাল। পাঠক, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, লেখকও এখন কাঁদছে। এবং এ প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে যে, যতটা পারব আমরা উশুল করে নেব।

ছয়

একটি ফিটন গাড়ি সেই কিনিসন জুট মিলের হলঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। গভীর রাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মিলটা দখল করে অ্যামেরিকান এয়ারফোর্স তাদেব এরোপ্লেনের ইঞ্জিন ধোয়া-পাখলা করত। সত্যি বলতে হলঘরটি এখন নেই কিন্তু যে গভীর রাতের কথা বলা হচ্ছে তখনই হলঘরটি গজিয়ে উঠেছিল এবং পাশেই স্ট্যান্ডার্ড জুট মিলেব কোয়ার্টার থেকে সাহেব-মেমদের হাসি-ঠাট্টা, ছেনালি ও কান্না ভেসে আসছিল যদিও তাবা বহুদিন আগে মরে ভূত হয়ে গেছে। ফিটনের থেকে নামল দাঁড়কাক আর বনবেড়াল। হলঘরে ঢুকে তাবা দেখল হাতে টানা পাখা চলছে এবং ডিমেব স্টাইলে টেবিলের ওপরে মোমবাতি জ্বেলে বেগম জনসন বই পড়চে এবং আরও বহু বই ডাঁই করা। বেগম জনসন ইশারা করে ওদের বসতে বলল। বনবেড়াল দেখল টেবিলের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা ম্যাসিভ কোলাব্যাঙ বসে আছে। বেগম জনসন টেবিলে দুটো টোকা মারতেই ব্যাঙগুলো লাফাতে লাফাতে টেবিল থেকে নেমে গেল।

—কি পড়ছি বলতে পারবে?

—ক্যাপিট্যাল? বলেছিলে ধরবে।

—ধরব। এটা শেষ হলে। মানে সাবজেক্টটা।

—কি এখন তোমার সাবজেক্ট।

—পাগল হরনাথ। তাঁর সাধনসঙ্গিনীর মানে ওয়াইফও রয়েছে, কুসুমকুমারী।

—এই এত বই! সব অ্যাবাউট হরনাথ?

—ইয়েস মাই লাভ। শুনবে কি কি যোগাড় করেছি। এক এক করে বলছি,

* পাগল হরনাথ—কার্তিকচন্দ্র রায়
* Souvenir on the Hundredth Birthday celebration of Pagal Thakur Sree Sree Haranath : Published by Haranath Anath Ashram, Swargadwar, Puri.
* হরনাথ স্মৃতি/(ষষ্ঠ লহরী)—ভবাণীচরণ সেন
* আমার অভিজ্ঞতা—অক্ষয়কুমার গুপ্ত
* পাগল হরনাথ—অটলবিহারী নন্দী
* হরনাথ স্মৃতি/(একাদশ লহরী)—শিশিরকুমার ঘোষাল
* অমিয় হরনাথ লীলাকথা—ভাগবত মিত্র
* হরনাথ চরিতামৃত—সত্যচরণ
* Haranath the Saviour–Vimala Modi
* Sree Haranath Lilamritam–Narayan Ch. Ghosh
* হরগাথা—রামগোপাল ভট্টাচার্য
* পাগলাঝোরা—তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকাশক)
* শরণাগতি—পাগলভাই
* বিনোদমালা—বিনোদবিহারী ঘোষ
* Haranath–His play and Precepts
* Life and Message of Bhagwan Sri Kusum-Haranath–M. Sri Rammurthi
* Sri Kusum-Haranath, The Lord of Love–M.V.Rao
* The Divinity of Haranath the Crazy–Sapuri Lakshminarayan-sayya

আরও অনেক আছে, যোগাড় করতে পারিনি, ভেরি রেয়ার..

বনবেড়াল তাজ্জব,

—আমি তো বাবা নামই শুনিনি। হবনাথ...নো .নেভার।

—শুনবে কি করে? জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুবে বেডালে সারাটা লাইফ। কতবাব বলেছি, ক্যালকাটায় সেটল্ করো...শুনবেই না।

দাঁড়কাক বলল,

—ওকে বলে লাভ নেই। স্যাভেজ.

—হরনাথকে আজ হাতে গোনা কিছু ফ্যামিলি বাদে কেউ চেনে না। কিন্তু ওয়াজ আ জায়েন্ট মিস্টিক, ভাবো, 'হবনাথ-স্মৃতি'-র একাদশ লহরী থেকে কোট্ করছি . সোনামুখীর হিমু কাকার সহিত ঠাকুবেব মধ্যে মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা হইত। হিমু কাকার কৌতুক প্রশ্নে বিবক্ত হইয়া ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসে কেন? ঠাকুর এই প্রশ্ন করেন। উত্তবে হিমু কাকা ওরফে হিমু গাঙ্গুলী বলেন, তোমার দৈবী শক্তি আছে। ঠাকুব অবজ্ঞাভরে বলিলেন, 'তোমার দৈবী শক্তিতে প্রস্রাব করে দিই।' বলো, ইন্টারেস্টিং নয়?

—হাইলি, কিছু ঠিক করলে? 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' তো গোডাতেই ফেল মেরে গেল।

—ওসব ছোটোখাটো ফেলিওর সম্বন্ধে আই কেয়ার আ ফিগ্. .কাল সারারাত এই নিয়ে মাদাম ব্লাভাৎস্কি-র সঙ্গে আমাব আলোচনা হয়েছে। তিব্বতে। শি হ্যাজ গন্ ব্যাক টু হার মাস্টাব্স্। এবং ব্লু প্রিন্টটাও বেডি.

বেগম জনসন বোল করা কাগজটি খুলতে লাগলেন। বনবেডাল ও দাঁড়কাক, উভয়েই কাগজটির ওপরে ঝুঁকে পডল। বিশাল হলঘরের কোণে অন্ধকারে ব্যাঙগুলো হঠাৎ ডাকতে শুরু করল ও টেবিলের ওপবে মোমবাতির শিখাব পাশে চামচিকেব চেয়েও ছোটো ছোটো মিনিয়েচার বাদুড় এসে ফড়ফড করে পাক মেরে মেবে উডতে লাগল। এবোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ জোরে হতে লাগল। পাটের ফেঁশো নিশ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যে শত শত রোগা রোগা কালো মেয়ে টিবি হয়ে মরে গেছে তাদের কাশির শব্দ। অনেক বছর আগের আগুনের ধোঁয়া। কুয়াশা।

এতরকম শব্দ প্লাস কিছু দেখাও যাচ্ছে না। অতএব অধ্যায়টি নিয়ে আর এগোন সম্ভব হল না।

পুরন্দর ভদি-অভিধানে অ্যাড্ করেছিল—

'ভদি-ভয়াল'।

সাত

'কাকভোরে বা বলিতে গেলে ঘোর শীতের প্রায় শেষ রাতে অর্ধোন্মাদ শিবনাথ ঝড়ের গতিতে তাহার ডজ ট্যাক্সি উড়াইয়া গঙ্গার জেটির দিকে ধাবমান হইল। কলিকাতার বিশিষ্ট চর্ম ব্যবসায়ী মিস্টার কক্-এর সহিত তিনমাসের জন্য খানদানি খানকি মাল্টা চলিয়া যাইতেছে। শিবনাথের কাতর ওজর-আপত্তি দৃঢ়চেতা খানদানি খানকি উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে—

—বিজনেস ইজ বিজনেস। কক্ সাহেবের নিকট হইতে তিন মাসে যে পরিমাণ রেস্ত কামাইব তাহা দশ বছর কলকেতার বাবুদের সহিত খিটকেল খেলা করিলেও জুটিবে না। ইহা সত্য যে খানকি জীবনে তোমাকেই আমি প্রেমিক বলিয়া পাইয়াছি। কিন্তু সে

কারণে জাত ব্যবসায় লালবাতি জ্বালাইতে পারি না।

—তিন মাস পরে যে তুমি ফিরিয়া আসিবে তাহার কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

—বিচিত্র এ জীবনে কোনো কিছুতেই গ্যারান্টি নাই শিবনাথ। গরানহাটা হইতে খানকি জীবন শুরু করিয়া আজ কক্ সাহেবের দয়ায় মাল্টায় যাইতেছি—এমনটি যে হইবে তাহা কি জানা ছিল? ভাবিতাম লম্ফ জ্বালাইয়া পোকা ধরিয়া ধরিয়া কোলাব্যাঙের ন্যায় লাইফ কাটিবে। বলা যায় না, মাল্টা হইতে আবার কোনো সাহেব নয়া বুকিং করিযা কোনো অজানা বন্দবে লইযা যায়। তবে তেমনটি না ঘটিলে কক্ সাহেবের সহিতই আমি ফিরিয়া আসিব।

কাতর শিবনাথ সাশ্রুনয়নে গিটকিরি মারিয়া গান ককাইয়া উঠিয়াছিল, 'এই কি গো শেষ দান.. বিরহ দিয়ে গেলে...'

জেটিঘাট। রোমহর্ষক কুয়াশায় সবই ঢাকা। তাহারই মধ্যে ভুতুড়ে জাহাজের মতো দাঁড়াইয়া আছে এইচ. এম. ভি. মালবেরা। ইহাতেই কক্ সাহেবের সহিত মাল্টা পাড়ি দিবে খানদানি খানকি। শিবনাথের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া নিদারুণ এই দৃশ্যটিকে আরও অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। কুলির দল মাল উঠাইতেছিল এবং পবিত্র গঙ্গাতীরে অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়া পরিবেশ কলুষিত করিতেছিল। এই কুলিদের আর যাহাই থাক আক্কেল নাই। থাকিলে তাহারা জেটির ধারে আসিয়া গঙ্গায় প্রস্রাব করিত না। যাহা হউক, মাল চাপানো শেষ হইল। লাইন দিয়া প্যাসেঞ্জাররা চলিল, কিছুটা আগাইয়া জাহাজের সিঁড়ি দিয়া আরোহণ। ওভারকোট, শোলা হ্যাট, বাঁদরটুপি, মেমদের বাহারী টোপর, বালক সাহেব, বালিকা মেম এবং শিশু, বিলাতি কুকুর—ইহাদের মধ্যে শিবনাথ শতচেষ্টা করিয়াও খানদানিকে আলাদা করিতে পারিল না। প্রাণঘাতী ভোঁ বাজাইয়া এইচ. এম. ভি. মালবেরা ছাড়িয়া দিল। কাতর শিবনাথ বেদনার ভাবে টলিতে টলিতে তাহার ডজ ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আসিল।

খুবই কুয়াশা। হাত কয়েক দূরেই কেহ থাকিলে ভালো দেখা যায় না। শিবনাথের সহসা চমক লাগল। পরিচিত সেন্ট ও আরও পরিচিত জর্দাপানের গন্ধ। কুয়াশার মধ্যে ও কী? কাশ্মীরী শালে কান মাথা জড়াইয়া সে এক এলাহি আয়োজন। বিস্মিত শিবনাথ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,

—কে মা আপনি? ভাড়া যাইবেন?

—তুমি আবার আমাকে মা বলা শুরু করিলে কবে থাকিয়া?

—খানদা...!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কক্ সাহেব কালই পটল তুলিয়াছে।

আশা করা যায় যে পিওর পাঁচু না হলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে বজরা ঘোষ এক মহান ঔপন্যাসিক এবং হালের বাংলায় নভেল রচনার নামে যে ত্যাঁদড়া হারামিগিরি চলেছে তার মধ্যে বজরা ঘোষকে ভাবাই যায় না। বলাই বাহুল্য যে ক্রিটিকেরা আমাদের এই সুচিন্তিত মূল্যায়নের সঙ্গে একমত তো হবেনই না উপরন্তু অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট বেঁকাইবেন। মাঝরাতে যখন মশারির ওপরে বনবেড়াল ল্যান্ড করবে তখন শালারা টের পাবে। যাই হোক, 'মসোলিয়ম' একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করিল। বঙ্কিমচন্দ্র, আর. এন. টেগোর, তলস্তয়, বালজাক, দস্তয়েভস্কি, স্তাঁদাল প্রভৃতির ও ইত্যাদির পাশে জ্বলজ্বল করিতেছে একটি নাম—বজরা ঘোষ। বজরা ঘোষের অমর সৃষ্টি 'খানদানি খানকি' কবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবে।

'মসোলিয়ম' রচনা করার বা নামানোর ফাঁকে ফাঁকে 'খানদানি খানকি'-র নিবিড় পাঠ চলিতেছে। আমরা বিস্মিত হইয়াছি—বজরা ঘোষের একটি টেকনিকে। সেটি হল নিজের

উপন্যাসের মধ্যে স্বনামে লেখকের আবির্ভাব। নিজের নাম না করিযা যেমন নিজের ছবিতে অটোগ্রাফের মতো উপস্থিত হইতেন ভীতিপ্রদ আলফ্রেড হিচকক।

যেমন, 'খানদানি খানকি ও শিবনাথ ম্যাঙ্গো লেন দিয়া হাঁটিতেছিল। তাহাদের নজরে পড়ে নাই যে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একটি আম খাইতে খাইতে তাহাদের উপর নজর রাখিতেছে সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ। ম্যাঙ্গো লেনে আম যাহার আবার ইংরেজি হইল ম্যাঙ্গো। কি চমকপ্রদই না এই নাম-শব্দের খেলা।

'নিউ মার্কেটের একটি দোকানে একটি রাক্ষুসে সাইজের ডলপুতুল কিনিতে নাছোড়বান্দা খানদানি খানকি সরবে দোকানদারেব সহিত দরদাম করিতেছিল। শিবনাথ কুঁই কুঁই করিয়া খানদানিকে সমর্থন জানাইতেছিল। দোকানদারদের রসবোধ প্রভূত। সে বলিতেছিল খানদানির দামেই সে ডলপুতুলটি বেচিতে পারে তবে, সেক্ষেত্রে পুতুলটির জামা-ফ্রক, ইজেব ইত্যাদি খুলিয়া লওয়া হইবে। খানদানি হুঙ্কার দিযা উঠিল—"ড্যাকরামুখো, ন্যাংটো পুতুল গছাইবি? দেখিবি? নাঙ্গা ডল দেখিবি? দেখাইব?" হঠাৎ পাশেই জলদ্‌গম্ভীর-স্বরে কে বলিয়া উঠিল "দেখাইবেন? দেখান।" বিস্মিত নেত্রে সকলে দেখিল বিশাল ভুঁড়িওয়ালা একটি সহাস্য মানুষ। মটকার পাঞ্জাবি ও ফাইন ধুতি পবা। মুখে হাসি। পাঠক জানিলে সুখী হইবেন যে লোকটি আর কেহই নয়। সাহিত্য সম্রাট বজবা ঘোষ।'

আট

রণনীতিগত কারণে কমরেড আচার্য আনন্দবাজার পড়েন না। রোজ 'গণশক্তি' এবং পুজোব চারদিন 'নন্দন'। এরকম পার্টি নিষ্ঠ পাঠাভ্যাস থাকবার কারণেই কমরেড আচার্য জানতে পাবলেন না যে আনন্দবাজারের দ্বিতীয় পাতায সুভাষ শাস্ত্রী, পারমিতা, রণেশাচার্য, সত্যানন্দজী, জয়া গাঙ্গুলী প্রমুখের সচিত্র বিজ্ঞাপনের পরেই ভদির কচি বয়সের একটি চুলওয়ালা ফটো এবং তার তলায় লেখা 'পরমারাধ্য ভদি সরকার' এবং তলায় চারটি লাইন,

মরুক, যাহারা বলে 'নাই'
জানি, জানি, জানি তুমি আছো
'মমি'-রূপ লয়ে তুমি
যুগ যুগ বাঁচো।...এবং তারওতলায় 'অগণিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ'।

আঞ্চলিক নেতারা শুনেও শোনেননি বা শুনলেও কানখাড়া করেননি যখন ভদি-অঙ্গনে নন্‌-স্টপ কীর্তন বা ভদি-ভজন চলছিল।

ভদি ভদয়ে নম

ভদি ভদভদিয়ে নম
ভদি দাঁড়ে ভদি পাখি গায় ভদি নাম
ভদি ভদয়ে নম...

ভদি ভদভদিয়ে নম
ভদি ভ্যাঁদভেঁদিয়ে নম

ভদিভাবে ভদি ভাবো, গাও ভদি নাম
ভদি ভদয়ে নম...

ভদি-ভোমরার পালের এই গুঞ্জন বা তার রেশ কোথাওই পৌঁছয়নি।

ভরদুপুরবেলায় টেম্পো করে বড়িলাল, গোলাপ ও বল্লভ বক্সি যখন পলিথিনে মোড়া বিশাল, মানুষপ্রমাণ কাচের বাক্স নিয়ে এল তখনও কেউ খেয়াল করেনি।

কুস্তিগির বড়িলাল এবং তার বৌ কালী এই ফাঁকে ম্যাটিনি শো-তে গিয়ে দেখে এল 'গ্যাঁড়াকল'।

নয়

দিনচারেক পরে দেখা গেল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং নিছকই গুরুত্বহীন গলিঘুঁজি, ময়লা ফেলার জায়গা, পেচ্ছাপখানা—নানা জায়গাতেই ছোটোসাইজের একটি চোতা পোস্টার পড়েছে যাতে একটিই শব্দ লেখা

'মমি'

এই চারদিনের মধ্যেই পুরন্দর ভাট তার বাল-সিবিজের সেকেন্ড কবিতাটি নামায়। এবং কবিতাটি ভদি-মণ্ডলে সবিশেষ সমাদর পায়।

গ্রামে যাত্রাপার্টি
আসিয়াছে যাত্রাপার্টি
পালা 'রাম-সীতা'
পালে পালে জুটিয়াছে
আবালবৃদ্ধবনিতা

ইন্টারভাল
সীতা ফোঁকে বিড়ি
রাম টানে মাল
আবৃদ্ধবনিতা ঘুমে কাদা

জাগিয়া বসিয়া আছে বাল

'মমি' পোস্টারটি খুব যে একটা ধুন্ধুমার আলোড়ন তুলেছিল এমনটি নয়। এ বিষয়ে লোকেও আজ খুব টনটনে জ্ঞানার্জন করে বসে আছে, পোস্টারের ঢপ আর তাকে টানে না। যাদের চোখে পড়েছিল তারাও বড়জোর যাদুঘরে রাখা ফারাও-দের চাকরের মমিটির কথা মনে করেছিল, যা সেই কবে ছোটোবেলায় দেখা। ঐ মমিটি এমনই নিরীহ যে ওটা দেখে কেউ আজ অব্দি ভয় পেয়েছে বলে শোনা যায়নি। এবং অনেকেরই মামি, মামি-টু এবং দা মামি রিটার্নস্ দেখা। কিন্তু এর দুদিন পরে যে পোস্টারটি পড়েছিল তা অতটা নিরামিষ নয়, একে আমরা সয়াবিনের মাংস বলে বর্ণনা করতেই পারি—'ভদিভবনে মমি'। এতে করেও যে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল বা মোড়ে মোড়ে গুলতান্, এমনটি হয়নি তবে দুচারজনের মরচেপড়া টনক

নডে থাকতে পারে। এরপর আর কোনো পোস্টার পড়েনি। পড়াব দরকারও হয়নি। এই সময়টুকু, পরের কোনো ঐতিহাসিক গবেষণায়, হয়তো 'ঝড়েব আগের থমথমে ভাব' জাতীয় ইডিয়টিক কোনো ভাষায় বর্ণিত হবে। নাও হতে পাবে।

এই সময়টুকু যতটা আমরা স্টাডি কবতে পেরেছি, ভদিকুলের মধ্যে অদ্ভুত একটা বিন্দাস ভাব বিরাজ করছিল যার মধ্যে টুকটাক খিল্লি ও রগড়ও দেখা গেছে। যেমন ডি. এস. মদনকে বলল,

—আজ আমার কয়েকটা টাকা খরচ হচ্ছেই।

—সে তো রোজই হয—মাল কিনবে?

—বাল।

—তবে?

—একটা কালো বেল্ট কিনতে হবে। কুচকুচে। ব্যাস্ মাব দিয়া...

—মানে?

—ব্ল্যাক বেল্ট। কোমবে চড়িয়ে যাকে একটা টিক্ দেব না রেড সুতো বেরিয়ে পড়বে।

—বুজেচি।

—কী?

—জ্যাকি চ্যান-ফ্যান দেখেচ টিভিতে। ভেবেচ কালো বেল্ট পরলে তুমিও ওরকম পারবে।

—পারবই তো। চ্যাক্— ডিগবাজি দিলাম। ঝাডলাম গলায—গঁক্। এরপর সাটসাট দুটো কিক্—ফিনিশ।

মদন কিছু বলেনি। পুরন্দর বলেছিল,

> শুধু পবা ব্ল্যাক বেল্ট
> আর কিছু নাই
> আযনায় কবিতেছে
> তুমুল লড়াই

অন্যদিকে গোলাপ আর বড়িলালের মধ্যে গল্প হচ্ছিল। এসব গল্প কেন যে আচমকা শুরু হয়ে যায় তা আর বোধহয় কোনোদিনই জানা যাবে না। তবে চেষ্টা চলছে। গোলাপই শুরু করেছিল,

—বর্ধমান লাইনে, কর্ডে, একবার এক ব্যাটা বাউল দেখি গুপিযন্তর নিয়ে পোঁদ দুলিয়ে ফ্যাঁসা গলায় চিল্লোচ্ছে।

—ওসব বাউল-ফাউল দেকলেই আমার মাতা গরম হয়ে যায়।

—আমারও, তা শোনোনা, মালটাকে তো বিড়িফিড়ি দিয়ে সাইজ করলুম। বাঁড়া বলে কিনা লন্ডন, প্যারিস সব ঘুরে এসেচে।

—তা তুমি কি বললে?

—বলে দিলাম। আমি হলাম খানকির ছেলে গোলাপ মল্লিক, মই লাগিয়ে হাতির পোঁদ মারি।

—কি করল তখন?

—কি আবার করবে, শুনেই ফেটে গেল।

ওদিকে নলেন মেথরের সঙ্গে ঝগড়া করছিল,

—ওঃ মেথর, মেথরের মতো থাকবি। শালা নন্দমায় হাত দেব না। তুই হাত দিবি না তো

আমি হাত দেব?

—নোদ্দোমোটা কি ছাঁই, কাঁটা ফেলার জায়গা? সকালে সিটি বাজিয়ে গাড়ি আসবে আর ছাই-কাঁটা সোব একানে ঢালবে। বিছুয়া-ফিছুয়া কিচু কামড়ে দিলে হাসপাতালের খরচা আপনি দিবেন?

—আমি কেন দিতে যাব? বিছে কামড়ালে তোকে কামড়াবে, আমার কি? কাউন্সিলারের ঠেঙে পয়সা চাইবি? ইশ্লি!

ভদি আর বেচামনি বারান্দায় বসে প্রায় রোজকার এই ঝগড়া এনজয় করছিল। বেচামনি হেসে বলল,

—একানে কে বসে আচে জানিস? সে থাকতে কে কামড়াবে? বলে ভদিকে ঠারেঠোবে দেখায়। মেথরের মুখে অপার্থিব হাসি।

—নলেন, ওকে একটা পচাধচা দেকে পলিব্যাগ দে না। হাতে পরে নদ্দমা ঘাঁটবে। মাতায় বুদ্দি নেই। ঝগড়া করচে।

মেথর নলেনকে বলে,

—বউদিদি ঠিক বোলা।

নলেন রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বাতিল পলিব্যাগ আনতে গেল।

সরখেল লিখছিল,

'ইংল্যান্ড দ্বীপের স্টোনহেঞ্জ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বিরাট বিরাট পাথর নানা ঢঙে সাজাইয়া রাখার বহর দেখিয়া দানিকেনসহ নানা সাহেব নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতিটি মতই অসার। গরু খাইলেই যে মাথায় বুদ্ধি খোলে এমনটি নয়। হয়তো পেট গরম হইবার ফলে বায়ু কুপিত হইয়া নানাবিধ আজগুবি স্বপ্ন দেখায়। এমনই একটি থিওরি হইল যে ভিন্‌গ্রহ হইতে দানবরা আসিয়া ওইসব প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া পালাইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়দা। সে এতকাল হাঁচরপাঁচর করিয়া বড়োজোর চন্দ্র পর্যন্ত গিয়াছে, আর কোথাও যাইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। সে পারিল না আর দূর তারকামণ্ডল হইতে দানবরা আসিয়া ভূপৃষ্ঠে দৈত্যাকৃতি পাথর লইয়া লুডো খেলায় মাতিল, এ কথা উন্মাদও বিশ্বাস করিবে না। মানুষ যতদিন ধরাধামে আছে তাহা হইতে অনেক হাজারগুণ সময় ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিল। সাহেবরাই শিখাইয়াছে যে ডাইনোরা নিরন্তর কামড়াকামড়ি করিত এবং এ উহাকে দেখিলেই হিংস্র গর্জন সহকারে তাড়া করিত। এই ভুল শিক্ষাটিকেই আমি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিব যে ডাইনোরা ছিল সুশীল ও শান্ত প্রকৃতির এবং অতীব সভ্য। রান্নাঘরে বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির মতো স্বাভাবিক কিছু হয়তো ঘটিয়া থাকিবে কিন্তু উহা বড়ো কথা নয়। সহস্র সহস্র বৎসর থাকিতে থাকিতে ডাইনোদের মনে 'আমরা কী ও কেন'? এই প্রশ্ন জাগরিত হয়। বিশাল বিশাল চক্ষু মেলিয়া তাহারা নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছিল। ত্রিতাপের জ্বালা কতদিন আর ভোগ করা যায়? অতএব, তারা তন্ত্রসাধনার পথ ধরিয়াছিল। ওই পাথর সাজাইয়াছিল তারাই, ওইগুলি এক একটি তন্ত্রপীঠ। আমাদের যাহা 'ওঁ', তাহাদের সেটিই ছিল 'গঁক্‌ঘ'। এইজন্যই দেখা যায় যে সকল ডাইনো-মন্ত্রের গোড়াতেই সেই 'গঁক্‌ঘ'।'

গঁক্‌ঘ

দশ

সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু সত্যিই কোনো পাঠক যদি গত নয়টি অধ্যায় অবধি 'মসোলিয়ম' পড়ার যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন তাহলে তিনি ধরেই নিয়েছেন বুঝতে হবে যে ভদিভবন-এর ভৌগোলিক স্থানাঙ্কটি নানা টাইপের মণ্ডলের নামে কালিঘাটে যে রাস্তাগুলো আছে তারই কাছের একটি ফ্যাকড়া-মার্কা আধা-রাস্তা আধা-গলিতে। ভদি-ভবনের রুফ টপে দাঁড়ালে আপনি মদনজী-র মন্দিরের ডগাটা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ ওইখানেই আদিগঙ্গা এবং পেরোলেই চেতলা যেখানে বিমল মিত্রের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিকই শুধু নয়, বহুৎ হেকড়বাজ ভোঁ ও গাঁজিয়ালরাও থাকতেন। সবই লোপাট। ছিটেফোঁটা যা বাকি আছে সেও আর কদিনই বা। বাঁ দিকে যে রেল-ব্রিজ দেখিতেছেন সেটিই ছিল সাবেক কলকাতার বর্ডার। সেই জন্যই ভদিভবনের সন্নিকটে একটি পুলিশ-চৌকিও ছিল যেখানে আজও রাতে মরা পুলিশদের ভূত কুচ-কাওয়াজ করে। মরা চোরদের ভূত প্যাঁদানি খেয়ে হাঁউ-মাঁউ করে। মরা খানকিদের ভূতেরা অনুরূপ করে না কারণ তখন সিরিয়াসলি খানকি-ধরাব বেওয়াজ ছিল না। এখন যেমন তাদের নিরন্তর হেনস্থা করা হয় তেমনটি হতো না। উপরে যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুল হইতে তো পারেই। তবে সব ছাপিয়ে একটি আক্ষেপ—ওফ্ আজ যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থাকত!

দাঁড়কাক বেগম জনসনকে বলল,

—তুমি বলছ পোস্টাব ক্যামপেনের আর দবকাব নেই? আমার কিন্তু কিরকম শেকি লাগচে। বনবেড়াল তো চাইছিল টি ভি তে দিতে। বলল, যে টাকা ইনভেস্ট করবে তার চারগুণ উঠে আসবে।

—হয়তো ঠিকই বলেছে বাট আই ডিফার। মনে বাখবে আমি চোখের ওপর কোম্পানিকে ইনডিয়া ক্যাপচার করতে দেখেছি, ব্যবসা আমার রক্তে। মাই আরগুমেন্ট ইজ টিভিতে না দিয়েই যদি ব্যবসাটা রমরম্ করে জমে যায় তাহলে ফালতু আমি ওই মাদারফাকারদের পয়সা দিতে যাব কেন? দোজ অ্যাসহোল্স্!

—সেটা ঠিক, তাহলে আমরা কি করব? 'ভদিভবনে মমি'-তেই বলচ এনাফ কাজ হবে?

—নো ডিয়ার। এই নাও, স্টেপ বাই স্টেপ সব পেয়ে যাবে।

দাঁড়কাকের দিকে বেগম জনসন একটা চারনম্বর খাতা এগিয়ে দিল।

—আর একটা কথা, ভদির মমি নিয়ে যখন ডিবেট চলবে, লাইক যেমন ধনঞ্জয়ের হ্যাংগিং-এর সময়ে চলেছিল, তখন আমার পক্ষে ওপেনলি মাঠে নামাটা ঠিক হবে না। হাজার হলেও ভদি ইজ মাই সান এবং আমাদের বংশে, মানে স্টার্টিং ফ্রম দা গ্র্যান্ড ওল্ড আত্মারাম সরকার কেউ কাউকে ডিফেন্ড করে নি। বাংলা কথাটা হল—নিজের কেচ্ছা নিয়ে সামলাও. বাড়ির কেউ কিছু বলবে না।

—সেটা জানি। তুমি আর আমাকে কি বলবে। এই জন্যেই আমি বনবেড়ালকে আনবার অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম।

—ও কি বলবে? ওয়াইল্ড একটা ক্রিচার, র মিট খায়!

—দ্যাখো মমির সাবজেক্টটা নিয়ে ও একজন অথরিটি, বুঝলে? লং বিফোর দা ফাকিং সাহিবস্, যখন লোকাল চোরগুলো পিরামিডে ঢুকত, ঢুকেই ওকে দেখতে পেত। ইজিপশিয়ান মমি তো হ্যাক্নিড একটা ব্যাপার, বুদ্ধিস্টট্ মমি সম্বন্ধে ওই আমাকে এনলাইটেন করে।

—বুদ্ধিস্ট্ মমি?

—হ্যাঁ। চায়না, জাপান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া—এই সব দেশে তুমি ওদের পাবে। মালগুলো নিজেই মমি হয়ে গিয়েছিল।

—মানে?

—টেক্‌নিক্, টেক্‌নিক্। ধরো শেষ কয়েকটা বছর খাওয়া কমাতে কমাতে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তারপর স্রেফ জল আর হাওয়া। জলটাও টেঁসে যাওয়ার কযেক মাস আগে, কমাতে কমাতে, ছেড়ে দিত। নো হাগামোতা, ওনলি বুদ্ধ'জ নেম, অ্যান্ড প্লেন হাওয়া। ব্যাস্, তারপর পট্‌লে গেল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ সেল্ফ মেড মমি।

—তাজ্জব কি বাত্!

—এই জানবে। এখনও গিয়ে দেখতে পারো—শুঁটকো বাঁদরের মতো বসে আচে। আব একটা টাইপের মমি হল রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের কয়েকটা সেন্ট-এর, এগুলো ও দেখেচে কিয়েভ মোনাস্টরির তলায়। তবে সেগুলো শোয়া আর মুখ ঢাকা। ভূতুড়ে।

—মোস্ট থ্রিলিং। এখন দেকচি বুনো বানচোতটাকে এতদিন কাঁচাখেকো বলে আন্ডার এস্টিমেটই করে এসেচি।

—আরে ওর খেল্ তো দেখনি। ওই রটেন সি. পি. এম-এর আচায্যিটাকে মুখ খুলতে দাও, দেখবে তখন! ধুতি খুলি দেবে।

ঘ্যাঁও!

এগারো

কমরেড আচার্য একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। কেন দেখলেন তা বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এটুকুই জেনে আশ্বস্ত হলাম কমরেড আচার্য-র মতো স্বচ্ছ, সঠিক ও অভ্রান্ত মানুষও নেহাতই রাম-শ্যাম-যদু অর্থাৎ টম-ডিক-হ্যারির মতোই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন। এবং ভুলেও যান।

সুন্দরী এক সদ্যোমৃত মেমসাহেব। হাতে একটি ডাক্তারি ব্যাগ, জনৈক প্রৌঢ় মড়াটিকে নিরীক্ষণ করছেন। মৃতদেহটি নগ্ন। ফরসা দুটো পা নীল হয়ে গেছে, নাকটা কিছুটা বসা। প্রৌঢ় ব্যাগ থেকে ছুরি বের করলেন এবং ফ্যালোপিয়ান আর্চের তলায় ফেমোরাল আর্টারিটি কাটলেন, নাভির কাছেও কাটলেন এবং প্রচুর পরিমাণে ফরম্যালিন ইঞ্জেকশন করলেন। এরপর তাঁর ছুরি খুঁজতে লাগল ভিসেরা। সেখানে তিনি দিলেন প্যারাফিন। এবং তারপর প্লাস্টার ট্যামপোন দিয়ে ক্ষতগুলিকে বন্ধ করলেন। প্রৌঢ়ের মাথায় টাক চকচক করছিল আর সেখানে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম ছিল। স্বপ্নের মধ্যেই কমরেড আচার্য বুঝতে পারলেন যে এতক্ষণ ভয়াবহ যে দৃশ্য তিনি দেখছিলেন সেটা দেখা যাচ্ছিল একটা কাচের জানলার মধ্য দিয়ে। কোনো অজানা কারণে কাচটা ঝাপসা হয়ে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে কমরেড আচার্য-র স্বপ্নটা মনে ছিল না। সামান্য একটু অস্বস্তি ছিল কিন্তু বেলা গড়াতে না গড়াতে সেটাও চলে গেল।

কমরেড আচার্য কিন্তু কোনো স্বপ্ন দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন একটি সত্যি ঘটনা। ঘটেছিল ১৯৫২ সালে। ওই মৃত মেমসাহেব হলেন এভিতা পেরন। ওই টাকমাথা প্রৌঢ় হলেন ডক্টর

পেদ্রো আরা। আর্জেন্টিনার একনায়ক হুয়ান পেরনের নির্দেশক্রমে তিনি এভিতা পেরনের মমি বানিয়েছিলেন। লে!

বারো

ভদিভবনের দরজার ওপবে লাগানো হয়েছিল একটি নতুন সাইনবোর্ড।

'মার্শাল ভদির মসোলিয়ম'

সাইনবোর্ডটি ছাডাও, আর একটি বোর্ড ছিল তলায়। তাতে লেখা ছিল 'মমি দেখার সময়—বেলা দুইটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা, প্রবেশ মূল্য ১০ ট'কা, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন মসোলিয়ম বন্ধ থাকিবে'। একতলা বাড়িটির চাবখানি ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটির মাঝখানে পূর্ববর্ণিত কাচের বাক্সে ছিল ভদির বমি। ভুঁড়ি অব্দি চাপা একটি লাল আর্ট সিল্কের কাপড়। মাথায় একটি লাল ভেলভেটের ছোটো, নরম বালিশ। মমির ওপরে গোল শেড দেওয়া একটি নীলচে বাল্ব। লাল কাপড় ও নীলচে আলো। ভদিব মমির মুখে স্মিত একটি হাসি কিন্তু মমির বাক্সটির পাশ দিয়ে হেঁটে ঘুরে যাওয়ার সময়ে কারো কাবো মনে হয়েছিল যে দাঁত খিঁচোচ্ছে। ঘরে একই সঙ্গে মশার কয়েল ও সুগন্ধ ধূপ জ্বলছে। দেওয়ালে লাগানো এস ইউ. সি-র কোটেশান এক্সজিবিশনের স্টাইলে ভদির বাণী—'সময় হলেই আমি জেগে উঠব', 'ওরে পাগলা, ভেবেছিস আমি নেই!', 'মদ, রেস, গাঁজা—সবই ভগবানের দান। নিবি না কেন?', 'মাগিবাড়ি না গেলে দুঃখী মেয়েগুলো খাবে কি?', 'ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নে', 'সময় থাকতে গিঁট খোল্', 'হাওদা আছে, হাতি কই?', 'সব ভালো যার পোঁদ ভালো', 'মায়া হল জালি গামছা, টেনে খুলে দে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ছাড়াও বড় সাইজের সন্তোষ টু-ইন-ওয়ানে বিরামহীন 'ভদি-ভদয়ে নম, ভদি ভদ্‌ভদিয়ে নম...'। দরজার বাইরে একটি এক হাতল ভাঙা চেয়ারে বেচামনি, শ্যাম্পু করা চুল, জমকালো শাড়ি, গলায় জবার মালা এবং পায়ের কাছে একটি থালা। অনেক পাব্লিক আছে যে ঘর থেকে বেরোতেই চায় না বা কাচের বাক্সের গায় টুক্‌টুক্‌ করে। তাদের তাড়াবার জন্যে ভেতরে ডিউটি নলেনের। টিকিট দিয়ে টাকা নেয় সরখেল। ওভার-অল সিকিউরিটির দায়িত্বে রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি সকলের ওপর ফৌজি নজর রাখেন এবং মাঝেমধ্যে ছাদে উঠে বাইনোকুলার দিয়ে চারপাশটা সার্ভে করে নেন।

বেগম জনসনের বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটি যে কি মোক্ষম তা কয়েকদিনের মধ্যেই হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল। ফার্স্ট স্টেপটি অনুযায়ী কাজ করতেই মামলা জমে গেল।

বেগম জনসন বলেছিলেন, প্রথমে নিজেদের যত লোক, সব বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও। লাইনটি যেন অতিরিক্ত সুশৃঙ্খল না হয়, আবার আনরুলি নেটিভদের মবেও যেন না পরিণত হয়। অল্পস্বল্প ধাক্কাধাক্কি, গাঁড়-পুষিং ও খিস্তিখাস্তা চলতে পারে। যারা ঢুকবে তারাই আবার বেরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়বে। এরকম চলতেই থাকবে।

এবং এর ফল ফলে গেল হাতেনাতে। সব সময়ই, সব রাস্তাতেই উদগাণ্ডু পাব্লিককে দেখা যাবে চলেছে। খোঁজ নিলে জানা যাবে ওদের এই নিরন্তর চলাফেরার পেছনে ভ্যালিড কারণ

খুব কম। বেহালা থেকে কোনো শালা হয়তো বড়বাজারে ধনে-র টন কত করে যাচ্ছে জানতে বেরিয়ে পড়ল। এবং যাবিই যখন স্ট্রেট চলে যা। তা না ল্যাওড়া হয়তো রাসবিহারীতে নেমে বাঁদিকে ভাঁজ মেরে গলি-গলতায় ঢুকে পড়ল। ইদানীং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এমন অনেকেই জেনে গেছে যারা জানে না যাদবপুরেই একটা আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যাই হোক, সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই একবার ভাট পাব্লিকের এই কেয়টিক ঘোরাঘুরি নিয়ে একটি পি. এইচ. ডি. গবেষণা হয়েছিল বলে শোনা যায়। তাতে বিশেষভাবে ক্যালকাটানদের এই বিচিত্র অভ্যাসের ব্যাপারটি অ্যানালিসিস করা হয়। দেখা যায় যে কলকাতার ইকনমিকালি ডিপ্রেস্‌ড্ সেকশনের লোকেরাই এরকম বেশি করে–উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি। বম্বেতে স্ট্রং ইকনমিক ধান্দা না থাকলে গরিবরা নিজেদের এলাকাতেই ডান্সিং বার ও অন্যত্র ছেনতাই ফেনতাইয়েব লাইন করে। দিল্লিতে গরিবরা গাড়ি চাপা পড়ে মরার ভয়তে নিজেব মহল্লা ছেড়ে বেরোয় না। কলকাতায় সব কিছুই উল্টো। এখানকার লোক সেই তানসেনের আমল বা প্রফুল্ল সেনের যুগ হয়ে আজ অব্দি যেরকম হারামি ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

যাই হোক, মবলগে কেসটা ক্যাঁচা হয়ে গেল। ভদির টিমের মমি দেখার লাইন দেখে আলতুফালতু কিছু পাব্লিকও মমি দেখতে ভিড়ে গেল। এবং এর ফল হল ইলেকট্রিফাইং–সেই দিনই সন্ধেবেলায় কাটুয়াখোটি লেন থেকে কেস্টোফার লেন, সিঁথি থেকে নেবুতলা, ম্যান্টন থেকে বালমুকুন্দ মক্কড় রোড–নানা জাযগায় সংগ্রামী জনগণ জেনে গেল যে কলকেতায মমি উটেচে।

কলকাতার প্রসিদ্ধ বৃদ্ধদেব কথা কে না জানে যাদেব হারামিপনাব দোসর মেলা ভার। তাদেবই আলোচনা,

—শুনেচ?

—কি?

—মমি বেরিয়েচে। কালিঘাটে। ওই যে, তোমার গে, বাপন, নিজেব চোকে দেকে এসেচে।

—মমি? মাগিফাগি হবে। বুড়ো কানে কি শুনতে কি শুনেচো।

—না হে বাঁড়া! ঠিকই শুনেচি। মমি! মমি!

—বলো কি ভায়া! তবে তো দেকে আসতে হচ্চে।

খবর কি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের এমুড়ো থেকে পাঁচমাথা হয়ে ও মুড়োয় পৌঁছে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে গণেশের দুধ প্যাঁদানোর বেলাতেই কলকাতা ট্রায়াল দিয়ে রেখেছিল। মমির বেলাতে সেই ট্রায়ালের সুফল পাওয়া গেল। বস্তি এলাকায় শুরু হয়ে গেল মমি-ড়ান্স। মোড়ে মোড়ে মমি-বিরিয়ানি ও মমি-রোলের দোকান বসে গেল। ভদ্দরলোকেদের পাড়ায়ও অন্যথা হল না। চল্লিশ কিলো ওজনের এক-একটা বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে ম্যাগি গিলতে গিলতে বায়নাক্কা জুড়ে দিল–'মমি দেখব, মামি, মমি দেখব!' এবং মমির ঘাড়ে চড়ে ভদির নামও ফেটে গেল।

পুলিশ কমিশনার জোয়ারদার জানতেন যে তাঁরই আই. বি. ডিপার্টমেন্টের স্টাফ গোলাপ মল্লিক ভদির ভক্ত। এটাও তিনি জানতেন যে দুঁদে গোয়েন্দা তারকনাথ সাধু গোলাপকে সবিশেষ স্নেহ করেন। মার্শাল ভদি সম্বন্ধে জোয়ারদারের ফিয়ারও ছিল ('কাঙাল মালসাট' দ্রষ্টব্য) তবে মার্শাল ভদি পটল তুলে মমি হয়েছে, এই ব্যাপারটায় তিনি খুব একটা নতুন করে ভয় পাননি। মালটা পট্‌লে গেছে, এটাই তো বিরাট রিলিফ। জোয়ারদার জানতেন যে, যে কোনো টাইমে কমরেড আচার্য ব্যাপারটা নিয়ে তাঁকে ক্যাঁক ধরে ধরবে। জোয়ারদার তারকনাথ সাধুকে ডেকে

পাঠালেন।

—বলুন মিস্টার সাধু, কিরকম চলছে?

—যেরকম চলে। মার্ডার আব রেপ নিযে ঘাঁটাঘাঁটি করচি। ঘেন্না ধরে গেল। তবে চারদিকে, কলকাতায়, মানে আপনার পুলিশে নয়, তা হলেও পুলিশ তো, পুলিশ কি রেটে রেপ কেসে ফাঁসচে দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্চি।

—সেই তো, সেই তো। এক একসময়ে আই ওয়াণ্ডার, এদের কি হ্যাপি কনজুগাল লাইফ নেই? কোথায় রেপ হবে, পুলিশ ধববে, তা না নন-রেপিস্ট পুলিশকেই রেপিস্ট পুলিশকে ধরতে হচ্ছে। পুলিশই পুলিশকে ধরছে। প্যারাডক্সিকাল।

—এবাব বলুন, কেন ডেকেচেন?

—আই নো, আপনি ফালতু বিটিং অ্যাবাউট দা বুশ পছন্দ কবেন না। বিশেষ করে আপনার, মানে, ওই গোপাল আর কি, মানে যাকে আপনি যথেষ্ট স্নেহ করেন—কিছু জানতে পাবলেন, ওই মমির ব্যাপাবে।

—একটা ছোটো মিসটেক হয়ে গেল গোপাল নয়, গোলাপ।

—ইয়েস, ইযেস, গোলাপ। রোজ! রোজ!

—ওর কাছ থেকে জানতে হবে কেন? ভদি মবে মমি হয়েছে—সিম্পল। দেখেও এসেছি।

—দেখে এসেছেন?

—হ্যাঁ, যে কেউ দেখে আসতে পাবে। কাচেব বাক্সে মডা, মানে ভদির। নো সাইন অফ ডিকম্পোজিশন।

—স্ট্রেঞ্জ! আচ্ছা, আপনাব কি মনে হয়? মানে মার্শাল ভদি সম্বন্ধে?

—ও গোলাপ অনেক কিছু বলে। সব আমি বিশ্বাস করি না। তবে একটা ম্যাজিকাল ব্যাপার আছেই।

—ঠিক! ঠিক!

তারকনাথ সাধু চলে যাওয়ার পবে মিঃ জোযাবদাব একটা ইন্ডিয়া কিং ধবালেন এবং আমেজে চোখ বুজলেন। বাড়িতে ললিতা জোযারদারেব অর্ডার চলে। ওনলি দুটো সিগারেট বরাদ্দ—ওয়ান ফর পায়খানা, ওয়ান আফটাব ডিনার। প্যাসিভ স্মোকিং হতে পারে, তাই বারান্দায় গিয়ে খেতে হয়। জোয়ারদার মনে মনে বললেন, 'মোস্ট হাবামি মাগি। হায়ার্ড কিলার দিযে মার্ডার করিয়ে দেব, তখন বুঝবে।' এমন সময় ফোন বাজল।

—আমি টালিগঞ্জ থানার ও. সি ভট্‌চায্ বলছি স্যার।

—বলো, এনি প্রবলেম?

—প্রবলেম স্যার, হেভি প্রবলেম। মার্শাল ভদির মমির ওখানে হেভি ক্রাউড। লাইনে ঝাড়পিট হচ্ছে। লোক পাঠিয়েছি।

—ভালো করেছো।

—স্যার, এই ম্যানপাওয়াবে এর পরে কুলোতে পারব না। এখনই তো স্যার, কলাবাগানে বোম মারামারি চলছিল। ঘুরে এলাম। নিজেকেই যেতে হল। লোক কই?

—পলিটিকাল?

—না স্যার, লোটো খেলা নিয়ে কিচায়েন। তবে পলিটিকাল হয়ে যেতে পাবে, এনি টাইম।

—দেখছি, কি করা যায়।

ফোন রেখে ফের স্বগতোক্তি করলেন, 'ওফ্, এই হয়েছে এক লোটো। সাট্টা তাহলে কি

দোষটা করল?' দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়লেন জোয়ারদার এবং এই ভাবনার মধ্যেই তাঁর চোখ গিয়ে পডল জানলায়, হিউজ একটি দাঁড়কাক বসে। জোয়ারদাব বললেন,

—হুশ!

দাঁড়কাক নির্বিকার। চোখ পিটপিট করছে।

বুড়ো দাঁড়কাক। হয়তো কালা। ফের বললেন, এবার আরও জোরে,

—হুশ! হুশ!

দাঁড়কাক বলল,

—একটা ঠোক্কর দিলেই বুজবি। গাণ্ডু কোথাকার। বাড়ি গিয়ে দ্যাখ্ কি হয়েচে।

এই বলে পুঁক্ করে একটি বাতকর্ম করে দাঁড়কাক উড়ে গেল।

ঘাবড়ে গেলেন জোয়ারদার। ঘামতে ঘামতে বাড়িতে ফোন করলেন,

—ললিতা কোথায়?

—আঁজ্ঞে, লেডিজ ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে মমি দেখতে গেছেন।

—কি?

—কালিঘাটে কোথায় মমি বেরিয়েছে। তাই দেখতে গেছেন।

—ওফ্, মাই গড!

জোয়ারদার ধড়াম্ কবে রিসিভার নামালেন।

গঁক্ঘ ঘঁক্ হুঁয়াক্ হোঁয়াক্ ভঁক্ ভঁক্

তেবো

একেলা বসিয়া আছি
ঘরে
কাব, কাব তরে

মমি নিয়ে ডামাডোল জমছে, বিস্তর টাকা উঠছে, প্রথমে মাদার ডেয়ারির প্যাকেটে ভাঁজ করে রাখা হচ্ছিল, এখন বড়ো পলিব্যাগে মানে দেড় কিলো দু কিলো মুরগি আনার কালো পলিব্যাগে নোট জমানো হচ্ছে এবং সব টাকা চলে যাচ্ছে প্রথমে, সরখেলের বাড়ির বিদঘুটে সিন্দুকে এবং পরে কারফর্মার ল্যান্ডমাস্টারে করে গভীর রাতে গরচায়। টাকা সরিযে ফেলার এই বুদ্ধিটি বেচামনির। সে যেমন চলছে চলুক, এদিকে, মদন, কাঁচা ঘুম থেকে পেচ্ছাপ পেয়ে যাওয়ায় জেগে উঠে দেখল যে পুরন্দর ঘরে নেই। পুরন্দরের হালের কবিতার খাতাটি খোলা, সেখানে জ্ঞান গোঁসাইয়ের গানের সামান্য একটু ইংরিজি অনুবাদ,

In this empty chest, Bird mine, come back, come back.

মদন আপনমনে বলল, 'বানচোত কি সুইসাইড ফাইড করতে গেল নাকি। কি ঝকমারি মাইরি!' মদন মুতে এসে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। ডি. এস. তার ঘরে বউ-বাচ্চা নিয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছিল। কলকাতার রাতের আকাশে অনেক ভূত হাওয়া খেতে বেরোয়। তাদেরই কয়েকজন দেখল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরির কাছে একটা লোক বসে আছে। এটাও তারা

বুঝল যে লোকটার মনে খুব কষ্ট। কিন্তু কিছু করার নেই। মিডিয়াম না পেলে ভূতরা কখনোই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। পরিব মিডিযাম হওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। পুবন্দর দেখল ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে যদি নিচে পড়ে যায়? পুরন্দর দৃশ্যটা ভেবে শিউরে উঠল। সকালে মর্নিং ওয়াকাররা গোল হয়ে ভিড় করেছে আর দাঁত ছরকুটে মারা পাতিকাকের মতো পড়ে আছে পুরন্দব। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে রাতের মহাকাশের দিকে তাকালো সে। তাবার ফুল ফুটেছে। চাঁদ চলেছে বলে ঠাওর হয়, মেঘ চলেছে বলে। একটা এরোপ্লেন গেল। এরোপ্লেনে যারা বসে আছে তারা কোথায় চলেছে? এয়ার হোস্টেসরা ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে? ফের কষ্টের শুরু। পুবন্দব ফের উডতে লাগল। এবারে মাঠের মধ্যে গিয়ে অন্ধকাবে বসি বরং। ঘুম পেয়ে গেলে পড়ে যাওযার ভয থাকবে না।

মাঠে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল পুরন্দর। কিন্তু খস্‌খস্‌ চলার শব্দ আর শস্তার সেন্টের গন্ধ পেয়ে তাকাল অন্ধকারে। সাদা নাইলনের শাড়ি পরা বোগা একটা মেয়ে।

—কান্না করচো কেন? একা বসে?

—কেউ নেই। একা বসে আচি। থাকতে নেই?

—না। একা থাকতে নেই। যাবে? ঘর আচে।

—তোমার নাম।

—সবিতা। আর তুমি?

—আমি পুরন্দব। পুরন্দব ভাট্‌।

—বিহাবী?

—না, না, বাঙালি।

—বেশ নাম। কি করো গো তুমি?

—আমি। আমি কবিতা লিখি।

এই সময়েই খুঁজতে থাকা টর্চের ঝলক ওদের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—একটা কেস পেযে গেচি স্যাব! এই শালা, এই!

টর্চের আলো এগিয়ে আসে।

—মাগিটা ফ্লাইং স্যার। খদ্দের নিয়ে জাপটাজাপটি করছিল। আবে, এই! ধর তো. মেবে গাঁড় ফাটিয়ে দে...

পুরন্দর সবিতার হাত শক্ত করে ধরেছিল আর মেযেটা এত পলকা, এত রোগা যে ওকে নিয়ে উড়তে অসুবিধে হয় না।

—এ কি, তুমি তো উড়চ?

—তুমিও পারবে। বলো, 'ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁই সাঁই।' ভয় নেই, বলো। আমি তো আচি। কেউ আর ধরতে পারবে না।

সবিতাও উড়তে থাকে। পাশাপাশি।

—এ কি করলে গো তুমি আমায়? তুমি কি ভূত নাকি গো?

—ধ্যুস্‌ ভূত কেন হতে যাব? আমরা হলাম ফ্যাতাড়ু।

—একন কোতায় নিয়ে যাবে আমায?

—চলো না। খারাপ লাগচে?

—না, ভালো লাগচে। পাখির পানা উড়চি। হি হি. উড়চি!

চোদ্দো

সবিতাকে পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দ পুরন্দরের কোনোদিনই ফুরোতে পারে না। সবিতা-পুরন্দরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো ডি. এস-এর বউ। শাড়ি দিল একটা অ্যামেরিকান জর্জেটের। বউ-পালানো মদনও দেখা গেল আনন্দে ডগোমগো। বেচামনি, কালী সকলেই সবিতাকে কাপড় দিয়েছিল। লালবাজারেব কলমের দোকান থেকে কিনে পিয়ের-কারদাঁ-র একটা বল পয়েন্ট পেন ইন এ বাক্স প্রেজেন্ট করল গোলাপ। বলল,

—পুলিশ বলে ভেবনা কাব্যি ফাব্যি বুঝি না। ইস্কুলে পড়েচিলাম কবি কালিদাস রায়। এখনও ঝাড়া বলে যেতে পারি।

পুরন্দরের ভাগ্যটা সত্যিই খুলে গেল। যারা 'কাঙাল মালসাট' আর ফ্যাতাড়ু-র গপ্পো ছেপে ডুবেছে তারা পুরন্দরের কবিতার একটা ফোল্ডার বের করল, 'কবিবর পুরন্দর ভাটের ভাটের কবিতা'। বাংলা কবিতাব কন্ট্রোল রুমে খবরটা কি পৌঁছেছিল। ঐ কন্ট্রোল রুমটিতে ঢুকলে নানা রেয়ার জাতের হাফ-ডাইনো ও কতিপয় কুমিরকে দেখা যাবে যাদের ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে দেখা যায় না। এদের ধরে ধড়াদ্ধড় ক্যালানোর হাই টাইম অনেক দিন আগেই পার হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই ভেড়ুয়াগুলোকে নিয়ে কস্টলি সময় না ওয়েস্ট করে আমরা বরং পুরন্দরের কাব্য-জীবনের নতুন পর্যায়টি একটু সাইজ কবতে পারি। কেন নতুন? এই কারণে যে মাগ্ বাগাবার আনন্দে পুরন্দর এমন একটি মাল নামিয়ে দিল যা আগে কখনও ঘটেনি। সনেট।

অ্যাকোযাটিকায় ভাসে মরা টিকটিকি
পাণ্ডার পোঁদে লাথি, কালিঘাটে সিকি
ব্রেক-ডান্স শুরু হবে, প্যান্ডেল তাই,
গগনে গরজে মেঘ, বেগুনি প্যাঁদাই

আন্ডারয়্যারে গিঁট, পেল তেড়ে হাগা
লাগানোর স্বপ্নতে কত রাত জাগা
মইটি দাঁড়িয়ে থাকে, গাছ দিল ছুট,
বারো হাত কাঁকুড় তো বিচি তের ফুট

দণ্ডিত আসামীর খণ্ডিত গান
গাণ্ডুর পণ্ডিতি, মণ্ডিত প্রাণ
লণ্ডভণ্ড করে ব্যান্ডিট হাটে
আণ্ডা-র গড়াগড়ি, ডাণ্ডা ললাটে

ডিম্ ডিম্ রব ওঠে সাঁওতাল গ্রামে
ফান্ডা বাড়াতে হলে চাপা পড়ো ট্রামে

পুরন্দর এটা জানতে পারেনি যে পেত্রার্ক, স্পেনসার, শেক্সপীয়র, মিল্টন প্রমুখ সনেটবীররা তারিফ জানাতে কার্পণ্য করেননি কারণ তাঁরা উল্লিখিত কন্ট্রোল রুমের আওতায় পড়েন না।

লোকাল কমিটির লিডার প্রাণকেষ্ট গুপ্ত ওরফে পেঁচোদা দেখলেন ক্যাডারদের মনে মমির ভয় ঢুকে গেছে। তাঁরও যে ভয় ছিল না তা নয়। কারণ প্রাতর্ভ্রমণে বেবিয়ে তিনি একপাল বুড়োর খপ্পরে পড়েছিলেন যারা প্রায় রোজই বাজারের পয়সা ঝেড়ে জিলিপি, কচুরি সাঁটায়। দু-একটা খেতেও দেয়। সেই কাবণেই পেঁচোদা দাঁড়িযে গিযেছিলেন এবং একটা ফ্রি জিলিপি খেয়ে আঙুল চুষে ধুতিতে মুছতে মুছতে বলেছিলেন,

—ভীমরতি আর কাকে বলে। ওসব মমি ফমি সব পিওর গ্যাঁজা। ভালো করে দেখুন, ন্যাপথলিন ঠেসে হয়তো মড়া রেখে দিযেছে।

—তা তোর পার্টি কি করচে?

—ওযাচ করচে। বেশি হুজ্জুতি হলেই স্টেপ নেবে।

—শুনেচ, ওয়াচ করচে। বলচে নাকি ন্যাপথলিন পোবা মডা। দ্যাখ্ পেঁচো, পাড়ার ছেলে বলে একটা কতা বলে রাকি। এ তোর কলতলায় ঝিদের ঝগড়া থামানো নয়, মমি বলে কতা। ঝাডেগুষ্টিতে লোপাট কবে দেবে।

—কে? ওই মমি।

—হ্যাঁ, ওই মমি। পিরামিডের মমি যাবা টেনে বেব করেচিল, একটা সায়েবও বাঁচেনি। কোনোটা তেতলা থেকে ঝাঁপাচ্চে, কোনোটা পোকাড কামড়ে ফৌৎ। কিচু জানবি না, পডবি না, কেবল চোতা কপচানো। ওয়াচ মারাচ্চে।

পেঁচোদা ঘাবডে যায়। আর একটা বুডো, এটা হেভি খজডা, ধরতাই নিয়ে নিল,

—মমিব গাঁডে আঙলি কবতে যাসনি যেন। দেখচিস বাক্সে দিব্যি রযেচে। রাত হলে বেরোয়. হয় তোর রক্ত চুষে নিল বা ঘেঁটি মট্‌কে দিল. .তখন 'মামা' বলে চেঁচালেও কেউ আসবে না। বা ধর্ তোর কিচু কবল না কিন্তু তোর বউ হয়তো গলায় দড়ি দিল। বাড়িতে হয়তো অপঘাত ঘটে গেল। আমাব কতা হল, যা জানিস না বুজিস না তা নিয়ে ধন নাচাবার দরকারটা কি? মমিকে মমির মতো থাকতে দে, তাহলে ও কিচু করবে না। বরং হয়তো উল্টে ভালোই করে দিল। তোব ফেসকাটিং দেখেই বুঝতে পারচি পোঁদে ভয় ধরেচে। আর একটা জিলিপি খাবি?

লোকাল কমিটির কাছে নানারকম রিপোর্ট আসতে লাগল। সবই নাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। মমি নাকি মাঝরাত্তিরে আদি গঙ্গায় গিয়ে চান করে, তারপর ভিজে কাপড়ে মায়ের মন্দিরের দিকে যায়। কোন্ বাড়ির বউ নাকি ছাদে মেলা কাপড় তুলতে ভুলে গিয়েছিল। রাত করে তুলে আনতে গেছে, অমনি তিনটে মানুষ মাপের ভূত নাকি ঝটপট করে উড়ে পালালো। কে নাকি পায়খানার সামনে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়েছে, ওমা, সকালে গিয়ে দেখে বিরাট বিরাট পায়ের ছাপ। বাজারের মুরগির দোকানে রাত্তিরে জালফাল ছিঁড়ে নাকি গোটা দশেক মুরগি হাওয়া। মমির ভয় সেইভাবেই ছড়াতে লাগলো যেভাবে আগে প্লেগ ছড়াতো। অবশ্য কলকাতায় ইঁদুরের যা হিউজ পপুলেশন তাতে প্লেগ আবার নতুন করে ছড়াতেও কোনো বাধা নেই।

কংগ্রেসের এক লিডারকে মিডিয়ার প্রশ্ন,

—মমি নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?

—হাই কম্যান্ড না জানালে মুখ খুলব না।

তৃণমূলের জনৈক লিডারও ইভেসিভ,

—দেখি উনি কি বলেন।

বি. জে. পি-র নেতার জবাব,

—যাঁর মমি হয়েছে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। আর. জে. ডি-র নেতা,

—কেয়া মমিয়া মমিয়া করতে হো। হাম কেয়া কুছ কমি হ্যায়?

দাঁড়কাক আর বনবেড়াল গিয়ে দেখল বেগম জনসন হেভি মন দিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখচে টি. ভি-তে। এম. সি. সি বনাম হিন্দুজ। খেলাটা তখন টিভিতে লাইভ হচ্ছিল যদিও খেলাটা হয়েছিল বম্বেতে ১৯২৬-এর ১ ডিসেম্বর।

—ওফ্, ইন্ডিয়ান নেটিভগুলো দেখচি খেলাটা শিখে ফেলল, ইউ শুড ফিল প্রাউড।

দাঁড়কাক আর বনবেড়াল দেখল ১৩টা বাউন্ডারি আর ১১টা ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৫৩ রান করে সি.কে. নাইডু ডিপ-এ কট্-আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। বেগম জনসন টিভিটা মিউট করে দিলেন ফলে ছবি চলতে লাগল।

—আমাদের কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে।

বলে তিনটে গেলাসে লেমনেড ঢাললেন জনসন।

—কি ভুল?

—ভদিকে সিঙ্ হিজ ইনফ্যান্ট ডেজ দেখে আসচি। পেটটা ওর বরাবরই উইক। এখনও তো খাওয়া কন্ট্রোল করতে পারে না। কালই তো হাফ-হাঁড়ি কাঁকড়ার ঝোল একাই সাঁটিয়ে দিল।

—সো হোয়াট?

—মানে ধরো তেমন হাগা শুরু হয়ে গেল যে ছুঁচোবার জল পোঁদে ড্রাই হওয়ার চান্স পাচ্ছে না। তখন ও শুয়ে থাকবে কি করে?

বনবেড়াল লেমনেড খেতে খেতে বলল,

—এটা তো আমাদের ভাবা উচিত ছিল।

—তাই আমাদের ইমিডিয়েটলি ভদির একটা ফাইবার গ্লাস রেপ্লিকা বানানোর দরকার। ইভা পেরনের মমিরও রেপ্লিকা ছিল।

দাঁড়কাক হেসে বলল,

—দরকার হবে না।

—কেন?

—পরকায়া-প্রবেশ। ভেরি ইজি। ভদির বডিতে আমি ঢুকে যাব। ভদি ঢুকবে আমার বডিতে। হাগলে হেগে মরবে দাঁড়কাক। ভদি যেরকম রয়্যাল স্টাইলে মমি হয়ে আচে তেমনই থাকবে।

—ওফ্, ইউ আর সিম্পলি অ্যাসটাউন্ডিং।

বেগম জনসন টিভির মিউট অফ করলেন। লাইভ, ১৯২৬ সালের হাততালি শোনা গেল।

পনেরো

মমি দেখার লাইন রাসবিহারী মোড় পেরিয়ে যেতে শুরু করল। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি—সব কাগজে মমি ছয়লাপ। ডিডি বাংলা, সিটিভিএন, তারা, আলফা, আকাশ—সব চ্যানেলেও ভদির মমি দেখা গেল। স্মিত হাসি, ভুঁড়ি, তৎসহ 'ভদি ভদয়ে নম, ভদি ভদভদয়ে নম...'। শোনা গেল মেট্রো মমি স্পেশাল চালাবার কথা ভাবছে। ওদিকে টিকিট কেনার দশ টাকা বাদেও বেচামনির পায়ের কাছে রাখা থালাতেও নোট ও কয়েন পড়তে থাকল। ভদি-ভজনের ক্যাসেট ও সিডি বেরোল। উঠতি বাংলা ব্যান্ড 'ক্লাউন'-এর গান এফ. এম-এ বাজতে লাগল, 'এ মমি! ও মমি! উঃ মমি। আঃ মমি।' জোযাবদাব একদিন ডিউটি থেকে আর্লি বাড়িতে ব্যাক করে দেখলেন এবং শুনলেন, ললিতা প্লাস বান্টি সেন হিমানী সোম, মিসেস দারুওয়ালা প্রমুখ লেডিজ ক্লাবের সদস্যরা ভদির ছবির সামনে বসে ভদি-ভজন গাইছে।

যেটা জোয়ারদার আশঙ্কা কবেছিলেন সেট'ই হল। ফোনে কমরেড আচার্য। বোধহয় বাড়ি থেকেই কারণ আবছা টেগোর সং শোনা যাচ্ছিল।

—আপনারা কি কিছুই করবেন না?

—কি ব্যাপারে, স্যার?

—ওই যে কি মার্শাল ভদির মমি না কি একটা ননসেন্স চলছে। ভদি, সে মরল, সেটা অবশ্য গুড নিউজ, কিন্তু সায়লেন্টলি মমি হযে গেল। চারদিকে মমি, মমি! যদিও একটা হোক্স। পিওর গ্যাঁজাখুবি কেস। এতকিছু হল, আপনি কি কবছিলেন।

—দেখুন, মবে গেছে, মমি হযেছে, এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই করাব নেই।

—কিন্তু, এতবড়ো একটা ফ্রড্'

—না, আমি ডিফার করছি স্যার, সে আপনি যাই ভাবুন। আমি নিজে দেখে এসেছি, পারফেক্ট মমি। নো হোক্স। এবং হাইলি ফ্রেশ। নো ব্যাড স্মেল, নাথিং।

—আপনি নিজে গেলেন?

—হ্যাঁ, নিজে। তবে কাবলিওলা সেজে। কেউ চিনতে পারেনি।

—সেটা ভালোই করেছেন। তবে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন। এ জিনিস চলতে দেওয়া মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।

ধাম্ করে রিসিভার রাখলেন কমরেড আচার্য। অমনি খিঁচিয়ে উঠলেন জোয়ারদার, 'মানুষ মেনে নেবে না! বাল। পালে পালে দৌড়চ্ছে লাফাচ্ছে। মেনে নেবে না। পারা গেলনা।' জোয়ারদার পকেট থেকে ওয়ালেট বের কবলেন, খুললেন। মার্শাল ভদির একটা ফটো। জোয়ারদার গুনগুনিয়ে ভদি-ভজন গাইতে লাগলেন।

রাতে সরখেলের বাড়ি। দোতলার একটি ঘরে সরখেল, বল্লভ বক্সি, গোলাপ, তিন ফ্যাতাড়ু, দাঁড়কাক ও বনবেড়াল। এমন সময় দরজায় খুট্ খুট্ হল। বেচামনি ও নলেন ঢুকল। বেচামনি মাথা থেকে পরচুলো খুলল, শাড়ি খুলল—আন্ডারওয়্যার পরা ভদি। সকলেরই মুখে আনন্দ। বিশেষ করে আনন্দ পুরন্দরের। ঘরভাড়ার তোড়জোড় চলছে। ততদিন সবিতা বেচামনির কাছেই থাকবে। পিটার স্কটের বোতল খোলা হল। সঙ্গে রেশমি চিকেন কাবাব। এমন সময়ে দরজায় ফের টক্ টক্। এবারে বড়িলাল। কালী কষা মাংস রেঁধে পাঠিয়েছে।

—আচ্ছা ভদিদা, এই যে তুমি নিঃশ্বাস না নিয়ে অতক্ষণ থাকো, টেকনিকটা কি।

—ভেরি স্পেশাল টাইপের একটা কুম্ভক।

—শিখলি কোথায়?

প্রশ্নটি দাঁড়কাকের। ভদি উঠে গিয়ে দাঁড়কাকের পায়ে মাথা ঠেকায়। দাঁড়কাক বলে,

—নে, বসে আরাম করে মাল খা। তোর যা ধকল যাচ্চে। চোক্তারের গুষ্টি ছাড়া এই কুম্ভকটা কোনো শালা জানে না। চারপুরুষ আগে আমাদের লাইনে আব কি, আউ আব গাউ বলে দু ভাই জন্মেছিল। গাউ ওলাউঠোয় পট্‌লে গেল। আউটা ছিল হেভি হারামি। আর তেমন সাহস। তখনকার দিনে, ভাব, মণিপুরী খাম্বা বলে স্পেশাল একটা গাঁজা আনতে গিয়েছিল মণিপুব। সেখানে জঙ্গলে জালিবাবা বলে এক সাধুর কাছে আউ এই কুম্ভকটা শেখে। জালিবাবা আবার অজগরদের শীতঘুম স্টাডি করে মালটা রপ্ত করেছিল। এই টেকনিকেই ব্যাঙ-ফ্যাঙ ঘুমোয।

বনবেড়াল বলল,

—আমিও শিখে নেব ভাবছি। মড়া হয়ে পড়ে থাকব। খরগোশ, ছোটো হবিণ, শেয়ালেব বাচ্চা, শুওরের ছানা—এরা মরা দেখে পাত্তা দেবে না। শুঁকে দেখার জন্য কাছে আসবেই। এলেই ঘ্যাক্।

—আরে তোর তো শিখতে দু মিনিট লাগবে। কোনো ব্যাপারই না। পুবন্দব, বাল সিবিজ আর এগোল?

—লিখেচি একটা, আজই, তবে রিভাইজ করা হয়নি।

—গুলি মার্। পড়্।

—সামনেব জমিটি নাবাল
তাহারই সম্মুখে বসি
কবিকূল পাড়িতেছে ফাল
আঁকা-বাঁকা আল
সেই পথে নাচিছে শৃগাল।

এরপর, দেখিয়া ভিডিও
আসিল বিডিও
নাবাল জমিতে
ফ্যালে মাটি
কোঁকড়া কোঁকড়া ফলে
সার সার আঁটি।

কাঁদিয়া মরিছে কবিপাল
সম্মুখে ঢেউ তোলে বাল।

বাঃ বাঃ, সাধু! সাধু! হারগিজ হবে না, চাম্পি! চাম্পি। প্লাস হাততালি ও হুপ্ হাপ্ সম্ভবত আরও কিছুক্ষণ চলতো যদি না দরজাটা আস্তে করে খুলে গিয়ে একজন কাবলিওয়ালা দেখা যেত। মেজর বল্লভ বক্সি 'হু ইজ দেয়ার?' বলে গর্জন করলেন এবং তাঁর ডানহাত কম্যাণ্ডো জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ভদি ডান হাত অভয় দেওয়ার স্টাইলে না তুললে এই নন-ভায়োলেন্ট নভেলটি হয়তো সহিংস রূপ ধারণ করিত।

কাবলিওয়ালা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়কাককে প্রণাম করে বলল,

—সেদিন তিনবার 'হুশ' বলে মহা অপরাধ করেছি। মাপ করে দিন স্যার।

—আমিও তোকে 'গাণ্ডু' বলার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

—ছি, ছি, আপনি গুরুজন, মন চাইলেই খিস্তি মারবেন। মার্শাল ভদি, আজ আমি আপনারই দলে। চোক্তার বানান, ফ্যাতাড়ু বানান, ইচ্ছে হলে কিছু না-বানান, ম্যাটাবস্ লিটল।

বনবেড়াল গোলাপকে বলল,

—গোলাপ, তোর উচিত ওঁকে স্যালুট করা।

গোলাপ একটু টং। সে বলল,

—কাবলেফাবলেকে গোলাপ মল্লিক স্যালুট করে না।

কাবলে বলল,

—ছিঃ রোজ! হাজার হলেও আমি এখনও তোমার বস্ যদিও ইন ডিজ্‌গাইজ। আই অ্যাম নগরপাল জোয়ারদার।

গোলাপ দু হাত দিয়েই স্যালুট মারে।

জোয়ারদার একটা জব্বর খবর এনেছিল। আজ বাদে কাল রবিবার স্পেশাল অর্ডার নিয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজের মড়া স্পেশালিস্ট ডঃ গুরুচরণ বটব্যাল মমি পরীক্ষা করতে আসবেন। সঙ্গে প্রেসের লোকও থাকবে।

এসেওছিলেন বটব্যাল। ভদির পেটে হাত বুলোলেন। পেট বাজালেন। পায়ের আঙুল টানলেন। ঠোঁট সরিয়ে দাঁত দেখলেন। পাতা টেনে চোখ। এরপরেই ক্যাচাল। ব্যাগ থেকে তিনি দুটি স্লাইড এবং একটি সন্না বের করলেন। মেজর বক্সি খ্যাক্ করে উঠলেন,

—কি করবেন ওগুলো দিয়ে? মমিকে কোনো খোঁচাখুঁচি চলিবে না।

—না, না, নো খোঁচাখুঁচি। বডির একটু স্যাম্পেল লাগবে। ডি এন এ টেস্টের জন্যে।

গোঁফ উঁচিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মেজর বক্সি।

—নো, আর টাচ করিবেন না। সেকেন্ডলি, এটা বডি নয়, মমি। নো ট্যামপারিং। আই ওয়ার্ন ইউ।

—মানে, আপনি সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন করতে দেবেন না।

—চোপরাও বুড্ঢাচোদ্, এর পর কিন্তু ফায়ারফাইট স্টার্ট হইবে।

ডঃ বটব্যাল তো বটেই, প্রেসের লোকেরাও এক্স-ফৌজির থ্রেটে ঘাবড়ে গিয়েছিল। সবই কাগজে বেরোল। কমরেড আচার্য স্টেটমেন্ট দিলেন, 'বিজ্ঞানের পথে বাধা সৃষ্টির এই ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে একটা কথাই, মমি নিছকই ভণ্ডামি। আমি জনগণের কাছে আবেদন করছি যে বিভ্রান্ত হবেন না, বিভ্রান্তিকর গুজবও ছড়াবেন না। সরকার এই ব্যাপারে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

বেগম জনসন বনবেড়াল ও দাঁড়কাক বললেন,

—আচায্যি লোকটা সুবিধের নয়। মোটকথা, আমাদের স্ট্র্যাটেজি হবে যতদিন না মেজর একটা ঝামেলা বাধছে চুপচাপ মাল কামিয়ে নেওয়া। যাতে করে এর পরে নাইদার দা চোক্তারস্ নর দা ফ্যাতাড়ুজ প্লাস যারা আমাদের দলের—কারও কোনো ফিনান্সিয়াল ডিফিকালটি না হয়।

—জোয়ারদার বলচে যে অ্যাসল্ট একটা আসবেই। তখন আবার ভদির কোনো প্রবলেম না হয়।

—বাবা হিসেবে দুশ্চিন্তা ইউ ক্যাননট পারহাপ্স অ্যাভয়েড। কিন্তু এটাও তুমি জান যে ভদিকে কেউ টাচ করতে পারবে না।

—সে তো বটেই।

বনবেড়াল বলল,

—ভদিকে কে টাচ্ করবে। আমি থাকতে ইভেন রবার্ট বুশও ওকে কিছু করতে পারবে না। ঘ্যাঁও।

ওদিকে নানা নিউজপেপারে একটি চিঠি বেরোল। তলায় পিশাচদমন পাল ও অন্যান্য বাঘা বাঘা মালদের সই। মমি সম্বন্ধে সবকার ও পার্টির নেতিবাচক মনোভাবের তাঁরা বিরোধী। বাঙালির মমি বাংলার মুখকে উজ্জ্বল কবেছে। মিশবের প্রাচীন মমিদেব গ্ল্যামার বাংলার টাটকা মমি অনেকটাই হাওযা করে দিয়েছে। মার্শাল ভদির সঙ্গে কারও বিরোধ থেকে থাকতে পাবে। কিন্তু নির্বাক ও নির্বিরোধী মমির বিরুদ্ধে বিষোদগার মর্মান্তিক বেদনারই কারণ ঘটাচ্ছে। হায়, বাঙালি রোজই মরে কিন্তু মমি মাত্র একটি। সেটিও কি থাকবে না? মমিব প্রতি মমত্ববোধ যেন আমরা না হারাই। তা না হলে সেদিনেব বেশি দেরি নেই যে হা মমি, হা মমি করিয়া রোদন করিতে হইবে। কই, লেনিনের মমি নিয়া তো ইঁহারা কাঁউ কাঁউ করেন না।

বিখ্যাত খচড়াদের চিঠি পড়ে ক্ষেপে গেলেন কমরেড আচার্য। এটাও অনুভব করলেন যে এদের গুলি করে মারা উচিত। পারা যাচ্ছে না বলে হাতও কামড়ালেন। এবং সেই সঙ্গে একটি টপ মোস্ট আর্জেন্ট গোপন সার্কুলার বাছাই কবা লিডারদের হাতে চলে গেল।

'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অভ্রান্ত আলোয় মমি সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা হবে এবং সমস্যাটিব মোকাবিলাও কবা হবে।'

মিঁয়াও

ষোলো

এই অধ্যায়টি নিপাট অধ্যয়ন।

'শুভ্র মেরুদেশ। অরোরা বরিয়ালিসের প্রেতাভা আলোয সকলই তাল তাল বরফ। তলায লাভা। আবার এমন আইসক্রিমও কারনানি ম্যানসনে খানদানি খানকি খাইয়াছিল যাহার উপব ফরাসী ব্র্যান্ডি ঢালিয়া দিয়াশলাই ঠুকিয়া দেওয়া হয়। খানদানি খানকির ওই বিশাল দেহেব নানা সংবেদনশীল এলাকায় ঢেউতে ওলটপালট খেতে খেতে শিবনাথ মাই-এর ডগায়, মানে বোঁটার ওপরে উঠে গেল, ওখান থেকে 'জয়-মা!' বলে পেটের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়ল। খানদানি খানকির বডি। স্লিপারি। চালমুগড়া, চন্দন ও অলিভের গন্ধে মাতোয়ারা। হাতড়ে হাতড়ে শিবনাথ চলল খানদানি খানকির নাভির দিকে যা একটি অতলান্ত কূপ যাব গভীর হইতে একটি নির্দেশ ধ্বনিত হচ্ছিল—'যা নেমে যা'। শিবনাথ অন্বেষণে চলিতে লাগিল। স্লোপ। হাসনুহানার ঝোপ। ঐ, ঐ, প্যাগোডার চূড়া দেখা যাচ্ছে। গ্যারেজ না প্যাগোডা। শিবনাথ, শ্বাসরুদ্ধ শিবনাথের কানে টাইফুনের শব্দ। ভাবিল সে কি টেঁকি টেঁকি খেলিবে না চোর-পুলিশ? খানদানি খানকির বিশিষ্ট অ্যানাটমিতে শিবনাথ বলিয়া কেহ নাই। আছে রাধানাথ শিকদার। তাহাকে এভারেস্ট মাপিতে হইবে।'

বজরা ঘোষ প্রণীত 'খানদানি খানকি'

(প্রথম খণ্ড)

সতেবো

ঘ্যাক্

পার্টি অফিসের দোতলায় মমি বিষয়ক গোপন উচ্চস্তরীয় মিটিং। পার্টির জঙ্গী যুবনেতা যেমন আছেন তেমন 'গুডচা' বলে পরিচিত বনমন্ত্রী বনবিহারী তা আছেন, আছেন আই. টি বিভাগেব মন্ত্রী যিনি প্রায়ই বিদেশেব আই. টি. ব্যবসার হন্‌চো দের মিট করতে সিলিকন ভ্যালি বা সিঙ্গাপুর উড়ে যান। আছেন ফিশ অ্যান্ড চিকেন দপ্তরেব মন্ত্রী যাঁর চীনে গিয়ে মুরগি ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য বার্ড ফ্লু হয়েছিল।

কমরেড আচার্য শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেবিলেব তলা থেকে,

—মিঁয়াও!

কি ব্যাপার! বনবিহারী তা টেবিলেব তলায় ঢুকে আঃ আঃ কবতে করতে কালপ্রিটকে অ্যারেস্ট করলেন। তুলতুলে ছোট্ট একটা বেড়ালছানা।

কমরেড আচার্য মক্ রাগ দেখালেন।

—তলায় নেপালী দারোয়ান আর দোতলায় বেড়ালছানা' আজব ব্যাপার।

বনবিহাবী তা বেড়ালছানাকে কোলে নিয়ে আদব করতে করতে বললেন,

—দা ট্রাবল উইথ দা কিটেন ইজ দ্যাট

ইভেনচুয়ালি ইট বিকামস্ এ ক্যাট

—কবিতাটা ভালো? কিন্তু কার?

—অ্যামেরিকান কবি অগডেন্ ন্যাশ্-এর।

—তার মানে ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রোপাগান্ডা। ওসব ফালতু জিনিস পড়েন কেন?

বনবিহারী তা চুপ। ফিশ অ্যান্ড চিকেন মিচকে হাসছে। বেড়ালছানা ঘুমোচ্ছে।

—যাই হোক, আমি শুরু করছি। প্রথমেই বলব যে মমি নিয়ে ব্যাপারটা ইনটলারেবল লিমিটে চলে গেছে। নিশ্চয়ই কমরেডরা কাগজে ওই রিঅ্যাকশনারি অপারচুনিস্টদের চিঠিটা পড়েছেন। এদের এমন সাহস যে ওরা লেনিনের মমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোথায় সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সাফল্য আর কোথায়...

মুহূর্তের মধ্যে বেড়ালছানাটি উষ্ণ কোল থেকে টেবিলে লাফিয়ে ওঠে ও জিমনাস্টদের স্টাইলে উল্টো ভল্ট খেতে খেতে দু সেকেন্ডের মধ্যে হিংস্র বনবেড়ালে পরিণত হয়—পিঠের রোঁয়া, ল্যাজ সব ফোলা। সেই সঙ্গে ঘঁ ঘঁ গর্জন।

—সব টলারেট করা যায় কিন্তু ঢপবাজি দেখলেই আমি রেগে যাই। সোভিয়েত বিজ্ঞান। লেনিন মারা গেল ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪। সাত বছরে সোভিয়েত বিজ্ঞান পয়দা হয়ে গেল? ওফ্, চুপচাপ শুনে যা, আখেরে লাভ হবে। ২১ জানুযারি—সন্ধে ৬টায় লেনিনের ভয়ঙ্কর কাঁপুনি, নিশ্বাস অনিয়মিত। পালস্ রেট মিনিটে ১৩০। সাড়ে ৬টায় নাড়ির গতি নেমে এল। টেম্পারেচার ৪২.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ৬-৫০-এ স্ট্রোক। মুখটা লাল, উঠে বসার চেষ্টা, তারপর মাথাটা এলিয়ে পড়ল। শেষ। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অটোপসি রিপোর্টে বলা হয়েছিল "died from cardio-respiratory arrest following a brain haemorrahage in a context of atherosclerosis" নে, কফি আর প্রন পকোড়া বল্। কাল হেভি রয়্যাল চ্যালেঞ্জ পেঁদিযেচি

উইথ রেওয়াজি খাসি অ্যান্ড ডিপ ফ্রায়েড বুড়ো পাঁঠার বিচি। মাথাটা ক্লিয়ার করার দরকার। উল্টোপাল্টা কিছু করিস না। তোদের ইনজিওর করার কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই।

কফি ও প্রন পকোড়া এসে গেল।

মুখ খুললেন বনবিহারী তা।

—আজ্ঞে, আপনি কার কাছে কথা বলা শিখেছেন?

—শিখতে হয় না। সব আপ্‌সে। তুই তো তাও বইফই পড়িস। সাকি মানে এইচ. এইচ. মুনরো-র একটা গল্প আছে, 'টোবেরমরি', আর বুলগাকভের 'দা মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা'-টা পড়ে ফেললে, পুরোটা না হলেও, আমার সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারবি। 'মসোলিয়ম'ও পড়তে পারিস। তবে মালটা এখনও ফিনিস হয়নি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ছোটো করে বলি, যা মাথা এক একটা, সব বাউন্সার হয়ে যাবে,

লেনিনকে মমি করার বিরুদ্ধে ক্রুপস্কায়া ২৯ জানুয়ারি, ২০০৪, প্রাভদায় লিখেছিলেন। কেউই পাত্তা দিল না। ইন ফ্যাক্ট ১৯২৩-এ লেনিনের মৃতদেহ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটা নিয়ে পলিটব্যুরোতে কথা ওঠে। তুলেছিল স্তালিন। কিন্তু প্রোজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি শুরু করে ঝেরঝিনস্কি। আমি আর ফিউনেরাল, কারা কফিন বয়েছিল, তাদের কতজনকে স্তালিন ঝেড়ে দিয়েছিল, ট্রটস্কি কেন ছিল না—ওসব ঘাঁটছি না।

ওদিকে মৃতদেহ পচনের প্রথম চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছিল—মুখ আর হাতের চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছিল, দেহের নানা জায়গায় চামড়া কুঁচকে যাচ্ছিল, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। তিনজন বলশেভিক নেতা ব্যাপারটা দেখছিল—মলোটভ গাধাটা, আর ইয়েনুকিদ্‌জে আব ক্রাসিন। ওই ক্রাসিন ব্যাটা ভেবেছিল রেফরিজেরেশন করবে। কিন্তু ডাক্তাররা বলল বডি টিকবে না। এই রিপোর্টটা পড়ে ইউক্রেনের খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভরোবিয়েভ খচে গিয়ে ঝুক বলে একজনকে বলে যে ঠেকানো যায়। সেই ঝুক-ই ঝেরঝিনস্কিকে জানায়। মালটা তখন যেতে বাধ্য হয়। পরে ভরোবিয়েভের সঙ্গে যোগ দেয় জবারস্কি। এর মধ্যে অধ্যাপক আব্রিবাসভ বডিতে ফরম্যালিন্ অ্যালকোহল আর গ্লিসারিন ইঞ্জেকশন করেছিল। যাই হোক ক্রাসিনের ছাগুলে বুদ্ধি শেষ অব্দি বরবাদ হয়—মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে নাইট্রোজেনের মধ্যে বডি রাখলে আর দেখতে হতো না। এরপর আনা হল লেনিনগ্রাদের থ্যানাটেলজির অধ্যাপক শর-কে, তোদের যেটা ওই ব্যাটবল না কি যেন। যাই হোক, মৃত্যুর দু মাস পরে ভরোবিয়েভ এমবামিং-এর কাজ শুরু করে। জবারস্কিও ছিল। এরা কেউই সোভিয়েত আমলে কাজ-কারবার শেখেনি। পরে জবারস্কি-র ছেলেও লেনিনের মমি রক্ষণাবেক্ষণের দলে ভিড়ে যায়। সবটাই সম্ভব করেছিল গ্লিসারিন আর পটাশিয়াম অ্যাসিটেট-এর সলিউশন যা বানিয়েছিল ভরোবিয়েভ। বডিতে এটা ইঞ্জেকশান করা হতো, বডিটা ওতে চোবানোও হতো।

অটোপসির ফলে মাথায় আর বুকে যে সেলাইয়ের দাগ ছিল সেগুলো ঢাকা দেওয়া হয়। ফুসফুস, লিভার, ভিসেরা সব বাতিল। ফরম্যালিন দিয়ে টিসুগুলোকে শক্ত করা হয়। গোঁফের তলায় সেলাই করে ঠোঁটদুটো জোড়া রাখা হয। চোখ উপড়ে নতুন চোখ বসিয়ে চোখের পাতা সেলাই করা হয়। আর বলব? আমি তো নন্ স্টপ বলে যেতে পারি—ভরোবিয়েভের রহস্যজনক মৃত্যু, পার্জের সময় কি হয়েছিল—এন্ডলেস। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় লেনিনের মমি পশ্চিম সাইবেরিয়ার তিউমেনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এবার আশা করি ফালতু প্যাঁক্ প্যাঁক্ করবি না।

এবার আমি মিহি করে ফুটে যাব। তবে তার আগে একটা কথা বলে যাই। ভদির মমির

একটা বালও তোরা ছিঁড়তে পারবি না। আর বেশি ডেয়ারডেভিলগিরি করলে মেজর বল্লভ বক্সি কিন্তু হাতেনাতে দুমদাম কিছু একটা ঘটিয়ে দেবে। এর জন্যে বেগম জনসন, দাঁড়কাক, আমি বা ভদি—কেউ দায়ী থাকবে না। বনবিহারী, চলি ভায়া। নর্থ বেঙ্গলে ইনস্পেকশনে গেলে, বাতের দিকে দেখা করে নেব, তোর তো আবার মালফাল চলে না। টা..টা...

ঘরে যেন টর্নেডোর শব্দ। টেবিলের ওপরে হঠাৎ বেগম জনসনের মুণ্ডু দেখা গেল। হিউজ থোবড়া। স্মাইলিং। ভ্যানিশ কবে গেল। তারপরই দাঁড়কাক। সে-ও উড়ে গেল। বাকি ছিল বনবেড়াল। সেও জানলা দিয়ে লাফ মেরে হাওয়া।

সকলেই চুপ। টেবিলে হাতে মাথা নিয়ে কমরেড আচার্য। খুবই কাতরকণ্ঠে বনবিহারী তা-কে বললেন,

—আগামী রোববাব, ভিডভাট্টাও থাকবে না, আপনি জোয়ারদারকে নিয়ে একবার যান। গিয়ে ওদের হাইকম্যান্ডকে বলুন আমরা কোনো ঝামেলা চাই না। ফেসসেভিং-এর জন্যে অ্যাডভাইস চান। এরকম ঝামেলা জানলে স্টেটমেন্টটা পাব্লিকেব কাছে দিতামই না। আমার ব্রেন আর কাজ করছে না। মিটিং খতম। যে যার কাজে যান। কাজ যা হচ্ছে তা তো জানি। যান, ড্যাবড্যাব কবে কি দেখছেন।

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সিগারেট ধবিয়ে বলেছিলেন—প্যাক অফ ইডিয়টস্!

আঠাবো

আশা করা যায় যে 'মসোলিয়ম'-এর পাঠক-পাঠিকা বা ওই জাতীয় খোকাখুকুরা এতক্ষণে মগজস্থ করে ফেলেছে যে বনবেড়াল বা দাঁড়কাক বা বেগম জনসন—এদের কেউই যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাউন্ডওয়ার্ক না করে খেলতে নামেনি। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা একটি গোপন সাক্ষাৎকারের গোটাটাই জানিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি।

মস্কো। মাইনাস টুয়েন্টি। প্রায়ান্ধকার একটি ফ্ল্যাটে বসে লেনিন মসোলিয়ম ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী নিকোলাই মার্দাশেভের (এটি সঠিক নাম নয়) সঙ্গে উপরোক্ত তিনজনের এরকম কথাবার্তা হয়েছিল—

বেগম জনসন · ওফ্ আপনাদের মানে রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের হাঁড়ির হাল দেখে আমরা একাধারে স্তম্ভিত ও শোকাহত।

মার্দাশেভ · সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। তবে এখন তো তাও আগের চেয়ে ভালো। তা না হলে ভদকা আর ক্যাভিয়ের দিয়ে আপনাদের ওয়েলকাম করতে পারতাম। এক বছর আগেও এটা, মাইরি বলছি, ভাবাই যেত না।

বনবেড়াল কেন?

মার্দাশেভ দেখুন একটু তাহলে খুলেই বলি। মস্কোব মেয়র ইউরি লুজকভ আমাদের বুদ্ধিটা দেয়। ওল্ড ঘরানার মাল তো, হেভি ঘোড়েল। লুজকভই আমাদের বলল, দেখুন, মড়া তাজা রাখার যে বিরাট অভিজ্ঞতা আপনাদের তা দুনিয়াতে কোথাও নেই। আপনারা 'রিচুয়াল সার্ভিস' বলে একটা সাইড বিজনেস লড়িয়ে দিন। ফিউনেরালের জন্যে গ্যাংস্টারদের লাশগুলো

জুড়েমুড়ে রেডি করে দিন। অ্যাভারেজে বছরে পঁচিশ হাজারটা মার্ডার। সবই গ্যাঙের সঙ্গে রাইভাল গ্যাঙের লড়াই। ধড়াদ্ধড় লাশ পড়ছে। লড়ে যান। ব্যাস্ আমরাও লড়ে গেলাম।

দাঁড়কাক : কি রকম রেট যাচ্ছে?

মার্দাশেভ : সেটা ডিপেন্ড করছে ক্লায়েন্ট কি চাইবে তার ওপর। নরম্যাল কালার ফিরিয়ে দেব মুখে। হাতেও। হাত, ঘাড় নাড়াতেও পারবে। ধরুন মাথাটা বুলেটে চুরমার না হলে একদিনের কাজের মজুরি ১৫০০ ইউ-এস. ডলার। আর গোটা লাশটা যদি বোমায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে এক হপ্তায় সেটাকে জুড়েফুড়ে খোলতাই করে তুলতে ১০,০০০ ডলার।

দাঁড়কাক : বুঝলে বনবেড়াল, এ তোমার বাল কামিয়ে মড়া হালকা করা নয়।

বনবেড়াল : হেভি! হেভি!

মার্দাশেভ : একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট—এই কাণ্ডগুলো করা হয় একটা মোটা ছাই ছাই রঙের মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে।

বেগম জনসন : সে না হয় হলো, কিন্তু ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা কী?

মার্দাশেভ : ঐ টেবিলটার ওপরেই জোসেফ স্তালিনের বডি এমবাম করা হয়েছিল।

বেগম জনসন : মাই গড!

মার্দাশেভ : বডিটা পেয়েই আমরা যেটা করি, ৮ লিটার 'বালসাম' অ্যার্টারিগুলোতে ইনজেক্ট করি। তারপর ঠ্যাংদুটো আর হাতগুলো মাসাজ করি যাতে ওটা ছড়িয়ে যায়। দেখবেন হাতগুলো ছিল নীল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হাতির দাঁতের রঙ এসে যাবে। মুখটা যদি চুরমার হয়ে থাকে তো ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে সেই মুখটা আবার বানাই। এর জন্যে লাশের অন্য অংশ থেকে হাড় ও চামড়া নিতে হয়।

বনবেড়াল : ব্যাস্, কাম খতম?

মার্দাশেভ : না, না, এর পর হল বিউটিশিয়ানের কাজ। ফাউন্ডেশন লাগাবে, লিপস্টিক লাগাবে। লোকটা যে বিচ্ছিরিভাবে মার্ডার হয়েছে সেটা বোঝাই যাবে না। শেষে কপালের ওপর একটা হালকা, টিসু সেঁটে দেওয়া হয়।

দাঁড়কাক : কেন?

মার্দাশেভ : ওর ওপরেই সবাই শেষ চুমুটা খায়।

বেগম জনসন : মোস্ট আনক্যানি!

মার্দাশেভ : তবে এটা মনে রাখতে হবে যে লেনিনের বডি যেমন কেমিকালে ডুবোনো হয়েছিল সেসব এক্ষেত্রে হয় না। হয় না মানে দরকার পড়ে না। কবর দেওয়ার দিন অব্দি বডিটা ফিট করে দেওয়া। অবশ্য, পিওর এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে একটা গ্যাংস্টারের বডি আমরা কবর দেওয়ার ন মাস পরে তুলে দেখেছিলাম। খুবই তাজা ছিল। মনে হচ্ছিলো তো যে কোনোসময়ে চোখ খুলবে।

বনবেড়াল : নতুন অনেক কিছু জানা গেল। আচ্ছা প্রায়ই তো শুনি যে লেনিনের মমি নাকি কবর দিয়ে দেওয়া হবে।

মার্দাশেভ সে তো আমবাও শুনি। কথা ওঠে। হৈ চৈ শুরু হয। কথা ফেব চাপাও পড়ে যায়।

সাক্ষাৎকাবে যে কথাগুলো আসেনি সেগুলোও-বা 'মসোলিয়ম'-এর পড়ুয়াদের অজানা থাকতে যাবে কেন?

১। 'রিচুয়াল সার্ভিস' মৃত মনসবদাবদেব জন্য বাহাবী কফিনও বানায় ও আমদানি করে। আ্যামেবিকায তৈরি ঘ্যাম কাঠেব কফিন ৫,০০০ ডলার, বাশিযাতে বানানো ক্রিস্টালের কফিন ২০,০০০ ডলাব। 'দা গডফাদাব' ফিল্মে যে কফিনটি দেখানো হয়েছিল রাশিয়াতে তার নাম প্রখ্যাত মাফিযা বসের নামে 'আ্যাল কাপোন' এবং এটিই জনপ্রিযতাব শীর্ষে।

২। লেনিন মসোলিযমের মডা স্পেশালিস্টদেব যে কাবণে বমবমা অর্থাৎ দেদাবে গ্যাংস্টাবদেব মডা সাপ্লাই তাব মূলে বযেছে দুটি মাফিযা দলেব নন-স্টপ লডাই। এই দুটি গ্যাং-এব নাম হল 'সেনত্রেইনি' এবং 'উরালমাশ'। শেষোক্তটিই বড়ো। ভ্লাদিভোস্তকে গাড়ির চোরাচালান ও মস্কো বিমানবন্দবে মাল তোলা ও নামানো এদের দখলে। অনেকগুলো ব্যাংক এবা চালায়। লন্ডনের বিশ্ব মেটাল মার্কেটেও এবা সক্রিয।

৩। লেনিন মসোলিযমের বিজ্ঞানীরা আব যাদেব মৃতদেহ মমিতে রূপান্তবিত কবে তাবা হল স্তালিন, জর্জি দিমিত্রভ, হবলুগিন চোযবালসান (মোঙ্গোলিযা), ক্লিমেন্ট গটওযাল্ড (চেকোশ্লোভাকিযা), হো চি মিন, আগস্তিনো নেতো (অ্যাঙ্গোলা), লিন্ডন ফোর্বেস বার্নহাম (গাযনা) ও কিম ইল সুং (উত্তব কোবিযা)। চীনেবা নিজেবাই মাও এব মৃতদেহ মমি বানিযে ফেলে।

সকলেই জানে যে রবিবাবেব আগে শনিবার আসে। শনিবাব বাতে, নিবিড় ঘুমেব মধ্যে, কমবেড আচার্য স্বপ্নে নানা বিচিত্র মানুষদেব দেখেছিলেন। তুচ্ছ ব্যাপাবে মাথা না ঘামানোতে তিনি এতই অভ্যস্ত যে কাউকেই চিনতে পাবেননি। নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া, ফেলিক্স জেরঝিনস্কি, আব্রাহাম বেলেনকি, ক্লিমেন্ট ভবোশিলভ, জিনোভিযেভ, কামেনেভ, মলোটভ, বুখারিন, রুদজুতাক, টমস্কি, ক্রাসিন, ট্রটস্কি, ইযেনুকিদজে—কাউকেই তিনি চিনতে পারেননি। পারার কথাও নয। চিনেছিলেন একজনকেই। জোসেফ স্তালিন।

হুপ্! হুপ্!

সংযোজন

আমাদেব এই দেশে, এই জমানায়, ভাবতে বা বাংলা বলতে আমরা যা বুঝি সেই পশ্চিমবঙ্গে মমি হতে কেউ বাজি আছেন? হাত তুলুন। পা-ও তুলতে পাবেন। তবে আব কিছু না তোলাই ভালো।

ঘুপ! ঘাপ।

উনিশ

রবিবাব বনবিহাবী তা, জোযাবদার, প্রফেসাব বটব্যাল ও তিন চারজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, কোনো আর্মস ছাডাই ভদিভবনে গিযেছিলেন। সাম্নাটা। দবজা হাট করে খোলা। নো সাইনবোর্ড, নাথিং—খাঁ খাঁ করছে। ঘরগুলোও খোলা। মমি নেই, কাচেব বাক্স নেই, দেওয়ালে ভদির বাণী

নেই, সন্তোষ টু-ইন-ওয়ানে ভদি-ভজন নেই, কিছুই নেই। জোয়ারদার বাদে সকলেরই গা ছমছম করছিল। বনবিহারী ও অন্যান্যরা সব ঘরেই উঁকি মারলেন। কাল অব্দি যে এই বাড়িতে ধুন্ধুমার ক্রাউড কিচ্ছু দেখে বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা হাওয়া, এই গরমের মধ্যেই, হু হু করে এল আর কোথাও একটা ডাঁই করে রাখা 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' উড়তে লাগল। জোয়ারদার বনবিহারী তা-কে বললেন,

—একটা কথা বলব স্যার?

—বলুন।

—খুবই আনক্যানি লাগছে। আমার তো মনে হয় কেটে পড়াই ভালো।

—ঠিক বলেছেন। লাস্টে ভূতুড়ে কারবারে ফেঁসে আমরাই হয়তো ভিক্টিম হয়ে গেলাম। তবে, বনবেড়াল জানে আমি লোক খারাপ নই। তাও, বলা তো যায় না।

মিউ

কুড়ি

কারফর্মার ট্রাক নর্থ-বেঙ্গলে রওনা দিচ্ছে। অন্যবার খালি যায়, কাঠে ভর্তি হয়ে ফেরে। এবারে মাছি গলার জায়গা নেই। বস্তা বস্তা টাকা তোলা হয়েছে। টাকার গরম গদির ওপরে চড়ে বসেছে ভদি, বেচামনি, সবিতা, কালী, সবখেল, বড়িলাল, গোলাপ, বজরা ঘোষ, মেজর বল্লভ বক্সি, নলেন, ডি. এস, মদন, পুরন্দর, কারফর্মা ও আর সবাই। সবকিছু তদারকি করে ক্লান্ত বেগম জনসন। হেডলাইট জ্বলছে। ড্রাইভারের ছাদের ওপরে বনবেড়াল। বেগম জনসন সিল্কের রুমালে চোখ মুছছেন। দাঁড়কাক বলল,

—মাত্র তো মাস দুয়েক। তারপরেই তো সবাই আবার ফিরে আসবো। দুমাসে লোকে মমির কথাও ভুলে যাবে। তারপর, যে কে সেই।

বেগম জনসনের কান্না থামছে না। বনবেড়ালও নেমে এল।

—এ তো সামান্য ব্যাপার। আর এটা তো আমরা জানি বার বার ঘটে। অত করে বললাম, সঙ্গে চলো।

বেগম জনসন চোখ মুছলেন।

—উপায় কই? আমি গেলেই চারনক আর ওয়াটসন মারপিট লাগিয়ে দেবে। থামাবে কে তখন? এবার স্টার্ট করো। আর কাঁদব না।

বনবেড়াল আর দাঁড়কাক লরিতে উঠে পড়ে। লরি চলতে থাকে। বেগম জনসন ভেজা রুমাল নাড়ছেন। লরি মোড় ঘুরে যেতে বেগম জনসনকে আর দেখা যায় না।

—